ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৩, মে, ২০২৩

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 10th Issue 23rd, May, 2023

সম্পাদক
আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 10th Issue 23rd, 15th May, 2023, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১০ ম বর্ষ ও ২৩ তম সংখ্যা
১৫ মে, ২০২৩

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ ভাবনা
রাজেশ বিশ্বাস ১৫
শম্ভু মিত্রের নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ 'অভিনয় কী?' : একটি মূল্যায়ন
লিপিকা সরকার ২১
ভারতীয় নারী এবং সামাজিক পরিবর্তন : একটি বিশ্লেষণ
বরুন কুমার ঘোষ ২৯
বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটক ও খালেদ চৌধুরীর মঞ্চচিত্রণ
প্রসেনজিৎ ঘোষ ৩৫
বাঁকুড়া জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন ও বীরাঙ্গনা সত্যরানী হালদার : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান
সৌম্যদেব মাইতি ৪৭
বিহু : একটি অনবদ্য কাহিনী
লোপামুদ্রা চক্রবর্তী ৫৮
বাজার-সফল দুই গোয়েন্দা কাহিনির লেখক ও তাঁদের বিপণন কৌশল
বর্ণালী পাল ৬৪
কৌম সমাজের ভিন্ন ভাষ্য : তিলোত্তমা মজুমদারের 'স্বর্গের শেষপ্রান্তে'
দীপিকা বাড়ুই ৭৫
প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে
মনোজ মণ্ডল ৮৪
নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যে গীতার প্রভাব
অমিত রায় ৯৪
নাট্য ও নাটককার উৎপল দত্ত
বিজয় হাঁসদা ১০০
'দৃষ্টিদান' ও 'সুভা' গল্পে দৃষ্টিবিযুক্ত ইন্দ্রিয়বোধ
মনজিৎ কুমার রাম ১০৮
যোগ : চর্চা থেকে দর্শন
ব্রততী চক্রবর্তী ১১৫
জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব অনিস্বীকার্য
মধুরিমা ভৌমিক ১২৪
ছেচল্লিশের দাঙ্গার চিত্রাঙ্কনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ'
সনৎ পান ১৩২

গুণময় মান্নার খাদ্য আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস ‘অসামাজিক’,
অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র
পাপ্পু সোনা গান্ধী ১৩৮
গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথ-পুরাণের অনুষঙ্গ
অসীম সরকার ১৫০
কবিতার প্রান্ত ছুঁয়ে বনফুলের ছোটোগল্পেরা
সারমিন রহমান ১৬০
বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনানন্দের নির্বাচিত
কবিতায় আত্মমুক্তির নব আশ্বাস
সুবর্ণা সেন ১৭৩
কিন্নর রায়ের ‘প্রকৃতি পাঠ’: আধুনিকতার করালগ্রাসে নবপ্রজন্মী ভাবনা
সুকন্যা মাইতি ১৮২
শক্তিপদ রাজগুরুর ‘কাঁসাই-এর তীরে’ : আদিবাসীদের
প্রতিবাদী সত্তার অনন্য আখ্যান
সত্যা দেবনাথ ১৯১
কিশোর রবীন্দ্র মননে ইউরোপীয় নারী জীবন :
প্রসঙ্গ – ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’
দিলদার কিবরিয়া ১৯৯
‘সন্দেশ’ সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার সম্পাদিত
‘সন্দেশ’ এর একটি তুলনামূলক আলোচনা
শম্পা লাহা ২০৫
উনিশ শতকের নিজস্ব সংজ্ঞায়নে দুটি বাংলা প্রহসন
শ্রেয়সী মল্লিক ২১৪
সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও সংবাদ : পারস্পরিক
সম্পর্কের এক সাহিত্যিক পর্যালোচনা
পৌলমী সরকার ২২৩
আলকাপের আলোকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘মায়ামৃদঙ্গ’
সুজিত দাস ২২৮
‘ভূত ও মানুষ’ গল্পগ্রন্থে স্যাটায়ারিস্ট ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
দেবাশিস মণ্ডল ২৩৬
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রাধা’ : আঞ্চলিকতা নয়, অঞ্চলচেতনা
সুচন্দ্রা রায় ২৪৫

গোবিন্দদাসের রাধা : অভিসার জয়ের সংগ্রামী প্রতিমূর্তি
তাপস মণ্ডল ২৫৪
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে নারী-ভাবনা : প্রসঙ্গ 'নারী হওয়া'
দেবাংকৃতা সরদার ২৬০
মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নির্বাচিত ছোটগল্পের নির্মাণ- শৈলী
অঞ্জলি পাইক ২৬৮
অভাব জাত 'বিভাব'
অঙ্কিতা মুখার্জী ২৭৫
সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যান্টি': একটি বিশ্লেষণের নিরিখে
টুম্পা খাতুন ২৮০
মারীর চড়ক থেকে উত্তরণের কবি বিষ্ণু দে
সুরজিৎ প্রামাণিক ২৮৭
'নৈতিকতা'- তার সঙ্গে কিছু অধিকারের প্রশ্ন
শিবান্বিতা মুখার্জী ২৯৮
নবজাগরণের প্রেক্ষিতে রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তা
বিদ্যুৎ সরকার ৩০৮
অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলার বাবু সংস্কৃতি ও দুর্গোৎসব
সন্দীপ বিশ্বাস ৩১৬
দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্প : নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনদর্পণ
শর্মিষ্ঠা জোদ্দার ৩২৩
ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন : এক ক্ষুধার্ত জীবনের আখ্যান
তন্ময় সরকার ৩৩৩
ডোমজাতির ইতিকথা ও ডোমনীগান
মনোজ ভোজ ৩৪২
সাম্প্রতিককালের প্রাসঙ্গিক গল্পকার নলিনী বেরা'র
ছোটগল্প : সীমাহীন নস্টালজিক আলেখ্য
অর্পন ঘোষ ৩৪৭
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ-যুদ্ধ, মন্বন্তর ও মানুষ
আশিস কুমার সাহু ৩৫৫
মর্ম মেঘ ও সোনালি ডানার চিল : আত্মঘাতী অবচেতন মনের স্বরূপ
আর্জুমুন নেহার বানু ৩৬৩
'অচেনা বীরাঙ্গনাগণ' : বাংলা শিকার-সাহিত্যে মেয়েরা
অনিন্দিতা মণ্ডল ৩৭১

স্ত্রীশিক্ষা থেকে দেশের কাজ : উনিশ শতকে
জাতীয়তাবাদে বাঙালি মেয়েরা
অর্পণ নস্কর ৩৮০
ব্যঙ্গের বাণে বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্প
সাহেব দাঁ ৩৮৮
ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় বনফুলের অনুগল্প
শ্রেয়সী দাস ৩৯৭
মৈমনসিংহ-গীতিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচয়
সেখ হোসেন ৪০৩
প্রাচ্য রসতত্ত্ব এবং সুধীরকুমার দাস গুপ্তের 'কাব্যালোক' গ্রন্থ
নীলকমল বাগুই ৪১০
স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার দুই বিপ্লবী সংগঠন
জয়িতা সিংহ ৪২৩
খাদ্য সমস্যা থেকে বিধিবিধানের অসারতা :
মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্প
সঞ্জীব মণ্ডল ৪২৮
বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও ব্যাসকৃত মহাভারত
হরিপদ মহাপাত্র ৪৩৫
শৈলেন ঘোষের নাট্যচর্চা ও রচনায় শিশু-কিশোর চরিত্র
রিয়া পাল ৪৩৯
শৃঙ্খল ঝঙ্কার : এক বন্দী নারীর আখ্যান যখন ইতিহাস
কৃষ্ণ কুমার সরকার ৪৪৬
নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকধর্মের অবক্ষয় :
একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা
প্রদীপ মণ্ডল ৪৫৮
লিঙ্গ বৈষম্য : সমাজের মূলস্রোতে তার প্রভাব
মুনমুন দত্ত ৪৬৮
মল্লিকা সেনগুপ্তের 'Mrs.বাংlish এর আত্মবিলোপ':
মাতৃভাষা নাকি বকচ্ছপের জয়জয়কার?
শিবানী মন্ডল ৪৭৯
অপরাধের অন্ধকারে নিমজ্জিত ঔপনিবেশিক বাংলা :
বর্ধমান জেলার ডাকাতির ইতিহাস
নূরমহম্মদ সেখ ৪৮৪

বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার স্বরূপ : গান্ধিজীর দর্শন
ভাবনার একটি পর্যালোচনা
মিতালী সরকার ৪৯৫

বাঙালি জাগরণের এক বিস্মৃত অধ্যায় :
ব্রজেন্দ্র কুমার দে'র 'বর্গী এলো দেশে'
মৃণাল কান্তি রায় ৫০৩

বাংলাদেশের ম্রো নৃগোষ্ঠীর জুমভাষা : একটি বাস্তুভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা
মুহাম্মদ তসলিম উদদীন ৫১০

প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িকতা : একটি রবীন্দ্র প্রবন্ধ ও উপমহাদেশের ইতিহাস
যীশু দেবনাথ ৫২৩

নোনা দ্বীপের জীবনচর্যা : ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব
শিমুল চন্দ্র সরকার ৫৩০

নগর মুর্শিদাবাদ থেকে জেলা মুর্শিদাবাদ-এর উত্তরণ, ১৭০৪ – ১৭৮৬
প্রদ্যুৎ মন্ডল ৫৪২

আত্মকথার অন্তরালে 'অন্তরঙ্গতা' : প্রসঙ্গ 'অঘোর প্রকাশ'
লাভলী হাজরা ৫৫৪

গিরিশ কারনাড'এর নাটকে ভারতীয় রাজনীতির পরিক্রমা
অমিতাভ কাঞ্জিলাল ৫৬২

প্রান্তিকতার মরুভূমিতে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতার চর্চার
তাত্ত্বিক অনুসন্ধান
বুবাই বাগ ৫৬৯

আকবর-পর্তুগিজ সম্পর্ক : একটি রাষ্ট্রনীতিক-বাণিজ্যিক পর্যালোচনা
সুমন মুখার্জী ৫৮০

মালদা জেলার নাট্যচর্চায় নেপথ্য শিল্পী
ইন্তাজুল হক ৫৯১

গঙ্গা নদীর জলবন্টন সমস্যা ও ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক
সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত
মেঘমিত্রা বিশ্বাস ৫৯৬

হামিরউদ্দিন মিদ্যার ছোটোগল্প : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
সৈকত মিস্ত্রী ৬০৭

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'বদনাম'
রিমি বাছাড় ৬১৫

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা
চৈতালী ঘটক (রায়) ৬১৮

বুদ্ধদেব গুহ'র নির্বাচিত 'প্রিয় গল্প' : রূঢ় বাস্তবের মানবিক আখ্যান
সুদেব বিশ্বাস ৬২৪
স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর নির্বাচিত উপন্যাসে একাকী পুরুষ
বিউটি রক্ষিত ৬৩২
নীলদর্পণ নাটক প্রতিবাদী ভাবনার উৎসমুখ
মহঃ অয়াশিক উল্লা ৬৩৯
মানভূমে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ও সত্য কিঙ্কর দত্ত -
একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
অলকা মাহাতো ৬৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে শঠ ও
প্রবঞ্চক চরিত্র : একটি সমীক্ষা
পূর্ণিমা সাহা ৬৫৭
নারীর কলমে বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্য : নৃবিজ্ঞানের খোঁজে
অনামিকা মুখার্জী ৬৬৫
গান্ধির দৃষ্টিতে নারী - একটি সাম্প্রতিক মূল্যায়ন
অজয় কুমার দাস ৬৭৩
আফসার আমেদের 'খোঁজ' সিরিজ :
নিখোঁজ মানুষের আখ্যান
মামনি মণ্ডল ৬৮৭
মেদিনীপুরে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ : একটি অধ্যয়ন
পুষ্পেন্দু রাউৎ ৬৯৪
প্রাচীন বাংলার খাদ্য তালিকায় কৃষিজাত দ্রব্য ও ফল ব্যবহারের প্রতিচ্ছায়া
আমিনুল ইসলাম ৭০২
ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ
অমৃতা চক্রবর্তী ৭০৮
GLOBALISATION, OLYMPISM, SPORT AND MULTICULTURALISM
Mamata Malik ৭১৬
The Newness of the New Social Movement
Upasana Roy Barman ৭২৯
An Analysis of Relationship Between the Mughal
Dynasty and the Malla Kingdom of Bishnupur
Amrita Karmakar ৭৩৮

Anxious Academics : How Democracies and
Governments are Re-defining and Re-describing
Foundational Concepts and Historical Events?
Mrittika Nandy ১৪৫
Flow of Blood : Analyzing the Ritual of
Sacrifice from the Shakti Peethas of Rarh Bengal
Arijit Banerjee ১৫৪
Poverty, Sexuality and Criminality : The
Nautch Women and The Informal Economy
Somen Dutta ১৬২
Role of Youth in India's National Integration
Jayanta Pandey ১৭০
IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON
TEACHING AND LEARNING
Sougata Goswami ১৭৬
Importance of Storytelling in Child Development
Ratul Nandi ১৮০
Preventive Detention and Detention Camp :
A Study of Buxa Fort Since 1865 to 1951
Madhusudan Paul ১৮৯

সম্পাদকীয়

যে শব্দবন্ধ আপনার কাছে হাতিয়ার, যে ভাবনা আপনার কাছে অস্ত্র। যাকে প্রতিমুহূর্তে শান দেন, অন্যকে আঘাত করার জন্য নয়। শুধুমাত্র যুক্তির কষাঘাতে জর্জরিত করতে চান। অন্যের ভাবনাকে একটু দোদুল্যমান করার চেষ্টা মাত্র। তাতে আলোকদ্যুতি কতটা ছড়াবে তার বিচার নাইবা করলেন। মুগ্ধতার নেশায় মত্ত না হয়ে, বরং যুক্তিটা নিখাঁদ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ থাক। সমালোচনার সুবাস এভাবেই সুবাসিত হোক। এবারের ‘এবং প্রান্তিক’এ সেই স্নিগ্ধতার পরশ।

রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ ভাবনা

রাজেশ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ (অটোনোমাস), নরেন্দ্রপুর

সারসংক্ষেপ : সমাজ ভাবনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। আবার প্রতিটি মতামতেরই চুলচেরা বিশ্লেষণও হয়। স্বামীজি একটি সঠিক সমাজ চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্বামীজীর এই ভাবনা দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তবে স্বামীজীর ভাবনার সঙ্গে যুগের প্রয়োজনে নতুন কিছু ভাবনার সংযোজন ঘটিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ ভাবনা মূলত স্বামীজীর সমাজ ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও এতে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ ভাবনায় কি আধ্যাত্মিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কই বা কি? পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ? শিক্ষা এবং নারীর গুরুত্ব সমাজ গঠনে কি ভূমিকা পালন করে? এই প্রবন্ধ এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সমাজে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, জাতির, দাবির, লিঙ্গের, আর্থিকসঙ্গতির মানুষ বসবাস করেন। সচেতনতাই সামাজিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। যদিও ‘সচেতনতা’ ও ‘কল্যাণে’র ধারণা আপেক্ষিক। আমাদের দেশে সচেতনতা ও কল্যাণের কাম্য মানে পৌঁছানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত স্তরে অনেকেই কাজ করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনও সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই সচেতন। রামকৃষ্ণ মিশনের সচেতনতা রামকৃষ্ণ মিশন সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে রামকৃষ্ণ মিশন কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের মাধ্যমে সমাজ গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মূল শব্দ : সমাজ, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, নারী, কল্যাণ।

মূল আলোচনা

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তার প্রাসঙ্গিকতা ধারাবাহিকভাবে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তাকে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে। বিশেষত সমাজ গঠনে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবনা তাকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করেছে।প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছে। সঠিক সমাজ গড়ার সাধনায় এই প্রতিষ্ঠান মানুষকেই সবচেয়ে

বেশি প্রাসঙ্গিক মনে করে থাকে। তার প্রতিটি কাজের কেন্দ্রেই থাকে মানুষ, সমাজ, পৃথিবী। সকল স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা দূর করে প্রকৃত মানুষই সঠিক সমাজ গঠন করতে পারে। তাই মানুষের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক কল্যাণ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম লক্ষ্য। ভারতীয় সমাজ কাঠামোয় বহু স্তর পরিলক্ষিত হয়। এই সমাজে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, জাতির, দাবির, লিঙ্গের, আর্থিকসঙ্গতির মানুষ বসবাস করেন। সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব আছে। সামাজিক দায়িত্ব অনেকেই পালন করে থাকেন। আবার বহু মানুষ ততটা সমাজ সচেতন নন, যতটা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সচেতনতাই সামাজিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। যদিও 'সচেতনতা' ও 'কল্যাণে'র ধারণা আপেক্ষিক। আমাদের দেশে সচেতনতা ও কল্যাণের কাম্য মানে পৌঁছানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত স্তরে অনেকেই কাজ করে চলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনও সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই সচেতন। রামকৃষ্ণ মিশনের সচেতনতা রামকৃষ্ণ মিশন সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে রামকৃষ্ণ মিশন কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতা ও আত্মগঠন

ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্যশীলতা,[১] অর্থাৎ যথার্থ ধার্মিককে সর্বদাই কাজ করে যেতে হবে। এই কাজ সমাজের জন্য ও নিজের জন্য উভয় প্রয়োজনেই করে যেতে হবে। যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়, সেই প্রকৃত 'ধার্মিক'।[২] সৃষ্টিলগ্ন থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন মানুষকে কর্মপরায়ণ হতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রচার করে এসেছে যে, 'নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়'।[৩] আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য কেবলমাত্র জপ, তপ, ধ্যান করলেই হবে না, সেই সঙ্গে পার্থিব কর্ম সম্পাদনও করতে হবে। তবে জপ, ধ্যানকে রামকৃষ্ণ মিশন কখনই অস্বীকার করে না। 'এদেশের প্রাণ ধর্ম ,ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম'।[৪] রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা পরিষ্কার, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্থকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে। অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে তা হবে।[৫] প্রকৃত ধর্ম এবং প্রকৃত ধার্মিক সমাজ ও রাষ্ট্রকে গ্লানি মুক্ত করতে পারে, রামকৃষ্ণ মিশন একথা মুক্ত কন্ঠে ঘোষণা করে। বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্ত করে তোলার চেষ্টায় সে অনড়। আর এ কারণেই রামকৃষ্ণ মিশন পাঠচক্রের আয়োজন করে থাকে নিয়মিত। এই পাঠচক্রে আর্থিক ও লৌকিক কল্যাণের কথা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সমাজের সব স্তরের মানুষ এই সব পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এভাবেই জাতির আত্মগঠন হওয়া সম্ভব। রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্ম সাধনা কখনই আত্মকেন্দ্রিক নয়, স্বামীজীর আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল বিষয় ছিল মানুষ ও সমাজ।[৬] তেমনি রামকৃষ্ণ মিশন তার ভাবধারাতে কাজ করে থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাসী করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য।[৭]

নৈতিকতা ও নতুন ভারত

জনজাগরণ তখনই সম্ভব যখন তারা বিদ্যা লাভ করবে। বিদ্যা লাভই তাদের প্রকৃত জ্ঞানী ও একত্রিত করতে পারে। একত্রিত বিদ্যাবানরা ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে - রামকৃষ্ণ মিশন এ কথা বিশ্বাস করে। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ কিছু শাখাতে স্কুল কলেজ তৈরি হয়েছে। সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কথা বলা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান মূলত তৈরি হয়েছিল উদ্বাস্তু গরিব ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য। কালক্রমে এই আশ্রম শিক্ষার ক্ষেত্রে মহীরুহে পরিণত হয়। সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের প্রথম সারিতে অবস্থান করে। এখানকার প্রাক্তন ছাত্ররা দেশের বিভিন্ন শুভ কাজে নিয়োজিত। এই প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররা বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকেন। প্রত্যেকের মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ব আছে রামকৃষ্ণ মিশন তাকেই জাগ্রত করতে চায়। জাগ্রত বিবেকই ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।সমাজের উন্নতির জন্য প্রকৃত সংস্কৃতি প্রয়োজন। প্রকৃত সংস্কৃতিই মানুষের চরিত্র গঠন করতে পারে। অর্থাৎ চরিত্র গঠনই জাতীয় প্রকল্প হওয়া উচিৎ - রামকৃষ্ণ মিশন এ কথা বিশ্বাস করে এসেছে এবং তাই জ্ঞানদীপ্ত মানুষ তৈরি ও যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে।[৮] সমাজ গঠনের অনুপ্রেরণার শক্তি নিজেরাই যাতে লাভ করতে পারে রামকৃষ্ণ মিশন মানুষকে সেভাবেই উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতি যেমন মানুষকে স্ব-সচেতন করে থাকে, তেমনি সমাজ সচেতনও করতে পারে। আধ্যাত্মিক উন্নতি পারে নৈতিকতাকে দৈনন্দিনতার মাঝে আনতে - মিশন একথা প্রচার করে ও বিশ্বাস করে। স্বামীজি বলেছেন 'Civilization is the manifestation of divinity in man'[৯] সঠিক সামাজিক উপলব্ধি, শান্তি, ভালোবাসার জন্য নিঃস্বার্থ সেবা প্রয়োজন, প্রয়োজন সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা। একারণেই রামকৃষ্ণ মিশন সম্পূর্ণ সমাজ সচেতন মানুষ গঠন এ ব্রতী হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করায় আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তা -ই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। আমরা যদি ভারতের পুনর্গঠন করতে চাই, তবে অবশ্যই জনগণের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।[১০] রামকৃষ্ণ মিশন ভারত গঠনের জন্য, সমাজ গঠনের জন্য, জনগণের জন্যই কাজ করে চলেছে। আর এই জনসাধারণের একটি বড় অংশ হলো নারী, স্বামীজীর মতো রামকৃষ্ণ মিশনও চায় যে নারীরা যথার্থ শিক্ষা লাভ করুক। শিক্ষিত নারীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে।

শিক্ষা ও মূল্যবোধ

মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশই হলো শিক্ষা।[১১] একটি দেশের উন্নতি সেদেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও বুদ্ধির অনুপাতেই হয়।[১২] পেশার প্রয়োজনে প্রথাগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।[১৩] প্রকৃত শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিকাশ প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে জনসাধারণকে। তাই তরুণ সমাজকে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাও এই প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে।

তরুণদের মাধ্যমেই ভারত গঠন সম্ভব স্বামীজি বলেছেন "হে ভারত, ভুলিও না - তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী; ভুলিও না - তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না - নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন করো; সদর্পে বলো - মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো - ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বলো ভাই - ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যান আমার কল্যাণ; আর বলো দিনরাত, হে গৌরিনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।"[১৪] রামকৃষ্ণ মিশন সমাজকে আলোকিত করতে চায়। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে চায়, দরিদ্রকে আলোকিত করতে চায়, ধনীকে আলোকিত করতে চায়, অশিক্ষিত মূর্খকে আলোকিত করতে চায়। শিক্ষিতকেও আলোকিত করতে চায়, কারণ শিক্ষার অভিমান বড়ই প্রবল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি শাখা সকলের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিতে চায়। নিঃস্বার্থভাবেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই কিংবা রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সমস্ত মানুষ নিরলসভাবে এই কাজটি করে আসছে।

রামকৃষ্ণ মিশন আসলে সমাজকে বিশ্বাস করে। স্বামীজি বলেছেন বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস - নিজের উপর বিশ্বাস - ঈশ্বরে বিশ্বাস - উন্নতি- লাভের একমাত্র উপায়।[১৫] পৃথিবীর ইতিহাস আসলে কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। যখনই কোনো ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায় তখনই তার বিনাশ হয়।[১৬] রামকৃষ্ণ মিশন সমাজের বিনাশ চায় না, সমাজের কল্যাণ চায়। তাই প্রত্যেককেই আত্মবিশ্বাসী হতে অনুপ্রাণিত করে। স্বামীজি মনে করেন যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক, [১৭] নতুন ধর্ম মনে করে যে নিজেকে বিশ্বাস করে সেই আস্তিক। রামকৃষ্ণ মিশনও সে কথাই প্রচার করে। দুর্বলতাই পাপ তাই এই প্রতিষ্ঠান সকলকেই সবল হতে বলে। দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ এবং উদ্বেগের কারণ, [১৮] শক্তিই জীবন। এই শক্তি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করার সদাই প্রচেষ্টা করে এই প্রতিষ্ঠান। আর এই শক্তি রামকৃষ্ণ মিশন মনে করে মানুষের ভেতরেই আছে। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ সমাজের

সর্বাধিক কল্যাণ করতে পারে।[১৯] তাই আত্মবিশ্বাস আরো বিস্তারিতভাবে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই প্রতিষ্ঠান বদ্ধপরিকর।

পর্যবেক্ষণ

সূচনা লগ্নে রামকৃষ্ণ মিশন শুরু করেছিল আর্ত ও পীড়িতদের সেবা কার্য। কালক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন পঠন পাঠন এর বিষয়েও যথেষ্ট গৌরবের সঙ্গেই কাজ শুরু করেছে। গোটা ভারত এমনকি বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আজ বহু শাখা, ভারতের বাইরেও রামকৃষ্ণ মিশন ভাব প্রচারের পাশাপাশি সেবা কার্য করে থাকে। অন্যদিকে দেশের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গ্রামের মানুষের সঙ্গেও কাজ করে। সমাজ গঠনের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন বদ্ধপরিকর। সেবা কার্য স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে, অখন্ডানন্দের নেতৃত্বে সারগাছিতে প্রথম শুরু হয়েছিল। সেখান থেকেই হয়তো সমাজ গঠনের কাজও রামকৃষ্ণ মিশন শুরু করেছিল। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের আজ অন্যতম বৈশিষ্ট্য দরিদ্র, আদিবাসী, হরিজন সকলকেই শিক্ষিত করা। তাদের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেই রামকৃষ্ণ মিশন তাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর দীর্ঘদিন যাবৎ রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে। কিন্তু বর্তমানের নিরিখে হয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের সবচেয়ে বড় কাজ সমাজ কল্যাণ। সমাজ গঠনে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবনা সত্যি যুগোপযোগী। ভারতের একটা নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং জীবনাদর্শ আছে। বিশ্বসভ্যতায় ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এদেশের অনেকেই অবহেলিত, বঞ্চিত, দুর্বল ও উৎপীড়িত। ধর্মের নামে অনেকেই শোষিত হন, শিক্ষার সুযোগও সকলের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। অনেকেই আবার অপর জাতির সঙ্গে কলহ করে। সেই সঙ্গে নারীদের অবহেলাও অনেকে করে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিশ্বাস করে সমস্ত শক্তি নিহিত আছে সমাজের সাধারণ জনগণের মধ্যে, তাই জনসাধারণের উন্নতির জন্য রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস কাজ করে চলেছে। নারী জাগরণেও তার ভূমিকা প্রশংসনীয়। রামকৃষ্ণ মিশন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে নতুন ভারত গড়ে উঠবে ভারতীয় ধারাতে। দেশ গড়ার প্রশ্নে রামকৃষ্ণ মিশন একদল মহান দেশপ্রেমিক গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ত্যাগ, সেবা, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করবে বলে এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খন্ড ৬ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭১) পৃঃ ১২১

২. তদেব পৃঃ ১২১

৩. তদেব পৃঃ ৫৮

৪. তদেব পৃঃ ১৬১
৫. তদেব পৃঃ ১৬১
৬. অমলেন্দু দে ও অন্যান্যঃ স্বামী বিবেকানন্দ মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪) পৃঃ ৬০
৭. তদেব পৃঃ ৬১
৮. Parents and Teachers in Value Education, (Ramkrishna Mission Belur Math, Howrah, 2013) pp 31 - 33
৯. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 5 (Advaita Ashrama,2007) p 308
১০. তদেব, pp 222 - 223
১১. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, খন্ড ৬ পৃঃ ৩১৪
১২. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 4 (Advaita Ashrama, 2007) p 482
১৩. রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে মূল্যবোধের পঠনপাঠন আবশ্যিক ।
১৪. স্বামী বিবেকানন্দঃ আমার ভারত অমর ভারত (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক, কলকাতা, ২০১৯) পৃঃ ৮-৯
১৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা খন্ড ৫(উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭১) পৃঃ ৬০
১৬. তদেব, খন্ড ২ পৃঃ ১৭৫-১৭৬
১৭. তদেব, খন্ড ৫ পৃঃ ২০
১৮. তদেব, খন্ড ১ পৃঃ ১১৯
১৯. স্বামী বিবেকানন্দঃ আমার ভারত অমর ভারত (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক, কলকাতা, ২০১৯) পৃঃ ৯৯-১০১

শম্ভু মিত্রের নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ 'অভিনয় কী?' : একটি মূল্যায়ন

লিপিকা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ

শম্ভু মিত্রকে আমরা চিনি বিশিষ্ট নাট্যকার, প্রযোজক, অভিনেতা হিসেবে। নাট্য শিক্ষক তিনি, তিনি আবার আজীবন নাট্য-শিক্ষার্থী। একজন নাট্যপ্রেমী, একজন থিয়েটারপ্রেমী মানুষ হিসেবে তিনি পরিচিত। এসবের বাইরেও তাঁর আলাদা একটা পরিচয় রয়েছে, যেটা হয়তো আমরা সকলেই জানিনা, অথবা কম-বেশি সকলেই জানি। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। প্রায় এক শ'র কাছাকাছি প্রবন্ধের প্রণেতা তিনি। সারা জীবন নাটকের সঙ্গে যুক্ত থেকে যখন যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, বোধের গভীরতায় ডুব দিয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত উপলব্ধির সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। প্রবন্ধ সমগ্রের প্রথম খন্ডে আলোচ্য প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে। 'অভিনয় কী?'-- প্রবন্ধটির নিবিড় পাঠে পাঠক-শ্রোতা অভিনয় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।

অভিনয় সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করতে চেয়ে তাঁর অনেক শিক্ষার্থী-শুভার্থী তাঁকে চিঠি লিখে, কখনোবা মৌখিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। অগত্যা বিষয়টি নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছে। তবে সেই ভাবনায়-বোধে তিনি অত্যন্ত সংকুচিত, তথাপি বক্তব্যে স্বতঃস্ফূর্ত। অভিনয় সম্পর্কে তিনি পরিবেশন করেছেন একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ। শম্ভু মিত্র প্রবন্ধের শুরুতেই জানিয়েছেন যে, যারা তাঁর 'শুভানুধ্যায়ী' তাদের মধ্যে অনেকেই অভিনয় শিখতে চেয়ে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁকে আরও অনুরোধ করা হয়েছে, অভিনয় সম্পর্কে তিনি যেন বিস্তারিত একটি আলোচনা করেন। প্রাবন্ধিক নিজে অভিনয় সম্পর্কে কিছু জানেন, এটা শুনতে এবং বলতে তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করেন। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে তিনি যেমন অপছন্দ করেন, আবার অতিরিক্ত তারিফ তিনি যে খুব পছন্দ করেন, তেমনটিও নয়। তাঁকে যে অভিনয় শেখাতে হবে, এ বিষয়ে বিনয়ের সঙ্গে প্রথমেই তিনি নিজের দীনতা প্রকাশ করে নিজের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। আসলে অভিনয় বিষয়টাকে তিনি বেশ কঠিন বলেই মনে করেন। তাই এরকম একটা কঠিন বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে তিনি যথেষ্ট সংকোচ বোধ করেছেন। এ ব্যাপারে কয়েকটি যুক্তিও তিনি নিজের সম্পর্কে খাড়া করেছেন— প্রথমত, তিনি যে লেখক নন, অসংকোচে সেকথা ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, অভিনয় সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান নেই বলেই তিনি মনে করেন। তৃতীয়ত, তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে বললে ঠিক সকলকে বোঝানো যাবে, সে বিষয়টিও তিনি জানেন না। নিজের

এইসকল অজ্ঞতা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে তিনি আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন।

অভিনয় এবং 'ভালো অভিনয় কী'? মানুষকে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য এই প্রশ্ন দিয়ে তিনি আলোচনা শুরু করেছেন। ভালো অভিনয় সম্পর্কে সাধারণের ধারণা স্বচ্ছ নয় বলেই অল্প বয়সের সুন্দর নায়ক-নায়িকার উপস্থিতিতে তারা হৈ হৈ করে এবং অভিনেতা যুবক-যুবতীদের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সাধারণ মানুষ মুখর হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য এই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সভা-সম্মেলনে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিজ্ঞাপিত হন। কেউ অভিনয় শুরু করেই শ্রেষ্ঠ হয়ে যেতে পারেন না, এমনটিই মনে করেন তিনি। অভিনয় শেখার জন্য সময় লাগে। ভালো অভিনয় করার জন্য অভ্যাসের দরকার হয়, বহুদিনের অভিজ্ঞতা-স্নাত হতে হয়। অভিনয় দীর্ঘ অনুশীলন-অধ্যাবসায় ও সাধনার মধেও দিয়ে রপ্ত করতে হয়। বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি, চরিত্রের গভীরতা--এই এসেন্সগুলো জরুরি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন হওয়া উচিত অভিনয়-দক্ষতা অনুযায়ী। কিন্তু সেখানে যে প্রহসন (বোম্বে) তিনি সংঘঠিত হতে দেখেছেন, তার প্রতি কটাক্ষ করে লেখক বলেছেন— "আমাদের বাংলাদেশেও এর ঢেউ লেগেছে। সেদিন চলে গেছে যখন লোকে বলত যে আজ বাংলা যা ভাবছে কাল সারা ভারতবর্ষ তাই ভাববে। এখন আমরা বোম্বের পাছ-দোহারি করি। এবং বোম্বে পাছ-দোহারি করে হলিউডের।"[১]

তবে লেখক বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন এই বলে যে, তাঁকে যেন কেউ ভুল না বোঝেন। 'নতুন লোক', 'যৌবন', 'সৌন্দর্য' এসব বিষয়ে তাঁর মোটেও অবজ্ঞা নেই। আসলে লেখকের দুঃখের কারণ এজন্য যে,সাধারণ মানুষ গুণের কদর না করে ব্যবসাদারদের কথা শোনে বলে নিজের বোধ হারিয়ে ফেলে। তবে আশার কথা বোধটা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি বলেই সত্যজিৎ রায়ের মতো লোককে বাংলার বুকেই আমরা পেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালির' কথা বলেছেন। 'পথের পাঁচালী' অত্যন্ত লোকপ্রিয় একটি ছবি। সেখানে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অসাধারণ অভিনয়, সেই অভিনয় কতখানি আদর পেয়েছে, সেটাও ভাববার বিষয় এবং উল্লেখযোগ্য।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই আমরা শুনে থাকি অভিনয় স্বাভাবিক হবে, অভিনেতা নিজেকে ভুলে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাবে। শম্ভু মিত্র মনে করতেন যে, এই দুটো কথার একটিও ঠিক নয়। প্রাবন্ধিকের মতে এই কথাগুলোর মধ্যে 'গলদ' আছে, দুটো কথাই পুরোপরি সত্যি নয়। তিনি বিষয়টি চমৎকারভাবে বুঝিয়েও দিয়েছেন। জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটে তার মধ্যে থেকে বাছাই করে কিছু কিছু গ্রহণ করতে হয়। বাছাই করা ঘটনাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছন্দে মিলিয়ে দিতে পারলে তবে সেটা হবে শিল্প। শিল্প নিজের নিয়মে সৃষ্টি হয়। সেখানে বাস্তবের মৃত্যু, মৃত্যু যন্ত্রণাজনিত বাস্তবের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া, না ঘুমানোর ক্লান্তি, মাথা ধরা, পেট খারাপ,

কোনোপ্রকার অস্বাস্থ্য ব্যাপার শিল্পের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। বরং শিল্পকে দেখাতে হয় "ব্যক্তির ক্ষুব্ধ আত্মাকে, তার রাত জেগে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকাকে,... তার অর্ধব্যক্ত আর্ত হাহাকারকে..."[২] দীর্ঘ সময়ের ঘটনার সারবস্তু তুলে ধরা শিল্পীর কাজ। সেখানে স্বাভাবিক জীবনের দুর্বলতা থাকলে চলে না।

অনেকে অবশ্য বলে থাকেন, অভিনয় হবে জীবনের মতো তরল ও স্বাভাবিক। শতকরা নিরানব্বইজন লোক জানে এমন ঘটনাই সেখানে দেখানো হবে। যা সাধারণভাবে ঘটে না তেমন ঘটনা শিল্পের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি অবশ্য 'ওথেলো' র কথা বলেছেন। কেননা ওথেলো কোনোকিছুই স্বাভাবিক বা সন্তোষজনক ছিল না। তবু 'ওথেলো' শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদায় আসীন। আসলে শিল্প কোন বলহীন দূর্বল ন্যাকার প্রাত্যহিক শিথিল জীবনযাপন নয়। প্রতিদিনের কোলাহলমুখর ধাবমান জীবনের গতিপ্রবাহ দিয়ে তাকে ধরতে হয়। মহাবিশ্বেরশক্তির সঙ্গে জীবনের নিবিড়-গাঢ় প্রবল সম্পর্ক রয়েছে। তার ভিতর থেকে উৎসারিত যে শক্তিপ্রবাহ অমৃতবারিধারা বর্ষণ করে চলেছে তাইই শিল্প। আর কোন বলহীনের পক্ষে সেই অমৃত পান করা সহজ নয়। প্রাবন্ধিক বলেছেন—"শিল্প স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক মনের চাহিদা মেটানোর বস্তু।"[৩]

স্বাভাবিক জগৎকে স্বীকার করে নিয়ে শিল্প-সৃষ্টি হয়, কিন্তু শিল্প জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জীবন ও জগৎকে গভীরভাবে না জেনে শিল্পসৃষ্টি করা যায় না। জগৎ-জীবনকে যত গভীরভাবে জানা যাবে, ততই খুলে যাবে মহৎ শিল্পের সিংহদ্বার। জীবনের গভীর-গাঢ় অভিজ্ঞতা না থাকলে 'প্রফুল্ল' নাটকের ভজহরি, 'চরিত্রহীন' এর দিবাকরকে অনুধাবন করা যাবে না। নকল কতগুলো ন্যাকা ন্যাকা ভাবের আশ্রয় নিয়ে শিল্পী হওয়া যায় না, সত্যকারের শিল্পী হতে হলে দরাজ মনে অভিজ্ঞতার পাহাড় গড়তে হয়। সেখান থেকে কৌশলে প্রকাশ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক যে কথাগুলো প্রায়ই শুনে থাকেন সেগুলি এইরকম, অভিনেতা-অভিনেত্রীর নিজের কোন ব্যক্তিত্ব থাকবে না, নিজেকে ভুলে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে। এই বিষয়টিকেই লেখকের 'গোলমেলে' মনে হয়েছে। কারণ অভিনেতার নিজের চেহারা, গলার আওয়াজ, মুখ, চোখ এগুলো অভিনেতার নিজস্ব, এগুলোকে অভিনেতা বিলুপ্ত করতে পারেন না, এসব মেনে নিয়েই অভিনয়কে ভালো করতে হবে। বরং অভিনেতার 'আবেগের অভিনবত্ব', 'ভঙ্গিমার অভিনবত্ব' ইত্যাদির প্রকাশ ভালো অভিনয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিনেতার মধ্যে এই গুণগুলো থাকলে অভিনয় ভালো হতে থাকবে। 'শিল্পের কাজ আত্মগোপন করা নয়, আত্মপ্রকাশ করা'। এখানে শম্ভু মিত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি 'স্‌েভংগালি' নামে একটি ছবি দেখেছিলেন অনেকদিন আগে। জন ব্যারিমুর সেখানে দাড়িগোঁফ পরে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। কিন্তু ব্যারিমুর তাঁর ভাই লাওনেল এর আওয়াজ, ভাবভঙ্গি সবকিছু নকল করছিলেন। দুজনেই ভাই ছিলেন বলে তাঁর

পক্ষে এভাবে নকল করাটা সহজ ছিল। এই অভিনয় দেখতে দেখতে লেখকের বার বার মনে হয়েছিল, ব্যারিমুর স্পেশাল কিছু দেখাতে সক্ষম না হলে লাওনেলকে দিয়েই চরিত্রটি অভিনয় করানো যেত। প্রকৃত লাওনেল হয়তো নকল লাওনেলের চেয়ে বেশি ভালো করতে পারতো। কারণ লাওনেল নিজের 'আত্মা' থেকে কাজটি করতো। 'অভিনয়' ব্যাপারটা বোঝা এবং বোঝানো একটা জটিল কাজ।

একই অভিনেতা একটা চরিত্রে একইরকম হাবভাব করে, একইরকম হাত-পা-ঘাড়-মাথা নেড়ে গোটা জীবন অভিনয় চালিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনা। শম্ভু মিত্রের কথানুসারে "জীবনের এই তো মুশকিল। কোনো একপেশে অর্থ করলেই কেলেঙ্কারি। এর সর্বত্র হচ্ছে বিপরীত অর্থের সমন্বয়। স্বাভাবিক হওয়ার বেলাতেও তাই। স্বাভাবিক নয়, অথচ স্বাভাবিক। আত্মপ্রদর্শন নয়, অথচ আত্ম প্রকাশ। এবং এই আত্মপ্রকাশে বৈচিত্র্য থাকা চাই।---বারে বারে নতুন নতুন নাটকে, নতুন নতুন চরিত্রে।"[৪] অল্প বয়সে প্রাবন্ধিক যখন 'রমা' নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন, তখন থেকেই তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন, 'অভিনয় আসলে কী?' এই নাটকে যিনি রমেশের অভিনয় করেছিলেন, তাকে দেখতে ভালো হলেও গলার আওয়াজটা মোটেই ভালো ছিল না, তার ব্যক্তিত্ব বলে কিছু ছিল না। অভিনয়ের সময় কথাগুলো কোনোরকমে আউড়ে গেলেন এবং বলাবাহুল্য সেই অভিনেতা দর্শকদের কাছে, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে বেশ সুখ্যাতি পেলেন। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্পর্কে তখনও লেখকের তেমন ধারনা জন্মায়নি। তবে এই অভিনেতার অভিনয় তাঁর একেবারে পছন্দ হয়নি, কেননা অভিনেতা নিজের সুন্দর চেহারা নিয়ে মুখস্ত বুলি আউড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার করলো। এখানে গল্প এবং গল্পকার মুখ্য। যে শর্ত সাপেক্ষে একজন অভিনেতা শিল্পী হয়ে ওঠেন, তাঁর দৃষ্ট রমেশ চরিত্রে তা ছিল না, তাই উক্ত অভিনেতা সেখানে শিল্পী নন, অন্তত প্রাবন্ধিকের মতে। পাশাপাশি তিনি 'কর্ণার্জুন' নাটক এর শকুনি-রডায়ালগ তুলে ধরেছেন, "তুমি দেখতে পাচ্ছ না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ওই আগুনের শিখা লকলক করে আকাশ ছেয়ে ফেললে, ওই আর্তনাদ, ওই হাহাকার ----- হাঃ হাঃ হাঃ!"[৫] এই অভিনয় করার জন্য গলা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। উচ্চারণের ভঙ্গি, গোটা গোটা উচ্চারণ, ছন্দের লালিত্য, পৈশাচিক উল্লাসে হাসতে শেখা ইত্যাদি কৌশল জানতে হয়। তাই এসব নাটক অভিনয়ের পক্ষে ভালো বলে তিনি মনে করেন। তবে শরৎচন্দ্রের নাটকে শিশিরকুমার এইসব চরিত্রগুলিতে সেই চমক এনেছিলেন। এটাও সত্য যে, শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলো ভীষণ সহজ-সরল ছবির মতো। শুধু চোখে দেখে পড়ে ফেলতে পারলেই সেইসকল চরিত্ররা জীবন্ত স্পষ্ট হতে থাকে। আলাদা করে অভিনয় দেখার দরকার হয় না, চরিত্রগুলো এমনিতেই বোঝা যায়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পধ ধরে তিনি জেনেছিলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে অভিনয়কে জীবন্ত করে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন এই অভিনয়কে জীবন্ত করে তোলার ফর্মুলা কী? প্রাবন্ধিক যত্নসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিছু মাল-মশলা, যা বাজার থেকে কিনতে হয় না। শুধু "ভাবতে হবে,

পড়তে হবে, লেখক যা বলেছেন ঠিক সেই অনুযায়ী করে যেতে হবে, তবে হবে।"[৬] এ বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বার বার উল্লেখ করেছেন। এই সময় তিনি দুইজন ইংরেজ অভিনেত্রী যাঁরা লেডি ম্যাকবেথ এর অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের অভিনয়ের বিবরণ পড়েন। দুই অভিনেত্রী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে একই চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে দুটি আলাদা চরিত্র হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তাঁরা যে আলাদা আলাদা যুক্তি দেখিয়েছেন তা যথার্থ এবং তীক্ষ্ণ। পরবর্তী সময়ে অবশ্য প্রাবন্ধিক নিজে রিয়ালাইজ করেছেন, এখানে "নাট্যকারের রায়ও চরম নয়। সৃষ্টি যতই মহৎ হয়, যতই জীবন্ত হয়, ততোই উপর থেকে তাকে দেখতে খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু এই আপাতসহজতার অন্তরে এত জটিলতা থাকে যা আমাদের জীবনের মতোই ভিন্ন ভিন্ন চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। সেখানে নাট্‌যকারের মনের চেয়েও তার সৃষ্টি বড়ো।"[৭]

উপরোক্ত অভিজ্ঞতার বোধ যখন বাড়তে লাগল তখন তিনি বলতে পেরেছিলেন, "বিভিন্ন লোকের হাতে একই নাটক সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে অভিনীত হতে পারে।"[৮] আসলে 'আবেগ' নামক বিশিষ্টতা দিয়ে মানুষের যে মানসিক গঠন, সেই বিশিষ্টতা 'শিল্পী' নামের উপযুক্ত বিশেষণ। এটা ইনঞ্জেকশন পুষ করে বা ক্‌যাপসুল খাইয়ে ভিতরে দেওয়া যায় না, এটা মানুষের সহজাত, শুধুমাত্র চেষ্টার বিষয় এটা নয়। অনেকে আছেন, অতিরিক্ত ভাব-ভঙ্গি-মুদ্রাদোষ সহযোগে নিজেকে স্পেশাল করে তুলতে চান। যাতে করে বাজারে চলে ভালো। এরকম বিজ্ঞাপনীয় পদ্ধতি চলচ্চিত্র, পত্র-পত্রিকার দৌলতে বহু দেখা যায়। এরকম 'ভিখিরিপনা' শম্ভু মিত্র একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে "শিল্পীর কাজ নয় নিজেকে মোহন সাজে সাজিয়ে লোককে ধোঁকা দেওয়া নয়, তার কাজ নিজের আবেগকে প্রকাশ করা, নিজের গভীর অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া।"[৯] নিজে যদি অনুভব করা যায়, অভিনীত চরিত্রটি তার ভিতরে রয়েছে, তবেই চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চরিত্রটিকে জীবনদান করতে সম্ভব হবে। আর সেটা করতে 'গায়ের জোর' লাগে না, 'মোহনসাজ'-সজ্জার দরকার হয় না। তাই শিল্পীর কাজ হবে 'নিজের মনকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা', নিজের গভীরতাকে ছুঁয়ে দেখা, তাকে অনুভব করা এবং নিরন্তর অনুসন্ধান করা। ফলে নিজের ভেতরটা স্বচ্ছ হয়।

অনেক ধরনের নীচতা আমাদের মধ্যে থাকলেও নিজের সৎ চেষ্টা দিয়ে সেই দোষকে নির্জীব করে রাখার ক্ষমতা জন্ম দেওয়া যায়। স্বয়ং তিনি নিজে এই বোধের অধিকারী হয়েছিলেন। এই বোধ যখন আসে তখন অভিনেয় চরিত্র সম্বন্ধে নিজের সমান্তরালে একটা সহ-অনুভূতি উপলব্ধ হয়। আর তখনই হয় সার্থক অভিনয়। এককথায় বলতে গেলে শম্ভু মিত্র বিশ্বাস করেন, ভালো অভিনয়ের জন্য সবরকম সংকীর্ণতা দূর করে অভিনেতার চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন, প্রয়োজন আত্মদর্শন। শম্ভু মিত্র নিজে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন ছিলেন, প্রত্যেক অভিনেতা

সেই গুণের অধিকারী হবেন, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। একজন ভালো অভিনেতাকে সততা শিখে নিতে হয় বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। অভিনেতার নিজের কাছে সৎ হওয়া, আত্মচেতনা প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখার অভ্্যাসরাখা জরুরী। সেই সৎ-শিল্পীমন অভিনেয় বিষয় আত্মসাৎ করবে। নিজের মনকে ফেলে রেখে অভিনীত ভূমিকাটি শুষে নিতে হবে। অভিনয় ভালো করতে হলে নিজের সত্তার মধ্যে তা অনুভব করতেই হবে। 'ধর তক্তা মার পেরেক' করে ভালো অভিনয় হয় না। এজন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় এবং সচেতন চিত্তশুদ্ধি। হঠাৎ করে কতগুলো নিয়ম বলে দেওয়া যায় না, যাতে করে সঙ্গে সঙ্গেই ভালো অভিনয় করে ফেলা যায়। অভিনয়ের 'দর্শনশাস্ত্র' পাঠ না করেই ভালো অভিনয় জন্ম দেওয়া যায় না। কেউ তাঁর কাছে অভিনয় শেখার জন্য 'মেড ইজি' পদ্ধতি জানতে চাইলে, তাঁর সাফ উত্তর অভিনয় অত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং বলা যায়, শিল্পীর নিজস্ব আত্মপ্রকাশের চেষ্টার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় শিল্প। কাজেই কবিরাজ যেমন বলে দিতে পারেন,"...বটিকা, প্রত্যহ মকরধ্বজসহ সেব্য, এক মাসের মধ্যেই ফললাভ?"[১০]

কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ-অভিনেতার পক্ষে ঠিক কবিরাজের মতো এভাবে বলা সম্ভব নয়। তবু কবিরাজের মতো না হলেও 'অভিনয়' সম্পর্কে তিনি একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়েছেন, যে পথে নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারলে একজন ভালো অভিনেতা হওয়া সম্ভব। রুচি, বুদ্ধি, বিবেচনা পুরোটাই কাজে লাগাতে হয়। গোঁয়ারের মতো সঞ্চালন নয়, বিচক্ষনতা আবশ্যক। এজন্য প্রথমে লক্ষ্য সামনে রেখে সেই দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পরিশ্রম আবশ্যক। যার লক্ষ্য ঠিক নেই, তাকে ধ্যান করে আপন লক্ষ্য স্থির করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাবন্ধিক।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অভিনয় শেখার জন্য প্রথমত লক্ষ্য স্থির করতে হবে। দ্বিতীয়ত স্বচ্ছবুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। তৃতীয়ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিশ্রম করে যেতে হবে। থিয়োরি এবং প্রাকটিক্যাল এর সমন্বয়ে গভীর প্রাকটিস এর প্রয়োজন। চতুর্থত গলা তৈরি করার জন্য গায়কের মতো সাধনার দরকার। কথা বলার ধরন স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। মোটকথা গলার আওয়াজ স্পষ্ট করতে হবে। পঞ্চমত কণ্ঠস্বরে আবেগময়তা জরুরি, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয় মোথিত। কণ্ঠের বিস্তৃতি ও কণ্ঠের বৈচিত্র্যে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। আপন অন্তর থেকে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা উঠে আসে। যার মূলে রয়েছে আবেগ। এছাড়া উচ্চারতত্ব নিয়ে তিনি ভাষাতাত্বিকের মতোই বিষয়টি বিশদ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। ভালো অভিনেতা হতে গেলে যার অনুশীলন অনস্বীকার্য। কেননা, তিনি বলেছেন, অভিনয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হলো কথা। "কথার মতো সমৃদ্ধ আর কিছুই নয়। সেই কথার যথাযথ প্রকাশ করতে পারি মানে কণ্ঠে অজস্র রঙের বৈচিত্র্য আনতে পারা। চোখের বা মুখের ভাব কেবল তাকে সাহায্য করে যায়।...সাধারণ জীবনে দেখা যায় যে হঠাৎ যদি কেউ অন্যমনস্ক হয়ে কিছু শোনে তো আমরা সকলেই বুঝতে পারি। যদি কেউ কোনো অবস্থায় সামান্য আহত হয়,

কারোর যদি আত্মাভিমানে লাগে, এসব বড়ো করে দেখতে হয় না, আমরা এমনিতেই বুঝতে পারি। ঠিক তেমনি সুক্ষ্ম প্রকাশ অভিনয়েও করা চাই।" [১১]সেখানে পার্ট শুধু মুখস্থ রাখলেই হয় না, সেটাকে 'মহলা দিয়ে দিয়ে সমস্ত হাঁটা-ওঠা-চলাফেরা'র সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চেতনার গভীরে প্রোথিত করে নিতে হবে। অভিনেয় বিষয় আত্মসাৎ করার পর অভিনয় আসবে ভেতর থেকে অর্থাৎ আত্মা থেকে। এছাড়াও আছে ভালো উচ্চারণ, উচ্চারণ স্পষ্ট করার কথা তিনি বার বার বলেছেন, হাঁটাচলা ভালো করার কথাও সেখানে বলা আছে। অভিনয়ের সময় শরীর-মন রিল্যাক্স রাখা, 'কচটতপ' ও 'খছঠথফ' প্রতিদিন উচ্চারণ প্রাকটিস করে জিভের আড়ষ্টতা দূর করার চেষ্টা অনবরত চালিয়ে যেতে হবে। প্রথম প্রথম অভিনয় শুরুর দিকে প্রত্যেকটি কথায় ঝোঁক দিতে হয়। ক্রমশ অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ঝোঁকগুলো আস্ত আস্তে কমিয়ে ফেলতে হয়। তখন 'সহজ এবং সাবলীল' ভঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করতে হয়। এইসব কথা লেখকের পক্ষে লিখে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব না, তবে তাঁর মতে ''এই লাইনটা পেরিয়ে এলেই বলা যায় যে অভিনেতা ভাবের অভিনয় করতে শুরু করেছে।'' [১২]

এই ভাবের জৌলুষ দিয়েই অভিনেতা সমাজের চোখকে নিজের দিকে টানে এবং স্থায়ী আসন লাভের প্রয়াসি হয়ে ওঠে। তখন সে 'ধাঁধানোর পরিবর্তে মমাতানোর চেষ্টা করে।' এইভাবে দর্শক হয়ে যায় বন্ধু। শিল্পী তাকে নিজের গভীর অনুভব উজার করে দিতে চায়। বৈষ্ণব কবির স্বচ্ছ ভাবের মতোই পরিণত শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী সহজ, কাব্যময় ও গভীর হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অঙ্গ সঞ্চালনও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সম্পর্কেও অভিনেতার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। 'ভালো অভিনেতা হতে গেলে ব্যক্তিত্ব অর্জন করা চাই'---একথা শম্ভু মিত্র মনে-প্রানে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব---এ প্রসঙ্গে তিনি মজা করে তাঁর দেখা দু-একটি ঘটনার কথা বলেছেন। চৌরঙ্গির ফুটপথে তিনি দেখেছেন সস্তা সিরিজের বই, যেখানে লেখা আছে, 'কী করে ব্যক্তিত্ব বাড়াতে হয়' এবং চার্লস অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপনে তিনি দেখেছেন 'ব্যায়াম করে ব্যক্তিত্ব বাড়াও, মেয়েরা টুপ টুপ করে তোমার প্রেমে পড়ে যাবে।"[১৩] এসবের প্রেক্ষিতে লেখকের স্পষ্ট বক্তব্য, বই পড়ে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করেও বহু ব্যক্তি 'ব্যক্তিত্ববিহীন ভেসে বেড়াচ্ছে'। আর যার ব্যক্তিত্ব গজানোর তার ওসব না পড়েই হচ্ছে। "আসলে, ব্যক্তিটি যদি বড়ো হয়, কর্মী হয়, চিন্তাশীল হয়, তা হলে তার ব্যক্তিত্বও তেমনি করেই ফুটবে। আমরা প্রত্‌যেকে জীবনের নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হই। কেউ কেউ প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দেয়, আর সেটাকে একটা মূল্যবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। এইভাবে যার চিন্তা যত সুবিন্যস্ত রাখা আছে--- সুবিন্যস্ত ও প্রত্যেকটা প্রত্যেকের সঙ্গে সচেতনভাবে গ্রথিত---তারই ব্যক্তিত্ব তত বেশি, এবং ততো পরিস্ফুট।"[১৩] অভিনয় শিক্ষায় এই ব্যক্তিত্ব বিকাশ অত্যন্ত আবশ্যিক বিষয়। সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূত্রগুলোর সঙ্গে আর একটু তথ্য সংযোজন করে প্রাবন্ধিক আলোচনার ইতি টেনেছেন, ----একজন শিল্পীর

''দায়িত্বসম্পন্ন হতে হবে। চিন্তা দিয়ে প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা করা শিল্পীর কাজ, কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে গেলে প্রকৃতিরই ক্রীতদাস হতে হয়।''[১৪]

গ্রন্থসূত্র :

১) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮১

২) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮২

৩) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৩

৪) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৪

৫) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৫

৬) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৫

৭) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৬

৮) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৬

৯) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৬

১০) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৮

১১) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫

১২) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৯৭

১৩) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৯৭

১৪) রচনা সমগ্র-১, শম্ভু মিত্র, সম্পাদনা-শাঁওলী মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০১৭, পৃষ্ঠা-৯৮।

ভারতীয় নারী এবং সামাজিক পরিবর্তন : একটি বিশ্লেষণ

বরুন কুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
মহিষাদল রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ :- পরিবর্তনশীলতা হল মানব সমাজের ধর্ম। আর সামাজিক পরিবর্তন হল এই বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তন। ম্যাকাইভার ও পেজ তাই সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন – 'সমাজ হল সামাজিক সম্বন্ধের জটাজাল, যা নিয়ত পরিবর্তনশীল'। আদিম সমাজ ব্যবস্থা এ প্রকার নানা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল। কারণ সমাজ স্থির থাকতে পারে না। আমরা বলতে পারি যে, পরিবর্তন হল সমাজের আইন, অপরিবর্তনীয় সমাজ একটি কল্পকাহিনী। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন শুরু হয় শব্দ পরিবর্তন দিয়ে, দিনের শুরু থেকেই আমরা আলোচনা শুরু করি গত এক বছর, এক দশক বা বিগত পঁচিশ বছরে পরিস্থিতি কী ছিল। মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ইত্যাদি কতটা পরিবর্তন হয়েছে। নিঃসন্দেহে পরিবর্তন সমাজ ও মানবজীবনের কোনো কোণ রেখে যায়নি। নারীরাও পরিবর্তনের ব্যতিক্রম নয়। আমরা দেখি নারীর জীবন নিয়ে লিখতে শুরু করলে কালি ও কাগজের অভাব হবে। একটি মজার বিষয় হল পৃথিবীর প্রতিটি কোণে যেখানে আমরা মানুষের আবাস খুঁজে পাই সেখানে নারীর মর্যাদা পুরুষদের পাশে, প্রায় সব সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ে আছে। এই সত্য নিজেই প্রকৃতির নিয়ম হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর, ভারত সরকারও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আমি আমার এই প্রকল্পে সামাজিক পরিবর্তনে ভারতীয় মহিলাদের মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি।

সূচকশব্দ :- মহিলাদের অবস্থান, সমতা, শিক্ষা, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, রাজনীতি।

ভূমিকা :- পরিবর্তনশীলতা হল মানব সমাজের ধর্ম। আর সামাজিক পরিবর্তন হল এই বৃহত্তর সমাজের পরিবর্তন। ম্যাকাইভার ও পেজ তাই সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন – 'সমাজ হল সামাজিক সম্বন্ধের জটাজাল, যা নিয়ত পরিবর্তনশীল'। আদিম সমাজ ব্যবস্থা এ প্রকার নানা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল। কারণ সমাজ স্থির থাকতে পারে না। আমরা বলতে পারি যে, পরিবর্তন হল সমাজের আইন, অপরিবর্তনীয় সমাজ একটি কল্পকাহিনী। আর এই পরিবর্তনশীল সমাজে নারীরা হল মৌলিক একক। নারীরা একটি পরিবার তৈরী করে, পরিবার একটি বাড়ি তৈরী করে, বাড়ি একটি

সমাজ এবং শেষ পর্যন্ত সমাজ একটি দেশ তৈরী করে। একটি দেশ ততক্ষণ অগ্রসর হতে পারে না যতক্ষন না তার নারীরা উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ না নেয়। ভারতে সামাজিক পরিবর্তনে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে পুরুষশাসিত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, পুরানো ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের চর্চা ইত্যাদির কারণে নারীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নারীরা শুধুমাত্র সন্তান জন্মদান এবং সন্তান লালন-পালনের মতো ঐতিহ্যগত ভূমিকার জন্য দায়ী ছিল। আধুনিক বিশ্বে নারীদের অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে একটি মেয়ের জন্মকে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে লক্ষ্মীর আগমন-ধন ও ধন-সম্পদের দেবী । নারীকে "জননী" এবং " অর্ধাঙ্গিনী" অর্থাৎ শরীরের অর্ধেক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমরা যখন সামাজিক আধুনিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের কথা চিন্তা করি তখন নারীর ভূমিকা সব চেয়ে বড় বিষয়। যে সমাজ নারীকে সম্মান করে না সে সমাজ কখনো উন্নতি করতে পারে না।

স্বাধীনতার আগে ভারতীয় মহিলাদের অবস্থানের ইতিহাস :- মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাম্প্রতিক সময় থেকে নয়, অনেক বছর আগে থেকে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নারীদের উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হত। বেদ এবং উপনিষদে নারীর অবস্থান ছিল মাতা বা দেবী। হিন্দু বিধান দাতা মণুর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবার এবং সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল পুরোপুরি, কিন্তু নারীকে সারাজীবন পুরুষের বশীভূত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক বৈদিক যুগে মহিলারা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল মর্যাদা ভোগ করতেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নারীর মর্যাদা নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পেশী শক্তি এবং অর্থ শক্তি সমাজে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যেহেতু পুরুষরা যুদ্ধ করেছে এবং শিল্প উৎপাদনের উদ্যোগগুলির পরিচালনা করেছে, তাই তারা নিজেদেরকে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল। তাই পরবর্তী বৈদিক যুগে কন্যাসন্তানকে দুঃখের উৎস হিসেবে গন্য করা হত। বহুবিবাহ প্রথা নারীর মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছিল। মধ্যযুগীয় যুগে মহিলারা নির্জন হয়েছিল এবং শিক্ষাগত সুযোগগুলি বিলুপ্ত হয়েছিল। এভাবে নারীরা সমাজে তাদের ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই শোষণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে। সতীদাহের অমানবিক প্রথা যেখানে স্ত্রী স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রথা বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে। রাজা রামমোহন রায় এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং অবশেষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের সহায়তায় ১৮২৯ সালে তা রদ হয়েছিল। এছাড়া ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, ১৮৭০ সালে মহিলা শিশুহত্যা প্রতিরোধ আইন চালু হয়।

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় মহিলাদের অবস্থানের ইতিহাস :- কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন থেকে থাকেনি। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরা সারা দেশ জুড়ে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। যেন মনে হয় স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল মহিলাদের আন্দোলন এবং যুদ্ধগুলি ছিল তাদের লড়াই। আসলে মহিলাদের লড়াইটা

শুরু করেছিলেন ঝাঁসির রাণি, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ধীরে ধীরে মহিলারা সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করে। গান্ধী যুগ এবং স্বাধীনতার পরের দশকগুলো ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। সংবিধানে লিঙ্গের সমতার মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে আলাদা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর অবস্থার দ্রুত ও কার্যকরী পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে কিছু মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় নারীরা ভারতীয় পুরুষদের মতোই এই অধিকারের সুবিধাভোগী। এছাড়া ভারতীয় সংবিধানে মহিলাদের সমতা লাভ, ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও রাজনীতিতে অংশগ্রহনের জন্য আইন পাস করা হয়েছে।

সমতা লাভের লড়াই :- পুরুষদের সঙ্গে সমতা লাভের জন্য মহিলাদের লড়াই সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল। মহিলাদের অবস্থানের ইতিহাস ছিল উত্থান ও পতনের ইতিহাস। তাদের অবস্থা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিভিন্ন সময় প্রভাবিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র আইনের দ্বারা সমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করেছি যে নৈতিক মূল্যরূপে সমতা উপভোগ করার কিছু প্রতিবন্ধক আছে। দুঃখজনক হলেও এখনো কোন কোন সমাজ ও রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে মানুষে মানুষে বৈষম্য স্বীকার করে এবং বৈষম্যের ভিত্তিতে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। এই বৈষম্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন – জাতিভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক। এই বৈষম্যগুলির মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য একটি বাস্তব ঘটনা, যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য করা হয় দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যেটি নৈতিক দিক দিয়ে অন্যায়। এই দেহগত পার্থক্যের দোহাই দিয়ে নারীদেরকে সমাজে নানাভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে। যেমন – ভোটাধিকার, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে নারীদেরকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানেও সমতার ধারণা বিভিন্ন বিধানের মাধ্যমে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন :- সমাজের আধুনিকীকরণের একটি শক্তিশালী দিক হল শিক্ষা। শিক্ষা একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা মহিলাদের দেয় সমান মর্যাদা, সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ ইত্যাদি। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের শিক্ষা উচ্চবিত্ত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষত ব্রাম্ভণ সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি ব্রাম্ভণ মহিলারাও তখন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। বর্তমানে যদি মেয়ে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাহলে সমাজের সদস্যরা তার পিতামাতাকে পরামর্শ দেয় কিভাবে সেরা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এমনকি সরকারও মেয়ে শিশুর পিতামাতাকে সহজতর করে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছেন। যেমন – কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মধ্যাহ্ন ভোজন, বেটি

বাচাও বেটি পড়াও, বিনামূল্যে বই, ইউনিফর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে মহিলা শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া বর্তমানে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে সমতা বিধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন :- সমাজের শক্তি কাঠামোতে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন কিছুই নয়। এই ক্ষমতায়নের ধারনা মহিলাদের মধ্যে পরিবর্তন আনে। একজন ব্যক্তি হিসাবে যদি নারীদের ক্ষমতায়িত করা হয় তবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাদের থাকে। তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হতে পারবে। তবে এটা আবশ্যিক যে জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য নারীদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের প্রয়োজন।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন :- মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি যখন আসে, তখন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান পান। পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের কারনে মহিলারা বৈষম্যের শিকার হন, যা তাদের কাজের জন্য অর্পিত মজুরি প্রদানে প্রতিফলিত হয়। যেখানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিক সম কাজে সম বেতনের কথা বলেছেন সেখানে সমাজে এখনও সম কাজে মহিলাদের পুরুষদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হয়। তবে বিভিন্ন কারনে তাদের এই অবস্থান বাড়িয়ে তোলে। যেমন – নিরক্ষরতা, মাতৃত্বকালিন পরিষেবা, নিকটতম গর্ভাবস্থা ইত্যাদি। এই সব কারনে, তাদের বিভিন্ন শোষণ ও দুর্বলতা তাদেরকে অসম করে তুলেছিল কর্মসংস্থানের বাজারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে। তাছাড়া সামাজিক আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে, নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থা, বিবাহবিচ্ছেদ, রক্ষনাবেক্ষন ইত্যাদি মহিলাদের ভারতীয় সমাজে নিম্ন স্তরে রেখেছে। এর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের সাথে বৈষম্য ইত্যাদি। এর ফলস্বরূপ মহিলারা শুধুমাত্র নিম্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির মান থেকে বঞ্চিত হয় না, এর সাথে সাথে তাদের সার্বিক বিকাশও প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে।

রাজনীতির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন :- আধুনিক ভারতীয় মহিলাদের উচ্চপদে আসীন হতে দেখা যায়। যেমন – রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ এবং মুখ্যমন্ত্রী। তবে আজও যখন আমরা মহিলাদের দিকে নজর রাখি, তখন নারী রাজনীতিবিদদের সংখ্যা পুরুষ রাজনীতিবিদদের তুলনায় অনেক কম। যে মহিলারা রাজনীতি করছেন তারা শহরবাসী অভিজাত শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। দরিদ্র মহিলারা গৃহস্থালি জীবনে সীমাবদ্ধ। তাই দরিদ্র মহিলাদের রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। যাতে তারা দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। এর ফলে মহিলারা বেশি করে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করবে এবং তাদের সমানাধিকার বুঝে নিতে পারবে। একটি বিদ্রুপ আছে যে – গ্রামীণ এবং দরিদ্র স্তরের মহিলারা বেশি শতাংশ ভোট প্রদান করে শহুরে এবং শিক্ষিত মহিলাদের তুলনায় – এর অবসান ঘটবে।

মহিলাদের জন্য সরকারি উদ্যোগ :- এছাড়াও ভারতে মহিলাদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য সরকার কর্তৃক অনেক আইনী ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে। সেগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ–

১) পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৫৪।

২) বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪।

৩) মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১।

৪) যৌতুক নিষেধাজ্ঞা আইন, ১৯৬১।

৫) সমান পারিশ্রমিক আইন, ১৯৭৬।

৬) বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬।

৭) ফৌজদারি আইন, ১৯৮৩।

৮) মহিলাদের অশালীন প্রতিনিধিত্ব (নিষেধ) আইন, ১৯৮৬।

৯) গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, ২০০৫।

১০) দ্য মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৭১।

১১) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬, সংশোধন ২০০৫।

আইন প্রণয়নের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্তরেই বিভিন্ন বিভাগ এবং মন্ত্রকগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কল্যাণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি। সেগুলি হল – ১) মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, ১৯৯৩।

২) স্বধার, ১৯৯৫।

৩) উজ্জ্বলা, ২০০৭।

৪) ধনলক্ষ্মী, ২০০৮।

৫) সবলা স্কিম, ২০১০।

৬) নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় মিশন, ২০১০।

৭) মহিলা উন্নয়ন কর্পোরেশন স্কিম।

৮) ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী যোজনা।

৯) বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও।

১০) কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি।

এইভাবে মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুবিধার জন্য অনেকগুলি প্রকল্প করা হয়েছে, তবে পরিস্থিতির একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সেগুলি কখনো কখনো কার্যকর হয়নি। তবুও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে আগের সময়ের থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। অতীতের তুলনায়, আধুনিক যুগের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং অনেক কিছু অর্জন করেছে কিন্তু বাস্তবে তাদের এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

উপসংহার :- আধুনিক নারীরা তার সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে শুরু করেছে। এখন নারীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা পেয়েছে তবে অনেক ক্ষেত্রে তা সত্য নয়, কারণ সমাজে এখনও কুসংস্কার

রয়ে গেছে। যদিও ভারতে আজকের আধুনিক নারীদের মর্যাদা উচ্চতর হয়েছে। মহিলারা সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একটি পার্থক্য তৈরী করেছে। বর্তমানে মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত রাজ করছে বলা যায়। সমসাময়িক ভারতীয় সমাজে নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন কারনে। যেমন – আধুনিক শিক্ষা, উচ্চ ভৌগলিক এবং পেশাগত গতিশীলতা এবং নতুন অর্থনৈতিক নিদর্শনগুলির উত্থান মহিলাদের একটি নতুন মর্যাদা অর্জনে সাহায্য করেছে। সুতরাং মহিলাদের জন্য সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক পদ্ধতিগুলি সময়ে নেওয়া প্রয়োজন। নারী এবং দেশের অগ্রগতিতে নারীদের সমান অংশগ্রহণকারী হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গ্রন্থ নির্দেশিকা :-

১) Sharma, K.L., Indian Social Structure and Change, Rawat Publication, Jaipur, 2008.

2) Chandra, Suresh, Social Change in Modern India, Jnanda Prakashan, New Delhi, 2011.

3) Desai, Neera, & Krishna Raj, Maithreyi, Women and Society in India, Ajanta Books, New Delhi, 1987.

৪) ভট্টাচার্য, সুকুমার, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, গাঙচিল, ২০০২ ।

৫) সেন, শ্রীক্ষিতিমোহন, প্রাচীন ভারতে নারী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, ২০১৭ ।

৬) ভট্টাচার্য,সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০০৮।

বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটক ও খালেদ চৌধুরীর মঞ্চচিত্রণ

প্রসেনজিৎ ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার : ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠিত হয়। আইপিটিএ-র কিছু সক্রিয় সদস্য আইপিটিএ থেকে বেরিয়ে 'বহুরূপী' গঠন করেন। 'বহুরূপী' প্রথম দিকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হলেও ১৯৫৪ সালের 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থের মধ্যে দিয়ে তাদের সাফল্যের পথচলা এবং ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের হাত ধরে 'বহুরূপী'-তে যুক্ত হন খালেদ চৌধুরী। আমাদের আলোচ্য বিষয় — বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটকে খালেদ চৌধুরীর মঞ্চচিত্রণ। মূলত রবীন্দ্রনাথ রচিত 'রক্তকরবী', 'স্বর্গীয় প্রহসন', ও 'ডাকঘর' –এই তিনটি নাটকে খালেদ চৌধুরীর মঞ্চভাবনা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এই তিনটি নাটক বহুরূপীর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে এবং মঞ্চের নেপথ্যের কারিগর ছিলেন খালেদ চৌধুরী। নিজের প্রতিভার মাধ্যমে তিনি বাংলা থিয়েটারে মঞ্চের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। আমরা আলোচনা করবো বহুরূপীর মাধ্যমে কীভাবে মঞ্চে খালেদ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ ঘটে ? রক্তকরবী নাটকের মধ্যে কীভাবে খালেদ চৌধুরীর শিল্পী সত্তার প্রকাশ ঘটে ? 'স্বর্গীয় প্রহসন' ও 'ডাকঘর' নাটকে তিনি কীভাবে মঞ্চভাবনার প্রকাশ ঘটালেন ?

সূচক শব্দ : খালেদ চৌধুরী, বহুরূপী, মঞ্চচিত্রণ, রক্তকরবী, স্বর্গীয় প্রহসন, ডাকঘর।

মূললেখা :

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ভাঙ্গার পর কিছু সক্রিয় সদস্য মিলে ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা করেন। 'বহুরূপী' একটি নাট্যদল। দীর্ঘদিন নাট্যপ্রয়োজনার মধ্যে দিয়ে বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চে উপস্থাপন কঠিন ব্যাপার, তাই সহজে কেউ রবীন্দ্রনাটক নিয়ে কাজ করতে চায় না। 'বহুরূপী' বেশ কিছু রবীন্দ্রনাটক মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৫১ সালের 'চারঅধ্যায়' মঞ্চস্থ হলেও সেভাবে সাফল্য পায়নি। ১৯৫৪ সালের শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়। খালেদ চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মঞ্চচিত্রণ, সংগীত ও পোশাক পরিকল্পনার। মঞ্চের নেপথ্য কাজ করেও খালেদ চৌধুরী 'রক্তকরবী'-র মঞ্চভাবনার মধ্যে দিয়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেন। বাংলা থিয়েটারকে নতুনভাবে ভাবতে শেখালেন। নতুন চিন্তাধারায়, নতুন ভাবনায়, নতুনভাবে 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয়েছিল। খালেদ চৌধুরী

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে 'বহুরূপী'তে যুক্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন 'বহুরূপী'কে সমৃদ্ধ করেছেন।

।। এক ।।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী খালেদ চৌধুরী **১৯১৯** সালের ২০ ডিসেম্বর মাসে মামার বাড়ি চেপরা গ্রামের নিকট দাসগ্রাম জন্মস্থান করেন। ছেলেবেলার বেশিরভাগ সময় মামার বাড়িতে কাটিয়েছেন। তিনি গান, নাচ, ছবি আঁকাতে ভালোবাসতেন — যা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন। মামা, দিদিমা, মাসিমা এমনকি তাঁর বাবাও গান গাইত। তিনি প্রথাগতভাবে গান কোথাও শেখেননি কিন্তু তাঁর গানের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যা ছিল তা বড় বড় গান জানা শিল্পীদেরও হার মানায়। তাঁর দাদু গুরুসদয় দত্তের বড়দি, কাত্যায়নী পুরকায়স্থ হলেন ধামাইল নাচের প্রবক্তা। 'রক্তকরবী'-র মঞ্চায়নে খালেদ চৌধুরী মঞ্চচিত্রণ সাথে সংগীত পরিচালনা করেছেন। সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারার সাথে সংগীত করলেন। এই সংগীতের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন তার পরিবারের কাছ থেকেই।

খালেদ চৌধুরী ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের লোকসংস্কৃতিরর সাথে জড়িয়ে ছিলেন। স্কুল ফাঁকি দিয়ে তিনি ধামাইল নাচ, নৌকা পুজো, নৌকা বাইচ দেখতেন। নৌকা পুজোয় সময় ব্যাহত ভাস্কর্য, বাড়িতে এসে বানানোর চেষ্টা করতেন। ছবি আঁকার আগেই তিনি শেপ দেওয়া শিখলেন। মনসামঙ্গল, পদ্মাপুরাণ দেখার জন্য রাতের বেলা লুকিয়ে বাড়ি থেকে বের হত। খালেদ চৌধুরী এই প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন :

> "পোশাক পরে দুই হাতে দুটো চামর নিয়ে নেচে নেচে গাওয়া হত এই গান। দীর্ঘ গাথার মত এই পদ্মপুরাণ-এর কাহিনী। সেই কাহিনী বিবৃত করা হত, আর দোহাররা থাকত মূল গায়কের পাশে। সেই যে গান গাইত সেটা আমাকে অবাক করে দিত অন্য একটা কারণেও যে লোকটি গান গাইত সে ভীষণ তোতলা ছিল, অথচ সে দুর্দান্ত গান গাইত। সুরীন্দ্র বলে তার নাম, আসলে সুরেন্দ্র আর কী, গ্রামের লোক তাকে সুরীন্দ্রর বলে ডাকত।"[১]

লোকসংস্কৃতির গান পরবর্তীতে মঞ্চে ব্যবহার করেন। তিনি 'ফোক মিউজিক এন্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য ধরে রাখেন। অন্যদিকে খালেদ চৌধুরী একজন নাস্তিক ছিলেন। নাস্তিক বলেই যে অন্যের ধর্মের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল এমন নয়। তিনি নিজের প্রতিভার জন্য একবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু ফর্মে ধর্ম লিখতে হবে বলে তিনি তা নাকোচ করে দেন। এই কারণে তিনি কখন বিদেশে যাননি। এ বিষয়ে খালেদ চৌধুরী বলেছেন : "শুনেছিলাম ধর্ম মানুষকে শুদ্ধ করে কিন্তু আমার জীবনে আমি দেখেছি ধর্ম মানুষকে হিংসা শেখায় দেখেছি যারা খারাপ করে মন্দ করে তারা ধর্মকে পুঁজি করে।"[২] তাঁকে নির্দিষ্ট কোন ধর্মে আটকে রাখা যায়নি। ধর্ম বলতে তাঁর

কাছে মানবধর্ম শ্রেষ্ঠ। সঠিকভাবে কাজকে করার জন্য তিনি সবরকম উপায় অবলম্বন করেছেন। খালেদ চৌধুরী মনে করতেন একজন জাত শিল্পীর কাছে মানুষ শ্রেষ্ঠ। ১৯৪৭-এ কলকাতায় যখন দাঙ্গা হয়, তখন তিনি থাকতেন পার্ক সার্কাসের মুসলমান পাড়ায়। সে সময় আই.পি.টি-এর রিহার্সল হত কমল বসুর বাড়িতে। রিহার্সল করতে যাওয়া প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরী জানান :

> "আমি পার্ক সার্কাসে ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরতাম। বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে যখন যেতাম তখন ধুতিতে কোঁচা দিয়ে দিতাম, তখন আমি কালি চৌধুরী। দাঙ্গার সময়ে এই কালি চৌধুরী আর খালেদ চৌধুরী সম্প্রীতি বজায়ের জন্য কিছু চেষ্টা, কিছু উদ্যোগও নিয়েছিল হিন্দু পাড়ার সেই চেষ্টা চালাত কালি চৌধুরী, আর মুসলমান পাড়ায় খালেদ।"[৩]

পাশাপাশি আমরা দেখি নিজের নাম তিনি নিজেই রাখলেন। পরিবারের দেওয়া চিত্তরঞ্জন নাম পাল্টে তিনি খালেদ রাখলেন। খালেদ শব্দের মধ্যে কোন ধর্ম লুকিয়ে নেই। খালেদ শব্দের অর্থ হলো চিরস্থায়ী। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে খালেদ চৌধুরী জানান : "দাদু গুরুষদয় দত্ত নাম দিলেন চিরকুমার। এদিকে বাবার পরিবারে প্রথম নামের পর রঞ্জন দেওয়া হত। তাই বাবা চিরকুমারের বদলে নাম দিয়ে দিলেন চিররঞ্জন। তিনি নিজের নাম নিলেন খালেদ যার অর্থ চিরস্থায়ী, নামের আড়ালে 'চির' থেকেই গেল।"[৪] আবার বাড়ি থেকে তিনি বারবার পালিয়েছেন। গণ্ডির বাইরে থাকতে ভালোবাসতেন। মঞ্চনির্মাণ বা সংগীত পরিচালনা সব কিছুতে তিনি নিজের পূর্ণ স্বাধীনতায় কাজ করেছেন। তিনি ভালোবেসে কাজ করতেন। নামের জন্য কখনো কাজ করেননি। বহুরূপী যখন ব্যালেন্স করার জন্য পোস্টারে তাঁর নাম লিখতে বলছিল তখন তিনি দুবার ভাবেননি বহুরূপী থেকে বেরিয়ে যেতে। অথচ তাঁর প্রতিভা তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। তিনি ১৯৪৪ সালে নিজের শহর ছেড়ে মাত্র ৬৪ টাকায় কলকাতায় পৌঁছালেন। কলকাতায় পৌঁছে তিনি গোয়া বাগানের একটি বাড়িতে ওঠেন এবং আইপিটিএতে যুক্ত হন। গান করতে জানতেন বলে, আইপিটিএ তাঁকে গানের স্কোয়াডে রাখেন। শম্ভু মিত্র সে সময় আইপিটিএতে যুক্ত ছিলেন। শম্ভু মিত্র ছিলেন নাটকের স্কোয়াডে। সেই সময় শম্ভু মিত্রের সাথে খালেদ চৌধুরী পরিচয় হয়। কলকাতায় এসে তিনি গুরু জোসেফ নস্করের কাছে বেহালা আর জয়নুল আবেদিনের কাছে আঁকা শিখলেন। ছেলেবেলা থেকেই সংগীত, ছবি, আঁকা তে পটু ছিলেন এতে কোন সন্দেহ ছিল না। খালেদ চৌধুরী বলেন : "মঞ্চসজ্জা, সংগীত, প্রচ্ছদ আঁকা এসবের পরেও তাঁর জীবনের আরও বড় ক্ষেত্র ছিল লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতির জগৎ।"[৫] লোকসঙ্গীত ও সংস্কৃতি তিনি মঞ্চে নতুন ভাবে উপস্থাপন করে দর্শকের মন জয় করেন। ছবি আঁকতে, গান করতে জানতেন। এসব গ্রামবাংলা থেকে পাওয়া। দীর্ঘদিন গ্রামে থাকার ফলে গ্রামে যাত্রাপালা, লোকসংগীত, ধামাইল নাচ এই সমস্ত সংস্কৃতিতে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মঞ্চে উপস্থাপন করলেন। অন্যদিকে যান্ত্রিকতা ও

স্লোগান সর্বস্বতা যখন বাড়তে লাগলো তখন শম্ভু মিত্র আই.পি.টি-এ ছেড়ে দিলেন। স্লোগান ও দুর্ভিক্ষের জন্য ছাড়েননি, যেখানে শিল্পীর সত্ত্বা বজায় রাখা হয় না সেখানে থেকে কি করবেন — "মোদ্দা কথা সব শিল্পই প্রোপাগাণ্ডা, কিন্তু সব প্রোপাগাণ্ডা শিল্প নয়।"[৬] শিল্পীর বাকস্বাধীনতার যেখানে থাকে না, সেখানে প্রকৃত শিল্পী কাজ করতে পারেনা। আই.পি.টি.এ শিল্পীর বাকস্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, কোন কিছু করতে গেলে জানিয়ে করতে হবে এমন নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরীর মতো শিল্পীরা আইপিটিএ ছেড়ে বেরিয়ে যান।

খালেদ চৌধুরীর পরিবারের কেউ কখনও থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিল না। নিজের প্রতিভা ও গুণের কারণে তিনি মঞ্চে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> "আমার কোন থিয়েটারের কোন ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলনা। ঐ যাত্রা দেখেছি কিন্তু যাত্রা তো অন্যরকমের একেবারে। বিজয়া দশমীর দিন। সেদিন কোন বাধা-বিপত্তি নেই। সমস্ত রাতের জন্য ছাড়া, 'রক্তকরবী' তে থিয়েটারে জড়িয়ে গেলাম, এইটা আমার প্রথম কাজ তারপর একশোর ওপরে কাজ হয়েছে।"[৭]

থিয়েটারের ব্যাকগ্রাউন্ডনা থেকে না আসলেও তিনি কাজে মধ্যে দিয়ে নিজেকে থিয়েটার বা মঞ্চের একজন প্রকৃত শিল্পী বানিয়েছেন। এবং এই শিল্পী সত্তার কারণেই তিনি আজও মানুষের মধ্যে বেঁচে আছেন। খালেদ চৌধুরী বেশকিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। অভিনয় তাঁর পছন্দের ছিল না। তিনি নিজেই বারবার বলতেন তিনি অভিনয় করতে জানেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "অভিনয় আমি like করি না, আমার দ্বারা হয় না। আসলে আমার ভেতর থেকে urge নেই।"[৮] কিন্তু তিনি আই.পি.টি.এর নিয়ম অনুসারে সবাইকে সবকিছু করতে হবে। তাই অভিনয় করেন বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটকে । এরপর তিনি 'নবান্ন' ছাড়াও বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেন। পরবর্তীতে অভিনয় ছেড়ে দেন — "আমার অভিনয় খুব খারাপ হয়েছিল। আমার নিজের একদম ভালো লাগেনি। কিন্তু আইপিটিএ-র নিয়ম ছিল সবাইকে সবকিছু করতে হবে। তাই আমার নাটকের সঙ্গে যোগাযোগ।"[৯] অভিনয় তিনি কোনদিনই করতে চাননি, আইপিটিএ-র সাথে যুক্ত থাকার সময় বাধ্য হয়ে তিনি অভিনয় করেন। গান, ছবি আঁকা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন : "গান আর ছবি আঁকাই ছিল আমার প্যাশন। কিন্তু, কী বিচিত্র জীবনের গতি! নাটকে প্রথম দিকে সুর করেছি ঠিকই, কিন্তু গান থেকে আমি চলে গেলাম মঞ্চের শিল্পে। ছবি আঁকার বদলে হয়ে গেলাম প্রচ্ছদ আঁকার কারিগর।"[১০] নিজেকে কখনো সামনে আনার চেষ্টা করেননি, মঞ্চের পিছনে কাজ করে গেছেন। পোস্টারে নাম দেওয়া নিয়েও শম্ভু মিত্রের সাথে তাঁর মতভেদ দেখা দেয় : "শম্ভু মিত্রের সঙ্গে একটু মতভেদ হয়। Production সম্বন্ধে নয়, শিল্পভাবনা নিয়ে নয়, মতভেদ যা হল নাম দেওয়া নিয়ে। Poster লিখেছিলাম, তাতে আমি আমার নাম দেইনি।"[১১]

নেপথ্যের কারিগর হয়েও তিনি সকল মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে। নামের জন্য হ্যাংলামো করতে পছন্দ করতেন না। পোস্টারে নাম নিজে থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেননি কখনো : "কেউ নাম চায় কেউ নাম চায় না। কেউ নামের জন্য হ্যাঙলামি করে, বেশি বাড়াবাড়ি করে, সেইটাও অনেক আছে নাম বলার দরকার। আমি তো নামই দিতাম না।"[১২] মঞ্চচিত্রণ শিল্পী খালেদ চৌধুরী ১৯৮৬ সালে নাট্য একাডেমীর পুরস্কার পেলেন। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি এই পুরস্কার পান এবং নাট্যশোধ সংস্থান খালেদ চৌধুরীর সম্মানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। পদ্মভূষণ পেলেন যেদিন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার লাইন নিজের মতো করে বললেন– "যতদূরে যাবো, তত প্রাইজ পাই, আরে দূরে যাবো পদ্মভূষণ পাবো। পদ্মভূষণ পাওয়ার পরে মন্ত্রী নেবো।"[১৩] বাংলা থিয়েটারের নেপথ্যের কারিগর খালেদ চৌধুরী ২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল প্রয়াত হন।

।। দুই ।।

১৯৫৪ সালে 'বহুরূপী'র প্রযোজনায় শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'রক্তকরবী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'রক্তকরবী' বাংলা থিয়েটারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। 'রক্তকরবী' নাটকের মঞ্চায়ন বহুরূপীকে বাংলার নাট্যদলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়। সে সময় রক্তকরবী মঞ্চ করেন খালেদ চৌধুরী এবং আলো করেন তাপস সেন। নেপথ্যের কারিগর খালেদ চৌধুরী থিয়েটারের ভাবনাকে বদলে দিলেন। মঞ্চচিত্রণ, সংগীত, পোশাক সব কিছুতে নতুন ধারনা প্রয়োগ করেছেন। পুরনো মঞ্চভাবনাকে বদলে নতুন ভাবনায় মানুষকে নিয়ে গেলেন। রক্তকরবীর আগে বহুরূপী 'চার অধ্যায়' নাটকটি প্রযোজনা করেছেন। কিন্তু 'রক্তকরবী' ছিল বাংলা থিয়েটারের মাইলস্টোন। সেই মাইলস্টোন পরবর্তীতে থিয়েটার ভাবনাকেই বদলে দেয়। শম্ভু মিত্র 'রক্তকরবী' নাটকের বড় দায়িত্ব খালেদ চৌধুরীকে দেন। মঞ্চ নির্মাণ, সংগীত, পোশাক পরিকল্পনা দায়িত্ব পায় খালেদ চৌধুরী। শম্ভু মিত্র নিজে স্বীকার করেছেন খালেদ চৌধুরী ছাড়া 'রক্তকরবী' নাটক তিনি করতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ :

> "আমাদের রক্তকরবী ভালোলাগে। তেমন অনেকেরই লাগে। অনেকবার আমাদের মনে হয়েছে এটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেকবার মনে হয়েছে যে আমরা পারবো না। আমাদের পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী 'বহুরূপী'-তে এলেন। এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যেকোনো বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, মাথায় রক্তকরবী চিন্তা পেয়ে বসল।"[১৪]

শম্ভু মিত্রের হাত ধরেই খালেদ চৌধুরী 'বহুরূপী'তে যুক্ত হন এবং শম্ভু মিত্রের কথাতেই তিনি 'রক্তকরবী'র মঞ্চ   করেন। প্রথম দিকে একটু অনীহা থাকলেও 'রক্তকরবী'র

প্রথম রিহার্সাল দেখার পর তার ভাবনা পাল্টে যায় তিনি রক্তকরবীর সাথে জুড়ে যান এবং প্রতিনিয়ত রবীন্দ্রনাথকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেন মঞ্চের মাধ্যমে।

বহুরূপী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আর্থিক অবস্থাও খারাপ ছিল। 'রক্তকরবী' মঞ্চের কথা ভাবলেই শম্ভু মিত্রের মাথায় একটা বড় খরচের কথা মাথায় আসতো। 'রক্তকরবী' নাটক একটা বড় নাটক সে নাটকের খরচা অনেক হবে, এটাই স্বাভাবিক। দেশজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খালেদ চৌধুরী রক্তকরবীর বাজেট কমিয়ে দিয়েছিল। স্বল্প খরচায় মঞ্চ নির্মাণ করলেন এবং সেই মঞ্চ ইতিহাসে স্থান করে নিল। নিমন্তন কার্ড কেটে সঠিক শেপে এনে রাজার ঘর তৈরি করলেন। কাগজ দিয়ে পার্ট, পার্ট করে ভাগ করেন সর্দারদের পাড়া। যাতে দর্শক সহজেই বুঝতে পারে কোনটা রাজার ঘর, কোনটা সর্দারদের পাড়া, রাজার ঘরকে বুঝানোর জন্য ঘরের উপরে কাগজের বাজপাখি রেখেছিলেন। খালেদ চৌধুরী সৃষ্ট রক্তকরবী ডিজাইন নাট্যশোধ সংস্থানে সংরক্ষিত আছে। স্টেজের কথা মাথায় রেখেই তিনি মঞ্চ ডিজাইন করেছিলেন। প্রথম থেকে ভেবেছিলেন স্টেজটা বড় হবে কিন্তু সেই রকম বড় পাননি। এ সম্পর্কে তিনি জানান : "স্টেজটা তিরিশ ফুট ওপেনিং। পাচ্ছি কিন্তু আটাশ ফুট ওপেনিং। আর আমি আসলে চল্লিশ ফুটের ডিজাইন করে ফেলেছিলাম। ওই বোধটা ছিল না। যাইহোক, ওটা কাজে লাগেনি। কাঁটছাট দিয়ে যা থাকল, সেটাতেই 'রক্তকরবী' শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো।"[১৫]

নাটকের সাফল্য 'রক্তকরবী'কে শুধুমাত্র কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। কলকাতার বাইরে দিল্লি, মুম্বাই তো রক্তকরবী মঞ্চস্থ হয়েছে। নিজেদের মঞ্চের বাইরে গিয়ে যখন 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হলো তখন শুধুমাত্র মঞ্চের সামঞ্জস্য রেখে কিছু পরিবর্তন খালেদ চৌধুরী করেছিলেন। ধ্বজার নিচে অ্যাটলাসের মতো দেখতে একটি মূর্তি বসালেন। আর মঞ্চস্থাপত্যকে আকর্ষণ করার জন্য অ্যাটলাসের মাথার উপর লাল কাপড়ের আবরণ দিয়ে একটি দরজার আকৃতি তৈরি করেন। রাজার ঘর বঙালির কুঁড়েঘরের মতো তৈরি করলেন। রাজার দরজা সবসময় বন্ধই রাখা হতো সে দরজাকে এক রহস্যময় দরজায় পরিণত করলেন। প্রথমদিকের অভিনয়ে রাজার দরজায় গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা প্রচ্ছদের অনুকরণে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তা পাল্টে নাটকের সংলাপ দরজায় ব্যবহার করলেন আর মঞ্চের গঠন অনুযায়ী দু'রকমের রং ব্যবহার করলেন। আগে আলোচনা করেছি, রক্তকরবী মঞ্চায়নের সময় বহুরূপীর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। সঙ্গীতের জন্য প্রয়োজন টেপরেকর্ডার কিনতে পারেননি। তখন খালেদ চৌধুরী কলকাতার রিচি রোডের পুরাতন লোহালক্কড় দোকান থেকে কয়েকটা টুকরো টুকরো লোহা এনেছিলেন আর তার বাঁশি, বেহালা, ড্রাম দিয়ে সংগীত করলেন। কারখানার আওয়াজ করার জন্য পুরাতন লোহালক্কড় ব্যবহার করেছিলেন। খালেদ চৌধুরী এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

"চীনে একটা যন্ত্র আছে। কিন্তু সেই যন্ত্র তো আমাদের নেই। সেটা অনুমান করে; একজন মিস্ত্রিকে দিয়ে, যমুনা তখন কাঠের মিস্ত্রি ছিল; আমি একটা ডিজাইন করলাম, আর যমুনাকে বাড়িতে এনে বসিয়ে, প্রথমে কাঠটাকে মাপ মতো করে নিলাম, আমি অন্য জায়গা থেকে করিয়ে নিয়ে এসেছিলাম; তারপর ওই যমুনা একটা একটা করে গর্ত করতে লাগল, আর ওই গর্তে আমি ঠুকে ঠুকে দেখছি, সুর মেলাচ্ছি, আবার বলছি, আর একটু কাটো। এই করে আমাদের বোধহয় দুদিন লেগেছে। অনেকগুলো টুকরো বার করলাম। বিভিন্ন সুরের। ফাঁপা। ভীষণ জোর আওয়াজ হয়।"[১৬]

প্রচলিত সংগীতের যন্ত্র কম ব্যবহার করেন। নিজের তৈরি যন্ত্রে তিনি বেশি ব্যবহার করেন। রাজার দরজায় নন্দিনীর আঘাত, সর্দারদের একসাথে চলার আওয়াজ সবকিছুই তিনি হাতের তৈরি যন্ত্রে সঙ্গীত করেন। কাঠের তৈরি যন্ত্র দিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ করা হত। আর ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের আওয়াজও ছিল। এরজন্য সেসময় রিকশাওয়ালাদের হাতে থাকা বড় সাইজের ঘন্টি চিৎপুর থেকে কিনে এনে কাপড় ঝোলাবার হ্যাঙারে বেঁধে একজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঘোড়া লাফালেই যাতে ঝিং ঝিং করে নাচায় আর সাথে ঠিক সেসময় আরেক জন বাজাতো। কারাগার ভাঙার সময়, রাজার এঁটোরা বের হলেও ড্রাম বাজানো হত। তার সাথে বাঁশির কাঁপুনি সুর রাখা হত। থমথমে ভাব আনার জন্য বেহালার প্রথম তারে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দের আওয়াজ করতেন। আসলে নাটকের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে খালেদ চৌধুরী সংগীতের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। রঞ্জনকে কাছে না পেয়ে নন্দিনীর যে অস্থিরতা, সেই অস্থিরতাকে বোঝানোর জন্য খালেদ চৌধুরী মৌমাছির ফুলে ফুলে বসার অস্থিরতাকে বেহালাতে বাজিয়েছিলেন। নন্দিনী রাজার ঘরের দরজায় কড়া আঘাত করলে বিকট শব্দ উৎপন্ন হত। খালেদ চৌধুরী এই শব্দ উৎপন্নের জন্য বিশাল বাক্সের মধ্যে হুইল লাগিয়ে ঘুরাত। রাজার ঘরের দরজা খোলার সময়ও এই শব্দ ব্যবহার করা হতো।

অন্যদিকে মঞ্চচিত্রণ শিল্পী খালেদ চৌধুরী রক্তকরবী'-তে প্রথম সংগীত পরিচালনা করলেন। আগে গান শুনতে ভালোবাসতেন গান করতে ভালবাসতেন। কিন্তু সংগীত পরিচালনা কখনো করেননি। তার অভিজ্ঞতাও সে বিষয়ে ছিল না। একদম নতুন অভিজ্ঞতায় নতুন চিন্তাধারায় নতুনভাবে তিনি রপ্ত করে সংগীত পরিচালনা করলেন। গ্রামের পরিবেশে বড় হয়েছেন। গ্রামের সংগীত তাকে মঞ্চে সংগীত পরিচালনায় সহায়তা করেছে। তাঁর কাজের গভীরতা দেখে কখনো মনে হবে না এটাই তাঁর প্রথম সংগীতের কাজ। প্রত্যেকটা পার্ট ও সংলাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংগীত করেছেন। স্বল্প খরচায় কিভাবে সংগীত করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন। পাশাপাশি প্রত্যেকটা চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'রক্তকরবী' নাটকে তিনি পোশাক পরিকল্পনা করলেন। নতুন চিন্তাধারা এখানেও লক্ষ্য করা গেল। রাজা, সর্দার, নন্দিনী, বিশু,

শ্রমিক -মঞ্চে এদের সকলকে বোঝানোর জন্য আলাদা আলাদা পোশাক ব্যবহার করেছিলেন। সর্দারদের আলাদা বোঝানোর জন্য সর্দারদের বুকে দুটো ফিতা ব্যবহার লাগিয়েছিলেন। তিনজন সদ্দার জন্য তিনটে আলাদা আলাদা রঙ ছিল। দর্শকদের বোঝার সুবিধার্থে ব্যবহার করা হয়েছিল রংবেরঙের ফিতে। আর শ্রমিকদের জন্য খাকি। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় যখন 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় তখন খালেদ চৌধুরী পোশাক পরিকল্পনার সময়, সমস্ত চরিত্র দর্শকদের বোঝানোর জন্য প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পোশাক ব্যবহার করেছেন। খালেদ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

> "কর্ষণজীবী- আকর্ষণজীবীর মধ্যে যে যে ব্যাপারটি, সেটি বাল্মিকের মধ্যেই ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে এলেন। 'রক্তকরবী'র আগে নাম ছিল 'যক্ষপুরী'। একটা সময় 'নন্দিনী' ও ছিল। 'নন্দিনী' পালা রূপে তিনি লিখেছেন। পরের হয় 'রক্তকরবী'। তিনটি ধাপে। এর মধ্যে অনেকরকমের মিশ্রণ আছে। সিম্বল আছে, অ্যালিগরি আছে, আবার খুব রিয়্যালিস্টিক চরিত্র আছে।"[১৭]

শম্ভু মিত্র নির্দেশনা রক্তকরী মঞ্চস্থ হলেও রক্তকরবীর সাফল্যের পিছনে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তিনি খালেদ চৌধুরী। মঞ্চচিত্রণ, সংগীত, পোশাক সবকিছুতেই নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা থিয়েটারে পরিবর্তন আনলেন 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের মঞ্চায়ন সহজ ব্যাপার নয় কিন্তু শম্ভু মিত্র তার ব্যতিক্রম ঘটান। তিনি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করলেন 'রক্তকরবী' নাটক। আর নেপথ্যের কারিগর হিসাবে কাজ করেন খালেদ চৌধুরী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত স্বর্গীয় প্রহসন বহুরূপীর প্রযোজনায় ১৯৫৫ সালে মঞ্চস্থ হয়। ইতিমধ্যে বহুরূপী রক্তকরবী মত নাটক মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন। বহুরূপী রক্তকরীর মধ্যে দিয়ে বাংলায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এরপর বহুরূপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গীয় প্রহসন অমর গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করলেন। মঞ্চ, পোশাক, সংগীতের দায়িত্ব খালেদ চৌধুরীকে দেওয়া হয়। 'স্বর্গীয় প্রহসন' সাফল্য না পেলেও নাটকের মঞ্চ নির্মাণ দর্শকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। স্বর্গীয় প্রহসনের মঞ্চ দীর্ঘদিন মানুষের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়। খালেদ চৌধুরী রক্তকরবী মঞ্চ নির্মাণের পর নতুন অভিজ্ঞতায় 'স্বর্গীয় প্রহসন' মঞ্চ নির্মাণ করেন। নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তুলে ধরেছেন সেভাবেই খালেদ চৌধুরী মঞ্চ নির্মাণ করলেন। মঞ্চে স্বর্গের চিত্র অঙ্কন করেছেন খালেদ চৌধুরী। স্বর্গ আমরা দেখিনি। কিন্তু স্বর্গ কেমন হতে পারে আমাদের মাথায় তার কাল্পনিক চিত্র আছে। 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকের মঞ্চে স্বর্গের প্রতিকৃতি তৈরি করলেন খালেদ চৌধুরী। খালেদ চৌধুরী 'স্বর্গীয় প্রহসন' নাটকের মঞ্চ নির্মাণ করতে গিয়ে জানান :

> "প্রথম মনে হয়েছিল, এটা স্বর্গ তো, কাজেই, জিনিসটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, সমস্ত মঞ্চটাকে কালো করে দেওয়া হল। চারপাশে কালো। মেঝেটাও কালো। ফলে যারাই আসছে, মনে হচ্ছে ভাসছে। কোন জিনিস দাঁড়াচ্ছে না। মাঝখানে একটা লাল সিংহাসন।"[১৮]

বিধান রায়ের বাড়ি থেকে রাবারের পাইপ এনে তাতে রং করে মেঘের প্রতিকৃতি বানালেন এবং কালো সুতো দিয়ে সেগুলো মঞ্চে ঝুলিয়ে দিলেন। আকাশে মেঘ ভাসছে এমন সিচুয়েশন তৈরি করলেন এবং মঞ্চের বাকি অংশ অন্ধকার রেখেছিল। অভিনেতারা যখন মঞ্চে প্রবেশ করত তখন তাদের স্বর্গের অনুভূতি কাজ করত — "নাটকের পাত্রপাত্রীরা এল। স্বর্গের পরিবেশে– ধোঁয়া-ধোঁয়া, ধোঁয়া-ধোঁয়া।"[১৯] স্বর্গের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করলেন খালেদ চৌধুরী। মঞ্চে স্বর্গের বাতাবরণ তৈরি করেন খালেদ চৌধুরী। কল্পনার জগত, যেখানে কেউ যায়নি কিন্তু সেই কল্পনার জগতকে মঞ্চ তুলে ধরলেন। পোশাকের জন্য তিনি পুতুলের পোশাকের ডিজাইন ব্যবহার করেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে খালেদ চৌধুরী জানান : "আমাদের কালীঘাটের যে পুতুলগুলো আছে, বেনে বউ পুতুল; এই বেনেবউ পুতুলের যে ডিজাইনটি, 'স্বর্গীয় প্রহসন'-এর মতো প্রতিটি চরিত্রের ডিজাইন কিন্তু তাই। ওইটাকে আমি মডেল করে নিয়েছিলাম। চট দিয়ে সব ডিজাইন করলাম।"[২০] 'স্বর্গীয় প্রহসন' -এ আবহ সংগীতও দিয়েছেন খালেদ চৌধুরী। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন : "বাচ্চাদের একরকম খেলার বাঁশি, কুঁই কুঁই করে বাজে, একজনকে প্রাণপণে সেই বাঁশিটি বাজাতে বললেন, আর তিনি নিজে নিলেন তামাক খাওয়ার কল্কে। তা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বের করলেন।"[২১] ছেলেবেলায় বাবার হুঁকোর কলকে নিয়ে নানারকম শব্দ বের করতেন। তাতে বিকট শব্দ উৎপন্ন হত। ছেলেবেলার অভিজ্ঞতায় বাচ্চাদের বাঁশি আর হুঁকোর কলকে দিয়ে অদ্ভুত রকমের আওয়াজ সৃষ্টি করলেন। ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলেই এই আওয়াজ দিতেন। ভালোবেসে কাজ করতেন। প্রত্যেকটা কাজেই তিনি সমান গুরুত্বের সাথে করতেন মঞ্চে আলাদা বাতাবরণ তৈরি করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ডাকঘর' বহুরূপী প্রয়োজনে ১৯৫৭ সালের ২৬ জুলাই মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের ব্যস্ততার কারণে তৃপ্তি মিত্র নাটকটি পরিচালনা করেন। আর নাটকের পোশাক, সংগীত, মঞ্চ করেন খালেদ চৌধুরী। অসুস্থ বালক অমলকে ঘিরে সমস্ত চরিত্রের আনাগোনা। অমল মুক্তি চায়। বদ্ধঘরের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু তার শারীরিক পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করে ঘরে থাকতে। খালেদ চৌধুরী মঞ্চে একটি ত্রিকোণাকার বর্গা দিয়ে কুঁড়ে ঘর বানায়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে খালেদ চৌধুরী লিখেছেন :

> "দূরত্ব বোঝাবার জন্যে। সাধারণত যা করা হয় না বক্স-সেটে। বক্স-সেটে ৪×৮ যদি থাকে, তাহলে সবদিকেই ৪×৮ থাকবে, দুদিকে ৪, দুদিকে ৮ থাকবে। এখানে দূরত্ব আনবার জন্যে এটা করলাম। আর একটা জিনিশ

> হচ্ছে যে, ঘরটা ভেতর থেকে কিছু দেখা যায় না। সেইজন্যে ওই ব্যাপারটাকে ওপেন রেখে দিলাম এবং ঠিক তার পাশেই কিন্তু ফুল রয়েছে। তার পাশেই দেখা যাচ্ছে একটা বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো দিয়ে নাচতে নাচতে নাচতে নাচতে সুধা আসে। সাঁকোর পাশেই বড় বড় দুটো গাছ। এবং দূরে কিছু তালগাছ। আরো দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এগুলো মোটের উপর বড় আকারে যা ভাবা হয়।....'বহুরূপী'তে প্রতিটি নাটকের জন্যে আমি পোস্টার করতাম। সে-পোস্টার নিয়ে বেশ আলোচনা হত। প্রতিটি নাটকের নতুন ধরণের পোস্টার দেওয়ার চেষ্টা করতাম নিউ এম্পায়ারে। একই নাটকের অনেক রকমের পোস্টার করতাম। 'রক্তকরবী'র নানারকমের পোস্টার আমি করেছি। অন্যান্য নাটকের করেছি। 'ডাকঘর'-এর পোস্টারে দরজা খোলা একটা খাঁচা ছিল। তার থেকে পাখি উড়ে চলে। যাচ্ছে। কাগজ কেটে কেটে বসিয়েছিলাম।”[২২]

প্রথম অভিনয়ের পরে মঞ্চ পূর্ণতা পায়। অর্থাৎ প্রথম অভিনয়ের পর মঞ্চে সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। কাগজ দিয়ে কলাবতী ফুল প্রথমে বানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বাজারের ফুল সরিয়ে ন্যাচারালিস্টিক ফুল লাগালেন। খালেদ চৌধুরী রক্তকরবী-তে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, ‘ডাকঘর’-এর সমস্যা ছিল অন্যরকম। রক্তকরবী-তে বাস্তব চরিত্র ছিল। কিন্তু ‘ডাকঘর’ নাটকে বাস্তব চরিত্র কাব্যিক ছিল। প্রত্যেকটা চরিত্র চিত্রের মত। অমল আকাশের দিকে তাকাচ্ছে, তারার দিকে তাকাচ্ছে, সুধা নাচতে নাচতে ফুল তুলছে, দইওয়ালা সুর করে কথা বলতে বলতে মঞ্চে ঢুকছে। সমস্ত কিছু ভাসছে এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি করেন। সেটের সামনে স্বচ্ছতা ছিল। অমল যেখানে বসে কথা বলছিল তার পাশেই ছিল জানালা। জানালার ছিল শুধু একটা ফ্রেম। আর সমস্তটাই ফাঁকা। আর সেই জানালার সামনে একটা সোজা রাস্তা যেখান দিয়ে সবাই চলাফেরা করে। এভাবেই স্টেজ তৈরি করলেন খালেদ চৌধুরী। অমলের ঘরের দুটা দরজা, আর একটি জানালা রেখেছিলেন। উইঙের পাশে একটি দরজা। মা ছিল ঘরের ভিতরে। যেটা দিয়ে অমলের পিসেমশাই চলাফেরা করতো। আর রাজকবিরাজ ঢোকার আরেকটা দরজা ছিল বাইরের দিকে। মঞ্চে চট দিয়ে তৈরি দুটো লম্বা গাছ ঝুলিয়ে দেয়। আবার তার ঠিক পিছনে পাহাড়ের আকৃতি আর বহুদূর থেকে দেখা যায় কয়েকটি গাছ এমনভাবে সেট করা করেছেন, যা দেখে দর্শকের মনে হবে গাছগুলো ক্রমশ ছোট হতে হতে দূরে চলে গেছে। সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য অমলের ঘরের পাশে রঙ ছিটানো ফুলের ঝুড়ি আর ডানদিকে বেতের তৈরি ফুল লাগিয়েছিলেন।

খালেদ চৌধুরীর মনে হয়েছে ‘ডাকঘর’ নাটকের সংলাপে সংগীত আছে। যেমন মঞ্চে যখন দইওয়ালা “দই-দই-ভালো দই” ডাকতে ডাকতে চলছে তখন সুর দিয়েছেন খালেদ। আবার সুধা যখন ঢুকছে তখন সেই সময় প্রজাপতি যেমন নাচতে নাচতে ফুলের মধু আচরণ করে ঠিক সেই ভাবেই সুধা ফুল নিতে ঢুকে আর তার সাথে

চলে মিউজিক। খালেদ চৌধুরী বেহালায় স্ট্যাকাটো, ত্রিমাত্রিক, এবং তার সঙ্গে একটি মন্দিরা ব্যবহার করেছেন। সুধা যখন বেরিয়ে যেত তখন খালেদ চৌধুরী 'রক্তকরবী' তে ব্যবহৃত সেই পুরনো লোহলক্কড় দিয়ে ঢং ঢং আওয়াজ করতো। অমলের মৃত্যুর দিকটা খালেদ চৌধুরী শোকের মনে করেননি। এই মৃত্যুর দিক তাঁর কাছে একটা পজিটিভ দিক মনে হয়েছিল। তাঁর কাছে মৃত্যু একটা অমোঘ ব্যাপার ছিল। তাঁর মনে হয়েছে অমরল মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত ছিল। অমল চাইছিল একটা মুক্তি। আর সেজন্য খালেদ চৌধুরী বেহালার ব্যবহার করলেন। খুব মৃদু হালকা আওয়াজ অথচ দ্রুত ছন্দে বেহালা বাজাতে লাগলেন। বাজাতে বাজাতে চরম পর্যায়ে গেলেন খালেদ চৌধুরী মঞ্চচিত্রণ, সংগীতের মাধ্যমে ডাকঘর নাটককে সাফল্যের শিখরে ।

তথ্যসূত্র :

১. দেবাশীষ রায়চৌধুরী, *খালেদ চৌধুরী* (নাট্যগ্রন্থমালা ১), (সম্পা.) প্রভাত কুমার দাস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী, জুন ২০০৫ , পৃ. ২
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *খালেদ চৌধুরী* (নাট্যগ্রন্থমালা ১), জুন ২০০৫ বলে উল্লেখিত হবে]

২. খালেদ চৌধুরী, *মঞ্চের বাইরে,* (সম্পা.) ফণিভূষণ মণ্ডল, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সূত্রধর, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৪
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *মঞ্চের বাইরে,* ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বলে উল্লেখিত হবে]

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৪. দেবাশীষ রায়চৌধুরী, *খালেদ চৌধুরী* (নাট্যগ্রন্থমালা ১), জুন ২০০৫ , পৃ. ৩

৫. সুদেষ্ণা বসু, 'অন্তরঙ্গ খালেদদা', *বহুরূপী,* (সম্পা.) প্রভাত কুমার দাস, সংখ্যা ১২২ অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ২৫
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে পত্রিকাটি *বহুরূপী,* অক্টোবর ২০১৪ বলে উল্লেখিত হবে]

৬. খালেদ চৌধুরী, মঞ্চের বাইরে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৭

৭. সৌমিক সাহা, 'সাক্ষাৎকার : খালেদ চৌধুরী', *ইতিবৃত্ত,* (সম্পা.) ফণিভূষণ মণ্ডল, প্রথম বর্ষ, ২০১৪, পৃ. ৩৯
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে পত্রিকাটি *ইতিবৃত্ত,* ২০১৪ বলে উল্লেখিত হবে]

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৯. অরূপ শঙ্কর মৈত্র, 'খালেদ চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার', *বহুরূপী,* সংখ্যা ১২২, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৯

১০. খালেদ চৌধুরী, মঞ্চের বাইরে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৭

১১. সৌমিক সাহা, 'সাক্ষাৎকার: খালেদ চৌধুরী', *ইতিবৃত্ত,* প্রথম বর্ষ, ২০১৪, পৃ. ৪০

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৩. অমিত চক্রবর্তী, ‘খালেদদা’, *বহুরূপী,* অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৬

১৪. দেবতোষ ঘোষ, ‘আমার খালেদ সাহেব’, *ইতিবৃত্ত,* প্রথম বর্ষ, ২০১৪, পৃ. ৩০

১৫. খালেদ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা', *থিয়েটারে শিল্পভাবনা,* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রা. লি., বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৩৬
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *থিয়েটারে শিল্পভাবনা,* জানুয়ারি ১৯৯৭ বলে উল্লেখিত হবে]

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১৮. দেবাশীষ রায়চৌধুরী, *খালেদ চৌধুরী* (নাট্যগ্রন্থমালা ১), জুন ২০০৫ , পৃ. ১৫

১৯. খালেদ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা', *থিয়েটারে শিল্পভাবনা,* জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৪৯

২০. দেবাশীষ রায়চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী (নাট্যগ্রন্থমালা ১), জুন ২০০৫ , পৃ. ১৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২২. খালেদ চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাটকে দৃশ্যকল্প ও আবহভাবনা', *থিয়েটারে শিল্পভাবনা,* জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৫২

বাঁকুড়া জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন ও বীরাঙ্গনা সত্যরানী হালদার : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

সৌম্যদেব মাইতি
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, দূরশিক্ষা বিভাগ

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলার বাঁকুড়া জেলার এক বিশিষ্ট ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে আইন অমান্য আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল সেই আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি অগণিত মহিলা দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন।স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পৃহায় বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখনীয় । ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, বিদেশি দ্রব্য বয়কট, স্বদেশি দ্রব্যের প্রচার ব্যবহার এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। মূলত আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে বাঁকুড়া জেলার নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলার উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত রমনীদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গ্রাম্য রমণীরাও জীবনের পরোয়া না করে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বাঁকুড়া জেলার এরকমই একজন বীরাঙ্গনা হলেন সত্যরানী হালদার। আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে সত্যরানী দেবীর ভূমিকা ছিল অসামান্য। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে জেল খাটেন পরবর্তী সময়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় আন্দোলনে যুক্ত হন।বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্বস্তরের মহিলারা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।এদের মধ্যে বীরাঙ্গনা সত্যরানী হালদার ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

সূচকশব্দ : বাঁকুড়া, আন্দোলন, নারী, সত্যাগ্রহী, আইন অমান্য, সোনামুখী, জেল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলার বাঁকুড়া জেলার এক বিশিষ্ট ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে আইন অমান্য আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল সেই আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি অগণিত মহিলা দেশমাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন ষোড়শ সপ্তদশ শতকে শ্রীনিবাস

আচার্য যে আগুন জ্বেলেছিলেন, উনিশ শতকে আর এক শ্রীনিবাস রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাঁকুড়ার নারী জাগরণ ও নারী শিক্ষার প্রধান পুরোহিত ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।[১]

বিশের দশক থেকে কুমিল্লার সঙ্গে বাঁকুড়ার যোগ ঘটেছে 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । এই দশকে জেলা জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। তিরিশের আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা যোগ দিচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে বিশের দশক থেকে বাঁকুড়ার মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ১৯২৮ সালে সোনামুখীতে বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সময় জেলা মহিলা সম্মেলন হয়। জেলায় এটি প্রথম মহিলা সম্মেলন। তারপর ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর কোতুলপুরে একই সঙ্গে 'বাঁকুড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন' ও 'জেলা মহিলা সম্মেলন' হয়। এরপর 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন'-এর বিষ্ণুপুর অধিবেশনের প্রথম দিনে লাবণ্যচন্দের সভানেত্রীত্বে বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলন হয়। জানা যায় ঐ মহিলা সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য জেলার প্রত্যেক থানা থেকে এত অধিক সংখ্যক মহিলা প্রতিনিধি ও দর্শকের আগমন ঘটেছিল যে তাদের বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করতে প্রাদেশিক সম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।[২]

স্বাধীনতা আন্দোলনের স্পৃহায় বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখনীয়। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন, বিদেশি দ্রব্য বয়কট, স্বদেশি দ্রব্যের প্রচার ব্যবহার এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। বাড়ির অন্দরমহলের গোঁড়া রক্ষণশীল অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যে থাকা মহিলারাও স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের বিভিন্ন খবর বাড়ির অন্দরমহলে পৌঁছতে থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পতিপ্রাণা নারী, স্বামী বা ছেলের অথবা ভাইয়ের সম্পর্ক থেকেই নারীর অন্তর স্পর্শ করে এবং তাঁদের অন্তরে পৌঁছানোর পর অন্তরালবাসিনী মহিলারা স্বাধীনতা আন্দোলনে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন অথবা গুপ্ত নিরাপদ আশ্রয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়িতে আগলে রাখা মহিলাদের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। ভয় ভীতিকে তুচ্ছ করে বহু মহিলা স্বামীর সহযোদ্ধা অথবা ভাই-বোন সকলে মিলে কিংবা মা-ছেলে একত্রিতভাবে সংগঠনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে আত্মনিবেদন করেছেন স্বাধীনতার দীর্ঘ বছরগুলিতে। এঁদের ভূমিকা সত্যিই অবিস্মরণীয়। সমাজ ইতিহাসে এঁদের অবদান এক বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী আধার।[৩]

বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে নারীদের ভূমিকা। ১৯৩০-৩৪ আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে এ ভূমিকা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।[৪] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলে বাঁকুড়া জেলায় তার আঁচ পরিলক্ষিত

হয়েছিল। এখানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে বাঁকুড়াতে ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্যাপিত হয়। জেলার বহু সংখ্যক মহিলা এতে যোগদান করেছিলেন।[৫] ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাঁকুড়ায় লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হলে মহিলাদের জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পর্ব শুরু হয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার লবণকেন্দ্র গুলিতে লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার সত্যাগ্রহীর দল কুমিল্লার অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঁকুড়া শহর থেকে কাঁথির উদ্দেশ্যে পদব্রজে ২৬শে মার্চ, ১৯৩০-এ যাত্রা শুরু করে বেলিয়াতোড়, সোনামুখী, ধনসিমলা, কাকটিয়া, পাত্রসায়ের, বেতুড়, শ্রীপুর, ভগবানবাটী, রাহাগ্রাম, বিষ্ণুপুর হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেন।[৬] সর্বত্রই মহিলারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত থেকে সত্যাগ্রহীদের স্বাগত জানিয়েছেন। ২৮শে মার্চ ১৯৩০-এ বিকেল ৫.৩০-এ সত্যাগ্রহীরা সোনামুখী পৌঁছান, মহিলারা শঙ্খধ্বনি দিয়ে ধান-দূর্বা খই বর্ষণ সহকারে সত্যাগ্রহীদের স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছেন, সত্যাগ্রহীদের কপালে তাঁরা এঁকে দিয়েছেন চন্দন তিলক। সোনামুখীতে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এখানে সত্যাগ্রহীরা বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাঁরা নারী-পুরুষদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। ডঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী এখানকার মহিলা এবং পুরুষদের সরকারি অফিস, আদালত, ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের নির্দেশ দেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং চৌকিদারদের পদত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। সোনামুখীর নারী-পুরুষগণ সত্যাগ্রহী তহবিলে অর্থ সাহায্যও করেন। সোনামুখীর এই সভাতে প্রায় ৫৭ জন সত্যাগ্রহী হিসাবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেন।[৭]

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। মূলত আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে বাঁকুড়া জেলার নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলার উচ্চবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত রমনীদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গ্রাম্য রমণীরাও জীবনের পরোয়া না করে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বাঁকুড়া জেলার এরকমই একজন বীরাঙ্গনা হলেন সত্যরানী হালদার।।

১৯১০ সালের ১লা জুলাই বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামের শ্যামবাজারে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সত্যরানী হালদার। তাঁর পিতা ছিলেন বিষ্ণুপদ হালদার। মাত্র নয় বৎসর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল মুরারী বিহারী হালদারের সঙ্গে। কিন্তু মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি স্বামীহারা হলেন।কিছু দিনের মধ্যে পিতা- মাতা মারা যান। এমতাবস্থায় বাল্যবিধবা সত্যরানী দাদা সঙ্গীতজ্ঞ পূর্ণেন্দু হালদারের কাছেই রইলেন। এমতাবস্থায় আস্তে আস্তে তিনি অনুভব করলেন যেমন করেই হোক নারীর এই অবমাননা তাঁকে দূর করতে হবে। তাই ১২-১৩ বছরের বিধবা সত্যরানী অন্দরমহলের পর্দা ছিঁড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন বাইরের জগতে।

পড়াশুনা শিখতে শুরু করলেন বাড়ির কাছেই শ্রদ্ধেয় আশুতোষ বিশ্বাসের কাছে। শুধু পড়াশোনা নয়, তার ফাঁকে চলতে লাগলো রাজনীতির ও দেশোদ্ধারের মহড়া।[৮]

১৯২৫ সালে বাঁকুড়ায় গান্ধীজি এলেন। ওনার ভাবধারা বালিকা সত্যরানীকে আকৃষ্ট করল। ইতিমধ্যে কানাইলাল দত্ত, শৈলবালা দে'র সংস্পর্শে এসে তিনি গৃহ পরিবেশে দেশাত্মবোধ শিক্ষাও তালিম নেন। ১৯৩০ সালে সত্যরানী সরাসরি যোগ দিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। আন্দোলনপর্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩০-এর ২৬শে মার্চ বুধবার ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহী দল বাঁকুড়া সত্যাগ্রহ শিবির থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছিল মেদিনীপুর জেলার কাঁথির দিকে। সেই লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশ নিলেন সত্যরানী হালদার। প্রথম থেকেই পুলিশ নজর রাখছিল সত্যরানীর গতিবিধির উপর। কিন্তু পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হয়।[৯]

১৯৩২ সালের ৪ঠা জুলাই বন্দী দিবস উপলক্ষে বাঁকুড়া কংগ্রেস প্রচারপত্র লিখেছে "গত ৪ঠা জুলাই বন্দী দিবস উপলক্ষ্যে সোনামুখীতে হরতাল প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সত্যরানী হালদারের নেতৃত্বে ও কামিনী দেবী ও সন্তোষ কুমারী দেবীর সহযোগিতায় পুলিশ পাহারার কড়া বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও শ্যামবাজার থেকে এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা বাজারের কাছাকাছি আসিলে পুলিশ তা ভাঙিয়া দিয়া সত্যরানীর হস্তধৃত জাতীয় পতাকা ছিনিয়া লইতে চেষ্টা করিলে সত্যরানী তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিতে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। বিরক্ত হইয়া সোনামুখী থানার গোরা হাবিলদার তাঁহার ঘাড়ে সজোরে এক থাপ্পড় মারে ও কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ দেয় এবং বলপূর্বক জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া আসে। তাঁহাদের কারাবাস হয়।"[১০]

পুনরায় সত্যরানী দেবী ১৯৩২ সালে দেশব্যাপী জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নারী সংগ্রামীর পুরোধা হয়ে বন্দী হলেন পুলিশের হাতে। শাস্তি হল জেল ও জরিমানা। খানা তল্লাশি চলল তাঁর ঘরে। তাঁকে পাঠানো হল বহরমপুর জেলে। সেখানে তিনি হলেন রাজবন্দিনী।[১১] বহরমপুর জেলে তৎকালীন ৪৩ জন মহিলা বন্দী ছিলেন। তার মধ্যে বাঁকুড়ার চারজন মহিলার নাম পাওয়া যায়। বাইরের জগৎ ও অন্যান্য সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও কবিতার অক্ষরে চিঠি লিখতেন বা সংবাদ প্রেরণ করতেন। আর যারা দেখা করতে আসতেন তারা ছদ্ম পরিচয়েও আসতেন।[১২]

জেলে থাকাকালীন সময়ে বীরাঙ্গনা সত্যরানী দেবী তার অভিজ্ঞতা ব্যাক্ত করেছিলেন – "জেলে কিন্তু আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয়নি। বরং জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ছিল। ফুল ও ফলের বাগান করা, রান্না করা, খেলাধুলা ও গান-বাজনা করার সব রকম সুবিধা ও ব্যবস্থা জেল কর্তৃপক্ষ

করেছিল। তাছাড়া জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি করে খাতা,কলম ও কিছু কালিও আমরা পেয়েছিলাম খাতার ওপরে লেখা ছিল খাতা প্রাপক এর নাম,ঠিকানা,পৃষ্ঠা নম্বর ও এই খাতা হইতে কাগজ ছেড়া নিষেধ -সাবধানবাণী। সবশেষে Major,I.M.S. Superintendent স্ট্যাম্প ও সহি এসব সুযোগ সুবিধা আমরা নিয়েছিলাম হাসিমুখে। কিন্তু কাজ করতাম ভিন্ন পথে।”

সত্যরানী দেবী এই ভিন্ন পথ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যে কাজ আমরা করতাম তা পুরোপুরি স্বদেশী। যেনন, রান্নাবান্নায় থাকত বাঙালিয়ানা কলাই-এর ডাল, পোস্ত, চচ্চড়ি এবং মাঝে মধ্যে মাছ। মাংস কেউই খেতাম না। যেসব খেলা খেলতাম তা ছিল রাইফেল চালানোর কায়দা ও আত্মগোপন এবং আত্মরক্ষার কৌশল। যে গান আমরা গাইতাম তা নিঃসন্দেহে দেশাত্মবোধক। যে কথা আমরা খাতায় লিখতাম তা দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্তির শপথবাণী। সত্যরানী দেবীর স্বরচিত-স্বহস্ত লিখিত সেই খাতার একটি পাতা উপস্থাপিত করা হল

শ্রীহরি

মহাত্মার উপবাস ৮ই মে। সন ১৩।৪০

বহরমপুর জেল

"মোদের ছেড়ে যেও নাক ওগো মহাজন
তোমার আদেশ শিরে ধরে
আসছি মোরা দেশের তরে
স্বাধীনতা আনবো বলে করছি জীবন পণ
তোমার কথায় আসছি জেলে
আবার তুমিই ঘরে নিবে তুলে
তুমিই প্রভু করবে মোদের দাসত্ব মোচন
মোদের ছেড়ে যেও নাক ওগো মহাজন।......”.[১৩]

তারও আগে বহরমপুর জেলে এসেই তাঁরা পালন করেছিলেন হিজলী দিবস। প্রমাণ ঐ খাতার আর একটি ছেঁড়া পাতা

শ্রীদুর্গামাতা

হিজলী দিবস ১৬ই সেপ্টেম্বর,

সন ১৩।৩৮

সন্তোষকুমার মিত্র, তারকেশ্বর সেন উভয়ের মহাযাত্রা
“চলে গেছে দুটি মহাপ্রাণ
জানাতে – বিধাতার পদে বন্দিনী মায়ের বাথ্যা
শত শত বর্ষ ধরি পরপদ বিদলিতা

বীর পুত্র সইবে না রে, মার ব্যথা বারে বারে
রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে ঘুচাবে সে অপমান।
হাসিতে হাসিতে তাই চলে গেছে দুটি মহাপ্রাণ।
যতদূরে থাক ভাই চেয়ে দেখ একবার
বন্দিনী ভগিনীগণ দেয় শ্রদ্ধা অর্ঘভার
আজি স্মৃতি পূজা দিনে বার বার জাগে মনে
শত শত বীরপুত্র দেছে মাতা বলিদান
অসমাপ্ত কার্যভার লইয়াছে শিরে ভুলে
দেশবাসী ভাইবোন আগে দেখ দলে দলে।"[১৪]

খাতার পাতায় তিনি আরও লিখেছেন... সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনকে মায়ের কোল থেকে পরিজনের কোন থেকে ভালবাসার বন্ধন থেকে বিনা অপরাধে কাড়িয়া নিয়া বন্দী অবস্থায় পাশবিক বলে হত্যা করিয়াছে। তাহা আজ প্রত্যেকের স্মরণীয় ব্যথায় ব্যথিত করে তুলিয়াছে। কিন্তু উপায় নাই, ক্ষমতা নাই, কি করা যায় ভাবিতে গেলে মনকে ধাক্কা দেয়, ভগবানের সে নেপথ্য বাণী -বাঙ্গালার নারী আজ তোদের কিছুই নাই, আছে কেবল চোসিখের ভুল প্রাণের ব্যাথা.... আমরা নিজ হাতে ভারতবর্ষকে রাক্ষসদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের রক্তে শ্মশান করিতেছি। আজ আমাদের রক্তে তাকে পুষ্ট করতে হবে। আমরা নারী-মায়ের জাত। জড় পদার্থ সংসারের সুখেই ব্যাস্ত আছি, তাই আমাদের জড়তা ভেঙ্গে মায়ের মত অধিকার নিয়ে বাঁচতে হবে। আমরা মা-বোনেরা কি করিব নির্জীব হয়ে অপমানিত হইব, না তার প্রতিকার করিব? সারা জীবনের মোহ পাশ ছিন্ন করিয়া নিজেদের আহুতি দিয়া ভারতরূপ মহাশ্মশানে আমাদের কাম্য স্বাধীনতার জন্য ছুটে চলতে হবে।.... সংসারে সুখের নীরে ডুবে গেলে চলবে না, কখনও স্বাধীনতা আসবে না, আমরা আজ যাদের জন্য মৌন উপবাস কচ্ছি তাদেরি মত কত রত্ন পলে পলে ঝরে পড়ছে আমাদের ২০০ বৎসরে। মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন যেন মায়ের কাছে দিতে পারি ও যেন ধন্য হতে পারি। আমাদের আছে এই দেহ, তাই মাতৃপূজার বেদীমূলে এসে দাঁড়িয়েছি।"[১৫]

সত্যরানী দেবী সেলাই করতে খুব ভালবাসতেন। জেলের ভিতরেও তিনি অন্যান্য সঙ্গিনীদের নিয়ে সেলাই করেছেন। কিন্তু কিভাবে? উত্তর পাওয়া যায় তাঁর কথাতেই। তিনি বলতেন "জেলের ভিতর আমাদের লাল, কাল ও সবুজ পাড়ের মোটা কাপড়ের সঙ্গে ফুলহাতা মোটা ব্লাউজ পরতে দিত। মোটা কাপড়ের ফুলহাতা ব্লাউজ পরতে আমাদের কষ্ট হোত বলে হাতার কিছুটা অংশ রান্নাঘরের বঁটি দিয়ে কেটে ফেলতাম। পরে সেই কাটা অংশটিতে সেলাই-এর ফোঁড়ে লিখতাম

বন্দেমাতরম্
বহরমপুর মহিলা জেল
ভারতমাতার জয়
১৩।৪০ সাল

সূঁচ যদিও বহু কষ্টে যোগাড় হোত সূতো পেতাম না। তাই শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে লাল, সবুজ, কাল রং দিয়েই সেলাই করতাম।"[১৬]

সংগ্রামের গুরুত্ব অনুযায়ী দীর্ঘ দু'বছরের বন্দীদশা কাটাতে হয়েছিল সত্যরাণীকে এই বহরমপুর মহিলা জেলে। এসময় তিনি যেসব সংগ্রামী বোনেদের সাহচর্য পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন সৌদামিনী পাহাড়ী — সাং বিদুরপুর; মেদিনীপুর। সুহাসিনী দেবী – তমলুক; মেদিনীপুর। আশালতা - সেন ফরিদাবাদ- ঢাকা। সুরনা দেবী কাটোয়া-বর্ধমান। সুনীতি সেন, সন্তোষকুমারী সেন, হেনা মজুমদার, কামিনীবালা, কিরণবালা রুদ্র, শশীবালা প্রমুখেরা ছিলেন বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী প্রভৃতি অঞ্চলের। সেসময় মাতঙ্গিনী হাজরাও জেলে ছিলেন। তাঁকে সত্যরানী দেবীরা মাসীমা বলতেন। তিনি তাঁর অপূর্ব তেজ ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে জেলের বন্দিনীদের মনে দেশপ্রেম ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতেন।[১৭]

বাইরের জগৎ ও অন্যান্য সংগ্রামীদের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ হোত সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'জেলে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ও সাক্ষাৎকার ব্যাপারে ছিল দারুণ কড়াকড়ি। তবুও যাঁরা আসতেন, তাঁরা ছদ্মপরিচয়ে। চিঠি লিখতেন বা কোন সংবাদ প্রেরণ করতেন। কবিতার অক্ষরে।' একটি উদাহরণ-

আমরা বঙ্গনারী কিবা পারি অন্তঃপুরের মেয়ে
গৃহধর্ম কাজকর্ম বেড়াই সদাই বয়ে।
হঠাৎ এল আগল খোলা পাগল করা বান
সেই বানেতে ভাসিয়ে নিল সবাকার ভাই-প্রাণ ।
পশল কানে এলেন শুনে কার সে উদাস সুর
সব ছেড়ে আয় চলে সবাই যাবি অনেক দূর।
কে ডাকে গো পাগল করা কার এ করুণ বাঁশী
সদাই ভাসে চোখের পাশে কার এ অশ্রু রাশি।
কার এ বিলাপ মরমের তাপ প্রাণে এসে পশে
বন্ধ হিয়া মর্মরিয়া দহে অন্তঃশ্বাসে
তাই ত মোরা বাঁধন হারা ছুটি আঁধার পানে
সকল বাথা সইতে হেথা কারা অভিযানে।
(মোদের) প্রাচীর ঘেরা রুদ্ধকারা কি আর বেশি তাপ
মোরা শান্তিহারা লক্ষ্মীছাড়া জন্ম জন্মের পাপ।

বাঁধন ভেঙ্গে তোমায় নিয়ে মাগো ফিরতে যেন পারি
সফল জনম সফল করন পাবে বঙ্গনারী।

তোমার মাসীমা
শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী দেবী
তমলুক।

কবিতার অন্তর্নির্হিত অর্থ বুঝতেন বন্দিনীরা। ইংরেজ পাহারাদারদের চোখে ধূলো দিয়ে তারা উত্তর দিতেন কবিতার মাধ্যমে। যেমন-

"দুঃখ সাগর মন্থন শেষ ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়
কবে যে ডুবিলে অতল পাথারে
উঠিলে না আর হায় মা হায়।
মন্থনে শুধু উঠে হলাহল শিব নাই পান কে করে গরল
অমৃতভাণ্ড লয়ে আয় মাগো জ্বলিয়া মরি মা বিষের জ্বালায়।
চাই না মোক্ষ চাই না বাঁচিতে
অক্ষয় আয়ু লয়ে ধরণীতে
চাই প্রাণ চাই ক্ষুধায় অন্ন মুক্ত আলোক মুক্ত বায়........"

-শ্রীমতী সত্যরাণী হালদার।[১৮]

জেলের মেয়াদ শেষে সোনামুখীতে ফিরে স্বাধীনতার অগ্নিযুদ্ধে সমর্পিতা সত্যরানী সকলকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন-

"তোরা কে কে যাবি আগে আয়,
জননী কাতরে ডাকিছে অদূরে
কে কোথায় আছিস ছুটে আয়।
যে মায়ের কাছে ত্রিংশ কোটি ছেলে
সে-মা কেন আজ পর পদতলে
আয় ছুটে আয়, আয় দলে দলে দলে
এ যে সবারি মাতৃদায়।"[১৯]

শুধু সোনামুখী নয়, সোনামুখীকে কেন্দ্র করে তিনি অন্যান্য প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সাহায্যে আন্দোলন চালাতে লাগলেন বিভিন্ন জায়গায়। যেমন— ডিহি পাড়া, ধুলাই, পিয়ারবেড়া, হামির হাবী, মানিক বাজার, ধনসিমলা, পাঁচাশ, কোচডিহি, পূর্ব নবাসন, রাধামোহনপুর, জগমোহনপুর, বেতুড়, পাখন্না, বন্দনাহাটী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস প্রভৃতি গ্রামে গেছেন আন্দোলন জোরদার করতে। সেখানে মিটিং করেছেন, পিকেটিং করেছেন, যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন সভা-সমিতিতে। লবণ আইন অমান্য করে নিজ হাতে লবণ তৈরি করে তা বিক্রি করেছেন ছোটো এক প্যাকেট ১০ টাকা দামে। বিক্রির অর্থ দান করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মযজ্ঞে। রিভলবার চালনা করেছেন গুপ্ত সমিতিতে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি নরনারীকে সচেতন করেছেন দেশপ্রেমে।

উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশসেবায়, এবারের জন্য তাঁকে বহুবার জেল খাটতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানবিক অত্যাচার।[২০]

জেলা গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায় সত্যরানী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে মার্চ সোনামুখী শহরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শহরের কয়েকজন দোকানদারের বিরুদ্ধে যে ‘Distress warrant' বা ক্রোক পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল তা কার্যকর করার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তব্য রাখেন ও জনগণকে দোকানদারদের ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।[২১]

১৯৩৮ সালে ২৯শে জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সত্যরানী ছিলেন সক্রিয় কর্মী। সভানেত্রী ছিলেন লাবণ্যলতা চন্দ্র। এছাড়া নেতাজীর সোনামুখী আগমন উপলক্ষ্যে সংগ্রামী ভাইবোনদের সংঘবদ্ধ করার কাজে সত্যরানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এসময় তাঁর কাজে সঙ্গী হিসেবে সাহায্য করেছিলেন শচী দেবী। দেশের তখন উত্তাল অবস্থা, সে সময় সোনামুখীতে কিছু স্বদেশি পত্রিকা প্রচার হত। 'বঙ্গদর্শন', 'ধর্মকারার কর্ণ', 'নবশনি' প্রভৃতি নিষিদ্ধ পত্রিকার খোঁজে প্রায় ৩০০ পুলিশ স্থানীয় সংগ্রামী রাধিক প্রসাদ ঘরের বাড়ি ঘেরাও করলে সত্যরানী অক্লেশে বাড়ির বধূ সেজে রান্না করার অছিলায় সংগৃহীত পত্রিকাগুলি পুড়িয়ে ফেলেন। পাশাপাশি সোনামুখীর নীলকুঠী শ্রমিকদের মধ্যেও আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে তাদের কাছ থেকে মাসিক ২ পয়সা হারে চাঁদা তুলে তা জেলার কংগ্রেস কার্যালয়ে পাঠানোর কাজেও সত্যরানীর যথেষ্ট তৎপরতা ছিল। তাছাড়া সোনামুখীর মনোহরতলায় 'ব্যান্ডিড চার্জ' করার অপরাধে মিলিটারি ঘেরাও অ্যাকশনে সত্যরানী দেবী ধরা পড়েন এবং মিলিটারের হাতে মারও খান। কিন্তু তাতেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। বরং তার অন্তরে জেগে ওঠে ইংরেজ অত্যাচারের জ্বালা ও দেশমাতৃকার মুক্তি আন্দোলনের তীব্র সংগ্রামী চেতনা।[২২]

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেন না। তিনি গঠনমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করলেন। তিনি নিজের বাড়িতেই একটি বালিকা বিদ্যালয় খুললেন। ১৯৪২-এর ১২ই জানুয়ারি সোনামুখী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা শিক্ষক পদে নিযুক্ত হলেন। শিক্ষাদান করতে করতে ক্রমশঃ তিনি গড়ে তুললেন একটি 'নারীশিক্ষা সমিতি'। ৩৪ জন সদস্যা নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪শে জুলাই তিনি এই সমিতির কার্যভার গ্রহণ করলেন। পরে একটি 'মহিলা সভা'-ও গঠন করেছিলেন। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতির তিনি সদস্যা ছিলেন দীর্ঘদিন।[২৩]
১৯৯৩ সালের ২৬শে জানুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে আজীবন সংগ্রামী মহীয়সী বীরাঙ্গনা সত্যরানী হালদার তাঁর জন্মভূমি সোনামুখীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৪]

জাতীয় আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার মহিলাদের এই সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঁকুড়া জেলার গৌরব বৃদ্ধি করেছে তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী একজন নারীও

ব্রিটিশ পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে মুক্তিক্রয় করেননি। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনপর্বে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে নারীরাও দেশের মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্বস্তরের মহিলারা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।এদের মধ্যে বীরাঙ্গনা সত্যরানী হালদার ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল।তার বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল অতুলনীয়। বাঁকুড়া জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনকারী মহিলাদের অনেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে কারাবরণ করেছেন আবার অনেকে পরোক্ষভাবে আন্দোলনকারীদের গোপনে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি সমগ্র জেলায় আন্দোলনে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এই আত্মত্যাগ বহু ক্ষেত্রেই অনালোচিত থেকে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম, 'জাগরন বনাম জাগরণ: বাঁকুড়ায় নারী মুক্তির অপ্রকাশিত অধ্যায়' *বাঁকুড়া পরিচয়,* তৃতীয় খন্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ:৩৭৩।

২. বাঁকুড়া জেলা মহিলা সম্মেলন, *প্রবাসী* (আলোচনা) আশ্বিন, ১৩৪৬ পৃ: ৮১৯।

৩. চৌধুরী, শ্রী রথীন্দ্রমোহন, *বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি,* ফার্মা কে. এল. এম. প্রা:লি:, কলকাতা, আগস্ট,২০০২ ।

৪. দাশগুপ্ত, কমলা, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ: ২৭৬-২৭৭।

৫. Ghosh, Dr. Niranjan, *Role of Women in the Freedom Movement in Bengal (1919-1947),*Tamralipta Prakashani, Midnapore, 1988, p. 276.

৬. চৌধুরী, শ্রী রথীন্দ্রমোহন, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ,* পৃঃ ২৬২

৭. Ghosh, Dr. Niranjan, *Op. Cit.*, p. 17-18

৮. দাস, শৈলেন, মণ্ডল, নমিতা, চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রশেখর (সম্পাদিত), *স্বাধীনতা ইতিহাসে বাঁকুড়ার সংগ্রাম ও সংগ্রামী ভূমিকায়—ফিরে দেখা,* বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি অকাদেমি, দোলতলা, বাঁকুড়া, জানুয়ারি, ২৬, ১৯৯৮, পৃঃ ৬১-৬২।

৯. *তদেব,* পৃঃ ৬৩।

১০. *বাঁকুড়া কংগ্রেস প্রচারপত্র,* সংখ্যা- ২৫, ১৬ই জুলাই ১৯৩২, পৃঃ ৩।

১১. দাস, শৈলেন, মণ্ডল, নমিতা, চক্রবর্তী, গিরিন্দ্র শেখর (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত গ্রন্থ,* পৃঃ ৬৩।

১২. *তদেব,* পৃ:৬৬।

১৩. *তদেব,* পৃ:৬৩-৬৪।

১৪. *তদেব,* পৃ:৬৪-৬৫।

১৫ *তদেব,* পৃ:৬৫।

১৬. *তদেব,* পৃ:৬৬।

১৭. *তদেব*।

১৮. *তদেব,* পৃ:৬৬-৬৭

১৯. *তদেব,* পৃ:৬৮

২০. *তদেব,* পৃ:৬৭-৬৮

২১. চৌধুরী, শ্রী রথীন্দ্রমোহন, *পূর্বোক্ত গ্রন্থ,* পৃ: ২৬১।

২২. দাস, শৈলেন, মণ্ডল, নমিতা, চক্রবর্তী, গিরিন্দ্র শেখর (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত গ্রন্থ,* পৃঃ ৬৯-৭০।

২৩. *তদেব,* পৃ:৭০।

২৪. *তদেব,* পৃ:৭১।

বিহু : একটি অনবদ্য কাহিনী

লোপামুদ্রা চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ,
মেমারি কলেজ; পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ : সকল অসমীয়াই অসমীয়া ভাষায় কথা বলে। এই ভাষা সবার বোধগম্য। কিন্তু আসামের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সরকারি ভাষা এবং সাধারণ অসমীয়া ভাষাই একমাত্র প্রামাণিক। স্বাধীনতার আগে ও পরে আসামে যারা এসেছেন এবং বসবাস করেছেন তারাও এই ভাষা গ্রন্থ করেছেন। সাধারণতঃ আমরা বলি যারা অসমীয়া ভাষায় কথা বলে তারা সাধারণত অসমীয়া। কিন্তু আসামে বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠী বাস করে এবং তাদের সামাজিক-সংস্কৃতিও ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান প্রতিবেদনে আসাম রাজ্যের আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সন্ধান দেওয়া হয়েছে - আহোম, বোড়ো, রাভা, বারাহি, সুতিয়া, মরান, জেমি নাগা, কুকি ইত্যাদি। সেই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি খুঁজে পেতে হলে প্রথমে আসামের লোকদের সম্পর্কে জানতে হবে। বিশ্ব জানে আসামের সংস্কৃতি হল 'বিহু', যা আসামের 'জাতীয় উৎসব নামেও পরিচিত।
সূচক শব্দ : বিহু, অসমীয়া, সামাজিক-সংস্কৃতি, আহোম, বোড়ো, রাভা, বারাহি, সুতিয়া, মরান, জেমি নাগা, কুকি ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান প্রতিবেদনে আসাম রাজ্যের আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের বৈচিত্র্যময় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সন্ধান দেওয়া হয়েছে যেমন - আহোম, বোরো, রাভা, বারাহি, সুতিয়া, মরান, জেমি নাগা, কুকি ইত্যাদি। সেই বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি খুঁজে পেতে হলে প্রথমে আসামের মানুষদের সম্পর্কে জানতে হবে। সাধারণতঃ আমরা বলি যারা অসমীয়া ভাষায় কথা বলে তারাই সাধারণত অসমীয়া। কিন্তু আসামে বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠী বাস করে এবং তাদের সামাজিক-সংস্কৃতিও ভিন্ন। বিশ্ব বোঝে আসামের সংস্কৃতি হল 'বিহু', যা আসামের 'জাতীয় উৎসব' নামে পরিচিত। স্বাধীনতার আগে ও পরে আসামে যারা এসেছেন এবং বসবাস করেছেন তারাও এই ভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। শর্মিষ্ঠা দে বসু-এর বই 'বিহু'-এর ৭৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যে এটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত একটি ইন্দো-আর্য ভাষা। অসম ইতিহাস বিচার করা হয় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র, শিলালিপি, কিংবদন্তি ইত্যাদির অনিশ্চিত, অসংগঠিত তথ্যের ভিত্তিতে। আহোম উপজাতি আসাম শাসন করার পরে, আসামের ইতিহাস একটি সুসংগঠিত এবং সু-নথিভুক্ত আকারে দেখা যায়, যার অর্থ ১২২৮ খ্রিস্টাব্দের আগে আসামের ইতিহাসে কোন ধারাবাহিকতা ছিল না।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে আসামের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমে কিরাত, কছারি, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি উপজাতির ইতিহাস জানতে হবে- যার কোনো লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। তথাপি, আসামের নৃতাত্ত্বিকদের অভিমত যে, সেই সময়ে আসাম ছিল পূর্ব কামরূপের বৃহত্তর মঙ্গোলীয় উপজাতিদের বাসস্থান এবং এছাড়াও তিব্বতি-বর্মী, ইন্দো-চীনা, দ্রাবিড়, নেগ্রিট, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ইত্যাদির বিচরণক্ষেত্র ছিল।

'বিহু' সম্পর্কে কিছু বলার আগে, আমাদের আসামের ২৭টি প্রধান উপজাতির নাম জেনে নেওয়া উচিত এবং আসামের এই উপজাতিগুলির দীর্ঘস্থায়ী সংস্কৃতি, রীতিনীতি ইত্যাদি বোঝা উচিত। উপজাতিগুলো হলো- আহোম, বোরো, রাভা, বারাহি, সুতিয়া, মরান, নাগা, কুকি, মিরি (মিসিং), মণিপুরী, মিকির (কারবি), হোজাই বা হাজং, লালুং, খাসিয়া, হাজং, টিয়া, গারো, কোচ, সোনোয়াল, ঠেকোল, টিপরা, শরনিয়া, মটক, মদাহি, খামতি, দেউরি, কাছারি। এখানে বলা যেতে পারে যে 'বিহু' আসামের একটি মিশ্র সংস্কৃতি; 'বিহু'-এর লোককাহিনী, রীতিনীতি, নৃত্য, গান, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একটি অমূল্য অবদান। নিবিড়ভাবে পরিদর্শন করলে দেখা যাবে যে, উপরোক্ত উপজাতিদের মধ্যে 'বিহু' এবং নৃত্য, গানেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লোককাহিনী, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি এই স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে; অন্যদিকে, এই সমস্ত উপজাতির মধ্যে, সামগ্রিকভাবে কিছু সংস্কৃতি আসামের জনজীবনে গভীরভাবে জড়িত। অসমের নৃত্য-গীতকে আমরা সাধারণত 'বিহু' নামেই জানি। কিন্তু আসাম জুড়ে তিন ধরনের 'বিহু' আছে এবং এই তিন ধরণের 'বিহু'-এর সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি জড়িত। আসামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এটি কৃষিকে কেন্দ্র করে একটি উৎসব। আহোম রাজার সময় থেকে 'বিহু' রাজদরবারে একটি আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং পরবর্তীতে, অর্থাৎ বর্তমান আসামের মানুষের কাছে 'বিহু' জাতীয় উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও উপরোক্ত তিন ধরনের 'বিহু' অনুষ্ঠান প্রধানত আচার-অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত, তথাপি উপজাতিদের মধ্যে সেসব আচার পালনের পদ্ধতি বা রীতি ভিন্ন। তাই এই তিন প্রকার 'বিহু' তিন প্রকারের 'রস' দ্বারা করা হয়। যেমন- 'রঙালী বিহু' মূলত 'শৃঙ্গার রস' কেন্দ্রিক; 'মাঘ বিহু' বা 'ভোগালি বিহু'-এর 'রস' হল 'রুদ্র রস' কেন্দ্রিক যা ক্ষয় ও ক্ষতিকে ধ্বংস করে; 'কাটি বিহু-এর 'রস' হল 'শোক'।

আসাম রাজ্যকে যদি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়- যেমন উচ্চ আসাম, মধ্য আসাম এবং নিম্ন আসাম, তাহলে লক্ষ্য করা যায়, সমগ্র আসাম রাজ্যে বিভিন্ন উপজাতি কোথাও কম এবং কোথাও বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং বেশিরভাগ অসমীয়া উপজাতি মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর বংশধর। এই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও, কিছু বর্ণ হিন্দু, তফসিলি জাতি এবং মুসলিম অসমীয়াও রয়েছে। তবে, এরা সবাই আসামের বাসিন্দা তা বলা যাবে না; প্রত্যেকেই ভারত বা কাজের জন্য ভারতের বাইরের অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছেন। হিন্দুধর্মে, এই বর্ণপ্রথা একটি অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত

ঐতিহ্যের দ্বারা আবদ্ধ; কিন্তু অসমীয়া নৃতাত্ত্বিকবিদ্যা অনুযায়ী মিশ্রণটি এতটাই বেশি যে বর্ণপ্রথায় খুব বেশি দৃঢ়তা নেই। অসমীয়া সংস্কৃতির সাধারণত দুটি ভাগ রয়েছে - উত্তর আসাম সংস্কৃতি, সমাজ এবং সভ্যতা এবং দক্ষিণ আসাম বা নিম্ন আসাম সংস্কৃতি, সমাজ এবং সভ্যতা। আসামের এই সভ্যতার ধারক ও বাহক উপজাতিগুলির মধ্যে 'বিহু'-এর প্রধান ভঙ্গিমা এবং গাওয়ার কৌশল আদি লোকগীতি ও নৃত্যে পাওয়া যায় এবং 'বিহু'-এর আদি বাদ্যযন্ত্রগুলির পরিচয়ও পাওয়া গিয়েছিল এই উপজাতিদের মূল লোকগান এবং নৃত্য থেকে। এখানে 'বিহু' নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল আসামের 'বিহু' বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করে। কিন্তু যেহেতু এই স্বল্প পরিসরে এই বৃহত্তর বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয় তাই এই ছোট নিবন্ধে, আমি আসামের দুইটি উপজাতির 'বিহু-উৎসব' পালনের উপর আলোকপাত কোরবো যেগুলি হল - রাভা উপজাতি, মিরি বা মিসিং উপজাতি।

রাভা উপজাতিঃ

রাভা উপজাতি হল 'মঙ্গোলয়েড' প্রজাতির অন্তর্গত 'বোড়ো' উপজাতির একটি শাখা। এই উপজাতি কখন এবং কীভাবে আসামে প্রবেশ করেছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জি.ভি. হাডসন, ভারতীয় উপজাতির সাথে সম্পর্কিত বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ১০৫-এ উল্লেখ করেছে যে রাভা উপজাতি 'বোড়ো উপজাতি'-এর একটি শাখার অন্তর্গত। এই পাঠ্যটিতে দুটি উপজাতির মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় এবং শারীরিক সামঞ্জস্যতারও উল্লেখ রয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে রাভা উপজাতি-এর আদিম আবাসস্থল ছিল গারো পাহাড়ের 'এঢোলিয়া' অঞ্চলে। তাদের অভিমত যে 'রাভা' নামটি একটি অনিশ্চিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত নির্ণয়। কারণ 'দারং' জেলার রাভা উপজাতিরা নিজেদেরকে 'টোটলা' এবং 'দাদিয়াল কাছারি' হিসেবেও পরিচয় দেয়। বিভিন্ন উপজাতি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করে ড. ভুবনমোহন দাস মন্তব্য করেছেন যে রাভা উপজাতি-এর সাথে 'গারো উপজাতি'-এর অনেক মিল রয়েছে। এই উপজাতিগুলি বিভিন্ন সময়ে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা থেকে এসেছে বলে জানা যায় এবং নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছিল (The Ethnic Affinities of Rava; pp. 116-117)। রংদানি, মাইতোরি, পাটি এবং ডাহুরি হল রাভা উপজাতি-এর চারটি প্রধান বিভাগ। বিটিলিয়া, দামাচা, মাদাহি, হানা, টোটলা ইত্যাদির মতো অনেক ছোট উপ-শাখাও রয়েছে। যোগেন্দ্র জাভাস্থোরের 'রাভা জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ছোট দলগুলি নিজেদেরকে 'গারো' বলে পরিচয় দিয়েছে অবস্থান বা অঞ্চলের প্রেক্ষিতে। গ্রন্থটিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে রংদানি এবং মাইতোরি শাখা ছাড়াও অন্য দুটি শাখার 90% লোক হিন্দু।

এইবার আসা যাক রাভা উপজাতির মধ্যে রঙালী বিহু উৎসব কিভাবে ধর্মীয় রীতি-নীতি সহকারে পালিত হয়ে থাকে সেই আলোচনায়। এই উপজাতির মধ্যে 'বিহুগীত' কে বলা হয় 'ছাতার গীত'। অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে যেমন তিন ধরনের

'বিহু উৎসব' পালিত হয়, তেমন রাভা উপজাতির মধ্যে তিন ধরনের 'বিহু উৎসব' পালিত হলেও 'রঙালি বিহু'-এর প্রাধান্য বেশি লক্ষ্য করা যায়। রাভা উপজাতি-এর নারী-পুরুষেরা 'রঙালি বিহু'-তে এই 'ছাতার গীত' গেয়ে ঘরে ঘরে আনন্দ করে 'লেবা টানা' অর্থ্যাৎ 'লেবা' মানে গাছের লতা এবং 'টানা' মানে টানাটানি করা। এই লতা টানা রাভা উপজাতির একটি মজার খেলা। এসব উপজাতির মধ্যে 'লেবা' অর্থাৎ লতাকে ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। 'ছাতার গীত' হল 'বিহুগীত'-এর মতোই প্রেমের গান। কিছু 'ছাতার গীত' 'বিহু গীত'-এর সঠিক অনুবাদ বলে মনে হয়। এই 'ছাতার গীত', 'বায়খু উৎসবে' গাওয়া হয় যা 'রঙালি বিহু' উৎসব শেষ হওয়ার পর খুব ধুমধামের সাথে পালিত হয়। 'বায়খু উৎসব' সাধারণত বৃষ্টি হলে পালিত হয় এবং শস্যের দেব-দেবীদের বলিদান সহযোগে পূজা করা হয় এবং 'লেবাটানা' রীতিটিও এই পূজার একটি অংশ। 'ছাতার গীত' দুই প্রকার – 'জ্ঞাতিনী ছাতার' এবং 'চোট কামিনী ছাতার'। যদিও 'জ্ঞাতিনী ছাতার' গানগুলিতে যৌন আবেদনময় বাণীর সাথে কিছু মার্জিত তথ্য এবং তত্ত্বও এতে গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। 'চোট কামিনী ছাতার' গানে মুক্ত মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'ছাতার গীত' হল রাভা উপজাতির নারী-পুরুষের হৃদয় ও মনের আনন্দগান। এই উপজাতির লোকেরা চিরকালই 'ছাতার গীত'-এর সুর এবং স্টাইলাইজেশনের মাধুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।''বিহু গীত' প্রতিটি অসমীয়া উপজাতির কাছে যেমন প্রিয়, তেমনই এই 'বায়খু উৎসব'-এর 'ছাতার গীত' রাভা উপজাতির সামাজিক জীবনের একটি অত্যন্ত প্রেমময় প্রেমের গান।

মিসিং উপজাতিঃ

মিসিং উপজাতির মানুষরা পাহাড়ি উপত্যকা থেকে নেমে এসেছেন কিনা তার কোনো সঠিক তথ্য নেই (লীলা গগৈ, মিসিং সোশিও কালচারাল লাইফ অফ এবুমুকি মুরং, সম্পাঃ জওহর জ্যোতিকুলি, মুখবন্ধ সংখ্যা - জানুয়ারী ১৯৮৫)। তরুণচন্দ্র পামেগামের মতে, 'মিরি' নামক একটি উপজাতি চুতিয়া রাজবংশের শেষ এবং আসামের আহোম রাজবংশের শুরুর মাঝামাঝি পর্বত উপত্যকা থেকে নেমে এসেছিল বলে জানা যায় ('মিরি বা মিসিং', দি পিউপিল অফ আসাম; সম্পাঃ পি. সি. ভট্টাচার্য; পৃষ্ঠা নং ১৫৫)। স্বর্গীয় আহোম রাজা 'চুহুংমুং' (১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রীঃ) শদিয়া রাজ্য ভেঙ্গে আসামের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অধিবাসীদের প্রতিষ্ঠা করেন। মিসিং উপজাতিরা পরবর্তীতে লখিমপুর, শিবসাগর প্রভৃতি জেলায় স্থানান্তরিত হয় (লীলা গগৈ, প্রাগোক্ত প্রবন্ধ; সংস্করণঃ জওহর জ্যোতিকুলি) এবং মিরি উপজাতিরা নিজেদেরকে মিসিং উপজাতি বলে পরিচয় দেয়। তিব্বতি ভাষায় 'মিরি' শব্দের অর্থ 'পাহাড়ি মানুষ'। সাধারণতঃ দেখা যায় বহিরাগতরা যেকোনো জাতিকে তাদের সাধারণ নামে ডাকা হয়। নিজেদের মিসিং উপজাতি বলে পরিচয় দিয়ে এই পাহাড়ি মানুষেরা তিব্বতের অধিবাসীদের 'মিরি' বলে ডাকত; তবে এটা সত্য যে মিসিংরা তিব্বতের দিক থেকে এসে অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় বসবাস শুরু করে তাই আজও অরুণাচল প্রদেশের মানুষের ভাষা ও

সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। পাহাড়ি উপজাতিদের মধ্যে 'আদি' পুরোহিতদের অর্থাৎ উপাসকদেরকে উপাসকগণ 'মিরি' বলা হয়। এই 'আদি' উপজাতি সংস্কৃতির সাথে জড়িত মিসিং উপজাতিকে পাহাড়ি উপত্যকার লোকেরা 'আদি' উপজাতির 'ককাই-ভাই' (বড় ভাই) বলে (লীলা গগৈ, Op. cit.)। অনেকেই আসামের 'মিরি' জনগণকে উড়িষ্যার 'মিরিয়া' বা 'মিলিয়া'-এর সাথে তুলনা করেন। মিসিং উপজাতি প্রধানত বাসস্থান এবং বিভিন্ন কারণে নয়টি বিভাগে বিভক্ত; সেই বিভাগগুলো হল- ছায়েঙ্গিয়া, আয়েঙ্গিয়া, মোয়েঙ্গিয়া, দেলো, তায়োতায়, পাগার, ডাম্বুক, চামগুরিয়া এবং তামার (তরুণচন্দ্র পামেগাম, পূর্ববর্তী নিবন্ধ)।

মিসিং উপজাতির মানুষ বিহুপ্রেমী। তারা উচ্চ আসামের অন্যান্য উপজাতির মতো বহাগ বিহুর রঙ এবং আনন্দ উদযাপন করে। 'হুঁচরি' স্তোত্র এবং 'বিহুনাম'-এ ভাঙা ভাঙা অসমীয়া শব্দ ব্যবহার করে এই উপজাতির মানুষ। সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে নারী-পুরুষ 'হুঁচরি'তে অংশগ্রহণ করে। এই উপজাতির মানুষদের মধ্যে 'বিহু' একটি নতুন সংস্কৃতি হলেও 'বিহু'-এর প্রাকৃতিক রঙ ও আনন্দ এরা উপভোগ করে। এই বিহুপ্রেমী সমাজে 'বিহুগীত'-এর মতো প্রিয় গান 'ঐনিতাম'। এই গানে মিসিং উপজাতির মানুষরা অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে তাদের ঘরোয়া জীবনের কথা বলেছেন। মিসিং উপজাতির মানুষ সহ সমস্ত অসমীয়া মানুষ এই গানের সুরের জাদুতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এই জনগণের নৃত্যেরও বিভিন্ন দিক রয়েছে এবং তাদের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্রতাও লক্ষ্য করা যায়। এই লোকনৃত্যের একটি তাত্ত্বিক বিন্যাস রয়েছে; ছন্দের তীক্ষ্ণ এবং গম্ভীর গতি নিয়মিত এবং পরিকল্পিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার মাধুর্য অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কিন্তু এই নৃত্যটি লোকজীবনের একটি অবচেতন ঐতিহ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। মিসিং উপজাতির মানুষরা এই নাচকে 'চমান' বলে। এছাড়াও এই উপজাতির মানুষের আদিম নৃত্যের নাম 'চেল্লয়া'। যখন তারা পাহাড়ের উপত্যকা থেকে সমতল ভূমিতে ভ্রমণ করত, তখন তারা 'চেল্লয়া' নামে এই নৃত্যটি পরিবেশন করত সাথে গান গাইত এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না করে মাটিতে দুমদুম করে হাত দিয়ে আঘাত করে আওয়াজ করত। এছাড়াও 'জুম্ চাষ' পদ্ধতি অনুসৃত নৃত্যকে বলা হয় 'আরিক ইনাম'; তাঁতে তাঁতিরা যে নৃত্য পরিবেশন করে তাকে বলা হয় 'বিপাক আরিক'; পুরোহিত নৃত্য 'মিবু চমান'; শিকারি নৃত্য 'আ-ও আপনাম' ইত্যাদি ('বিহু'; শর্মিষ্ঠা দে বসু; পৃ. ১৩৩)।

যেহেতু সমস্ত উপজাতির মানুষদের নিজস্ব উৎসব রয়েছে, তাই বসন্তে 'বহাগ বিহু'-এর সময় মিসিংদের কৃষি লৃগাং উৎসব উদযাপিত হয় যার নাম 'আলিয়াইলৃগাং' বা 'আলি-ই-লিগাং'। এই উপজাতির সবচেয়ে বড় উৎসব এই উৎসব। এই উৎসবটি বসন্ত ঋতুর সাথে জড়িত এবং বসন্ত ঋতুর আগমনের পরে উদযাপিত হয়। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার এই উৎসব পালিত হয়। প্রাচীনকাল থেকে কৃষিজীবী হওয়ায়, এই উপজাতির মানুষরা বসন্তের ঠিক আগে ফসল তোলার জন্য দেবতার

কাছে প্রার্থনা করে এই উৎসবটি পালন করে। 'আলিয়াই' মানে মাটির নিচে ফসলের বীজ এবং 'লিগাং' মানে প্রথম ফসলের বপন। বসন্তের শুরুতে যখন গাছে নতুন মুকুল আসে, আমের বোল হয়, প্রকৃতি হয়ে ওঠে সুন্দর। এই ঋতুতে প্রকৃতির সুরক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে ফসল রোপণের উৎসব এবং সেই উপলক্ষে তারা মাঠে ও বাড়ির প্রাঙ্গণে নাচ-গান করে। তখন ভালোবাসা আর প্রকৃতিকে গাছের দুটি ডাল মনে হয়। প্রকৃতির এই মধুর স্নেহময় পরিবেশে প্রকৃতির হারিয়ে যাওয়া যৌবন আনন্দে ফুলেফেঁপে ওঠে। মিসিংরা প্রকৃতি ও ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে গান গেয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাগুলো শেয়ার করে একে অপরের সাথে। এই প্রেমের গান এবং এর সাথে যে নৃত্য হয় তাকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় 'ঐনিতাম' যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই নৃত্য পরিবেশনের সময় তারা ঢোল, তাল, কাঁসি, পেঁপে, টকা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে এবং আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই 'বিহুগীত'কেই মিসিংরা বলে 'ঐনিতাম' বলে।

তথ্যসূত্রঃ

১. দে বসু, শর্মিষ্ঠা; 'বিহু'; লোক সংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র; কলকাতা ২০১৪।
২. ডঃ গগৈ, লীলা; 'আসাম সংস্কৃতি'; বনলতা পাবলিকেশন্স; গুয়াহাটি ২০১৫।
৩. চক্রবর্তী, মহাদেব; 'উত্তর-পূর্ব ভারতঃ তারপর এবং এখন'; প্রগতিশীল প্রকাশনা; কলকাতা ২০১৬।
৪. দাস, যোগেশ; আসামের লোকসংস্কৃতি'; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট; কলকাতা ১৯৩০।
৫. গগৈ, হেম (সম্পাদনা); 'বিহুর রূপ ও রূপান্তর'; ড্র-বেন্ড পয়েন্ট অফ সেল পাবলিকেশন্স; গুয়াহাটি ২০১৩।
৬. ডঃ বড়ুয়া, হেমন্ত কুমার; 'বিহুর উৎস ও ঐতিহ্য'; SH Educational NYAS পাবলিকেশন্স; গুয়াহাটি ২০১৩।
৭. বরকটকি, সত্যেন; 'আসাম'; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া; কলকাতা ১৯৮০।
৮. ডঃ গগৈ, লীলা; 'বিহুঃ একটি সমীক্ষা'; বনলতা পাবলিকেশন্স; গুয়াহাটি ১৯৬৯।
৯. মিশ্র, বিনা; 'উত্তর পূর্বের সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্য'; পুনশ্চ পাবলিকেশন; গুয়াহাটি ২০০৪।
১০. স্বামী, অভেদানন্দ; 'ভারত এবং তার সংস্কৃতি'; শ্রীরামপুর বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত; কলকাতা ১৯৭৯।

বাজার-সফল দুই গোয়েন্দা কাহিনির লেখক ও তাঁদের বিপণন কৌশল

বর্ণালী পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : শ্রুতকীর্তি গবেষক সুকুমার সেন তাঁর 'ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি' গ্রন্থের 'কৈফিয়ৎ' অংশে মানুষের 'শিল্প-কল্পনাকে' 'বৃক্ষের' উপমা দিয়ে সেই বৃক্ষের প্রথম উদ্‌গত শাখাগুলির অন্যতম হিসেবে শিকারচিত্র এবং গোয়েন্দা গল্পকে চিহ্নিত করেছেন। সুকুমার সেনের প্রাতিস্বিক চিন্তাপ্রসূত এই মন্তব্য থেকে গোয়েন্দা কাহিনির শিকড় এবং এর প্রাচীনতা বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। তবে প্রাগুক্ত সমালোচক কথিত একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে আধুনিক অর্থে গোয়েন্দা কাহিনি বলতে আমরা যা বুঝি তার যথার্থ সূচনা হয় পুলিশি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেই। ভারতীয় তথা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব সমানভাবে প্রযোজ্য। বাংলায় মৌলিক গোয়েন্দা কাহিনির পথিকৃৎ হলেন প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিজলী'তে প্রকাশিত তাঁর 'ডিটেক্‌টিভ পুলিস' থেকে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পথ চলা শুরু হয়। 'দারোগার দপ্তর'-খ্যাত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের পর শরচ্চন্দ্র দেব সরকার, পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণা' ও 'কুমারিকা' সিরিজের স্রষ্টা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, পরাশর-স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, 'এক ও অদ্বিতীয়' শ্রীস্বপনকুমার, সত্যজিৎ রায়, সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, 'মিতিন মাসি'র লেখক সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র রচয়িতা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা নিজেদের স্বকীয়তায় একশো বছরেরও অধিক পুরাতন এই সাহিত্য-সংরূপটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। একবিংশ শতাব্দীতেও এই সৃষ্টি-পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের এই যে সুদীর্ঘ ইতিহাস, তার প্রারম্ভিক পর্বের দু'জন উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়। তাঁরা উল্লেখযোগ্য এই কারণেই যে, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি যখন সাহিত্যের স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ খুঁজছিল, তখন পূর্বোক্ত দুই সমসাময়িক লেখক গোয়েন্দা কাহিনিকে পাঠকপ্রিয় ও বাণিজ্য-সফল করে তোলার অভিপ্রায়ে কিছু অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, যা বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির 'বাজার' এবং বিপণনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। জনসাধারণের কাছে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিকে গ্রহণযোগ্য এবং বাজার-সফল একটি 'পণ্য' হিসেবে পরিবেশন করার ক্ষেত্রে পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়ের অবদান পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: গোয়েন্দা কাহিনি, পাঠক, পাঠরুচি, জনসাধারণ, চাহিদা, বাজার, পণ্য, বিজ্ঞাপন, বিপণন কৌশল।

মূল আলোচনা:

প্রকৃতপক্ষে বাংলায় গোয়েন্দা উপন্যাস লিখে যশস্বী হয়েছিলেন পাঁচকড়ি দে(১৮৭৩-১৯৪৫)।[১] ‘শুধুমাত্র গোয়েন্দা কাহিনি লিখেই তিনি গাড়ি বাড়ি হাকিয়ে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিলেন লেখকমহলে।’[২] পাঁচকড়ি দে শরচ্চন্দ্র দেব সরকারের ‘গোয়েন্দা-কাহিনী’ পুস্তকমালার একজন সম্ভাব্য লেখক ছিলেন।[৩] এর পাশাপাশি ‘সমালোচনী’[৪] পর্বেও শরচ্চন্দ্রের সহযোগী লেখক হিসাবে পাঁচকড়ি দে’র কাজ করার কথা জানা যায়। ‘সমালোচনী’ পত্রিকাতেই পাঁচকড়ি দে’র প্রথম মৌলিক গোয়েন্দা গল্প ‘চিঠি চুরি’ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গোয়েন্দা কাহিনির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ করে প্রখর ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লেখক পাঁচকড়ি দে যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে বাজারে প্রতিপত্তি ধরে রাখতে গেলে চাহিদামাফিক জোগান দিয়ে যেতে হবে। চাহিদা এবং জোগানের মধ্যকার সমানুপাতিক সম্পর্ককে অনুধাবন করে জোড়াসাঁকোর ৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনে ‘পাল ব্রাদার্স’ নামে বইয়ের দোকান ও বাণী প্রেস বসান তিনি এবং গোয়েন্দা কাহিনির সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিলেতি ঢঙে তৈরি করেন লেখকদের সিণ্ডিকেট। বস্তুত বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ধারায় পাঁচকড়ি দে’র প্রতিপত্তির মূল এখানেই নিহিত। প্রায় তিরিশটি বই পাঁচকড়ি দে’র নামে প্রকাশিত হলেও অনেক বইয়ের তিনি ছিলেন সম্পাদকমাত্র। পাঁচকড়ি দে’র এরকম একজন ‘Ghost Writer’ ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ পাল। তাঁর কৃতিত্বের অনেকখানিই ধীরেন্দ্রনাথ পালের প্রাপ্য বলে মনে করেন আলোচক সুকুমার সেন।[৫] পাঁচকড়ি দে ‘প্রণীত’ এবং ‘সঙ্কলিত’ বইগুলি হল ‘মায়াবিনী’[৬](এপ্রিল-মে, ১৮৯৯), ‘মনোরমা’,‘মায়াবী’(১৯০১), ‘জীবন্মৃত-রহস্য’[৭](১৯০৩), ‘নীলবসনা সুন্দরী’(১৯০৪), ‘রহস্য-বিপ্লব’(১৯০৪), ‘পরিমল’, ‘কালসর্পী’, ‘গোবিন্দরাম’, ‘হত্যাকারী কে?’, ‘ভীষণ প্রতিহিংসা’, ‘লক্ষ টাকা’ ইত্যাদি। পাঁচকড়ি দে’র গোয়েন্দা রচনা সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকদ্বয়ের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> প্রিয়নাথবাবু লিখতেন অভিজ্ঞতার গল্প, আর পাঁচকড়িবাবু শুরু করলেন কল্পনার রঙ চড়ানো কাহিনী। পাঁচকড়িবাবুর রচনাগুলিকে অবশ্য মৌলিক বলা চলে না। দেশী পোশাক পরানো বিদেশী কাহিনী।[৮]

বস্তুতই গোয়েন্দা কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে পাঁচকড়ি দে’র প্রধান অবলম্বন ছিল স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসের কাহিনি(অবশ্য সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘খোঁচা’ খেয়ে এবং পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণের দাবি থেকে ফরাসি গোয়েন্দা সাহিত্যেরও আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে)। বরিষ্ঠ সমালোচকের মতে ডয়েলের ‘দি সাইন অব ফোর’-এর অনুবাদ ‘হরতনের নওলা’ পাঁচকড়ি দে’র নামে প্রকাশিত হয় এবং সেটিই শার্লক হোমসের ‘গল্পের’ প্রথম বাংলা অনুবাদ।[৯] কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন আলোচক অরিন্দম দাশগুপ্ত। ‘সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি’ গ্রন্থের ‘ভূমিকা’য় তিনি লিখেছেন:

> গোড়াতেই কবুল করা ভাল যে 'হরতনের নওলা' পাঁচকড়ি দে'র নামে প্রকাশিত হয়নি। 'গোয়েন্দা কাহিনী' সিরিজে যখন 'খুন না আত্মহত্যা' নামে প্রকাশিত হয় এবং পরে পাল ব্রাদার্স বই হিসেবে 'হরতনের নওলা' বলে ছেপে বের করে, দু' ক্ষেত্রেই সংকলক হিসেবে নাম ছিল শরচ্চন্দ্র সরকারের।[১০]

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিকেই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ 'অনেক দিনের পর অনেকের আগ্রহে' 'হরতনের নওলা' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় তখন এর বিজ্ঞাপনে[১১] 'সঙ্কলক' হিসাবে শরচ্চন্দ্রের নাম পাওয়া যায়; কোথাও পাঁচকড়ি দে'র নামের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না। তবে এই অনুবাদ-কর্মে যে পাঁচকড়ি দে'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ মেলে পূর্বোক্ত 'হরতনের নওলা'র 'নিবেদন' অংশটিতে।

অবশ্য এর পরবর্তীকালে পাঁচকড়ি দে 'সাইন অব ফোর'-এর অনুবাদ করে 'গোবিন্দরাম'(১৯০৫) নামে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করেছিলেন। 'গোবিন্দরাম'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন 'সাহিত্য-সংহিতা'(৭ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা,আষাঢ় ১৩১৩) এবং 'বঙ্গভূমি'(১৭ বৈশাখ ১৩১৪ ও ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) পত্রিকায়। এখানে 'বঙ্গভূমি'তে মুদ্রিত 'গোবিন্দরাম'-এর সমালোচনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা হল:

> ...আমরা এই পুস্তকখানি আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি—পড়িয়া সুখী হইয়াছি ; ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিতে গ্রন্থকারের বেশ হাত আছে ; তাহাঁর প্রণীত পুস্তকাদি পাঠে আমরা সে পরিচয় অনেকদিন আগেই পাইয়াছি। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে তিনিই এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী ; তাহাঁর যশঃ অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের আকিঞ্চন। অন্যান্য অসার কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস পাঠে সময় নষ্ট না করিয়া এই পুস্তক পড়িলে জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইয়া থাকে, আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।[১২]

গোয়েন্দা কাহিনিকে ধ্রুপদী বা 'জাতসাহিত্য'-এর থেকে যেখানে পৃথকভাবে অপেক্ষাকৃত লঘু দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, সেখানে 'বঙ্গভূমি'(১৭ বৈশাখ ১৩১৪)-র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'গোবিন্দরাম'-এর পূর্বোক্ত আলোচনাটি এর বিপরীত ছবিকেই তুলে ধরছে। আলোচনাটি যে কেবল সমকালে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে পাঁচকড়ি দে'র প্রতিপত্তিকেই নির্দেশ করছে তা নয় ; বরং বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্যের মেইনস্ট্রিম 'উপন্যাস'-এর প্রতিস্পর্ধী বা প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে গোয়েন্দা কাহিনিকে। অন্যান্য উপন্যাসকে 'অসার', 'কুরুচিপূর্ণ' আখ্যা দিয়ে গোয়েন্দা কাহিনির মাধ্যমে যুগপৎ 'জ্ঞান' এবং 'শিক্ষা' লাভের বার্তা প্রচার করছেন 'বঙ্গভূমি' পত্রিকা। অন্যদিকে 'বঙ্গভূমি'র ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সংখ্যায় ছাপা একটি আলোচনা থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত পাঁচকড়ি দে'র 'গোবিন্দরাম' উপন্যাসটিতে 'তিনখানি' ছবি থাকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।[১৩] বস্তুত কাহিনির সঙ্গে ছবির সংযোজন পাঠককে আকৃষ্ট করবারই একটি কৌশল। পাঁচকড়ি দে'র মতো ধুরন্ধর ব্যবসায়িক বুদ্ধির লেখক প্রথম থেকেই

সেটা বুঝেছিলেন ,যার প্রমাণ তাঁর প্রথম বই সচিত্র 'সতী শোভনা'(১৮৯৯) থেকে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'তাঁর পরের বইগুলি ছাপা বাঁধাই ও ছবি আর কাহিনী নিয়ে পাঠকদের মাতিয়ে তুলেছিল।[১৪]

এখানে উল্লেখ্য শুধু উপন্যাস নয়, পাঁচকড়ি দে হোমসের কয়েকটি ছোটগল্পেরও অনুবাদ করেছিলেন। 'গোবিন্দরামের কীর্ত্তি পর্যায়' শিরোনামে এই গল্পগুলি প্রকাশিত হতো। পাঁচকড়ি দে অনূদিত এরকমই দুটি গল্প হল 'পলাতক' এবং 'পিশাচ পিতা', যেগুলি যথাক্রমে 'আরতি' ও অর্চ্চনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচকড়ি দে কেন শার্লক হোমসকে নাম পালটে বাঙালি চেহারায় অবতীর্ণ করেছিলেন ? এর কারণ, সম্ভবত তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে পরাধীন ভারতবর্ষ তথা বাংলায় যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যাঁরা ইংরেজ প্রভুদের অনুকরণ করতে চাইছেন অথচ পারছেন না তাঁরা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দা চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত রোল মডেলকে। বইয়ের পাতায় শার্লক হোমসের মতো আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালি গোয়েন্দাকে যিনি সরকারি সাহায্য পাচ্ছেন, ডিডাকশন পদ্ধতিতে জটিল রহস্যের সমাধান করছেন, চাইলেই আধুনিকতার প্রতীক রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সুবিধা পাচ্ছেন, সংবাদপত্রে যাঁর কীর্তির প্রশস্তিসূচক আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে দেখে বাঙালি পাঠক অভিভূত হয়েছিলেন। হয়তো এই পাঠকপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ রেখে পাঁচকড়ি দে শার্লক হোমসের বঙ্গীকরণে মনোযোগী হয়েছিলেন। এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সমালোচক অরিন্দম দাশগুপ্তর সুচিন্তিত অনুমানের কথা। তিনি বলেছেন:

> ...সেই সময়ের আরও অনেক ভোগ্যপণ্যের মতোই গোয়েন্দা কাহিনিরও একটা সুবিধাজনক অবস্থান ছিল,তার গায়ে লেগেছিল আধুনিকতার তকমা। কিছু ভাবনা সেইসময়ে খুব সুকৌশলে ঔপনিবেশিক বাংলায় চারিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, বিড়ির থেকে সিগারেট উন্নত, কাপড় ধোলাইয়ের জন্য দরকার কারখানার তৈরি সাবান কারণ তা স্বাস্থ্যসম্মত কিংবা পোশাক হিসাবে ধুতি-চাদরের থেকে কোট-প্যান্ট অনেক পরিশীলিত। সেই একই যুক্তিতে গোয়েন্দা কাহিনি পড়ার মানে দাঁড়ায় আধুনিক রুচির পরিচয়। হয়তো সেইজন্যই জোর পড়েছিল শার্লক হোমসের অনুবাদে,কারণ তা লক্ষ লক্ষ ইংরেজ আর আমেরিকান পাঠক পড়ে থাকে।[১৫]

জনসাধারণের এই পাঠ-প্রবণতাকে অনুধাবন করে পাঁচকড়ি দে এর পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেছিলেন তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলির বিপণনে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচকড়ি দে'র বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা কাহিনি অনূদিত হয়ে বর্হিবঙ্গে প্রসার লাভ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'জাসুস' পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক গোপালরাম গুপ্তার কথা বলা যায়। তিনি পাঁচকড়ি দে'র কয়েকটি বইয়ের হিন্দিতে অনুবাদ করেন 'যাদুগরনি মনোরমা ইয়া পাঁচ খুন'(১৯০০), 'মায়াবী'(১৯০১-১৯০২),

'নীলবসনা সুন্দরী'(১৯০৪), 'কপট রূপবালা'(১৯০৫),'ভয়ঙ্কর ভুল'(১৯১০) ইত্যাদি নামে। পাঁচকড়ি দে'র গোয়েন্দা কাহিনিগুলির অন্যান্য অনুবাদকরা হলেন কার্তিকপ্রসাদ ক্ষত্রি, রামলাল বর্মা এবং মনোহরলাল বর্মা। তাঁর বই যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হচ্ছে এই বিষয়টিকেও বইয়ের বিপণন এবং প্রচার-কার্যে ব্যবহার করেছিলেন পাঁচকড়ি দে। বিজ্ঞাপনে লেখা হতো, 'পুস্তকগুলি সর্ব্বত্র এতদূর আদৃত যে, হিন্দী, উর্দ্দু, তেলেগু, তামিল, মারাঠী, গুজরাটি, সিংহলীস, ইংরাজী প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে।'[১৬] কাহিনিতে ছবি সন্নিবেশের মতো এ-ও পাঠককে আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার এক কুশলী প্রচেষ্টা।

লক্ষ করা যায় সফল লেখক ও ব্যবসায়ী হিসাবে পাঁচকড়ি দে তাঁর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে 'অ্যাগ্রেসিভ ক্যাম্পেন'[১৭] চালিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে তিনি কেবল তাঁর বইয়ের অনুবাদের সংবাদই নয়; কোন বই কতো পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে, বইয়ের কত'তম সংস্করণ হয়েছে পরিসংখ্যানগত সেই তথ্যও পাঠকের কাছে অকপটে তুলে ধরে আত্মপ্রচার এবং বইয়ের বিক্রি দুটোই নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। এর পাশাপাশি আরও বলা যায়, পাঁচকড়ি দে একদিকে যেমন তাঁর 'জীবন্মৃত-রহস্য' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে বইটিকে একটা রাবীন্দ্রিক মোড়ক দিয়ে নান্দনিক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে 'মায়াবিনী' উপন্যাসে খলনায়িকাকে অবতীর্ণ করেছিলেন মোহিনী বিভঙ্গে, যেখানে 'পাপিষ্ঠা' জুমেলিয়ার মতো ভ্যাম্প অনায়াসে 'বক্ষের বসন ও কাঞ্চুলী খুলিয়া' শুদ্ধচিত্ত , নীতিনিষ্ঠ গোয়েন্দা দেবেন্দ্রবিজয়কে মোহজালে আবিষ্ট করার চেষ্টা করে। আসলে 'এও এক বিপণনি খেল! লক্ষ্য বিদ্বজ্জনের পাশাপাশি সাধারণ পাঠকেরা।'[১৮] এখানেই শেষ নয় , পাঠককে আকৃষ্ট করতে প্রকাশকের তরফ থেকেও লেখকের অনেকগুলি বই একসঙ্গে কিনলে সেগুলি 'অর্দ্ধমূল্যে' দেওয়ার ঘোষণা করার কথা জানা যায়। বস্তুত এই সমস্ত কুশলী বিপণন-পন্থা সমকালে গোয়েন্দা কাহিনির লেখক হিসাবে পাঁচকড়ি দে'কে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল।

পাঁচকড়ি দে'র প্রায় সমসাময়িক আরেকজন বাজার-সফল গোয়েন্দা কাহিনির লেখক হলেন দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)। জানা যাচ্ছে, ১৩০৬ সালে দীনেন্দ্রকুমার রায় হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রবর্তিত 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় গোয়েন্দা গল্প 'অদল বদল' লিখে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। 'গল্পটি অনুবাদ নয়, মৌলিক। চিত্তাকর্ষক না হলেও মন্দ নয়' বলেছেন সমালোচক সুকুমার সেন।[১৯] দীনেন্দ্রকুমার রায় পেশায় শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষকতাকালীনই তিনি 'ক্রাইম-অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা গল্পকাহিনী'[২০] লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময়পর্বে প্রকাশিত তাঁর বইগুলি হল 'বাসন্তী'(১৮৯৮), 'হামিদা'(১৮৯৯) ইত্যাদি। এর কয়েক বছর পর গ্রামের ছবি নিয়ে লেখা 'প্রবন্ধ'[২১] 'পল্লীচিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্য' প্রথমে 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায়'কে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতিমধ্যে তিনি শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বটতলা

অঞ্চলের প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একজন বাঁধা লেখক হয়ে ওঠেন। ফাল্গুন ১৩০৭-এ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'নন্দন কানন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা শুরু করলে পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন দীনেন্দ্রকুমার। এর পরের বছরই আবার দীনেন্দ্রকুমারের প্রথম দিকের লেখা ছ'টি গোয়েন্দা গল্পের সংকলন 'পট' প্রকাশিত হয়। 'পট'-এর সমালোচনায় 'প্রদীপ' পত্রিকা লেখেন:

> ...সত্যই বঙ্গভাষায় ইতিপূর্ব্বে আমরা এরূপ সংযত ভাষায় লিখিত, বর্ণনা নৈপুণ্যে অলঙ্কৃত, সুরুচি সঙ্গত ডিটেক্‌টিভের গল্প পাঠ করি নাই। এ পুস্তকখানি যে বাঙ্গালা ডিটেক্‌টিভের গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।... 'পটের' প্রধান গুণ এই যে, ইহার রুচি মার্জ্জিত; কোন স্থানে এরূপ একটী শব্দ নাই, যাহা আপত্তিজনক, বা যেজন্য এই পুস্তক গৃহ-লক্ষ্মীগণের হস্তে অসঙ্কোচে দেওয়া যায় না। বঙ্গরমণীগণ অনায়াসে ইহা পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, গ্রন্থকারের ইহাই প্রধান কৃতিত্ব।...[২২]

বিশ শতকের গোড়ায় জেলা-মফস্‌সল এমনকী কলকাতা শহরেও ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, বিনোদনের বহুল উপকরণ সহজলভ্য ছিল না। গৃহবধূ থেকে সাক্ষর যুবক-যুবতীদের কাছে তখন বই ছিল বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পট'-এর উপরিদ্ধৃত সমালোচনাটি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দীনেন্দ্রকুমার বা আরও বৃহত্তর অর্থে দেখলে গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা এই টার্গেট অডিয়েন্সকেই ধরতে চাইছেন। আর সেইজন্য লক্ষ রাখা হচ্ছে ভাষার 'সংযত' প্রয়োগ এবং গোয়েন্দা কাহিনিকে 'রুচি মার্জ্জিত' করে তোলার ওপর ; পাশাপাশি সযত্নে বর্জন করা হচ্ছে 'আপত্তিজনক' শব্দাবলি। এইভাবে পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মতো লেখকদের মাধ্যমে ক্রমশ জনরুচিতোষণ গোয়েন্দা কাহিনির লক্ষ্যবিন্দু হয়ে উঠছে বলা যায়।

এখানে উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত মাসিক পত্রিকা 'নন্দন কানন' দ্বিতীয় বর্ষ থেকে মাসিক ক্রাইম গ্রন্থ সিরিজে পরিণত হয়। তবে সিরিজের বইগুলিতে লেখক বা অনুবাদকের নাম থাকত না; নামপৃষ্ঠায় প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম এমনভাবে ছাপা থাকত যাতে মনে হতো তিনিই লেখক। এই সিরিজে দীনেন্দ্রকুমার রায় বেনামে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বা সুনির্দিষ্ট করে বললে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের ব্যবসায়িক সম্পর্কে ছেদ পড়লে তিনি নিজেই 'রহস্য-লহরী' নামে একটি সিরিজ আরম্ভ করেন(বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দে)। শুরু হয় ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেক ও তাঁর সহকারী স্মিথের জয়যাত্রা। প্রথম দিকে এই সিরিজে ছবি না থাকলেও সিরিজটি ১১৫'তম সংখ্যা থেকে লেখকপুত্র বলেন্দ্রকুমার রায়ের সৌজন্যে সচিত্র হয়ে ওঠে। 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামে একটি পত্রিকা এবং 'সেক্সটন ব্লেক' সিরিজের বইগুলি 'রহস্য-লহরী' সিরিজের

অবলম্বন বা ভিত্তি ছিল। সিরিজের বইগুলির মূল যে ইংরেজি তা গোপন করার চেষ্টা করেননি লেখক; বরং কাহিনির মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজি বাক্য ও বাক্যাংশ সচেতনভাবে ইংরেজি অক্ষরেই ব্র্যাকেটে সন্নিবেশিত করেছিলেন। বইগুলিতে ইংরেজি মূলের আভাস বজায় রাখার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে এর উদ্দেশ্য ছিল স্কুল পড়ুয়াদের কাছে বইগুলিকে আরও লোভনীয় করে তোলা; যেহেতু তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলা প্রশ্নপত্রে অনেক নম্বর থাকত ইংরেজি থেকে বাংলায় ও বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদে।[২৩] বলা যায় 'বিশেষ একটি পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা সম্পর্কে অবহিত থেকে সেই পাঠকদের কাছে বিক্রীত হবার জন্য'[২৪] পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হচ্ছে এই ধরনের 'জনরঞ্জন সাহিত্য'[২৫] ,যার উদ্দেশ্য মুখ্যত বাণিজ্যনির্ভর।

'রহস্য-লহরী' সিরিজের প্রথম বই ছিল 'বিধির বিধান'। এরপর একে একে এই সিরিজে আরও ২১৬ অর্থাৎ মোট ২১৭টি(যেমন, 'তুর্কি-হামাম্ রহস্য', 'সাংঘাতিক উইল', 'চোরে গোয়েন্দায় যোগ', 'লোহার থাবা', 'ডাক্তারের নবলীলা', 'রঙ্গিণীর রণ-রঙ্গ', 'ঝোপে ঝোপে নেক্ড়ে', 'কলির ভীমের কাণ্ড', 'বিজলির ঝলক', ' মৃত্যু-কবলে'[২৬] ইত্যাদি) বই প্রকাশিত হওয়ার কথা জানা যায়। একটি সিরিজে একাদিক্রমে ২১৭টি গ্রন্থের প্রকাশ এর জনপ্রিয়তাকে সুনিশ্চিত করে। 'রহস্য-লহরী' সিরিজের জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে দীনেন্দ্রকুমার নিজেও যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখক শরচ্চন্দ্র দেব সরকার এবং সমসাময়িক প্রতিপক্ষ পাঁচকড়ি দে'র অনুসরণে 'রহস্য-লহরী' সিরিজের বিপণন-কার্য চালান। দীনেন্দ্রকুমার একদিকে যেমন 'রহস্য-লহরী' সিরিজের অনেকগুলি বই বাংলা ও বাংলার বাইরের রাজা ও জমিদারদের উৎসর্গ (যেমন, 'যখের আসন' উৎসর্গ করা হয় ময়মনসিংহ কালীপুরের ভূমধ্যিকারী বিজয়কুমার লাহিড়ী চৌধুরীকে, রঙ্গপুর-গোপালপুরের জমিদার ক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীকে 'চূড়ান্ত চাতুরী', মহিষাদলধিপতি রাজা সতীপ্রসাদ গর্গবাহাদুরকে 'নাবিক বধূ' উৎসর্গ করা হয়) করে আলোচ্য সিরিজের প্রতি রাজা এবং জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যের সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তেমনি পাঁচকড়ি দে-কে টেক্কা দিতে 'রহস্য-লহরী' সিরিজ শুধু দেশে নয়, বিদেশেও আদৃত হচ্ছে সে কথা সগর্বে বিজ্ঞাপিতও করেছিলেন। আবার পাঁচকড়ি দে'র তুলনায় এই সিরিজের বিপণন কার্যে আরও কিছুটা অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। তিনিই চালু করেন উৎসবের 'ডবল নম্বর' বা শারদ উপহারের মতো চমক। দীনেন্দ্রকুমার রচিত 'পল্লীকথা' 'রহস্য-লহরী' সিরিজের শারদ উপহার হিসাবে গ্রাহকদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল।

এখানেই শেষ নয়। আয়ের পথ নির্বিঘ্ন রাখার প্রয়োজনে দীনেন্দ্রকুমার লেখার সঙ্গে আপসও করেছেন। 'কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লেখেন:

> আমরা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অনুরক্ত প্রজা। রহস্য লহরীর কোনো উপন্যাসে বৈদেশিক রাজনীতির আভাস থাকিলেও গবর্ণমেন্টের স্বার্থের প্রতিকূল কোনো আলোচনা তাহাতে স্থান পাইবে না। ইউরোপীয় গল্পই রহস্য লহরীর প্রাণ; কিন্তু এমন কোনো গল্প ইহাতে প্রকাশিত হইবে না, যাহাতে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিন্দুমাত্র অভাব সূচিত হইতে পারে। আমাদের যে সকল সম্ভ্রান্ত পাঠক কোনও পুস্তক গ্রহণের পূর্ব্বে ইতস্ততঃ করেন,—ইহা কিনিলে কোনও ‘ফ্যাসাদ’ ঘটিবে কি না; আর যাঁহারা নূতন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিয়া গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলেও এই ‘ফ্যাসাদে’র ভয়েই তৎপ্রতি বিমুখ হন,—তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে রহস্য লহরী গ্রহণ করিতে পারেন।[২৭]

অর্থাৎ পরাধীন ভারত তথা বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে গিয়ে দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখায় খুব সচেতনভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, যার উল্লেখে লেখক কিংবা পাঠক অথবা বলা ভালো ক্রেতা ‘ফ্যাসাদ’-এ পড়তে পাড়েন ; যার ফলে বইয়ের কাটতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে পরিত্যাগ করেছেন। পাশাপাশি বইয়ের ‘ভূমিকা’য় পাঠকের প্রতি লেখকের তরফ থেকে থাকছে দীর্ঘ আশ্বাসন বার্তা । এইভাবে সম্পূর্ণত জনসাধারণের হিত, রুচি এবং প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ রেখে নির্মিত হচ্ছে একটি বিশেষ পণ্য—বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি, প্রারম্ভিক পর্বে যার গুরুত্বপূর্ণ দুজন পসারি ছিলেন পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়।

পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা গোয়েন্দা কাহিনিগুলির সাহিত্যগুণ বা এর মৌলিকতা কতখানি তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়। তবে বিশিষ্ট সমালোকের বক্তব্যকে স্বীকার করে বলতেই হয়, ‘...সাহিত্যের জগতে বাণিজ্যিকতা আর প্রকৃত সৃষ্টি—দুই ই থাকবে। এমনকী কোনো কোনো সময়ে এ দুটি হয়তো মিলেও যাবে।[২৮] বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির বিপণনে পাঁচকড়ি দে এবং দীনেন্দ্রকুমার রায়ের তৎপরতা বা ভূমিকাকে লক্ষ করলাম, যা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে তৎকালীন গোয়েন্দা কাহিনির বাজার এবং বাঙালির পাঠরুচি।

উল্লেখপঞ্জি :

১. পাঁচকড়ি দে’র মৃত্যুকাল নিয়ে সংশয় থাকায় তাঁর মৃত্যু সালের পাশে জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) দিয়েছেন সমালোচক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। দ্র.পরিশিষ্ট—২, রহস্যগল্পের নায়কেরা, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, আত্মজা,কোলকাতা-৫৭, প্রথম আত্মজা সংস্করণ: ২০১৯, পৃ.২৯৯।

২. অরিন্দম দাশগুপ্ত, ভূমিকা, সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৩. এই অনুমান বিশিষ্ট সমালোচক সুকুমার সেনের। দ্র. ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ২০১৫।

৪. ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ২০ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে কলকাতার মজুমদার লাইব্রেরি দ্বারা প্রকাশিত হয় ‘সমালোচনী’ পত্রিকা। দ্র. ভূমিকা, অরিন্দম দাশগুপ্ত(সম্পাদিত) সেকালের গোয়েন্দা গল্প, পূর্বোক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৫. সমালোচক অরিন্দম দাশগুপ্তর মতে পাঁচকড়ি দে’র ‘Ghost Writer’ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ পাল। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এখানে উদ্ধার করা হল— ‘অন্য কেউ লেখক পাঁচকড়ি দে সম্পাদক ব্যাপারটা বোঝা গেল; কিন্তু অন্য কোনও লেখকের নাম নেই শুধুই সম্পাদক পাঁচকড়ি দে এই ব্যাপারটার মধ্যে পাঠকরা খুঁজে পেলেন রহস্যের গন্ধ। সন্দেহ ঘনীভূত হল তাঁরই অভিন্নহৃদয় বন্ধু আর পাল ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী যতীন্দ্রনাথ পাল মারা গেলে। যতীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর পাঁচকড়ি দে আরও তিরিশ বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু আর কোনও গোয়েন্দা কাহিনি লেখেন নি । তাঁকে ঘিরে তাই তৈরি হতে লাগল নানা গল্প, যেমন—পাঁচকড়ি দে আসলে লেখক ছিলেন না আসল লেখক হলেন যতীন্দ্রনাথ। গোয়েন্দা কাহিনির একজন লেখককে ঘিরে এহেন জমজমাট রহস্য অবশ্যই তাঁর জনপ্রিয়তা ও বইয়ের কাটতি বাড়িয়ে ছিল।’ দ্র. ভূমিকা, সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, অরিন্দম দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৬. উপন্যাসটির পূর্ববর্তী নাম ছিল ‘জুমেলিয়া’, যার তিনটি ফর্মা ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ‘গোয়েন্দার গ্রেপ্তার’ নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ৪ চৈত্র ১৩০৫-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসটির নাম পরিবর্তন করে ‘মায়াবিনী’ রাখা হয়। এবং দ্বিতীয় সংস্করণকালে(১৮ আশ্বিন ১৩০৭) এতে তিনটি ছবি সংযুক্ত হয়। দ্র. বিজ্ঞাপন, মায়াবিনী, পাঁচকড়ি দে প্রণীত, পল ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কো. , ৭, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, ক্যালকাটা, ১৯১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৭. ১৩৪০ বঙ্গাব্দে পঞ্চম সংস্করণের সময় বইটির নাম পালটে ‘সেলিনাসুন্দরী’ রাখা হয়।

৮. রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ ঘোষ, প্রসঙ্গ : গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা, গোয়েন্দা আর গোয়েন্দা, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

৯. সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ২০১৫, পৃ.১৮৩।

১০. অরিন্দম দাশগুপ্ত, ভূমিকা, সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

১১. দ্র.ভূমিকা, অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ২, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

১২. বঙ্গভূমি পত্রিকা, ১৭ বৈশাখ, ১৩১৪, তদেব।

১৩. বঙ্গভূমি পত্রিকা, ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪, তদেব।

১৪. সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ২০১৫, পৃ.১৮১।

১৫. অরিন্দম দাশগুপ্ত, ভূমিকা, পূর্বোক্ত সেকালের গোয়েন্দা গল্প, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

১৬. দ্র. ভূমিকা, সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, অরিন্দম দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

১৭. অরিন্দম দাশগুপ্ত, ভূমিকা, পূর্বোক্ত সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ২, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

১৮. অরিন্দম দাশগুপ্ত, ভূমিকা, সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

১৯. সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ২০১৫, পৃ.১৮৪।

২০. তদেব।

২১. তদেব।

২২. প্রদীপ পত্রিকা, ১৩০৮, দ্র. ভূমিকা, অরিন্দম দাশগুপ্ত(সম্পাদিত) সেকালের গোয়েন্দা গল্প, পূর্বোক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

২৩. সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ: জুন ২০১৫, পৃ.১৮৬।

২৪. সুমিতা চক্রবর্তী, জনপ্রিয় উপন্যাস ও নারী-প্রতিমা নির্মাণ, উপন্যাস বহুরূপে, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া, আশ্বিন ১৪১৭ / অক্টোবর ২০১০, পৃ.১১২।

২৫. শিশিরকুমার দাশ, জনপ্রিয়তা ও উপন্যাস, দ্র. চার্বাক সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চতুর্মাসিক, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পাদিত), দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪২০, পৃ.৭১।

২৬. দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত ‘রহস্য-লহরী’ সিরিজের ২১৭ নম্বর অর্থাৎ শেষ বই এটি।

২৭. দীনেন্দ্রকুমার রায় , ভূমিকা , ‘কৈসার-অন্তঃপুর রহস্য’, দ্র. পূর্বোক্ত সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি-র ভূমিকা, অরিন্দম দাশগুপ্ত , প্রাগুক্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা অনুল্লিখিত।

২৮. সুমিতা চক্রবর্তী, বাংলা উপন্যাস: সৃষ্টি না উৎপাদন ?, উপন্যাস বহুরূপে, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া, আশ্বিন ১৪১৭ / অক্টোবর ২০১০, পৃ.১১১।

কৌম সমাজের ভিন্ন ভাষ্য : তিলোত্তমা মজুমদারের ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’

দীপিকা বাড়ই
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract): উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে বিশেষত পূর্ব ডুয়ার্সে (যার সীমানা তোর্ষা নদী থেকে আসাম ঘেষা সংকোশ নদী পর্যন্ত) এমন অনেক জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে শত বাধা-বিপত্তি, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, পরিবর্তনের মধ্যেও স্বজাতির পরম্পরাগত রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, গোষ্ঠীগত শাসন ব্যবস্থা, ভাষাচর্চা ইত্যাদি উপাদানের নিরিখে জীবনধারণ ও জীবনযাপন করে চলেছে। তাদের যাপিত এই জীবনে জড়িত প্রকৃতি-লগ্ন আদিম সমাজের বিভিন্ন উপকরণ, যা এখনো তার কুমারিত্ব বা মৌলিকতা হারায় নি কিংবা ‘অন্য’ সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে মিশে যায় নি। তাদের সমাজকে তাই বলা যায় কৌম সমাজ, জীবনযাপনের সাথে যুক্ত উপকরণকে বলা যায় কৌম বা আদিম জনজাতির উপাদান।

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার জন্মসূত্রে ডুয়ার্সের বাসিন্দা হওয়ায় এখানকার কৌম সমাজ ও তাদের জীবনযাপনের বিচিত্র উপাদান নিয়ে রচিত হয়েছে তাঁর আখ্যানবিশ্ব এবং আখ্যানসূত্রে পাওয়া যায় নতুন জীবনের ঘ্রাণ। তিনি কীভাবে এবং কেমন করে ডুয়ার্সের কৌম সমাজকে ‘স্বর্গের শেষপ্রান্তে’ (২০১৫) শীর্ষক উপন্যাসে তুলে এনে শৈল্পিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা অনুসন্ধান করাই এই গবেষণা-নিবন্ধের মুখ্য বিষয়।

সূচক/মূল শব্দ (key Word): কৌম—আদিম জনগোষ্ঠী, গিরমিটিয়া—চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, কন্দ--খাবার বিশেষ, পিলুয়া--চা গাছের ক্ষতিকারক কীট, কুকরি--মাটি খোঁড়ার যন্ত্র, ফারুয়া--কোদাল, তবল--কুঠার, ডিবরি--কুপি।

মূল আলোচনা (Discussion):

আত্মপরিচয় সন্ধানের স্পৃহা মানুষ মাত্রই। কেননা আত্মপরিচয় অনুভব করতে পারলে মানুষের মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তৃপ্তবোধ আসে। যার কারণে প্রতিটি মানুষ আত্মপরিচয়ের সন্ধানে ব্যপৃত থেকে অতৃপ্ত মনকে তৃপ্ত করতে চায়। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ সে অতীত ইতিহাসের মধ্যে নিজের, জাতির উৎসমূল সন্ধানে রত হয়। স্বাভাবিক কারণে প্রতিটি মানুষের মধ্যে বর্তমান-অতীতের দ্বন্দ্ব চলে, সে বর্তমানে থাকলেও অতীতকে বাঁচিয়ে রাখে পথ চলার প্রতিটি ছন্দে। অতীত বর্তমানের মেলবন্ধনেই তৈরি করে নেয় ভবিষ্যতের চলার সম্ভাবনাময় পথ। শিক্ষা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে দ্বিস্তর উপলব্ধি থাকে---১) ইতিহাস এমন এক বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় উপাদান, যা মনের

বহু অভিপ্রায়ের সন্ধান দিতে পারে ২) ইতিহাসে আছে এক সংবিত্তি, যা অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভবিষ্যতের সংযোগে বর্তমানকে অনুভব করতে শেখায়। তাই সে যতই বর্তমানে থাকুক না কেন সৃষ্টির সন্ধানে লীন হয়ে জীবনের সত্য উৎঘাটনে সর্বদা মুখরিত হয়। যার জন্য অতীত সমাজের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পুরাণ, কিংবদন্তি, বিশ্বাস, মিথকাহিনি প্রভৃতি পরম আশ্রয়ের বিষয়-আশয় হয়। একজন সষ্ট্রাও সেদিক থেকে বঞ্চিত নয়, সে জগত ও জীবন সম্পর্কে গভীর অনুভব শক্তির অধিকারী এবং অত্যন্ত কাল সচেতন ও সমাজ সচেতন মানুষ হন। সমাজে, মানবজীবনে প্রত্যক্ষ এই উপলব্ধির জায়গা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না; সাহিত্য নামক শিল্পকলার নিপুণ তুলিকায় নানাভাবে উদ্ভাসিত হয়। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারের সৃষ্টিসম্ভার তারই সার্থক দৃষ্টান্ত বহন করে। তিনি বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য, জীবনবোধের গভীরতা উপন্যাস নামক শিল্পে প্রস্ফুটিত করার জন্য অতীত ঐতিহ্যকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে যে সমস্ত মানুষ এখনও জীবনযাপন করছে তাদের উপাদানকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপন্যাসে বিচিত্র রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, দলপতি প্রথা, গোষ্ঠীগত শাসন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট ভাষার ব্যবহার, পাল-পার্বণ, ধর্মাচার, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর সংস্কার ইত্যাদি জীবনাচার ও আয়ুযাপনের নিরিখে গড়ে ওঠা যৌথচেতনা-সম্পৃক্ত আদিম সুসংগঠিত মানবসমাজের স্বতন্ত্র এক একটি কৌম সমাজের উপাদান অনুসরণে রত জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষণীয়, যারা অতীত ঐতিহ্যকে বংশপরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখছে। আমরা জানি, মানবজাতির সকলের মধ্যে কম-বেশি এই প্রবণতা থাকলেও সমাজ সভ্যতায় যারা আদিবাসী হিসাবে পরিচিত তারা এই মানসিকতার অধিকারী ও কঠোর অনুসরণকারী, তাদের সমাজ তাই কৌম সমাজ। যার জন্য সমীর চক্রবর্তী বলেছেন-- 'আদিম যাযাবরী জীবন পরিত্যাগ করে সব মানুষ একই সময়ে কৃষিজীবীতে পরিনত হয় নি। এই পরিবর্তন এসেছে ধাপে ধাপে আংশিকভাবে। কেউ অনেক আগেই যাযাবরী জীবন পরিত্যাগ করেছে, আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী অনেক পরে কৃষিকাজ শিখে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে, কিন্তু অরণ্য ও পশুশিকারের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের 'কৌম সমাজ সংগঠন'ও বিনষ্ট করে ফেলেনি। আদিবাসী সংস্কৃতি তাই মূলত লোকসংস্কৃতি হলেও 'কৌম চেতনা'ই এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য।'[১]এই সম্পর্কিত তিলোত্তমা মজুমদার রচিত তেমনই একটি দৃষ্টান্তযোগ্য উপন্যাস হল 'স্বর্গের শেষপ্রান্তে'(২০১৫)। যেখানে জন্মসূত্রে চিরপরিচিত উত্তরবঙ্গের একপ্রান্তে অবস্থিত ডুয়ার্সের কৌম সমাজ বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েও অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত---এই তিন কালের সংযোগসূত্রে দাঁড়িয়ে থাকা চিরকালীন সমাজ-সভ্যতা-মানব জীবনসত্য প্রস্ফুটিত করেছে।

'স্বর্গের শেষপ্রান্তে'র(২০১৫) ভাববস্তুতে আছে ছোটদের হৃদয় তুলিতে বড়দের জটিল পৃথিবীকে দেখা ও দেখানোর নানা ভাব ও ভঙ্গি। প্রেক্ষাপটে রয়েছে সবুজের

সমারোহ, পাহাড়ের সানুদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বনভূমি, চা বাগানের বর্ষায় জলভারনত মাঠ-ঘাট, ঝোরা, নালা-নর্দমা, গোরু-বাছুর, জীব-জন্তু পরিবৃত ডুয়ার্সের কালচিনি চা-বাগান, হাসিমারা, জয়গা, দলসিংপাড়া, রায়মাটাং, মাইকেলনগর, তোর্ষা নদীঘেরা ভূ-ভাগ, জনপদ। যেখানে বাঙালি, নেপালি, আদিবাসী, মদেশিয়া, রাভা, কোচ, মেচ, গারো বিবিধ জাতি উপজাতি মিশ্রিত জীবন প্রবাহমান। চা-বাগানকে আশ্রয় করে অধ্যুষিত যে জীবন তা প্রকৃতির মতোই আপাত সরল ও মনোরম। কিন্তু এরই মাঝে বড়দের যে জগৎ, মানব-সমাজের প্রেম-অপ্রেমের দ্বন্দ্ব, হিংসা, বঞ্চনা, মিথ্যা, সন্দেহ, আত্মসর্বস্বতার চিত্র প্রকৃতির রুদ্র রূপের মতো বড়ই বেদনার। ছোটদের দেখা ভেদাভেদহীন জীবন স্বর্গের কাছে বড়দের এই জটিল পৃথিবী তাই চিরকালের ধনী-দরিদ্র, মালিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজা, শাসক-শোষিতের দ্বন্দ্বময় ইতিহাস, সমাজসত্যকে তুলে ধরে। ফলত উপন্যাসে জীবনবোধের উন্মোচনের পাশে সমাজের প্রান্তীয়, দলিত, শোষিত, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ চা-বাগানের কৌম সমাজের জীবনচিত্র, চিত্রলিপি প্রাধান্য পেয়েছে। যার মধ্যে প্রধান একটি সম্প্রদায় হল দ্রাবিড়-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ওঁরাও এবং অস্ট্রিক-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত মুণ্ডা সম্প্রদায়। উপন্যাসে বুখলা, কালুয়া, মউল, ওঁরাও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, অন্যদিকে বেবেকা, শিউশরণ, পিটারবাবু অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত মুণ্ডা সম্প্রদায়। এছাড়াও রয়েছে লোহার, টোটো, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ- অনুষঙ্গ। চা-বাগানের পরিবেশে তাদের এই নির্দিষ্ট পরিচয় নিয়ে কেউ-ই মাথা ঘামায় না, কেননা ডুয়ার্সের চা-বাগানের শ্রমিক রূপে বহুযুগ আগে ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, রাচি, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে গিরমিটিয়া হয়ে যারাই এসেছে এবং যুগের পর যুগ এই অঞ্চলে থেকে গেছে, তাদের পরিচয় কেবলই মদেশিয়া বা কুলি। তাদের বসবাস স্থল মদেশিয়া লাইন বা কুলি বস্তি বা লেবার লাইন। ইংরেজরা চা বাণিজ্যকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রনের জন্য ভেবেচিন্তে সামাজিক স্তর বিভাজন করেছিল, যেমন মালিক, ম্যানেজার, বাবু, বৈদার, লেবার বা শ্রমিক। এই স্তরের উচুতে রয়েছে মালিক স্বরূপ প্রথম দিকে ইংরেজ এবং ইংরেজ যাবার পর কোনো মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বা ধনী বাঙালি। ম্যানেজার হিসাবে মাড়োয়ারীরাই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, যারা একসময় ইংরেজের থেকে টেন্ডার নিয়ে চা-বাগান পরিচালনা করত, বর্তমানে এরাই মালিক হয়ে উঠেছে। এর পরের স্তরে রয়েছে বাবু শ্রেণি--- শিক্ষিত বাঙ্গালির একছত্র অধিকার এতে। যেমন বড়বাবু, ছোটবাবু, ওজনবাবু, গুদাম বাবু প্রভৃতি। সবশেষে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণি--- মূলত নেপালি ও আদিবাসী মদেশিয়ারাই এই স্তরে। এদের মধ্যে শ্রমিকদের সর্দারকে বৈদার বলা হয়। নেপালিরা বেশিরভাগ চা-বাগানের মিস্ত্রী হিসাবে কাজ পায়, কিন্তু মদেশিয়ারা কেবলই শ্রমিক। আজ ইংরেজ নেই কিন্তু তবু এই শ্রমভেদ রয়েছে এবং সেই সূত্রে বৈষম্যও রয়েছে। উচু স্তরে থাকা মানুষ ক্রমশ নীচুতে থাকা মানুষকে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অছুত, অস্পৃশ্য ভাবে। অথচ তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে দ্বিধা করে না। এই তাচ্ছিল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে সমাজের নিম্ন স্তরে থাকা

আদিবাসী বা মদেশিয়া সমাজের খেটে খাওয়া মানুষেরা। কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা কৌম সমাজের উপাদানকে ব্যবহার করেই এই সত্যকে তুলে ধরেছেন। যেখানে নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে নিজেরা গৌরব উপলব্ধি করলেও, স্বতন্ত্র সমাজ কাঠামো থাকলেও অন্যের চোখে তা সহানুভুতির, করুণার। কিন্তু লেখিকা এই বৈষম্য যেন চান না তাই তা দূরীভূত করতে তাদের জীবনে ব্যবহৃত উপাদানকে মহিমান্বিত ভাবে বর্ণিত করেছেন, জীবনবোধের উন্মেষে ব্যবহার করেছেন, বিবর্তনকে তুলে এনেছেন। পাশাপাশি এই শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদ, মানুষে মানুষে ভেদ এ যেন আজকের না, এর ইতিহাস বহু প্রাচীন, সমাজের উচু স্তরের মানুষের নিজস্ব কর্তৃত্ব, মহিমা নিয়ে বেঁচে থাকার গভীর রাজনৈতিক-কূটনৈতিক ভাবনার ফল। তিলোত্তমার এই উপন্যাসে বর্ণিত সময় ও বিষয় তাই কেবল বিশ শতক নির্দেশ করে না; এর ব্যাপ্তি সুদূর আদিমযুগ থেকে আজ পর্যন্ত। বিষয় ভাবনায়ও সমাজ কাঠামোয় থাকা রাজা-প্রজা, প্রভূ-দাস, জমিদার-চাষী থেকে মালিক- শ্রমিক সম্পর্কের বাস্তবতাকে স্মরণ করায়। তাই তিনি যেন উপন্যাস নামক শিল্পে গণ-ইতিহাস লিখেছেন—যার নায়ক একটি বঞ্চিত, উপেক্ষিত নির্দিষ্ট চরিত্র নয় বরং কৌম সামাজের নামহীন সাধারণ জনতা।

তিনি ডুয়ার্সের কৌম সমাজের উপাদানকে যেমন, কোনো মিথ, কিংবদন্তি, প্রথা, সংস্কারকে কখনও রূপক বা প্রতীক রূপে ব্যবহার করে জীবন উপলব্ধি, সমাজ ভাবনার কথা বলেছেন। আবার তাদের প্রতি সমাজ সভ্যতার বৈষম্য, ভেদাভেদ, হীনতা দূর করতে সহমর্মিতার সহিত মূল জীবনস্রোতের পাশে তাদের সমাজ সংস্কৃতির স্বতন্ত্র প্রভাব, উদার-উন্মুক্ত ভাবনা, ভালো-মন্দের নানাদিক উত্থাপন সূত্রে কৌম উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি ডুয়ার্স অঞ্চলকে জীবন্ত করতে, মানবসমাজের ইতিহাস, জীবনসত্য ও জীবনবোধের ব্যপকতা প্রকাশ করতে কৌম সমাজের উপাদানকে ব্যবহার করেছেন।

প্রথমে আমরা উপন্যাসে রূপক বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত উপাদান নিয়ে আলোচনা করব। এই উপন্যাসে 'ডোম্বীতাল' ও 'সনাতন ভূত' –কিংবদন্তি ও বিশ্বাস রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ডুয়ার্স সর্বদা জঙ্গল, ঝোরা, হ্রদ, খাল-বিল, বৃক্ষ নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে রহস্যময় সৌন্দর্যে ঘেরা। প্রাকৃতিক এইসব উপাদানের উৎপত্তি নিয়েও মানুষের মধ্যে কৌতূহলের সীমা নেই। যার সমস্তর উৎপত্তির পিছনে এই অঞ্চলের কৌম সমাজের মানুষের মধ্যে 'সত্য- মিথ্যা ও সম্ভাবনা' কে আশ্রয় করে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন কিংবদন্তি। উপন্যাসে বালিবিনি চা-বাগানের আদিবাসী চা-শ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গলের ধারে থাকা গভীর এক কুয়ো 'ডোম্বীতাল'কে নিয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রচলিত কিংবদন্তিটি হল—'মদেশিয়ারা বিশ্বাস করে, এই জায়গাটা স্বর্গের টুকরো। এখানে শিব আর পার্বতী ডোম্ব আর ডোম্বী হয়ে জলকেলি করত। ডোম্বীদেবী ভক্তের পরিত্রাতা আবার শিব পার্বতী খেলা করত বলেই এখানে

জলের উপর মুখ বাড়ালে যে যাকে ভালোবাসে তার মুখ দেখতে পায়। প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে ভালোবাসা যাচাই করতে আসে।’[২]

উপন্যাসে বহুবার এই কিংবদন্তির প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের আলাপ আলোচনায়, দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গে এই কিংবদন্তির কথা এসেছে। কিন্তু কেন? আসলে লেখিকা এই কিংবদন্তি ব্যবহার করে মানবমনের চিরন্তন এক রহস্যকে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রতিটি মানুষ চায় অর্থ, শ্রেণি, সামাজিক স্তর নির্বিশেষে ভালোবাসার মানুষকে নিবিড়ভাবে পেয়ে সুখী হতে। ফলত তারা চায় প্রত্যেকের ভালোবাসার মানুষের চোখে তার প্রতি ভালোবাসার পরিমাণ যাচাই করতে। কিন্তু জীবন এবং সমাজ আত্মসর্বস্বতার চিত্র, হিংসা, দ্বেষ নিয়ে এতটা প্রকট যে কে কাকে কতটা ভালোবাসে বা বাসে কিনা এই প্রশ্ন যেমন সংশয়ের তেমনি সার্থকতা পাওয়ায়। তবুও মানুষ আপ্রাণ চেষ্টায় অন্যের চোখে নিজের প্রতি ভালোবাসা খুঁজে ফেরে, অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভরসা করতে চায়। মানবজীবনের এই সত্যই ব্যঞ্জিত হয়েছে ‘ডোম্বীতাল’ এ। উপন্যাসের চরিত্রেরা রিনি, ঝিনি, কালুয়া, এমনকি দীপ্তেনও তাই বারবার ডোম্বীতাল বেড়াতে যেতে চেয়েছে, সামাজিক স্তর ভুলে বাবুর মেয়ে রিনি ভালবেসেছে ডিমওয়ালার ছেলে ধবলুকে, আদিবাসী কালুয়া ঝিনিকে, দেওর দীপ্তেন তার বৌদিকে। প্রত্যেক বার মুখ বাড়িয়েছে অন্যের প্রতিবম্ব দেখতে কিন্তু দেখতে পায় নি। তাই কালুয়া উপলব্ধি করেছে--‘যে প্রেম এমনকি নিজের চেয়েও বড় করে তোলে প্রেমাস্পদকে—তেমন বিরলতম ভালোবাসার জনও আসলে কোনও প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে না।’[৩]কেননা সমাজ তার স্বীকৃতি দেবে না। মানুষে মানুষে এই বৈষম্যের জীবন্ত স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এই রূপকে। কিন্তু সমাজের এই নির্মমতা কেউ-ই চান না, লেখিকাও না। মুক্ত সমাজ আমাদের কাম্য--তাই ভেদাভেদ সত্ত্বেও রিনি, ঝিনি, কালুয়ার মতো পরম আকর্ষণ এই ডোম্বীতাল। তাই উপন্যাসের শেষেও তারা কবে দেখতে যাবে তার প্রসঙ্গ এসেছে, কেননা সামাজিক বৈষম্য ভুলে প্রত্যেক মানুষ একে অপরকে ভালবাসতে মরিয়া। এভাবেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত উপাদান লেখনী শক্তিতে সর্বজনীন মাত্রা পেয়েছে।

ভূতে, আত্মায় বিশ্বাস আদিবাসী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসে তাদের বিশ্বাস থেকেই ‘সনাতন ভূত’ প্রসঙ্গ রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বুখলা ওঁরাও বিশ্বাস করে কালিকাপ্রতাপের বান্দা, দাস ‘সনাতন’ মরার পরেও ভূত আকারে মাইকেলনগরের বাঁশবাগানে রয়ে গেছে। এই সনাতন কেবল নিজেকে চিহ্নিত করছে না, জাতি, স্তর নির্বিশেষে সকল শ্রমজীবী মানুষকে বোঝাচ্ছে। যারা জীবনে কারো না কারো দাস। মানুষ মাত্রই দাস, যে বলবে আমি দাস নই তবুও সে প্রবৃত্তির দাস। জীবন সম্পর্কে সনাতনের এই উপলব্ধি তার জীবৎকালে যেমন সত্য ছিল, আজও সত্য। মানুষ তার প্রভু, মালিক, প্রবৃত্তির দাস বলেই নিজের জীবন তুচ্ছ করে সে সবকে যত্ন করে লালন করে। সনাতনের কথায়, শত্রুনাশে পাপ নেই, অমানুষ নিধনে

পুণ্য হয়--- এই সত্য সঙ্গী বুখলা সনাতন না থাকলেও মান্য করে। কালিকাপ্রতাপ স্ত্রী, পুত্র, নাতি- নাতনি পরিজনের মাঝেও অনুগত দাসকে খোঁজে। আসলে সমাজ, জীবন, সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক দাসেরা কতটা প্রয়োজন তা বাস্তব জীবন ও ভৌতিক জীবন দিয়েও বুঝিয়ে দেয়। সনাতনের ডায়েরি উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে ঝিনি, কালুয়া আজকের যে সমাজচিত্র দেখছে তা সনাতনের দেখা জীবন থেকে আলাদা কোথায় ? বরং বর্ণ বৈষম্য, জাতিভেদ, অবৈধ প্রেম, স্বদেশপ্রীতি, আদর্শ, কুসংস্কার সনাতনের দেখা জীবনে যেমন রয়েছে রিনি, ঝিনি, কালুয়া, সুপূর্ণার দেখা জীবনে ও সমাজেও রয়েছে। তাই সনাতন ভূত আকারে আজও রয়ে গেছে ও থাকবে। মানুষ নিজের পরিচয় সনাতনের ডায়েরির উদ্ধারের মতো অতীত থেকেই খুঁজে পাবে।

আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসে ডুয়ার্সের কৌম জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে জড়িত উপাদান কেবল রূপক বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি। বরং এই অঞ্চলকে পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করতে, প্রবাহিত মানবজীবনের মূলস্রোতের পাশে তাদের স্বতন্ত্র জীবনযাপন ও সংস্কৃতি, তার বিবর্তন, সংকরায়িত রূপ, সমাজ সভ্যতায় তার প্রভাব আলোচনা সূত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। কৌম সমাজের মানুষেরা প্রকৃতি নির্ভর, সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী শ্রমিকেরা তাই আজও পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, গাছ-পালা, মাটিকে পূজা করে থাকে। মারাবরু, জাহের এড়া, মাছের এড়া, বোঙ্গা এমনই সব দেবতা। তারা প্রকৃতিকে কৃতজ্ঞ জানাতেই 'শারহুল উৎসব', 'করম পূজা' করে থাকে। শারহুল হল ওঁরাওদের ভূমি বন্দনার উৎসব, এই পূজা না হলে তারা চাষবাস শুরু করে না। আবার এই পূজা না হলে সাঁওতাল, মুণ্ডারা শাল, মহুয়া ফুল স্পর্শ করে না, খোঁপায় পরে না। আজ তারা শ্রমিক, চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু তবু পূজা-পার্বণগুলি বাদ দেয়নি। এছাড়াও রয়েছে করম পূজা, জিতিয়া পরব, এরঃকশিম পূজা। বুখলার কথায়—'এরঃকসিম পূজা ঠিকঠাক হলে মারাংবুরু, জাহের এরা, মঁড়েকো দেবতারা খুশি হয়ে বৃষ্টি দেয়। তারা থাকে পাহাড়ে পাহেড়ে, মেঘে মেঘে, জমির আলে, মাটির ভিতর, জমিজমার চারিদিকের চারসীমায়। এছাড়া আছে করম পূজা। জিতিয়া পরব। ভাদরে করম পূজা শুরু হয় আর আশ্বিনের দিন জিতাষ্টমীর ব্রতপালন। কি বলব মাইজি, মানুষ কেন কোন পূজা করে, নিজেই ভালো জানে না। করম পূজা করলে চাষবাস ভালো হবে, জিতিয়া করলে শস্যও ফলবে, বাচ্চা-কাচ্চাও হবে। এরঃকসিম আগে শুধু সান্তালরা করত। এখন আমরাও করি। আমরা করম জাওয়া করি ভাদুইয়ের শুক্লা একাদশীতে, মুণ্ডারা করে করমসূন। ওদের করম শীত বসন্তের উৎসব। তাতে কি? কামনা তো সেই একই। যেন ভালো শস্য হয়। সন্তান-সন্ততি ভালো থাকে। দেবতারা প্রসন্ন থাকে।'[৪] আজ তারা চা-শ্রমিক। ফলে জীবন নিয়ম এবং সময়ের গণ্ডিতে বাধা। তাই বন-জঙ্গল থাকলেও শিকারে যেতে পারে না, চাষ বাস করার জমি পায় না। কিন্তু তবু তারা পূর্বপুরুষের করে আসা এইসব পূজা-পার্বণগুলি ভুলেনি। বিশ্বাস- সংস্কার থেকে সরে আসেনি।

ডুয়ার্সে এইসমস্ত প্রান্তিক মানুষেরা মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ- কবজ, ওঝা-কবিরাজ-ডাইন, গাছ-গাছড়া, জড়িবুটিতে বিশ্বাস করে। তাই দেখা যায়, বুখলা মৃত বাঘের নখ, চুল সংগ্রহ করেছে তাবিজ বানাবে বলে। সোমারি ঝিনির শুভ কামনায় ধনেশ পাখির পালক ছুইয়ে দিয়েছে। আদিবাসীরা রেবেকা মুণ্ডাকে ডাইন ভেবেছে। এরা ভূতে বিশ্বাস করে। উপন্যসগুলিতে ব্যবহৃত মন্ত্র তার পরিচয় বহন করে, যা তাদের নিজস্ব ভাষা মুণ্ডারি এবং সংযোগকারী ভাষা 'সাদরী' তেই উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন—

(ক) পলায়ন রত সাপকে ধরার মন্ত্র-- 'উয়ার বান্ধো শুয়ার বান্ধো
হট্টর মট্টর মাটি ....'[৫]

(খ) ভূত তাড়ানোর মন্ত্র ---'ছন ছন করুয়া ছন ছন দাড়ি
বাম হাতমে সোনে কাটারি '[৬]

মন্ত্রগুলির ব্যবহার তাদের আদিম বিশ্বাসকে যেমন তুলে ধরেছে তেমনি এসব মন্ত্র যে বাঙালি জীবনকে প্রভাবিত করছে তার দৃষ্টান্ত বহন করছে। কেননা আমরা দেখি, এইসব মন্ত্রের প্রতি কালিকাপ্রতাপ, সুপূর্ণা, ঝিনি, সকলের বিশ্বাস জন্মেছে এবং সেই আগ্রহ থেকে শেখার প্রবণতাও তৈরি হয়েছে।

ডুয়ার্সের প্রান্তিক মানুষের জীবনে অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে জড়িত রয়েছে গান, নাচ। 'ডমকচ' গান নামে এক বিশেষ ধরনের গান প্রচলিত রয়েছে এখানকার ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডা, খারিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে। সমীর চক্ররর্তীর কথায়—'দুঃখ-বেদনা, শোক-তাপ, বিরহ, ব্যর্থতা, মৃত্যু, কঠোর জীবন সংগ্রাম—এই সব বিষয় নিয়ে রচিত হয় 'ডমকচ' গান। একথায় দুঃখের গান ডমকচ গান। অনেক সময় মহাকাব্য বা পৌরাণিক ঘটনা বা চরিত্র, ডমকচ গানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ডমকচের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানব-মানবীর হৃদয়ের আর্তির প্রকাশ।'[১৭]উপন্যাসে জীবনবোধের অভিব্যক্তি নিয়ে বাংলা অর্থ সহ তেমনি একটি গান ব্যবহৃত হয়েছে-- 'একে জাগা জনম পালি/ বাড়লি যনে তনে/ জিতিয়া পতইয়া লেখে/ ভেলি ছিতি ছান।/ আয় গেলয়ঁ আন্ধিধুকা/ গির গেলয়ঁ খেড় কুটা/ শুখা পতইয়া লেখে/ ভেলি ছিতি ছান।'[৮]

অর্থাৎ 'সব ভাইবোন আমরা এক জায়গায় জন্মেছিলাম। কিন্তু বড় হতেই জীবনে এল অন্ধকার ঝড় । খড়কুটোর মতো ছত্রাখান হয়ে গেলাম আমরা। শুকনো পাতার মতোই ঝরে গেলাম।'[৯] শীতের সন্ধ্যায় জুট লাইন থেকে ভেসে আসা এই গান ঝিনি, ভুতো, কালুয়াকে অতীতের নির্মল ভালোবাসার স্মৃতিতে যেমন জড়িয়ে দেয় তেমনি হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ভেদাভেদে পূর্ণ বড়দের জটিল পৃথিবী বেদনাহত করে তোলে। জীবন দর্শনের গভীর অনুভবে গানটি একটি গোষ্ঠীর ব্যক্তিক হৃদয়ের উপলব্ধি হয়েও হয়ে ওঠে সর্বজনীন।

এছাড়াও বিবাহ, বিভিন্ন পূজা, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করেও গানের ব্যবহার রয়েছে। ওঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহরীতির 'বর দেখাউনি' পরবের তেমনি তাদের একটি ব্যবহৃত গান হল- 'এহেন বিশিকি নায়ো/ নেও পুত্রিয়ার ভানু/ হন্যে মালা বাঃ

নায় দীয়া গো।'[১০] এটি একটি বড় গান, যার বাংলা অর্থও তুলে দিয়েছেন লেখিকা— 'আমায় তুমি বিকিয়ে দিলে মাগো/ অনেক দূর গভীর নির্জনে/ অলুক্ষণে এমন কথা/ আনতে নেই মনে।/তোর আপনজনা রইল আগে পিছে/কেন তুই এমন করে কাঁদিস মিছেমিছে?...'[১১] গানটি সর্বস্তরের সর্বকালের জগত-সংসারে ঘটা মা- মেয়ের, পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনাকে ব্যক্ত করে।

ওঁরাও সম্প্রদায়ের বিবাহরীতি ও অতিথি সম্ভাষণ উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য সংস্কৃতিতে যেখানে বিয়ের জন্য নারীর মতামত গ্রহণে অনীহা দেখা যায় সেখানে এদের সমাজে নারীর মতামত বিশেষ মান্যতা পায়। বাড়িতে অতিথি এলেও এরা অতিথির পা কাসার থালায় নিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গামছায় মুছিয়ে ধানদূর্বা দেয়। একজন মানুষ তাদের কাছে কতটা কাঙ্ক্ষিত, আদরণীয়---তাদের সমাজে আচরণীয় এই রীতি বুঝিয়ে দেয়। লেখিকা মউলয়ের বিয়ে উপলক্ষ করে এই চিত্র এঁকেছেন।

এসকল নির্বস্তুগত ও প্রয়োগকলামূলক উপাদান ছাড়াও উপন্যাসে থেকে ডুয়ার্সের আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির যে সব বস্তুগত কৌম উপাদান পাওয়া যায় সেগুলি হল---

খাদ্য : কচু পাতা, কুঁদরি, কন্দ, পিলুয়া, ভুট্টা, চিড়ে, খিচড়ি, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি।

অস্ত্র : তির, ধনুক, বল্লম, হাঁসুয়া, কুকরি, ফারুয়া, লাঠি, প্রভৃতি।

তৈজসপত্র : টোকরি, বাঁশের ঝুরি, ডিবরি(কুপি) প্রভৃতি।

লোকনেশা : হাঁড়িয়া, বিড়ি, গাঁজা।

ঔষধ পত্র : কৃমি দমনে--- আশ শ্যাওড়ার পাতার ব্যবহার।

রক্তপাত বন্ধে---পোড়া ন্যাকড়ার ছাইয়ের ব্যবহার। গাঁদা পাতার রসের ব্যবহার।

মাথা পরিষ্কার করতে---রিঠা সেদ্ধ জলের ব্যবহার।

সর্দি-কাশির উপশমে---বাসক, তুলসী, দারুচিনি, লবং, তেজপাতা, গোলমরিচ, আদা আর মিছরি দিয়ে তৈরি পাচনের ব্যবহার।

লোকাভরণ: প্রকৃতির ফুল, পাতা আদিবাসীদের সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহৃত হয়। এরা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পশু, পাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি অঙ্কিত চিত্র কপালে, গায়ে, পায়ে আঁকে (সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওরা)।

এভাবেই কথাসাহিত্যিক তিলোত্তমা ডুয়ার্সের কৌম সমাজের উপাদান ব্যবহার করে এই অঞ্চলের প্রেক্ষাপট, মানবজীবন চিত্র যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনি কৌম উপাদান ব্যবহারেই অতীত-বর্তমানের সমাজসত্য, জীবনবোধকে উদ্ভাসিত করেছেন। চিরকালের সত্যকে বর্তমানে তুলে ধরে বৈষম্যহীন আশাবাদী ভবিষ্যতের বার্তা দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী. স. (১৯৯২). উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা : মনীষা, পৃ.১৪৯
২. মজুমদার.তি.(২০১৭). স্বর্গের শেষপ্রান্তে,কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৫৯
৩. তদেব, পৃ. ৫৬০
৪. তদেব, পৃ. ২৫
৫. তদেব, পৃ. ১৫০
৬. তদেব, পৃ. ২৬৯
৭. চক্রবর্তী.স.(১৯৯২). উত্তরবঙ্গে আদিবাসী চা-শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা : মনীষা পৃ. ২২৮
৮. মজুমদার. তি.(২০১৭). স্বর্গের শেষপ্রান্তে, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৬৮৭-৬৮৮
৯. তদেব, পৃ. ৬৮৭-৬৮৮
১০. তদেব, পৃ. ৫৭৬
১১. তদেব,পৃ. ৫৭৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ঘোষ আনন্দ গোপাল, কার্তিক সাহা, ১৯৪৭- পরবর্তী উত্তরবঙ্গ-১, এন, এল পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০১৩।
২) চক্রবর্তী সমীর, উত্তরবঙ্গের আদিবাসীচা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি, মনীষা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২।
৩) চক্রবর্তী বরুণকুমার, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৫।
৪) দেবসেন সুবোধ, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০১০।
৫) নাথ প্রমোদ, প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের জনজাতি, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৪।
৬) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ২০১৭।
৭) মজুমদার বিমলেন্দু, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, গাঙচিল, কলকাতা,২০২০।
৮) রাণা সন্তোষ, রাণা কুমার, পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৮।
৯) সেন শুচিব্রত, ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ, পরিবেশ ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন', কলকাতা ২০২১।

সহায়ক গ্রন্থাগার :

১) কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার। ২) উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার, কোচবিহার। ৩) সুভাষ পাঠাগার, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।

প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে

মনোজ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ: বহু আলোচিত বিষয় প্রেম। বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্যের সমস্ত শাখাতে প্রেম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা কবিতাতে তো প্রেমের অবস্থান আরো উচ্চে। প্রেম দিয়ে কীভাবে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কয়েকজন নবীন-প্রবীণ কবির কবিতারঅবয়ব নির্মিত হয়েছে, তা-ই এই প্রবন্ধের উপজীব্য।
সূচক শব্দ : প্রেম, বিরহ, স্মৃতিকাতরতা, চিত্রকল্প।

মূল আলোচনা :
প্রেম একটি বহুচর্চিত বিষয়। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, প্রেম ছাড়া মানুষ বাঁচে না। প্রেমহীন মানুষ—মানুষই নয়, বরং বলা চলে সে মানুষ নামক জড়বস্তু—বিশেষ একটি মনুষ্যের প্রতিবিম্ব। মানুষের জীবনে আকাঙ্ক্ষার যেমন মৃত্যু নেই, প্রেম বা ভালোবাসারও মৃত্যু নেই। প্রেমই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে লৌকিক জীবনে। এমন একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ নেই, যার মধ্যে প্রেম নেই। জীবন থেকে জীবনেই প্রেমের সঞ্চার লক্ষ করা যায়। 'প্রেম' মানুষের জীবন-যাপনে একটি প্রথম ও প্রধান বিষয়।সেই প্রেমেরই বিচ্ছুরণ বিভিন্ন কবির দৃষ্টিতে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তা বর্তমানকালের কবিদের কবিতায় উপলব্ধি করা যাবে।

প্রেমের কবিতার বিষয়বিন্যাসে দেখা যায়— ১.বিচ্ছেদজনিত বিরহ ২. স্মৃতিচারণা ৩. মুগ্ধতাবোধ ৪. সৌন্দর্যের কারুলিপি নির্মাণ ৫. প্রেমহীনতার আক্ষেপ ইত্যাদি।

প্রেমের কবিতার অনুষঙ্গে কবিরা লেখেন বিচ্ছেদ না-বিচ্ছেদের কবিতা, যার অর্থ, বিরহে গাথা প্রেমেরই একটি চিত্রকল্প। কবি ঋতুরাজ গোস্বামী বেশ সহজ ভাষায় অথচ গভীর ইঙ্গিতবাহী ভাবের অনুষঙ্গ নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায়—

> 'তোমাকে দেখব বলে যেই উঁকি দিয়েছি জানালায়
> নদী এসে ডুবিয়ে দিল ঘর' (ভালোবাসবো বলে)

আর তখন কবির ভালোবাসার পাখিও—

> 'নৌকার একান্ত ইশারায়

আড়াল টেনে দিয়ে বোহেমিয়ান।'(ঐ)— প্রেম রহস্যময়তায় ঢাকা—যাযাবরও বটে—হঠাৎ যেমন তার আগমন, তেমনি সহসা নিরুদ্দেশ কোন পথে কেউ জানে না।ঋতুরাজের কবিতায় প্রেমের গূঢ়তা বা গাঢ়তার চেয়েও বেশি কিছু—

'মেঘকে রাঙিয়ে দিল রামধনু,
সীমানা ঘেঁসে উড়ে গেল শুকসারিও
তুমিই শুধু অচীন ভঙ্গিমায় নিজস্বী
আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার শ্রাবণের মেঘ

তুমি বিরহ পাঠাবে বল?' (ঐ) —এ যেন ভালোবাসার প্রথম পাঠ, যেখানে কেবল মুগ্ধতার মোহই প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই ঋতুরাজের কবিতার সার্থকতা, একালের পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভাবের ইশারায়।

প্রেমের কবিতার একটি বিশিষ্ট দিক লক্ষ করা যায় অতীতচারিতায়। প্রেম হয়নি, ব্যর্থ প্রেমের চলচ্ছবি এঁকেছেন বহু কবিই। স্মৃতি বড়ো সুখের না হয়ে, বেদনার হয়ে থাকে, হৃদয়ে চিরকালের চিত্তপটে আঁকা হয়ে থাকে। স্মৃতিকাতর বয়ঃসন্ধির প্রেমের ছবি আঁকেনবিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিকবাসুদেব মোশেল তাঁর 'স্মৃতি' কবিতায়—

'মনে পড়ে! শীতের সৌরভ মেখে সেদিন সারারাত
পাপ-পুণ্য জলাঞ্জলি দিয়েছিলে অধিকার চেয়ে'

প্রেমের মোহে মানুষ ভুলে যায় পাপ-পুণ্যের হিসেব। কখনো এক মোহ থেকে আরেক মোহে অবগাহন। খুঁজে পায় না সত্যিকারের প্রেমের অমৃতভাণ্ড—পুণ্য খুঁজতে গিয়ে পাপের জীবনকেই বেছে নেয়। আর তখন নিখাদ প্রেমের পূজারী ডুবে যান স্মৃতির অতলে। অতীত আর বর্তমান, সুখ আর বিরহ-বিচ্ছেদকে মিলিয়ে দেন বিষণ্ন আবেগে—

'মনে পড়ে 'বাসুদেব' নামে কেউ পায়ের চাতালে এখনো থাকে-
তবুও তার কথা পড়ে না মনে। সে এখন থাকে
কোন এক অলৌকিক ধূসর জগতে-।' (স্মৃতি)

প্রেমের এই স্মৃতিচারণা বাংলা কবিতার ও কবিদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতার দিক বলেই চিহ্নিত করতে হয়। প্রেমের স্মৃতিময়তার আক্ষেপ ও না পাওয়ার বেদনার মৃদু আর্তির প্রকাশ বিলক্ষণ বোঝা যায়। প্রেম, সে ব্যর্থই হোক, সার্থকই হোক, 'ব্যর্থপ্রেমের আবর্জনামুক্ত' নন যেন কোনো কবিই—সে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অর্বাচীনকালের কবিরাও। বর্তমানকালের বহু কবিই হৃদয় খুঁড়েই বেদনার কথা স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করেছেন। যেমন রবীন বসুর কবিতায় ব্যর্থতার মধ্যেও প্রেমিক সত্তার আশাবাদের বিমূর্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়—

'কোনো সাঁকো খুঁজে পাইনি আজও
যা পার হলে প্রেম অগস্তযাত্রা থেকে ফেরে।'(প্রেম অগস্ত্যযাত্রায়)

বিকাশ দাশ তাঁর 'আক্ষেপানুরাগ' কবিতায় ছন্দোবদ্ধ প্রেম ও স্মৃতিমেদুরতায় খোঁজেন হারিয়ে যাওয়া ফেলে আসা স্মৃতির মোড়ক থেকে উদ্ভাসিত দিনগুলিকে এই ভাবেই—

'তীর আজও বুকে বিঁধে আছে দেখি খচ খচ করে তাই
সব আছে দেখি আগের মতোই সেই শুধু পাশে নাই।'

কিংবা,

'সুখে থাক সবাই হাসি মুখ নিয়ে আমার মুখেতে ছাই
পরজন্মে আমি বিশ্বাসী নই তবু যেন তাকে পাই।'

ভাব সঞ্চারে বাধা হলেও প্রেমানুভূতির একটা আভাস তরুণ কবিদের প্রেমের কবিতায় ঋজু হয়ে ওঠে। নতুন কবিদের কবিতাও সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে পাঠকের হৃদয়ে—তা দুর্বোধ্য হলেও। বুঝতে হবে, দুর্বোধ্যতার কারণ আর কিছু নয়, বর্তমান সমাজের অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতা। যেমন কবি ঋত্বিক মল্লিকের কবিতায় আবছা একটা চিত্রকল্পের আভাস মেলে, অবকাশ মেলে না বোঝার—

'মানুষই ব্যাস যেন
আর ব্যাসার্ধ গুলো
কোনো এক নাটকের শুধুই কোরাস।'

(একটি জ্যামিতিক প্রেমের কবিতা)

আরো কয়েকজন কবির কবিতা আপাত দুর্বোধ্য মনে হলেও, মনোযোগী পাঠকের পক্ষে কবিতাগুলি প্রেমের অনুষঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—

'যতদূর চোখ যায়, অসীম বরফ
শুকনো, পাতাঝরা বার্চ গাছে বসা বিদেশী পাখির
ডানায় আলোড়ন। যাতে, কলকাতাও দুলে, কেঁপে ওঠে

*　　　*　　　*

তুমি ক্লান্ত জেট ল্যাগ, তুমি ভিন্ন প্রবাসের ফুল।' (আমি ও তন্‌হাই)—কবি অর্ণব সাহা একজন পরিচিত গবেষক-কবি। তাঁর এই দুর্বোধ্য চিত্রকল্পে রচিত কবিতা পাঠকের দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, কিন্তু কাব্যের উপস্থাপনা ও ভাষার সমন্বয়ে তাঁর কবিতা মুগ্ধ করে পাঠককে।

প্রেমকে চিরস্থায়ী, পবিত্র, স্বর্গীয় এক সম্পর্ক বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানকালের প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে তা আজ ক্ষণিকের সুখমাত্র। প্রথম সারির প্রতিষ্ঠিত কবি অংশুমান কর। একবিংশ শতকের প্রেমের ক্ষণস্থায়ীত্ব, ঈর্ষা-সন্দেহের দিকটি যেমন তাঁর কবিতায় রয়েছে, তেমনি প্রেমে উপেক্ষার হৃদয়-নিঙ্গাড়ানো উপলব্ধিও প্রকাশ পেয়েছে—

'লোকে প্রেমে পড়ে
পৃথিবীর কঠিনতম আঘাতের চেয়েও
আরও ভয়ংকর, আরও অবহেলা
শুধু এইটুকু বুঝবে বলে।' (কেন)

আরেক প্রতিষ্ঠিত কবি সৌম্যজিত আচার্য। তিনি অপূর্ব কোমল ভাষায় প্রেমের নৈর্গিক চিত্রকল্প এঁকেছেন 'এমন মাঝেমধ্যে হয়' কবিতায়—

'চুলে মৌসিনরামের বৃষ্টি বুলিয়ে তুমি হেঁটে আসছ এদিকে।
এগিয়ে আসছ আর গাঢ় মেঘের মতো
এক এক করে খুলে ফেলছ পালক...' '

প্রেমে আছে আনন্দ-সুখ, আছে বিরহ-দুঃখ। আনন্দ-দুঃখ নিয়েই প্রেমের ভুবন। কবি কৃষ্ণপদ দাস এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই দুঃখকে ভুলে আনন্দের নির্যাসটুকু গ্রহণ করতে চান—

'দুঃখ আমিও পেয়েছি; তুমিও তাই!
যতক্ষণ থাক কাছাকাছি আরও শুধু
সুখে ভরা জীবনের গান গাই।' (দিঠি)

কবি যতীন্দ্রনাথ সরকার। তিনি স্মৃতির আবেশে ডুব দিয়ে তারুণ্যের প্রেমকে ছুঁতে চান। প্রিয় মানুষটিকে শুধু একবার দেখার জন্য বিছানার আরাম ছেড়ে ওঠে পড়েন সেই ভোরে, প্রথম লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার আগেই—

'তোমাকে দেখবো বলে
উঠেছি কোন ভোরে

* * *

ভোরের প্রথম লঞ্চ—
সিটি দিয়ে তখনো যায়নি গঞ্জের দিকে
কতদিন দেখিনি তোমাকে!' (ছুঁয়ে যায়)

কবির স্মৃতির সকাল-সন্ধে-দুপুর ছুঁয়ে থাকে ফেলে আসা প্রেমের গীতি—খোঁপার ফুল, নূপুরের ধ্বনি, চেনা গন্ধের আবেশ ছড়ায় মনে—

'খোঁপার ফুলে, নূপুরের বাঁশিতে
তোমার নিজস্ব গন্ধে
তোমাকে পেয়েছি কতবার
দৃষ্টির কাজল-সরু পথ
পারাপার করেছে আমায়—কতদিন!' (ঐ)

আমরা ছবি তুলি ক্যামেরায়। অ্যালবামে তা যত্ন করে তোলা থাকে। অ্যালবামের পাতা উল্টে উল্টে দৃশ্যমান হয় সে ছবি। কিন্তু হৃদয়-ক্যামেরায় তোলা ছবি সর্বক্ষণ চোখের সামনে দৃশ্যমান। কবি শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের চোখের সামনে প্রথমে ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি দৃশ্যমান হয়—

'ক্যামেরায় চোখ রাখতেই
এক ঝলক হাসি উজ্জ্বল ও-মুখে
লাল টিপ—একরাশ কালো চুলে

সাদা জুঁইয়ের মালা—প্রথম দেখা’ (দেখা)

কিন্তু অচিরেই ক্যামেরার সেই ছবি কবির হৃদয়ে স্থান করে নেয়—ক্যামেরা, অ্যালবাম একদিন আস্তাকুঁড়ে মিশে যায়, কিন্তু হৃদয়ের সে ছবি চির অমলিন—

‘ক্যামেরায় চোখ রেখে—না রেখে।
খোলা চোখে—নির্জনে বোজা দু’চোখে
সেই মুখ, সেই হাসি, সেই জুঁইয়ের মালা,
জুঁই রজনীর সাদা রঙেই সাত রঙের খেলা।’ (দেখি)

একালের প্রেম দ্রুত যেমন গড়ে, তেমন ভাঙতেও সময় নেয় না। তখন বিচ্ছেদের মাঝেশুধু জেগে থাকে কিছু সুখস্মৃতি। নবাগত কবি চন্দ্রিমা ব্যানার্জীর কবিতায় ওঠে আসে ফেলে আসা দিনগুলির কথা—প্রিয়জনের হাত ধরে পথ পরিক্রমা, পার্কে কাঁধে মাথা রেখে আদর-স্পর্শের সুখানুভূতি। কিন্তু সেই মধুর দিনগুলি আজ ধূসর বিরহের আবহে অবগুণ্ঠিত—

‘পাশাপাশি হাঁটা হয় না আর;
কাঁধে মাথা রাখা আদরগুলো
হারিয়েছে বদ্ধ বাতাসে।’ (অসমাপ্ত প্রেম)

কখনো স্মৃতির সরণি বেয়ে ওঠে আসে একসাথে বৃষ্টি ভেজার মুহূর্ত, কিংবা উঁকি মারে ডায়েরির পাতায় ভালোবাসার বর্ণমালাগুলো। যদিও সে বৃষ্টিভেজা সুখ আজ শীতের রুক্ষতায় অপসৃত—ডায়েরির আখরগুলো মৃত ভালোবাসার বর্ণহীনতায় ধূসর—

‘একসাথে বৃষ্টিমাখা মুহূর্তেরা
শীতের শুষ্কতায় চাপা পড়েছে বহুদিন।

তবুও ডায়েরির ভাঁজে মৃত ভালোবাসা আঁকড়ে রাখি।’(ঐ) — তবুও ভালোবাসা আগলে ধরে প্রেম বেঁচে থাকে। সে মধুরই হোক কিংবা দুঃখের। সেই স্মৃতিকে সহজে মুছে ফেলা যায় না। বরং সেই স্মৃতির টুকরোগুলি জুড়ে জুড়ে লিখিত হতে পারে ইশতেহার। তেমনই অসমাপ্ত প্রেমের বিরহ-গাথা পাঠককে উপহার দেন কবি—

‘কিছু শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে ইশতেহার লেখা হয়;
এখনও অনেক দূরে কোথাও মুহূর্তেরা বেঁচে আছে হয়তো,
সমাজের জটিল সমীকরণের সমাধান করতে গিয়ে
প্রেম অসমাপ্তই থেকে গেল—’ (ঐ)

তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় আশাবাদের কবি। জীবনে যতই মন্দ সময়, হতাশা আসুক সবেতেই প্রজ্জ্বলিত রাখতে চান প্রেমের দীপ্ত শিখা—

‘হতাশার নিগূঢ় অন্ধকারে আকাঙ্ক্ষার সেতু রূপে তোমাকে চাই
ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা নিয়েও তোমার হৃদয় মাঝে ঝুলে থাকতে চাই।’

একটাই জীবন আমাদের। এ জীবনেই প্রেমের সব চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে চায় অনেকে। কিন্তু অনেক প্রেমভীরু নায়িকাই সংশয়ে পারে না নিজেকে প্রেমে উৎসর্গ

করতে। এ তো নায়িকাদের সমস্যা! কিন্তু কত প্রেম তৃষাতুর ভীরু নায়কও আছে, যারা প্রেমের জন্য কাতর। অথচ প্রেম যখন দুহাত বাড়িয়ে কাছে ডাকে, তখন লাজুক প্রেমিক পালিয়ে বাঁচে! যেমনটা দেখেছি কবি সপ্তর্ষি চক্রবর্তীর ‘এলোমেলো খোয়াবনামা’ কবিতায়—

‘হরিণ চোখের চাহনিতে
কাঁপতে থাকা বিষণ্ণতা
যেন ধাওয়া করে আমায়।
পালিয়ে এসেছি শতাব্দী দূরত্ব
গ্রীক নাবিকের বেশে
পান্নারঙ সমুদ্র থেকে ধূসর তাম্রলিপ্তে।’

রাধা আর কৃষ্ণ প্রেমের শিরোমণি। আধ্যাত্মিকতার খোলস সরিয়ে দিলে তাঁদের প্রেমে মর্ত্য নরনারীর প্রাত্যহিক প্রেমকেই উপলব্ধি করা যায়.কবি স্বপন নন্দী রাধাকৃষ্ণের সেই চিরন্তন প্রেমকাহিনীকেই পুনর্নির্মাণ করলেন—

‘এই বসন্তরাগে তুই চন্দ্রাবলী
জেগে ওঠো কিশোরী অনন্ত ফাগুনে
আরক্তিম গৈরিক মুগ্ধ পদাবলী
সৃজন করেছি স্বপন মধু বৃন্দাবনে।’ (বসন্তকথা)

প্রেমে আনন্দ যেমন আছে, জ্বালাও কম নেই। ভালোবাসায় ঈর্ষারও সমান্তরাল অবস্থান। যত বেশি প্রেম তত বেশি ঈর্ষাকাতরতা, কখনো হিংসার পথও খুলে যায়। কবি সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় তারই ইঙ্গিত—

‘চলবি না পথ, করবি না ঘর?
বিমুখ হলো মন—
প্রেমই হলো হিংসা, আমায় জ্বালায় সর্বক্ষণ।’ (প্রেম ও হিংসা)

প্রেম শাশ্বত—টুকরো টুকরো সুখ দিয়ে গড়ে ওঠে প্রেমের বসত বাড়ি। কবি মোস্তাক আহমেদ শোনালেন প্রেমের চড়ুইয়ের চিরন্তন জীবনরসের গল্প—বাতিল খুঁটিনাটি দিয়ে ছোট্ট সুখের ঘর—যেন প্রেমবৃন্দাবন—ঠোঁটে ঠোঁটে সুখের মিলন, যা জীবনের সাথে মিশে থাকে—

‘লিখে ফেলে দুই চড়ুই-এর গল্প—
ছোটো ঘর, ছোটো ঘুলঘুলি তার ইতিহাস জানে।
কত খড়-পাতা জমা হয়, গৃহস্থের বাতিল খুঁটিনাটি কত!
* * *
কি সুখে চাঁদ নেলে এল মাটিতে
কি সুখে ঠোঁট ছোঁয়ালে ঠোঁটে
জীবনের গায়ে গায়ে সে সুখ মিশেছে জেনো।’ (সম্পৃক্ত উপলব্ধি)

শ্রীকৃষ্ণ যুগাবতার। যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব—সেই কাল্পনিক দ্বাপর যুগ থেকে চৈতন্য অবতার রূপে নদীয়ার বাস্তবের মাটিতে তাঁর মহিমময় পদচারণা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের শিরোমণি, রাধা তাঁর হ্লাদিনী প্রেমশক্তি। আবার চৈতন্য রাধা ও কৃষ্ণের যুগল অবতার—একই সঙ্গে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমাস্বাদনে বিভোর। কবি ব্রজেন্দ্রনাথ ধর রাধাকৃষ্ণের মিথীয় ভাবনার সঙ্গে চৈতন্যীয় বাস্তবতাকে মিলিয়ে অপূর্ব এক কবিতার জন্ম দিলেন—

‘এ কেমন শরীর ধরেছি আমি
দ্বাপর পেরিয়ে এই নদীয়ায়
নারীর শরীর নয় তবু
পুরুষ উত্তর এক নারীর শরীর
ক্ষমা করো বিষ্ণুপ্রিয়া’ (রাধা হব বৃন্দাবনে)

সযত্নে জনৈক প্রেমিকা জুঁইফুলের পরিচর্যা করে চলেছে, আর বুকে লালিত প্রেম। জুঁই ফুলের অনুষঙ্গে প্রেমের উদ্ভাস কবি রজত কিশোর দের কবিতায়—

‘জুঁইফুলের চারা অনিমেষদার হাতে—
সময় তরঙ্গিত হয়, পাঠ-সাঙ্গ কলেজের পরে
স্নান করাই দুই বেলা—
বিকশিত জুঁই—এখন অনিমেষের ইশারায়!’ (কিংবা প্রত্যাশা)

প্রেম অবিনশ্বর। মৃত্যুকে ডিঙিয়েও তার চলা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে। প্রাবন্ধিক-কবি সনৎকুমার নস্করের কবিতায় প্রেমকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়ার প্রদীপ্ত তৃষ্ণার কথা প্রকাশ পেয়েছে। অনিবার্য মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে দুটি প্রাণ, কিন্তু রেখে যাবে প্রেমের বীজমন্ত্র—পরবর্তী প্রজন্মের গর্ভে—

‘আমরা সেই মৃত্যুকে ডিঙিয়ে যেতে চাই নীলা।
শুধু আমার হাত ধরো একান্ত বিশ্বাস আর প্রদীপ্ত তৃষ্ণায়,
জীবন-তরণী বাওয়া নয় আর
তরীটাকে জীবন করে নেওয়া যায় কিনা ভাববো এবার।
তারও পরে মৃত্যুর একান্ত ইঙ্গিতে,
দু’প্রান্ত হতে দুজনে ছিটকে যাবো অজান্তেই—
আমাদেরও কল্পনার গর্ভে জন্ম নেবে আরো এক প্রেমিক প্রজাতি।’
(প্রেম ও প্রজাতি)

রামরাজ্যের রাজনীতি ছুঁয়ে, ইতিহাসের অন্বেষণে কলকাতার অলিগলি পরিভ্রমণ করেও, শ্যামলী পাহাড়ের শ্বাস আর বনতুলসীর গন্ধে উজ্জীবিত হয়েও প্রেমের সমাধিলিপি রচনা করেন কবি মলয় রক্ষিত। প্রেমের ক্ষণস্থায়ীত্ব কবিকে ব্যথিত করে তোলে, তাই তাঁর উপলব্ধি—

‘আসলে কী জানো প্রিয়

একবিংশ শতাব্দীতে প্রেমের আয়ু বড়োজোর দুই কি এক ঘন্টা'
(এপিটাফ লিখছি আমি)

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী সকলের কাছে পরিচিত বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক হিসেবে। কিন্তু এখনকার প্রেমের নানা অসংগতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। প্রথম দেখাতেই প্রেম। তারপর ঘোরাঘুরি, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, দিনরাত মোবাইলে কথোপকথন, উপহার দেওয়া, জোর করে হলেও দেহ সুখ আদায় করে নেওয়া— এসবই এখনকার প্রেমের প্রবণতা। বিশেষত বেকার ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রেমের বিড়ম্বনা আরো বেশি। মেয়ে ভালো চাকরিওয়ালা ছেলে পেলে কেটে পড়তে একটুও সময় নেয় না। তখন বেকার প্রেমিকের হৃদয়-যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া কোনো পথ থাকে না। তাই কবি তাদের শতর্ক করেছেন এইভাবে—

'প্রেমিকের পথ বড় পঙ্কিল শুনো প্রেমিকজন
দেখে শুনে যাচাই করে তবে দেবে মন।' (সতর্কীকরণ)

নীলকন্ঠ ভ্রমণ কাহিনী, ছোটগল্প লিখিয়ে হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত। কিন্তু তিনি অসাধারণ কবিতাও লেখেন। প্রকৃতি এবং প্রেম তাঁর কবিতার কোলাজ। তিনি মুগ্ধতার ছবি আঁকেন অতি সহজ ভাষায়—

'ঝাউ গাছের মাথা ছুঁয়ে লাল রং দেখে
আমার খুব ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে—
অথচ রঙের তুলি আমার মনে
অন্ধকারের প্রলেপ বুলিয়ে যায়
আমার আঁকা হয়ে ওঠে না।' (কখনও আমি)

কিংবা প্রেমিক হতে না পারার আক্ষেপ থাকলেও তিনি সহজ শিল্পিত ভাষার বুননে সৌন্দর্যের এক অপরূপ ছবি পাঠককে উপহার দেন—

'ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা ছুঁয়ে প্রথম চুম্বনের
লাল আভা আমাকে
আবেশে ডুবিয়ে দেয়।
প্রেমের সে রঙিন ছোঁয়ার স্বপ্ন
আমাকে প্রেমিক বানাতে চায়—
অথচ প্রেমিক হয়ে ওঠার গোপন
চাবিকাঠি আমার জানা নেই।'

প্রেমের জন্য মানুষ সবকিছু করতে পারে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—'আমি বিষ পান করে মরে যাব'। কবি অহীন্দ্রনাথ ঘোষও নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ঠোঁটে চুম্বন করতে চান—

'বড্ড ইচ্ছে করে একটু চুমু দিতে—
....

ওখানে বিষ আছে!” (মৃত্যুকেও ভালোবেসে)— তবুও কবি সেই বিষামৃত পান করে, ভালোবাসার জন্য মৃত্যুকেও ভালোবেসে যেতে চান আজীবন—

‘ও ঠোঁঠে মৃত্যু লেখা আছে—! থাকুক—
ঐ বিষ-সুধায় অন্ততঃ জীবনটা বাঁচুক!’ (ঐ)

মানুষ অতীতকে ভুলে থাকতে পারে না—তবুও যারা মুখ লুকোতে চায়, অতীতের প্রেম-ভালোবাসা ভুলে যারা নতুন করে গড়তে চায় ভালোবাসার সৌধ, একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার মনে কি জাগে না পুরোনো স্মৃতি—বিদ্রুপ করে না নিজের প্রতিচ্ছবি? নবাগত কবি সৌরভ পাঁজার কবিতায় তারই প্রতিধ্বনি—

‘জলের আয়নায় মুখ দেখে লজ্জা পাস না তুই।
হালকা হাওয়ার মেঘ তোকে ঢেকে ফেলেছে
তোর অতীত বর্তমান।’ (জলের আয়না)

বৃষ্টি আর প্রেম একে অপরের পরিপূরক। বহু কবির কবিতায় তাই বৃষ্টির অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। প্রেমিক-প্রেমিকার বৃষ্টিভেজা মাতাল প্রেমের ছন্দিত রূপ ধরা পড়েছে কবি সাবিনা সৈয়দের কবিতায়—

‘এক ছাতাতে আমরা দুজন
জল ছেটানো পাগল সুজন।
উলোট্ পালোট্ খেলার ছলে
হারিয়ে যাবো তোর বুকেতে!
বর্ষা নেশায় মাতাল হবো
তোর গালেতে বৃষ্টি খাবো!’

কবি বাদল সরকার। তাঁর বসন্ত থমকে আছে প্রেমের দুয়ারে। প্রেমানুরাগের পরাগ ছুঁয়ে ভোরের বাতাসে ভাসিয়ে দেন চিঠি—আহ্বান করেন একান্ত কামনায়—

‘ভোরের বাতাসে লিখেছি চিঠি—
তুমি এসো, এসো ফিরে
এই নীরব বাসরে
আমার বসন্ত থমকে দাঁড়িয়ে
তোমার দুয়ারে।’ (আমন্ত্রণ)

কবি সাবিনা ইয়াসমিনের কবিতায় বলিষ্ঠ প্রেমের আহ্বান ধরা পড়েছে—

‘এসো, মেপে যাও জ্বর, মেপে যাও জন্মদাগ, অভিমান, অনায়াস পাহাড় চূড়ার সীমানা। মেপে যাও আমার দিন রাত্রি বিছানা বালিশ, পালিশ করে রাখা স্বপ্নজাল।’

(জরিপ)

বসন্ত আর বসন্তসেনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি পঙ্কজকুমার নাথ সৃজন করেন এক পেলব কবিতার—

‘এ বসন্তেতোমাকে ছুঁয়েই দিলাম।
... ...
এ বসন্ত শিমুলের নয়
এ বসন্ত পলাশের নয়।
... ...
এ বসন্ত সামাল-সামাল
মনমাতাল বনচাতাল’ (বসন্তসেনা)

একালের কবিতার অলংকরণ, ছন্দবৈচিত্র ইত্যাদি কারুশিল্প ছাপিয়ে, বিচ্ছেদ-বিরহ-স্মৃতিকাতরতা-আক্ষেপইত্যাদি বিষয়বিন্যাসের বৈচিত্রই প্রকট হয়ে উঠেছে। এটাই হয়তো এযুগের লক্ষণ।

তথ্যসূত্র :

মনোজ মণ্ডল সম্পাঃ, প্রেমের কবিতা, মরালী প্রকাশনী, ২০২৩ (আলোচিত সবকটি কবিতাই এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যে গীতার প্রভাব

অমিত রায়
সহকারী অধ্যাপক, চাঁচল কলেজ, মালদা

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মর্মবাণী হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি মোক্ষলাভের যে পথ নির্দিষ্ট করেছে সেই পথে আপাতবিরোধ রয়েছে ঠিকই, তবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই বিরোধের সমাধান ঘটিয়ে নানা দার্শনিক মত ও পথের অপূর্ব সমন্বয় সাধন দেখিয়েছে। গীতা একাধারে উপনিষদ্ ও যোগশাস্ত্র। কারণ হিসেবে বলা যায়, উপনিষদের জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে গীতার জ্ঞানের বিষয়ের বহুবিধ সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে যোগ শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থবোধক অর্থাত্ সর্বতোভাবে কর্মে কুশলতা লাভ করাই যোগের মূল কথা, এই বিষয়ে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

"তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" ইতি।

এই পবিত্র গ্রন্থটি যুগযুগ ধরে ভারতবাসীর জনমানসে, ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। ধনীর প্রাসাদ থেকে শুরু করে দরিদ্রের কুটীর পর্যন্ত এই পবিত্রগ্রন্থের অমৃতবাণী আজও পরমশ্রদ্ধায় পঠিত হয়। সেই সুধানিশ্রাবী বাণী শ্রবণ করে মানুষ পবিত্রতার স্পর্শ পায়। মানুষ সামাজিক জীব, স্বাভাবতই রাষ্ট্রচেতনা, ধর্মিয় বিকাশ প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াকার্যগুলি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলত একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সংঘাত সমাজের পরিবেশ পরিবর্ধিত হয় অপরদিকে রূপান্তরিত পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মনে নানা পরিবর্তন আসে। স্বাভাবিকভাবেই জন্ম নেয় নব নব জ্ঞান, ভক্তি চেতনা, কর্ম ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত বাণীতেও জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমস্ত বিষয়গুলির সমন্বয় সাধন ঘটেছে এবং যা গীতা নামক ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক বাঙালী সাহিত্যিক তাদের স্ব রচিত সাহিত্যে গীতাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন এবং গীতার বাণীগুলিকে মানব জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার মুখ্য প্রেরণা হিসেবে তুলে ধরেছেন। এমনই একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিক হলেন শ্রী নবীনচন্দ্র সেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন সমকালের আধুনিক প্রখ্যাত কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী তিনি ১৭৬৮ শকাব্দে চট্টগ্রামের নয়াপাড়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত রায়ের বংশে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন গোপীমোহন রায় এবং মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ করেছিলেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। যা কবির নবম প্রকাশিত এবং সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ। সমকালের সম্পূর্ণ অনুবাদ গ্রন্থ। শ্রী নবীনচন্দ্র সেনের নামে প্রকাশিত মোট ১৮টি গ্রন্থের কথা জানা যায়। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' নামক কাব্যগুলির স্থান যথাক্রমে সপ্তম, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ। প্রথম কাব্যগ্রন্থটি ১৮৮৭ খ্রী. থেকে শেষটি

১৮৯৬ খ্রী প্রকাশকালের ব্যবধান হলেও কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই ত্রয়ীকাব্য রচনার সময় কবি নিজের অবস্থা বিষয়ে 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন-

> "তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায় কখনও ভাবে, কখনও বা ভক্তিতে কখনও বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিত... আমি চতুর্দশ বর্ষব্যাপী শ্রীভগবানের লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম"।

'প্রভাস' কাব্যের শেষে কবিনিজের অবস্থা বিষয়েআবারও লিখেছেন-

> "চতুর্দশ বর্ষ মাগো, এরূপে বসিয়া ধ্যানে
> দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, এরূপ বিমুগ্ধ প্রাণে।
> পাইয়াছি শোকে শান্তি পাইয়াছি দুঃখে সুখ
> প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক"।।

'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' এই ত্রয়ীকাব্যের মাধ্যমে নবীনচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকৃতি ও জীবনাদর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ত্রয়ীকাব্যে গীতাহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর প্রকাশ, গীতার ভক্তি-শরণাগতি, নিষ্কামপুরুষোত্তম তত্ত্বাদির বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। কবি তাঁর রচনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শকে ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের এক অন্যতম আদর্শ মার্গ বলে মনে করতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত আদর্শ মার্গটি হলো 'নিষ্কাম কর্ম' বা 'অনাসক্ত কর্ম', আর এরূপ কর্মের মাধ্যমেই ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত ধর্মরাজ্যই ছিল ভারতের প্রথম সম্রাজ্য, সুতরাং একথা বলতে দ্বিধা নেই আমাদের দেশে পুনরায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর নির্দেশিত মার্গকেই অনুসরণ করতে হবে। গীতোক্তনিষ্কাম কর্ম বা অনাসক্ত কর্মের বিষয়ে কবি নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' গ্রন্থে বলেছেন-

> "অতি মানুষিক শক্তি বলে ও কৌশলে একসঙ্গে ধর্ম, রাজ্য ও সমাজ সংস্কার করিয়া এবং তিনিই নিষ্কাম তত্ত্বের উপর স্থাপিত করিয়া এই মহাধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্র অন্য সকলের অবজ্ঞার কারণ। তাঁহারা এক এক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন পৃথিবীর কোনও অবতার বা ধর্মপ্রচারক তাহা করেন নাই, তাই তিনি পূর্ণ ভগবান।আমি এই দুই মহামূর্তি দেখিলাম এবং ভক্তিতে অধীর হইয়া প্রণত হইলাম – একদিকে রৈবতক কুরুক্ষেত্রে, প্রভাস অন্যদিকে অমিতাভ অঙ্কুরিত হইল"।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে পুরাণাশ্রয়ী ধর্মচেতনা ও তদাশ্রিত সাহিত্য সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের ফলে বাংলা সাহিত্যের একটি বিচিত্র বিকাশ ধারা পরিলক্ষিত হয়, যা এক প্রকার নূতন কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনার পথ খুলিয়া দেয়। মহাভারত ও ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা পাঠে ব্যাকুল হয়ে কবি বিশাল মহাকাব্যের পটভূমিকার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনখানি কাব্যে (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) কৃষ্ণের লীলামাধুরী

চরিত্রাদর্শ ও অবতারবাদের এক নূতন মহাভারত রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কবি নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে মহাভারত ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শকে মিলিয়ে দিয়ে এক নূতন মহাভারত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। 'গীতাধ্যান' নামক গ্রন্থে মহাভারতের মাহাত্ম বিষয়ে কবি মুখে ফুটে উঠেছে-

> "মহাভারত বলিতে শুধু গ্রন্থখানিকেই বোঝায় না। একটি বিরাট ভুখণ্ডকেও বোঝায়। ...মহাভারত নামক বিরাট দেবভূমি যে অখণ্ড সংস্কৃতি তাহারও নাম মহাভারত। ...মহাভারত একটি গ্রন্থের নাম,মহাভারত একটি ভূখণ্ডের নাম। মহাভারত সেই ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির নাম"।

কবির মহাভারত ও গীতা চর্চার বিষয়টি কতখানি গভীর ছিল, তা আরও একটি ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে রাজগীরে শিবিরে বসে মহাভারত পড়তে পড়তে কবির প্রথম ধারণা হল যে- মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য নয়, ঐতিহাসিক মহাকাব্য। গ্রন্থটি মহাকাব্য হলেও সেটির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে ইতিহাস প্রবাহিত হয়েছে এবং এখানে যে ভৌগলিক নির্দেশ ছিল বর্তমানেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। আবার তার বহির্ভাগে সেই বৌদ্ধ ইতিহাসের রাজগৃহের ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপরাশি ও গিরিগুম্ফা এখনও সেই পূর্ব ইতিহাস নীরবে দর্শকের নয়নে উদ্ঘাটিত হয়। এই ভাবনার পরিপেক্ষিতে কবির হৃদয়ে দুটি মহামূর্তি পূর্ণিমা সন্ধ্যায় পূর্ণ চাঁদের মত ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে- যার মধ্যে একদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে রয়েছে শ্রীবুদ্ধ। এই দুই মহামূর্তির খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারত যে মহাসম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তারই নাম মহাভারত। এই আলোচনার মাধ্যমে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, কবি নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে মহাভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং গীতার উপদেশ বিষয়ে অধিকতর উৎসাহি ছিলেন।

ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এবং এই যুদ্ধের মধ্যস্থলে গীতার আবির্ভাব হয়েছিল।লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত মহাভারতের এই অংশটি সাহিত্য প্রেমিক থেকে শুরু করে পাঠকবর্গ প্রভৃতি সকলের কাছে আজও খুবই আকর্ষনীয় হয়ে রযেছে। কবি নবীনচন্দ্র এই যুদ্ধের নামানুসারে কাব্যটির নামকরণ করেছেন 'কুরুক্ষেত্র'। তিনি এই কাব্যে 'কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ' কথাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন-

"জগৎ তাঁহার রথ, অনন্ত তাহার
কুরুক্ষেত্র, শক্তি অস্ত্র, অনন্ত সমর-
সৃজন পালন নয়, অনন্তে সাঁতার
দিতেছে সে মহারথ কল্প কল্পান্তর।।"

কর্ম ও ধর্মের সন্মিলনে মূর্তিমতীরূপী হল 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। তাই কুরুক্ষেত্রের কর্ম কোলাহলে মিলেছে ধর্মের মোক্ষ সুধা। অধর্মের নাশ করতে গিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা

স্মরণ করে অর্জুন আত্মীয়বর্গের মুখ দর্শন করে মোহগ্রস্থ হয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন-

"নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।।"

অর্থাৎ হে কেশব! আমি লক্ষণগুলিও সব বিপরীত দেখতে পাচ্ছি এবং যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকে বধ করে শ্রেয় কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পুনরায় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেন- "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।।"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাই না, রাজ্য চাই না এবং সুখভোগও চাই না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কী লাভ? ভোগে কী লাভ? এবং বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

উপরিউক্ত শ্লোকগুলি কবি নবীনচন্দ্র তাঁর 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে বাঙ্লা তজর্মা করেছেন কবিতার ছন্দে। উক্ত শ্লোকসমূহের অনুবাদ আমরা অভিমন্যুর মুখে শুনতে পাই-

"কি কাজ রাজ্যে গোবিন্দ, কি কাজ ভোগ জীবনে
যাদের কারণ
চাহি রাজ্য-ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে
ত্যজিতে জীবন
হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি
হে মধুসূদন।"

কবি নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যের মধ্যে আরেকটি হলো 'রৈবতক'। কাব্যটি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যটি রচনার পূর্বে নবীনচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার মধ্যে অবকাশরঞ্জিনী, ভারত উচ্ছ্বাস, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রৈবতক রচনার পরে কবির মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। কবির নিকট একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে – মানুষ নিমিত্ত মাত্র। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাকে। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মুখে শোনা গিয়ে ছিল- নিমিত্তমাত্রং তব সব্যসাচিন্। তবে কিছু সাহিত্য সমালোচকের মতে রৈবতক রচনার পর কবি নবীনচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন। তিনি এই পর্যন্ত গীতা পড়েন নি। এ বিষয়ে কবির নিজস্ব উক্তি 'আমার জীবন' গ্রন্থে আছে-

> "আমি এ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়ি নাই। ভাগবতে ও মহাভারতের উপখ্যানভাগের বঙ্গানুবাদ পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল তাহাই রৈবতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

বস্তুতঃ রৈবতক রচনার পূর্বে নবীনচন্দ্র গীতা পড়েন নি একথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এই কাব্যে গীতার মূল ভাবাদর্শ নিষ্কামকর্ম ও ভগবদ্ শরণাগতির ছাপ পড়েছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই কাব্যের স্থানে স্থানে-

"এস মিলি ইহজন
করি আত্মসমর্পণ
এই কর্ত্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ পদে সমর্পিয়া।
একধর্ম এক জাতি
এক রাজ্য এক জাতি
সকলের এক ভিত্তি সর্বভূত-হিত,
সাধনা নিষ্কাম কর্ম।
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
একমেবদ্বিতীয়ং করিব নিশ্চিত
এই ধর্ম রাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"

কবি নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য হল- 'প্রভাস'। এই কাব্যটির বিষয়ে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন- রৈবতক কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস অন্তিমলীলার দ্বারা রচিত। কবির লেখা রৈবতক কাব্যের মাধ্যমে কৃষ্ণানুভূতির উন্মেষ, অন্যদিকে গীতানুশীলনের ভিত্তিতে কুরুক্ষেত্রে এর প্রগাঢ় রতির পরিচয় পদান এবং প্রভাসে এর ধারা প্রবাহিত হয়ে পরবর্তী রচনার ধারা ও জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই 'প্রভাস' কাব্যে গীতার প্রভাব লক্ষ্য করে পণ্ডীত শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন-

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।"

এই শোধপ্রবন্ধটির মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, কবি নবীনচন্দ্র সেন বিরচিত ত্রয়ী কাব্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। গীতা অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্যগুলিতে নিজস্বতাও দেখিয়েছেন, ফলস্বরূপ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস হয়ে উঠেছে কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর এই কাব্যগুলির মাধ্যমে ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলেভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃত বাণী তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা পাঠকবর্গের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

তথ্য সহায়ক গ্রন্থ :

1. রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় সং, খ্রীষ্টাব্দ-১৯৬৬

2. আমার জীবন(প্রথম ভাগ), নবীনচন্দ্র সেন, সান্যাল এণ্ড কোম্পানীর প্রকাশন, কলিকাতা, সাল-১৩১৯
3. ড. উজ্জ্বলা কুণ্ডু, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব, বন্ধু সেবিকা সংঘ, মালদহ, 25 ডিসেম্বর 1995
4. নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী(দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার, ধন্বন্তরী ষ্টীম মেশিন যন্ত্রে প্রকাশিত, কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা, সাল-১৩১১
5. হরলাল ভট্টাচার্য, গীতা আলোচনা ও গীতা চিন্তাকণা, কলি. খ্রীষ্টাব্দ 1974
6. শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, নবভারত পাবলিশার্স, জুলাই-1986
7. রৈবতক কাব্য, শ্রীনবীনচন্দ্র সেন, পিপেলস্ লাইব্রেরি, কলিকাতা, সন-১২৯৩
8. স্বামী রামসুখদাস, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতা প্রেস, গোরাখপুর বঙ্গাব্দ ১৪১৯
9. গীতাধ্যান(১-৬খণ্ড), ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলি-৩

নাট্য ও নাটককার উৎপল দত্ত

বিজয় হাঁসদা
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

"আমি শিল্পী নই, নাট্যকার বা আন্য যে কোনও
আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে।
তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগনিষ্ট এটাই আমার মূল পরিচয়।"
—উৎপল দত্ত

সারসংক্ষেপ : উৎপল দত্তের প্রথম পরিচয় থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত। নাট্যকার তার দ্বিতীয় পরিচয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত সরাসরি জড়িত। তখন বিশ্ব রাজনীতির গনগনে আগুনের দাবদাহ সহ্য করে নাট্য সাহিত্যের নাট্যকার ও নাটককার রূপে আবির্ভূত উৎপল দত্ত। তার অগ্রজ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নবান্ন নাটকের মধ্যে ভারতবর্ষের করুণ চিত্র তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজ সরকার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নাটক লেখার জন্য গ্রেফতার হয়েছেন। জেলে বসে না লিখেছেন—আবার মুক্ত হয়েছেন—আবার বন্ধ হয়েছে—তাঁর কলমকে থেমে যায়নি। সর্বভারতীয় রাজনীতি তাঁর নাটক লেখার ক্ষেত্রে ভূমি। সমস্ত নাটকের মধ্যে প্রতিবাদী সুর ফুটে উঠেছে মানবীয় বেদনায়। যেখানে নাট্যকার ও নাটককার একই সেখানে শিল্পের সরস্বতী বিরাজ করে। বামপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত থাকায়উৎপল দত্তের প্রতিটি নাটকের শ্রেণি সংগ্রামের কথা উঠে আসে। জোতদার, জমিদার, বুর্জোয়া মুৎসুদ্দি দেওয়ান সঙ্গে নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রাম তুলে আনেন জিতিয়ে দেন হেরে যাওয়া মানুষকে।

সূচক শব্দ : উৎপল দত্ত, কল্লোল, টিনের তলোয়ার,অঙ্গার Proletariat , Agitprop, proletariat.

এমন স্পষ্ট ঘোষণায় যিনি তাঁর চরিত্রের বিনয় ও বিদ্যা, প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকে সারাজীবন দেশ ও বিদেশে সর্বত্র পরিচিত করেছেন, তিনিই আমাদের এই শতাব্দীর, ভারতীয় থিয়েটারের বলিষ্ঠ ও বরিষ্ঠতম রূপকথাকার, বাংলায় প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, নাটকে শেক্সপিয়র, দর্শনে মার্কসবাদ, নাট্যজগতের মহাপরাক্রান্তা অভিনেতা ও পরিচালক উৎপল দত্ত। নাটক নিয়ে রাজনীতি বলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই উৎপল দত্তের অবদান সব চাইতে বেশি। অনেকেই রাজনৈতিক নাটক ও উৎপল দত্তকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না। বাংলা নাটককে যাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উৎপল দত্ত। বাংলা

রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা খুবই গৌরবজনক স্বাধীনতার উত্তর কালে নাটক ও নাট্যভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত এক প্রবাদ প্রতীমনাট্যকার।

উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯মার্চ মাসে শুক্রবার অবিভক্ত বাংলায় বরিশালের কীর্তন খেলনায়। স্কুল জীবনেই বাবা মায়ের সঙ্গে পেশাদারি থিয়েটার দেখা শুরু আর প্রথম দর্শনেই প্রেম—

"সেই সব মহৎ কারবার দেশে দেখে মনে হল আমার পক্ষে অভিনেতা ছাড়া আর কিছুই হবার নেই, আমার বয়স তখন তেরো"[1]

ইবসেন, বার্ণাড শ, এলিয়ট, টেনিস উইলিয়ামস, আর্থার মিলার, শেক্সপিয়র, কিংবা ব্রেখটচেকভ প্রমুখ নাট্যকারদের পড়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। রাজনৈতিক দর্শনের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বামপন্থী ও মার্কসবাদী ভাবে ভাবিত। রাজনৈতিক নাটক লেখার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভগীরথ। রাজনৈতিক নাটক লিখতে গিয়ে তিনি বলতেন—**"যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল।"** রাজনৈতিক বাংলা নাটকের অস্তিত্ব অবশ্যই উৎপল দত্তের আগেও ছিল। বাংলা নাটকে তার বিররণ আছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে বাংলা রাজনৈতিক নাটকের একটা ধারা আমাদের চোখে পড়ে। এই ধারা সম্ভবত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পন' নাটক থেকেই। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে জ্যাতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায় ,উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, প্রমুখ মূলত ইতিহাসের প্রচ্ছদে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী রাজনৈতিক নাটক রচনা করেছিলেন। চল্লিশের দশকের গণনাট্য নাটকও এই প্রবাহেরই বিকশিত রূপ। উৎপল দত্ত তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারদের থেকে এখানেই স্বতন্ত্র যে তাঁর নাটকে 'অ্যাজিটপ্রপ' শব্দটি নাটকের সঙ্গে ওত্যোপ্রতোভাবে জড়িত।

১৯৪৭ সালে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে প্রথম বর্ষের তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে নিজস্ব নাট্য দল 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস' গঠন করেন। ওই বছরই নিকোলাই গোগলের 'ডায়মন্ডকাটসডায়মন্ড' এবং মলিয়ের 'দ্য রোগারিজ অফ স্ক্যাপাঁ' দিয়ে তার অভিনয় শুরু। ১৯৪৭ সালে 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস' এর নাম পাল্টে রাখেন 'কিউব'। তাঁর রচিত প্রথম নাটক BETTY BELSHAZZAR। এই সময় সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক পুরুষোত্তমলাল এর অনুরোধে এই নাটক রচনা করেন। ইউরোপীয় থিয়েটার দলের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা উৎপল দত্তের নাট্য জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। নাট্য গুরু জেফ্রি কেন্ডালের কাছে শিখেছিলেন—There is no art with out discipline and no discipline with our sacrifice.

নিজস্ব নাট্য দলের হয়ে তাঁর প্রথম অভিনয় শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্যথার্ড'। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে কবি ও গায়ক দীলিপ রায়ের অনুরোধে কিউবনাট্য দলের নাম পাল্টে রাখেন 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' নাট্যকার হিসেবে অভিযান শুরু 'ছায়ানট'(১৯৫৮) নাটকের মধ্য দিয়ে।

উৎপল দত্ত যখন জন্ম গ্রহন করেছেন তখন বিশ্বব্যাপি বয়ে যাচ্ছে এক বিক্ষুব্ধ সময়। সমগ্র বিশ্ব এবং বিশেষ পর্ব। ভারতীয় উপমহাদেশের তখন প্রতিদিনের নতুন সকাল সম্পর্কে মন্তব্য করা ছিল কঠিন। বিশ- শতকের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটতে থাকলো অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, মানুষের

আন্তর্জাতিক ভূগোল এবং তৎসম সম্পর্কিত বাহ্যিক আচার আচরণ যা চল্লিশের দশকে গিয়ে আরও পরিণত হলো উৎপল দত্তের বেড়ে ওঠা এই সময়ের ভেতরে, যে কারণে সে সময়ের বৈচিত্র্য সংঘাত এবং রাজনৈতিক রসায়ন উৎপল দত্তের নাটকের প্রধান মনোযোগ। 'নীলদর্পন' নাটকের মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের নির্মম চিত্র যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল উৎপল দত্তও নাটকের বিষয়ের পরিবর্তন করলেন না। তিনি নিজে আজীবন দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন যে—

"তাঁর নাটক প্রলেতারিয়েব বিপ্লবের পথে একটি সাঁজোয়া গাড়ি"[২]

তিনি সমাজ বিপ্লবের প্রতিদায়বদ্ধ শিল্পী। সেই জন্য তাঁর বক্তব্য ছিল –

"I am propagandist for revolution. I propagate ideas.We thy to fight ideas of the...... Class with ideas of the proletariat."[৩]

১৯৫৯ সালে উৎপল দত্ত লেখেন 'অঙ্গার' নাটক। বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি কালজয়ী সৃষ্টি। আসানসোলের বড়ধোমা কয়লা খনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই নাটক রচিত। এই নাটকে প্রথম শ্রমিক জীবন উঠে এল ভারতীয় তথা বাংলার মঞ্চে। মানুষের কথা মানুষের কাছে উপস্থিত করতে গেলে মানুষের জীবন ও সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হতে হয়। তাদের কথা তাদের মতো করে বলতে গেলে সত্য ও আত্মীয়তা অর্জন করতে হয়, না হলে জীবন সমস্যায় জর্জরিত মানুষের কাছে পৌঁছনো যায় না। অঙ্গার নাটকে উৎপল দত্ত তাই করলেন। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রথম অভিনয় কিংবদন্তি হয়ে আছে।অঙ্গার নাটক বাংলার জনগণকে চমকে দিল। খনি শ্রমিকদের জীবন কথা, তাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা, শ্রমিকদের লড়াই সব বাস্তব সম্মত ভাবে নাটকে উপস্থিত করলেন। কয়লা খনির শ্রমিক জীবনের পীড়নের ছবি দেখানোর জন্য তিনি আস্ত কয়লা খনির দৃশ্য সাজিয়ে ছিলেন মঞ্চে, তাতে লিফ্ট, ট্রলি সবই ছিল। বিশেষত মঞ্চসজ্জা, রবিশঙ্করের আবহ সংগীত ও তাপস সেনের আলোর কাজ ছিল চমকপ্রদ।

চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লড়াইকে কেন্দ্র করে লিখলেন 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটক। ১৯৩০ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের পট ভূমিকাতে লেখা। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বিপ্লবের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন ফেরারী ফৌজ নাটকে। বাংলার আন্দোলনর ইতিহাস যা অগ্নিযুগ নামে পরিচিত সেই যুগটি যেন ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। ইতিহাসকে এখানে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। বিপ্লবের উত্থান, পতন, সংগ্রাম, ত্রুটি বিচ্যুতিকে, দেখিয়েছেন এই নাটকে। এই বিপ্লবীরা আসলে কমিউনিষ্টরা আর কংগ্রেস হল রূপান্তরিত ব্রিটিশ শক্তি। অশোক এই নাটকের প্রধান চরিত্র। শচী বঙ্গবাসী, রাধারাণী, সবাই যেন বিপ্লবীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

১৯৬৫তে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সাড়া জাগানো নাটক 'কল্লোল' অভূত পূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করল। নাটকটি লেখার প্রেরণা ছিল ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া নৌ বিদ্রোহের ঘটনা। এই নাটক কংগ্রেসী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার দলিল ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অত্যাচারের প্রমাণ। ওই বছর ২৯ মার্চ প্রথম অভিনয়। নাট্য অভিনয়ের পর কলকাতা শহরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল মঞ্চে একটি জাহাজ উপস্থাপন

করে। শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, সত্যবন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখের অভিনয় ও সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জা, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংগীত, তাপস সেনের আলো সর্বোপরি উৎপল দত্তের পরিচালনায় নাটকটিকে অসাধারন উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এই নাটক তীব্র প্রতিবাদী ও আন্দোলনমূখী দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন শাসক দলের পছন্দ না হওয়ায় ১৯৬৫ সালের ২৩সেপ্টেম্বর ভারত রক্ষা আইনে উৎপল দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে 'মির্নাভা থিয়েটার কমিউনিষ্টদের বেলেল্লাপনা আখড়া' পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাপস সেনের করা শ্লোগান 'কল্লোল চলছে চলবে' পোষ্টরেও মন্মথ রায়, সত্যজিৎ রায়, প্রমুখ পাঠানো প্রতিবাদপত্রে নাটকের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। উৎপল দত্তের মুক্তির দাবিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সবর হয়েছিলেন শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা। কলকাতার রাস্তায় মিছিল বেরিয়ে ছিল। অবশেষে জনগণের প্রবল চাপে সরকারকে নতিস্বীকার করতে হয় এবং উৎপল দত্তকে মুক্তি দেওয়া হয়। ওই বছরই রচিত হয় 'সমাজতান্ত্রিকচাল' তদানীন্তন কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচারের কথা ছবির মতো প্রতিফলন ঘটে নাটকের মধ্যে।

রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে উৎপল দত্ত যে ৬ মাস জেলে বন্দী থাকাকালীন রচনা করলেন 'অজেয় ভিয়েতনাম' (১৯৬৬)। জেলে বন্দীরত অবস্থায় তিনি ফ্যাসিবাদী শক্তির সহায়ক হিসেবে কংগ্রেস দল এবং কমিউনিষ্ট প্রতিক্রিয়া শীল প্রসংশাকে দায়ী করেন। বিশ্বরাজনীতে ঘটে যাওয়া সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিয়েতনাম যুদ্ধ। ভিয়েতনাম কৃষকদের উপর বর্বরোচিত মার্কিন সম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সংগ্রামী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। এই সংগ্রামে আমেরিকার পরাজয় ঘটেছিল। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রবল পরাক্রান্তা শক্তির বিরুদ্ধে পরাভূত জাতি ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করলে জিতবেই।

১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে অবলম্বন করে রচিত হয় 'দিন বদলের পালা'। ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসী সরকারের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি, খাদ্য আন্দোলন এবং তার প্রতিবাদের জোরে সরকারকে ভাবতে বাধ্য করে ছিল সাধারণ মেহনতি মানুষ। নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'তীর' নাটক রচনা করেন। এই নাটকে কৃষক আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার নিগ্রো মানুষ এর উপর শ্বেতাঙ্গ মানুষের অত্যাচারের প্রতিবাদে লেখেন 'মানুষের অধিকার' নাটক। এই নাটকের মধ্যে উৎপল দত্ত লিবোভিতসের ভূমিকায় করেন। নাটকের মধ্যে হেরে যাওয়া মানুষ গুলো কি ভাবে লড়াই করছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারই এক জীবন্ত দলিল।

১৯৬৯ সালে লিখলেন 'লেনিনের ডাক'। প্রাক সত্তর দশকের সময়ে বামপন্থী চিন্তা ও মতাদর্শ নিয়ে গোটা দেশে তখন চলছে চরম মতভেদ। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তখন চরম খাদ্যাভাব, অর্থনৈতিক সংকট, বিদেশি শক্তির হাত থেকে কি ভাবে কমরেড লেনিন ও বলশোভিক পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল তার অমান্য দলিল লেনিনের ডাক। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন শ্রীমতি ইন্দ্রিয় গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গোটা দেশে জুরুরিব্যবস্থা জারি করে। গনতান্ত্রিক চিন্তাধারা সর্বোপরি মানুষের মৌলিক অধিকার গুলি যখন ধ্বংস করতে

চেয়েছিল, সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে উৎপল দত্ত লিখলেন 'লেনিন কোথায়' নাটকটি নিয়ে প্রতিবাদের মিছিলে। তাঁর নাটকে বামপন্থী আদর্শ থাকার প্রসঙ্গে ডা. সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> **"নাট্যকারউৎপল দত্ত মার্কসীয়চিন্তাদর্শেআস্থাবান ছিলেন বলেই জনগণ বা বেশী সংখ্যাক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। আরও বেশী সংখ্যাক মানুষ বলতে উচ্চশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা খুব কমই থাকবে.....সাধারণ অল্পশিক্ষিত বা অ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাই বেশী।"[৪]**

১৯৬৮ সাল। নানা পরিস্থিতিতে তখন অস্থির তাঁর জীবন। নিজের নাট্য দল লিটল থিয়েটার গ্রুপ (L.T.G) থেকে তিনি বিতাড়িত। চারিদিকে চেনা মানুষ গুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি থেমে থাকার পাত্র নন।তাঁকে চলতেই হবে। লিখে ফেললেন 'রাইফেল' নাটক। ১৯৩৪ সালের ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর বিপ্লবীদলের যে অভ্যুস্থান ঘটেছিল সেটাকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন এই নাটকে। আন্দোলন নিয়ে বিপ্লবীবাদী ও গান্ধীবাদীদের মধ্যে যে মতদ্বৈততা ছিল তাকে নাট্যকার রূপায়িত করেছেন অসাধারন নাট্যোৎকন্ঠায়। অবশ্য এই মতদ্বৈততায় উৎপল দত্ত বিপ্লব বাদেই বিশ্বাসী। নাটকের শুরুতেই নাট্যকার সূত্রধর চরিত্রের মাধ্যমেই সেই প্রশ্ন তুলেছেন –

> **"কান পেতে শুনুন চারিদিকে ঢক্কা নিনাদ, দেশ স্বধীন হয়েছে বিনা রক্ত পাতে। অহিংসা সংগ্রামের দৌলতে, দেশ নাকি অহিংসা সংগ্রাম এর ফলে দেশ স্বাধীন। তবে কি ক্ষুদিরাম বসুর নাম মুছে ফেলা হবে ইতিহাস থেকে। বিনা রক্ত পাতে দেশে স্বাধীনতা? তবে কি সূর্য সেনের রক্ত রক্ত নয়,তবে ঝাঁসিররাণীলক্ষ্মীবাই আর তিতুমীর আর এ যুগের নয়, বিদ্রোহী আর সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র আই এন এ বাহিনী আমাদের কেউ নয়।"[৫]**

এই সংলাপের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায় নাট্যকারের আদর্শ। দেশ স্বাধীন হল বটে কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা হল না। তাই গনমানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে যায়। শুধুমাত্র মানুষের পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। উৎপল দত্ত বোধ হয় এটা দেখাতে চান যে পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা যেমন শাসন শোষণ চালাত সাধারণ মানুষের উপর, ঠিক তেমনি ভাবে শোষণ নির্যাতন করতো স্বাধীন দেশের কংগ্রেসীরা। কংগ্রেসী স্বাধীনতাকে নাট্যকার স্বাধীনতা বলতে নারাজ। সেটা শুধু ক্ষমতার পালাবদল মাত্র, কাঠামো বদল নয়। নাটকের শেষে তাই বিপ্লবীরা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে। লুকিয়ে রাইফেল নিয়ে তারা আবার ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে নাট্যকার স্পষ্ট ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন সংগ্রাম ছাড়া বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়। তাই রাইফেল হয়ে ওঠে গণমানুষের হাতিয়ার।

বাংলার রাজনীতির উত্তপ্ত পরিবেশ, সংকট, তার মধ্যে শাসক দলের চরম অত্যাচার, কমিউনিষ্ট পার্টির ভাঙ্গন, নকশালবাড়ি সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে যুবসমাজ আত্মবলিদানে রত, তরুণ -তরুণী সমাজ বিপ্লবের আশায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ওত্যোপ্রতো ভাবে যুক্ত। এই সময় বাংলাকে, বাংলার জনগণকে উজ্জীবিত করতে ১০০বছর পিছনে ফিরে গিয়ে এক উজ্জ্বলময় ইতিহাসের অধ্যায়

থেকে বিষয় নির্বাচন করে রচনা করলেন 'টিনের তলোয়ার'। নাটকটি রচনার পটভূমিতে উগ্র জাতীয় চেতনার ইতিহাস রয়েছে। নাটকের ভূমিকায় নাটকার জানিয়েছেন—

> **"১৮৭৬ সনই সাম্রাজ্যবাদের নিজ মুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। এই বৎসরনাট্যশালার টিনের তলোয়ার দেখায় ভীত সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া নাট্য নিয়ন্ত্রণের নামে নাট্যশালার কণ্ঠরোধ ব্যবস্থা করে। বাংলা সাধারণ রংগালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রমাণ করি। সেই সব মানুষ গুলিকে যাঁহারা কুণ্ঠাগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজ যাঁদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই...যাঁহাদের উল্লাসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হল বাঙ্গালীর নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র। যাঁহারা আমাদের শৈলন্দ্র-সদৃশ্য পূর্বসূরি।"[৬]**

তৎকালীন সময়ের চাপে পড়ে মানুষ যখন সত্য-শিব-সুন্দর এর প্রতি আস্থা হারাচ্ছে ,ঠিক তখনই সমকালের সময়কে তুলে ধরলেন নাটকে। টিনের তলোয়ার নাটকে বেণীমাধব বেশী উৎপল দত্ত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ—

> **"আমি কাঁপিয়ে দেব। আমি ব্রহ্মার মুখের উপর তর্জনী নেড়ে বলবো, নাট্যশালায় গড়েছি এমন এক জগৎ , যা তোমার চার মাথার কোন টিতে আসেনি দেবতা।"[৭]**

এই নাটকের মধ্যে আমরা সনাক্ত করতে পারি ঊনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজতন্ত্র ও মুৎসুদ্দি শ্রেণী প্রভাবিত সমাজের যাবতীয় মূল্যবোধ ও মানবিক সম্পর্কে টানাপোড়েন। নাটক মঞ্চস্থ কালে উৎপল দত্ত বেণীমাধব বেশে ফিরিঙ্গি দের তলোয়ার উঁচিয়ে বলেছিলেন—

> **"সাহেব তোমরা আমাদের দেশে এলেন কেনো? আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা তো ছিলাম ভায়ে ভায়ে গলাগলি করে হিন্দু - মুসলমান প্রীতির বাহু বেঁধে, বাংলাদেশের শ্যামল অঞ্চলে মুখ ঢেকে। হাজার হাজার ক্রেশ দূরে এ দেশে এসে কেনো ঐ বুট জোড়ায় মারগে দিলে মোদের স্বাধীনতা।"[৮]**

বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে সভ্যতার সড় থেকে বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছিল সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। নয়া ফ্যাসিবাদী ঘরানায় ব্যাপক আলোড়ন তুলল অতীত ইতিহাসের লালসন্ত্রাস। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই কি তাহলে মানব সভ্যতার শেষ কথা। এর উত্তর দিলেন 'লালাদূর্গ' নাটকে। রাজনৈতিক নাট্যশালা এক অন্য রণক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষ এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম এই রণাঙ্গনে নানা ভূমিকায় নানা রূপে উৎপল দত্ত প্রবেশ ও সংগ্রাম। অভিনেতা, প্রয়োজক, পরিচালক, নাট্যকার, নাট্য আন্দোলন কর্মী যখনযে রূপে প্রয়োজন তখনই সেই রূপে আর্বিভূত।

১৯৭২ সালে রচনা করলেন 'ব্যারিকেড' নাটক। এখানে ১৯৭১ সালের হেমন্ত বসু হত্যার সময়কার কলকাতার যে ছবি আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'দুঃস্বপ্নের

নগরী’ (১৯৭৪) নাটকে একটি সকাল বেলার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটির সম্পর্কে বলেছেন—

> **“.....যুবশক্তির বেদনার্ত ক্রন্দন যারা পথে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথ রূদ্ধ.....নির্মম ভাবে নিহত হয়ে রাস্তার রাজ পথে ডাস্টবিনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।”[৯]**

উৎপল দত্তের রাজনৈতিক নাটক গুলোর মধ্যে আবার পাওয়া যায় শ্রেণী চেতনার ইতিহাস। ভারতবর্ষের সমাজ রাজনীতির পাশাপাশি ওঠে এসেছে বিশ্বরাজনীত, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। মানবতার জয়তু জ্বীবন বিজ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আজীবন সংগ্রামী যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, দখল, শাসন-শোষণ নিত্য চলছে, দমন ,নিপীড়িত শোষিত, সর্বহারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন বারবার। আদায় করেছে তাদের কাঙ্ক্ষিত অধিকার। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৮৬০সালের নীল বিদ্রোহ, ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার রক্তাক্ত অধ্যায়, ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের ঘটনা, কোন কিছুই বাদ যায়নি তাঁর লেখনীর মুখ থেকে। তীর,টোটা, রাইফেল, সন্ন্যাসী তরবারি, টিনের তলোয়ার, নানাধরনের অস্ত্রের নাম ব্যবহার এবং এত বেশি নাটকেরও নামকরণ আর কোন নাট্যকার কি করছেন। এক্ষেত্রে তার নিজের কথা গুলো আমাদেরকে বেশি সাহায্য করে—

> “Form the very beginning of my theater work we have tried to put revolution in a his torical perspective . Studying social phenomena in isolation, assuming each phase of development as a hole , that is , substituting the general with the particular is a universal bourgeois vice.”[১০]

সিদ্ধান্ত

উৎপৎ দত্ত আঁচ করেছিলেন যে, পথ নাটক গুলির মাধ্যমেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়। মানুষের মনের আলোড়ন ঘটানো সম্ভব। তাই তাঁর রচিত পথ নাটক গুলিও রাজনৈতিক রঙে রাঙা। যেমন নয়া তুঘলক, সংসার, স্পেশাল ট্রেন, ক্রুশবিদ্ধকুবা, পেট্রোল বোমা, ইত্যাদি। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ উৎপল দত্ত সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন তা সর্বৈব সত্য—**“উৎপলবাবু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে অত্যন্ত উগ্রভাবে বিশ্বাসী এবং এই নাটকে সর্বপ্রথম মানবীয় হৃদয়বৃত্তির মূল্য এবং দ্বন্দ্ব জটিল জীনের রস তাঁহার কাছে স্বীকৃতি লাভ করিল।”**

সর্বোপরি রাজনৈতিক নাটক লেখার ক্ষেত্রে তিনি এক অন্য ধারা সৃষ্টি করলেন। যে ধারায় শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, মানুষের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। তাই তাঁর নাটকে শ্রমজীবী মানুষেরাই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক নাটকে থাকবে একটা বৃহৎ সত্যের অঙ্গীকার, যে সত্য মানব চরিত্রকে বিকশিত করবে। আর এই দুইয়ের ক্ষেত্রেই উৎপল দত্ত আজও অপরাজেয় নাট্যব্যক্তিত্ব রূপে বাংলানাট্য সাহিত্যে বিরাজমান।

তথ্যসূত্র :

১. অরূপ মুখোপাধ্যায় :উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি ; ন্যাশনালবুকস্ট্রাস্ট ইন্ডিয়া ২০১১,পরবাস পত্রিকা ;সংখ্যা -৪৮

২. তাপস ভৌমিক : কোরক পত্রিকা; বাংলা নাটক ও নাট্য মঞ্চ ,শারদ সংখ্যা ১৪২০ দেশবন্ধু নগর এ ১/৮ বাগুইআটিখালধরা কলকাতা ; পৃষ্ঠা -১৯৪

৩. তদেব পৃষ্ঠা -১৯৪

৪. সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় : উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার পাঠের ভূমিকা ;২০০৭ কলকাতা ; পৃষ্ঠা ২১

৫. M.J firdush : শিল্প সাহিত্য পত্রিকা ; উৎপল দত্ত এর নাটকে রাজনৈতিক চেতনা; ২২ নভেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ; নভেম্বর সংখ্যা

৬. তাপস ভৌমিক : কোরক পত্রিকা ;বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ;শারদ সংখ্যা ১৪২০ দেশবন্ধুনগর এ ১/৮ বাগুইআটিখালধরা কলকাতা ; পৃষ্ঠা – ২০১

৭. কুন্তল মুখোপাধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকের রাজনীতি ও ফ্যাসিবাদী বিরোধী দর্শন; নৃপেন্দ্র সাহা ;উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন ;২০০৭ নভেম্বর ২০০৫ দ্য ফ্রেন্ডস অফ স্টেডিয়াম কলকাতা ;দে'জ পাবলিশিং; পৃষ্ঠা -৫৪

৮. তদেব পৃষ্ঠা -৪৯

৯. তদেব , পৃষ্ঠা৫৬

১০. উৎপল দত্ত : Towards revolutionary Theater .পৃষ্ঠা – ২৮

<u>গ্রন্থপঞ্জি ও সহায়ক পত্রিকা</u>

সুকুমার সেন : বাঙ্গালাসাহিত্যোর ইতিহাস(তৃতীয় খন্ড),আনন্দ পাবলিশার্স :২০১৩

নৃপেন্দ্র সাহা : উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন ;কলকাতা ৭ নভেম্বর ২০০৫

অরূপ মুখোপাধ্যায় : উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি ; ন্যাশনালবুকস্ট্রাস্ট ইন্ডিয়া ২০১১

অজিতকুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

তাপস ভৌমিক (সম্পাদক) : কোরক পত্রিকা ; ১৪২০ শারদ সংখ্যা ; দেশবন্ধুনগর এ ১/৮ বাগুইআটি খালধরা কলকাতা

‘দৃষ্টিদান’ ও ‘সুভা’ গল্পে দৃষ্টিবিযুক্ত ইন্দ্রিয়বোধ

মনজিৎ কুমার রাম
গবেষক
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটো এবং বড়ো গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি গল্প হল ‘দৃষ্টিদান’ ও ‘সুভা’। গল্পদুটি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে *সাধনা* (১২৯১, মাঘ সংখ্যা) ও *ভারতী* (১৩০৫, পৌষ সংখ্যা) পত্রিকায়।কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পের তুলনায় এই গল্পদুটির একটু বিশেষত্ব আছে। দুটি গল্পেরই প্রধান চরিত্র যথাক্রমে দুজন মূক ও বধির এবং দৃষ্টিহীন মেয়ে। যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে দৃষ্টিহীনতা ও বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিবিযুক্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুভূতির প্রসঙ্গ গল্পগুলিতে আলোচিত হয়েছে। আমরা সে ধরনের ভিন্ন অনুভবের প্রসঙ্গগুলোকেই সর্বজ্ঞকথন ও আত্মকথনের সূত্র অনুযায়ী মূল নিবন্ধে একত্র করেছি। দৃষ্টিপ্রধান ইন্দ্রিয় বোধ ও দৃষ্টিনির্ভরতা মানুষের জীবনের এক চরম আশ্রয়রূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দৃষ্টিহীন মানুষের ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার অস্তিত্বও স্বীকার্য। অথচ দৃষ্টিপ্রধান সক্ষম সমাজে প্রাত্যহিক জীবন ধারণের তাগিদে তার কথা আমাদের মনেই থাকে না। কাজেই, দৃষ্টিহীন মানুষেরা তাদের ভিন্নতর ইন্দ্রিয়সংবেদনা ও অস্পষ্ট সামাজিক উপস্থিতিকে সঙ্গে নিয়ে ক্রমে কোণঠাসা হতে থাকেন। এই সব মানুষের কথা মাঝে-মাঝে দৃষ্টিমান লেখকের কলমে উঠে এসেছে। ‘দৃষ্টিদান’ গল্পের মাধ্যমে আমরা একজন অতি সাধারণ দৃষ্টিহীন মেয়ের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। আর, ‘সুভা’ গল্পের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নির্ভেজাল ইন্দ্রিয়গত মিলনের বিষয়টি আলোচনা করেছি।
সূচক শব্দ : ইন্দ্রিয় বোধ, দৃষ্টিদান, রবীন্দ্রনাথের গল্প, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ

মূল নিবন্ধ:

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ইন্দ্রিয়জগৎ অনেক চরিত্রের জন্যই বেশ সীমিতভাবে এসে হাজির হয়। কিন্তু তাই বলে বাস্তবসম্মত পটভূমিকে সে সমস্ত গল্পের চরিত্রেরা যেভাবে বর্ণনা করে এবং উপলব্ধি করে তাতে কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়গত সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায় না। সীমিত ইন্দ্রিয়বোধ দিয়ে বহির্জগৎ সম্পর্কে এই চরিত্রগুলি কীভাবে তাদের ধারণা গড়ে তোলে,বর্তমান নিবন্ধের একদম আরম্ভেই সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত চরিত্রের কথা বলছি, তাদের মধ্যে কেউ দৃষ্টিহীন, কেউ মূক ও বধির। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য চরিত্রদের ইন্দ্রিয়বোধ খণ্ডিত বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু সীমিত বোধযুক্ত হয়েও তারা যে-রকমভাবে প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশ্বকে বর্ণনা করে, অথবা এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের অনুপস্থিতিতেও তারা যে দক্ষতার সঙ্গে

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারে তা প্রায় বিস্ময়জনক ঘটনা বলে মনে হয়। আমাদের কাজ হল এ বিষয়ে কিছু পরিমাণ যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা লাভ করা। মানুষের দৃষ্টিক্ষমতাজনিত ইন্দ্রিয়বোধের পরবর্তী প্রধান ইন্দ্রিয়ক্ষমতা হল শ্রবণক্ষমতা। কিন্তু সে বিষয়ে সামান্য পরিমাণ জ্ঞান আহরণের জন্যেও একক ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় অনুভব করে কোন উপায়ে যে পটভূমিকে বর্ণনা করা সম্ভব তা আমাদের বুঝতে হবে। আলোচ্য গল্পগুলির নির্দিষ্ট কয়েকটি চরিত্র শুধুমাত্র তাদের একটি বা দুটি অপ্রধান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে অনুভব করে এবং বর্ণনা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ‘সুভা’ (প্রকাশকাল ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, *সাধনা,* মাঘ সংখ্যা) গল্পের প্রধান চরিত্র হল সুভা। সুভা মূক ও বধির। তার আচরণের মধ্যে দিয়ে যে শরীরী ভাষা ব্যক্ত হয়েছে গল্পের সর্বজ্ঞ কথক তাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন, গল্পের মূল ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে। সুভার মনের কথা, তার আনন্দ আর বেদনা কথকের মনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।গল্পে সুভার কণ্ঠস্বর কোথাও শুনতে পাওয়া যায়নি অথবা তা শোনারও চেষ্টা হয়নি। পাঠক হিসেবে আমরা মনে করি,রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব নিসর্গভাবনার নির্দিষ্ট একটি দিককে পরিস্ফুট করবার তাগিদে সম্ভবত সুভা চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাই ব্যক্তিমানুষ সুভার উপস্থিতি এখানে গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে নিসর্গপ্রকৃতি ও সুভা যেন একীভূত। সুভা বিরাট অথচ মৌন প্রকৃতির একটি সংহত রূপ। কিন্তু সুভার সমস্ত অভিব্যক্তি যে একমাত্র তার পারিপার্শ্বিক ইন্দ্রিয়জগতকে ঘিরেই প্রকাশলাভ করছে,তার বড়ো বড়ো চোখ মেলে সব সময়ে সে যে চেয়ে থাকে, তাতে কথকের মনে হয়েছে সবসময়েই সে তার সঙ্গিনী প্রকৃতিকে তার মনের কথা বলতে চায়। কিন্তু এমনটা তো নাও হতে পারে। আমাদের বিশ্বাস মানুষকে বলতে পারলে সে তাকেই বলত। সুভার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করবার ক্ষমতা ছিল কিন্তু প্রকাশ করবার তার কোনো ক্ষমতা ছিল না। সে কারণেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যেকার যে নানাবিধ দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শময় জগৎ সুভার মনকে আন্দোলিত করত, তা একমাত্র গল্পটির কথকের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পেরেছিল। তা ছাড়া, নিঃসঙ্গ একজন মেয়ে হিসেবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্যপরিবেশ সচেতনভাবে অনুভব করা ব্যতীত সুভার আর কোনো উপায়ও ছিল না। কেননা বাহ্যপরিবেশ ছিল তার খেলার সঙ্গী। এ গল্পে সুভাকে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশ্বের একমাত্র দোসর বলে মনে হয়। তারা যেন একে অন্যের মন বুঝতে পারে। সুভার বস্তুবিশ্বকে গল্পের পটপরিবেশে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করে তোলবার জন্যে এমনটা ঘটেছে। তার ফলে মানবী সুভা একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেই নিজেকে মেলাতে সক্ষম হয়েছে। কেননা সুভার মতো প্রকৃতিও নিঃসঙ্গ এবং মূক। এরকমভাবে শুধু দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শময় বস্তুজগৎকে অনুভব করা কিন্তু তাকে ব্যক্ত না করতে পারার আত্যন্তিক ব্যাকুলতাকে ‘সুভা’ গল্পের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। কারণ সুভা নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। অথচ প্রকৃতির সান্নিধ্য ছাড়া সে যে বাঁচবে

না ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সুভা একাধারে তার পটপরিবেশের সঙ্গে অখণ্ডভাবে বিরাজ করে,আবার অন্যভাবে, তার একমাত্র সঙ্গীও সেই পটপরিবেশ। ‘সুভা’ গল্পের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে তার পটপরিবেশের যে অখণ্ড যোগাযোগ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকে সকলের প্রতি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এমনকি, মানুষ যখন সঙ্গীহীন অবস্থায় জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয় তখনও সে তার বাহ্যপরিবেশ এবং বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে সে পালানোর কথা ভাবতে পারে না। তা যদি নিতান্তই ঘটে,তাহলে তার জীবনে সেই ঘটনা হয়ে ওঠে সব চেয়ে বড়ো বিচ্ছেদের ঘটনা। সুভা তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিল। কিন্তু মূক ও বধির হবার কারণে যেহেতু তার প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল না, সেহেতু তার সংবেদনশীল মনের প্রকৃত গভীরতা নির্ণয় একটু দুরূহ কাজ। বস্তুত, ‘সুভা’ নিজের সুখদুঃখের কথা শুধু মুক্ত প্রকৃতির কাছেই তুলে ধরতে অভ্যস্ত।‘দৃষ্টিদান’(প্রকাশকাল ১৩০৫) গল্পটি উত্তম পুরুষের বয়ানে বিবৃত। গল্পের মূল চরিত্র কুমু, স্বামীর ভুল চিকিৎসার ফলে অচিরেই কুমুর দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। সম্পূর্ণ গল্পটি দৃষ্টিহীন কুমুর ভিন্নতর ব্যক্তি ও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার একটি খাঁটি বিবরণ বললেও চলে। আমরা কুমুর মুখেই তার ক্রমশ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়বার ঘটনা শুনি। এ ঘটনাই আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু আরও একটি আকর্ষণীয় বিষয় হল এই যে, দৃষ্টিহীন অবস্থায় কুমু তার হারিয়ে ফেলা দৃষ্টিশক্তির অভাব প্রথম দিকে খুবই বোধ করত। কিন্তু অচিরেই চোখ ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে সে যে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি করে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়ে উঠছে তা উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ, শব্দ, গন্ধ আর স্পর্শের অনুভূতির সাহায্যে সে দৃষ্টিশক্তির অভাবকে কিছু পরিমাণে পূরণ করে নিয়েছে বলে ঘোষণা করে। তা সে কুমু যতই বলুক, দৃষ্টিশক্তিবর্জিত ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা যে একরকম বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত অভিজ্ঞতা, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে চোখের কিছুটা কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু বিকল হয়ে পড়া ইন্দ্রিয়টির স্থানে ভিন্ন কোনো ইন্দ্রিয়কে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেওয়া চলে না। ‘দৃষ্টিদান’ গল্পের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় যে, চোখের কাজ বন্ধ হবার পরই বরং কুমুর বয়ানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অনুভব করবার ব্যতিক্রমী পন্থা ব্যবহারের দিকটি। কুমুর বক্তব্য,

> অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।[১]

প্রথমত, আমাদের মনে হতে পারে যে, দৃষ্টিহীন কুমু আসলে উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তার মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে। সে দৃষ্টিহীনতাজনিত বিভিন্ন সমস্যাকে শান্তভাবে মেনে নিতে আরম্ভ করেছে। দ্বিতীয়ত, কুমুর বক্তব্যের দ্বারা আরও একটি বিষয় পরিস্ফুট হয় তা হল, তার প্রধান একটি ইন্দ্রিয় অক্ষম হয়ে পড়ার দরুণ সে প্রাত্যহিক কর্মে বাকি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে এখন আরও অধিক গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করে। এখানে প্রথম পর্যবেক্ষণের চাইতে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটির প্রতি অধিক মনোযোগ ন্যস্ত করাই বিধেয়। কারণ সমগ্র কাহিনি জুড়ে কুমু নিজের প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়ানুভবকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণকে বারংবার প্রমাণ করেছে। সুভার সঙ্গে এখানেই কুমুর চরিত্রের পার্থক্য আলাদাভাবে ধরা পড়ে। সুভা তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে সমগ্র শরীর জুড়ে অনুভব করতে পারলেও তাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে অপারগ ছিল। কিন্তু কুমু দৃষ্টিশক্তি হারানোর পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের ভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত অনুভবকে ব্যক্ত করতে সমর্থ। সুভা সম্ভবত জন্মগতভাবেই মূক ও বধির। ফলে তার মানসিক নিঃসঙ্গতার কথা গল্পের সর্বজ্ঞ কথকের মধ্যস্থতায় আমরা অবহিত হই। কিন্তু কুমু প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিল। যার ফলে সুভার তুলনায় কুমু তার মনের ভাব এবং ইন্দ্রিয়সংবেদনাকে ভাষার সাহায্যে সুস্পষ্ট উপায়ে ব্যক্ত করতে পারত। এখানে কুমুর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে বলেছে, দৃষ্টিহীনতা প্রাপ্তির পূর্বে তার শ্রবণশক্তি সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেনি। তার কানের যতটুকু শোনা উচিত ছিল সে তার চাইতে অনেক কম শুনেছে। কুমুর এই বিশেষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্পর্কে আমরা গল্পটির একাধিক অংশ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে নিতে পারি। সে কারণেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম শব্দনির্ভর অনুভূতির অধিকারিণী কুমুর চরিত্র এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য হয়ে উঠেছে। গল্পটি কুমুর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ার পরবর্তীকালীন ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক, সুতরাং দৃষ্টিমান কুমুর ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। ছোটোগল্পের পরিসরে অনেক সময়ই ব্যক্তির একক জীবনাভিজ্ঞতা বর্ণনার রীতি পরিলক্ষিত হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাজেই, কাহিনির সংক্ষিপ্ত পরিসরের কথা খেয়াল রেখে, দৃষ্টিহীন কুমুর প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতা কিংবা ভিন্নতর ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ এখানে উঠে এসেছে। কুমুর একমাত্র নির্ভরস্থল তার স্বামী। দৃষ্টিশক্তি হারানোর দিনকে মনে করতে গিয়ে কুমু খেদোক্তি করেছিল যে,শুভদৃষ্টির মাধ্যমে একদিন যে স্বামীর সঙ্গে তার মিলন হয়েছিল, আকস্মিক দৃষ্টিহীনতার কারণে তাঁকে সে আর কখনই দেখতে পাবে না। কুমুর এই বক্তব্যটি তার জীবনের দুটি পৃথক সময়ের সন্ধিলগ্নকে সূচিত করে।'দৃষ্টিদান' গল্পে উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহার প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। তার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, যে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বয়ানে গল্পের প্রধান ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে দৃষ্টিহীন। দৃষ্টিনির্ভর উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয়। কোনো কোনো গল্পে সাধারণত উত্তম পুরুষে

বিবৃত ঘটনায় ব্যক্তির একক অভিজ্ঞতাই হয়ে ওঠে মুখ্য। 'দৃষ্টিদান' সে ধরনেরই একটি গল্প। কাহিনি অংশে উপস্থিত ঘটনার চূড়ান্ত ঘাত-প্রতিঘাত যেমন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তেমনি তাতে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপস্থিতিকেও তিনি এমনভাবে তুলে ধরেন যে, চরিত্রটি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে যেন মনে হয়। তবু প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিভিন্ন গল্পের চরিত্রদের সব ইন্দ্রিয় সচল অবস্থায় থাকলেও তার উপলব্ধিতে গল্পে বর্ণিত পটপরিবেশ কিন্তু খণ্ডিত অবস্থাতেই পৌঁছেছে। 'দৃষ্টিদান' গল্পটির ক্ষেত্রে কুমুর সমস্ত দৃষ্টিবিযুক্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর উপলব্ধিকে খুব প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই দৃষ্টিহীনতার কারণে কুমুর ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতা খণ্ডিত হলেও সে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। উল্লেখ্য যে, গল্পটিতে দৃশ্যচিত্র প্রায় নেই। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দৃশ্যচিত্রের আদৌ কোনো দরকার আছে এমন কথা মনে হয় না। কুমুর ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুভবে বাহ্যজগৎ সামান্য খণ্ডিতভাবে পৌঁছাচ্ছিল। কিন্তু কুমু খুব কম সময়ের জন্যই তার বিবরণ দিয়েছে। তার কারণ হয়তো নিজের জীবনের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন ছিল। কিন্তু যখনই সে নিজেকে ঘরের মধ্যে সম্পূর্ণ একা করে পেয়েছে অথবা উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করেছে, তখনই তার খণ্ডিত ইন্দ্রিয় চেতনা বিস্তারলাভ করেছে। বস্তুবিশ্বকে উপভোগ করবার নিরিখে কুমুর ভিন্নতর ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুভবকে বিশ্লেষণ করে হয়তো খণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু পরিমাণে যৎসামান্য হলেও বহির্জগতের পরিবেশচিত্রকে তার বর্ণনায় সে সামগ্রিকভাবেই তুলে ধরবার চেষ্টা করে। 'দৃষ্টিদান' গল্পে উপমা কিংবা চিত্রকল্প তেমনভাবে পাওয়া না যাওয়ার আরও একটি কারণ, কুমু সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে। অনেক পড়াশোনা করে, তার দৃষ্টিহীন জীবনের অভিজ্ঞতাকে সংহতভাবে পাঠক কিংবা শ্রোতাদের প্রতি তুলে ধরবার মতো বুদ্ধি কুমুর ছিল না। সে জন্যই এ গল্পে কুমু যেরকমভাবে সব কিছুকে অনুভব করেছে সেরকমভাবেই স্পষ্ট করে দু-এক কথায় সকলের সামনে তাকে তুলে ধরেছে। দৃষ্টিহীন কুমুর প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতায় যে সামান্য খামতি দেখা দেয়, সে খামতি কুমু তার স্বামীর সাহায্যেই দূর করে ফেলতে পারবে বলে মনে করেছিল। কিন্তু কুমুর মনের সেই একান্ত আশা পুরণ হয়নি। কুমুর দৃষ্টিহীনতা কুমু এবং তার স্বামীর মাঝে নৈকট্য স্থাপনে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছিল প্রতিনিয়ত। এ প্রসঙ্গে কুমুর দৃষ্টিহীনতাকে দায়ী করে তার স্বামীর খেদোক্তি,কুমুর দৃষ্টিহীনতা তাকে এমন অসাধারণের কোঠায় উত্তীর্ণ করেছে যে, দৈনন্দিন গৃহকর্মের নিরিখে তার ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য হয়ে পড়েছে। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাই কুমুর প্রতি তার স্বামীর দৈহিক ও মানসিক আকর্ষণ ক্রমশ হ্রাস পায় বলে আমরা লক্ষ করি। যত দিন যায়, কুমুর স্বামীর কাছে কুমু তত অসহনীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে কুমুর প্রতি তার স্বামী এমনই বিরক্ত হয়ে ওঠেন যে, কোনো কারণ ছাড়াই একদিন কুমুকে এক চরম মানসিক আঘাত করে বসেন। এক সময়ে

তিনি কুমুর প্রতি আর আসক্ত নন বলে কুমুকে সাফ জানিয়ে দেন। কুমু একে দৃষ্টিহীন, তাতে নারীসুলভ গৃহকর্মে অক্ষম। কুমুর স্বামী তাঁর দৃষ্টিনির্ভর ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সমান সক্ষম একটি মেয়েকে কামনা করেন। যে মেয়ে তাঁর মতোই দৃষ্টিমান, যে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতে সক্ষমতায় তাঁর সমতুল্য। যে তাঁর মতো করেই পারিপার্শ্বিক পটপরিবেশকে অনুভব করে— এমন একটি সুস্থ, স্বাভাবিক, গৃহকর্মনিপুণা মেয়ে তাঁর চাই।

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে,সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা,তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক,তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব,রাগ করিব,সোহাগ করিব,গহনা গড়াইয়া দিব,এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"[২]

ক্রমে কুমুর পক্ষে যখন স্বামীকে ফেরানোর আর কোনো উপায় রইল না, কুমুর দৃষ্টিহীনতা যখন তার স্বামীকে ক্রমেই কুমুর প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলতে লাগল, তখন আকস্মিকভাবেই কুমুর অবহেলিত এবং অসম্মানিত জীবনে হেমাঙ্গিনীর আবির্ভাব ঘটে।কুমুর জীবনে হেমাঙ্গিনী একজন অপরিচিত আগন্তুক ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু সে আগন্তুকই ক্রমে কুমুর একান্ত আপনজন হয়ে উঠতে লাগল। কুমুর নিঃসঙ্গ দৃষ্টিহীন জীবনে হেমাঙ্গিনী যেন সান্নিধ্য আর সহানুভূতির বন্যা বইয়ে দিল। হেমাঙ্গিনীকে লাভ করে কুমু স্বামীর উপেক্ষা ক্রমে ভুলে যেতে লাগল। হেমাঙ্গিনীকে কুমু তার স্বামীর মতোই দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিগ্রাহ্য এই দুটি পৃথক জগতের মাঝখানকার একটি সেতু হিসেবে ব্যবহার করতে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। কিন্তু এবার কুমু সে কাজে সফলতা অর্জন করে। হেমাঙ্গিনীকে কুমুর দাদা বিবাহ করেছিলেন, সে সূত্রেই কুমু তাকে আত্মীয় ও সুহৃদ হিসেবে চিরকালের মতো লাভ করেছিল।

'দৃষ্টিদান' গল্পে বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার উপস্থিতি খুবই সীমিত। তার প্রধান একটি কারণ হয়তো দৃষ্টিহীন কুমু নিজে। কাহিনির প্রধান ঘটনা কুমুর ব্যক্তিগত জীবনকে ভিত্তি করে আবর্তিত হয়। কিন্তু কুমু নিজের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাবিষয়ে নিজমুখে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। ফলে কাহিনির মধ্যে সুদীর্ঘ প্রাকৃতিক বিবরণ প্রায় নেই বললেই চলে। 'সুভা' গল্পের মতো 'দৃষ্টিদান' গল্পে সর্বজ্ঞের দায়িত্বভার কথক স্বীকার করেননি। সে দায়িত্ব গল্পের প্রধান চরিত্র কুমু নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। 'দৃষ্টিদান' গল্পে উত্তমপুরুষের বয়ানে প্রধানত ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে গল্পটিতে কথকের বিশেষ কিছু করার ছিল না। ফলে এই গল্পে মাঝে-মাঝে সর্বজ্ঞ কথক সূত্রধারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অবশ্য, দৃষ্টিহীন কুমু তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে ভিন্নতর বোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, সে সম্পর্কে গল্পে খুব বেশি বলা নেই। শুধুমাত্র কুমুর জন্মভিটে হাসিমপুরে তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে যেভাবে সে একযোগে ব্যবহারে সক্ষম হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

কুমুদের গোয়ালঘরের ভিজে জাবনা এবং খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ আর বিদ্যালংকারদের ঠাকুরবাড়ি থেকে ভেসে আসা কাঁসরঘণ্টার শব্দ কুমুর মনকে তার বালিকাবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। যখন সে দৃষ্টিমান ছিল, যখন তাকে কেউ উপেক্ষা করত না, কুমুর মনে পড়ে তার সেই স্বাধীন জীবনের কথা। কুমুর চিরপরিচিত হাসিমপুর তার দৃষ্টিবিযুক্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতায় এক ধরনের অভাবিতপূর্ব নতুনত্বের সঞ্চার করেছিল। সে বিবরণের মাধ্যমে কুমুর দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন জীবনের পৃথক ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতাজনিত অনুভবের মধ্যে যেন সন্ধি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল।

'দৃষ্টিদান' ব্যতীত আর কোনো গল্পে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে দৃষ্টিনির্ভর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের প্রতিভাষ্য নির্মাণ করেননি। দৃষ্টিহীনতা এবং দৃষ্টিনির্ভরতা বিষয়ে তিনি আর কোনো গল্পে এমন সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেননি। তবু কোনো কোনো সমালোচক গল্পটিকে নারীর সতীত্বের ধারণা অথবা ধর্মীয় বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে জর্জরিত মানবমনের প্রকাশ্য চিত্র বলে ব্যাখ্যা করেন। আমরা তাঁদের বক্তব্যগুলিকেও শিরোধার্য করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পটি একজন দৃষ্টিমান মেয়ের দৃষ্টিহীন হয়ে পড়াকালীন মানসিক হতাশা ও দৃষ্টিহীনতাকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথাই তুলে ধরে বলে আমাদের মনে হয়। 'সুভা' গল্পে কিন্তু এত জটিলতা নেই। তা নিতান্তই রূপক। তা প্রকৃতিরূপী মানবীর নিঃশব্দ আত্মপ্রকাশ। সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবার ব্যাকুলতা, অথচ সেই ব্যাকুলতাকে প্রকাশ না করতে পেরে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণাদীর্ণ হবার সুভা যেন সূত্র বহন করে চলে। ও-টুকুই তার কাজ। অন্যদিকে, কুমু রক্তমাংসের মানবী। তার আনন্দবেদনার সুরে বাঁধা জীবন। সে 'বিশ্বপ্রকৃতি' নয়। সে তার উপভোক্তা।

তথ্যসূত্র:

১[1]. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ*দৃষ্টিদান',,সাহিত্যম্‌দ্বিতীয় সংস্করণ ,, মাঘ ১৪১৫, পৃ.- ৩৭২

২. তদেব, পৃ. ৩৮১

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্যমস মাঘ ১৪১৫।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণস কথাকোবিদ্‌ রবীন্দ্রনাথ, বাক্‌ সাহিত্য প্রা. লি., ১৪১৭, কলকাতা

৩. Bolt. David, The Metanarrative of Blindless, *A RE-READING of TWENTIETH-CENTURY ANGLOPHONE WRITING*, University of Michigan Press, 2014.

যোগ : চর্চা থেকে দর্শন

ব্রততী চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ,
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়,
মল্লারপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ : ভারতীয় আস্তিক ষড়্দর্শনের মধ্যে যোগদর্শন অন্যতম। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রের হাত ধরে দর্শনের শাখারূপে এর পথচলা শুরু হলেও যোগের উৎস বহু প্রাচীন। যোগের উৎসানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতের সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যোগ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের একটি মন্ত্রে 'যোগ' শব্দটি 'উদ্দেশ্য' অর্থে প্রযুক্ত। সামবেদ সংহিতার উত্তরার্চিকে সায়নাচার্য 'যোগ' শব্দটিকে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য নয় পুরুষার্থরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যোগ যে পুরুষার্থসাধনের বা মোক্ষের প্রধান সহায় তার ইঙ্গিত বৈদিকমন্ত্রেই সূচিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের সারাৎসার এবং দর্শনজিজ্ঞাসার জন্মস্থান উপনিষদের ছত্রে ছত্রে যোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কোথাও পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সংযোগ অর্থে কোথাও বা সংযোগের উপায়রূপে যোগ ব্যাখ্যাত। যোগতত্ত্ব প্রতিপাদক অপ্রধান উপনিষদগুলিতে অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। পুরাণগুলিও যোগের স্বাক্ষর বহন করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দর্শনের প্রস্থান রূপ পরিগ্রহণের বহু পূর্ব থেকে যোগের ধারা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেটি ছিল বিদ্যাচর্চার আকারে, সাধনরূপে। সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যোগবিদ্যাকে সূত্রাকারে সাজিয়ে দর্শনশাস্ত্রের রূপ দিলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। নাম দিলেন 'যোগসূত্র'। পতঞ্জলিকর্তৃক প্রতিপাদিত যোগতত্ত্বসমূহ পরবর্তীতে ব্যাসদেব, বাচস্পতি মিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু, ভোজদেব প্রমুখ আচার্যগণের মননঋদ্ধ ও বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি পৃথক দার্শনিক প্রস্থানের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে বর্তমান কলেবর ধারণ করেছে। মূল নিবন্ধে যোগের সেই উৎস ও আচার্যপরম্পরায় তার ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ : যোগ, সংযোগ, সমাধি, যোগের উৎস, বেদোক্ত যোগ, উপনিষদীয় যোগ, পুরাণোক্ত যোগ, হিরণ্যগর্ভ যোগ, পতঞ্জলি, ব্যাসভাষ্য, তত্ত্ববৈশারদী, যোগবার্তিক, রাজমার্তণ্ড, দর্শনপ্রস্থান।

মূল নিবন্ধ:

'যোগ' শব্দটির সঙ্গে বর্তমানে আমাদের সকলেরই কমবেশি পরিচয় আছে। সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনপ্রস্থানরূপে যতটা না এর পরিচয়, তার থেকে চর্চা বা অভ্যাস

হিসাবেই এর বেশি জনপ্রিয়তা। এখন আমরা প্রায় সকলেই 'যোগা'[১] করি শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য। কিন্তু মনের খবর কে রাখে? মন যদি পঞ্চক্লেশে[২] জর্জরিত থাকে তাহলে সুস্থ, সুঠাম শরীরধারী নিজের ও অন্যের মঙ্গল করতে পারেন না। তাই নিরোগ শরীরের সাথে নিরোগ মনও সমভাবে কাম্য। মনকে কালুষ্যমুক্ত করে সুস্থ রাখার পথের সন্ধান দেয় যোগদর্শন। বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী ভারতীয় আস্তিক ষড়্দর্শনের মধ্যে সুপ্রাচীন দর্শনপ্রস্থান 'যোগদর্শন'। বলা হয় মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রবক্তা। তাঁর প্রণিত 'যোগসূত্র' যোগদর্শনের উপলভ্যমান প্রাচীনতম গ্রন্থ্। তবে দর্শনরূপ পরিগ্রহণের পূর্বে বিদ্যারূপে যোগের উল্লেখ ও প্রয়োগ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। বর্তমান নিবন্ধে এই যোগের উৎস ও দর্শনরূপে ক্রমবিকাশের ধারা আলোচিত হয়েছে।

যোগের ক্রমবিবর্তনের ধারা আলোচনার পূর্বে 'যোগ' শব্দের অর্থটি বিচার্য। 'যুজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্'[৩] প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'যোগ' শব্দটি উচ্চারণে দুটি অর্থ প্রথমেই উদ্ভাসিত হয়। প্রথমটি হল 'সংযোগ' এবং দ্বিতীয়টি 'সমাধি'। কারণ শাব্দবোধের অন্যতম উপায় ব্যাকরণের ধাতুপাঠে 'যুজ্' ধাতুটি দ্বিবিধার্থে পঠিত। ১) 'যুজ্‌র যোগে' এই অর্থে করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন যোগ শব্দটি সংযোগ অর্থকে দ্যোতিত করে। অপরপক্ষে ২) 'যুজ্ সমাধৌ' অর্থে যোগ শব্দ গ্রহণ করলে সেটি সমাধি অর্থেরই প্রকাশক হয়। এই দুই প্রধান অর্থ ছাড়াও 'যোগ' শব্দটি নানা অর্থের প্রকাশক। 'বাংলা বিশ্বকোষ' গ্রন্থে 'যোগ' শব্দের তেতাল্লিশটি অর্থ উক্ত হয়েছে।[৪] এই বিবিধ অর্থে 'যোগ' কোথাও জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, কোথাও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়রূপে, কোথাও বা আধ্যাত্মিক বিষয়রূপে ব্যাখ্যাত। বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত এই যোগ শব্দ সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন বেদের প্রাচীনতম শাখা সংহিতাংশে 'যোগ' শব্দের উল্লেখ যোগের প্রাচীনত্বের সূচক। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম সূক্তের তৃতীয় ঋক্-এ বলা হয়েছে—

"স ঘা নো যোগ এ ভূবৎসঃ রায়ে সঃ পুরংধ্যাম্। গমষদ্বাজেভিরা স নঃ।।"

মন্ত্রটিতে 'যোগ' শব্দটি 'উদ্দেশ্য' অর্থে প্রযুক্ত। অর্থাৎ ইন্দ্র প্রার্থীদের নানাবিধ উদ্দেশ্যসাধন নিমিত্ত আগমন করুন— এটিই মন্ত্রার্থ। উক্ত মন্ত্রটি সামবেদ সংহিতার উত্তরার্চিকে উপলব্ধ। সেখানে সায়নাচার্য 'যোগ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন— 'যোগে পূর্ব্বমপ্রাপ্তপুরুষার্থস্য সম্বন্ধে'।[৫] সুতরাং শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নয় পুরুষার্থরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য এখানে অভিপ্রেত। যোগ যে পুরুষার্থসাধনের বা মোক্ষের প্রধান সহায় তার ইঙ্গিত এই মন্ত্রে সূচিত হয়েছে। ঋদ্বেদের অন্য একটি মন্ত্রে (১/৩০/৭) 'কর্মারম্ভ' অর্থে যোগশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সায়নের মতে— "যোগে যোগে প্রবেশে প্রবেশে তত্তৎকর্মোপক্রমে।"[৬] কিন্তু এই মন্ত্রে যে 'যোগ' শব্দটি সংযোগ অর্থের প্রকাশক সেটিও ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে[৭] বলেছেন 'যুজির্ যোগ' অর্থে যুজ্ ধাতুর উত্তর 'হলশ্চ' সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এবং 'চজোঃ কুঘিন্যতোঃ' সূত্রানুসারে 'ঘ' স্থানে 'গ' আদেশ পূর্বক 'যোগ' শব্দটি গঠিত। সুতরাং মন্ত্রস্থ অংশের অর্থ হয় 'প্রতি

কর্মসংযোগ'। যোগের এই সংযোগ অর্থের গ্রহণ দৃষ্ট হয় ঋগ্বেদসংহিতার প্রথমমণ্ডলের চৌত্রিশতম সূক্তের নবম ঋক্ এ। এছাড়া অন্যত্রও[৮] যোগ শব্দের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।

বৈদিক সাহিত্যের সারাৎসার উপনিষদে যোগ শব্দ 'সংযোগ' অর্থে গ্রহীত। 'যুজ্যতে অনেন' এই অর্থে যুজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন যোগ শব্দের অর্থ 'যার দ্বারা যুক্ত হয়'। এই যোগ বা সংযোগ জীবাত্মার সাথে পরামাত্মার যোগ, যা উভয়ের ঐক্যের নামান্তর। এই ঐক্যজ্ঞান বা নিজের স্বরূপজ্ঞান হলে জীবের ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি তথা মুক্তিলাভ হয়, যা উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং যোগ হল সেই পরমপদে পৌঁছানোর উপায়স্বরূপ। প্রধান ও অপ্রধান উভয় উপনিষদ্ সমূহের প্রায় অধিকাংশেই সাধনরূপে যোগ ও তার অঙ্গসমূহ আলোচিত হয়েছে। কঠোপনিষদে যোগকে ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরাবস্থারূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে— 'তাং যোগমিতি মন্যতে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্'।[৯] বাহ্যবিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবৃত্ত করে পরমাত্মাতে স্থাপন করলে অতিচঞ্চল ইন্দ্রিয় স্থির হয়। যোগের মাধ্যমে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় তা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি কারণ বা উপায়। মৈত্রায়ণী উপনিষদে মন ও আত্মার ঐক্যকে যোগ বলা হয়েছে। মহোপনিষদে বলা হয়েছে— 'মনঃ প্রশমনোপায়ো যোগ ইতি অভিধীয়তে'।[১০] মন প্রশমন অর্থাৎ চিত্তকে শান্ত, সমাহিত করার মাধ্যমই যোগ। চিত্ত স্থির বা শান্ত হলে একাগ্রতা সাধিত হয় এবং একাগ্র চিত্ত পরমাত্মাতে স্থাপিত হলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপদের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।

পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণের বিভিন্ন স্থানে যোগের উল্লেখ উপলব্ধ। সেখানে কোথাও যোগের লক্ষণ ব্যাখ্যাত, কোথাও বা যোগীর স্বরূপ, কোথাও অষ্টাঙ্গযোগের বিশদ বর্ণনা, কোথাও ষড়ঙ্গযোগের রহস্যমোচন করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে যোগের লক্ষণে বলা হয়েছে — "আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যাব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে।।"[১১]

যোগ হল এক বিশেষ মনোগতি বা মানসিক অবস্থা, এই মানসিক অবস্থাকে লাভ করতে হয়, যার সাধন হল যম, নিয়মাদি আত্মপ্রচেষ্টা। যমাদির মাধ্যমে পরিষ্কৃত এবং সংযত মনের এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের সাথে জীবের সংযোগ বা মিলন হয়। এই বিশেষ মানসিক অবস্থাই যোগ পদবাচ্য। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণোক্ত যোগলক্ষণে যোগ শব্দটি সংযোগ অর্থেরই প্রকাশক। একইভাবে স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে— 'সংযোগস্ত্বাত্মমনসো যোগ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।'[১২] অর্থাৎ আত্মমনঃসংযোগই যোগ। এই স্কন্দপুরাণে আবার যোগের চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক স্বরূপও বর্ণিত— 'চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যং যোগতত্ত্বং প্রকীর্ত্যতে।'[১৩] লিঙ্গপুরাণেও চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধকেই যোগ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে আসন, ধ্যান প্রভৃতি ব্যতিরেকে মনের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগকেই যোগ রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— "ন চ পদ্মাসনাদ্ যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগো যোগ উচ্যতে।।”[১৪]

গড়ুর পুরাণে এই যোগ ভুক্তিমুক্তিকর বলে আখ্যায়িত। ভুক্তি হল বাহ্যিক দীর্ঘজীবনাদি সুখভোগ এবং মুক্তি অর্থাৎ সংসারাদি থেকে আত্যন্তিক মুক্তি। যে সাধনার মাধ্যমে যুগপৎ যোগৈশ্বর্য প্রভৃতির মাধ্যমে ভুক্তি এবং সমাধির মাধ্যমে মুক্তি লব্ধ হয় সেই সাধনমার্গই যোগ।

যোগের উৎসানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে যোগচর্চার ধারা অতি প্রাচীনকাল থেকে নিজগতিতে প্রবহমান ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী ভগবান্ সর্বপ্রথম এই বিদ্যা বিবস্বান্ কে প্রদান করেন। বিবস্বান্ তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে উপদেশ দেন। মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এবং ইক্ষ্বাকু জনক প্রমুখ রাজাকে যোগবিদ্যা উপদেশ দেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ং এই কথা বলেছেন –

“ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।”[১৫]

যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখের মতে হিরণ্যগর্ভ হলেন যোগের আদি প্রবক্তা। তত্ত্ববৈশারদীকার বাচস্পতি মিশ্র যোগসূত্র ১/১ –এর ব্যাখ্যাকালে এই মতের উল্লেখ করেছেন— ‘হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।’[১৬] আচার্য বিজ্ঞানাভিক্ষুও সমমত পোষণ করেন। তবে তাঁরা হিরণ্যগর্ভ বলতে মহর্ষি কপিলকেই বুঝিয়েছেন। মহর্ষি কপিলই সাংখ্য ও যোগের আদ্যুপদেষ্টা। -

“কপিলং প্রাহুরাচার্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতিনিশ্চিতাঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ ছন্দসি সংস্তুতঃ।।”[১৭]

তবে মহাভারত ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি অনুযায়ী সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভ যোগের সূচনা করেন। বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যগর্ভযোগের উল্লেখ বিদ্যমান।[১৮] পতঞ্জলিকৃত ‘যোগসূত্রে’র প্রথম সূত্রে ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা পতঞ্জলির পূর্বসূরীগণের অস্তিত্ব সূচিত হয়েছে। ‘অনুশাসন’ শব্দের দ্বারা পূর্বে উপস্থাপিত কোন বিষয়ের পুনঃপ্রতিস্থাপনকে বোঝানো হয়। সুতরাং পতঞ্জলি যোগের আদি প্রবক্তা নন। তাঁর পূর্বে হিরণ্যগর্ভযোগের প্রচলন ছিল। পতঞ্জলি যোগস্বরূপ ও যোগসম্পর্কিত অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে একত্রে এনে সূত্রাকারে গ্রথিত করেন, যা ‘যোগসূত্র’ নামে পরিচিতি লাভ করে। যোগসূত্রকার পতঞ্জলিকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতসমাজে মতভেদ বিদ্যমান। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি অনন্তনাগের অবতার এবং চরকরূপে বৈদ্যশাস্ত্ররচনা করে শরীরের মল, মহাভাষ্য রচনা করে শব্দের মল এবং যোগসূত্র রচনা করে চিত্তের মল দূর করার উপায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাই ব্যাসভাষ্যের মঙ্গলাচরণে অনন্তদেব স্তুত হয়েছেন।[১৯] এইরূপে যাঁরা মহাভাষ্যকার ও যোগসূত্রকার পতঞ্জলিকে অভিন্ন মনে করেন তাঁরা যোগভাষ্যে স্ফোটবাদের অবতারণাকে সপক্ষযুক্তিরূপে প্রস্তুত করেন, যেহেতু অভিনব স্ফোটবাদ মহাভাষ্যে স্থাপিত ও বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত। তবে এই মতের প্রতিপক্ষে যাঁরা বিদ্যমান তাঁদের মতে

যোগসূত্রকার পতঞ্জলি তাঁর কোন সূত্রে স্ফোটবাদের উল্লেখ করেননি। ব্যাসদেব তৃতীয়পাদের সতেরতম সূত্রের ব্যাখ্যায় স্ফোটবাদের অবতারণা করেন। এই কারণরূপে অনুমিত হয় যে ব্যাসদেব ঐতিহ্যানুসারে উভয়পতঞ্জলিকে অভিন্ন জ্ঞানে নিজভাষ্যে স্ফোটবাদের অবতারণা করেছেন। যোগসূত্রকার পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। তবে বলা যেতে পারে দু'শ খ্রীঃ পূঃ থেকে দু'শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময় তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। অধ্যাপক জ্যাকোবির মতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে 'যোগসূত্র' রচিত হয়। J. H. Woods এর মতে পতঞ্জলির সময়কাল ৫০০-৩০০ খ্রীঃ পূঃ।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে 'যোগ' শব্দটিকে সমাধি অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কারণ, যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি ব্যাসদেব 'অথ যোগানুশাসনম্'[২০] সূত্রস্থিত যোগ শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলেছেন— 'যোগঃ সমাধিঃ। যোগের স্বরূপপ্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।[২১] চিত্তের বৃত্তিসমূহের[২২] নিরোধকেই যোগ বলা হয়। 'নিরোধ' পদটি এখানে বিনাশ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি, এখানে নিরোধের অর্থ 'লয়'। চিত্তের বৃত্তিগুলি যখন স্বকারণে লয় হয় তখন সেই অবস্থা 'যোগ' পদবাচ্য। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলার কারণে প্রশ্ন জাগে যে আংশিকবৃত্তির নিরোধকে না সর্ববৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা হবে। যদি সর্ববৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা হয় তাহলে সম্প্রজ্ঞাতযোগ যোগপদবাচ্য হবে না, কারণ সেখানে ধ্যেয়াকার অক্লিষ্টবৃত্তি থাকে। আর যদি আংশিক বৃত্তির নিরোধ যোগ হয় তাহলে বিক্ষিপ্তভূমিতে যে কিঞ্চিৎ বৃত্তির নিরোধ হয় সেটিও যোগ পদবাচ্য হবে। এই প্রশ্নের উত্তর পতঞ্জলি নিজেই দিয়েছেন 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'[২৩] সূত্রে। যে সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্রষ্টার স্বস্বরূপাবস্থিতির কারণ হয় তাই যোগ বা সমাধি। যোগসূত্রের চারটি অধ্যায়ে সূত্রাকারে তিনি এই যোগের স্বরূপ, অধিকারীভেদে সমাধিলাভের উপায়, যোগমার্গে প্রাপ্ত বিভূতি ও কৈবল্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

পতঞ্জলিপ্রণীত যোগসূত্ররূপ ভূমিতে দর্শনরূপে যোগের যে অঙ্কুরোদ্গম হয়, ব্যাসদেবের যোগভাষ্য সেই যোগবৃক্ষের পরিবর্ধনে এক অত্যাবশ্যক উপাদান। স্বল্পাক্ষর সূত্রগুলির অর্থের পরিস্ফুটনার্থে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচনা করলেন তাঁর 'যোগভাষ্য', যা ব্যাসভাষ্যরূপে সমধিক খ্যাত। ভাষ্যকারের সময়কাল আনুমানিক তৃতীয় শতক। ব্যাসভাষ্য ব্যতীত যোগসূত্রের অর্থানুধাবন ও বিশ্লেষণ অসম্ভব। সূত্রের জটিল, দুরূহ, পারিভাষিক বিষয়সমূহকে ভাষ্যকার সহজবোধ্য, মনোগ্রাহী করে তুলেছেন তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে। তিনি যে কেবলমাত্র ব্যাখ্যাকার ছিলেন না, দার্শনিকের অন্তরে যে এক 'কবি' জীবিত ছিলেন তার পরিচয় তাঁর বর্ণনাকৌশল। যেমন চিত্তের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— চিত্তনদী উভয়তোবাহিনী। একটি ধারা কল্যানবাহী, তা মঙ্গলের জন্য বাহিত হয়। অন্যটি পাপবহা। যোগের মাধ্যমে পাপবাহী ধারাকে রুদ্ধ করে কল্যাণের ধারাকে

বর্ধিত করার কথা তিনি বলেছেন। এছাড়াও চতুর্ব্যূহবাদ, সুখ ও দুঃখের স্বরূপবর্ণনা, ক্ষণের সংজ্ঞা ইত্যাদি তাঁর চিন্তার অভিনবত্বের পরিচায়ক।

পরবর্তীকালে রচিত যোগসূত্র ও ব্যাসভাষ্যের উপর টীকা ও বৃত্তিগুলি যোগকলেবরের বৃদ্ধিতে সহায়ক। ব্যাসভাষ্যের উপর রচিত সর্বপ্রাচীন টীকা গ্রন্থ 'তত্ত্ববৈশারদী'র প্রণেতা হলেন বাচস্পতি মিশ্র। মিথিলার অধিবাসী বাচস্পতি মিশ্রের সময়কাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ অথবা নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। তিনি যোগদর্শনের প্রেক্ষিতে যোগভাষ্যের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সরল। ব্যাসভাষ্যের বহু জটিল ব্যাখ্যাকে সরলীকরণার্থে তিনি যোগের দৃষ্টিতে এই টীকাগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। ব্যাসভাষ্যের উপর রচিত অপর টীকাগ্রন্থ হল 'যোগবার্ত্তিক'। এটি বিজ্ঞানভিক্ষুপ্রণীত। তিনি আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে তিনি তত্ত্ববৈশারদীর ব্যাখ্যাসমূহকে পর্যালোচনা করেছেন এবং স্থানে স্থানে বাচস্পতি মিশ্রের মত খণ্ডন করেছেন। গ্রন্থটি সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রচুর শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। তবে কিছু স্থানে মনোজ্ঞ বিচারের ও বিশ্লেষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা টীকাগুলির মধ্যে একটি হল 'ভাস্বতী'। সাংখ্যযোগাচার্য স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যক (৪/১২/১৮৬৯ – ১৯/৪/১৯৪৭) টীকাটি রচনা করে যোগদর্শনকে সমৃদ্ধ করেছেন। সরল ও বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গীতে রচিত যোগভাষ্যের এই বৃত্তিগ্রন্থটি পরম উপাদেয়। যোগভাষ্যের গুরুত্ববিষয়ক বিস্তৃত ও যুক্তিসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে উপলব্ধ হয়। গ্রন্থকারের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা যোগদর্শনের বক্তব্যকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করেছে।

ভোজদেবকৃত 'রাজমার্তণ্ড' পতঞ্জলিপ্রণীত যোগসূত্রের উপর রচিত বৃত্তিগ্রন্থ। এটি ভোজবৃত্তি নামেও বহুবিদিত। তিনি আনুমানিক ১০১৯–১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। ভোজদেব ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। কোন বিষয়ে নিজমত জ্ঞাপনের পূর্বে পূর্বপক্ষরূপে স্থিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত উপস্থাপনের পর তা খণ্ডন করে নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন— আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায়োক্ত মতগুলি উল্লেখ করে সেগুলি খণ্ডনপূর্বক নিজমতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। যোগদর্শনের বিশেষ পারিভাষিক শব্দগুলিকে তিনি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাখ্যা করেছেন। 'সূত্রার্থবোধিনী' ব্যাখ্যাগ্রন্থটি যোগসূত্র আধারে গ্রথিত। গ্রন্থকার নারায়ণতীর্থ সপ্তদশ শতাব্দীতে অবস্থিত ছিলেন। যোগসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানভিক্ষু এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত বিরুদ্ধ মতগুলি পর্যালোচনাপূর্বক একটি সংশ্লেষিত রূপ উপস্থাপিত করেছেন। বিশ্লেষণব্যতীত কোন মতের গ্রহণ বা বর্জন গ্রন্থকার করেননি। নারায়ণতীর্থ প্রণীত অপর গ্রন্থ 'যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' যোগসূত্রের একটি সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাখ্যাগ্রন্থ । প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিকে অবলম্বন করে এখানে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভক্তিযোগ এবং

হঠযোগ আলোচিত হয়েছে। যোগসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি ক্রিয়াযোগ, চর্যাযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, জ্ঞানযোগ, অদ্বৈতযোগ, লক্ষ্যযোগ, ব্রহ্মযোগ, শিবযোগ, সিদ্ধিযোগ, বাসনাযোগ, লয়যোগ, ধ্যানযোগ, প্রেমভক্তিযোগ ইত্যাদি যোগের অবান্তর রূপভেদগুলির অনুসন্ধান করেছেন। অনন্তদেব প্রণীত 'পদচন্দ্রিকা' গ্রন্থটি যোগসূত্রের উপর রচিত সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বৃত্তিগ্রন্থ। তিনি যোগসূত্রের ব্যাখ্যা ভোজবৃত্তির প্রেক্ষিতে করেছেন। এই গ্রন্থে যোগসূত্রের বিভিন্ন পদগুলিকে অনেকক্ষেত্রে কারকবিভক্তি বা সমাসের ভিত্তিতে বিভক্ত করে উপস্থাপন করে হয়েছে। কোন নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন দৃষ্ট হয় না।

'বৃহৎযোগসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থটি নাগেশভট্ট বিরচিত যোগসূত্রের বৃত্তি। গ্রন্থকারের সময়কাল ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরার্ধ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। গ্রন্থটির ভাষা ও রচনাবিন্যাস বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিকের অনুরূপ। বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর উপস্থাপিত মতানৈক্যগুলিকে তিনি বিশ্লেষন করে নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। গ্রন্থে তার স্বকীয় চিন্তার ছাপ বিদ্যমান। যোগসূত্রের অপর একটি সরল বৃত্তিগ্রন্থ হল 'যোগসুধাকর'। অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী গ্রন্থটির প্রণেতা। তিনি তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে যোগসূত্রের তত্ত্বকে সরলীকৃত করতে চেয়েছেন। সেই কারণে যোগতত্ত্বের সরলীকরণার্থে তিনি নানা উদাহরণ সহযোগে যোগসূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন।

'পাতঞ্জলরহস্য' গ্রন্থটি রাঘবানন্দ সরস্বতী প্রণীত তত্ত্ববৈশারদী গ্রন্থের ব্যাখ্যারূপ গ্রন্থ। বাচস্পতিমিশ্রের উক্ত বহু জটিল বাক্য এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সরলাকারে উপস্থাপিত করেছেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর সমসাময়িক আচার্য ভাবাগণেশ (ষোড়শ শতাব্দী) যোগবার্ত্তিককে আধার করে যোগসূত্রবৃত্তি রচনা করেন। বৃত্তিটির নাম 'যোগদীপিকা' বা 'ভাবাগণেশীয়বৃত্তি'। গ্রন্থটির মাধ্যমে গ্রন্থকার যোগসূত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যোগবার্ত্তিকের গুরুত্ব কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। যোগসূত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতগুলির আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত গ্রন্থগুলি যে কেবলমাত্র যোগদর্শনের কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে তাই নয়, নানা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তারা যোগদর্শনকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছে। বিভিন্ন মতের সমাবেশে উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত। বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রে বিধৃত, ঔপনিষদীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের মনন ঋদ্ধ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় 'যোগ' মহর্ষি পতঞ্জলির মাধ্যমে দশর্নের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের জ্ঞানচর্চার দ্বারা বর্তমান রূপে বিরাজমান। যোগচর্চা থেকে যোগদর্শনের ক্রমবিকাশের এই যাত্রাপথে পাথেয় জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতদের প্রকৃত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা অজানাকে জানার, পুরোনোকে নতুন আঙ্গীকে দেখার। সেই কারণেই অতিপ্রাচীন যোগবিদ্যা যোগদর্শনরূপে স্বমহীমায় বিরাজিত।

তথ্যসূত্র :

১। ‘যোগা’র আকারটি ভুলবশতঃ নয়, ইচ্ছাকৃত সংযোজন। কারণ, বর্তমানে ‘যোগাভ্যাস’, ‘যোগব্যায়াম’, ‘যোগসাধনা’ সমস্তই ‘যোগা’ তে পর্যবসিত। আমাদের ‘যোগ’ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কখন যেন ‘যোগা’ হয়ে গেছে।

২। যোগমতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ— এই পাঁচটি ক্লেশ আমাদের চিত্তকে ক্লিষ্ট করে তোলে, ফলে মন একাগ্র ও সমাহিত হতে পারে না।

৩। পাণিনীয় সূত্র – ‘অকর্তরি চ করণে সংজ্ঞায়াম্’ (৩/৩/১৬)

৪। দ্রষ্টব্য বাংলা বিশ্বকোষ, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৯।

৫। সায়নভাষ্য, সামবেদ সংহিতা, পৃ. ২৯২।

৬। দ্রষ্টব্য ঋগ্বেদ সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৪২১ ।

৭। যুজির্ যোগে। হলশ্চেতি ঘঞ্। চজোঃ কুখিন্যতোরিতি কুত্বং – ঋগ্বেদ সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৮। ঋগ্বেদ ৩/২৭/১১, ৪/২৪/৪, ৭/৬৭/৮, ১০/৩০/১১, ১০/১১৪/৯ ।

৯। কঠোপনিষদ, ২/৩/১১।

১০। মহোপনিষদ্, ৫/৪২।

১১। বিষ্ণুপুরাণ, VI/৭/৩১।

১২। স্কন্দপুরাণ, IV/৪১/৪৮।

১৩। ঐ, I/২/৫৫/১১।

১৪। ব্রহ্মপুরাণ, ২৩৪/২৮।

১৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১।

১৬। দ্রষ্টব্য পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, পৃ. ২।

১৭। দ্রষ্টব্য যোগদর্শন, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২ ।

১৮। বিষ্ণুপুরাণ, ২/১৩/৪২-৪৩।

১৯। যস্ত্যক্ত্বা রূপমিদং প্রভবতি জগতোইনেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্বিষমবিষধরোইনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোইহীশঃ স বোহব্যাত্সিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ।।

২০। যোগসূত্র, ১/১।

২১। ঐ, ১/২।

২২। ত্রিগুণাত্মিকা চিত্তের পরিণামকে চিত্তবৃত্তি বলে। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষে চিত্তের যে বিষয়াকার পরিণতি, তাই চিত্তবৃত্তি। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্টরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ পাঁচপ্রকার- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

২৩। যোগসূত্র, ১/৩।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। *ঋগ্বেদ সংহিতা* – দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মণ (সম্পা), দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃথিবীর ইতিহাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, হাওড়া, ১৩৪০ সালাব্দ।

২। *সামবেদ সংহিতা* – দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্মণ (সম্পা), প্রথম খণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, হাওড়া, ১৩৪০ সালাব্দ।

৩। *পাতঞ্জলদর্শন* – কালীবর সিদ্ধান্তবাগীশ (অনুবাদক), অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।

৪। *পাতঞ্জল-যোগদর্শন* (তত্ত্ববৈশারদীসংবলিত-ব্যাসভাষ্যসমেতম্) – রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, বারাণসী, ১৯৬৩।

৫। ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র – *ষড়্দর্শনঃ যোগ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

৬। মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল – *যোগের কথা-পতঞ্জলির দৃষ্টিতে (অখণ্ড),* শ্রী সারদা মঠ, কলকাতা, ২০১১।

৭। বসু, নাগেন্দ্রনাথ (সম্পা) – *বাংলা বিশ্বকোষ,* ১৬তম খণ্ড, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৮।

৮। বসু, অমরেন্দ্রনাথ – *ভারতীয় দর্শনের খোঁজে,* ১ম পর্বঃ বেদ ও উপনিষদ্, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কোলকাতা, ২০০২।

জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব অনিস্বীকার্য

মধুরিমা ভৌমিক
গবেষক, দর্শন বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ: সুখ যেমন মানব জীবনে আকাঙ্খিত দুঃখ কিন্তু মানব জীবনে আকাঙ্খিত নয় অথচ জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় দুঃখের অস্তিত্ব অনিস্বীকার্য এবং দুঃখ হলো মানব জীবনের অপ্রিয় সত্য। ভারতীয় দার্শনিকরা দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তার থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। শুধু ভারতীয় দার্শনিকরা নন, পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।
মূল শব্দ: দুঃখ, জীবন, জন্ম, অবিদ্যা, বন্ধন।

দুঃখের ইংরেজি অনূদিত হলো suffering, pain, stress etc. *দুঃখ* (Dukhha) শব্দের বিন্যাস করলে *দু* (du) + *খ* (kha), *দু* অর্থাৎ 'খারাপ' বা 'কঠিন 'আর *খ* অর্থাৎ 'খালি'। দুঃখ উপনিষদ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থে (ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত সকল গ্রন্থে দুঃখের আলোচনা দেখা যায়) পাওয়া একটি শব্দ যার অর্থ হল অপ্রীতিকর, ব্যথা, বেদনা ইত্যাদি। মানুষ দুঃখের চিহ্নিতকরণ সাধারণত সুখের বিপরীত হিসেবেই করেন। দুঃখ এতটাই অপ্রিয় সত্য যে মানুষ তার অস্বীকার করেননি বরং তা সহ্য করার ক্ষমতা বারংবার প্রার্থনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির ৩৬ সংখ্যক কবিতা উল্লেখিত, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারংবার প্রভুর কাছে সুখকে যেমন সইবার শক্তি চেয়েছেন, ঠিক তেমনি জীবনে সুখের সঙ্গে দুঃখকে সহ্য করার প্রার্থনা করেছেন।

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন -
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখের সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিতমুখে
পারে উপেক্ষিতে।

This is my prayer to thee, my lord-strike, strike at the root of penury in my heart.
Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.
(Rabindranath Tagore, Gitanjali- 36)

দুঃখের নানা প্রকারভেদ থাকতে পারে কিন্তু দুঃখ সাধারণত দুই রকম- একটি হল শারীরিক দুঃখ, অপরটি মানসিক দুঃখ। জীবনের দুঃখের আগমন নানাভাবে হতে পারে। কখনো সমাজ দ্বারা, কখনো প্রকৃতি দ্বারা, আবার কখনো আপনজন দ্বারা ইত্যাদি। সব দুঃখের তারতম্য কিন্তু এক নয়। এখানে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে আসে যে ঠিক কতটা দুঃখ পেলে একটি জীবনকে দুঃখময় জীবন বলা যেতে পারে বা দুঃখ মাপার মাপকাঠি কি? এটি একটি আলোচনার জায়গা কেননা কারো কাছে তার প্রিয় খাবারটি রেস্তোরায় গিয়ে না পেলে দুঃখী হতে পারেন আবার কেউ হয়তো খাবারই পাচ্ছেন না তাই তিনি দুঃখী। তবে দুঃখ জীবনেরই একটি অংশ ঠিক সুখ যেমন জীবনের অংশ।

দর্শনে দুঃখ শব্দটি খুবই প্রচলিত। ভারতীয় দর্শনকে অনেকে দুঃখবাদী দর্শন বলেন। এ কথা ঠিক ভারতীয় দর্শন দুঃখের বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন কিন্তু এর থেকে এটা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী দর্শন। দুঃখের বাস্তবতা এবং জীবনে দুঃখের অবস্থানকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। তাই ভারতীয় দর্শন দুঃখের বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং এর থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। জীবনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনা করা যেতে পারে - একটি দুঃখ বা নৈরাশের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং অপরটি সুখ বা আশার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেসব দার্শনিক জীবনকে দুঃখের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন তাদের দুঃখবাদী দার্শনিক (pessimist philosophers) বলা হয়। আর যারা জীবনকে সুখের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন তাদের আশাবাদী দার্শনিক (optimist philosophers) বলা হয়। যেমন পাশ্চাত্য দর্শনে জার্মান দার্শনিক শোপেনআওয়ার (Schopenhauer) দুঃখবাদী দার্শনিক নামে পরিচিত। কেননা তিনি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, তার মতে জীবনে দুঃখই একমাত্র বাস্তব অনুভূতি, সুখ বলে বাস্তবত কিছু নেই। শোপেনআওয়ার তার *On the Suffering of the World* গ্রন্থে বলেছিলেন- দুঃখই জীবনের সার কথা। সুখ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। সুখ প্রসঙ্গে তার মতবাদ অধ্যয়নের পর আমার সেই flok song মনে পড়ে যায় সেটি হল-

তারে ধরি ধরি মনে করি
ধরতে গেলাম আর পেলাম না
দেখেছি রুপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
(Song written by Nabanidas Khayapa Baul)

আসলে সুখ হল অধরা মাধুরী। যখনই একে ধরতে যাওয়া হয় তার অস্তিত্বের সংকট ঘটে। তবে শোপেনআওয়ার গৌতম বুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি নিজেকে বুদ্ধিস্ট বলতেন। গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে শোপেনআওয়ার এর দার্শনিক আলোচনায় মিল যেমন রয়েছে তেমনি অমিল রয়েছে। তবে গৌতম বুদ্ধের মতে 'সর্বং দুঃখম'। জগতে সবই দুঃখ অর্থাৎ জন্ম দুঃখ, রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ

ইত্যাদি। দুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে Heinrich Heine এর একটি quote খুবই প্রাসঙ্গিক তা হল- "sleep is good, death is better; but of course, best thing world to have never been born at all" অর্থাৎ ঘুম জাগরণ থেকে ভালো, কেননা নিদ্রা ভঙ্গ হলেই আবার সেই দুঃখময় জীবন। জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় কেননা জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই দুঃখময়। তাই এই পৃথিবীতে না জন্মানো সবথেকে ভালো। জন্ম মানেই সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ আর বন্ধন মানে দুঃখ। শোপেনআওয়ার এর মতেও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবই দুঃখ এবং দুঃখ মুক্তি সম্ভব নয়। এখানেই গৌতমবুদ্ধের সাথে শোপেনআওয়ার এর বিস্তর পার্থক্য। গৌতম বুদ্ধ জগৎকে দুঃখময় বললেও দুঃখের যে মুক্তি সম্ভব এবং তার পথ তিনি দেখিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনে দুঃখের আলোচনা: ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় গুলি দুঃখ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবার একে একে দুঃখ সম্পর্কীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মতবাদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

বৌদ্ধ দর্শন: বুদ্ধমতে, 'সর্বং দুঃখম'। জগতের সবকিছুই দুঃখ। জন্ম থেকে মৃত্যু মধ্যবর্তী যা কিছু সবই দুঃখ যেমন অপ্রীয় সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, রোগ, জরা, সবই দুঃখ। দুঃখ সত্য এবং এর থেকে চরম বাস্তব জগতে আর কিছুই নেই। মনুষ্য ইতিহাসে কোন জীবন আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আসেনি যে জীবনে দুঃখ নেই। আসলে দুঃখ বিহীন জীবন - এটি যেন মিথ্যাচার। তবে গৌতম বুদ্ধের আসল লক্ষ্য ছিল- দুঃখতাপে জর্জরিত মানুষের মুক্তি। বুদ্ধদেব তার জীবনে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দ্বারা চারটি সত্য লাভ করেন, যা আর্যসত্য (Four Noble Truths)[১] নামে পরিচিত। এগুলি হল-

ক. দুঃখ (There is suffering)
খ. দুঃখ সমুদয় (There is a cause of suffering)
গ. দুঃখ নিরোধ (There is a cessation of suffering)
ঘ. দুঃখ নিরোধ মার্গ (There is a way leading to this cessation of suffering)

মনে রাখতে হবে বুদ্ধদেব কিন্তু দুঃখ এবং দুঃখমুক্তি এই দুইয়ের কথাই বলেছেন। বুদ্ধমতে, জগত যেমন দুঃখময় সেই দুঃখের কারণও আছে। কেননা কারণ ছাড়া কোন কার্যই বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে পারেনা। দুঃখ নামক কার্যেরও কারণ আছে এবং কারণ যদি জানা যায় সেই কারণের উচ্ছেদ থেকে কার্যের উচ্ছেদ সম্ভব অর্থাৎ দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভব। দুঃখের এক এক করে কারণ দেখলে মূল কারণটি যা তা হল 'অবিদ্যা' সুতরাং অবিদ্যা বিনাশে দুঃখ মুক্তি সম্ভব। এবার প্রশ্ন হল এই অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে সম্ভব? অবিদ্যা বিনাশের জন্য তিনি মার্গ দেখিয়েছেন যা বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ নিরোধ মার্গ বা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দর্শন অধ্যায়ন করলে এটি পরিষ্কার যে বৌদ্ধ দর্শনে জগতকে দুঃখময় বলা হলেও তিনি দুঃখমুক্তির পথ

দেখিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই দুঃখ কোন স্থায়ী বস্তু নয়। বুদ্ধমতে, "সর্বং অনিত্যম" অর্থাৎ সবকিছুই অনিত্য। সুতরাং দুঃখও অনিত্য।

জৈন দর্শন: জৈন দর্শনে অবিদ্যাকে দুঃখের কারণ বলা হয়েছে। অর্থাৎ জৈন দর্শনে দুঃখ স্বীকৃত। এবার আবারো সেই প্রশ্ন অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে সম্ভব? Passions attract the flow of karmic matter into the souls. And passions are due to ignorance. So ignorance is the real cause of bondage. Here Jainism agrees with Sankhya, Buddhism and Vedanta. Now, ignorance can removed only by knowledge.[২] অর্থাৎ অবিদ্যার ফলে মানব জাতি জগতে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে আর এই বন্ধনই হচ্ছে দুঃখের কারণ। জ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যার নাশ সম্ভব। মুক্তির পথ হিসাবে জৈনরা তাদের দর্শনে ত্রিরত্নের উল্লেখ করেছেন। তা হল -

ক. সম্যক দর্শন (Right faith)
খ. সম্যক জ্ঞান (Right knowledge)
গ. সম্যক চরিত্র(Right conduct)

সাংখ্য দর্শন: এবার সাংখ্য দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সাংখ্য দর্শনে প্রথম কারিকায় দুঃখের উল্লেখ রয়েছে। তাই সাংখ্য কারিকার প্রথম কারিকা উল্লেখ করে তারপর আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট করণ হবে। সাংখ্য কারিকার প্রথম কারিকায় বলা হয়েছে -

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোহভাবাৎ।।১।।[৩]

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকাটি দুঃখকেন্দ্রিক। মানব জীবনে দুঃখ ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তির উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এই কারিকায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুঃখকেন্দ্রিক কারিকা দিয়ে সংখ্যা দর্শনের শুরু হলেও আসলে দুঃখের অপঘাতক বা নিবর্তক হেতু কি তা নিয়েই জানতে চাওয়া হয়েছে এই করিকায়। এবার প্রশ্ন হল এই ত্রিবিধ দুঃখগুলি কি ? এবং এই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব কি? দুঃখসমূহের দুঃখত্রয় বা

ত্রিবিধ দুঃখ হলো- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার- শারীরিক ও মানসিক। আধিভৌতিক দুঃখ বাহ্যিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ। আধিদৈবিক দুঃখের কারণ ও বাহ্যিক তবে দৈব শব্দের অর্থ এখানে অপদেবতা কে বুঝানো হয়েছে। সাংখ্য মতে, জন্ম থেকেই জীব এই দুঃখত্রয়ের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত। এই ত্রিবিধ দুঃখের বন্ধন থেকে উচ্ছেদ কি সম্ভব বা কিভাবে দুঃখ ত্রয়ের নিরোধ সম্ভব? ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সংখ্যাকারিকার দু নম্বর কারিকায় দুঃখ-নিবৃত্তির বিধি দিয়েছেন তা হল-

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।২।।[৪]

সুতরাং দুঃখের নিবারণ সম্ভব এবং তার তিন প্রকার উপায় রয়েছে।
ক. দৃষ্টবৎ বা লৌকিক উপায়
খ. আনুশ্রবিক উপায় যথা বেদ বিহিত যাগযজ্ঞাদি
গ. সংখ্যা শাস্ত্রবিহিত উপায়- তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞান
দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক উপায় যেহেতু একই তাই দুঃখ নিবারণের অনেকেই দুরকম উপায়ে কথা বলেছেন। তবে দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে দুঃখত্রয়ের ঐকান্তিক বা অত্যান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তাহলে প্রশ্ন হল বিবেকজ্ঞানের দ্বারা কি দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হবেই। সাংখ্য দর্শনের উপরের উল্লেখিত কারিকা সবিস্তার অধ্যায়ন করলে দেখা যাবে বিবেজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ (একান্ত ও অত্যন্ত) নিবৃত্তি সম্ভব। এবার প্রশ্ন হল বিবেকজ্ঞান কি? বিবেকজ্ঞান হল 'ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান' অর্থাৎ 'ব্যক্ত' হচ্ছে প্রকৃতির পরিনাম, 'অব্যক্ত' হচ্ছে প্রকৃতি, আর 'জ্ঞ' হচ্ছে পুরুষ। এককথায় পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান হচ্ছে বিবেকজ্ঞান।

যোগ দর্শন: আমরা জানি সাংখ্য ও যোগ সমান্তন্ত্র দর্শন। তথাপি এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সাংখ্য এবং যোগ উভয় দর্শনে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে বিবেকজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু যোগ দর্শন বিবেকজ্ঞানের সঙ্গে যোগসাধনাকেউ মুক্তির উপায় বলেছেন। Chandradhar Sharma তার গ্রন্থ *A Critical Survey of Indian Philosophy* তে বলেছেন - There are five kind of sufferings (klesha) to which it is subject. These are: (1) ignorance *(avidya)* (2) egoism *(asmita)* (3) attachment *(raga)* (4) aversion *(dvesa)* (5) clinging to life and instinctive fear of death *(abhinivesha).* The bondage of the self is due to its wrong identification with the mental modifications and liberation, therefore, means the end of this wrong identification through proper discrimination between *purusha* and *prakriti* and the consequent cessation of the mental modifications. It is the aim of yoga to bring about this result.[৫] অর্থাৎ যোগ দর্শনের পাঁচ প্রকার ক্লেশর উল্লেখ রয়েছে। প্রথম পকার অর্থাৎ অবিদ্যা হচ্ছে অজ্ঞান যা ক্লেশের মূল কারণ। অস্মিতা হচ্ছে অহং অভিমান, রাগ হচ্ছে সুখ জনক বস্তুর প্রতি আসক্তি,দ্বেষ হচ্ছে দুঃখজনক প্রস্তুত প্রতি বিতৃষ্ণা, অভিনিবেশ হচ্ছে মৃত্যুভয়। সুতরাং যোগ দর্শনেও দুঃখের স্বীকৃতি যেমন রয়েছে, তৎসহিত দুঃখমুক্তির মার্গ ও উল্লেখিত রয়েছে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন: ন্যায়বিশেষিক দর্শনে প্রমেয় পদার্থে দুঃখ স্বীকৃত। এই দর্শনে জীব জন্মের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর কর্মের দ্বারা সুখ ও দুঃখের ফল ভোগ করে। ন্যায়বৈশেষিক মতে, অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। আবারো প্রশ্ন হল অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে সম্ভব? তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয়।। এই তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে প্রমেয় পদার্থের (প্রমেয় পদার্থ বারটি যথা - আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ) জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানকে বিনাশ করে। এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হলে জীব জন্ম ও দুঃখে জর্জরিত হন না। আসলে মিথ্যাজ্ঞান নামক কারণের ফলে দোষ নামক কার্যের উৎপত্তি। দোষ থেকে উৎপত্তি হয় প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি থেকে উৎপত্তি হয় জন্ম। আর জন্ম নামক কারণ থেকেই দুঃখ নামক কার্যের উৎপত্তি। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকৃত। যদিও তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখমুক্তি সম্ভব।

মীমাংসা দর্শন: মহর্ষি জৈমিনি কর্মকে সর্বপ্রধান বলে স্বীকার করেন। মীমাংসা দর্শনে স্বর্গের ধারণা অধ্যায়ন করলেই স্পষ্ট হবে যে এখানেও দুঃখ স্বীকৃত হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো স্বর্গ কি? স্বর্গ হল সুখ বা যাতে দুঃখের লেশমাত্র নেই যা উৎপত্তির পরক্ষণেই ধ্বংস হয় না। এই স্বর্গলাভ বা দুঃখ মুক্তি হলো জীবের পরম অভীষ্ট।

বেদান্ত দর্শন: মীমাংসা দর্শনের মতো বেদান্ত দর্শনেও অবিদ্যাজনিত জীবনকে দুঃখময় বলা হয়। অবিদ্যা থেকেই বন্ধনভ্রম হয় (আত্মার বন্ধন বা মুক্তি নেই। আত্মা নিত্য মুক্ত)। এই অবিদ্যার বিনাশেই মুক্তি। জ্ঞান হল জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান। আর এই প্রকার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন। শঙ্করের মতে, বিশুদ্ধ জ্ঞানই মুক্তি (শঙ্কর দুই প্রকার মুক্তির উল্লেখ করেন যথা - জীবনমুক্তি ও বিধেয়মুক্তি)। রামানুজ মনে করেন মুক্তির জন্য জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিরও প্রয়োজন (রামানুজ জীবনমুক্তি স্বীকার করেন না)।

দুঃখের অনুভূতি হল মানব জীবনের সবচেয়ে তীব্র ও কষ্টকর অনুভূতি। শুধু ভারতীয় দর্শনে নয় পাশ্চাত্য দর্শনের দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকৃত। যেমন গ্রীক দার্শনিক পাইরোনিজমের (Pyrrohonism) মতে, দুঃখের মূল কারণ হলো গোঁড়ামি (dogmas). এপিকিউরাস (Epicurus) এর দর্শনের দিকে তাকালে দেখা যাবে তিনি একটি গ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেটি হল - *ataraxia* অর্থাৎ 'freedom from worry'. এপিকিউরাসের মতে, দুশ্চিন্তা সুখী জীবনের জন্য উপযোগী নয়। তিনি একজন সুখবাদী দার্শনিক তথাপি তিনি সুখের সংজ্ঞায় বলেছেন "the absence of pain in the body and trouble in the soul"[৬] অর্থাৎ সুখ হচ্ছে শরীরে ব্যথার অনুপস্থিতি এবং আত্মায় কষ্টের অনুপস্থিতি। শুরুতে গৌতম বুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শোপেনআওয়ার এর নাম উল্লেখিত হয়েছে। Nietzsche প্রথম শোপেনআওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিও দুঃখের বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন এবং মানব জীবনে দুঃখ বা দুর্ভোগকে ছদ্মবেশে একটি আশীর্বাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পরিশেষে, বলা যায় যে দুঃখ হল মানব জীবনের চরম বাস্তবতা। মানুষ দুঃখে যত অশ্রু বর্ষণ করেছেন হয়তো তার কাছে সমুদ্রের জল ও হার মানবে। জীবনে দুঃখকে অস্বীকার করার বদলে এর অস্তিত্ব স্বীকার করাই শ্রেয়। তৎসহিত আমাদের সহ্য ক্ষমতাকে অধিক থেকে অধিকতর করা উচিত যাতে দুঃখ এক নামমাত্র বিষয় হয়ে উঠে জীবনে। মানব ইতিহাসে এমন কোন জীবন নেই যে জীবন দুঃখহীন। তাই দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার এক হাস্যকর বা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের জন্ম থেকে, মানুষ যতদিন জন্মাবে, দুঃখ ততদিন জন্মাবে। অনেকে বর্তমান জীবনের দুঃখের জন্য ভাগ্যকে দায়ী করেন। এটি একটি সবিস্তার আলোচনার জায়গা কেননা ভাগ্য নির্ধারিত হয় কর্মের দ্বারা এবং আমরা পূর্বজন্মের কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন ভোগ করি। অনেকে পূর্বজন্ম বা পরজন্ম এই ধারণায় বিশ্বাসী নাই হতে পারেন, তবে কর্ম দ্বারা জীবন অতিবাহিত হয় এটি সবাই বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ ভালো কর্মের ভালো ফল এবং খারাপ কর্মের খারাপ ফল। কাজী নজরুল ইসলাম তার *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস যেটি প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে রচিত। তৎকলিন দরিদ্র, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনীর বিকাশ। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন তার জীবন অতি দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে, (উপন্যাসের প্রথম অংশ কৃষ্ণনগরের এবং শেষাংশ কলকাতায় রচিত) এই উপন্যাস তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই উপন্যাসে তিনি বলেছেন "কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই! এতে কপাল যথেষ্টই ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না।" যাই হোক সাধারণ মত আনুসারে, মানব জীবনের শারীরিক বিলুপ্তিতে একমাত্র দুঃখের বিলুপ্তি সম্ভব কিন্তু দর্শনে শারীরিক বিলুপ্তির পূর্বেও দুঃখমুক্তি সম্ভব।

উৎসের সান্ধানে :

১। Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey Of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD. Delhi, 1987, p. 71.

২। Ibdi, P. 65

৩। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (আনুবাদক), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণি কলি ৬, তৃতীয় প্রকাশকঃ ১৪০৬, পেজ নং, ৮।

৪। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (আনুবাদক), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণি কলি ৬, তৃতীয় প্রকাশকঃ ১৪০৬, পেজ নং, ২২।

৫। Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey Of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD. Delhi, 1987, p. 171.

৬। Epicurus: “In Waking or in Dream” Source: Baronett, Stan: *Jounney into Philosophy: An Introduction with Classic and*

Contemporary Readings, Routledge, New York and London,2012, p. 645.

সহায়ক গ্রন্থ :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি।

২। Sharma, Chandradhar, *A Critical Survey Of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD. Delhi, 1987.

৩। Chatterjee, S. & Datta, D. *An Introduction to Indian Philosophy*, Rupa Publications India Pvt. Ltd 2007.

৪। শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (আনুবাদক), *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ৩৮, বিধান সরণি কলি ৬, তৃতীয় প্রকাশকঃ ১৪০৬।

৫। রজত ভট্টাচার্য (আনুবাদক), *সাংখ্যকারিকা সম্পূর্ণ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

৬। Baronett, Stan: *Jounney into Philosophy: An Introduction with Classic and Contemporary Readings*, Routledge, New York and London, 2012.

ছেচল্লিশের দাঙ্গার চিত্রাঙ্কনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ'

সনৎ পান
স্টেট এডেড কলেজ টিচার,
বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ : বিশ শতকে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যাকাশে বারে বারে ঘনিয়েছে দুর্যোগের কালো মেঘ। ভারতীয় উপমহাদেশে পরাধীনতার আন্তিম পর্বের বিপর্যয় চিরস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রূপে বহমান। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা—১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদাঙ্গা এক ট্র্যাজিক অধ্যায়। ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট বঙ্গভূমি দাঙ্গার উৎসমুখে পরিনত হয়। এর স্পর্শে বোম্বাই, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পালটে দিল চিরায়ত ঐতিহ্যের মর্মমূলে আঘাত হানে। এই দাঙ্গা পাল্টে দিল ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের বোধ বিশ্বাস সবকিছু। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ এ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষের যন্ত্রনাময় যাপনকথা—বাংলা সাহিত্যের চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১ খ্রিঃ) উপন্যাসে ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও তার প্রেক্ষাপটে বিপর্যস্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে চিত্রিত করেছেন। দাঙ্গা থেকে স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কলকাতার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরায় উন্মোচিত হয়েছে।
সূচক শব্দ : দাঙ্গা, দেশভাগ, ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু, স্বাধীনতা, কলকাতা, স্বার্থসিদ্ধি

মূল আলোচনা :
বিশ শতকে দেশ ও দেশবাসীর ভাগ্যাকাশে বারে বারে ঘনিয়েছে দুর্যোগের কালো মেঘ, নিবিড় ঘন অন্ধকার। ভারতীয় উপমহাদেশে পরাধীনতার অন্তিম পর্বের বিপর্যয় গভীর মারাত্মক ক্ষত চিহ্ন রূপে বহমান। ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃহত্যার যজ্ঞ তথা দাঙ্গা এক ট্র্যাজিক ও উদ্বেলিত অধ্যায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পারস্পরিক ক্ষমতার লোভ এই দ্বন্দ্বকে ত্বরান্বিত করে। বাংলার লীগের নেতৃত্বের পরোক্ষ ইন্ধনে– 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে কংগ্রেসের চূড়ান্ত শ্লোগান-ই (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে) যেন ফিরে আসে লীগের ঘোষণায়—

"....that will be the signal for Muslims to do or die." [১]

ছেচল্লিশের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' (১৯৪৬ খ্রিঃ ১৬ আগষ্ট) এর স্পর্শে বোম্বাই, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশবাসীর ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেয়। এই দাঙ্গা পাল্টে দিল ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের বোধ- বিশ্বাস সবকিছু। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ এর দেশভাগ। দাঙ্গা ও দেশভাগ ছিন্নমূল

হতভাগ্য বাঙালির বেদনাময় ইতিহাস। ব্যাথিত মানুষের দুঃখ বেদনা হতাশা হাহাকারের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত রক্তের অক্ষরে সাহিত্যের পাতায়।

ছেচল্লিশের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার বেদনাময় ইতিহাসকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অনন্য সৃষ্টি সম্ভার। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'হাসুবানু', গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে', জ্যোর্তিময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', সমরেশ বসুর 'খন্ডিতা', প্রভৃতি উপন্যাস পূর্ববর্তী সাহিত্যধারাকে অতিক্রম করে মাটি ও মানুষের বাস্তবতাবোধ এর জীবন্ত দলিল। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পের সেই সময়ের ছবি যেসময়—'সকলেই সকলকে আড়চোখে দ্যাখে'। মনোজ বসুর 'হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতার বর্ণনা আছে। হত্যা- প্রতিহত্যা, খুন-জখম, ধর্ষণ, আগুন লাগানো, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রনা অগ্নি আখরে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে দাঙ্গা ফলশ্রুতিতে ছিন্নমূল 'নতুন ইহুদী'দের জীবনালেখ্য আমার আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যে অন্যতম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। বাস্তবের মাটিতে পদচারণা করে বাস্তবের গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) উপন্যাসে ১৯৪৬ সালের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও তার প্রেক্ষাপটে বিপর্যস্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে প্লট হিসাবে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ১৩৫৬-৫৭ বঙ্গাব্দে মাসিক বসুমতীতে 'নগরবাসী' নামে প্রকাশিত হয়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় পরিবর্তিত 'স্বাধীনতার স্বাদ' নামে।
১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা-নোয়াখালী-বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ত্বরান্বিত করেছিল দেশভাগকে। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। দেশভাগ ও ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবন যন্ত্রণা, সেইসব ব্যাথিত মানুষের হৃদয়স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে। 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের পটভূমি ১৯৪৬ এর দাঙ্গা থেকে স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কলকাতার সমাজ জীবন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

> "স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসে ১৯৪৬এর ১৫ আগস্ট এর অব্যবহিত আগের সময়ের কলকাতার পটভূমিতে প্রায় শব ব্যবচ্ছেদ – দাঙ্গার বাইরের বিবরণ নয়, মনের বিবরণ। বর্হিবাস্তব মানুষের মনকে আর চেতনাকে কিভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে, সংশয়ী, ভীত আবার বিকৃত করেছে, তার ছবি আঁকা হয় – বাস্তববাদের নব্য প্রকরণে।"[২]

দারুন গুমোট করা বর্ষার দুপুর এর চিত্র দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। শ্মশান পুরীর মত চারিদিকে নিস্তব্ধতা , কারফিউ, বিপর্যস্ত জনজীবন এর ছবি— যা দাঙ্গার সময় কলকাতার বাস্তবতার জীবন্ত দলিল –

> "চারিদিকে ভয়, জমজমাট আতঙ্ক। দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কলাহল ভেঁসে আসে। সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও পাওয়া যায় তীক্ষ্ণ কুৎসিত হিংসার ধার। দোকানগুলো বন্ধ, রুদ্ধদ্বার বাড়িগুলির একটি ঘরের জানালাও খোলা নেই, কোনো জানালার খড়খড়ি একটু তুলে ক্ষণিকের জন্য ভয়ার্ত ক্লিষ্ট মুখ উঁকি দেয়।"[৩]

মধ্য ভারতের কোন এক শিল্পকেন্দ্র থেকে মৃত্যু উপত্যকা কলকাতা মহানগরীতে এসেছে প্রমথ, সঙ্গে প্রণব। ভাগ্নি মনিমালার চিঠি পেয়ে তাদের আসা, দাঙ্গার বীভৎস রাস্তা তাদের কাছে খুব অচেনা। দলবেঁধে দলীয় উন্মত্ততায় দিশেহারা 'ঘাগি লোক' এর আক্রমণে দুজনেই আহত হয় এবং খানিক পরেই প্রমথ মারা যায়। প্রমথ এর মৃতদেহ সৎকার হয়না - দেহটা চাদরে ঢাকা পড়ে থাকে একতলায়, দোতালার ঘরে চলতে থাকে জীবনের ভয়াবহতার নানান আলোচনা। জীবনের জটিলতায় মৃত্যুও যেন সস্তা হয়ে গেছে। জাপানি বোমা ফেলা থেকে সস্তা অপমৃত্যু – পথে ঘাটে ছড়ানো শব। প্রতিটি মুহূর্ত অশান্তি আর তাণ্ডবের আতঙ্ক যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা। সকলেই জানে –

> "বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কিনা জানিনা বাড়ির লোক। ফিরেছি বাড়ির লোককে দেখবে কিনা জানে না যে বাড়ি থেকে বাইরে যায়।"[৪]

মনিমালা ও সুশীলের সংসারে আঁচ লাগে দাঙ্গার। আত্মহত্যায় রত শহরের বস্তিতে রাতে আগুন লাগে। মনি ও সুশীলের বাধা অতিক্রম করে প্রণব ও সুধীন বস্তির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। মধ্য ভারতের শহরে মামার কাছে যাবার কথা ভেবে ঘটনাচক্রে মনি ফিরে যায় সাত-আট বছর আগেই ছেড়ে আসা প্রণবদের বাড়িতে। এই দাঙ্গার সময় কাল্লু ও রহমতের মতো মিস্ত্রিরা হিন্দুপাড়ায় রয়ে যায়। এদের প্রচেষ্টায় প্রণবদের বাড়ির ছাদে তৈরি হয় অস্থায়ী নতুন চালা, দাঙ্গায় আশ্রিত আরও জন কুড়ি পুরুষ-নারীর থাকার ব্যবস্থা হয়। গিরীন ও কবি মনসুর ফকিচাঁদ লেনে 'কালের কথা' মাসিক পত্রিকা র সম্পাদকের অফিসে মনসুরের কবিতা পৌঁছতে গেলে আক্রান্ত হয়। এলাকার বিখ্যাত গুন্ডারাজ ও তার সহকারীদের উন্মাদনায় হত্যা ও লুটপাট চলে ভোররাত থেকেই। ফকিরচাঁদ লেনের হৃদয়ের প্রতিহিংসার আগুনে মনসুর ও গিরীন ঝলসে যায়। মনসুরের স্ত্রী রশৌনা এসে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ঘৃণায় গিরীন ও নীলিমাদের ঘটনার জন্য দায়ী করে। সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক গিরীন 'দাঙ্গার ভিত্তি' শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখেন – যা প্রধান সম্পাদক প্রবীন সত্যহরির মনোমত ছিল না। দাঙ্গার সময় রাস্তাঘাট জনবিরল , ট্রাম বাস চলে, কোথাও বা ট্রাম ড্রাইভারের পাশে অস্ত্রধারী নিরাপত্তারক্ষী। এই নিষ্ঠুরতা লেখক তুলে ধরেছেন—

> "দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে ! হায়রে তামাশা।" [৫]

ঔপন্যাসিক নিপুন দক্ষতায় দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা কে তুলে ধরেছেন। একজন মুসলমান বৃদ্ধা নানীকে মেরে দাঙ্গাকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক দাঙ্গার পটভূমি সৃষ্টি করা ও দাঙ্গাকে ত্বরান্বিত করা পূর্বপরিকল্পিত। এতে একশ্রেণীর সুবিধাভোগীর মুনাফা ও স্বার্থসিদ্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়—

> "ভোরে দেখা গেল নানী পথের ধারে মুখ থুবরে মরে পড়ে আছে। বোসেদের দোতলা বাড়ির নীচের তলায় দালানের গঠনের সঙ্গে একত্র গড়া মার্বেল পাথরের মন্দিরটির ঠিক সামনে।..... নানীর ওই ক্ষীণ দেহে এত রক্ত কোথায় ছিল? অথবা এ রক্ত শুধু নানির রক্ত নয়, এ মরণ শুধু নানির মরণ নয়? দালানসাৎ মন্দিরটির লোহার কোলাপসিবল দরজার খাঁজে লটকানো গরুর মাথাটি দেখে তাই মনে হয়।"[৬]

অর্থাৎ এ দাঙ্গা স্বার্থান্বেষণের উপায়মাত্র, যা পূর্বপরিকল্পিত। এর কয়েক মুহূর্ত পর শুরু হয় দাঙ্গা। বহু লোক হতাহত হয়, বস্তিতে আগুন লাগে, লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হয় অনেকে । চোরাবাজারের পেট্রোল যখন পুড়ছে বস্তি ,তখন না আসে সৈন্য ,না আছে মিলিটারি। পরে উপস্থিত হয় মিলিটারি। নানির ছেলে নাজিমকে মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গুন্ডা ইয়াসিন উদ্বুদ্ধ করে। পরে নাজিমের অনুভূতি পরিবর্তিত হয় মানব ধর্মে—

> "জগতে হিন্দু ও নেই, মুসলমানও নেই, আছে শুধু বড়লোক আর গরিব লোক। জগতে আছে শুধু গুন্ডা আর তাদের শিকার লাখ লাখ কুলি-মজুর, বাস খতম্। ঈশ্বর আল্লা তাদের নয় স্রেফ ধনী আর গুন্ডাদের ঈশ্বর আল্লা।" [৭]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে দিল ধারণা ছিল উপরতলার সুবিধাভোগী মানুষের সৃষ্টি দাঙ্গা, শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের এতে হাত নেই। প্রণবের কোথায় তা উঠে আসে –

> "মজুররা এ দাঙ্গায় নামেনি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুন লাগতে পায় না, পালা করে দলবেঁধে তারা পাহারা দেয়। তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সুযোগে এটা কর্তাদের অন্য প্রতিশোধ হলে আলাদা কথা।" [৮]

দাঙ্গার সময় কালোবাজারিরা মুনাফা অর্জনে ফেঁপে ওঠে। যদুগোপাল, যতীন, অনঙ্গভূষণ এরা মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। সুশীল চালের প্রয়োজনে যতীনের কাছে গেলে কালোবাজারি যতীন তাকে সাহায্য করেছে, বিনিময় পরমুহূর্তে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। দু সেরা চাল যতীনের কাছে সামান্য হলেও সুশীলের কাছে তা পরম পাওয়া—

> "রাশি রাশি ধান চাল নিয়ে মশগুল হয়ে থাকায় যতীনের খেয়াল থাকেনা যে দু মন কেনো দু সেরা চালের জন্য এই শহরে কত লোক হন্যে হয়ে বেড়ায়, না পেয়ে উপোশ পর্যন্ত দেয়।" [৯]

অসাধু যতীনের ষড়যন্ত্রে ও লাখপতি হওয়ার লোভে সুশীল বন্ধুর চোরাকারবারে ঢেলেছিলো সব অর্থ। পরিণতিতে বাড়ি বন্ধক দিতে হয় সর্বস্ব হারাতে হয়। ঔপন্যাসিক দাঙ্গা ও মজুদদার অসাধু ব্যাবসায়ির চিত্ত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার ভিত্তিভূমিকে মজবুত করেছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী সভা পরিণত হয় শোভাযাত্রায়। অসাম্প্রদায়িকতার ধ্বনি ওঠে। সভায় মানুষের সমুদ্র দেখে দাঙ্গাকারীরা মুখ লুকায়। প্রণব, মনি, সুধীন, গোকুল, মনস্বামী এরা স্বাধীনতার প্রত্যাশী। প্রণব মনে হয় গান্ধী-জিন্নার আপোষ চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করেছে তারাই। উপরতলার নেতারা দেশ শাসনের নামে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে ইচ্ছুক। এদেশের হিন্দু মুসলমানের মেলবন্ধন দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রে, লীগের মদতে এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। গিরীন এই সত্য উপলব্ধি করেছে—

> "রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াইয়ে দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড়ো খারাপ। শেষ পর্যন্ত কি হবে আমি জানিনা, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদাজল খেয়ে দুটো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।" [১০]

দেশভাগ হয়ে যাবে দেশের দুটো টুকরোর প্রত্যক্ষ শাসনের সুযোগ পাবে কংগ্রেস আর লীগের প্রধানেরা। জল্পনা-কল্পনা আর পরিকল্পনা জোয়ার এসে তা বন্যায় পরিণত হয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্তিমিত হয়ে রূপ নিয়েছে ওলটপালটের। যাদের স্বাভাবিক জীবন দেশ ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে চলেছে তাদের অবস্থা চিত্র ফুটে উঠেছে –

> "মুখ ম্লান হয়ে গেছে স্থান আর স্থানের হিন্দু ও মুসলমানের। যে মারাত্মক আত্মহননের মধ্যে জন্মেছি স্থান ও স্থান, কে জানে ভাগাভাগিতে তার ইতি কি না?" [১১]

উপন্যাসের শেষে অনেকেই বাড়ি ফেরে। অনেকেই বাড়ি না ফিরে বস্তিতে নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। হাসপাতাল থেকে গিরীন জেলে, সরস্বতীর সন্তান প্রসবের সময় আসন্ন। দুর্গাপূজা, ঈদের মতোই স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আয়োজন চলছে। ঊষারা এই আবহে বাড়ি ফিরে যায়। সুশীল জামিন পেয়ে পুরনো বাড়ির দিকে যায়, মনিরাও পুরনো বাড়ি যায়।

১৯৪৬ দাঙ্গা যার ফলশ্রুতিতে বাস্তুচ্যুত মানুষের বেদনা যন্ত্রণা। অশ্রুকুমার সিকদার তাই মন্তব্য করেছেন 'আমাদের যুগকে বলা হয়েছে 'Age of Migration.'[১২] দাঙ্গার সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ হাতের পুতুলের মত একশ্রেণীর মানুষের দ্বারা পরিচালিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে বেদনাময় সমাজবাস্তবতার জীবন্ত চিত্র উপস্থাপন করেছেন – যা দাঙ্গা ও দেশভাগের মধ্যবর্তী বেদনাময় কালপর্বের জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ, ‘ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা’, দ্বিতীয় প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ. ২৬।

২. বন্দোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: বাস্তববাদের বহুমুখ’, বাক্ সাহিত্য, পৃ. ১০৫।

৩. বন্দোপাধ্যায়, মানিক, ‘স্বাধীনতার স্বাদ’, চিরায়ত প্রকাশন, জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৯।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪ ।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১ ।

১২. সিকদার, অশ্রুকুমার, ‘ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য’, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ৩১ ।

গুণময় মান্নার খাদ্য আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস ‘অসামাজিক’, অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র

পাপ্পু সোনা গান্ধী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মিরান্ডা হাউস কলেজ, নিউ দিল্লী

সারসংক্ষেপ : ছেষট্টি সালের খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গবাসীর জনজীবনে যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তারই এক বিশ্বস্ত বয়াননির্ভর উপন্যাস ‘অসামাজিক’ এই প্রবন্ধের আলোচ্য। তবে ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না শুধু এই আন্দোলনের চিত্র অঙ্কন করেই নিরস্ত থাকেননি, তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা অনুযায়ী সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং সমাজের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল তারও অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাও দিয়েছেন এ উপন্যাসে। কাজেই খাদ্য আন্দোলননির্ভর একটি অতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাসটির বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ এবং সামাজিক অবক্ষয়ের মূলানুসন্ধানই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। পাশাপাশি ঔপন্যাসিক গুণময় মান্নার জীবনদৃষ্টি তথা সাহিত্যদর্শনকেও স্বল্প পরিসরে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।
মূলশব্দ : খাদ্য আন্দোলন। সামাজিক অবক্ষয়। টক্সিক প্যারেন্টিং।

মূল প্রবন্ধ :

গুণময় মান্নার উপন্যাসের কথা বলতে গেলেই প্রথমেই সবার মনে আসে ‘লখীন্দর দিগার’, ‘কটাভানারি’, ‘শালবনি’ কিংবা ‘জুনাপুর স্টীল’-এর কথা; কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে গুণময় মান্নার স্বল্পপরিচিতির কারণেই হোক অথবা দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই হোক তাঁর কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ বলছি এই কারণে যে, সে সব উপন্যাসগুলি এক দিকে যেমন ঔপন্যাসিক হিসেবে গুণময় মান্নার জীবনদর্শনকে বুঝতে আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করে তেমনই তা আবার অন্যদিকে মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতি এক বিশেষ আলোকসম্পাত করে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত চারটি পর্বে ও ৪৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ‘অসামাজিক’ তাঁর এমনই একটি উপন্যাস।

স্বাধীনতাউত্তর পশ্চিমবঙ্গবাসীর বিপন্নতা ও বিপর্যস্ততার জীবন্ত চিত্রশালা এ উপন্যাস। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন পশ্চিমবঙ্গ নানান কারণে ক্লান্ত, কাতর, বিপর্যস্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন। স্বাধীনতার কয়েক বছর আগে কিঞ্চিৎ ভীরু ও শান্তিপ্রিয় বাঙালীর সমাজজীবনে প্রথম ঝড়ের আলোড়ন তোলে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ। পূর্ব ভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে এই ঝড়ের অনেকটাই বুক পেতে নিতে হয়। পরিণামে বাঙালীর দীর্ঘ দিনের লালিত ধারণা ও বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তার সাথে সাথে এ রাজ্যে নবোদ্ভূত কালোবাজারের মধ্যে দিয়ে সাধারণ বাঙালী জীবনেও ব্যাপক পরিমাণে দুর্নীতি প্রবেশ করে। আবার ঠিক এই সময়েই মানুষের তৈরী করা পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে যে প্রবল খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়, স্বাধীনতাউত্তর পশ্চিমবঙ্গেও তার জের চলেছিল আরও অনেক দিন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্রমবর্ধমান চাপ, রাজ্য সরকারের দুর্বল খাদ্যনীতি, প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি অপেক্ষা শিল্পের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ ইত্যাদি কারণে স্বাধীনতার পরেও এ রাজ্যে খাদ্যসংকট উত্তরোত্তর চরম রূপ লাভ করতে থাকে এবং কংগ্রেস সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাম দলগুলির নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে এ রাজ্যে এক ব্যাপক খাদ্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আমদানি বিঘ্নিত হওয়ায় সে সময় কেরোসিনেরও প্রবল সংকট দেখা দেয়। এ সব কিছুর পাশাপাশি বরাবরের সমস্যা বেকারত্ব তো ছিলই। এমনকি অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও তখন ফাটল ধরে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের দুর্বল নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে বাম দলগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর সর্বপ্রথম এ রাজ্যে কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব করে প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। এই প্রত্যেকটি বিষয়ই উঠে এসেছে এ উপন্যাসে।

মানুষের জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য খাদ্যের সংকটকে সামনে রেখেই এই উপন্যাসের সূচনা হয়। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই খাদ্যসংকটের উল্লেখ আছে, সন্তোষবাবুর কাছে প্রবীরের চাল চাওয়ার মধ্যে ও সন্তোষবাবুর চালের অপ্রতুলতার উল্লেখে চালের তীব্র সংকটের পরিচয় মেলে। বসিরহাট, স্বরূপগঞ্জ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে সংঘটিত তীব্র গণ-আন্দোলন ছয়ের দশকের উত্তাল পশ্চিমবঙ্গের কথা খুব সহজেই মনে করিয়ে দেয়। সরকারের বসানো কন্ট্রোল ও কর্ডনের দাপটে যখন সাধারণ মানুষ এক ছটাক চাল পাচ্ছে না তখন পুলিশের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে লরির পর লরি চাল বাইরে পাচার হয়ে যেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী খাদ্য সংকটের মোকাবিলা করতে সরকার রাতারাতি কন্ট্রোল বসিয়ে ব্যাপক কড়াকড়ি শুরু করলে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের চক্রান্তে এক জেলার চাল অন্য জেলায়, এমন কি বাংলার বাইরেও চালান হয়ে যেতে থাকে। ফলে খাদ্যদ্রব্যের সুষম বণ্টন তো দূরের কথা, এক কৃত্রিম খাদ্যসংকট তৈরি হয়ে যায়। এই সংকটের ঢেউ সব থেকে বেশি যাদের ওপর আছড়ে পড়ে গ্রাম ও শহরের সেই সব খেটে-খাওয়া মানুষের দল না বুঝেই এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে এবং ধান-চাল চালান দিয়ে আখেরে বড় বড় আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের অর্থোপার্জনের পথকে প্রশস্ত করে।

এমনকি সেই সময় নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় চালটুকু সংগ্রহের জন্যও নিরীহ সাধারণ মানুষকে চোরা পথের আশ্রয় নিতে হত এবং চড়া দামে চাল কিনতে হত। সব মিলিয়ে সমাজের ওপরতলা থেকে নীচ পর্যন্ত সর্বত্রই দুর্নীতিতে ছেয়ে যায়। বস্তুত, শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে কর্ডনের আকস্মিক কড়াকড়িতে সেদিনের বাঙালী একেবারে দিশেহারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখছেন, "এ এক আশ্চর্য ঘটনা, বাংলাদেশের লোক এক প্রত্যুষে জেগে উঠে দেখলে, তার আষ্টে পৃষ্ঠে কর্ডনের দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দেখলে তাদের ব্যবসা নেই, ক্রেতারা চাল কিনতে গিয়ে দেখলে চাল নেই। যাদের উদ্বৃত্ত হাজার হাজার মণ ধান রয়েছে তারা দেখলে ধান লুকিয়ে ফেলতে হবে।"[১]

গুণময় মান্না তাঁর অপরাপর উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয়ের মতো এ বিষয়টিরও যে বর্ণনা দিয়েছেন এ উপন্যাসে তা হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান। ". . . যাত্রীদের দু সারি বসার জায়গার ফাঁকেফোকরে ঢুকে পড়েছে চাল পাচারকারির দল। কেউ চালের বস্তা লুকিয়েছে, কেউ বা তখনও সুবিধে করতে পারেনি। স্টেশন ছাড়ার পর এদের কাজকর্ম অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে, তখন দেখা যায়, উচ্চকিত, বিষণ্ণ, অপরাধসচেতন; অথচ আক্রমণাত্মক এক দল মানুষ প্রত্যেক কামরাতেই দাঁড়িয়ে বসে ঝিমোচ্ছে।"[২]

এহেন পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা চালের সংকট দূর করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ লাঠিচার্জ্ করে, গুলি ছুঁড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তবে তাতেও আন্দোলনকারীদের পুরোপুরি দমানো যায় না, বিক্ষুব্ধ জনতা বিভিন্ন সরকারি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়, পুলিশের গুলিতে দুজন ছাত্রযুবা শহীদ হয়। এই বিক্ষোভের পর কাজল সরকারের মতো ধান্দাবাজ নেতারা অত্যাচারঅনাচারের প্রতিবাদ, সংঘবদ্ধতার আহ্বান, নাগরিক কমিটি গঠন, শহীদ ছাত্রদের শব নিয়ে শোভাযাত্রা, সর্বস্তরের লোকদের নিয়ে খাদ্যকমিটি গঠনের দাবি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিতে থাকে। এই সব নেতাদের রাজনীতি চর্চা অধ্যাপক মণিময় সেনগুপ্তের কাছে 'মেন্টাল জিমন্যাস্টিক ও স্বার্থচারণা' ছাড়া কিছুই না। কাজল সরকারই জনগণকে সব থেকে বেশি খেপিয়ে দিয়ে নির্বাচনে তার জয়ের পথ প্রশস্ত করে নেয়।

নির্বাচনের স্বার্থে জনগণকে নিয়ে ছিনিবিনি খেলার এ গল্প তো পুরাতন হয়েও চির নতুন।

বাস্তবিকই খাদ্য আন্দোলনকে ঘিরে সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গে যে উত্তাল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা ছিল অভূতপূর্ব। সমসাময়িক আনন্দবাজার, প্রতিদিন ইত্যাদি পত্রিকার পাতায় এবং অজয় চক্রবর্তী, অনিল ঘোষ, শ্যামসুন্দর বসু, বিমলেশ ভট্টাচার্য, কার্তিক ঘোষ প্রমুখ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিকথা থেকেও বসিরহাট, স্বরূপগঞ্জ ও কৃষ্ণনগরের স্বতঃস্ফূর্ত খাদ্য আন্দোলনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

তবে জীবননিষ্ঠ ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না কখনই নিছক সমাজের উপরিতলে বিহার করেই পরিতৃপ্ত হন না, তিনি স্পর্শ করতে চান মানুষের জীবনকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর মনন চারিয়ে যায়, ব্যক্তিমনের গভীরে প্রবেশ করে তিনি মানুষের একান্ত অহং তথা সত্তাকে আবিষ্কার করতে চান। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ায় মানুষের জীবনের বিপন্নতাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না। তাই তাঁর এই উপন্যাসে পূর্বোক্ত সামাজিক সংকটের থেকেও বড় হয়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তিজীবনের সংকট, একটি সম্ভাবনাময় তরতাজা তরুণ প্রজন্মের ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সংকট। ব্যাধিগ্রস্ত সময়ের প্রকোপে পড়ে মানুষের দেহ ও মন কি রকম বিকৃত ও দূষিত, অস্থির ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তা সুদীপ, প্রবীর, অনন্ত, রাণি, মেনি, সানি, কৃষ্ণেন্দু, পল্লব, হিতেন, পার্থ, নমিতা ইত্যাদি চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই প্রত্যেকটি তরুণ চরিত্রের মধ্যেই একটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, একটা অসংযত বেপরোয়া উদ্ধত ভাব, একটা বিদ্রোহী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সে বিদ্রোহ যে সব সময় সমাজদ্রোহ তা নয়, কখনও কখনও তা আত্মদ্রোহও।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুদীপের মধ্যে আমরা প্রথম থেকেই পারিপার্শ্বিকের প্রতি একটা বিরক্তি ও নিরুৎসাহের ভাব দেখতে পাই। বাইরের কারও সাথে প্রাণ খুলে মেলা মেশা করা তো দূরের কথা সে তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গেই একাত্মতা অনুভব করতে পারে না। একই বাড়িতে একই সাথে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও সে তার প্রায় সমবয়সী পিসতুতো ছোট বোন নমিতার সাথেও তেমন কোনো আন্তরিক যোগ অনুভব করে না, বরং তাদের মধ্যে একটা চাপা রেষারেষি চলে। আবার রাস্তায় সুদীপের বন্ধুস্থানীয় প্রবীর সুদীপের সাথে ভাব জমাতে চাইলেও সুদীপ তাতে স্বস্তি বোধ করে না, সে যতই ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে সুদীপ ততই নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

আসলে সুদীপ একজন সংবেদনশীল, আত্মমগ্ন যুবক। তাদের মতো শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব, মেয়েদের নিয়ে স্থূল রসিকতা ও নানান কুরুচিপূর্ণ আলোচনায় মত্ত যুবসমাজ, স্বার্থমগ্ন মানুষের ধান্দাবাজী, চালের চোরাই কারবারিদের প্রতি পুলিশের নিস্পৃহতা ও ঔদাসীন্য সুদীপের অন্তরজগতে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা করেও মন মতো একটা চাকরি জোগাড় করতে না পারা, প্রতিবেশী রাণি-মেনিকে তার সঙ্গে জড়িয়ে প্রবীর ও অনন্তের নানান অশ্লীল মন্তব্য, বাড়ির সামনেই অবস্থিত হাসপাতালে নিয়মিত মৃত মানুষের আসা-যাওয়া, প্রতিবেশী ঠিকাদার ও এম এল এ-এর বাড়িতে ধান্দাবাজ লোকজনের অবাধ যাতায়াত, পুলিশের চোখের সামনে দিয়েই দালালদের চাল পাচার হয়ে যাওয়া, কাজল সরকারের মতো সুযোগসন্ধানী উঠতি রাজনৈতিক নেতার কপট ভালমানুষি ইত্যাদি ঘটনা দেখতে দেখতে অসহ্য যন্ত্রণা ও গ্লানিতে সুদীপ নিজের ভেতরে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে নিজের চারদিকে

একটা আপাত ঔদাসীন্যের আবরণ গড়ে তোলে এবং এভাবে সে ক্রমশ একজন 'অসামাজিক' জীবে পরিণত হয়ে যায়।

বস্তুত, এই উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এক অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র। রাস্তার দিকে চোখ রাখলেই বা ছেলে-ছোকরাদের আড্ডায় কান পাতলেই এই অবক্ষয়িত সমাজের একটি ছবি খুব সহজেই পাওয়া যাবে। সুদীপ ও প্রবীরের প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি দিয়েই শুরু করা যাক। বাজারের থলে হাতে প্রবীর ও সুদীপ দুজনেই বাড়ি থেকে বের হয়। এই অবস্থায় পথের মাঝে প্রবীর সুদীপকে ধরলে সুদীপ কোনোভাবে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলে প্রবীরের চোখে দপ করে সংশয়ের আগুন জ্বলে ওঠে এবং তাকে হাস্যপরিহাসের ছলে ব্যঙ্গ করে। এই ব্যঙ্গের ঝাঁঝটুকু সুদীপ প্রায় নীরবেই সহ্য করে নেয়। এরপরই দেখা যায় একটি স্কুল-পড়ুয়া ছাত্রের দল পড়াশোনা না করে সকাল সকালই মার্বেল খেলতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশের কিছু দূরেই চাল পাচারের চক্রান্ত চলতে দেখেও পুলিশকে উদাসীন, নির্বিকার থাকতে দেখে সুদীপ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে পুলিশটিকে আঘাত করে জাগিয়ে দিতে চায় তখনই তার পায়ে একটি মার্বেল এসে লাগে। তার পায়ে এই মার্বেল এসে লাগা যেন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজেরই প্রতিবাদ।

প্রবীর ও অনন্তের গতিবিধি অসামাজিকদের মতো। তারা সব সময়ই যেন একটা গোপন অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরছে ফিরছে। রাস্তায় অধ্যাপক সেনগুপ্তকে দেখতে পেয়ে তারা নিজেদেরকে তার চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে ফেলে। তাদের পেছনে রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন থাকায় এবং পুলিশের লোকজন সব তাদের করায়ত্ত থাকায় কারো প্রতিই তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পরনিন্দা পরচর্চায় তারা সিদ্ধহস্ত। কাজল সরকার, মণিময় সেনগুপ্ত, সুদীপ, নমিতা প্রমুখের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের শেষ নেই। রাতের অন্ধকারে নমিতা ও ভারতীর গোপন কথা লুকিয়ে আড়ি পেতে শুনতেও তারা কোনো লজ্জা বোধ করে না, উপরন্তু তারা নমিতা ও ভারতীর সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দেয় এবং অনন্ত নমিতার হাত মুচড়ে দিয়ে তার হাতের বালা কেড়ে নিয়ে তাকে হেনস্থা করতে চায়। সামাজিক অবক্ষয়ের ছাপ কীভাবে ভাষাকেও প্রভাবিত করে প্রবীর ও অনন্তের সংলাপই তার প্রমাণ। সুদীপের বোন নমিতা রায়কে নিয়ে অধ্যাপক ও অ্যাডভোকেট সন্ধ্যেবেলা নদীর ধারে ব্রিজে ঘুরতে আসেন। এই প্রসঙ্গে অনন্তকে প্রবীর বলে "তার মানে, দুজনে মিলে খান নাকি ....."[৩]

"লালমণি প্রফেসার, আর রাস্তায় ঘাটে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে মুখ দেখায় কি করে? এই করেই যে ছাত্র ছাত্রীরাও প্রেম করে বেড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র আর প্রফেসারে কম্পিটিশেন ...."[৪]

চন্দনা টি অ্যান্ড্ রিফ্রেশমেন্ট নামক চায়ের দোকানটির এই উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রবীর-অনন্ত ও হিতেন-পার্থদের মতো যুবকদের পাশাপাশি সরকার-সেনগুপ্তদেরও আড্ডাস্থল এই দোকান। চন্দনায় দুজন পনের ষোল বছরের

রিফিউজি মেয়ে বয়ের কাজ করে বলে ছেলেছোকরাদের কাছে তার নাম রিফিউজি রেস্তোরা, এই কারণেই নরেন-পার্থের চন্দনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। আবার এর আরেক অর্থ কাস্টমাররাই রিফিউজি। ". . . আমরা যারা মাসিমাকে প্রণাম করে বৈঠকখানায় বসে চা খেতে পাইনে, পার্কের লোটানো আঁচলের ওপর বসে বাদাম খাই না, তাদের এই রকম পয়সা ফেলেই কালো হাতের চা খেতে হয় (মেয়েদুটি কালো এবং শ্রীহীন) . . . আমরা রিফিউজি না তো কি?"[৫] কৈশোরোত্তীর্ণ ছেলেদের মনে প্রেম সম্পর্কিত হতাশাটি (frustration) বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নরেন, পার্থদের মতো সংস্কারপন্থী যুবকদের আড্ডায় অনেক নির্মম সব সামাজিক সত্য উঠে আসে। তারা ভাল করেই জানে "নির্বাচনে জেতা স্রেফ চাকরি পাওয়া। তাদের স্পষ্ট উক্তি, "ওরা আমাদেরই মতো বেকার,"[৬]

আড্ডার মাঝে মাঝে ". . . এই সব কিশোর এবং তরুণ চিত্তে সমস্ত উচ্ছৃলতা এবং হুল্লোড়ের আড়ালে যে শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ী ও রোখালো মন, তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়।"[৭]

আমরা সাধারণভাবে যে সব মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত দেখে গর্ববোধ করি, যাদের আদর্শে আমাদের জীবনকে গঠন করতে চাই, এই ধ্বস্ত সময়ে সে সব আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্বগুলিও যুবসমাজের কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। বেড়াল যেমন করে ইঁদুর ধরে খেলা করতে করতে সেটাকে দাঁত আর নখ দিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে, তেমনই তারাও ঊনিশ শতকের সব মহামানব ও মহান নেতাদের আদর্শে হাসির দাঁত বসাতে থাকে। তাদের স্পষ্ট ব্যাঙ্গোক্তি "স্যাক্রিফাইজ ও সেবা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল।"[৮]

বামফ্রন্ট নেতা দেবনাথ রায় কৃষ্ণনগর কলেজের ফার্স্ট্ ইয়ারের ছাত্র নরেন আর এভি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র পার্থের ব্রেন ওয়াশ করতে চায়। নরেন, পার্থ ভালই বোঝে যে এ সব শ্রেণীসংগ্রামের বড় বড় আদর্শের কথা বলা আসলে ভোটের সময় তাদেরকে ভলেন্টিয়ার করার তাল।

উদ্বাস্তুসমস্যা, খাদ্যসংকট, বেকারত্ব, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যথাযথ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছার অভাব, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমবিলোপ – একের পর এক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে যুবসমাজ যখন বিদ্রোহী, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে তখন কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতার এহেন মেকি বিপ্লব প্রচেষ্টা যুবসমাজের মনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিরূপতার সঞ্চার করে, যা ঐ প্রজন্মের অস্থিরচিত্ততা ও উৎকেন্দ্রিকতার অন্যতম একটি প্রধান কারণ। বস্তুত, এই বিরূপতাই পরে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ে।

এ উপন্যাসে 'মৃত্যু' একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে বার বার ফিরে আসে। কৃষ্ণনগর স্কুলের ভূতপূর্ব নামজাদা শিক্ষক অবনী ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যব্রত গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। সত্যব্রত হিস্ট্রি অনার্স পার্ট

ওয়ানের একজন মেধাবী ছাত্র ছিল। অধ্যাপকমহলে তার সম্বন্ধে আশা ছিল অনেকখানি। ব্যর্থ প্রণয়, আর্থিক সংকট, পারিবারিক কলহ বা বন্ধুদের সঙ্গে তীব্র মনান্তর এ সব কোনো কিছুই ছিল না তার জীবনে। সে সবারই প্রিয় ছিল। তবু কেন এই আত্মঘাত? তবু কেন সে তার মৃত্যুর আগে তার বাবা-মা, ভাই-বোন ও বন্ধুদেরকে লেখা তিনটি চিঠিতে ভাষান্তরে একই কথাই লিখে গেল "আমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই আমি চলে গেলাম। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।"?[৯] তবে কি জীবনানন্দের কাব্যের নায়কের[১০] মতো কোনো এক অজানা বোধের দ্বারা আক্রান্ত হল সে? অভিশপ্ত সময়ই কি একটি সম্ভাবনাময় প্রাণকে অকালে গ্রাস করল? স্বাভাবিকভাবেই এই আত্মহত্যা শহরে একটা আলোড়ন তুলে দেয়। বলা বাহুল্য যে, গ্লানিময় সময়ের হাত থেকে বাঁচতে, এই পচা গলা সমাজের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সত্যব্রতের আত্মহত্যা একটি প্রতীকী তাৎপর্যের দ্যোতনা বহন করে আনে; এ যেন সমাজের বুক থেকে সত্যনিষ্ঠার, সততার অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া।

এ উপন্যাসের প্রটাগনিস্ট চরিত্র সুদীপের মনে বার বার ফিরে আসে মৃত্যুর অনুষঙ্গ। তার বাড়ির সামনে যে পুরোনো হাসপাতালটি আছে সে দিকে তাকালেই সে যেন মর্গের পচা লাশের গন্ধ পায়। আবার ট্রেনে করে বসিরহাটে যাওয়ার সময় দমদম স্টেশনে সুদীপ এক মহিলাকে খাবারের অভাবে ট্রেনে কাটা পড়ে আত্মহত্যা করতে দেখে। এই ঘটনা তার অবচেতন মনে এমন গভীর ছাপ ফেলে যে বসিরহাটগামী ট্রেনে যেতে যেতে পাশে বসা ভারতী যখন তার বন্ধু প্রণবের সাথে লেভি ও কর্ডনের ফলে তাদের মতো বড় ব্যবসায়ীদের লাভবান হওয়ার খোসগল্পে মত্ত তখন সুদীপের মনে বার বার ভেসে ওঠে মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির ছবি। ধাবমান নৃশংস, নির্মম, কঠিন মাঠকে তার যেন রুক্ষ কঠোর বাস্তবেরই প্রতিরূপ বলে মনে হয়।

সুদীপের মৃত্যু ক্রমশ এগিয়ে আসছিল বলেই কি মৃত্যুচেতনা তাকে এমনভাবে তাড়িত করে চলেছিল?

আবার স্বরূপগঞ্জের বিক্ষোভে পল্লবের মৃত্যু হয় এবং কৃষ্ণনগরের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে হিতেন ও পার্থ এই দুই জন ছাত্র শহীদ হয়। আসলে সময়ের দাবি মেটাতে গিয়েই যে কত কত নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে যায় মানবজীবনের সেই মর্মান্তিক দিকটির প্রতিই ঔপন্যাসিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মর্মান্তিক অপচয় আরও ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে যখন শহীদদের শবদেহ মর্গ থেকে আদায়ের জন্য পথে শোভাযাত্রা বের হয় এবং সেই শোভাযাত্রাকে কাজল সরকারের মতো নেতৃবৃন্দ নিজেদের মসনদ দখলের হাতিয়ার করে।

কালের ক্ষত যে কত গভীর হতে পারে তা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ সময়ের জালে জড়িয়ে পড়ে অসহায়ভাবে ছটফট করতে করতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। সুদীপের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানুষের জীবনের সেই ভয়াবহ পরিণতিকেই তুলে ধরেছেন। শহীদদের মৃত দেহ আদায়ের দাবিতে কৃষ্ণনগরে

যে বিরাট মিছিল হয় সুদীপ তার প্রেমিকা সানিকে খুঁজতে সেই মিছিলের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে পুলিশের আক্রমণে আহত হয় এবং অনন্ত তাকে তাদেরই লোক ভেবে বোমা তৈরি করার জন্য তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। অপটু হাতে বোমা তৈরি করতে করতে বোমা ফেটে সুদীপ গুরুতর জখম হলে পুলিশ তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় এবং কয়েক দিন সংগ্রামের পর সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

এই অবক্ষয়িত সমাজের প্রেক্ষাপটে মানুষের অবিন্যস্ত, বিক্ষিপ্ত, লঘু-তরল মনোজগতকেও সুনিপুণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য সুদীপের পিসতুতো বোন নমিতার কথা। সুদীপই যে শুধু নমিতার প্রতি বিরক্ত তা নয়, নমিতাও সুদীপের প্রতি ঈর্ষান্বিত; অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক রেষারেষির ভাব বিদ্যমান। সুদীপ হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে কলেজে ভর্তি হলেও মামার বাড়িতে আশ্রিত নমিতা টাকা পয়সার অভাবে ক্লাস টেনের পরেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, এটিই সুদীপের প্রতি নমিতার ঈর্ষার প্রধান কারণ। তদুপরি, কে আগে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে সে নিয়েও তাদের দুজনের মধ্যে একটা চাপা লড়াই চলতে থাকে। অবশ্য নমিতার গল্পটা একটু অন্য রকম। দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আসার সময় তার মাকে দুর্বৃত্তরা রাস্তার মধ্য থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর তার বাবা তাকে মামার বাড়িতে রেখে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অবশ্য তার মা-বাবা সম্বন্ধে এই সব কথা নমিতার কাছ থেকে তার মামা হরেন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই দীর্ঘ দিন গোপন রেখেছিলেন। একাধিক বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও এ বিষয়ে হরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর থেকেছেন। নমিতার বিয়ের পর সে এই সব কথা জানতে পারে। ফলে আর পাঁচটা শিশুর মতো তার বেড়ে ওঠাটা স্বাভাবিক ছিল না। মাতৃপিতৃহীনতার অনুভূতি, মামার আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হওয়ার বেদনা তাকে ক্রমশ ভেতরে ভেতরে অস্থির, একগুঁয়ে ও জেদি করে তুলেছিল। এর সঙ্গে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একটা আত্মসম্মানবোধ। এই ভাবে চলতে চলতে সে যখন যৌবনে পদার্পণ করল সে তখন অধ্যাপক মণিময় সেনগুপ্ত এবং অ্যাডভকেট তথা কৃষ্ণনগর পৌরসভার কমিশনার শক্তিনগরের কাজল সরকারের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। তারা দুজনেই নমিতার পাণিপ্রার্থী। তাদের দুজনের কাউকেই নমিতার ঠিক তেমন ভাল না লাগলেও দুজনের একজনকে সে ছেড়ে দিতেও পারে না। নমিতা বলে, "ওদের একটি কাদা, একটি ইট, কারও ঘাড়ে চড়া যায় না, কাউকে রাখা যায় না মাথায় তুলেও ...."[১১]তাই সে তাদের সাথে প্রেমের খেলা খেলে। তবে ". . . প্রেম জিনিসটা নিয়ে খেলা করতে ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা করা যায় না। বেছে নিতে হয় ...."[১২]– ভারতীর বলা এই কথাটিই নমিতার জীবনে শেষে সত্যি হয়ে যায়। আসলে নমিতা চায় নারী হিসেবে পুরুষরা তাকে একটু সম্মান করুক, কিন্তু সেনগুপ্ত ও সরকার কারও কাছেই ঠিক মতো মর্যাদা সে পায় না; তাঁরা উভয়েই নমিতাকে নিজের মতো করে পেতে চান। সরকারের অনমনীয় উদ্ধত মনোভাব যেমন নমিতার বিরক্তি উৎপাদন

করে, তেমনই সেনগুপ্তের অতিরিক্ত আদর্শনিষ্ঠার কচকচি ও বাগাড়ম্বরতাও তার কাছে যারপরনায় অসহ্য মনে হয়। প্রবীর ও অনন্ত সরকার ও সেনগুপ্তের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নানান কুরুচিকর মন্তব্য করলেও সরকার ও সেনগুপ্ত কেউই তার প্রতিবাদ করে না, উলটে তারা তার এই কথাটি এড়িয়ে যায়। সরকার যদিও বা তাকে তার কথাটুকু বলার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন, সেনগুপ্ত তো তাকে তাও দেননি, তিনি নিজের ভাবাবেগের কথা বলতেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের এই আচরণ নমিতাকে নিরতিশয় ব্যথিত করে এবং সেনগুপ্তের প্রতি তার মনের একটু বেশি ঝোঁক থাকলেও তাকে সেনগুপ্তের থেকে এ ঘটনা চিরতরে দূরে সরিয়ে দেয়। সেনগুপ্তের বিবাহ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কাজল সরকারের যোগসাজুসে নমিতা কোলকাতায় পালিয়ে যায় এবং তাকেই বিয়ে করে নেয়। এমনকি বিয়ের আগে সম্ভোগ করতে দেওয়ার যে পূর্বশর্ত কাজল সরকার নমিতার ওপর চাপিয়ে দেন সেই অবমাননাকর শর্তকে মেনে নিয়েই নমিতা কাজল সরকারকে বিয়ে করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রথম বার নমিতা যখন সেনগুপ্তকে নিজে থেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তখন তিনি নমিতার বয়সের অপরিপক্কতার কথা বলে সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরও নমিতা তার কাছ থেকে যে একটু পাশে দাঁড়ানোর ভরসাটুকু চেয়েছিল তাও তিনি নমিতাকে যোগাতে ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিতে নমিতার আত্মদ্রোহকে নিতান্ত অসংগত ও অস্বাভাবিক বলা যায় কি?

এর পরই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় সানির কথা। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান সানি। রাণি, মেনি ও সানি এই তিন বোনের মধ্যে সানিই সব থেকে ছোট। সুদীপকে যদি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রের স্থান দেওয়া হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় নারীচরিত্রটি হল সানি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট ভাবপরিকল্পনা এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। গুণময় মান্নার উপন্যাসগুলি একটু অভিনিবেশের সাথে পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি আসলে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনের পরিপূর্ণতার কথাই বলতে চান। তিনি যেমন এক সুসংহত, সুসমন্বিত জীবনের স্বপ্ন দেখেন, তেমনই তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি মানুষের সুস্থ সবল দেহ-মনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সানির মধ্যে একদিকে যেমন আছে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, তেমনই আছে দৈহিক স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতা। সানির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "মেয়েটি শ্যামলা, ওর দিদিদের মতো রং নয়, কিন্তু বেশ সতেজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পা দুটো সত্যিই পরিপুষ্ট, আর প্রকৃতি যেন, বয়সের তুলনায় অসংগতরূপেই ওর বুকের ওপর সম্পদ ঢেলে দিয়েছে।"[১৩]

তবে এই কীটদষ্ট সময় অফুরান প্রাণশক্তি ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারীণী সানির আত্মবিকাশকে ব্যাহত করে। কনিষ্ঠ সন্তান হওয়ায় কথায় কথায় মা-বাবার গঞ্জনা ও প্রহার, উঠতে বসতে অহরহ দুই দিদির মুখ ঝামটা, রাস্তা ঘাটে তার শরীরের প্রতি ছেলেদের অশ্লীল ইঙ্গিত তার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে। অগত্যা সে আশ্রয় খুঁজে

নেয় সুদীপের প্রেমের মধ্যে। বস্তুত, সুদীপ ও সানি উভয়েই পরস্পরের প্রেমের মধ্যে বেঁচে থাকার রসদ পায়, তারা তাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অপরাপর বহু কবি-সাহিত্যিকের মতো গুণময় মান্নাও বিশ্বাস করেন যে, প্রেমই মানুষের জীবনের যাবতীয় অপূর্ণতা দূর করে মানুষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাতে পারে, শত গ্লানি ও বঞ্চনার মধ্যেও প্রেমই মানুষকে অমল আনন্দ দান করে। তবে কখনও কখনও বিষময় কালপ্রবাহের কবলে পড়ে এই অমৃতও গরলে পর্যবসিত হয়ে যায়। তাই দেখি পারস্পরিক জ্বালা ভুলতে সুদীপ ও সানি একান্ত স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রথম আলাপেই নিজেদেরকে পরস্পরের কাছে সঁপে দেয় এবং বারংবার অবাধ যৌন সংগমের ফলে সানি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে; অর্থাৎ সুদীপ ও সানির এই প্রেমই তাদেরকে আর পাঁচ জনের চোখে অসামাজিক করে তোলে। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, লোকের কোনো কথাতেই সানির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, নিন্দা-কলঙ্ক কোনো কিছুকেই সে তোয়াক্কা করে না, সুদীপের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে গেলেও সে বিষয়েও সে তেমন ভাবিত নয় – একান্ত নির্ভরতায় ও বিশ্বাসে সুদীপের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সানি পরম শান্তি ও চরম তৃপ্তি অনুভব করে। তাই সুদীপের মৃত্যুর পরও জীবনের অন্তহীন পথে চলতে থাকা পূর্ণদেহা গর্ভিণী তরুণী সানির দ্রুত চলার তালে মনোরম ভঙ্গিমা ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই মনোরম চলার ছন্দের তালে তাল রেখে এই উপন্যাসের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের আশাবাদই সূচিত হয়। মনে হয় এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি, জীবনের স্বাদ এখনও পুরোপুরি তিক্ত হয়ে যায়নি, কিছু গান কিছু সুর এখনও আছে বাকি; বর্ণময় পথের বাঁক ঘুরে ঘুরে ছন্দবদ্ধ পদক্ষেপে এখনও আমাদের হাঁটতে হবে আরও অনেক অনেক পথ। এই অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়, মানুষের এই সুগভীর মর্যাদাবোধ, এই বলিষ্ঠ জীবনবোধই ঔপন্যাসিক গুণময় মান্নার অন্বিষ্ট।

জীবন ও সমাজের বিপন্নতার ছবি অনেক উপন্যাস ও গল্পেই বার বার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক এই বিপন্নতার কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন এবং বাহ্যিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার অন্তর্নিহিত কারণটিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এখানেই এই উপন্যাসটির অভিনবত্ব। অধ্যাপক মণিময় সেনগুপ্তের জবানিতে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে তা এ প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান। ইনি একজন অদ্ভুত মানুষ – তিনি অন্যের সমালোচনা করা অপেক্ষা আত্মসমালোচনা করার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেদের ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হলেই যাবতীয় সংকট থেকে মুক্তি মিলবে। কাজল সরকারের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সেনগুপ্ত বলেছেন যে, এখনকার সন্তানরা অভিভাবকদের কাছে অযাচিত ও অবজ্ঞাত বলেই এবং তাদের সামনে আদর্শস্থানীয় কোনো অভিভাবক নেই বলেই তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ বিপথগ্রস্ত, অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের পরিবর্তে তাদের মনে দানা বেঁধে উঠছে অশ্রদ্ধা,

ঘৃণা ও সংশয়। উদ্ধত কাজল সরকার সেনগুপ্তের এই মতের বিরোধিতা করে ছেলে-মেয়েদের ওপরই দোষারোপ করলেও সেনগুপ্ত দৃঢ়ভাবেই বলেন তাদের বখে যাওয়ার কারণ "they have lost the Father image"। তিনি আরও বলেন যে, ". . . তারা কি পাচ্ছে? না খাদ্য, না শিক্ষা, না মনের আদর্শ, না স্বচ্ছন্দ্যভাবে বেড়ে ওঠার প্রাকৃতিক আর সামাজিক পরিবেশ! ...."[১৪] সেনগুপ্তের এই অভিমত অবশ্যই বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। সানি, পল্লব ও কৃষ্ণেন্দুর অভিভাবকদের তাদের প্রতি অবজ্ঞা সেনগুপ্তের কথার যাথার্থই প্রমাণ করে। অবশ্য সেনগুপ্তও শেষ পর্যন্ত নমিতাকে না পেয়ে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে এ রাজ্য ছেড়ে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেন এবং একজন অসামাজিক মানুষে পরিণত হয়ে যেতে বাধ্য হন। যাই হোক, যে সব সমাজবিজ্ঞানীরা সাহিত্যকে তাঁদের গবেষণার অন্যতম প্রধান উপকরণ বলে মনে করতে চান এ উপন্যাস নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলেই আমাদের মনে হয়।

সব মিলিয়ে এ উপন্যাস হয়ে ওঠে সমাজবদ্ধ মানুষের ক্রমশ অসামাজিক হয়ে ওঠার, আধুনিক ব্যক্তিমানুষের ক্রমশ আরও আরও একা হয়ে পড়ার আখ্যান। তবে 'অসামাজিক' ও 'সমাজবিরোধী' যে এক কথা নয়, এ উপন্যাস তা যেন আমাদের নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালীসমাজে যে অবক্ষয়ের সূচনা হয় এ উপন্যাস তারই এক নির্মোহ ভাষ্য।

তথ্যসূত্র :

১। গুণময় মান্না, *অসামাজিক*, ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, দ্বিতীয় পর্ব, ১৩, পৃ – ৮৮
২। ঐ, পৃ-৮৫
৩। ঐ, প্রথম পর্ব, ২, পৃ-১৫
৪। ঐ
৫। ঐ, প্রথম পর্ব, ৫, পৃ—৩৬
৬। ঐ, পৃ – ৩৭
৭। ঐ, পৃ – ৩৮
৮। ঐ, পৃ – ৩৮
৯। ঐ, প্রথম পর্ব, পৃ – ২৫
১০। স্মরণীয় জীবনানন্দের 'আট বছর আগের এক দিন' কবিতার কথা।
১১। গুণময় মান্না, *অসামাজিক*, ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২,, প্রথম পর্ব, ৮, পৃ-৫৪-৫৫
১২। ঐ, পৃ -- ৫৪
১৩। ঐ, প্রথম পর্ব, ৪, পৃ – ৩১

১৪। ঐ, প্রথম পর্ব, ৩, পৃ – ২১-২২

গ্রন্থপঞ্জি :

১। গুণময় মান্না। *অসামাজিক*। কোলকাতা। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ। ১৯৭২।

২। অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। *বাঙালী রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭)*। কোলকাতা। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড্ কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ বই মেলা ১৯৯৯।

৩। বিপানচন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী। অনুবাদ আশিস লাহিড়ী। *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে (১৯৪৭-২০০০)*। কোলকাতা। প্রথম আনন্দ সংস্করণ আগস্ট ২০০৬।

৪। জীবনানন্দ দাশ। আট বছর আগের এক দিন। প্রাক স্নাতক পাঠপর্ষদ বাংলা কর্তৃক সংকলিত। *এ কালের কবিতা সঞ্চয়ন।* কোলকাতা। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯।

৫। অমলেন্দু সেনগুপ্ত। জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর। পাল পাব্লিশার্স। কোলকাতা। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৭।

৬। সম্পা অনিল আচার্য। সত্তর দশক। তৃতীয় খণ্ড। অনুষ্ঠুপ। কোলকাতা। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি,২০১২।

৭। সম্পা অসীমকুমার রায়। এখন ইছামতি বিদ্যাধরী। দ্বাদশ বর্ষ।প্রথম সংখ্যা। জানুয়ারি ২০১৭।

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথ-পুরাণের অনুষঙ্গ

অসীম সরকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ,
শান্তিপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : মিথ রূপক হলেও মিথের উপমা আমাদের অভ্যন্তরীণ অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতীক। মিথ কোনো প্রত্যয়-পদ্ধতি থেকে নয়, জীবন-পদ্ধতি কিংবা জীবন অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসতে পারে। মিথ নিজে কিন্তু ফ্যাক্ট নয়, ফ্যাক্টকে সব সময় অতিক্রম করতে উন্মুখ থাকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিথ ও পুরাণ এক অর্থে আলোচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে মিথ চর্চায় বিতর্ক আছে। তবে পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মধ্যযুগের কাব্যগুলি মিথের লক্ষণাক্রান্ত যুক্তি ও তর্কের বিচারে প্রমাণসিদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের কবি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথ-পুরাণের অতীন্দ্রিয় রহস্যে প্রবেশ করলে বোঝা যাবে কিভাবে মধুলোভী সমাজ ও সমাজমনস্ক মানুষকে সুচৈতন্যে জাগ্রত করে আমাদের ভিতর স্বপ্নগাছের বীজ বুনে দিতে চেয়েছেন? মূল প্রবন্ধ তারই প্রতিরূপ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পৌরাণিক ও মিথ চরিত্র কিংবা কাহিনি অনেকাংশে এক হওয়ার কারণে মিথের আলোচনায় সুবিধা থাকলেও বাংলা সাহিত্যে সেই চর্চা এক অর্থে বিতর্কের ইতিহাস। ‘মিথ’-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল ‘পুরাকাহিনি’ বা ‘পুরাবৃত্তান্ত’। তাছাড়া বাংলা ও ইংরেজি অভিধানেই নয়, বাংলা একাডেমি বানান বিধিতে ‘মিথ’ ও ‘পুরাণ’ শব্দ দুটির অর্থ এক হলেও পুরাণকে সম্পূর্ণভাবে মিথ বলতে অস্বীকার করেন এমন মহাজন নিছক কম নয়। প্রাবন্ধিক কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে ‘পুরাণ’ ও ‘মিথ’–এর অর্থ এক না হলেও কোথাও শব্দ দুটির মিল থাকলেও ‘‘আমাদের মনে হয় ‘পুরাণ’ শব্দটি দিয়ে মিথের গতিপ্রকৃতি যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায় না, যদি ‘পুরাভব’, ‘পুরাতন’ পুরাণের এই যে অর্থগুলো— তার সঙ্গে মিথের একটি চরিত্র-লক্ষণ অবশ্য মিলে যায়’’[১]। অর্থাৎ অর্ধসত্য হলেও পৌরাণিক চরিত্র সময়ের গতিতে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে মিথ হয়ে উঠেছে। বিপরীতে মিথ চরিত্রগুলি লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে এক সময় পুরাণগ্রন্থগুলিতে লিখিত হয়েছে তার সপক্ষেও যুক্তির অভাব নেই। ঘটনাক্রমে যুগের প্রয়োজনে পৌরাণিক চরিত্রগুলি রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ধর্মগ্রন্থগুলিতে জায়গা করে নেওয়ার জন্য গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘পুরাণপ্রবেশ’ গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় পুরাণের সঙ্গে মহাকাব্যের সাদৃশ্যের কথা বলেন। তবে যুক্তি, যুক্তিখণ্ডনে না গিয়ে বলা যেতে পারে সমস্ত পৌরাণিক চরিত্র যেমন মিথ নয়, তেমনি অনেক পৌরাণিক চরিত্র মিথ হয়ে লোকমুখে প্রচলিত। আবার পুরাণের সঙ্গে

মহাকাব্যের যোগসূত্র থাকবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থে পৌরাণিক ও মিথ চরিত্র আছে স্বীকার করতে সংকোচ থাকবার কথা নয়। অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে মিথ-পুরাণের কাহিনি ও চরিত্রের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়। অন্যদিকে, মিথের বহুবিধ লক্ষণের মধ্যে ভয়-ভাবনা, লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি ও দৈবভাবনা হয়, তাহলে মঙ্গলকাব্যগুলি মিথের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমত, হাতে গোনা কয়েকটা বাদ দিয়ে সব মঙ্গলকাব্যে দেবীর কবিকে স্বপ্নাদেশ, দেবী আরাধনায় বাঙালির ব্রত রাখা, অনাগত বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিপদ অনুসারে সেই দেব-দেবীর পূজা দেওয়ার মানসিক করা, মন্দির স্থাপন করবার ঘটনা একুশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবাদী চিন্তার মধ্যে থেকেও বাংলার জনজীবনে আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক ও ততোধিক প্রচলিত আছে। যার জন্য মঙ্গলকাব্যগুলিও মিথ হয়ে উঠেছে বলা অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয়ত, পৌরাণিক চরিত্রগুলি কালক্রমে লোকপ্রচলিত কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে মিশে মধ্যযুগের গণ্ডি অতিক্রম করে আধুনিক যুগের সহস্রধারার (গান, চিত্র, যাত্রাপালা, সাহিত্যে) মধ্যে আধুনিক ও বাস্তবানুগ হয়ে উঠছে।

বাংলা সাহিত্যে আদিযুগের চর্যাপদ, মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদে ও মঙ্গলকাব্যের ধারায় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যসহ একাধিক গ্রন্থ পৌরাণিক চরিত্র কেন্দ্রিক। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেন— 'প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথমান্থর পুচ্ছানুগ্রাহিতা সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যে ও অনূদিত মহাকাব্যগুলিতে পুরাণের জঙ্গম স্বাস্থ্যময়তা বিস্ময়কর।'[২] কিন্তু যে ব্যক্তি সাহিত্যে পুরাণ চর্চায় মনোনিবেশ করবেনতাকে সাবধান থাকতে হবে 'পুরাণ' অর্থে পুরাকাহিনি বা পুরাবৃত্তান্তে সীমাবদ্ধ থাকলে সংকীর্ণ হয়ে যায়, কারণ পুরাণের জন্ম পুরাঘটিত এবং বর্তমান মুহূর্তের অবিচ্ছেদ্য হৃদ্যতায়। 'পুরণ' কথাটি থেকে 'পুরাণ' কথাটির মৌল সূত্র মিলতে পারে। যা ঘটে গিয়েছিল বা ঘটে গেল তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দূরত্ব মনে মনে পূরণ করতে হবে। স্মৃতির শরীরটিকে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও উপকরণে ঋদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করে তোলাই পুরাণের কাজ। যে কারণে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অভিঘাত, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অস্থির সময়খণ্ডের প্রেক্ষিতে যুক্তির প্রখরতায় মিথ-পুরাণের নির্মাণ ও বিনির্মাণ আবশ্যিক এবং ততোধিক আলোচনা ও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে আধুনিককালে। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগেই নয় আধুনিক যুগে উপন্যাস, নাটকের পাশাপাশি কাব্য-কবিতার ইতিহাসে পুরাণের প্রয়োগ চোখে পড়বার মতো। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নজরুলের কবিতা এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়সহ একাধিক কবির কবিতায় মিথ-পুরাণের নির্মাণ ও বিনির্মাণে বাঙালির আধুনিক চেতনার সন্ধান পাওয়া

যায়। এ প্রসঙ্গে ছয়ের দশকের কবি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মিথ-পুরাণের কাহিনি ও চরিত্র নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

গীতা চট্টোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় প্রচারবিমুখ কবি। সারাজীবন মধ্য কলকাতার রক্ষণশীল বনেদী পরিবারের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেও মায়ের আধুনিক মনোভাবে স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে লেডিব্রেমন কলেজের বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেন। খুব অল্প সময়ে দাদাদের উৎসাহে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়ে ওঠে। কৃতিছাত্রীর মেধায় অবিভূত জগদীশ বাবুর উৎসাহে গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা লেখা শুরু হয়। প্রথম কবিতা 'বেত্রবতীর জলে আমার ছায়া' যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত। তারপর 'গৌরীচাঁপা নদী, চন্দরা', 'সপ্ত দিবানিশি কলকাতা', 'মীনাঙ্ক সোপান', 'বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস', 'জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর 'গৌরীচাঁপা নদী, চন্দরা' কাব্যের 'ভূ র্ভু বঃ স্বঃ' কবিতাগুচ্ছের 'মার কাছে যাচ্ছি' কবিতায় পুরানো দিনের খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে বিচরণ করা মহাজনদের গানের মধ্য দিয়ে মহাভারতের কাহিনির পুনঃনির্মাণ হয়েছে—

> খঞ্জনি কাঁদিয়ে যেত গোষ্ঠগানে মহাজন দাস
> পাণ্ডুর মলাটে আঁকা শোকবধূ বিধূরা উত্তরা;
> মহাভারতের শ্লোকে ঘুম ছুঁয়ে চলেছে ঘর্ঘরা –
> লাল সিদুরের টিপে লাল ঠোঁটে মার অনুপ্রাস।[৩]

কবিতায় পাণ্ডু অর্থাৎ অর্জুন ও পাঞ্চালির পুত্র অভিমন্যু কথা বলা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু নিধনের পর তাঁর স্ত্রী উত্তরার শোকের কথা কবি গোষ্ঠগানে মহাজন দাসের খঞ্জনির কান্নার মধ্যে শুনতে পান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমুন্য নিধনের পর উত্তরার যন্ত্রণার কথা সমগ্র মহাভারতে শুধুমাত্র কবি নয় কোনো চরিত্রের মুখে উচ্চারণ করতে দেখা যায়নি। সকলে প্রতিশোধের স্পৃহা ও সাম্রাজ্য বিজয়ের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। মহাভারতকারও উত্তরাকে অন্তঃপুরেই রেখে উপেক্ষিতা রেখেছেন। গীতা চট্টোপাধ্যায় উত্তরার যন্ত্রণাদীর্ন অবগুণ্ঠনময়, অন্ধকারময় জীবনের কথা তুলে ধরেন। কবির কলমে মহাভারতের কাহিনির নবনির্মাণ লক্ষণীয়। কখনো বীর শ্রেষ্ট পরশুরাম বাবার আদেশে জন্মদাত্রী মা-কে হত্যা করেন। যিনি একুশবার বীরশূন্য ধরাতল বিজয় প্রাপ্ত হলেও তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের 'পরশুরাম' কবিতায় লেখেন—

> বাবা বলেছিল বলে মাকে মেরে এসেছি একবার
> এবং একুশবার বীর শূন্য করেছি টঙ্গিতে
> এত রক্তপাত শেষে আজ ভাবি, সামনের শীতে
> উষ্ণ আগুনের খড় কে দেবে এ- নির্বান্ধবতার [৪]

এত সুবিশাল ক্ষেত্র নিয়ে, বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে, সাম্রাজ্য লোভে নিজ বীরত্ব প্রদর্শনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে গেল। শত শত বীর যোদ্ধার বিনাশ হলেও পরশুরাম নিশ্চুপ

থেকেছে। তাঁর টাঙ্গিতে যে রক্ত ঝরেছে তার জন্য অনুতপ্ত পরশুরাম অস্ত্রধারণ থেকে বিরত থেকে ব্রহ্মাচার্যের পথ বেছে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আবার মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মের কথা গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় উঠে আসে। মহাভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন পরাশর। ছোটবেলা থেকে পিতামহ বশিষ্ঠকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু যখন মা অদৃশ্যন্তীর কথায় জানতে পারেন, তাঁর পিতাকে রাক্ষস ভক্ষণ করেছে। পিতৃহত্যার পরিশোধ নেবার জন্য পরাশর রাক্ষস নিধন যজ্ঞ শুরু করলে একে একে রাক্ষস নিধন শুরু হয়। বিপদ বুঝে পুলস্ত্য জানায় পরাশরকে তোমার বাবার হত্যাকারী ক্ষত্রিয় রাজা কল্মষপাদ। তোমার বাবা শক্ত্রির সঙ্গে বিবাদ হলে তাকে নরমাংসভোজী রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দেয়। রাজা কল্মষপাদ রেগে তোমার বাবাকে ভক্ষণ করেন। পরাশর রাক্ষস নিধন সমাপ্ত করেন ঠিকই কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ঘটনাক্রমে দেখা যায় তিনি রচনা করেন ‘পরাশর-সংহিতা’। সমাজ পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে নতুন নতুন নিয়মের কথা বলেন। অন্যদিকে রাজা উপরিচর বসুর ঔরসে অপ্সরা অদ্রিকা দুটি সন্তান ধারণ করেন কিন্তু ব্রহ্মের অভিশাপে মৎসীরূপে জলে বাস করতে হয়। ধীবরের জালে ধরা পড়লে তাঁর পেট চিরে এক পুত্র ও কন্যা সন্তান পাওয়া গেলে রাজা উপরিচর বসু পুত্র সন্তানটি নিয়ে যায়। ধীবরের কাছে থেকে যায় কন্যা সন্তানটি, তাঁর নাম হয় মৎসকন্যা। একদিন ভ্রমণ করতে করতে পরাশর খেয়া পাড়ের সময় পারানির বেশে মৎসগন্ধাকে দেখে তাঁর কাছ থেকে পুত্র সন্তান লাভের কথা জানায় তাঁর ঔরসে এবং সত্যবতী সম্বোধন করে তাকে কামনা করতে বলে। পরাশরের ইচ্ছায় মৎসগন্ধা পদ্মাগন্ধা প্রাপ্ত হয়। গর্ভবতী পদ্মগন্ধা পুত্র সন্তান প্রসব করেন দ্বীপে। দ্বীপে জন্মানোর কারণে নাম হয় দ্বৈপায়ণ। যে মহান ব্যক্তির কলমে মহাভারত লিখিত হয়। গীতা চট্টোপাধায়ের ‘পরাশর’ কবিতায় দেখা যায়— “নীহারে ঢেকেছি দিগন্তরাল/ স্থল ও জলের দৃষ্টি রুদ্ধ/ এখন আমাকে, সত্যবতী, কি/ দেবে না তোমার যা কিছু শুদ্ধ ?/ কুমারী, তোমার অরুণ হাতের/ তরণী দোলায় কতদূর ভাসি/ জীবন যেখানে মৃত্যু ছুঁয়েছে,/ মৃত্যু- শিল্প ছোঁয় অবিনাশী/ মৎসগন্ধ ঔই তনুটির/ এক মুহূর্তে পদ্মগন্ধ / তোমাকে দিয়েছি ভাষা-অনুরোধ/ বাকবন্ধের প্রথম ছন্দ।”[৫]

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ‘সপ্ত দিবানিশি কলকাতা’ কাব্যের ‘চাঁদ সদাগর, সমুদ্র’ কবিতার নামকরণে মধ্যে মনসামঙ্গলকাব্যের মুখ্য চরিত্র চাঁদসদাগরের কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে চাঁদসদাগরের বানিজ্য যাত্রার কথা। মনসার সঙ্গে বিবাদের ফলস্বরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ মনসার ষড়যন্ত্রে বিনা মেঘে বদলে যাওয়া সমুদ্রের রূপবদল। মনসার উদ্যত ফনার সন্ত্রাসে চাঁদ সদাগরের মাঝি মল্লার দিশাহীন হয়ে পড়া ও নৌকাডুবির কথা। কিন্তু প্রথম স্তবকে ‘হাওয়ায় হাওয়ায় হাজার নাবিক/ হাঙর-সাগরে হারাল হাল(চাঁদ সদাগর!)’ উচ্চারণে বুঝতে হবে চাঁদ শুধুমাত্র নিজের কথা নিজের মাঝি মল্লারের কথাই নয় সমগ্র মানুষ জীবন সমুদ্রের নানারকম বাঁক আর ঝড়ে

কথা বলতে চাইছেন। আর সমুদ্রের ভয়ংকর উত্তাল ঢেউের সঙ্গে মনসার ফনার গভীর যোগসূত্র তারই দিক নির্দেশ করে।উভয়ক্ষেত্রেই চুড়ান্ত পরিণতি মৃত্যু। যে তাড়নায় কবি দ্বিতীয় স্তবকে চাঁদ সদাগরের মানসপটে চিত্রকল্পের উপর ভর করে তুলে আনলেন ঘটে যাওয়া অতীতের কথা—

সনকার চোখে ফল দেখে এলে
নিকানো উঠোন
মনসা-ঘট ?
পায়ে ভেঙে ফেলো, হাজার-হাজার বছরের ঝুরি
ছায়ামায়াভরা ঝুপসি বট
দেয়াসিনি-শিরে মৃত্যুভীতের
পুরানো প্রথিত-যশের জট
টেনে ছিঁড়ে
এই সাপের ফণার মৃত্যু-দোলন
ছোবল নাও

(চাঁদ সদাগর!)[৬]

কবিতাটিতে মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিবাদে ছয়পুত্রের জীবনই নয়, কালিদহে বানিজ্যিক নৌকা ডুবে থেমে থেকেছে এমনই নয়, সর্বদিক থেকে চাঁদ সদাগরের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। সপ্তম পুত্র লখিন্দর জন্ম হওয়ার পর তাকে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে চাইলেও মনসার ষড়যন্ত্রে সাওতালি পর্বতের লোহারবাসর ঘরে সাপের ছোবলে মৃত্যু হয়েছে। চাঁদ সদাগর ও তাঁর পত্নী সনকা পুত্রশোকে মূর্ছা গেছে এমনই নয়, নববধূ বেহুলার মনের অবস্থা কি হতে পারে, আমাদের কল্পনার অতীত। তারও পর খণ্ড কপালিনী, চিরুনিয়াদাঁতী ইত্যাদি অপমানজনক কথায় ভৎর্সনা করলে তাঁর মনের অবস্থা কি হতে পারে? যে তাড়নায় নিজের জীবন বিপন্ন করে আত্মবিশ্বাসে মৃত লখিন্দর নিয়ে দেবলোকে যাত্রা করেছে জীবন ফিরে পাবার ক্ষীণ আশায়। যার জন্য যাত্রাপথে শ্বেতকাকের মাধ্যমে নিজের দুঃখের কথা নিছনি নগরে মা অমলার কাছে পাঠিয়েছে এবং আত্মবিশ্বাসে লখিন্দরের জীবন ফিরে পাবার সংকেত বার্তা গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় উঠে আসে— 'কড়ার তৈলেতে যদি ছমাসের প্রদীপ আরও জ্বলে/ সিজান ধান্যতে যদি আবার অঙ্কুর এসে ফলে/ বুঝবে ফিরে পাবে প্রাণ আগামী শতেক পুনর্বার'।[৭] যে আত্মবিশ্বাসে বেহুলা মৃত লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দাসে গাঙুরের জলে ভেসে ছিলো। যাত্রাপথের একে একে সকল দূর্যোগ কাটিয়ে মনসার পরামর্শ দাতা নেতার ঘাটে উপনিত হলে এবং নদীর তিন প্রবাহ প্রসঙ্গে কবি লেখেন—

এ তবে ত্রিপূর্ণি নদী, তিন দিকের জল যারা চাখে
দক্ষিণে হিমেল পায় উত্তরেতে অবিশ্বাস্য ক্ষার
ক্রমশ নেতার ঘাটে এসে লাগে বেহুলা জোয়ার—

এলাকা রেডিয়েশান— সাবধান কাচের ফারাকে[৮]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবীমঙ্গলচণ্ডীর মধ্যে মার্কেণ্ডয় পুরাণের মহিষাসুরমর্দিনী দেবী চণ্ডী, জগলক্ষী, সরস্বতী কিংবা বৌদ্ধতন্ত্রের ভদ্রকালি, নীল সরস্বতী কিংবা জাঙ্গুলীতারা প্রভৃতি দেবীর মিশ্রণ ঘটেছে এমন অজস্র লোককথা প্রচলিত আছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, যখন বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মের মধ্যে আত্মগোপন করিতে ছিল। তখন কোনও কোনও তান্ত্রিক বৌদ্ধদেবী মঙ্গলচণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া আত্মগোপন করেন। তবে এমতের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনুরূপ দেবী দুর্গা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও ধনলক্ষ্মীর কিংবা জগলক্ষ্মীর সঙ্গে চারিত্রিক মিল নেই। কারণ দেবী দুর্গা ও সরস্বতী শান্ত প্রকৃতির আর মঙ্গলচণ্ডী কোপনস্বভাবা এবং উগ্র। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্যের বণিক খণ্ডে ধনপতির কমলে কামিনী দর্শন বর্ণনায় দ্বিমত থাকে না—

অপরূপ হের আর,   দেখ ভাই কর্ণধার,
কমলে কামিনী অবতার।
ধরিয়া বাম করে   উগারয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার।।[৯]

এমন এক অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর সংহাররূপ যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ধনপতি কমলে কামিনী দৃশ্য নিজে দেখতে পেলেও নাবিকদের দেখাতে পারেনি। তবুও ধনপতির কথায় দেবী চণ্ডীর বিনাশকারী রূপের বর্ণনা আমরা পায় সেই রূপকেই গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ‘কমলে কামিনী’ কবিতায় যা অধিক ব্যঞ্জনায় সৃষ্টিচক্রের গভীর রহস্যে প্রবেশ করে আমাদের জীবন সত্যের কাছে উপনীত হয়—

সৃষ্টির ভেতরে এনে আবার বাইরে দিই ছেড়ে
গর্ভের নির্মলতম জলে আমি জন্ম দিই প্রাণ
সবচেয়ে সুবাতাস, সব অন্ন, সফল শ্রীভূমি
পদ্মের পাতার মধ্যে রিক্তস্বর্গ বৈকুণ্ঠ নির্মাণ।
প্রেতসংস্থা মৃত্যু এই নীলজল কাঁপানো অস্থিতি
তুমুল সিন্ধুর ঘণ্টা কবুলয় হস্তীর বৃংহিতি
এই নষ্ট অবেলায় বলো সত্য, যা দেখেছি ঠিক,
সংহার সৃষ্টিতে মিলে এক নারী-কবির প্রতীক
ঊর্ধ্বে চাও চামুণ্ডার দিক্‌মুখ গগণবিস্তার
শুষ্ক মাংস লোলচর্ম অতিলোভ আবার বিস্ফার
নিচে রক্ত কলুষিত সৃষ্টির মায়াবী ঘোর রূপ
ললাটে চন্দন আঁকি জ্যোস্নায় আমার গন্ধধূপ
উথাল সমুদ্রপথে চন্দনের হৃদ গুরুভার
দেখতে হয় নিঃস্ব কামিনী কমলে অবতার [১০]

রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে অন্তর্গত আমির মুখোমুখি হলে সবক্ষেত্রে সৃষ্টিই সম্ভব এমন নাও হতে পারে। রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে আমির মুখোমুখি হলে সকলের দ্বিধা দ্বন্দ্বে দ্বৈতচেতনায় উদ্ভাস হওয়াই স্বাভাবিক লক্ষণ। এই দ্বৈতচেতনায় আসতেই পারে সৃষ্টির বিপরীত ধ্বংসের প্রসঙ্গ। যা কবিতার অস্থি-মজ্জায় লেগে আছে। কবি কোন পথে চালিত হবেন, নির্ভর করে সমকালের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনে কবির অভিপ্রায়। যে তাড়নায় গীতা চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলে কামিনী' কবিতায় চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কমলে কামিনী দৃশ্যের নির্মাণ-বিনির্মাণে শুদ্ধ-স্ববিরোধ গড়ে উঠতে দেখা যায়। কবিতায় পদ্মপাতার মধ্যে বৈকুন্ঠ নির্মাণের পাশাপাশি প্রেতসংস্থার মৃত্যু। নীলজল। চামুণ্ডার দিক্‌মুখ গগণবিস্তার, শুষ্ক মাংস লোলচর্ম অতিলোভ আবার বিস্ফার আমাদের সত্ত্বাকে দ্বিধা বিভক্ত করে। কবিতায় যতই অসুর নিধনে দেবী কালিকা বা চণ্ডীর অশুভ শক্তির বিনাশকারী রূপ, ঊর্ধ্বে চামুণ্ডার দিক্‌মুখ গগণবিস্তার ও লোলচর্ম অতিলোভ বিস্ফার সংহার রূপের দিক নির্দেশ করুক না কেন, গীতা চট্টোপাধ্যায় সেই সংহাররূপের ললাটে চন্দন পড়িয়ে মায়াবী জ্যোস্নার আলোয় গন্ধধূপ জ্বেলে সৃষ্টির প্রতি মূর্তিতে রূপান্তরিত করেন। সৃষ্টির রূপকে নির্মাণের জন্য সংহার রূপ তখন আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিনাশ যত গভীর থেকে উঠে আসবে নির্মাণ তারও গভীর থেকে হবে। অশুভ শক্তি দমন করে গর্ভের পবিত্র জলে স্নান করিয়ে পুনঃরায় জন্ম দেওয়া একজন নারী কবি বলেই সম্ভব হয়েছে। কবিতার নির্মাণ কৌশলে মিথ-পুরাণের বিনির্মাণে গীতা চট্টোপাধ্যায় প্রশংসার দাবী রাখে।

রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের 'অঘোর বাদল পালা'; 'জাগরণ পালা' ও ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের ত্রয়োবিংশতি সর্গের 'পশ্চিম-উদয় পালা'র কাহিনি গীতা চট্টোপাধ্যায়ের 'হাকন্দ তপস্যা' কবিতার উৎস ভূমি। ধর্মমঙ্গলকাব্যে মহামদ বুঝতে পারে লাউসেনের অপরাজেয় শক্তির উৎস, ধর্মের স্তব ও স্তুতির ফল স্বরূপ। মহামদ বুঝতে পারেন, লাউসেনকে হত্যা করবার জন্য ধর্ম ঠাকুরের সাহায্য দরকার। কূটকৌশলী মহামদের পরামর্শেই লাউসেন বধের জন্য গৌড়েশ্বরের ধর্মপূজার আয়োজন করেন। ধর্মঠাকুর নিজের বরপুত্র লাউসেনের অনিষ্টকারীদের প্রতি রুষ্ট হন এবং হনুমানের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে গৌড়ের ক্ষতি করলেন। গৌড়েশ্বর ধর্মঠাকুরের রোষানল থেকে বাঁচবার জন্য পুনঃরায় মহামদের পরামর্শ মতো লাউসেনকে পশ্চিম উদয়ে গিয়ে ধর্মের তপস্যা করতে আদেশ দিলেন। গৌড়েশ্বরের আদেশ অমান্যে লাউসেন বন্দী হলেন। ঘটনাক্রমে রঞ্জাবতী সাহায্যে বন্দিত্ব মুক্তি পেয়ে পশ্চিম উদয়ে গিয়ে ধর্মের তপস্যায় যাত্রা করলে সুযোগসন্ধানী মহামদ ময়না আক্রমণ করলেন। অন্যদিকে যাত্রাকালে নদীপথে বিভিন্ন স্থান পার করে লাউসেনের হাকন্ডে পৌঁছানো। বনভূমির মধ্যে ধর্মের দেহারা চেহারা দর্শন। লাউসেনের কাছে সামুলার হাকন্দ ভূমির পূর্ব অবস্থা বর্ণন এবং ধর্মপূজা বন্ধ হবার কারণে হাকন্দ আজ বেনাবনে পরিণত হওয়ার ঘটনা লাউসেনকে ব্যথিত করে। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের

'হাকন্দ তপস্যা' কবিতার উৎস ভূমি ধর্মমঙ্গল কাব্যের হলেও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন চোখে পড়বার মতো। 'হাকন্দ' শব্দের বাংলা অর্থ হাহাকার। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা, ভজনা কিংবা পূজা না পাবার জন্য জল নষ্ট হয়েছে, হাওয়া দুষিত হয়েছে। সুন্দর ভূমি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে ধর্মঠাকুরের রোষানলে। কিন্তু গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় গ্রহ মণ্ডলের জল, হাওয়া নষ্ট হওয়ার মূলে কোনো দৈবশক্তির প্রভাব নেই। প্রভাব আছে মানুষের অর্থাৎ আমাদের। আমরা জ্ঞাতার্থে নিজ স্বার্থে স্বাস্থকর পরিবেশকে দূষিত করছে চলেছি। অত্যাধিক গাছ কাটবার জন্য, রাষ্ট্রনেতাদের শক্তি প্রদর্শনে ইত্যাদি প্রকার আধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার, অত্যাধুনিক যন্ত্র ও যানবাহনের ব্যবহার গ্রহমণ্ডলের বায়ুকে দূষিত করছে। অন্যদিকে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ, কলকারখানার কেমিক্যালযুক্ত দূষিত পদার্থ নদীতে ফেলে দেওয়া, নদীর সংরক্ষণের জন্য কোনোভাবেই উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে গ্রহমণ্ডলের জল আজ দূষিত হয়ে চলেছে। বিঘ্নিত হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র পদ্ধতি। আমরা নিজেরা নিজের মৃত্যুই নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের মৃত্যুপুরী নির্মাণ করে চলেছি। যে জন্য উদ্বিগ্ন কবি গীতা চট্টোপাধ্যায় লেখেন—

এই গ্রহ মণ্ডলের সব জল নষ্ট, ফিরে নাও
এই গ্রহ মণ্ডলের সব হাওয়া দুষ্ট, ফিরে নাও
তবুও এখনো সেই আগুন তো রয়েছে আগুন-ই
তোমার শব্দকে অগ্নিতৃণ থেকে ছোটাও ফাল্গুনী
এই জীর্ণ ডালে বসে কী দেখছ, নীচেই তীব্র শিখা
সমস্তটা জ্বলে উঠছে নৈসর্গিক এ পটভূমিকা
নামমাত্র ক-টি সূত্রে ধরে রাখছ জীবনযাপন [১১]

ধর্মমঙ্গলকাব্যে হাহাকার, হাকন্দ ভূমি রক্ষার জন্য লাউসেন ধর্মঠাকুরের তপস্যায় রত হয়েছেন। তপস্যায় ব্যর্থ হয়ে কঠিন তপস্যার সিধান্ত নিয়েছেন। যজ্ঞের কুন্ডে একে একে নিজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আহুতি দিয়েছেন। তারপরও ব্যর্থ হলে নিজের মাথা কেটে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে ধর্মঠাকুরের প্রতি আত্মবিশ্বাসে। হাকন্দ ভূমিতে পরিণত আজকের পৃথিবীকে কে রক্ষা করবে? রক্ষার জন্য লাউসেনের মতো কাউকে পাওয়া যাবে কি ? যার তপস্যায় হাকন্দের মতো আজকের পৃথিবীতে নতুন সূর্যের উদয় হবে। হাহাকার ভূমিকে আবার আমরা সুস্থভাবে বাঁচবার মতো করে তুলতে পারবো। কিন্তু হতাশার কারণ সে পথ অবলম্বন না করে আমরা সকলেই যেন মহামদ হয়ে উঠেছি—

একটি একটি কেটে দিলে দাউ দাউ চিতা সংক্রমণ
অনেক বলেছি মিথ্যা কণ্ঠে ধরি শ্বেত কুষ্ঠ দাগ
একে একে অঙ্গ মগ্ন সামনে আগন্তুক অভ্যুদয়
সে কি কোনো জ্যোতিষ্মান পূর্ণ শুদ্ধ কল্পস্রোমে ?

কূর্মের আকুতি ধর্ম আজন্ম যন্ত্রণা পিঠে বয়
আকাশ পরিধি থেকে নীচে শতাব্দীর পরিক্রমে
শির ছিন্ন করে দিয়ে রক্তে অসম্ভব সূর্যোদয়।[১২]

এর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। প্রতিবেশ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আখেরে নিজের গায়ে ক্ষত দাগের দায়ভার দেখেও মুখোশ ধারণ করতে হয়। কিন্তু কোন উপায়ে আমাদের 'রক্তে অসম্ভব সূর্যোদয়' হতে পারে ? যে ধর্মকে জেনে আজন্ম যন্ত্রণা সহ্য করেও কূর্ম বহন করে চলেছে তার পরিত্রাণ অর্জুনের লক্ষভেদ বানের দ্বারা সম্ভব। এই বাণের তেজ কবি জ্যোতিষ্মান পূর্ণ শুদ্ধ শব্দের মধ্যে দিয়ে নির্মাণ করেন। লাউসেনের মতো আত্মহূতি দিয়ে আজকের দিনে সম্ভব নয় জেনে কবি শব্দের বাণ নিক্ষেপে জোর দিয়েছেন। শব্দের পবিত্র শিখা দিয়ে আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আমাদের শুভ চেতনার বীজ বুনে দিতে গীতা চট্টোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনি বিনির্মাণ করেছেন। কবি বিশ্বাস করেন আজ না হলেও ভবিষ্যতে কোনো না কোনো সময় স্বপ্নবীজ অঙ্কুরিত হবে, যে অঙ্কুর থেকে হয়তো আমাদের স্বপ্নগাছের জন্ম নেবে। যে গাছের ফুল ও ফলে সমৃদ্ধ হবে সমগ্র মানবসমাজ।

তথ্যসূত্র :

১. কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৮০, পৃ.১৫

২. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ'। 'পুরাণ সংখ্যা'। 'এবং আমরা পত্রিকা'। দেবব্রত শূর (সম্পা.)। অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ১১

৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়। 'কবিতাসংগ্রহ'। প্রথম প্রকাশ। কৃষ্ণনগর, আদম, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৪২

৪. তদেব, পৃ. ২৭৮

৫. তদেব, পৃ. ৩১৪

৬. তদেব, পৃ. ১০৯

৭. তদেব, পৃ. ২৭১

৮. তদেব, পৃ.২৭০

৯. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯২১,পৃ. ২০৬

১০. গীতা চট্টোপাধ্যায়। 'কবিতাসংগ্রহ'। প্রথম প্রকাশ। কৃষ্ণনগর, আদম, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৭৪

১১. তদেব, পৃ. ২৭২

১২. তদেব, পৃ. ২৭২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. গীতা চট্টোপাধ্যায়। কবিতাসংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ। কৃষ্ণনগর। আদম,জানুয়ারি ২০১৬

২. গিরিন্দ্রশেখর বসু। ‘পুরাণপ্রবেশ’। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা। বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০০৭

৩. কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। ‘বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৮০

৪. অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পা.)। ‘মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি’। ভাষাবন্ধন সংস্করণ। কলকাতা, ভাষাবন্ধন, ২০১৩।

৫. পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’। প্রথম খন্ড। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, প্যাপিরাস, বৈশাখ ১৪১৩

৬. রূপরাম চক্রবর্তী। ‘ধর্মমঙ্গল’। পঞ্চম মুদ্রণ। কলকাতা, ভারবি, এপ্রিল ২০২০

কবিতার প্রান্ত ছুঁয়ে বনফুলের ছোটোগল্পেরা

সারমিন রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে বনফুল তথা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের আঙ্গিক ভাবনা পাঠককে নতুন ভাবনায় উদ্দীপিত করে এসেছে বরাবর। তাঁর গল্প ভাবনায় ছোটো শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ধরা দিয়ে অণুগল্পের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এই সংযত, সংহত, পরিমিত গল্পভাবনার স্তর থেকে তাঁর ছোটোগল্পেরা কবিতার প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে। কোথায়, কেমনভাবে— তারই পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ : বনফুল, কবিতা, অণুগল্প।

এক.

ছোটোগল্পের আয়তনিক পরিসীমা সর্বদাই আলোচনায় মুখর। বনফুল যেন ছোটোগল্পের আক্ষরিক অর্থকে ধরে দিয়েছিলেন তাঁর ছোটোগল্পের রচনায়। বনফুলের অধিকাংশ ছোটোগল্পে স্বল্পায়তন লক্ষ করবার বিষয়। বেশ কিছু গল্প হাতে গোনা কয়েকটি বাক্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের যে প্রচলন, তার আয়তনিক চেহারার সঙ্গে বনফুলের ছোটোগল্পের বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। আলোচক জগদীশ ভট্টাচার্য বনফুলের ছোটোগল্পের এই রূপনির্মাণের দিকে লক্ষ রেখেই বলেছেন "শিল্পরীতি ও রূপকর্মের দিক দিয়ে পুনরাবৃত্তি তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও নেই।"[১] বনফুলের সাহিত্য পাঠ করলেই বোঝা যায়, শিল্পের রীতি ও রূপ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। বাংলা সাহিত্য তাই যখন একটি প্রমাণ আয়তনকে সামনে রেখে ছোটোগল্পকে বাঁধা আয়তনিক গতে রচনা করছিল, বনফুল তখন যেন 'ছোটো' শব্দটির আক্ষরিক অর্থের প্রকাশ ঘটালেন তাঁর গল্পে। শুধু তাই নয় পাঠক এবং সমালোচক তাঁর গল্পে খুঁজে পেয়েছেন কাব্যব্যঞ্জনা। তাঁর ছোটোগল্পকে তুলনা করা হয়েছে গীতিকবিতার সঙ্গে—

"ছোটগল্প এক হিসেবে গীতিকবিতার সঙ্গে তুলনীয়। উভয়ক্ষেত্রেই মুহূর্তলীলার মধ্যে শাশ্বত জীবন রহস্যের দ্যোতনা অভিব্যঞ্জিত হয়। তফাতের মধ্যে এই যে গীতিকবিতায় কেবল কবিমানসের নিজের ভাবময় মুহূর্তগুলোরই প্রকাশ; ব্যক্তি সেখানে একটিই, অনুভূতিও স্বভাবতই আত্মনিষ্ঠ। কিন্তু ছোটগল্পে বহু ব্যক্তির বহু চিত্রিত মুহূর্তের বহুনিষ্ঠ ভাব-ভাবনার উন্মেষ।. . . জীবনসত্য সেখানে বহুরূপী হয়ে স্রষ্টার কাছে ধরা দেয়। বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে।"[২] বাস্তবিকই বনফুলের ছোটোগল্প সম্পর্কেও একথা সর্বোতভাবে প্রযোজ্য।

দুই.

বনফুলের ছোটোগল্পের কবিতার সঙ্গে সামীপ্য উদ্ঘাটন এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাভাবিকভাবেই কবিতা এবং ছোটোগল্পের আয়তনিক স্বল্পতাসূত্রে তাঁর ছোটোগল্পগুলি কবিতার কাছাকাছি এসে পড়ে। তাছাড়া ছোটোগল্প সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রায়শই উচ্চারিত 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন', বনফুলের ছোটোগল্পগুলি সম্পর্কে তা আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য। জীবনের সমগ্রতাকে একটি নির্দিষ্টতায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিসরের মাধ্যমে শুধু খণ্ডাংশের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করা খুব সহজসাধ্য নয়। বিশেষত বনফুলের ছোটোগল্পগুলি যখন পাঠ করা হয়, তখন তার প্রাথমিক চেহারা বা উপস্থাপনটুকু দেখে খটকা লাগে— গল্পটা শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে তো? এবং গল্প পাঠের পর ছোটোগল্পের যে চমক তাতে পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারেন না। বনফুলের গল্পে আরও লক্ষণীয়, গল্পের কাহিনি বা ঘটনা অতিকথন বা অতিবর্ণনে ভারাক্রান্ত নয়, যা কবিতার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। কবিতায় অতিকথনের জায়গা প্রায় থাকে না (ব্যতিক্রম যদিও রয়েছে)। তবে কবিতার ক্ষেত্রে তার একটা বড় কারণ হয়তো ছন্দ বা বলা চলে নির্দিষ্ট পরিমিতি। তবে গল্পের সে স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও বনফুলের ছোটোগল্পের পরিমিত কথনভঙ্গি তাকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে গেছে অনেকখানি। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে তাঁর 'সমাধান' গল্পটির কথা। কত স্বল্প ভাষায় চরিত্র এবং ঘটনা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। গল্পটি তেইশটি লাইনে সমাপ্ত। গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে— "আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহারঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাক্ড়া গ্রামবাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন বুঁচি।"[৩] ছোটোগল্পের আয়তনিক পরিসীমা মাথায় রেখেও এ গল্পে detail এর অবকাশ ছিল। কিন্তু তাঁর ব্যতিক্রমতাই বনফুলের ছোটোগল্পের বিশেষত্ব। 'সমাধান' গল্পটিতে চরিত্রগুলির নামকরণেই বোঝা যায় চরিত্রগুলির গুরুত্ব। কথকের নাম নীহারঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে হল ক্ষান্তমণিনাম্নী পল্লীবালার সঙ্গে—এ বক্তব্যে নীহারঞ্জনের অনীহা এবং অনিচ্ছা প্রকাশিত। কন্যাসন্তান বুঁচির নামকরণে রয়েছে অনাদর-অবহেলা-অবজ্ঞা। এহেন বুঁচির কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নীহারঞ্জনকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে একদিন যখন তুমুল আলোচনা— কালো-কুচ্ছিৎ বুঁচির বিবাহ হবে কীভাবে, ঠিক তখনই নীহারের নামে আসা একটা চিঠির একটা লাইনে ভয়ানক চমকে সমাপ্তি ঘটে যায় গল্পটির— "বউ লিখেছে—বুঁচি মারা গেছে কাল।"[৪] এমনই একাধিক বাক্রুদ্ধ করবার মত গল্পের স্রষ্টা বনফুলের গল্পভাণ্ডারের অন্যতম আলোচিত গল্প 'নিমগাছ'। তবে এ গল্পটির বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে লক্ষণীয় কবিতার মত ঢঙে গল্পটির উপস্থাপনভঙ্গি—

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।
কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনই কাঁচাই . . .
কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।[৫]

এ গল্পটিতে নিমগাছের নিরিখে কী নিদারুণ ভঙ্গিতে প্রাঞ্জল ভাষায় একজন সামান্য গৃহবধূর জীবন যাপনকে উপস্থাপন করেছেন লেখক। নিমগাছের গুণাবলী তথা উপকারিতা কম-বেশি প্রত্যেকেরই জ্ঞাত। তবে সাধারণ একটি বিষয়ের সাযুজ্যে জীবন সত্যের উপলব্ধিকে এমন অসাধারণভাবে উপস্থাপন করবার দূরদর্শিতার জন্য গল্পকারের সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। গল্পটির উপস্থাপন ভঙ্গি নির্মেদ, নির্ভার। নিমগাছের প্রয়োজনীয়তাকে ছাড়িয়ে যে সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন গল্পকার, তা একজন কবি দৃষ্টিতেই সম্ভবপর। কবির দৃষ্টিতেই যেন ধরা পড়ল নিমগাছের সৌন্দর্য— "বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি . . . কীরূপ ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার . . . একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বা; —"[৬] বলা বাহুল্য, একজন কবির দৃষ্টিতেই সেই পরখ করবার শক্তি থাকে, যা সাধারণকে করে তোলে অসাধারণ। বনফুলের কবিমন শুধু সাধারণকেই অসাধারণ করে তুলল তা নয়, সেই সঙ্গে বাস্তবকেও উপলব্ধির পর্যায়ে উত্তীর্ণ করলেন সহজেই। নিমগাছের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা সর্বোপরি তার সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা টানলেন 'গৃহকর্মা-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার'। আর সেখানেই প্রকাশ পেল গল্পটির ব্যঞ্জনা। সংসারের ঘেরাটোপ থেকে নারী মুক্তি পেতে চাইলেও তা সম্ভব হল না, কেননা 'মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে।'[৭] 'নিমগাছ' গল্পটি প্রসঙ্গে বনফুলের গল্পে কবিসত্তার এ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে সমালোচকদেরও সমর্থন মেলে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য এ গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— ". . . কিন্তু তার পরেই গল্পের আবরণ উন্মোচন হল একটি মাত্র বাক্যে। 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা। গল্পকার নয়, কবি বনফুলের এটি একটা অতুলনীয় রচনা।"[৮]

জগদীশ ভট্টাচার্যের বক্তব্যে স্পষ্টতই প্রকাশিত, 'নিমগাছ' গল্পটি গল্পকার বনফুলের নয়, কবি বনফুলের সৃষ্টি। বলাই বাহুল্য, বক্তব্যের পরিমিতি এবং উদ্দিষ্ট সত্যোদ্ঘাটনের কৌশল 'নিমগাছ' গল্পটির বুননে এনেছে কবিত্বের ছোঁয়া। আর গল্পে কবিতার এই আবাহন কোনো একজন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। অন্যান্য সমালোচকের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে 'নিমগাছ' গল্পের মধ্যে কবিত্ব— "নিমগাছ। অভাবিত চমকবাহী একটার পর একটা বাক্যের আনুপূর্বিক অনুক্রমে গড়ে উঠেছে তার বুনট। তারা গদ্যচরিত্র অনুসরণ করে পাশাপাশি বিন্যস্ত নয়, বরং কবিতার পঙ্‌ক্তির মতো ক্রমিক অবতরণে তাদের কম্পোজিশন : "[৯]

তবে উপরোক্ত দুটি বক্তব্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, গল্পটির শেষতম বাক্যের ব্যঞ্জনায় গল্পটি উত্তীর্ণ হয়েছে কবিত্বে। সে হিসেবে এই ব্যঞ্জনা কবিতার সম্পদ। আর কবিই তার স্রষ্টা, গল্পকার নন। আর দ্বিতীয় বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, 'অভাবিত চমকবাহী' একাধিক বাক্যের 'আনুপূর্বিক অনুক্রম' এবং গদ্যের ঢঙ অপেক্ষা কবিতার মতো পংক্তিসজ্জা এই গল্পে কবিত্ব খুঁজে পাওয়ার অন্যতম কারণ। ব্যঞ্জনা যে কবিতার অন্যতম অভিপ্রায় সে কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। আর গল্পকে কবিতার ঢঙে অর্থাৎ কবিতার মতো পংক্তিসজ্জায় কম্পোজ করবার ভাবনা যে নিছকই একটা খামখেয়ালি ভাবনা, আর্ট ফর্ম সম্পর্কে তীব্র সচেতন শিল্পী বনফুল সম্পর্কে একথা বলা বা ভাবাটা একরকম নির্বুদ্ধিতা বলা চলে। তা না হলে গদ্যভাষায় ছন্দের সাহায্য ব্যতীত হাতে গোনা বাক্যের পরিবেশনায় গল্প পরিবেশিত হয়ে পাঠককে ভাবনার মুখোমুখি করাটা সহজসাধ্য ছিল না। কেননা সংরূপ সচেতন বাঙালি পাঠক ছোটোগল্পের গতানুগতিক আয়তনিক পরিসীমা পেরিয়ে বনফুলের স্বল্পায়তন গল্পে পেল ভিন্ন মাত্রা। যা পাঠক-সমালোচককে আবারও ভাবিয়ে তুলল সংরূপ নিয়ে। আর সে সংরূপের প্রাতিষ্ঠানিক নামকরণ হল 'অণুগল্প'। আর অণুগল্পের চেহারার সঙ্গে কবিতার চেহারা প্রাথমিকভাবে সাদৃশ্যমূলক হয়ে বনফুলের গল্পের সঙ্গে দেখা গেল কবিতার নৈকট্য।

তিন.

শুধু অণুগল্পই নয়, বনফুলের ছোটগল্পের আয়তনিক পরিমিতির দিকে লক্ষ রেখে সেগুলি অভিহিত হয়েছে কখনো 'ছোট ছোট গল্প'[১০], আবার কখনো 'গল্পানু'[১১] হিসেবেও। সুকুমার সেন বনফুলের ছোটোগল্পগুলির এই আয়তনের দিকে লক্ষ রেখেই ইংরেজি 'five minute short story'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর কথায়, ". . . বলাইবাবু কতকগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় ছোটগল্প লিখিতেছিলেন, যাহাকে বলে ইংরেজীতে five minute short story আর আমেরিকান সাহিত্যিক গ্রাম্যভাষায় short short।"[১২] স্বল্পায়তন, পরিমিত কথন, স্বল্প বর্ণনা, নির্মেদ, নির্ভার উপস্থাপন অণুগল্পগুলির অন্যতম শর্ত। অথচ সে সংক্ষিপ্তিতেই থাকবে গূঢ়-গভীর ব্যঞ্জনা, যা কবিতার সমগোত্রীয়। অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। সমালোচকের মতে, ঋক্‌বেদী 'অণুলেক্ষ্য', বাইবেলের প্যারাবল, ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্রের আখ্যায়িকা, জাপানি হাইকু, চর্যাপদ এবং যুগবাহিত লোককথাগুলি অণুগল্পের পূর্বসুরী।[১৩] সমালোচকের এও বক্তব্য যে, অণুকবিতার অনুসরণে অণুগল্পের আবির্ভাব।[১৪] যদিও কবিতার ক্ষেত্রে, খুবই ক্ষুদ্র কবিতাকে বলা হয় 'কবিতিকা'।[১৫] আর গল্পের ক্ষেত্রে তা অণুগল্প। তবে একথাও ঠিক "কবিতার মত গল্প অত ছোট হ'তে পারে না। গদ্য গল্প কাহিনীকে অবলম্বন করে যাত্রা করে। কাহিনী প্লটের হাত ধরে আসে। প্লটের অবস্থানের মধ্যে চরিত্রের আনাগোনা অনিবার্য ভাবে আসে। গভীর মনের অতল থেকে উঠে আসে অণুগল্প।"[১৬] অন্য একজন সমালোচকের মতে, "এই বিশেষ আঙ্গিকের গল্পে বাড়তি মেদ-মাংস থাকে না। অণুগল্পে কলমের

ব্যবহার খুবই কম। যেটা থাকে সেটা হল রাবার বা ইরেজারের কাজ। আর তা অতি সূক্ষ্মনিপুণভাবে করতে হলে তার কৌশলটি আয়ত্ত করা চাই। কথন-চিত্রণ ও শৈল্পিক প্রকাশ ভঙ্গিটাই এক্ষেত্রে মুখ্য।”[১৭]

বনফুল এমনতর অণুগল্পেরই সার্থক স্রষ্টা। যদিও এর প্রেরণা খুঁজে পেতে চাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথে। কেননা বনফুলের আগে ১৯২২ সালেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘লিপিকা’র ছোট ছোট রচনাগুলি। ‘লিপিকা’র রচনাগুলিও স্বল্প পরিসরে স্বল্প কথায় স্বল্পাঙ্গিকে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯২২ সালেই ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বনফুলের প্রথমগল্প।[১৮] বনফুল যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপের জায়গা থেকে। যার মূলতম যোগসূত্র ছিল সাহিত্য এবং ‘রবীন্দ্রস্মৃতি’তে তা স্পষ্ট। তাই বনফুল গল্প লেখবার আগে ‘লিপিকা’র আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন থাকলেও, বনফুলের অণুগল্প এবং ‘লিপিকা’র রচনার মধ্যে ফারাক লক্ষ করা যায়। সমালোচকের বক্তব্যেও এ মতের সমর্থন মেলে—

“লিপিকার আঙ্গিকের প্রভাব বনফুলের ছোটগল্পে আছে মেনে নিয়েও বলতে হয় লিপিকার গল্পগুলির ব্যঞ্জনাময় কবিত্বমণ্ডিত ভাষা যা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব তা থেকে বনফুলের গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র। তার গল্পের আয়তন যেহেতু অতি সংক্ষিপ্ত, তাই ভাষা ব্যঞ্জনাময় হবেই অনেক সময়। বনফুলও কবিতার কাছাকাছি পৌঁছেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। তিনিও ব্যঞ্জনার সাহায্যে লক্ষ্যভেদে পৌঁছেছেন। কিন্তু বনফুল এটাও জানতেন যেকোনো সার্থক ছোটগল্প রচিত হয় মানুষকে নিয়ে। মানুষের নিজস্ব যে মর্মকথা, উপলব্ধি, আবেগকেই সংহত পরিমিত শিল্পরীতিতে যথার্থ ও যথাযথ করে তুলতে হবে—”[১৯]

রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’র রচনা এবং বনফুলের ছোটোগল্পের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সে তো পাঠেই বোঝা যায়। তবে লক্ষ করবার বিষয় রবীন্দ্রনাথ ‘লিপিকা’ রচনা করছেন মূলত কবিতার কথা মাথায় রেখে। তিনি সে সকল রচনাকে প্রথম বাংলা গদ্যকবিতা লেখবার প্রচেষ্টা বলছেন। বলবার কথা রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’ রচনার পশ্চাতে ছিল ছোটোগল্প থেকে গদ্যকবিতার আঙ্গিকের ভাবনা। বনফুলের গল্প রচনার পশ্চাতে ছিল ছোটোগল্প থেকে অণুগল্পের আঙ্গিকের ভাবনা। একজন গল্প থেকে লিখতে চাইলেন কবিতা। আর একজন গল্প থেকে লিখতে চাইলেন আরো সংহত গল্প। রবীন্দ্রনাথ গদ্য ঢঙে ‘লিপিকা’ লিখলেও তিনি জানতেন আন্তর গঠনে সেগুলি আসলে কবিতা। তাই সেগুলিতে কবিতার আঁটসাঁট বাঁধুনি না থাকলেও ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। আর বনফুল সচেতনভাবেই অণুগল্প লিখলেও পরিমিতিবোধ বা স্বল্পায়তন তাঁর অণুগল্পগুলিতে এনে দিল কাব্যময়তা। আর তিনি যে গল্পই লিখছেন তাঁর বক্তব্যেই সে কথার প্রমাণ মেলে। একটি সাক্ষাৎকারে বনফুল বলছেন— “মানুষই তো গল্পের আসল বিষয়, মানুষ যদি গল্পের মধ্যে না থাকে, তাহলে সে গল্প গল্পই হয় না। তবে সে গল্প বলার ধরণটা

এবং গল্প বলার সেই শিল্প যদি খুব ভালো না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত পুরনো হয়ে যায়''।[২০]

বনফুল গল্পই লিখতে চাইলেন, মানুষের গল্প, মানুষকে নিয়ে গল্প। আর সে জন্যে তিনি গল্প বলার ধরণ এবং গল্প বলার শিল্পকে দিলেন অণুগল্পের রূপ। তবু সেই অণুগল্পেও লক্ষ করা যাচ্ছে কবিতার ব্যঞ্জনা বা কাব্যধর্মী কিছু গড়ন। বলা বাহুল্য, তা সম্ভবপর হচ্ছে আয়তনিক পরিমিতির কারণে। কেননা আকৃতি স্বল্প হলেও তার গভীরতা কোনো অংশেই কম নয়। তাই স্বল্প কথায় জীবনের গভীরতা যখনই প্রকাশ পেয়েছে, তখনই তা সাধারণ বক্তব্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে অসাধারণত্বের দাবি করেছে, যাকে বলা হয়েছে ব্যঞ্জনা আর যা কবিতার মূলতম সম্পদ। তাই স্বল্প বক্তব্যেই, অণুগল্পের আধারেই বনফুলের গল্পভাবনাতেও কবিতা এসে উঁকি দিয়েছে। তাঁর অণুগল্পের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে কবিতার সামীপ্য। কত কম বলে কত বেশি বলা যায়—এই একান্ত ইচ্ছাই যেন তাঁর এ শ্রেণির গল্পগুলির মধ্যে এনে দিচ্ছিল প্রার্থিত ব্যঞ্জনা, যা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রাপ্য এবং কাম্য। বনফুলের গল্প একাত্ম হয়ে গেছে কবিতার আবহের সঙ্গে। সমালোচকের দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছে— "যে বিষয় নিয়ে বনফুল গল্প লিখছেন, এবং লিখছেন যে আঙ্গিকের তত্ত্বাবধানে, তা নিয়ে তিনি চমকে দেওয়ার মতো কবিতাও লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখলেন না, বরং প্রমাণ করে দিলেন যে কবিতায় নয়, গল্পের গদ্যের মধ্যেই তাঁর আসল সাবলীল স্ফূর্তি ও স্বাচ্ছন্দ।"[২১] যেমন— 'মানুষ' নামক অণুগল্পটিতে টুকরো টুকরো দৃশ্যের কোলাজে জীবনের অভিব্যক্তি। প্রথম দৃশ্যে প্রকৃতির বর্ণনা সৌন্দর্যে পূর্ণ—

গঙ্গা-বক্ষে সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণাতীত সমারোহ। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপনসায়রে নিমগ্ন। সাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্তত উড্ডীয়মান মাছরাঙা পাখিগুলি সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত। টলমল নদীজল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।
প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শোভা।
তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়।
দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধর-দেহ একটি গাভী।
আর একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার।
দেবালয়ে করুণ সুরে নহবৎ বাজিতেছে।
পূরবীর অপরূপ আলাপ।
চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।[২২]

লক্ষণীয় গল্পটির প্রথম ছ'টি বাক্য পাশাপাশি টানা গদ্যে পরিবেশিত। পরবর্তী ন'টি বাক্য কবিতার পংক্তিসজ্জার মতো পরিবেশিত। এই ন'টি বাক্যের পরবর্তী সমস্ত বাক্যগুলি কবিতার মতোই সজ্জিত (দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া)। তবে কবিতাকারে সজ্জিত বলেই গল্পটি কবিতার নৈকট্য দাবি করে তা নয়। গঙ্গা-বক্ষে সূর্য অস্তকালীন

প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং তার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি, যেমন—উড্ডীয়মান মাছরাঙা, নধরদেহী গাভী, মুদিতনয়ন মার্জার, দেবালয়ের করুণ সুরের নহবৎ, পূরবীর আলাপ অনুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে গল্পের মতো ডিটেলে। তবে অতিবর্ণনের ভার এখানে নেই। অথচ আছে বর্ণনার অনুপুঙ্খতা, যা অনুভূতিকে সম্পূর্ণতা দেয়। বাক্যগুলোও কবিতার মতো করে সাজিয়েছেন লেখক। গল্পের গদ্যকে টানা বিন্যাসে না রেখে কবিতার মতো পংক্তিসজ্জায় দাঁড় করিয়েছেন স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবেই।

'মানুষ' নামক গল্পটিরও এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখেই প্রসঙ্গত সমালোচকের এ মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য— "বাক্যের অন্তিমে কমা, সেমিকোলন বা ড্যাশ বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন – কোন কিছুর আশ্রয়েই যেতে চাননি তিনি। শুধু চোদ্দটা অমোঘ পূর্ণচ্ছেদ দৃশ্যটাকে, বলতে পারি জীবন বীক্ষণকেও সেইসঙ্গে, ঠেলে দিচ্ছে তার অনড় এক পরিণতির দিকে। আর বিষয়টাও তো যেন ঋণী থেকে যাচ্ছে এক কবিতা ভাবনার দিকেই।"[২৩] বস্তুত সমালোচকের এ মন্তব্য মূলত এ গল্পের পরবর্তী অংশটিকে উদ্দেশ্য করে, যেখানে গল্পের প্রথম দৃশ্যের বৈপরীত্যে ফুটে উঠেছে আরও একটি দৃশ্য— এক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী এবং ষোল-সতেরো বছর বয়সের এক ভিখারিণী। এদের উপস্থিতিতেও রয়েছে বৈপরীত্য—জরা এবং যৌবন। গল্পকার লিখছেন—

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিনী ইতিপূর্বে আরও দেখিয়াছি।
কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।
ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্য।
ক্ষুধার অন্ন চাই।
ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।
সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে— আর একজন যৌবনকে।
দুজনকেই দুটি পয়সা দিলাম।
চলিয়া গেল।
কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতিকষ্টে ধীরে ধীরে।
মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছু দূর গিয়া সে আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।
মুখে মুচকি হাসি।
নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।
তাহার ছিন্ন বসনের শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।[২৪]

বনফুলের গল্পে চিত্রকল্প সহজলভ্য নয়। তবে এ গল্পখানির পরিবেশনে গল্পকার কবিতার হাত ধরেছেন। গল্পের পরবর্তী দৃশ্য—

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার।
সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, বিড়ালটা একটা ইঁদুর ধরিয়াছে।
ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল।
গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম, দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন
মাতৃস্তনাভিমুখী
বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।
তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।
আকাশে কৃষ্ণপক্ষ মেলিয়া সারিসারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পালতোলা
নৌকাগুলি দেখিলাম জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।[২৫]

সহজ-সাবলীল সাধারণ একটি চিত্র। তবে বিড়ালের ইঁদুর ধরা, গাভী দোহন, বাছুরের করুণ কাকুতি, জাল ফেলে মাছ ধরার চিত্র বর্ণনার সঙ্গে জুড়ে আছে শিকার এবং শিকারীর চিত্রকল্প। সমাজ তথা জীবনের গূঢ়-গভীর সত্যের সঙ্গে তা ওতপ্রোত। একজন শিকার করছে, আর একজন শিকার হচ্ছে। আর জীবনসত্যের উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাবনাটুকু গল্পের পরবর্তী সম্ভাবনার প্রেক্ষিতটিকে ফুটিয়ে তুলে কাব্যব্যঞ্জনার অনুসারী হয়ে ওঠে—

অন্ধকার নামিতেছে।
উঠিয়া পড়িলাম।
পথে দেখিলাম, সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিনী একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া
একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাস্য-পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।[২৬]

আসলে উদ্দেশ্য একটাই— 'ক্ষুধার অন্ন চাই।'[২৭] এমনই কাব্য ব্যঞ্জনায় মুখর হয়ে উঠেছে এ গল্পটি। তুমুল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে গড়ে তোলা এ গল্পেও জীবনের গভীরতম দিকটি ব্যঞ্জিত হয়েছে কবিতারই স্পর্শে। আর তাই এ গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকেরও অভিমত—

"এমন এক-একটা উত্তীর্ণ কবিতার সঙ্গে আমাদের অহোরাত্র নয়, ক্বচিৎ কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়, যেখানে সমূহ বিষয় ভাবনাটাই দাঁড়িয়ে থাকে হয়তো-বা একটা অবিকল্প পঙ্‌ক্তি, অব্যর্থ একটি চিত্রকল্পের ওপর, এমনকি অবধারিত একটি মাত্র শব্দের ওপর। বাকি পঙ্‌ক্তি, বিষয়ের বাকি অনুষঙ্গ, পল্লবিত বিবৃতি, সব যেন অপেক্ষা করে থাকে ওই 'magic word'- এর জন্য, চাবি শব্দের কাছে পৌঁছানোর জন্য। একটা মাত্র পঙ্‌ক্তি, একটা মাত্র অমোঘ শব্দ সরিয়ে নিলেই বোঝা যায় কবিতার সমস্ত শরীরটাই ধসে যাবে এক পলকে। কবিতার হাত ধরে মাঝে মাঝে গল্পও হয়ে ওঠে এরকমই, মৌলিক কোন প্রভেদ থাকে না তাদের অন্তর্চরিত্রে।"[২৮]

আসলে বনফুলের একাধিক অণুগল্পেরই অন্যতম সম্পদ এই 'magic word' বা 'অমোঘপঙ্‌ক্তি', যা তাঁর গল্পে কাব্যধর্মীতা বজায় রাখবার অন্যতম কারণ। বলা বাহুল্য, বনফুলের গল্পের এই সংক্ষিপ্তি, এই মিতায়ন, এই স্বল্পবাক্‌ই তাঁর গল্পে কাব্য ব্যঞ্জনার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে পাঠক অণুগল্প নামক নতুন আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত হতে না হতেই আবারও ফিরে ফিরে যাবে তার আর এক পরিচিত জগত কবিতার কাছে। যেখানে সংরূপের ধাঁধা অপেক্ষা পাঠক মুখোমুখি হবে

আনন্দের, বিস্ময়ের, অভিনবত্বের। বেরিয়ে আসবে ছক ভাঙা ভাবনায়। এমনই আপাত অসম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ অজস্র কবিতাধর্মী অণুগল্পের স্রষ্টা বনফুল।

চার.

বনফুলের গল্পে কবিতা খোঁজার উদ্দেশ্যে 'তিলোত্তমা' গল্পটিকে আলোচনার বাইরে রাখা চলে না একেবারে। 'তিলোত্তমা' বনফুলের এমন একটি গল্প, যেখানে মানুষের রূপ-সৌন্দর্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। যদিও এ গল্পটি যথাযথ অণুগল্পের ঢঙে নয়, তবুও গল্পের অন্তিম ভাষ্য কবিতামুখীন হয়ে উঠেছে বলা চলে। আর তাতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র অণুগল্পের আয়তনিক দোহাই দিয়েই বনফুলের গল্পে কবিতার অন্বেষণ সম্ভবপর হয়েছে, তা নয়। আসলে বনফুলের ছোটোগল্পেও রয়েছে কবিতার সাযুজ্য।

গল্পটির এই শেষাংশ পাঠককে এক অদ্ভুত অনুভূতি এবং আবহের সম্মুখীন করে। শাঁখের আওয়াজে গোকুলের শিহরণ এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ না করবার সিদ্ধান্ত পাঠককে অভিভূত করবার সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র জীবনব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দেয়। বলা বাহুল্য, শাঁখের এই মঙ্গলধ্বনি শুভবোধের, কল্যাণবোধের ইঙ্গিতবাহী, যা শুধু হয়তো গোকুলকেই নয়, গোকুলের জীবন চিত্রের একটি টুকরো দিয়েই সমস্ত মানুষের জীবনের প্রতিও ইঙ্গিত করে। বাহ্য সুন্দরতা ব্যতীত অন্তরের সুন্দরতাকে উপলব্ধি করবার যে অনুভূতি— এর সবটাই তুলে ধরবার জন্য গল্পে স্বল্পভাষী বনফুলকে কোন বিরাট-বিপুল আয়োজনের বা সিরিয়াস কোন তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হল না। অনায়াসেই তিনি জীবনের গভীরতম একটি দিককে উন্মোচন করলেন। লেখকের এই অনায়াস প্রতিভার কথা মাথায় রেখে প্রসঙ্গত সমালোচকের এ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা অবশ্যপ্রয়োজন— "কবিতায় উচ্চারিত শেষ বাক্য যেমন কখনো-কখনো অন্য মাত্রিক হয়ে ওঠে, আমূল বদলে দেয় তার প্রেক্ষাপট, অর্থান্তর ঘটে যায় অন্তিম মুহূর্তে, এও তেমনি।"[২৯]

বনফুলের প্রায় সব গল্পের ক্ষেত্রেই এ বক্তব্য সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এমনই আরও একটি গল্প 'দুই ভিক্ষুক', যেটাকে লক্ষ করেই সমালোচকের এই মন্তব্য। এ গল্পের প্রথম পর্বে দেখে যায়—

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে এক অন্ধ ভিখারী। সে সর্বদা নীরব। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড় পেতে স-সংকোচে বসে থাকে সে। নানা জনের দাক্ষিণ্যে সেই ছেঁড়া কাপড় ভরে ওঠে। খাবারও জমে নানা রকম। তবুও সে নীরব। গভীর রাতে কাপড়ে সঞ্চিত সমস্ত জিনিস ফেলে দিয়ে আসে গঙ্গাগর্ভে। কারণ, "সে যা চায় তা পায় নি। কাপড়টি বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে !"[৩০]

গল্পের দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত হয় ন্যুব্জদেহ স্থবির আর একটি ভিখারী। তার মাথায় জট। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ন্যুব্জদেহ ভিখারী প্রথম ভিখারীর কাছে এসে তার নিজের ভিক্ষার থলিটি উজাড় করে ঢেলে দেয়। প্রথম ভিখারী পুলকিত হয়ে ওঠে। অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে যায় তার। চিৎকার করে বলে, "আমায় ক্ষমা করে যাও মহারাজ,

চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি।"[৩১] এরপর 'ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।'[৩২] এ প্রসঙ্গেই সমালোচকের যথাযথ মন্তব্য— "সম্ভবত ঘুরে দাঁড়াল গল্পের বাকি অংশটাও,— প্রতীকে-চিত্রকল্পে যে উদ্ধর্তিত হয়ে গেল সব কিছু। যা মানায় কবিতায়, স্তর থেকে স্তরান্তরে অর্জিত অর্থের ঘনতা— তা-ই যেন ঘটে গেল এখানে, পলকের মধ্যে, পাঠকের মনে সামান্যতম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে।"[৩৩] আর এ সবকিছুর প্রমাণ রাখল গল্পের বাকি অংশটুকু, যা বনফুলের ভাষাতেই পরিবেশনযোগ্য—

সাহেব বলতে লাগল – "ক্ষমা করো আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত-জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী-জীবন যাপন কর গিয়ে; যদি কোনও দিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহলেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা করো মহারাজ . . . "[৩৪]

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহলে।

"মিস্টার হেস্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজেছি জন্মজন্মান্তর ধরে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই !"

"ক্ষমা করেছ ?"

"নিশ্চয় !"[৩৫]

চূড়ান্ত মুহূর্ত আরও একটু বাকি—

"দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল।

ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পর স্পরকে আলিঙ্গন করলেন !"[৩৬]

মাত্র দেড় পাতা গল্প। সাদামাটা বর্ণনা। কিন্তু অসাধারণ চমক। আর এ চমক প্রাপ্তিতেই গল্পটির সার্থকতা— যা একাধারে গল্প, আবার কবিতারও আস্বাদন এনে দেয়। বনফুলের এমনই অজস্র গল্প যা পাঠককে গল্পের সীমারেখা কখনো অতিক্রম করে, কখনো বা সে সীমারেখা বজায় রেখেও শব্দে, বাক্যে, প্রতীকে-চিত্রকল্পে, ভাবব্যঞ্জনায় কবিতার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এককথায় বনফুলের ছোটোগল্পে কবিতা বা কবিতার অনুভব সহজলভ্য। তা শুধু পর্যবেক্ষণ করবার, উপলব্ধি করবার অপেক্ষা।

পাঁচ.

আলোচনার অভিমুখ বনফুলের ছোটোগল্পের সঙ্গে কবিতার নৈকট্যের অন্বেষণ হলেও, শুধুমাত্র এই একটি সত্তায় তাঁর ছোটোগল্প সীমিত নয়। গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যএবং চরিত্রের বৈচিত্র্যও নজরকাড়া—সাধারণ থেকে অসাধারণ, গরীব-বড়লোক, বৃদ্ধ, যুবা, তরুণ-তরুণী, সুন্দর-কুৎসিত সমস্তরকম সর্বস্তরের মানুষেরা, কখনো বিখ্যাত কোন ব্যক্তিত্বও তাঁর গল্পের চরিত্র হিসেবে এসেছেন। পশু-পাখিরাও বাদ পড়ে নি সে তালিকা থেকে। বলা বাহুল্য, বিষয় এবং চরিত্রভাবনায় বৈচিত্র্য থাকলেও অভিনবত্ব নেই। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে তাঁর ছোটোগল্পের যে বৈশিষ্ট্য তা হল, "তাঁর গল্প-পরিকল্পনার অভিনবত্ব

ও বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি। . . .তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও আকস্মিক তাৎপর্যের উদ্ভাস ও তাঁর কোনো কোনো গল্পের মৌলিকত্ব। আবার অত্যন্ত সংযম ও তির্যকভঙ্গি ও তাঁর গল্পের রীতিগত দিক থেকে একটা কঠিন সংহত বৈশিষ্ট্যও এনে দিয়েছে।”[৩৭]

বনফুলের এই অণুগল্পে কবিতা যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, গল্প যেমন অন্যভাবে পাওয়া যায়, তেমনি বনফুলের অণুগল্পে কোনো সমালোচক গল্প খুঁজে না পেয়ে ভাবের মুক্তিই খুঁজে পেতে চান— “বনফুলের কোনো অতিক্ষুদ্র ‘গল্পানু’-তে কাহিনী নেই বললেই চলে। বিশেষ একটি ভাবকে মুক্তি দিয়েই যেন গল্পগুলি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনো গল্পে আবার কাহিনীর আভাস থাকলেও তা অকিঞ্চিৎকর।”[৩৮] অন্য এক সমালোচকের মতে, “বনফুলের ছোটগল্পের ছোটত্ব যত না বিস্ময়কর, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়কর তার গল্পত্ব। এ একেবারে বনফুলের নিজস্ব দান।”[৩৯]

উপরোক্ত সমস্ত সমালোচনার দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, বনফুলের অণুগল্পে গল্প যদি না-ই থাকে, থাকে শুধু ভাবের মুক্তি, তবে তার কারণেই তা কবিতার এত নিবিড় স্পর্শ লাভ করেছে। আবার বনফুলের অণুগল্পে বা ছোটোগল্পে যদি গল্পত্বও কেউ লক্ষ করে থাকেন, তবে এও লক্ষণীয়, সে অণুগল্প বা ছোটোগল্পের গল্পত্ব কবিত্বকে ছুঁয়ে আছে। ছুঁয়ে আছে পরিসরের দিক থেকে, কখনো উপস্থাপনার দিক থেকে, কখনো সহজ-সরল-অনাড়ম্বর শব্দ-বাক্যের পরিবেশনায়, কখনো প্রতীকী ইঙ্গিতে, কখনো চিত্রকল্পে, সর্বোপরি কাব্য ব্যঞ্জনায়। ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রতীকী ইঙ্গিতই বনফুলের ছোটোগল্পে কবিতার অন্যতম প্রাসঙ্গিকতা। যদিও তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি সহজ-সরল, অলংকারবিহীন, অনাড়ম্বর। তবুও সে সহজাত নতুন ভঙ্গিতেই প্রকাশ পেয়েছে— মানব মনের বিচিত্র ভাবনা। বনফুলের গল্পে যেমন সভ্য সমাজের নর-নারীর প্রেম দেখানো হয়েছে, তেমনি অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে অসভ্য বর্বর জাতির প্রেম। আবার ‘তাজমহল’ এর মত গল্প তো বাংলা সাহিত্যে হাতে গোনা।

তবে ছোটোগল্পের পরিমিতি, মিতভাষণ এবং শেষতম অনভিপ্রেত ব্যঞ্জনায় তাঁর প্রায় সব গল্পেরাই কম-বেশি কবিতার অভিমুখী এবং দীর্ঘ তার তালিকা। আর ফর্ম সচেতন বনফুল এসবের মধ্যে ছোটোগল্পের আক্ষরিক অর্থকে গ্রহণ করে সংহত-পরিমিত প্রকাশে যেন ছোটোগল্পের সঙ্গে যেন কবিতার নৈকট্য আরও বেশি করে রচনা করেছেন। আর বলাটাই বাহুল্য, সে নৈকট্য শুধুমাত্র পরিসরগত দিক থেকেই নয় বা শুধুমাত্র ব্যঞ্জনার প্রকাশেই নয়। কবিতার মতো তৎসম শব্দ বাহুল্য এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল ব্যবহারও তাঁর ছোটোগল্প বা অণুগল্পের গদ্যভাষায় কবিতার মতো ছান্দিক স্পন্দনের অবকাশ রেখে গেছে।

বনফুলের ছোটোগল্পে কবিতার উপাদান বা কবিতার ব্যঞ্জনাগর্ভ আবেদন পাওয়া দুষ্কর নয়। তবুও লেখক বনফুলের ছোটোগল্পে কবি বনফুলের সত্তা খুঁজতে গিয়ে তাঁর ‘ছোটগল্পের গল্প’ নামক গল্পটির মধ্যে দিয়েই বনফুলের ছোটোগল্প সম্পর্কিত ধারণাটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বনফুল বিশ্বাস করতেন মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসকে,

ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছিল পরিমিতিবোধে, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায়। তত্ত্ব, তথ্যের ভার ছোটোগল্পের তন্বী কায়াকে মেদবহুল করবে না। তা হবে নির্মেদ, নির্ভার। আর এসব কিছুর প্রত্যাশা রেখেই বনফুল ছোটোগল্পকে এমনরূপে ধরতে চাইলেন, যার সহজাত, নির্মেদ, নির্ভার প্রকাশ গল্পের সঙ্গে কবিতাকেও অঙ্গীভূত করে দিল এক অনভিপ্রেত ব্যঞ্জনায়। আর এখানেই লেখক বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্র প্রকাশ।

তথ্যসূত্র:

১. বনফুল, 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প', পঞ্চম বাণীশিল্প সং, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৭

২. তদেব, পৃ.৮

৩. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, "বনফুল", প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ.২১

৪. তদেব, পৃ. ২২

৫. তদেব,পৃ.১৪৭

৬. তদেব, পৃ.১৪৭

৭. তদেব, পৃ.১৪৭

৮. পবিত্র সরকার (সম্পা), 'বনফুল শতবর্ষের আলোয়', জগদীশ ভট্টাচার্য, "উন্মেষ পর্বের বনফুল : স্রষ্টা ও সৃষ্টি", নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ.১১৬

৯. 'প্রচ্ছায়া', সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, "কবিতা থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে তাঁর গল্প", জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ.৬৪

১০. 'আত্মবিকাশ', স্বস্তি মণ্ডল, "বনফুলের ছোটগল্পের অভিনবত্ব— অনুগল্প বা গল্পকণিকা", জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃ.৩৩

১১. তদেব, পৃ.৩৩

১২. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ.৩৫৭

১৩. সাহিত্য বাণী, বর্ষ ২৬, সংখ্যা-২, রণজিত মল্লিক, "অণুগল্প : বনফুল ও পেটার বিকসেল", ১৪০৬, পৃ.১২

১৪. তদেব,পৃ.১২

১৫. তদেব, পৃ.১২

১৬. তদেব,পৃ.১২

১৭. প্রচ্ছায়া, অজিত ত্রিবেদী, "বনফুলের অণুগল্প : বিজ্ঞান ও কবিত্বের দ্বৈত শিল্পায়ন", জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ.১০৭(২০)

১৮. আত্মবিকাশ, স্বস্তি মণ্ডল, “বনফুলের ছোটগল্পের অভিনবত্ব— অনুগল্প বা গল্পকণিকা”, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬, পৃ.৩৫
১৯. তদেব, পৃ.৩৫
২০. তদেব, পৃ.৩৫
২১. ‘প্রচ্ছায়া’, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, “কবিতা থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে তাঁর গল্প”, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ.৬৫-৬৬
২২. বনফুল, ‘বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প’, পঞ্চম বাণীশিল্প সং, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ.৬০
২৩. ‘প্রচ্ছায়া’, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, “কবিতা থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে তাঁর গল্প”, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ.৬৬
২৪. বনফুল, ‘বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প’, পঞ্চম বাণীশিল্প সং, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ.৬০-৬১
২৫. তদেব, পৃ.৬১
২৬. তদেব, পৃ.৬১
২৭. তদেব, পৃ.৬০
২৮. ‘প্রচ্ছায়া’, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, “কবিতা থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে তাঁর গল্প”, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ.৬৭
২৯. তদেব, পৃ.৭০
৩০. বনফুল, ‘বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প’, পঞ্চম বাণীশিল্প সং, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ.১৫২
৩১. তদেব, পৃ.১৫৩
৩২. তদেব, পৃ.১৫৩
৩৩. ‘প্রচ্ছায়া’, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, “কবিতা থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে তাঁর গল্প”, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ.৭০
৩৪. তদেব, পৃ.১৫৩
৩৫. তদেব, পৃ.১৫৩
৩৬. তদেব, পৃ.১৫৩
৩৭. শনিবারের চিঠি, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, “বনফুলের ছোটগল্প”, ৫১বর্ষ, ১৩৮৬, পৃ.৩৩
৩৮. কোরক, কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, “বাংলা ছোটগল্পের কাটুম-কুটুম”, মে-আগস্ট, ১৯৯৯, পৃ.৬২
৩৯. কড়ি ও কোমল, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ছোটগল্পের শাহানশা”, বর্ষ-২, মার্চ ১৯৯৯, পৃ.১৪

বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনানন্দের নির্বাচিত কবিতায় আত্মমুক্তির নব আশ্বাস

সুবর্ণা সেন
সহকারী অধ্যাপক, শিলিগুড়ি তরাই বি.এড কলেজ

সারসংক্ষেপ : জীবনানন্দ দাশ ছিলেন বাংলা কাব্য আন্দোলনে রবীন্দ্র বিরোধী তিরিশের কবিতা নামে খ্যাত কাব্যধারার অন্যতম কবি। পাশ্চাত্যের মর্ডানিজম ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজের মধ্যবিত্ত জনমানসের মনন ও চৈতন্যের সমন্বয় ঘটে তাঁর কাব্য সম্ভারের বিভিন্ন ধারাপ্রবাহে। খুব অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাব্যচর্চার সূত্রপাত; মূলত তিনি কবি হলেও উপন্যাস, ছোটগল্প ও কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থও রচনা করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝড়াপালক' (১৯২৭), এছাড়াও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১) প্রভৃতি। তিনি ছিলেন নিভৃত সাধনার লেখক। আবহনান গ্রাম বাংলার প্রকৃতি, নিসর্গচেতনা, পুরাণ, পরাবাস্তবতা, ইন্দ্রিয় বিপর্যাস ও ইতিহাস চেতনায় সমৃদ্ধ এক নিখুঁত শিল্পী। আধুনিক কলার বিভিন্ন তত্ত্বগত প্রয়োগ, শব্দ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভা, কবিতার ক্ষেত্রে উপমা প্রয়োগের বৈচিত্র্য, দাম্পত্য সংকট, নর-নারীর মনস্তত্ত্ব তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত গদ্যস্পন্দন নবীন কবিদের কাছে অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি ষাটের দশকে বাঙ্গালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগ্রামী গণচেতনার উত্থানমূলক আবহ তাঁর কাব্য সমূহের প্রাণবাণী জাগরণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জীবনানন্দের কবিসত্তায় পরিব্যপ্ত এমনই বেশ কিছু বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : মৃত্যু চেতনা, শ্রমজীবি মানুষ, মনুষ্যত্বের অপচয়, বিকারগ্রস্ত রুচিহীনতা, আত্মসুখ, কৃত্রিম অন্নাভাব ।

মূল আলোচনা :

"তোমার কবিতা সেই/ হিরণ্ময় পাত্রের মতন/ আবিষ্কার ক'রে না মোচন!"

(জীবনানন্দ দাশ/দিনেশ দাস)

আধুনিক কবি ও কাব্য সমাজের যুগান্তকারী প্রতিনিধি রূপে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে এ উক্তি নিঃসংশয়ে প্রণিধান যোগ্য। সাহিত্য যে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই সমাজের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা নানা উত্থান পতনময় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী লগ্নে, নানা সৃষ্টির দ্যুতিময়তা সমসাময়িক কালের ক্ষেত্রেও বরই প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বীজমন্ত্র যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তারই

প্রভাব তথা রবীন্দ্রচেতনার পাদস্পর্শে আগত শতাব্দীর নানা পরিবর্তনের পটভূমিকা নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। আর সেই ধারাবাহিকতার পথে একবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পরিসরে আত্মিক সংকট, দ্বন্দ্ব, সংশয় তথা বিশ্বময় এক যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রতিচিত্রে সমাজ ও সাহিত্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে জীবনানন্দ দাশের মতো কবি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এক নব পালক সংযোজন করেছে। পৃথিবীর গভীর ক্ষত, মানুষের অব্যক্ত জীবন জটিলতা, আত্মমুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় উন্মুক্ত নিঃশাসের অভিপ্রায়ে মানব হৃদয়ের আর্তিকে প্রকৃত শিল্পীত আঙ্গিকে তিনি যে রূপ দিয়েছিলেন তা বাংলা কাব্য সমাজকে এক পৃথক দিকে চালিত করে পাঠক হৃদয়ের পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এমনই কিছু কাব্যকে স্থান দিয়ে আলোচনাকে অগ্রসারিত করা হয়েছে।

জীবনানন্দের কাব্য সমূহের বিভিন্ন দিক আলোচনার পূর্বে তার প্রেক্ষাপটগত বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। ররবীন্দ্রনাথের পর বিশেষত ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে আলোচিত কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন অন্যতম কবিতার ধারক বাহক স্থপতি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে কেন্দ্রকরে যে গবেষণা মূলক কাজ হয়েছে সে বিষয়ে তাপস বসুর 'জীবনানন্দ অ্যাকাডেমি' এবং তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনানন্দ চর্চা কেন্দ্র' বিশেষ ভূমিকা তথা পাঠকের হৃদয়ে তাঁর কবিতার প্রতি অনুসন্ধিৎসু মনোভাবকে তরান্বিত করেছে। জীবনানন্দের কাব্যকে পাঠক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বুদ্ধদেব বসুর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে 'প্রগতি' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩৩৫) এ বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং লিখেছেন—

> "জীবনানন্দবাবু বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন ব'লে আমার মনে হয়।... জীবনানন্দবাবুর কাব্য রসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময় সাপেক্ষ।... তাঁর কবিতা একটু ধীরে সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে আস্তে বুঝতে হয়।"[১]

এই প্রবন্ধ মধ্যে জীবনানন্দের বিভিন্ন সময়পর্বে রচিত চারটি কবিতাকে নির্বাচিত করে সেই অনুযায়ী কবির বিভিন্ন কাব্যমানসিক পটভূমিকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে কবি রোমান্টিক মৃত্যুভাবনাকে এক পৃথক শিল্পীত নেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিটি মানুষকে একদিন এই পৃথিবীর মোহমায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। তাই কবির প্রার্থনা মৃত্যুর মোহনবাঁশি প্রতিটি নশ্বর প্রাণের হৃদয়ে অনন্য সুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়ে তাকে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করুক। কবি বারবার এই আর্তধ্বনির অনুরণন 'তোমার বুকের থেকে একদিন' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু চেতনায় একদিকে যেমন এসেছে ক্লান্তি, ব্যাধি, ক্ষয়, অপ্রেম, জাগরণ থেকে আত্মমুক্তির অনুসন্ধানে মৃত্যু কামনা, অন্যদিকে পৃথিবীর মোহ মায়া ত্যাগের আক্ষেপ জনিত মৃত্যুর আগমন। তাই তিনি মৃত্যুকে আপন করে নিতে চান। এই মৃত্যু ভাবনাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে কবির প্রকৃত চেতনা। যে প্রকৃতি কবির কাছে

মাতৃস্নেহ থেকে প্রিয়ার প্রেমের আস্বাদন নিয়ে এসেছে। তাই তিনি নিজ জন্মভূমি বাংলা প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান। কিন্তু মৃত্যু যেন অনন্ত বিচ্ছেদের সুরে কবিকে তাঁর মাতৃসম প্রকৃতির বুক থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে একদিন। এই ভাবনাই আলোচ্য কবিতার ভাববস্তু নির্মাণ করেছে।

জীবনানন্দের এই সনেটে সামগ্রিক ভাবে পেত্রার্কীয় গঠন রীতি অনুসৃত হলেও শেষ দুটি পংক্তি শেক্সপীয়রীয় রীতিতে নির্মিত হয়েছে। মহাপয়ার ও তানপ্রধান ছন্দে তিনি মৃত্যু চেতনা, তাকে অমৃতময় করে তোলার বাসনা, বঙ্গজননীর কাছে এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার অসহনীয় বেদনাকে ব্যক্ত করে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনার স্রোতে অবগাহিত করেছেন। যা অনেকাংশেই বরীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার ভাবব্যঞ্জনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে উন্মুক্ত করেছেন। তিনি তোমার বুকের থেকে একদিন কবিতায় বলেছেন—

> "....যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে, আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে
> দিয়ে হিমের ভিতরে ডুবে যায় ,কুয়াশায় ঝরে পড়ে দিকে দিকে
> রূপশালী ধান একদিন;"[২]

তাই প্রকৃতির প্রতি অসীম আকর্ষণে নিমপ্যাঁচার গান, প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুবাসে, জ্যোৎস্না রাতের প্রতি রূপ মুগ্ধতায় চারিদিকে যে আনন্দের পদসঞ্চারণ সেই সুখানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বাসনা তাকে ভীষণ ভাবে মর্মাহত করেছে। পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দর চাওয়া পাওয়ার মাঝেই যে জীবনের সার্থকতা সেই ভাবনার বীজমন্ত্রকেই তিনি কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত করেছেন—

> "আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
> হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার—"[৩]

তিনি কাব্য মধ্যে জীবনের চরম বাস্তবতার প্রতিচ্ছবিকে দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র বিত্তশালীদের উঞ্ছবৃত্তি করে মেঠো ইঁদুরের মতো জীবন যাপন করার কোন অর্থ নেই। প্রকৃতির অসীম দান যেমন শিশিরের ঘ্রাণ, বাকা চাঁদ, শূন্য মাঠের যে আত্মমুক্তি তা অনেক মানুষই তাদের আত্মোপলব্ধির আলোকে অনুভব করতে পারেনা। তাই হতাশার সুরে তিনি জানিয়েছেন অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু যেকোন সময় এই জীবন কেড়ে নিয়ে চলে যেতে পারে। তাই কবি আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন যে মৃত্যুর পদধ্বনি সত্য হলেও মানুষ তার কৃত্রিম বিলাসিতায় মগ্ন থেকে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। নিরীহ খরগোশের উপর বাঘের থাবা বা কালিদহের আকস্মিক ঝড়ে কমলের নাল ভাঙা বা গাঙচিলের নিষ্ঠুরতম হিংসার স্বীকার হয়ে শালিক যেভাবে প্রাণ হারায়; ঠিক সেভাবেই মৃত্যু আমাদের জীবনে উপস্থিত হয়ে সবকিছু তছনছ করে দেয়। তাই তিনি অবিচলিত ভাবে মৃত্যুকে বরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

> "তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
> কৃষ্ণা যমুনার নয়— যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ

লেগে থাকে চোখে মুখে—”[৪]

তাই বলা যায় কবি জীবনানন্দ গ্রাম-বাংলার সাধারণ উপকরণে যেমন— কৃষ্ণা বা যমুনার জলে নয়, অপরিচিত নদী, মাঠে, ঘাটে, সামান্য গাঙুরের জলের ঘ্রাণে তৃপ্ত হতে চান। এই বাংলার মোহনীয় উপলব্ধি তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে পরিশেষে অমরলোকে যাত্রা করবে এই হল তাঁর বাসনা। তাই মৃত্যু মুহূর্তে তিনি বলে ওঠেন—

“রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি
অর্ধনারীশ্বর।”[৫]

হরগৌরীর মিলনের বাণীকে বাঙ্ময় করে তাই পরিশেষে অর্ধনারীশ্বর শব্দের ব্যবহারে প্রেমের গভীরতাকে ব্যক্ত করে কবি নিজে শিব হয়ে গৌরী রূপী প্রকৃতির সঙ্গে এক ও অভিন্ন সত্তায় মিলিত হয়ে নীল মৃত্যুর আবেষ্টনে কবিতার ইতিরেখা টেনেছেন। চৈতন্য ও জড়ের মিলনে মৃত্যুর মোহনবাঁশীর সুর তাই কবির কাছে বৈদেহী মিলনের রম্য আস্বাদনকে পূর্ণতা দিয়েছে।

জীবনানন্দের বহু আলোচিত কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ‘রাত্রি’ কবিতাটি। এখানে রাত্রির গভীর রহস্যময়তা ও এর অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ-মাধুর্যের বাতাবরণে নগর জীবনের বহুব্যাপ্ত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতায় কবি ও এক নিগ্রো বৃদ্ধের চোখে কলকাতা নগরীকে দেখার আস্বাদন চিত্রকে অভাবনীয় ভাবব্যঞ্জনায় কখনো সুখকর, কখনোবা আতঙ্কের প্রতিচিত্রে তুলে ধরেছেন। কবিতায় এসেছে জীবন বাস্তবতার ভয়াবহ রূপচিত্র যেমন— কুষ্ঠরোগীর হাইড্র্যান্টের জল চেটে খাওয়া, রাত্রির নির্জনতা ভেদকারী মোটর গাড়ি, রিক্সার ছুটন্ত রূপ, ইহুদী নারীর গান, হেটে যাওয়া ফিরিঙ্গি যুবকের পদধ্বনি, বেন্টিক স্ট্রীট, টেরিটিবাজারের বানিজ্যিক পরিমণ্ডল প্রভৃতি যান্ত্রিক জীবনের নিয়ত ক্রমগ্রাসমান সভ্যতার অভিশাপে যেখানে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলে। যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হতে হতে এই নগরীর উজ্জ্বলতা কৃত্রিম যান্ত্রিক সভ্যতা হনন করে। এককথায় ‘রাত্রি’ কবিতায় কবি অনভ্যস্ত অন্ধকারে নিশাচর জীবনের ভয়াবহতা বা বিষণ্ণতাকে আবেগদরদী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘নবজাতক’ কাব্যের ‘রাত্রি’ কবিতার বহু প্রসঙ্গ তুলনীয় হয়েছে। রাত্রির আধার জয়কারী মন্ত্রের বাণী উচ্চারণ করে জীবনানন্দ এক চরম সত্য তথা মানবজীবনের দুঃসহ বেদনাকে তুলে ধরেছেন—

“হাইড্র্যান্ট খুলে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।”[৬]

প্রবল ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের মনুষ্যত্ব ভূলণ্ঠিত হয়, এই উক্তি যেন তারই সমার্থক। তাই এই পিপাসা মানসিক থেকে দৈহিক দুটি ধারাপথেই বিচার্য হয়েছে। কুষ্ঠরোগীর বিকার যেন সেই মানসিক সুস্থতাকে হারিয়ে ফেলার দিকেই পাঠক হৃদয়কে অভিগামী করেছে। সেই সঙ্গে কবিতায় এসেছে নগর সভ্যতার বিকৃত রূপ, রাত্রির

রহস্য তথা ছলনাময় প্রতিবিম্ব। যান্ত্রিকতা, বোধহীনতা যেখানে এক গাড়লের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতার কড়াল স্রোত বিশেষত মোটরকারের রিক্সার জায়গা দখল করার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের আত্মহননের পথকে তরান্বিত করেছে। তাই মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে।

কবি মাইলের পর মাইল হেটে বণিক সভ্যতার এই রূপ দেখে ব্যাথিত হন। বেণ্টিক স্ট্রীট আর টেরিটিবাজারে চিনেবাদানের মতো বিশুদ্ধ বাতাসে কবিপ্রাণ আজ ক্ষত-বিক্ষত। যেখানে কোন মানবিক সম্পর্ক নেই, আছে শুধুই স্বার্থ। বারাঙ্গনাদের জীবনযুদ্ধ, রাত্রির পরিবেশে নির্মিত হওয়া কামনার স্থূল পরিমণ্ডল, নানা বানিজ্যিক পসরা প্রভৃতি উপকরণে কবির চোখে তাই কলকাতার রাত্রি হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অভাবনীয় রূপকল্প। যে পৃথিবী সব কিছুতেই সচল হলেও শুধু মানবিক প্রেমে আজ মৃতপ্রায়। তাই কবির লক্ষ্য করা হুণরাজা অ্যাটিলা, জার্মান অধিপতি হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ, তাদের পাশবিক অত্যাচার ও অমানবিকতার কাহিনী, বিশ্বময় এই অর্থ, কাম, পণ্যের বিস্তারে নিগ্রো আফ্রিকান মানুষটির দৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। কারণ আদিম অরণ্যে এখনো যে জীবন আছে তা এই নগরসভ্যতায় নেই।

> "তবু জন্তগুলো আনুপূর্ব— অবৈতনিক,
> বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।"[৭]

এক অভাবনীয় উপমা ও রূপকের চিত্রকল্পের সমাহারে তিনি রাত্রির জীবন্ত প্রতিকৃতিকে বাস্তবগ্রাহ্য পটভূমিতে দণ্ডায়মান করিয়েছেন। তাই কবিতাটির পরিশেষে একথাই বলা যায় যে মহানগরীর ক্লেদাক্ত, বানিজ্যিক রূপ, যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসন। প্রেম, প্রতীক্ষার চিত্রে কবি বিস্মিত হলেও তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরস্থ আশাকে জীবিত রেখেছেন। এমনকি তিনি রাত্রিশেষে নব আশার বাণীকে প্রজ্জ্বলিত করে কবিতার ইতিরেখা ঘোষিত করেছেন।

জীবনানন্দের আরো এক কালজয়ী কবিতার মধ্যে অন্যতম হল তার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি। শতাব্দীর এক ভয়াবহ পরিবর্তনকামী ও ধ্বংলীলার আবহে মানব প্রবৃত্তির নানা ক্রুর দিক যেমন লোভ, হিংসা, যুদ্ধোত্তর বিশ্বের রক্তপাত শুধু পৃথিবীকে নয়, কবির হৃদয়কেও সমানভাবে আহত করেছে। প্রাক্স্বাধীনতা পর্বে নগর কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালোবাজারী সম্প্রদায়ের মুনাফা লাভের আশায় কৃত্রিম অন্নাভাব সৃষ্টির মতো বিষয়, তা থেকে উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ, ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের উন্মাদনা, ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট শুরু হওয়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয়াবহতা কবি জীবনানন্দকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তুলে এক কঠিন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখে দাড় করিয়েছিল। তাই এই অন্ধকার থেকে নবআলোর আশাকে নিয়ে তিনি দশটি স্তবকে রচনা করেন '১৯৪৬-৪৭' নামক অসাধারণ কবিতাটি। তিনি এই কবিতায় সমাজ তথা ব্যক্তির সংকটকে অভ্রান্ত ভাবে নির্মিত করে কবিতার ছত্রে ছত্রে

মানুষের সততার অভাবজনিত নানা দিককে, ছলনা, শঠতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, নারীর প্রতি অবমাননার ভয়াবহ পরিণামকে চিহ্নিত করেছেন।

"কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে— মনে হয়
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।"[৮]

কবিতাকে তিনি এরপর এগিয়ে নিয়ে গেছেন নাগরিক জীবনের ক্লেদাক্ততা পূর্ণ প্রতিচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে বলেছেন সহজ সরল মানুষের জীবনপর্যালোচনার কথা।

"তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থির ভাবে পেলে ভালো হতো।"[৯]

এসেছে অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ঈশ্বরপাটনীর সন্তান প্রীতির প্রসঙ্গ। একদিকে নগর সভ্যতার কর্দমাক্ত প্রতিকৃতি অন্যদিকে বাংলার শ্রীহীন চালচিত্র, মনুষ্যত্বহীনতার মধ্যে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি রূপে 'নবান্ন' উৎসবের স্মৃতি কবিকে আবেগাপ্লুত করেছে। নতুন চালের গন্ধ, পাখিদের কলকাকলি, গ্রাম্য উৎসবের আমন্ত্রণের আনন্দ, বধূদের শাঁখ বাজানো, প্রেম-প্রীতির নম্রবন্ধনের এই সারল্য চিত্র আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, জীবন পরিবর্তনের এই পটচিত্রে এসব চিত্র বিলুপ্তপ্রায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থটির কথা বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। কবিতায় কবির দৃষ্টিতে গ্রাম-বাংলার অভাবনীয় কিছু চিত্রপঠ নির্মিত হয়েছে—

"চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো
ধানের অদ্ভূত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগদির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে-বিবাহের কিছু পরে-সন্তানের জন্মাবার
আগে।"[১০]

কৃষিভিত্তিক সমাজের এই ছোট প্রাণোচ্ছল ছবিটি কবির 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের 'অবসরের গান' কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে সমান ভাবে সমতুল্যতা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবিতাটি তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলীবাকের উপকথা' প্রভৃতি উপন্যাসের মৃত্তিকা সংলগ্ন জীবন চিত্রের সঙ্গে একই মাপকাঠিতে বিশ্লেষ্য হয়েছে। এভাবেই কবি মানব প্রবৃত্তির নানা অভিঘাতে ব্যথিত চিত্তের কথা কবিতার বিভিন্ন পরিমণ্ডলে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সভ্যতার আগ্রাসন, বিনাশকালের যন্ত্রণা, নগরীর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস, কৃত্তিম আত্মকেন্দ্রিকতায় ভিড়ে উচ্চারণ করেছেন এ যুগের আলো আজ নির্বাপিত। এমনকি আজ তিনি পৃথিবীতে মাতৃগর্ভের নিরাপত্তার আশ্রয় প্রদান করার আশ্বাসে বুক বাধেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের রক্ত প্রহরের ইতিরেখা কামনা করে তিনি পৃথিবীময় প্রশান্তির নির্মলতা আশা করেছেন। তাই কবিতার শেষে

মানুষের চেতন স্তরের পথ চলার মাঝে যে নবপ্রভাতের দীপ্তি সেই আশাকে উজ্জ্বল বাণীরূপ দিয়ে কবিতার ইতিরেখা ঘোষণা করেছেন।

কবির অভিজ্ঞতার এক অনন্য নজির 'তিমির হননের গান' কবিতাটি। এক অস্থির আবেষ্টনী, তিক্ত অভিজ্ঞতা জীবনের প্রতিরূপ অন্বেষণের স্পৃহা থেকে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মসুখের বিচিত্র রূপ এই কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই তিনি আশা রাখেন তিমির বিলাসে নয়, তিমির বিনাশেই মানব সভ্যতার সত্যরূপ উন্মোচিত হতে পারে। মাত্র একটি স্তবকে লিখিত কবিতাটিতে কবির ক্ষোভ, বেদনা, অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রতিবিম্ব গভীর ভাবনার আলোকে ব্যাপ্তি পেয়েছে। তিনি কবিতায় একদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবজীবনের দুর্দশাময় চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি জীবনের ইতর মানুষের প্রতি জীবন দৃষ্টিকে প্রতিফলিত করেছেন ঠিক এভাবেই—

> "লঙ্গর খানার অন্ন খেয়ে
> মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
> নর্দমায় নেমে—
> ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
> নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।"[১১]

এই মধ্যবিত্ত জীবনে তাই কবির মনে হয়েছে একমাত্র সূর্যালোক যাদের মনে মনোরম ছবি এঁকে দিতে পারে। যা কবির ভাষায়—

> "মধ্যবিত্ত মদির জগতে
> আমরা বেদনাহীন— অন্তহীন বেদনার পথে।"[১২]

জীবনের নানা আলোড়ন, হতাশা, ভদ্রসমাজের আত্মকেন্দ্রিকতা, সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা, ইতর শ্রেণির জীবন; যাদের ভোগ-বিলাস তথা আত্মসুখী পূর্বপুরুষের আত্মগৌরবে সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। যাদের চেতনা বিবেক চিরঘুমের জগতে নিমজ্জিত, অথচ এরাই অপরের দুঃখে বিষণ্ণতার অভিনয় করে। কবির এই মানসিকতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বিবৃত বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতার মানসিকতাকে অনেকাংশেই স্পর্শ করেছে। জীবনের স্বাদ যেখানে ক্ষুধায়, পিপাসায়, কামে, মমতায়, স্বার্থসংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ। জীবনান্দের ভাষায় যা—

> "এরা সব এই পথে;
> ওরা সব ওই পথে— তবু
> মধ্যবিত্তমদির জগতে
> আমরা বেদনাহীন— অন্তহীন বেদনার পথে।"[১৩]

মহানগরীর এই কদর্যতা, মনুষ্যত্বের অসম্ভব অপচয়, বিকারগ্রস্ত রুচিহীনতা, আত্মসুখের মোহের মাঝেও কবি নব আশায় বাঁচতে চেয়েছেন। তিনি মানুষের দুঃখে কাতর হয়েও নব জীবনের আশার আলোয় নতুন ভাবে জীবনদৃষ্টিকে উন্মীলিত করে 'তিমির হননের গান' কবিতার শেষে সকল অন্ধকারকে পর্যদুস্ত করে নতুন চলার

আলোকসঙ্গীতে চতুর্দিক মুখরিত করেছেন। একদিকে ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বৈরতান্ত্রিক পটভূমিতে মানুষের অস্থিরতা সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচর্যার উন্মত্ত রূপকে তুলে ধরে আত্মার অন্ধকারকে দূরীকরণের আস্বাসে ও মনুষ্যত্ব বিকাশের বিজয়কেতন উড়িয়ে 'তিমির হননের গান'কে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

তাই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে একথাই বলা যায় যে, কবি কোন কাল্পনিক রোমান্টিকতার পেলবতায় নয়, সমাজের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরে আত্মোৎকর্ষের সাধনা করেছেন। নির্বাচিত চারটি কবিতাও যেন জীবনমুখী বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রতিমূর্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে। সেই সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়েছেন প্রকৃতির অসীম প্রীতিপূর্ণ বন্ধনের আবহে। নাগরিক কদর্যতা থেকে মুক্তির আশ্বাসে এই প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনেই কবির আত্মার চিরমুক্তি সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে স্বীকার করেই তিনি বাংলা কাব্য জগতকে যে ভাবে ও ভাষায় তথা তাঁর সৃষ্টির জাদুতে সমৃদ্ধ করেছেন তা নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে ব্যাপক প্রশংসার দাবি রাখে একথা বললে অত্যুক্তি হয়না।

তথ্যসূত্র :

১। 'জীবনানন্দ : শ্রাবস্তীর কারুকার্য' : ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩।
২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৯।
৪। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬২।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৫।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৯।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭১।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৫।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৭।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। ত্রিপাঠী, দীপ্তি : 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৫, আগস্ট ১৯৫৮,

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৭, অগ্রহায়ণ ১৪১৪।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত : 'আমার জীবনানন্দ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ স্বাধীনতা দিবস, ১৪১২, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫।

৩। মুখোপাধ্যায়, ড. বাসন্তীকুমার : 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৬৯, সপ্তম সংস্করণ : মার্চ, ২০০৯।

কিন্নর রায়ের ‘প্রকৃতি পাঠ’: আধুনিকতার করালগ্রাসে নবপ্রজন্মী ভাবনা

সুকন্যা মাইতি
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাম্প্রতিককালের বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক অন্যতম কথাকার হলেন কিন্নর রায়। বিশ শতকের সত্তরের দশকের, এই সাহিত্যিকের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছেন। বিপন্ন পরিবেশ নিয়ে তিনি একাধিক গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর এরূপ একটি রচনা হলো ‘প্রকৃতি পাঠ’ উপন্যাসটি। উপন্যাসে ‘প্রকৃতি’ শুধু গাছ নয় আমাদের সমগ্র পরিবেশ কে সূচিত করে, আর এই ‘প্রকৃতি পাঠ’ হল, পরিবেশ দূষণের প্রত্যেকটি স্তরের নিখুঁতভাবে তথ্যমূলক পাঠের উপস্থাপনা। বর্তমান সমাজে আমরা অতি মডার্ন হতে গিয়ে পরিবেশের ওপর প্রভুত্ব করে, সমূলে বিনষ্ট করে, পরিবেশ দূষণের এক মারণ উল্লাসে মেতে চলেছি। চারিদিকে শুধুই ইট-কাঠ-পাথরের সমারোহ। পরিবেশ থেকে পাখিরা হারিয়ে যাচ্ছে, পাখি বিক্রেতাদের পেশা আজ মাংস বিক্রি। উপন্যাসে পরিবেশবাদী আন্দোলন হিসেবে, চিপকো আন্দোলন, ক্যালকাটা মাই লাভ আন্দোলনের কথা উঠে আসে। আমরাও সমাজে দেখনদারির আলোকে এরূপ আন্দোলনে সামিল হই, যা শুধু অলীক প্রতিশ্রুতি হয়েই থেকে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ার অতি ভয়ানক আগ্রাসন, যন্ত্র সভ্যতার বিপুল দাসত্ব গ্রহণ, নিজ সংস্কৃতির অবমানয়িতা, পরিবেশ দূষণের তীব্রতা, লোভী মানসিকতাকে পাথেয় করে এ কোন শ্রীহীন লাবণ্যময়ী আধুনিকতার গর্ভে আশ্রয় নিচ্ছি আমরা? লেখক আমাদের ও ভাবী প্রজন্মের কাছে এরূপ কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ রেখে গিয়েছেন এবং সচেতনতার বার্তায় এই মহামারী থেকে সংশোধনের আশা প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাস, পরিবেশ সংক্রান্ত হিতকর তথ্যে পুষ্ট হওয়ার পাশাপাশি পাঠকদের মধ্যে নবচেতনাবধ জাগ্রত করে। বর্তমান সমাজের এরূপ পরিবেশ বীভৎসতায় এই ধরনের উপন্যাস সঞ্জীবনীর ন্যায়। আলোচ্য উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, আধুনিকতার করালগ্রাসে নব প্রজন্মী ভাবধারার অনুসন্ধানই, এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধটির মূল অভিপ্রায়।

সূচক শব্দ: পরিবেশ বিপন্নতা, একুশ শতক, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি, যন্ত্র সভ্যতার আগ্রাসন, মনুষ্যত্বের বিপর্যয়, লুপ্তপ্রায় জনজীবন, আধুনিক ভোগবিলাসিতা, নবপ্রজন্মী ভাবধারা, ইকো ক্রিটিসিজম প্রভৃতি।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যে সত্তরের দশকের অন্যতম প্রাণপুরুষ হলেন কিন্নর রায়। লিটল ম্যাগাজিনের অধিক পরিচিত এই লেখক, নিজেকে সর্বদা একজন অক্ষরকর্মী হিসেবেই পরিচিতি দিয়েছেন। পপুলিজমের সঙ্গে ক্লাসিক সাহিত্যের কোনও বিরোধ আছে না সাযুজ্য আছে না ভালবাসা আছে তা ঠিক জানি না -একথা স্বীকার করেই বাস্তব সমাজের নানা সমস্যা, ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে তাঁর একাধিক রচনায় উঠে এসেছে নিঁখুতভাবে। এরূপ একটি উল্লখযোগ্য রচনা হল তাঁর 'প্রকৃতি পাঠ' উপন্যাসটি। আলোচ্য রচনায়, আধুনিকতার করালগ্রাসে পরিবেশ বিপন্নতার মধ্য দিয়ে তিনি নবপ্রজন্মী ভাবনাকে, সচেতনতার বার্তায় রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন।

'প্রকৃতি পাঠ' উপন্যাসটির পটভূমি হল কলকাতা, আর পরিবেশ সচেতনতার প্রতিভূ হলেন নায়ক সতীপ্রসন্ন। উপন্যাসে উল্লিখিত সমস্যা শুধু কলকাতার নয়, বর্তমানে তা সমগ্র বাংলার, আধুনিক সভ্যতার অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক ভোগবাদী জীবনে আরাম-আয়েস, বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী উৎপাদনার্থে আমরা 'প্রকৃতি শোষক' হয়ে উঠছি। একদিন মানুষ জঙ্গল সাফ করে নিজের বাসযোগ্য ভূমি তৈরি করে নিয়েছিল, বর্তমানে সজ্ঞানে সে আবার এক ভয়ঙ্কর জঙ্গল তৈরির নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছে, তবে তা গাছপালার জঙ্গল নয়; ইঁট-কাঠ-পাথরের এক বিষাক্ত জঙ্গল। আলোচ্য উপন্যাসে নায়ক সতীপ্রসন্ন এ প্রসঙ্গে বলেছেন-"বহুতল বাড়ি নামিয়ে দিচ্ছে জলের স্তর, বে-আইনি কনস্ট্রাকশান ভেঙে পড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। মানুষ তার সুবিধের জন্য শাল গাছ কেটে, অরণ্য ধ্বংস করে লাগাচ্ছে ইউক্যালিপটাস, যা জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে সমস্ত বনভূমির"।[১] যে প্রকৃতি মানুষকে নতুন জীবন দিয়েছে, বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে চলেছে, মানুষ নিজেকে সেই প্রকৃতির প্রভু হিসেবে অনাহ্য দাবী করে, নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক সতীপ্রসন্নর ভাবনায়-"একটি গাছ মানুষকে পঞ্চাশ বছরে যত অক্সিজেন দিয়ে যায়, এখনকার হিসেবে তার দাম পনের হাজার সাতশ টাকা। গাছ তো আরও কত কি দেয় মানুষকে- ছায়া, সবুজ, বৃষ্টি, কাব্য। এমনকি জীবন দায়ী ওষুধও। পঞ্চাশ বছরে একটি বৃক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি সম্পদ দেয় মানুষকে। মানুষ লোভে, মূর্খ স্বপ্নে, সেই অরণ্য নষ্ট করে"।[২]

পূর্বে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, দোসর সত্যচরণের হাতে পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছিল বলে, শেষ পর্যন্ত তার সেই পাপবোধ থেকে সে আদিম দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে আক্ষেপ করেছে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে প্রকৃতির অতিপ্রভাব কিন্তু, মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথে কখনই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, সামান্য একটা পুকুরকেও এই বীভৎসতা থেকে রেহাই দিতে চায়নি। কলকাতার পার্ক ময়দান নিয়ে যে সামান্যতম খালি জমিটুকু ছিল, সেখানেও মানুষ ইঁট-কাঠ দিয়ে মুড়ে দিতে চাইছে। চিড়িয়াখানার জমিকে ছাঁটাই করে

গড়ে তুলেছে আকাশ চাটা পাঁচতারা। লেখক তাই আক্ষেপ করে বলেছেন-‘হায় কলকাতার সবুজ!’ বর্তমানে এই অত্যাধুনিক জীবনে আমরাও শুধুমাত্র লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে পৃথিবীর যেটুকু অংশ ফাঁকা পাচ্ছি, সেখানেই ইট কাঠ দিয়ে উচু উঁচু ইমারত গড়ে তুলে মনুষ্যত্ব জাহির করতে চাইছি। কিন্তু এ নিয়ে প্রকৃতির কি হলো বা সমগ্রের কি ক্ষতি হলো সেদিকে কারোর কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না, নিজের গরজটুকু মিটলেই হল।

গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা জমিদারদের বিলাসবহুল ও দেখনদারি সংস্কৃতির আলোকে বাবুসংস্কৃতির আধিক্য ছিল ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ উপন্যাসে। পরবর্তীতে সেই কলকাতা অনেকটাই বিদেশীয়ানার প্রতি মোড় নিয়েছে। তাই কলকাতানিবাসী সুধাপ্রসন্নর ছেলে প্রত্যুষপ্রসন্ন কানাডায় সেটেল করার সূত্রে তার ছেলেরা সগর্বে নিজেদের কানাডিয়ান বলে পরিচয় দেয়। কলকাতা সম্পর্কে তাদের ধারণা-“এ শহর এত স্টাফি, কি রাশ! ডাস্ট, ডার্টি। বিলো প্রভার্টি লাইনের নিচে এসব মানুষ কেমন করে থাকে এ শহরে”।[৩] সুধাপ্রসন্নর হাত ধরে কানাডিয়ান নাতি ইগলু বারোয়ারি প্যান্ডেলে যখন যায়, বাঙালির আরাধ্য কালীমূর্তি দেখিয়ে দাদুকে প্রশ্ন করে- ‘হু ইজ দ্যাট হুলা হুলা ডান্সার’? এর থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাঙালি সংস্কৃতি বর্তমানে কোন সম্মানের শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে! ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ উপন্যাসে ঊনিশ শতকে কলকাতার যে চিত্র পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণীর মানুষ হঠাৎ আর্থিক দিক থেকে ফুলে ফেঁপে উঠে, বিলাসী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে বাবু সংস্কৃতির। পাশাপাশি চড়ক পার্বণ, বারোয়ারি পুজা, রথ, দুর্গোৎসব, রামলীলা প্রভৃতির কেন্দ্রে বাঙালি সংস্কৃতিরই আধিক্য ছিল। কিন্তু লেখক সত্তরের দশকের কলকাতার যে সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বাঙালিয়ানার ছাপ অনেকটাই সীমিত। তবে উনিশ শতকে ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’য়, যে বাবু সংস্কৃতির আধিক্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে তা বিদেশিয়ানার প্রতি মোড় নিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরাও সেই বিদেশী সংস্কৃতিকেই সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, নিজ সংস্কৃতির মানহানি করে। বর্তমানে বাঙালি সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে, ওয়েস্টার্ন ফ্যাশনে পরিবর্তিত হয়ে এক বিকৃত বাঙালি সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে ক্রমাগত।

আধুনিকতার মোড়কে আধুনিক বাঙালি মধ্যবিত্তের পয়সা খরচের ধারা পাল্টে গেছে। পূর্বের মতো তার আর পাখি পোষার জায়গা নেই, পাখির খিদমত করার মতো সময় নেই। তাই এখন দেখা যায়, ৫০০ বা ৭০০ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের টবে, বড়জোর মানিপ্লান্ট বা অ্যাকোরিয়ামে রঙিন মাছ। সুধাপ্রসন্ন আক্ষেপ করে বলেন- “বাতাসের ধোঁয়ায় সেইসব জোনাকিরা যে কোথায় গেল! কত পাখি ছিল কালীঘাটের বাড়ির আশেপাশে, এখন শুধু কাক কি চড়াই নয়তো শালিখ। বাড়ির খাচায় বন্দী টিয়া, চন্দনা, কোকিল”।[৪] ওয়াইল্ড লাইফ রক্ষকদের তাড়নায় অনেকেই বৃত্তি বদল করে মুটে

মজুর হয়েছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, মুটে মজুর বা অন্য কোন দৈহিক শ্রমের কাজে চলে গেছেন মানিকতলার বাঁশের খাঁচা তৈরি করা ডোমেরা, নারকেলডাঙ্গার তারের খাঁচা তৈরীর কারিগরেরা। এত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, বেজি মেরে তার পেটে খড় ঢুকিয়ে স্টাফ করে ফুটপাতে বিক্রি করা হয়। রাতের পর রাত পয়সার জন্য বিদেশে ব্যাঙের ঠ্যাং পাঠানো হচ্ছে, কারণ এটা খুব দামি খাবার। শো-কেস সাজানো সামগ্রী হিসেবে মৃত কাঠবিড়ালি, ময়না, ফুলটুসি, টিয়া,বেনে বউ, ডানা মেলা চিল, মাছরাঙ্গা প্রভৃতি পাওয়া যায়। বর্তমান সমাজেও, এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ কাজের প্রভুত্ব করে চলেছি আমরা, কিন্তু এইসব অন্যায় নিয়ে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করার মত সাহস কারোর থাকে না, তা কেবল কোনো বিশিষ্ট স্থানে উজ্জ্বল বক্তৃতার আঙ্গিকেই থেকে যায়। ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টের টানাপোড়নে পাখি ব্যবসায়ীরা বর্তমানে অনেকেই মুরগির মাংস বিক্রির লাইনে চলে যাচ্ছেন, কারণ বাজারে পাখি রক্ষকের পরিমাণ এর চেয়ে ভক্ষকের লালসার পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই টিকে থাকার জন্য, বাজার অনুযায়ী মানুষকে তার পেশা তো পরিবর্তন করতেই হবে!

বিংশ শতাব্দীর শেষে দাঁড়িয়েও সতীপ্রসন্নর মত একজন সংস্কারমুক্ত মানুষও যখন সন্তান না থাকার যন্ত্রণায়, বৃদ্ধ বয়সে এসে একজন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে, তা প্রথমত একজন পুরুষ সন্তানের জন্যই। এর থেকে আমাদের বর্তমানে উন্নত সমাজের মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট। যদিও দাদা সুধাপ্রসন্নর পরিবারের চিত্র তার সেই আক্ষেপ মিটিয়ে দেয় খুব সহজেই। বাবা মা তার ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিমিত্ত বিদেশে পড়তে পাঠায় ঠিকই, তবে বৃদ্ধ বয়সে তারা আশা করে যে, তাদের ছেলেমেয়েরা যেন তাদের পাশে থাকে; কাছে থেকে সুখ-আনন্দ পাওয়ার সামান্য আকাঙ্ক্ষাটুকু তাদের থাকে। কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা কয়েকটা চিঠি, রঙিন ফটোগ্রাফ আর কিছু ডলারের কৃত্রিম মায়ায় মিটিয়ে দিয়ে তাদের যথাযোগ্য কর্তব্য সাধন করে। আমাদের বর্তমান সমাজের কোটরে কোটরে এই দৃশ্য এখন অতি সহজলভ্য; তাই বৃদ্ধ বয়সে বাবা মার স্থান - হয় বৃদ্ধাশ্রম, নয়তো সঙ্গহীন সেই প্রাচীন বাড়ির কোণায়। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা, সতীপ্রসন্নর তুলনায় অনেক বেশি ধ্যানধারণায় পুষ্ট হয়েও, পুরোপুরি সংস্কার মুক্ত হতে পারি নি। পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কম হলেও, আজও কিছু কিছু সংস্কার মুক্ত বিত্তবান পরিবারের মধ্যেও সেই নিকৃষ্ট মানসিকতা বর্তমান।

টিভি ও অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিডিয়ার আগ্রাসনের ফলে সতীপ্রসন্নর মত সামান্য পত্রিকার সম্পাদক/প্রকাশকদের বর্তমানে অস্তিত্বের সংকট। বর্তমানে, আধুনিক সমাজেও বাংলা বইয়ের বাজার অতি মন্দা, বইয়ের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ স্যোসাল মিডিয়ার ভয়ানক আগ্রাসন। বাংলা বইয়ের পাঠক সংখ্যাও নগণ্য। যে বই কিনতে আমাদের বাজারে ছুটতে হতো, আজ তা অনলাইনে ই-বুক আকারে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের অল্প প্রয়াসেই, এই যন্ত্র সভ্যতার দয়ায়। ফলে বই ব্যবসায়িদের রুজি-

রোজগারে টান পড়ছে। তা সত্ত্বেও উপন্যাসে দেখা যায়, সতীপ্রসন্নর মতো মানুষেরা, নিজেদের সমস্যা ভুলে পরিবেশ সংকটের প্রতি সকলকে সচেতন করতে চায়। কারণ তা শুধু একজন ব্যক্তির সংকট নয়, সমগ্র জাতির সংকটকে নির্দেশ করে। পাশাপাশি উপন্যাসে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন হিসেবে উঠে আসে 'চিপকো আন্দোলন', 'ক্যালকাটা মাই লাভ' আন্দোলনের কথা। অরিন তার স্টোরি'তে কলকাতার দূষণের ভয়ংকরতা নিয়ে লিখেছেন। লেখক অরিনের মধ্য দিয়ে বাস্তব সমাজের কাছে প্রশ্ন করেছেন- "তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলোকে দূষণমুক্ত করার তেমন ব্যবস্থা কই? এর ধোঁয়া বিপদজনক। কে শুনবে, কে বলবে? পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপদ তো আগেই। চেরনোবিলের দুর্ঘটনা-সেকি পরমাণু বোমা পড়ার থেকে কম বিপজ্জনক? আর পাশাপাশি ভোপাল ট্রাজেডি ও মনে পড়ে যায়। বহুজাতিকের বিষ তো এখনও এই ভারতবর্ষের বাতাসেই। ক'প্রজন্ম ধরে যে ভোপালের মানুষ এই বিষাক্ত ট্র্যাডিশান বহন করবেন কে জানে!"[৫]

হাজার হাজার ধোঁয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক মাইকের চিৎকারে পরিবেশের বাতাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ফুটপাতে একজন বিদেশীকে নাকে মুখে সুক্ষ্ম জালের ঠুলি লাগিয়ে হাঁটতে দেখে সতীপ্রসন্নর মনে প্রশ্ন জাগে—"একি দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? গোটা পৃথিবী কি একদিন এইভাবে গ্যাস নিরোধক মুখোশ পরে হাঁটবে? যেমনটি দেখা যায় টি.ভি., বিজ্ঞাপনে। ছবি থেকে বাস্তব কি এভাবেই জ্বলন্ত চেহারা নিয়ে উঠে আসবে?"[৬] বর্তমানে সতীপ্রসন্নর সেই সংশয়ান্বিত ছবি, বাস্তবের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে অল্প সময়ের ব্যবধানেই। চারিদিকে নোংরা আবর্জনার স্তূপ ছড়িয়ে দিচ্ছে এক বিষাক্ত দুর্গন্ধ। পরিবেশ থেকে সুমিষ্ট ফুলের সুবাস এখন আর পাওয়া যায় না। মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের লিস্টে একে সমাদরে স্থান দিয়েছে, কারণ-'মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া আশির দশকের নতুন ফেনোমেনা'।

আলোচ্য উপন্যাসে, লেখক ট্রাডিশনাল সংগীতের পাশে, বর্তমানে যাবতীয় লোচ্চামির আধুনিক উপকরণ নিয়ে উপস্থিত সঙ্গীতকে শব্দ দূষণের তুল্য বলে মনে করেন। কারণ তার মতে, 'এই ধ্বনিতে মায়া থাকে না। আকর্ষণ থাকে। এবং গানে অঙ্গভঙ্গিতে শুধুই যৌনতা'। বর্তমান যুবসমাজ গুরুজনদের পূর্বের মতো ততটা শ্রদ্ধা, ভক্তি করে না। যেটুকু করে তা বেশিরভাগ সোশ্যাল মিডিয়ার শেখানো বুলিতে, এতে আন্তরিকতা কতটা থাকে তা বলাই বাহুল্য। মহাভারতের তাতাশ্রী, ভ্রাতাশ্রীর কথা স্মরণ করে, সুধাপ্রসন্নের ভাবনায় সেই দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে-"আমরা সবাই চারপাশের এই অপার শ্রীহীনতার মধ্যে কেমন যেন শ্রীমান হয়ে উঠতে পেরেছি, অন্তত এটুকু সেলুলয়েড-বোকামিতে"।[৭] আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে 'সংগীত' শব্দটা অতি সস্তা হয়ে গেছে। এই অত্যাধুনিক সভ্যতায়, সংগীতের মাধুর্যতা, গাম্ভীর্যতা হারিয়ে যাচ্ছে। 'সংগীত' আজ সাধনা নয়, ফেলনা হয়ে গেছে; তাই যে কোনো কথা, যে কোনো শব্দ, যে কারোর হাতে পড়ে, সহজেই 'সংগীত' নাম নিয়ে প্রচারিত হচ্ছে সর্বত্র।

সতীপ্রসন্ন ভেতরে ভেতরে খবর পায় কলকাতার পুরনো ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে তৈরি হবে মাল্টিস্টোরেজ বিল্ডিং, এমনকি কফি হাউসের মালিকানাও কর্মীদের বদলে কোন ব্যক্তি সংস্থার হাতে চলে যাবে। লেখক তাই সতীপ্রসন্নর মধ্য দিয়ে এই চিত্রকে সামনে রেখে আমাদের হৃদয়হীনতার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন-"সব বিক্রি হয়ে যাবে, সমস্ত সবুজ, যাবতীয় ইট-কাঠ-পাথরের ইতিহাস? ট্র্যাডিশন, স্মৃতি মুছে দিয়ে হৃদয়হীন এ কোন আধুনিকতার দিকে যাত্রা? পৃথিবীর কোন দেশে এমন হয়?"[৮] সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ৩৩-৩৫ শতাংশ বনভূমি। সেখানে পৃথিবীতে ও ভারতে বর্তমান বনভূমির হার যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ২৩.১শতাংশ। প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায়, বর্তমানে তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। কারণ গ্রামগুলি আজ নগরের সমতুল হওয়ার পথে ক্রমশ চলমান। আমাদের এই অত্যাধুনিক যাত্রাপথে সবুজকে তো থাকতেই হবে, কিন্তু যে গুটিকয়েক অরণ্য আছে তারা হয়তো অতীত হয়ে যাবে, বেঁচে থাকবে বইয়ের পাতায় রুক্ষ এক ইতিহাস হয়ে।

লেখক তো সর্বদা আশাবাদী, তাই এই ভয়ংকর সমস্যার সমাধানেরও তিনি পথনির্দেশ করেছেন নবপ্রজন্মের কাছে। সমগ্র উপন্যাসে একা সতীপ্রসন্ন শুধু সচেতনভাবে এই সমস্যার কথা ভেবেছেন, এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে চেয়েছেন। 'পরিবেশ' পত্রিকার মধ্য দিয়ে পরিবেশ সচেতনতার যে আন্দোলন সতীপ্রসন্ন একা শুরু করেছিলেন, উপন্যাসের শেষে তার বিরোধীরাও একে একে তার সেই আন্দোলনে সামিল হয়; কলকাতাকে তিলোত্তমা করার স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে। কারণ মানুষ একা যা পারে না, সমবেত উদ্যোগে সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। সতীপ্রসন্নর সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়, উপন্যাসের প্রথমেই তার সুপ্ত ভাবনায় যা ছিল, শেষে এসে তা বাস্তবায়িত হয়- 'জীবনে মানুষ একলা কি বা করতে পারে! সংগঠনে, সম্মেলনে, সমবেত উদ্যোগে মানুষ এগোয়'।[৯]

এসব সত্ত্বেও মানুষের চেতনা কি ফিরছে? বাসের গায়ে নো স্মোকিং; সিগারেটের প্যাকেটে, টিভির পর্দায়, খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনের পাতায়- 'ইনজুরিয়াস টু হেলথ'। তা সত্ত্বেও আমরা সজ্ঞানে সেই দুষণদেবীকেই আহ্বান করে চলেছি। বাসে যাত্রা করার সময় সেকেন্ডারি স্মোকিং আটকাতে তাই নাকে রুমাল চেপে থাকতে হয় সতীপ্রসন্নকে। জাপানে দেখা যায়, ধূমপানের জন্য আলাদা ঘর, নন-স্মোকারদের যাতে সেকেন্ডারি স্মোকিং না হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এসব নিয়ে একটুও স্বাস্থ্য সচেতনতা আসেনি এখনও। ইদানিং, ঝকঝকে অফসেটে, ছাপা রঙিন কাগজে, দূষণ-পরিবেশ পলিউশনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তীতেই দেখা যায়, পরিষ্কার পাহাড়, সবুজের গায়ে - পিকনিকের জঞ্জাল, জ্যামের টিন, প্লাস্টিকের প্যাকেটের সদা বিচরণ। সতীপ্রসন্নর মত আমরাও পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে এগিয়ে আসি, তবে সেটা শুধু সমাজে দেখনদারির নিমিত্ত; মানুষের আবেগে, নানা সেমিনারে , খবরের কাগজে, ছবিতে, দূরদর্শনের পর্দায় ও অলীক প্রতিশ্রুতির কৃত্রিম

ফাঁদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এতে ফলপ্রসু হয় না। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসে, সতীপ্রসন্নকে করা অরিনের মন্তব্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য-"আমরা তো শুধু প্রতিষ্ঠা দিবসে, পতাকা উত্তোলনের সময় শুধুই প্রতিশ্রুতি দি জ্যাঠামশাই। কিন্তু কিছুই তো হয় নি। আমরাও পারি নি। আগের জমানাতেও হয় নি"।[১০]

লেখক আলোচ্য উপন্যাসে, পরিবেশ দূষণের যে দিকগুলি উপস্থাপন করেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমাদের বর্তমান সমাজেও তা সমানভাবে সত্য। পরিবেশ দূষণের এই বিভৎসতা ভয়ংকর রূপ নিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আধুনিক সমাজে আমরা সজ্ঞানে এই বিশ্বকে শিশুর বাসের অযোগ্য করে তোলার এক বিষাক্ত উল্লাসে মেতেছি। পূর্বের একান্নবর্তী পরিবারের দৃশ্য আজ আর তেমন চোখে পড়ে না, বর্তমানে দেখা যায় বাবা-মা-সন্তান নিয়ে এক নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। ফলে সমাজে ইট-কাঠ-পাথরের ইমারতের প্রাচুর্য তো থাকবেই। মডার্ন যুগে সো-অফ কালচারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা যে কোন হৃদয়হীন, বিষাক্ত আধুনিকতার দিকে যাত্রা করছি, তা কি আমাদের সকলের কাছে সত্যই অজ্ঞাত? নগরের প্রকোপ দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে হয়তো আমাদের কারোর পক্ষেই তা ঠেকানো সম্ভব হবে না, অত্যধিক জনসংখ্যার প্রাচুর্যতার কারনে। কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেও আমাদের পরিবেশটাকে বাঁচানো দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার প্রতি' কবিতার সেই অমর বাণী এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক- "দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর,/লও যতো লৌহ লোস্ট্রো কাষ্ঠ ও প্রস্তর/হে নব সভ্যতা!"[১১]

বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার অতি ব্যবহার ও অপব্যবহার আমাদের সুষ্ঠু পরিবেশ ও সুস্থ জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের পরমপ্রিয় আরাধ্য, যন্ত্র দেবতার সাধনা করে চলেছি। হয়তো একদিন নিজেরাও যন্ত্র হয়ে উঠবো, অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা হারিয়ে, বোবা দৃষ্টিকে পাথেয় করে টিকে থাকবো। নিজ সংস্কৃতির অপমৃত্যু নীরবে মেনে নেব। ইট-কাঠ-পাথরের প্রবল দাবদাহে, কয়েক শতাব্দী পর নতুন প্রজন্মের কাছে হয়তো মাটি, অরণ্য প্রভৃতি কোন এক আশ্চর্য বিষয়ে পরিণত হবে। হয়তো সেই বিস্ময়কর বস্তুর সাথে পরিচয় হবে, তাদের বাবা-মার সাক্ষাতে; বইয়ের রঙিন অক্ষরে কিংবা রঞ্জিত ফটোগ্রাফির মধ্যে দিয়ে। করোনার মতো এক ভয়ঙ্কর অতিমারির মুখোমুখি হয়েও এখনও আমাদের টনক নড়েনি। কাজ-অকাজের বাঘবন্দি খেলায় হাঁফিয়ে ওঠা জীবনে দম্ভ, ঐশ্বর্য, বিলাস ও তো জলের মতো সাময়িক বুদ্ বুদ মাত্র। আধুনিকতার শরীরী দুর্গন্ধ কে কৃত্রিম পারফিউমের গন্ধে যতই ঢেকে ফেলার চেষ্টা করিনা না কেন, সেই সৃষ্টিশীল বিশ্ব প্রকৃতির তন্ত্রীতে শুদ্ধতার আবেশ আজ ফিকে। অতীত সূত্রে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন, শুভবুদ্ধি জাগরণের মূল মন্ত্র,জীবনে পরম প্রার্থিত বৈচিত্র্যের স্বাদ আমরা কি দিতে পারবো ভাবী প্রজন্মের কাছে? - এ প্রশ্নের উত্তর আজ অমৃত-সুধারসের আস্বাদনের মতো। বিবেকবান শুভদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই পারে, নবসভ্যতার নিষ্ঠুর সর্বগ্রাস থেকে

পূণ্যছায়া রাশি গ্লানিহীন দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে। প্রাচীনত্ব থেকে আধুনিকতায় উত্তরণমূলক যুগসন্ধিক্ষণে সুস্থ জীবনবোধের ঈপ্সিত পথের অনুসন্ধান করতে। তাই ব্যক্তি স্বার্থ নয়, অচলায়তনের শুধু উত্তর নয় পূব,পশ্চিম ,দক্ষিণের দরজা যেদিন আমরা খুলে দিয়ে মুক্ত বাতাসের শ্বাস নিতে পারবো; পরিবেশবিদদের পরিবেশ রক্ষার লড়াই অতীতের নানা আন্দোলনের মতের, আবারো নবজগতের চোখে ক্লোরোফিল জোগানোর দিন সম্মুখে আগত হবে। সেদিন শুধু কিন্নর রায় একা নয়, ওনার মতো অনেক পরিবেশ সচেতক সাহিত্যিকদের কলমের সতর্কী শব্দ দ্যোতনা আমাদের ও ভাবীপ্রজন্মের জীবন দীপ্ত প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে হবে, ছন্দময়।

তথ্যসূত্র:

১) রায়, কিন্নর ‘প্রকৃতি পাঠ’ সমকাল প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৬৩, পৃষ্ঠা, ৩৭।

২) তদেব, পৃষ্ঠা, ৬৯।

৩) তদেব, পৃষ্ঠা, ১৯।

৪) তদেব, পৃষ্ঠা, ৬০।

৫) তদেব, পৃষ্ঠা, ৭৪।

৬) তদেব, পৃষ্ঠা, ৩৭।

৭) তদেব, পৃষ্ঠা, ১৪০।

৮) তদেব, পৃষ্ঠা, ৬৯।

৯) তদেব, পৃষ্ঠা, ১৩।

১০) তদেব, পৃষ্ঠা, ১৪৯।

১১) https://www.tagoreweb.in

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার, ‘ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য’, দিয়া পাবলিকেশন, ২০২২।

২. নন্দী, সাথী ‘কিন্নর রায়ের সাহিত্যজীবন ও সাহিত্য ভূবন’, দে’জ পাবলিশার্স, ২০২১।

৩. পান্ডা, বিশ্বজিৎ ‘সাম্প্রতিক উপন্যাসে পরিবেশ বিপন্নতা’ ২০২১।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা ও অন্যান্য সমাজ চিত্র’ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ ১৩৬৩।।

৫. রায়, কিন্নর ‘প্রকৃতি পাঠ’ সমকাল প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৬৩।

আর্কাইভাল বৈদুতিন তথ্য:

1. https://www.youtube.com/live/tkTo1CO-IWS?feature=share.
2. https://www.youtube.com/live/w5FcfiVDK1U?feature=share.
3. https://itihasten.blogspot.com

4. https://sukhopath.in
5. https://www.anandabazar.com
6. www.jagonews24.com
7. https://tirj.org.in
8. https://shampratikdeshkal.com
9. https://galpersamay.com
10. https://www.bangiyasahityasamsad.com

শক্তিপদ রাজগুরুর 'কাঁসাই-এর তীরে' : আদিবাসীদের প্রতিবাদী সত্তার অনন্য আখ্যান

সত্যা দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ : যারা তাদের নিজস্ব জীবন ধারণ পদ্ধতিকে যথাসাধ্য অপরিবর্তিত রেখে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাদেরকেই সাধারণত আদিবাসীবলা হয়। অরণ্যসম্পৃক্ত বাংলা উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে আদিবাসীদের কথা। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত,শোষিতআদিবাসীরা সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখে। বাংলা সাহিত্যে স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাসের সংখ্যা শতাধিক, এক কথায় বলতে গেলে এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেননি। আদিবাসীদের প্রতি তাঁর একটা আলাদা সহমর্মিতা ছিল। তিনি আদিবাসীদের বস্তিগুলোতে দিনের পর দিন থেকেছেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর আদিবাসী কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো। আলোচ্য 'কাঁসই-এর তীরে' উপন্যাসে তিনি যেমন আদিবাসীদের শোষণ বঞ্চনার ছবি এঁকেছেন, তেমনি তাদের প্রতিবাদও দেখিয়েছেন উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক বদন সমগ্র আদিবাসিদের হয়ে প্রতিবাদ করেছে শোষক, অত্যাচারী মানুষদের বিরুদ্ধে। এই প্রতিবাদকে দেখানোই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

মূলশব্দ: শক্তিপদ রাজগুরু, 'কাঁসাই-এর তীরে', আদিবাসী, প্রতিবাদী সত্তা।

মূল আলোচনা:

আদিবাসী বলতে আমরা বুঝি তাদের, যাদের ভারতের সংবিধানে তপশিলি উপজাতি এবং সমাজ ভাষাবিজ্ঞানে বলে কৌমোজনগোষ্ঠী। যারা তাদের নিজস্ব জীবনধারণ পদ্ধতিকে যথাসাধ্য অপরিবর্তিত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা হলো আদিবাসী। এরা কোনো বিশেষ অঞ্চলে বাস করে, এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা জঙ্গলে বাস করতে পছন্দ করে। এককথায় অরণ্য সন্তান আদিম জনগোষ্ঠী হলো আদিবাসী। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী W.H.R Rivers(১৮৬৪-১৯২২) আদিবাসী সম্পর্কে বলেছেন-

> "A tribe is a social group of a simple kind, the members of which speak a common dialect, have a single government, and act together for such common purpose as warfare."[১]

অরণ্যসম্পৃক্ত বাংলা সাহিত্যে অরণ্যের কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে আদিবাসীদের কথা উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্য যখন উপন্যাস বলে নতুন ধারা এলো, তার কিছু দিন পর অরণ্য নির্ভর উপন্যাস লেখা শুরু হলো। বাংলায় অরণ্যনির্ভর উপন্যাস অজস্র হলেও সবগুলোই অরণ্যসম্পৃক্ত উপন্যাস নয়। কোনোকোনো উপন্যাসে অরণ্য একটু-আধটু অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে, আবার কখনো কখনো অরণ্যই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। তবে যাই হোক অনেক বাংলা উপন্যাসে আদিবাসীদের কথা এসেছে, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের জীবন সংগ্রাম, তাদের লোকবিশ্বাস- সংস্কৃতি, তাদের অরণ্যপ্রেম সমস্ত কিছু উঠে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসে আমরা অরণ্যের কথা পাই, অরণ্য মানুষের কথা পাই। কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে প্রথম অরণ্যসম্পৃক্ত আদিবাসী নির্ভর উপন্যাস আমরা পেয়েছি যার নাম 'আরণ্যক'। এই উপন্যাস সম্পর্কে শিশির কুমার দাস বলেছেন-

> "প্রকৃতি আর মানুষ এমনভাবে এখানে পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো
> যে তাদের আলাদা করে দেখা কঠিন।"[২]

এরপর আরো অনেক সাহিত্যিকের উপন্যাসেই অরণ্য এসেছে, এসেছে আদিবাসীদের কথা। এই ধারার একটি অভিনব সংযোজন হলো শক্তিপদ রাজগুরুর 'কাঁসাই-এর তীরে' (১৯৯৬)। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এক অতি পরিচিতি নাম শক্তিপদ রাজগুরু। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার গোপবান্দি গ্রামে লেখকের জন্ম। ডাক বিভাগে চাকরির সূত্রে ও লেখার রসদ সংগ্রহ করার জন্য তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন উত্তরবঙ্গ থেকে আসামের জঙ্গল, কয়লা খনি অঞ্চল, সুন্দরবন, অযোধ্যা পাহাড়, সারেন্ডার জঙ্গল, পতিতা পল্লী, উদ্বাস্তু ক্যাম্প, পালামৌ, চা বাগানের বস্তি, পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন আদিবাসী বস্তি। এমনকি সাহিত্যের রসদ সংগ্রহ করার জন্য তিনি চলে গিয়েছিলেন বিদেশের মাটিতেও। তিনি একশোরও বেশি উপন্যাস, অজস্র ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ সাহিত্য, কয়েকটি নাটক এবং ছোটদের জন্য অনেক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর বনজঙ্গল ও আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাসগুলি হলো' বনের আঙিনায়' (১৩৮৮), 'নীল নির্জন' (১৯৯০), 'কাঁসাই-এর তীরে' (১৯৯৬), 'বন বাংলো' (২০০০) ইত্যাদি। ঔপন্যাসিক দিনের পর দিন জঙ্গলে ঘুরেছেন, আদিবাসীদের বস্তিতে থেকেছেন। তাদের সুখ-দুঃখ, জীবন যন্ত্রণা নিজের চোখে দেখেছেন। 'বনের আঙিনায়' উপন্যাসের নায়কের মধ্য দিয়ে তিনি যেন তাঁর মনের কথা বলেছিলেন-

> "মানুষের জগত থেকে জঙ্গল যেন অনেক শান্তির। এখানে তবু
> আনন্দের সন্ধান পাই।"[৩]

'কাঁসাই-এর তীরে' উপন্যাসটি লেখকের এরকম একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। এটি একটি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত রাণীবাঁধ, খাতড়া এলাকায় কাঁসাই নদীর উপর কংসাবতী জলধারা গড়ে ওঠাকে কেন্দ্র

করে উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্ত অঞ্চলে কংসাবতী নদীর তীরে যে অরণ্য তাতে অনেক আদিবাসীদের বাস। তাদের জীবন সংগ্রাম এবং তাদের উপর যে শোষণ সম্পন্ন হয়, তারা কীভাবে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয় এবং তাদের প্রতিবাদের কথা সমস্ত কিছুই উপন্যাসে উঠে এসেছে খুব সুন্দরভাবে। আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকে শোষিত হয়ে এসেছে ইংরেজ আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারত স্বাধীনের পরের সময় হলো উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দথেকে ধারাবাহিকভাবে আদিবাসীরা যে বঞ্চিত এবং শোষিত হয়ে আসছিল নতুন সরকার গঠনের পরও পশ্চিমবঙ্গের সেই শোষিত এবং বঞ্চিত আদিবাসীদের ক্ষোভ একসময় প্রতিবাদী রূপে বের হয়ে আসে। শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গে আদিবাসীরা যে, সে অন্ধকারই রয়ে গেল শোষিত অত্যাচারিত হতে হতে দেয়ালে যখন তাদের পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তখন তারা নিজেদের অস্তিত্ব লড়াইয়ে শোষক ও মহাজনরূপী শোষক মানুষগুলোর উপর বদলা নিতে চেয়েছিল। আদিবাসীদের এই প্রতিবাদের কথাই আছে আমাদের আলোচ্য 'কাঁসাই-এর তীরে' উপন্যাসে। কাহিনির নায়ক বদন প্রতি পদে পদে আদিবাসীদের হয়ে প্রতিবাদ করেছে। উপন্যাসের নায়ক বদন, সে যতটা রোমান্টিক ঠিক ততটাই বিদ্রোহী এবং প্রতিবাদী। সে বড়লোকের সম্পত্তি লুঠ করে গরীবদের বিলিয়ে দেয়, তাই সে ত্রাস আবার অন্যদিকে ত্রাতা। অসাধু ধনী ব্যবসায়ী এবং অত্যাচারীদের কাছে সে আতঙ্ক আবার গরিব আদিবাসীদের সে আশ্রয়। প্রথম পর্বটিতে সে আদিবাসী মেয়ে কিশোরীর সঙ্গে ঘর বাঁধে। কিন্তু বদন প্রায় বিনা দোষে সুধন্য রায়ের রোষের মুখে পড়ে, বদনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। বদন নাকি কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, লেখকের সঙ্গে বদনের দেখা হয়েছিল এবং তিনি বদনের কাছে তার কাহিনি শুনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নিতাই নাগ বলেছিলেন-

> "উপন্যাসের নায়ক তথা প্রধান চরিত্র হল আদিবাসী যুবক বদন। উপন্যাসের এই 'বদন' চরিত্রটি কাল্পনিক নয় বাস্তবে লেখকের সঙ্গে বদন বলে এক আদিবাসী মানুষের পরিচয় হয়েছিল। বদন তার পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লেখককে বলেছিলেন। বদনের সঙ্গে লেখকের যখন সাক্ষাৎ হয় বদন তখন বার্ধক্যে উপনীত বয়স তার ৭৪/৭৫ বছর।"[৪]

বদনকে জেলে দিয়ে সুধন্য রায় কিশোরীকে ভোগ করতে চেয়েছিল। কিশোরী নিজের জীবন দিয়ে সুধন্যের কামনার হাত থেকে বেঁচেছিল। প্রথমে আমরা বদনকে নির্ভীক, পরিশ্রমী একজন যুবক হিসেবে দেখি। প্রথম থেকে দেখি সে কখনো কাউকে ভয় পেত না। বদনের মনেও আদিবাসী সমাজের জন্য অনেক ভালোবাসা ছিল। আদিবাসীদের শোষণকে সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারিনি। তাই হয়তো তার জায়গা হয়েছে জেলে। একবার জেল থেকে পালালেও আবার শেষেও তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। তাকে কোনোদিন শান্তিতে সংসার করতে দেয়নি সেই লোভী শয়তান সুধন্য রায়। বদন

জেল থেকে বের হয়ে যখন দেখে তার কিশোরী নাই তখনই সে প্রতিজ্ঞা করে, প্রতিশোধ নেবার। বদনের বুকফাটা কান্না প্রতিধ্বনিত হয়েছিল জঙ্গলে-

> "বদন চিৎকার করে কিশোরী কুথাকে? আমার ঘর হেই পিসি। জংলি বুড়ি বলে সি আর নাইরে। কেউ নাই- কুছু নাই রে। নাই। বদনের বুকফাটা চিৎকার উঠে, নাই। কিশোরী নাই।"[৫]

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে বদনের আদিবাসী মেয়ে কুর্চির সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুর্চি বদনকে ভালোবাসে, নানাভাবে সাহায্য করে বদনকে স্বাভাবিক জীবন দিতে চায়। কিন্তু সেখানেও বদনের জীবন থেকে তার ভালোবাসাকে কেড়ে নেয় সেই অত্যাচারী মানুষগুলো। অন্ধকার রাতে গদাই ও পটল কুর্চিকে ধর্ষণ করে খুন করে। আবারও ভালোবাসাকে হারিয়ে বদন নতুন করে সে মানুষগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। সে জঙ্গলে চলে যায়, ফুরফুরে ডাকাতের সঙ্গে মিলে বদন শয়তান লোভী বড়লোকদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে থাকে। একের পর এক আঘাত পায় বদন। তার সর্বস্ব কেড়ে নেয় সেই সুবিধাবাদী ক্ষমতাবান দল। বনের গার্ড গুপি রাউত, বিট অফিসার রতি বাবু, রেঞ্জ অফিসার, নিতাই ঘোষ, নকুল সাহা, ভবানী পোদ্দার এবং সর্বোপরি সুধন্য রায় ও তার ছেলে ত্রিনাথ মিলে সেই ডুংরির আদিবাসীদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সেই আদিবাসী মানুষগুলো কত সহজ সরল, তারা নিজেদের জগতেই সুখে থাকতো। তারা শহরের ভদ্র-শিক্ষিত মানুষদের কখনো বিরক্ত করতে আসত না। কিন্তু সেই তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত মানুষগুলো এই নিষ্পাপ আদিবাসীদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল নিজেদের স্বার্থে।

বদনের জীবনে আবার ভালোবাসা এসেছে। তার মুংলিকে দেখে কিশোরীর কথা মনে পড়েছে। মুংলির মধ্যে সে তার কিশোরকে খুঁজে পেয়েছে। কংসাবতী প্রজেক্টের কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সমরেশ বাবু। তিনি এবং তার স্ত্রী সুলতার চেষ্টায় বদন ও মুংলি ঘর বাঁধে-

> "ক'মাসে মুংলির অনেক কাছে এসেছে বদন। সেই মারমুখী হিংস্র ছেলেটা একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। মুংলি বলে কিরে মরদ? আর যাবি না বন পাহাড়ে? বদর এখন ঘর বাঁধতে ব্যস্ত। মুংলীর অনেক দিনের শখ গরু পুষবে। সুলতার আগ্রহে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন বদনও বাঁধা পড়েছে। তার মনে ঘরের স্বপ্ন। কাজ থেকে ফেরে দুজনে, ছায়া নামা ঝোরার জলে সুর ওঠে। বদন আর মুংলী সেই জগতে হারিয়ে গেছে।"[৬]

কিশোরী, কুর্চি এদেরকে হারিয়েও বদন আবার নতুন করে বাঁচার কথা ভাবে। জীবনের ধর্মই নতুন করে বাঁচা। শত প্রতিকূলতার মাঝেও মানুষকে বাঁচতে হয়। নতুন করে জীবন শুরু করে বদন পুরনো সবকিছু ভুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানেও নিয়তি বাঁধ সাধল। ক্ষমতালোভী মানুষগুলো বদনের সুখ সহ্য করতে পারল না। বদন ভেবেছিল

সে আর কোনো খারাপ কাজ করবেনা, সে শান্তিতে সংসার করবে। কিন্তু সুধন্যের ছেলে ত্রিনাথ সমরেশবাবুকে মারতে আসলে বদন তার মালিককে বাঁচাতে ত্রিনাথকে খুন করে। বদন পুলিশের কাছে ধরা দেয়। অসহায় আদিবাসীদের ওপর সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে বদন প্রতিবাদ করত। বদন যখন জেলে যায় তখন তার মনে একটা সান্ত্বনা ছিল, সে তার বংশধর রেখে যাচ্ছে। সেও বড়ো হয়ে বাবার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে- এই আশা নিয়ে বদন জেলে যায় আর এখানেই কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

উপন্যাসে আমরা আদিবাসী সমাজ, আদিবাসিদের জীবনযাত্রা, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা সমস্ত কিছুর ছবি দেখতে পাই। আদিবাসীরা কত অল্পতে সন্তুষ্ট হয়। লোভ তাদের কত কম, তার ছবি যেমন আছে তেমনি প্রধান হয়ে উঠেছে আদিবাসীদের প্রতিবাদ। সহজ সরল আদিবাসীরা প্রতিবাদ করতে ভয় পায়। তারা মুখ খুলতে ভয় পায়, তারা দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারীদের অত্যাচার সহ্য করে যায়। সমস্ত আদিবাসী সমাজের হয়ে বদন প্রতিবাদ করেছে। শক্তিপদ রাজগুরু অত্যন্ত সহমর্মীতার সঙ্গে আদিবাসীদের প্রতিবাদের ছবি অঙ্কন করেছেন। মহাশ্বেতাদেবীর উপন্যাসে আদিবাসীদের কথা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়-

> "মহাশ্বেতা দেবী ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রান্তদেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী জনজাতিদের জীবনযাত্রার প্রকৃত পরিচয় তাঁর রচনার মাধ্যমে তুলে ধরার ফলে আমাদের মধ্যে সেই অবহেলিত আদিবাসী জনজাতিদের সম্বন্ধে যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্য কম নয়। ইতিহাস গ্রন্থ যা পারিনি, মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস ও গল্পগুলি সেই দুরূহ কাজটি করতে পেরেছে। সেজন্যই মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জনজীবনের এক মহান রূপকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।।"[৭]

মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী উপন্যাসের সঙ্গে আলোচ্য এই উপন্যাস তুলনীয় না হলেও শক্তিপদ রাজগুরুর এই উপন্যাস আদিবাসীদের সম্পর্কে নতুন করে পাঠকদের ভাবতে শিখিয়েছে। আদিবাসীদের শোষণ এবং বঞ্চনার চিত্র নতুন করে পাঠকের সামনে এসেছে।

শক্তিপদ রাজগুরুর এই উপন্যাসে বদন চরিত্রকে সম্পূর্ণ করতে তিনজন নারী চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন। প্রথমজন কিশোরী, দ্বিতীয়জন কুর্চি, আর তৃতীয় জন মুংলি। কিশোরী বদনকে যে কতটা ভালোবাসেছিল তার প্রমাণ, সে জীবন দিয়ে বদনের ভালোবাসার মর্যাদা দিয়ে গেছে। কুর্চি যদি বদনের ভালোর জন্য সমস্ত খবর বদনকে না দিত তাহলে তাকেও মরতে হয়না। সেও জীবন দিয়ে বদনের ভালো করে গেছে। মুংলি অবাধ্য বদনকে শান্ত করে তাকে ঘরমুখী করেছে। অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে বদনকে

পূর্ণ করেছে। বদন জেলে গেলেও মুংলি বদনের বংশধরকে আগলে রেখে সেই সন্তানকে বদনের মতো তৈরি করার নীরব শপথ নিয়েছে। এই নারী চরিত্রগুলো সত্যিই অসাধারণভাবে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক।

বদনের সমস্ত কাজ সমর্থনযোগ্য না হলেও বদনের প্রতি ঔপন্যাসিকের যেমন সহানুভূতি ছিল, পাঠকেরও তেমন একটি সহানুভূতি তৈরি হয়। হাজার অত্যাচার সহ্য করেছিল আদিবাসীরা, আদিবাসী মেয়েরা দিন-রাত প্রতিমুহূর্তে অত্যাচারিত হয়েছিল। সামান্য প্রয়োজনীয় কাঠ-পাতাও তারা সংগ্রহ করতে পারত না। অথচ সেই জঙ্গল থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ পাচার করে দিত বাইরের মহাজনেরা। সামান্য একটা হরিণ মারার জন্য বদনের চার বছর জেল হয়েছিল অথচ চোরাশিকারীরা বনের সব জন্তু মেরে বাইরে পাচার করে দিত কিন্তু বনদপ্তর পুলিশ প্রশাসন তখন কোনো ব্যবস্থা নিত না। অত্যাচারিত হতে হতে তাদের ক্ষোভ, তাদের রাগ বিদ্রোহী হয়ে বের হয়ে আসে। এখানে সমস্ত আদিবাসী চরিত্রের প্রতীক হিসেবে বদনকে অঙ্কন করা হয়েছে। বদনের এই প্রতিবাদ দেখে অবাক হয়েছে আদিবাসীদের সর্দার মুটুক সর্দার। বদন নিজে যেমন প্রতিবাদ করতো তেমনি অন্য আদিবাসী ছেলেদের প্রতিবাদী করতে চাইতো। সে লখা, কানাই সবাইকে বলতো সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। আমরা আলোচনা করেছি বদন কত অত্যাচার সহ্য করে প্রতিবাদী হয়েছে। তবুও উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি বদনের স্থান আদিবাসী ডুংরিতে হয়নি, হয়েছে জেলে। অথচ সেই আদিবাসী ডুংরিকে বদন প্রাণাধিক ভালোবাসতো। সেই ডুংরিকেই সে স্বর্গ মনে করতো। সামান্য চাষ আবাদ করেপাতার ছাউনির মাটির ঘরে থেকে বদন নিজেকে পৃথিবীর সবথেকে সুখী মানুষ মনে করতো। কিন্তু সে একদিনও শান্তিতে তার সেই শান্তির নীড়ে বাস করতে পারেনি। তাই বদনের জন্য পাঠকের বিরাট সহানুভূতি তৈরি হয়।

উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব শোষক বনাম শোষিতের, অত্যাচারীর সাথে অত্যাচারিতদের, ধনীর সঙ্গে গরিবের। লোকবল, অর্থবল কোনো দিক দিয়েই বদন সুধন্য রায়ের সমকক্ষ ছিল না। তাইতো ক্ষমতা এবং অর্থের কাছে বারবার হেরে গিয়েছে বদন। তবু সে তার প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সে আদিবাসীদের হয়ে প্রতিবাদ করে গেছে আজীবন। বদন প্রতিবাদ করেছিল সমস্ত অন্যায় কাজের, বদন শাস্তি দিয়েছিল সমস্ত অপরাধীদের। কুর্চিকে ধর্ষণ করে খুন করেছিল যারা, মদন তাদেরও বাঁচতে দেয়নি। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতার লোভীদের একতার বিরুদ্ধে বদনের সংগ্রাম ছিল অসহায়। তবে পরাজয় বদনের হয়নি, সে অত্যাচারীদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে পেরেছিল- এটাই বদনের প্রতিবাদের সার্থকতা। বদন শেষে জেলে গেলেও তার মন পড়েছিল পাহাড়ের ঘেঁষা সেই ডুংরিকে-

"পূরব তর মালা, পছি তর মালা

দুয়া সুখে জিয়া ভরসাযই।।
গানের সুর উঠে পাহাড় বনে। চারদিকে পাহাড়-পাহাড়ের গা ঘন
শাল আটারি-পলাশ-মহুয়াকুর্চিগাছে ঢাকা ।"[৮]

বদন সেই স্বপ্নের রাজ্যে বাস করতে পারিনি কিন্তু বদনের সেই ত্যাগের পরিণামে সেই ডুংরির মানুষগুলো হয়তো একটু শান্তিতে বাস করতে পারবে- এটাই বদনের শান্ত্বনা। সুধন্য রায়রা হয়তো আদিবাসীদের ওপর শোষণের মাত্রা কমাবে- এটাই ঔপন্যাসিকেরও কামনা।

তথ্যসূত্র:

১. Rivers, W.H.R, 'Social Organisation', edited by W.J perry, Kegal Paul, Trench, Trubner and co Ltd, New York, third impression- 1932, page- 32.
২. সেন তরুণ (সম্পাদিত), 'বিভূতিভূষণ: আধুনিক জিজ্ঞাসা', সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা- ০৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১।
৩. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'(বনের আঙিনায়), সত্যনারায়ণ প্রকাশন, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৩৯।
৪. নাগ নিতাই, 'কথা সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ রাজগুরু: স্রষ্টা ও সৃষ্টি', সাহিত্যলোক, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৪২।
৫. রাজগুরু শক্তিপদ, 'পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস'(কাঁসাই-এর তীরে), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১০, পৃষ্ঠা- ১৪৫।
৬. রাজগুরু শক্তিপদ, 'পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস'(কাঁসাই-এর তীরে), তদেব, পৃষ্ঠা- ২২০।
৭. দত্ত শিপ্রা, 'মহাশ্বেতা দেবীর কথা সাহিত্যে আদিবাসী জনজীবন', অক্ষর পাবলিকেশনস, কলকাতা- ১২ ,প্রথম প্রকাশ- ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৬।
৮. রাজগুরু শক্তিপদ, 'পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস'(কাঁসাই-এর তীরে), তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ:

১. রাজগুরু শক্তিপদ, 'পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস' (কাঁসাই-এর তীরে), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১০।

সহায়কগ্রন্থ:

১. ঘোষ সুবোধ, 'ভারতের আদিবাসী', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা-৭৩ চতুর্থ মুদ্রণ-২০০০।
২. মাহাতো বঙ্কিমচন্দ্র, 'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য', বাণীশিল্প প্রকাশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ।

৩. মন্ডল প্রকাশচন্দ্র, 'কথাসাহিত্যের নানাপাঠ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৮।
৪. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৪।
৫. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ-২০১৬।
৬. ভট্টাচার্য দেবীপ্রসাদ, 'উপন্যাসের কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ-২০০৩।
৭. ভট্টাচার্য অধ্যাপক দেবাশীষ, 'বিশ শতকের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা', অক্ষর পাবলিকেশন, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ-২০১০।
৮. নাথ প্রিয়কান্ত, 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০৭।
৯. নাথ প্রিয়কান্ত ও চক্রবর্তী রামী, 'বাংলা উপন্যাস সংজ্ঞার সন্ধানে'(সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০১৭।
১০. চক্রবর্তী রামী, 'কথাসাহিত্যের বহুমাত্রিক পাঠ'(সম্পাদিত), একুশ শতক, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০১৯।
১১. ভট্টাচার্য অরূপ কুমার, 'আঞ্চলিকতা: বাংলা উপন্যাস', পুস্তক বিপণি,কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭।
১২. ঘোষ প্রসূন, 'উপন্যাসের নানা স্বর', এবং মুশায়ের, কলকাতা-৯০, প্রথম প্রকাশ-২০০৫।
১৩. ড. গিরি সত্যবতী ও ড. মজুমদার সমরেশ, 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (সম্পাদিত), রত্নাবলী, কলকাতা- ০৯, চতুর্থ সংস্করণ-২০১৯।
১৪. বসু অরুন কুমার, 'কথাশিল্পের নানা দিক' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ-২০১৯।
১৫. ঘোষ সিনহা চন্দ্রা, 'বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্পে সমাজ বিদ্রোহ’, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩।
১৬. মজুমদার উজ্জ্বল কুমার, 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ০৯, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ- ২০০৮।
১৭. দেবসেন সুবোধ, 'বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭।
১৮. মজুমদার উজ্জ্বল কুমার, 'উপন্যাস পাঠের ডায়েরি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০৯।
১৯. শংকর চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে নিঃসঙ্গ নায়ক', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-২০০২।

কিশোর রবীন্দ্র মননে ইউরোপীয় নারী জীবন : প্রসঙ্গ – 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'

দিলদার কিবরিয়া
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : ইউরোপীয় সমাজ বিশেষ করে যে ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, তা ভারতীয় নারীর অনন্দরমহলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে সে সময়টা খুব একটা সুবিধেজনক ছিল না। ঘরের কোণেই কাটত তাঁদের জীবনের বেশিরভাগ প্রহর। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম ইংরেজ নারীদের এক পৃথক সত্তাময় গঠন দেখলেন। এঁরা ঘরকন্নায় জীবনের গল্প অতিবহন করে না। তাঁরা স্বাধীন। সভা সমিতি, নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সর্বত্রই তারাই প্রাণভোমরা। খাদ্যাভাসে পৃথক, মদ্যপান জীবনের অঙ্গ, মাথার ওপর তাঁদের নীল আকাশ।
সূচক শব্দ : ইউরোপ, নারীজীবন, স্বাধীন, ভারতীয় নারী জীবন, সমাজগত দৃষ্টি।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাস জীবন যাপনকালে ইংরেজদের সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি, সংস্কৃতি, নিখুঁতভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ইংরেজিতে তেমন সাবলীল নাহলেও, ইউরোপবাসীর জীবনগত সমীকরণ বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ফলত ইউরোপবাসীর সামাজিক ও রাষ্ট্রের জীবন তাঁকে রোমাঞ্চিত করেছে। বিশেষতঃ নারী শিক্ষা, চেতনা ও নারীর সমাজগত অবাধ বিচরণে তিনি পুলকিত হয়েছিলেন। কেননা, রবীন্দ্র সমকালীন সময়ে ভারতীয় নারীজীবন খুব একটা সুখকর ছিল না, উক্তহেতুগত কারণেই ইউরোপবাসীর নারী ভাবনায় তিনি আন্দোলিত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

ধরাভূমিতে মূলত ত্রিধারার মানবজন্ম লক্ষ্যগোচর হয়। বিষয়টি চর্বিত চর্বনের মত। নর-নারী এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, এই ত্রিবিধ মানব স্রোতের ধারা বহমান। আমরা সকলে অবগত আছি, অলিখিতভাবে হলেও ধরাভূমির মূল ক্ষমতা সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পুরুষ সমাজ বিধাতা সেজে স্বহস্তে নিয়ে রেখেছেন। তৃতীয় শ্রেণির যে মানব উপস্থিতির কথা বলা হল, তাঁরা নারী কিংবা পুরুষ, এই দুই ধারার থেকে শরীরী গঠনে যেমন পৃথক, তেমনি সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে একেবারেই এলেবেলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের সমাজে স্থান হয় না। নারীদের কথা বললে, তৎকালীন অর্থাৎ রবীন্দ্র জন্মের আগে ও পরে নারীজীবন খুব ভাল অবস্থায় ছিল না। সমাজকর্তা পুরুষের বিধি, রীতি-নীতি, সামাজিক দ্বন্দ্ব বিধানের ঘোরটপে কেটে যেত তাঁদের জীবনের গল্প সমূহ।

শুরুটা অন্যরকম করে করা হল, যেহেতু ইউরোপের নারীজীবন আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য, উক্ত হেতুগত কারণে এই সময়কালে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের নারীজীবনের গল্পগুলো কেমন ছিল, বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা দরকার।

ভারতীয় নারীজীবন ও ইউরোপীয় নারীজীবনের একটি তুলনামূলক আলোচনার দাবি রাখে অনেক কাল থেকেই। তবে, এখানে বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ এই পত্রগুলি লিখছেন, সেই কালপর্বে নারী জীবন ইউরোপ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তেমন সুবিধেমূলক জায়গাতে ছিল না। এই একটি জায়গায় ইউরোপবাসী ধরাভূমির অন্যান্য স্থানের তৎকালীন মানবকূলের থেকে যেমন ভাবনাগতভাবে পৃথক ছিল, তেমনি অনেক বেশি উন্নত ভাবনার অধিকারী ছিলেন। এই বিষয়টি কিশোর রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। ভারতবর্ষের নারীজীবনে বিকাশ হওয়ার পথে বার বার বাঁধা পায়, ঠিক সেই জায়গাতে ইউরোপীয় নারীদের স্বাধীন, বন্ধনহীন জীবনের আনন্দে তিনি সুখ অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> "মেয়েরা তো মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর তো তাঁদের সমাজের এক অংশ করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রয়েছেন আর মেয়েরা তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তির একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরে দেওয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। একদল বুদ্ধিমান বিবেচনাশক্তিবিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী থেকে নির্দয় লোকাচারের শাসন পীড়ন দমন বন্ধন করে পোষা পাখির চেয়ে নির্জীব বশীভূত সংকুচিত ও সংকীর্ণময় করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সম্পূর্ণ শিউরে উঠে। কোনো একজন মানুষের পরে এরকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা—এক জন বুদ্ধি ও হৃদয় বিশিষ্ট মানুষকে জানোয়ারের মতো...যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য তাঁকে চিরস্থায়ী কষ্ট পেতে হয় তবে তাও অম্লান বদনে তার স্পন্দে স্থাপন করা---এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়।...মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।"[১]

বলা যেতেই পারে, সব দিক থেকেই সেই সময়কালে ইউরোপ ছিল আলোকদীপ্ত। আসলে, তখনকার পৃথিবী পুরোপুরি ইউরোপমুখী ছিল। ইউরোপবাসীর নারী ভাবনাও ছিল অত্যন্ত উন্নত। এক প্রকার ভাবে বলতে গেলে, সমাজের প্রাণভোমরাই ছিলেন নারীরাই। সেই সময়ের নারীরা নিজেদের অধিকার অর্থাৎ মানুষের মতো বেঁচে থাকবার অধিকার পাওয়ার জন্য অনেক বেশি লড়াই করছিলেন, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সত্য যে ইউরোপের নারীদের নিজেদের অধিকারের জন্য বেগম রোকেয়ার মতো সমাজের সাথে লড়াই করতে হয়নি। তাঁরা 'Born free', হয়েই জন্মেছেন।

> "এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নোভেল পড়ে...।"[২]

আবার একাদশ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "বসন্তের আরম্ভ থেকে গর্মির কিছুদিন পর্যন্ত লনডনের জোয়ার---season! এই সময়ে লনডন উৎসবে পূর্ণ থাকে -থিয়েটারে, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক বল, আমোদ-প্রমোদে চারদিক ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকেদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে। আজ তাঁদের নাচের নেমন্তন্ন, পরশু থিয়েটারে যেতে হবে, তরশু রাত্তিরে ম্যাডাম পার্টির গান শুনতে যেতে হবে...।"[৩]

সেই সময়ে ধরাভূমির অন্যত্রে এমন বিলাসী নারীজীবন কল্পনার অধিক বলে বোধ হয়। কিন্তু ইউরোপের নারীরা সবদিক থেকেই পৃথক প্রকৃতির। অর্থাৎ বাঙালি তথা ভারতীয় কিংবা অন্য রাষ্ট্রের যে নারীজীবনের যে ছবি তৎকালীন সময়ের ইতিহাস ইতিবৃত্তের মধ্যে বার বার আমরা দেখেছি, সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি এক অপূর্ব গৃহ নিপূণ মনোভাব তাঁদের হৃদয় মানুষকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল। নিবন্ধের শুরুর দিকেই উল্লিখিত ইউরোপের নারীজীবন অন্য সব জায়গার নারীজীবন থেকে পৃথক। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের নারীদের কথা বলতে গিয়ে বার বার উক্ত কথাগুলোর কথায় মনে করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত; যদি একজন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে করলেন জীবনের মহান লক্ষ্য সিদ্ধ হল। পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হল। মন ভোলানোর জন্য তাঁদের নিজের সুখ স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন। কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বলতার মতো কোমর করে তুলবেন। তার জন্য তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করতে ও সকল প্রকার রোগ সহ্য করতেও রাজী আছেন। পুরুষের মন ভোলানোর জন্য তাঁরা পটের বিবি সেজে থাকে সর্বক্ষণ। এই বাহারি সাজ ও রকমফেরের জন্য বিদ্যাশিক্ষার বহর তাঁদের বেশি দূর প্রসারিত হয়নি। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে নিরাস করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> "আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশের কী বেশি উন্নতি দেখছি জান? না, এরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। আর লেখা পড়া শিখেছেন। লেখা পড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে, নোভেল পড়বার সময় এদের কখনো ডিক্সনারি খুলবার আবশ্যক হয় না।"[৪]

উৎসব কিংবা নিমন্ত্রণ বাড়ির প্রধান আকর্ষণ ছিল ইউরোপের নারীগণ। সেই সময়েরকার পৃথিবী যখন নারীদের কয়েদ করতে ব্যতিব্যস্ত সেই কালপর্বে ইউরোপের নারীপুরুষদের রয়েছে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। যা অন্যান্য সমাজগত দৃষ্টির থেকেও

আধুনিক এবং পৃথক একথা বলা যায় অকুণ্ঠিত ভাবে। রবীন্দ্রনাথ একটি উৎসব বাড়ির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন; কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> "ঘরের চারিদিকে আশে-পাশে যে সকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকে ঢুকে, গাছপালা দিয়ে দুই একটি কৌচ চৌকি রেখে Lovers Bower (প্রণয়ীদের কুঞ্জ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে ক্লান্ত হয়ে কোলাহলে বিরক্ত হয়ে দুই-একটি যুবক-যুবতী নিড়িবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের কালে এমন ভাবনা সত্যিই অভূতপূর্ব। এখনকার সময়ে বিনোদন পার্কগুলোতে 'লাভার্স পয়েন্ট' থাকে তেমনি। যাইহোক, উৎসব হোক বা কোনো নিমন্ত্রণ বাড়ি, সব জায়গাতে নৃত্য একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। পূর্বেই বলেছি, এই উৎসব সমূহের মূল আকর্ষণ ছিল কিন্তু ইউরোপের মেয়েরাই। নারী পুরুষের অবাধ আড্ডা, নৃত্য ও সঙ্গীতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তাঁদের সামাজিক জীবনকে আরো বেশি আনন্দময় করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> "ইংরাজি নাচকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, একরকম হচ্ছে স্ত্রী পুরুষে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দুইজন লোক একসঙ্গে নাচে; আর একরকম হচ্ছে চারটি জুড়ি নর্তক-নর্তকী চতুষ্কোণ সুমুখা সুমুখী দাঁড়ায় ও হাত ধরাধরি করে নানা ভঙ্গীতে চলা ফেরা করে বেড়ায়। কোনো কোনো সময় চার জুড়ি নাহয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউণ্ড ড্যান্স বলে ও চলা-ফেরা করে বেড়ানোর নাম Square Dance। নাচ হবার পূর্বে গৃহকর্তী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ করে দেন; অর্থাৎ পুরুষ অভ্যাগতকে সঙ্গে করে কোনো এক অভ্যাগত মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'মিস ওমুক, ইনি হচ্ছেন মিস্টার অমুক।"[৬]

ইউরোপীয় সমাজে মিলনের অবসর বিবিধ। এখানে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। উঁচু নিচু ব্যাপার নেই। সমাজগত ভাবে সকলেই যে সমাজ, এই ভবনা থেকে ইংরেজ সমাজ ভীষণ রকম উদার। ধরাভূমির অন্য জায়গাগুলিতে যেমন নারীদের খাঁচায় বদ্ধ করতে উদ্যত, সেই জায়গাতে ইংরেজ সমাজের একটা মিলন মহান রূপ লক্ষ্যগোচর হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "মিলনের উপলক্ষ্য কত প্রকার আছে তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল, Conversations, চা সভা, Lawn Parties, Excursions, Picnics ইত্যাদি। Thackeray বলেন, "English Society has this eminent advantage over all others ---that is if there be any society left in the wretched distracted old European continent ---that it is all

> above others a dinner-giving society. অবসর পেলে এক সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের জোগাড় করে আহারাদি করা ও আমোদ-প্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্যই কর্তব্য কাজের মধ্যে।" [৭]

নিবন্ধের শেষ লগ্নে উপনীত আমরা, ইউরোপীয় যে জীবন নারীরা যাপন করতেন সেই সময় তা সমগত ভাবে বেশ আধুনিক এবং উন্নত -- এ কথা স্বীকার করতেই হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা চমৎকার কথা বলেছেন,

> "একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাৎ, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাৎমাত্র। দিশি পুতুলের অত সাজগোজ রঙচঙের আবশ্যক করে না, আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার আবশ্যক করে না---বিলতি পুতুলের কিছু বাহার আবশ্যক করে, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প-স্বল্প কিছু লেখা পড়া শিখতে হয়...।"[৮]

কথা সমাপন পর্বে বলতে পারি, দু' বছরের প্রবাস জীবনে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের নারীজীবনের সফল গল্প স্বচোখে দেখেছিলেন। প্রতি ক্ষেত্রেই ভারতীয় নারীদের সাথে ইউরোপবাসী মেয়েদের উন্নত জীবন দর্শন তাঁকে আন্দোলিত করেছে। তিনি ইউরোপবাসীর নারীজীবনকে উপলব্ধি করেছেন ভীষণ রকমভাবে। সেই দেখবার চোখ থেকেই তিনি অনুধাবন করেছেন,

> "মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলেই বোঝা যায়।"[৯]

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- ১৮৮১, পৃ: ২০।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী,প্রথম প্রকাশ- ১৮৮১, পৃ: ২২।

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী,প্রথম প্রকাশ- ১৮৮১, পৃ: ২২

৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- ১৮৮১, পৃ: ২৩।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- ১৮৮১, পৃ: ৩১।

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- **১৮৮১,** পৃ: ৩২।
৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- **১৮৮১,** পৃ: ৩৫।
৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- **১৮৮১,** পৃ: ৩৯।
৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ- **১৮৮১,** পৃ: ৪২ ।

‘সন্দেশ’ সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ এর একটি তুলনামূলক আলোচনা

শম্পা লাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পাঁচথুপী হরিপদ গৌরীবালা কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ : প্রদীপ হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়না। প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব। শুরুর আগে আরেক শুরু। চলে নীরব প্রস্তুতি। শেষে সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ। 'সন্দেশ' ও সহসা ছোটদের হাতে পৌঁছে যায় নি। সন্দেশের যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতার পথে যাত্রা সম্ভব হয়েছে এক ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়েই। সেই ১৮১৮ তে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দিগদর্শন'। 'সন্দেশ' প্রকাশের পঁচানব্বই বছর আগে। পত্রিকাটিতে ছাপা হতো পাঠ্যঘেঁষা রকমারি জ্ঞানবর্ধক রচনা। ছোটদের পত্রিকার আভাস প্রথম পাওয়া যায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অবোধবন্ধু' তে। প্রকাশকাল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ। তবে সত্যিকারের ছোটদের পত্রিকা পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো সতেরো বছর। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছে প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'সখা'। ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ি থেকে 'বালক', ১৮৯৫ তে শিবনাথ শাস্ত্রী বের করলেন 'মুকুল'। লক্ষ্য করার বিষয় প্রায় সবকটি পত্রিকাতেই উপেন্দ্রকিশোর মেলে ধরেছিলেন আপন লেখক সত্তাকে। এমনকি মুকুলের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পারিপাট্যের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ঠিক তাঁর নিজের ক্ষেত্রকে প্রকাশ করার জন্য 'সন্দেশ' পরিকল্পিত হয়নি। নতুন শতক আরম্ভের আগেই বাংলার শিশুরা পরিচিত হতে শুরু করেছিল বিভিন্ন শিশুপত্রিকার সঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোর শুধু চেয়েছিলেন ছোটদের মনের মতো একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'সন্দেশ' পত্রিকার আবির্ভাব।

সূচক শব্দ : সুকুমার, সত্যজিৎ, সন্দেশ, পত্রিকা, শিশু, সাহিত্য, উপেন্দ্রকিশোর, ছবি।

প্রদীপ যেমন হঠাৎ করে প্রজ্জ্বলিত হয় না, প্রদীপ জ্বালানোর আগে থাকে সলতে পাকানোর পর্ব, ঠিক তেমনি 'সন্দেশ' এর পূর্ণতার পথে যাত্রা যে ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে, সেই ধারাবাহিকতার প্রথম সূত্রপাত উপেন্দ্রকিশোরের হাতেই। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়ঃ “ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসতো 'সন্দেশ'। আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে। আনতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেষন।” (১)

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য 'সচিত্র মাসিক পত্রিকা' কেমন হতে পারে, কোন অত্যুচ্চ মানে পৌঁছতে পারে---'সন্দেশ' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তার নজির রেখেছেন পত্রিকাটির পাতায় পাতায়। ডাক দিয়েছেন 'এসো বসো আহারে।'

'সন্দেশ' এর অনন্যতাঃ প্রেক্ষাপট, গঠন ও প্রস্তুতিপর্ব

'সন্দেশ' এর প্রথম প্রকাশ **১৯১৩** সালের মে মাসে। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'সন্দেশ' লেখায়-রেখায় অনবদ্য হয়ে ওঠে। একেবারে অন্যরকম। আগে বের হওয়া কোনো ছোটদের পত্রিকার সঙ্গে মেলানো যায় না। গতানুগতিকতা বর্জিত, সম্পাদক ছোটদের নিয়ে কত গভীরভাবে ভেবেছেন, তা বোধহয় প্রথম সংখ্যাটি থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কবি প্রিয়ংবদা দেবীর মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন সে সময়কার নামী কবি। সন্দেশের এই অনন্যতা ভারী সরস ভঙ্গিতে লিখেছেন তিনিঃ

'সন্দেশ এসেছে ঘরে থালা নিয়ে আয়।
খোকা খুকি দাদা দিদি আয়রে ত্বরায়।
এ সন্দেশ টপ করে মুখে পুরে দিলে,
খাইতে পারিনে রস একেবারে গিলে।
মার কাছে ভাই-বোন সকলে বসিয়া
ধীরে সুস্থে মিষ্টি রস লইব চুষিয়া।
খাজা গজা রসগোল্লা আবার খাবার
বাজারেও মিলিবে না এমন আবার।' (২)

পত্রিকার নাম 'সন্দেশ'। মিষ্টান্নের সুস্বাদ আর সংবাদের বিস্তার এ দুইয়ে মিলেই 'সন্দেশ' পত্রিকা সকলের মনোগ্রাহী, মুখরোচক, আবার সহায়ক মানস বিকাশেরও। শিশুসাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টিধর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাবনাচিন্তা, পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা প্রথম দিকের সন্দেশে থাকত মজার মজার ছবি, গল্প-কবিতা, আশ্চর্য সব খবর, নতুন ধরনের ছড়া, ধাঁধা ও খেলায় মোড়া 'সন্দেশ' এর পাতায় পাতায় ছিল হাস্যোজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত জীবন ভাবনার অফুরন্ত ভান্ডার। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় অংশে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে সরস ভঙ্গিতেঃ—

"'সন্দেশ' বলিলেই যে আমরা সকলের আগে একটা খাইবার জিনিসের কথা ভাবি, সে আমাদের অভ্যাসের দোষ। ঐ শব্দের আসল অর্থ যে 'সংবাদ' সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'সংবাদ' এর অর্থ বদলাইয়া 'মিঠাই' হওয়া খুবই আশ্চর্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব নহে।..... আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভালো লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে, ----অর্থাৎ ইহা

পড়িয়া যদি সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।” (৩)

'সন্দেশ' এর গঠন :

উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় বেরোনো ১৩২০ আর ১৩২২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রায় তিন বছরের সন্দেশের তেত্রিশটা সংখ্যা। যাতে পাওয়া যায় নানা মেজাজের, নানা ধরনের লেখা। সম্পাদনা করেছিলেন মোট দুই বছর সাত মাস।

ক্রাউন (১৫×২০ ইঞ্চি) মাপের কাগজে Quarto ভাঁজের এই পত্রিকাতে পাতার মাপ ছিল ৬.২৫×৮ ইঞ্চি। পাতায় মুদ্রিত অংশের মাপ ১২.৫×১৭ সেমি। প্রতি পাতায় running head বাদে থাকত ২৮ লাইন করে এবং ওপর নিচে, বা পাশে সাদা মার্জিন ছাড়া থাকত ২ সেমি, ডান পাশে ২.৫ সেমি করে। প্রথম দু'বছর বারোটি করে সংখ্যা ও তৃতীয় বছরে (১৩২২ বঙ্গাব্দ) অগ্রহায়নের অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত।

উপেন্দ্রকিশোরের কালে 'সন্দেশ' ছিল বত্রিশ পৃষ্ঠার। ছাপা হত পাইকা টাইপে। তখনকার দিনে আজকের মত মুদ্রণ কারিকুরি ও অফসেট আনুকূল্য ছিল না। লেটারপ্রেসে পাইকা টাইপে ঝকঝকে করে ছাপা হতো 'সন্দেশ'। রঙিন ছবি, রংচঙে মলাট--- মনভোলানো ভালোরকমের ছাপা। উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সন্দেশ' এর পরবর্তীকালেও পত্রিকার বাহ্যিক পরিবর্তন কিছুই ঘটেনি। পত্রিকার অঙ্গসজ্জা ও লে-আউট একই রকম।

'সন্দেশ' এর লেখালেখি :

বর্ণোজ্জ্বল মনোরম প্রচ্ছদ, চোখজুড়ানো ইলাস্ট্রেশন, অপূর্ব ফটোগ্রাফ ও পাতাজোড়া রঙিন ছবির জোরেই প্রকাশমাত্র 'সন্দেশ' ছোটদের মন জয় করেছিল, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বাহ্যিক চাকচিক্য যেমন ছিল, তেমনি পাতায় পাতায় ছাপা হয়েছে অজস্র ভালো লেখা। লীলা মজুমদারের 'সন্দেশ' প্রবন্ধের এই মন্তব্যই তার প্রমাণঃ

“সেই প্রথম 'সন্দেশ'-এর উচ্চমান, আজ পর্যন্ত কোনও ছোটদের পত্রিকা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। 'সন্দেশ' নিজেও না। প্রতি মাসে একটি রঙিন হাফটোন ছবি থাকত। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদির গল্প থাকত। দেশ-বিদেশের উপ-কথা, ভ্রমণকাহিনি, জীবনী, হাসির গল্প, স্মৃতিকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, কবিতা, নাটিকা, স্বরলিপি সহ গান, ধাঁধা। সাদা কালো ছবিগুলিরও অধিকাংশ উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা। সুকুমার বিলেত থেকে ছবিশুদ্ধ মজার কবিতা পাঠিয়ে সকলকে চমকে দিতেন। কুলদারঞ্জন দেশ-বিদেশের পৌরাণিক গল্প, প্রমদারঞ্জন তাঁর বনজঙ্গলের অভিজ্ঞতার কথা, সুখলতা পরিদের গল্প।” (৪)

এমন লেখা ছোটোরা আগে কখনো পড়েনি, এমন ভাবে তাদের কথা আগে ভাবা হয়নি। প্রথমদিকে সন্দেশের প্রধান লেখক ছিলেন স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর। পত্রিকার প্রয়োজনে দুই হাতে লিখতে হয়েছে তাঁকে। কখনো লিখেছেন মজার গল্প, কখনও বা লিখেছেন সরস নিবন্ধ। পুরাণের গল্পও তাঁর লেখার গুণে হয়ে উঠেছে দারুণ

উপভোগ্য। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটিতেই ছিল তাঁর লেখা এমনই এক গল্প --'প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ' প্রবন্ধে সুনির্মল বসুর স্মৃতিচারণা। ---

"এই 'সন্দেশ' আমার জীবনে একটা রঙিন আনন্দময় যুগ নিয়ে এল।....প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ডাকের পথ চেয়ে থাকতাম ----আমাদের লোক ভোরবেলা (গিরিডির) ডাকঘরে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসত, 'সন্দেশ' যদি পয়লা তারিখে তার হাতে না দেখতাম মুখ শুকিয়ে যেত। তার পরদিন আবার আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করতাম, দূর থেকে লক্ষ করতাম লোকটার হাতে অন্যান্য চিঠিপত্রের মধ্যে উঁচু হয়ে আছে 'সন্দেশ' এর বাদামি মোড়ক-- আনন্দে প্রাণ নেচে উঠত।" [৫]

উপেন্দ্রকিশোর বাল্মিকীর রামায়ণ নিয়ে যেমন গল্প লিখেছেন, তেমনই দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখেছেন হাস্যরসে ভরপুর ভূতের গল্প 'জোলা আর সাত ভূত'। দ্বিতীয় সংখ্যাটি থেকেই গল্প-প্রবন্ধ-ছড়া-কবিতার পাশাপাশি ধাঁধাও ছাপা শুরু হয়েছে। এছাড়া ছিল 'বিচিত্র সংবাদ' ও 'কথাবার্তা' নামে দুটি নিয়মিত বিভাগ। দুটি বিভাগই সমাদৃত হয়েছিল পাঠকমহলে। এদের মধ্যে 'কথাবার্তা' বিভাগটি নিঃসন্দেহে অভিনব। এই বিভাগের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর। খুদে পড়ুয়ারা কি চায়, তাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, জেনে নিয়ে 'সন্দেশ' এর পাতা লেখায়-রেখায় ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। প্রথম বর্ষের 'সন্দেশ' এ ছাপা হয় কুলদারঞ্জন রায় অনূদিত 'রবিনহুড' ও প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবর'। আরো অনেক অনেক ভালো গল্প, কবিতা ও জ্ঞানবর্ধক রচনার সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধা, হেঁয়ালিরও অফুরান আয়োজন ছিল উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' এ। লীলা মজুমদারের ভাষায়ঃ

"'সন্দেশ' এর প্রকাশন শিশু সাহিত্যের জগতে একটা নতুন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল। হঠাৎ যেন একদিনের মধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। বাস্তবিক ওই প্রথম সংখ্যার 'সন্দেশ' খানি পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ শিশু মাসিক পত্রিকার পাশে আসন পাবার যোগ্য। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য তেমনি তার ছবি, কাগজ, ছাপা ও মলাট। তারপরে আরো পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে, বাংলাদেশে আর কোনো ছোটদের পত্রিকা অমন মনোহর রূপ নিয়ে দেখা দিল না।" [৬]

লেখকগোষ্ঠীঃ

উপেন্দ্রকিশোর ছাড়া এই পর্যায়ের 'সন্দেশ' এর অন্যান্য লেখকেরা ছিলেন-- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রিয়ংবদা দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি গুনী ব্যক্তিরা। পরবর্তীকালে সুখলতা রাও ও সুকুমার রায় নিয়মিত লেখক তালিকায় ছিলেন। এছাড়া লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়,

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, সুনির্মল বসু, কার্তিক দাশগুপ্ত, অসিত হালদার, প্রসন্নময়ী দেবী, চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতাদেবী--- সমসাময়িক লেখকদের অনেকেই লিখেছেন 'সন্দেশ' এ।

ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়ই কলম ধরেছেন উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' এ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন মজাদার গল্প 'হাবুর বাবুগিরি' আবার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সুখ্যাত 'ইলসেগুড়ি' কবিতাটি উপেন্দ্রকিশোরের সম্পাদনাকালেই প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য বিষয় কোনো লেখকই টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করতেন না। তাঁরা লেখা দিতেন বিনামূল্যে। লীলা মজুমদার লিখেছেনঃ "মজা হচ্ছে কেউ জোর করে লিখতেন না, কাউকে পেড়াপেড়ি করেও লেখানো হত না, সবাই লিখতেন মনের আনন্দে। আস্তে আস্তে দেখা গেল যে যার নিজের বিষয়টি বেছে নিয়ে, সেই বিষয়ে লিখে লিখে এমন হাত পাকাচ্ছেন যে লেখাগুলো হয়ে উঠছে অদ্বিতীয়।" [৭]

এককথায় লেখায়-রেখায় 'সন্দেশ' এর পাতায় পাতায় রয়েছে গভীর যত্নের ছাপ। যেমন ছাপার মান, তেমনই উৎকৃষ্ট কাগজ, খুঁটিয়ে প্রুফ দেখতেন উপেন্দ্রকিশোর। দেখতে সাহায্য করতেন সুকুমার। ছাপার ভুল খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। কোনরকম 'সম্পাদকীয়' অংশ থাকত না 'সন্দেশ' এ। এমনকি উপেন্দ্রকিশোর তাঁর পত্রিকায় কোনরকম বিজ্ঞাপন প্রকাশেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। কখনও কখনও এক-আধ পৃষ্ঠা খালি থাকলে, উন্নত মানের ছোট ছোট সরস রচনায় তা পূরণ করে দিতেন তিনি। যদি কোন একটি পত্রিকার পাতায় উপেন্দ্রকিশোরকে পুরোদস্তুর খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তা অবশ্যই 'সন্দেশ'। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটি থেকেই স্বনামধন্য মানুষটির সৃজনশীল বহুমুখী বার্তা বহনকারী 'সন্দেশ'। প্রচ্ছদ-চিত্রকর, ইলাস্ট্রেটর, কবি, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ, ধাঁধা-হেঁয়ালির স্রষ্টা এবং ব্লক-মেকার ---সবরকম পরিচয় যদি একত্রে কোথাও পেতে হয়-- তাহলে অবশ্যই উল্টাতে হবে 'সন্দেশ' এর পাতা। আর এখানেই লুকিয়ে আছে প্রথম পর্যায়ের 'সন্দেশ' এর অনন্যতা।

সম্পাদক সুকুমার রায় ও অন্যান্যঃ—

'সন্দেশ' নিঃসন্দেহে উপেন্দ্রকিশোরের জীবনের স্মরণীয়তম কীর্তি। এর প্রকাশের দুই বছর আট মাস বাদে যখন তাঁর জীবনাবসান ঘটে, ততদিনে পত্রিকার বত্রিশটি সংখ্যা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে গোড়ার দিকে 'সন্দেশ' প্রকাশিত হত। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন ললিত মোহন গুপ্ত। পত্রিকাটি মুদ্রিত হত ৬৪/১ নং সুকিয়া স্ট্রিটে অবস্থিত লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে।

বলতে দ্বিধা নেই ছড়া, রূপকথা, লোককথা, ইতিহাস, পুরাণ, আবিষ্কারের গল্প, কিংবা নিখাদ কল্পকাহিনী----শিশুসাহিত্যের এমন কোন শাখার কথা ভাবা যায় না, যা সন্দেশের জাদুস্পর্শে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়নি। রেখায়-লেখায় অনবদ্য 'সন্দেশ'

উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদনা পর্বেই অর্জন করেছিল অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। শুধু সমসাময়িক শিশুসাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক নিরিখেও পত্রিকাটি ছিল অগ্রগামী। গল্প-কবিতা-গান-প্রবন্ধ-জীবনী-ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয়ক লেখা, আবিষ্কারের গল্প, ধাঁধা, সংবাদ, ---বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যময় পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধারার অলংকরণ এবং মুদ্রণ পারিপাট্য ‘সন্দেশ’ কে এনে দিয়েছিল এমন এক বহুমাত্রিকতা যা এর চিরকালীন আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে নব পরিচয় বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক জাগরণের সূচনা করেছিল, ‘সন্দেশ’ ছিল তারই উত্তুঙ্গ বিন্দু।

'সন্দেশ' এর ওঠাপড়াঃ

ছোটদের পত্রিকার প্রচলিত ধারায় 'সন্দেশ' ছিল ব্যতিক্রমী। উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' এর ক্ষেত্রে যেমন একথা বলা যায়, তেমনই বলা যায় সুকুমারের 'সন্দেশ' এর ক্ষেত্রেও। বরং সুকুমারের ক্ষেত্রে ‘সন্দেশ’ এর এই স্বাতন্ত্র্য আরো বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুকুমারের সম্পাদনায় টানা আট বছর প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ'। পত্রিকার বেশিরভাগ লেখারই লেখক ছিলেন সম্পাদক স্বয়ং। সুকুমারের অকালমৃত্যুর পর তাঁর মেজ ভাই সুবিনয় রায় পত্রিকা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেন। তারপরেও ১৯২৬ সালে ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স এবং 'সন্দেশ' পত্রিকা বিক্রি হয়ে যায়। এর পাঁচ বছর পরে সুধাবিন্দু বিশ্বাস পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানটি কেনার পর তিনি এবং সুবিনয় রায় যুগ্মভাবে সম্পাদনা করে ১৯৩১ সাল থেকে পুনরায় প্রকাশ করতে থাকেন 'সন্দেশ'। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত লেখা 'সে' এর একটি কিস্তি দিয়ে এই পর্বের শুরু। আর দুটি কিস্তি দ্বিতীয় পর্বের ‘সন্দেশ’ এ লেখার পর এবং মোট চার বছর চলার পর ১৯৩৫ সালে এই পত্রিকা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পরে সুকুমার পুত্র সত্যজিৎ রায় ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় তৃতীয় পর্যায়ের 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। পত্রিকার অনেক প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছিলেন সত্যজিৎ। এরপর সম্পাদনায় এসেছেন লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, পরে বিজয়া রায় এবং বর্তমানে সন্দীপ রায় এর সম্পাদক। (জুলাই ২০২১ অবধি দেখা ‘সন্দেশ’ অনুযায়ী) লেখক তালিকায় অজেয় রায়, রেবন্ত গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়, শিশির কুমার মজুমদার প্রমুখ। অলঙ্করণে অবদান রেখেছেন সত্যজিৎ রায়, সূর্য রায় থেকে বর্তমানে শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, দেবাশীষ দেব, দেবব্রত ঘোষ প্রমুখরা।

'সন্দেশ' এর রঙবদলঃ

১৩২২ বঙ্গাব্দের ৪ ঠা পৌষ উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়ে সুকুমারের উপর। ১৩২২ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। সুকুমার রায়ের হাতে এসে 'সন্দেশ' পত্রিকা শিশুদের থেকে

কিশোরদের হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের উক্তিঃ “বাবার সন্দেশের চেহারাটা ঠাকুর্দার সন্দেশের থেকে আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের পত্রিকা থেকে হঠাৎই কিশোর পত্রিকা হয়ে উঠল।” (৮)

সুকুমারের মৃত্যুর পর ১৩৩০-১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত সুবিনয় রায় 'সন্দেশ' সম্পাদনা করলেও তার পূর্ব গৌরবকে ধরে রাখতে পারেননি। আর্থিক অনটনের কারণে এই সময়ে এসে 'সন্দেশ' পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকা চিত্র প্রতিযোগিতা শুরু করে এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃতও করে। সুবিনয় রায়ের তত্ত্বাবধানে 'সন্দেশ' পত্রিকা বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে আর্থিক কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে সুবিনয় রায় ও সুধাবিন্দু বিশ্বাসের যুগ্ম সম্পাদনায়, ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দে সুধাবিন্দু বিশ্বাসের একক সম্পাদনায় ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হয়। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটি দীর্ঘকালের জন্য (প্রায় ২৫ বছরের জন্য) বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় প্রকাশিত হয় ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে / ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায়, নবপর্যায়ের 'সন্দেশ' রূপে।

সুকুমার রায়ের লেখালিখিঃ

আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘সন্দেশ’ এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর দীর্ঘ আট বছরের সম্পাদনা পর্বে নিজে লিখেছেন ১২৬ টির মত কবিতা, ৬৬ টি গল্প, পাঁচটি নাটক, ১২১ টি প্রবন্ধ, আর ৬৪ টি ধাঁধা বা হেঁয়ালি। ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'বেজায় রাগ' কবিতাটির মধ্যে দিয়ে 'সন্দেশ' এর লেখক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সুকুমার। এরপর লিখেছেন 'আবোল-তাবোল' সিরিজের কবিতাগুলি। গল্পের ক্ষেত্রে বিদেশী অনুবাদমূলক গল্প 'পাজি পিটার', 'খৃষ্টবাহন', 'ভাঙা তারা', ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। 'পাগলা দাশু' র গল্পগুলিও প্রথমে 'সন্দেশ' এ প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি' নামে বিখ্যাত রচনাটিও প্রথম 'সন্দেশ' এ প্রকাশিত হয়। 'অবাক জলপান', 'হিংসুটে', 'মামাগো' নাটক তিনটি সুকুমারের সম্পাদনা কালে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য, ভাদ্র ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে তিনি ১৬ টি জীবনী ও প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে মোট ১০৫ টি প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর লেখা একাধিক অপ্রকাশিত নাটকও ‘সন্দেশ’ এ ছাপা হয়েছে। ('ঝালাপালা', 'লক্ষণের শক্তিশেল')

'সন্দেশ' এর গঠন পারিপাট্যঃ

সুকুমার সম্পাদিত 'সন্দেশ' এ কৌতুক চিত্র প্রকাশিত হত বেশি। এ সময় কয়েকজন চিত্রশিল্পী জনপ্রিয় হয়েছিলেন। রায়বাড়ির সুখলতা ও সুবিনয় ছাড়া যতীন্দ্র কুমার সেন, অসিত কুমার হালদার, হিতেন্দ্রমোহন বসু, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রকিশোরের সময়ে 'সন্দেশ' এ পৌরাণিক চিত্রের প্রাচুর্যের পাশে সুকুমার সম্পাদনা কালে 'সন্দেশ' এ বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্রের সমাহার বেড়ে যায়। অবশ্য

পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক ছবি এই পর্যায়েও ছিল। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, সমুদ্র ও তার তলদেশ, সামুদ্রিক প্রাণীর ছবি ‘সন্দেশ’ এ বহুবর্ণে প্রকাশিত হত। পত্রিকার পৃষ্ঠার প্রথমে থাকত রঙিন ছবি, তারপরে একটি কবিতা, তারপর অন্যান্য রচনা শুরু হত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য, বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে নানা ধরনের প্রবন্ধ এই সময়কার 'সন্দেশ' এর বৈশিষ্ট্য। এগুলিই ধীরে ধীরে পত্রিকাটিকে তার আগের চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র করে তুলছিল।

লেখকগোষ্ঠীঃ

সে আমলের সমসাময়িক প্রায় সব লেখকদের লেখাই ছাপা হতো 'সন্দেশ' এ। এই পর্যায়ে ছাপা হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাল্কীর গান' এবং অতুলপ্রসাদ সেনের 'বাতাসের গান'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'বৃষ্টি ও রৌদ্র' (ভাদ্র ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) আর 'সময়হারা' (বৈশাখ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া ‘সন্দেশ’ এ কবিতা লিখেছেন নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, প্রমথ চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রিয়ংবদা দেবী, কামিনী রায় এমনকি শিবনাথ শাস্ত্রীও। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে অসিতকুমার হালদার এর 'হো-দের গল্প', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খাতাঞ্চির খাতা', সীতা দেবীর 'নিরেট গুরুর কাহিনী' (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) আর প্রিয়ংবদা দেবীর 'পঞ্চুলাল' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) এছাড়াও কলম ধরেছিলেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, অসিতকুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুবিনয় রায়, ইলা রায়, শান্তিলতা চৌধুরী, সুবিমল রায়, মাধুরীলতা রায় প্রমুখরা।

তথ্যসূত্র :

১) 'সন্দেশ' (ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র) দ্বিতীয় বর্ষ, সম্পাদনাঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, (বৈশাখ-চৈত্র ১৩২১ বঙ্গাব্দ), পারুল, কলকাতা, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০১০, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ প্রচ্ছদ- ব্যাককভার।

২) ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ভূমিকা অংশ- vii

৩) 'সন্দেশ' (ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র), প্রথম বর্ষঃ বৈশাখ-চৈত্র ১৩২০, শ্রী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত, পারুল, কলকাতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা- 'ল' -'প্রসঙ্গত' অংশ।

৪) সম্পাদনাঃ প্রসাদ রঞ্জন রায়, 'অনন্য অন্য লীলা মজুমদার', অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৩২৮-৩২৯

৫) 'সন্দেশ' (ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিকপত্র), দ্বিতীয় বর্ষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৩৮৭।

৬) ঐ, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৩৯৪

৭) সুস্মিতা দত্ত, 'প্রসঙ্গ সন্দেশ' (উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদনা পর্বঃ বৈশাখ ১৩২০- পৌষ ১৩২২), পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ২০১০, পৃষ্ঠাসংখ্যা –৬৯।

৮) 'সন্দেশ' (ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা), তৃতীয় বর্ষঃ বৈশাখ- চৈত্র ১৩২২ বঙ্গাব্দ, সম্পাদনা- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, পারুল, কলকাতা, প্রথম পারুল সংস্করণঃ ২০১২, পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ ব্লার্ব- ব্যাককভার।

উনিশ শতকের নিজস্ব সংজ্ঞায়নে দুটি বাংলা প্রহসন

শ্রেয়সী মল্লিক
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: বাংলার আধুনিকতা ও আত্মদ্বন্দ্বের কাল উনিশ শতক। এই কালপরিসর বাংলা 'প্রহসন' নামক সাহিত্য-সংরূপটির কেন্দ্রীয় সত্য নির্মাণ করেছে নিজস্ব ঘটমান বর্তমান, নিজস্ব দ্বন্দ্ব, সংকটের সমস্ত অনুষঙ্গ দিয়ে। প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব নির্দেশিত প্রহসনের স্বরূপ ও লক্ষণকে পরিত্যাগ করে বাংলা প্রহসন সেজে উঠেছে সমসময়ের প্রাতিস্বিকতায়। আমাদের প্রবন্ধ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় রচনাকে সামনে রেখে 'প্রহসন'-এর উনিশ শতকীয় অবয়বটিকে বোঝার চেষ্টা করবে। সমসময়ের চিহ্নকে ধারণ করার ক্ষেত্রে বাংলা প্রহসন কোথায় অন্যান্য সাহিত্য আঙ্গিক থেকে আলাদা হয়ে উঠল এবং উনিশ শতকের দুই প্রবাদপ্রতিম স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে নিজেদের লেখায় তার প্রতিফলন ঘটালেন, বক্ষ্যমাণ অনুসন্ধানে আমরা সেটিই দেখতে চাইব।
সূচক শব্দ: উনিশ শতক, তর্ক, উপনিবেশ, উপযোগবাদ, ক্ষমতাতন্ত্র, নভেল, স্ত্রী-শিক্ষা।

মূল আলোচনা:
'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা ভরতমুনিই প্রথম সাহিত্য-সংরূপ হিসেবে প্রহসনকে সংজ্ঞায়িত করেন। শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ- প্রহসনের দুই প্রকারভেদ উল্লেখ করে তিনি এদের লক্ষণগুলির উপর আলোকপাত করেছেন। ভরতের নির্দেশানুসারে, ভাগবত, তাপস, ভিক্ষু, শোত্রিয় ও ব্রাক্ষ্মণরা যদি সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেদের মতো পরিহাসপূর্ণ, সম্ভাষণবহুল ভাষায় কথা বলেন এবং তাদের আচরণ গ্রহণ করেন, তবে তা হাসির বিষয় হবে। এটিই শুদ্ধ প্রহসন। সংকীর্ণ প্রহসনকে কিন্তু শুদ্ধ প্রহসনের বিপরীতভাবে সংজ্ঞায়িত করেন নি ভরত। তিনি বলছেন, বেশ্যা, চেট, নপুংসক, ধূর্ত, বিট এবং বন্ধকীদের বেশভূষা ও কার্যকলাপ যদি অনিভূত হয় অর্থাৎ প্রকাশ্যে আসে তাহলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেটিই সংকীর্ণ প্রহসন। তাদের অস্তিত্ব ও যাপনের প্রকাশটাই কার্যত হাসির খোরাক।[১] 'সাহিত্য দর্পণ' কার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে প্রহসনে নিন্দনীয় ব্যক্তির কবিকল্পিত বৃত্তান্ত বর্ণিত হবে। এর অঙ্গীরস হবে হাস্যরস এবং তপস্বী বা বিপ্রই প্রহসনের নায়ক হবেন।[২]

আধুনিকতার সঙ্গে সংযোগের সমস্ত অনুষঙ্গকে বহন করে বাংলার উনিশ শতক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব নির্দেশিত প্রহসনের সংজ্ঞা গ্রহণ করতে পারেনি। উনিশ শতকের বাংলা প্রহসন কার্যত যে কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তা হল, সমকালকে ঘিরে তর্ক এবং সেই তর্কে প্রহসনকারের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ। এই

শতকের মৌলিক বাংলা সাহিত্যের যে অন্যান্য সংরূপগুলি, যেমন- উপন্যাস, নাটক, গল্প- এর কোনটিরই অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য সমসময়কে ঘিরে তর্ক, একথা বলা যায় না। একারণেই সম্ভবত উনিশ শতকে ইতিহাস ও পুরাণকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপ রচিত হলেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক প্রহসন রচিত হয় নি। উনিশ শতকের ঘটমান বর্তমানকে নিয়ে তর্ক করেছে একমাত্র প্রহসন। বক্ষ্যমাণ অনুসন্ধানে আমরা দেখতে চাইব 'সধবার একাদশী' প্রহসনটিতে উনিশ শতককে নিয়ে কী তর্ক রয়েছে এবং সেই তর্কে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের অবস্থান কীভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

১৮৬৬ সালে প্রকাশিত তিন অঙ্কে সমাপ্ত 'সধবার একাদশী'র শুরুতে উল্লিখিত Shakespeare ও Elihu Burret- এর রচনার উদ্ধৃতি এবং প্রহসনটির প্রথম ও শেষ সংলাপ থেকে আপাতভাবে মনে হয় যে এর কেন্দ্রীয় তর্কটি উনিশ শতকের মদ্যপানজনিত নৈতিক সংকটকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। উনিশ শতকে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে মদ্যপান বিষয়টি একটি সংকটের আকারে আবর্তিত হচ্ছিল ঠিকই। 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' ইত্যাদি রচনায় মদ্যপানকে একটি সামাজিক সমস্যার আকারে তুলে ধরা হচ্ছিল। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই একই বিষয় নিয়ে যদি 'সধবার একাদশী' লেখা হয়, তবে এ প্রহসনের স্বাতন্ত্র্য কোথায়! এই প্রহসন কি তবে বাহুল্যমাত্র! কিন্তু এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দেয় প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। বস্তুত এটিই প্রহসনের দীর্ঘতম ও কেন্দ্রীয় দৃশ্য। এই দৃশ্যেই কেনারাম নামক এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং নিমচাঁদের সঙ্গে ব্যঙ্গছলে তার একটি মুখোমুখি তর্কযুদ্ধ চলে। এই তর্কটিই কার্যত এরপর থেকে গোটা প্রহসনে জেগে থাকে। এ তর্ক কেবল মদ্যপান বিষয়ক একমাত্রিক তর্ক নয়- এ তর্ক সমকাল, সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত গভীর তর্ক ।

প্রহসনের এই কেন্দ্রীয় তর্কটি অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অটলের উদ্দেশ্যে গোকুলচন্দ্রের বলা একটি সংলাপ- "...তুমি ধর্মকর্ম করবে, এডুকেশান কমিটির মেম্বার হবে, অনরেরি ম্যাজিস্ট্রেট হবে, লেফটেনান্ট গবর্নরের কাউন্সেলের মেম্বার হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা করবে, তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া?"[৩] শুধু অটলের অভিভাবকই নন, গোটা উনিশ শতক তার তরুণ প্রজন্মের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করেছিল, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্তে উপযোগী অংশগ্রহণের সাপেক্ষেই যুবকদের সাফল্য ও ব্যর্থতার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিল উনিশ শতক। অটলের অভিভাবক চান অটল অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট হোক। এরপরই দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে উনিশ শতকের দেগে দেওয়া সাফল্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে কেনারাম নামক একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এসে দাঁড়ায় পদমর্যাদাহীন অটল এবং নিমচাঁদের বিপরীতে- মুখোমুখি হয় ক্ষমতাতন্ত্র ও ব্যর্থতা।

যে কেনারাম এই প্রহসনে ভবিষ্যত প্রজন্মের হয়ে ওঠার তাৎপর্য নিয়ে এসে দাঁড়ায়, গোটা প্রহসনে সেই চরিত্রটির কোন নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শবোধ বা নৈতিক অবস্থান আমাদের চোখে পড়ে না। তার কথাবার্তা ও আচরণে যেখানেই উনিশ শতকের বানিয়ে তোলা সাফল্য, ক্ষমতা এবং সেইসঙ্গে স্ববিরোধিতার চিহ্নগুলি প্রকট হয়ে ওঠে সেখানেই নিমচাঁদ তাকে ব্যতিক্রমহীনভাবে আক্রমণ করেছে। সাহেবরা চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে, এই ভয়ে কেনারাম ঘুষ খায় না। বস্তুত ঔপনিবেশিক ক্ষমতাতন্ত্রের কাঠামোয় নিজের অবস্থানের উপরেই নির্ভর করে থাকে কেনারামের গোটা জীবনদর্শন। মদ্যপান না করার কারণ হিসেবে একটি নিজস্ব স্বাধীন নৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করতে গিয়েও কেনারাম শেষপর্যন্ত বলে, "বিশেষত মদ খেলে কর্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদের মনে কি দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ ?"(২/৪)[৪] উপযোগবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সভ্যতার যে সংজ্ঞা এখানে কেনারামের হাতে তৈরি হয়ে ওঠে নিমচাঁদ তথা নিমচাঁদের বকলমে দীনবন্ধু মিত্রের কাজ হল সভ্যতার সেই অশ্লীল সংজ্ঞাকে প্রশ্ন করা। প্রতিবাদহীন, আনুগত্যপূর্ণ, একটি সভ্যতার ধারণা এই প্রহসনের ভেতরে তৈরি করে তুলতে চাওয়া হয়েছে ফল্গুধারার মতো। উপনিবেশের ক্ষমতাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কেনারামের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং মুখের ভাষাটুকুও উপনিবেশিত হয়ে পড়েছে। মদ্যপান যক্ষ্মারোগের কারণ, এরকম একটি শারীরবৃত্তীয় তর্কের দিকে যেতে গিয়েও কেনারামকে তাই বলতে হয়- "...মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই, তা হলে তো প্রমোসানও পাব না, মানুষ মনুষেত্বাও কত্তে পারবো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দু'টাকা দিতেও পারবো না।"(২/৪)[৫] বস্তুত কেনারামের সমস্ত যুক্তি গিয়ে শেষ হয় সাহেবদের কথায়। পদোন্নতির সঙ্গে পুণ্যের মেলবন্ধনকে যে সমাজ জীবনের লক্ষ্য বলে তুলে ধরতে চায়, সেই সমাজে কতগুলো অন্তর্ঘাত ঘটায় নিমচাঁদরা এবং একারণেই তারা উনিশ শতকের 'খারাপ ছেলে'। ফলত বোঝা যায় উনিশ শতকে উপনিবেশের বন্দোবস্ত স্থায়ীকরণে যে কেনারামসুলভ অবস্থান, তাকে কেন্দ্র করেই দীনবন্ধু মিত্র তাঁর তর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন 'সধবার একাদশী' প্রহসনে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও শিক্ষা যেখানে উপযোগবাদ ও ক্ষমতাতন্ত্রের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, প্রশ্ন ও প্রতিবাদহীন আনুগত্য তৈরির মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের উপনিবেশের বন্দোবস্ত বজায় রাখতে সাহায্য করে – সেখানেই নিমচাঁদের আক্রমণ। কেনারাম ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তার কাছে এই পদটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে ধর্ম তার কাছে কোন দার্শনিক অবস্থান বা নিগুঢ় ব্যক্তিগত অনুভূতি হয়ে ওঠেনি। নিমচাঁদ কেনারামকে ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলে, "আমি সমাজের সম্পাদক, আমি আর কিছু বুঝতে পারি নি।"(২/২)[৬] ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও পদই তৃপ্ত করে কেনারামকে। পরবর্তীতে 'রক্তকরবী' নাটকেও আমরা দেখেছি রাজার ধ্বজাপূজা কীভাবে ক্ষমতার প্রতীক হয়ে ওঠে। চাকরির সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য যোগ উনিশ শতকের শুরু থেকেই দেখা দিয়েছিল। এই

শতকের উপযোগবাদী শিশুশিক্ষা প্রকল্প লেখাপড়ার সঙ্গে গাড়ি- ঘোড়া চড়ার সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সেই শিক্ষা-প্রকল্পে অকারণের আনন্দ নেই, শিশুর কল্পনা বিস্তারের কোন পরিসর নেই, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত হয়ে ওঠাই এর মূল লক্ষ্য। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বাঙালি চাকরিজীবী গোষ্ঠীর যে কোনওরকম আবেগ বা মননের যোগ তৈরি হয়নি তার প্রমাণ বাংলা বাক্যের ইংরেজি তর্জমা করার ক্ষেত্রে কেনারাম ডেপুটির একাধিক অভিধান নির্ভরতা কিংবা মদ্যপ অবস্থায় ভোলাচাঁদ চরিত্রের ইংরেজি উদ্গারের অসংগতি। অন্যদিকে নিমচাঁদ শিক্ষিত হলেও পদমর্যাদাহীন, তার শিক্ষা যেহেতু উপযোগবাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, উনিশ শতকীয় বঙ্গ সমাজ তাই তাকে ব্যর্থ বলে চিহ্নিত করেছে। উপযোগবাদী শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতাকে উপলব্ধি করেই নিমচাঁদের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য- "সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।"(৩/৩)[৭] দীনবন্ধু মিত্র উপনিবেশের যে ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে চান নিমচাঁদ তার বাইরের মানুষ নয়। সময়ের সংকট তার মধ্যেও রয়েছে। কেনারাম ও নিমচাঁদ দুজনেই স্ববিরোধী, কিন্তু তাদের মধ্যে তফাৎ হল নিমচাঁদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত কান্না রয়েছে, যা কেনারামের নেই। নিমচাঁদ তার স্ববিরোধ সম্পর্কে সচেতন, দীর্ঘ পরিসর জুড়ে তার নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন রয়েছে- "জননি, কলিকাতায় লোক গুণ দেখে না; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুকলি কচ্চি নে- কলকাতার লোকে স্বর্ণখুরে-গর্দভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না- মা হস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ হয়েছে, আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব?" (৩/১)[৮]। নিমচাঁদের এই কান্নার কোন উপশম নেই, কারণ সে জানে এই সমস্যার সমাধান করতে সে অপারগ। স্বগতোক্তি শেষে তাকে আবার ফিরে আসতে হয় উনিশ শতকীয় যাপনেই। এখানেই নিমচাঁদ উনিশ শতকের একজন আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠে, কেবল আইডিয়া হয়ে থাকে না।

উপযোগবাদী শিক্ষা, ধর্ম ও মননহীন ক্ষমতাতন্ত্র ছাড়াও উনিশ শতকের বাবু কালচারকে কেন্দ্র করেও এই প্রহসনে কিছু তর্ক তোলা হয়েছে। অর্জিত অর্থকে সমস্ত অস্তিত্ব ও যাপনে অশালীনভাবে প্রদর্শনই ছিল উনিশ শতকের বাবুপনা। অর্থ এবং ক্ষমতার উৎকট, কুৎসিত প্রদর্শনীরূপে অটলরা রক্ষিতা প্রতিপালন করেছে। কতৃত্বের দাপট এবং মনুষ্যত্বের অবমাননাসূচক এই 'রক্ষিতা' ধারণাটিও ব্যঙ্গের মোড়কে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকে জানা যায় অটল বারবণিতা কাঞ্চনকে নিয়ে বারান্দায় এসে নেচেছে সকলকে 'দেখাবার' জন্য। নিজেকে বাবু বলে সমাজে প্রতিপন্ন করার জন্যই রক্ষিতা রাখা প্রয়োজন। উনিশ শতকের অর্থ ও ক্ষমতার উৎকট, কুৎসিত প্রদর্শনকে এ প্রহসনে যেমন প্রশ্ন করা হয়, তেমনি তার অশালীনতাকেও চিহ্নিত করা হয়। এভাবেই দীনবন্ধু মিত্র সমকালকে ঘিরে বহুমাত্রিক তর্ক তৈরি করেন তাঁর প্রহসনে।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় প্রহসনটি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'। ১৮৭৭-এর ৭ জুলাই প্রথম প্রকাশকালে এর নাম ছিল 'এমন কর্ম আর করব না' এবং এই নামেই প্রহসনটি জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চে অভিনীত হত। ১৯০০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এর নাম হয় 'অলীকবাবু'। এ প্রহসনে সমকালকেন্দ্রিক তর্ক খুঁজে বের করা আপাতভাবে কঠিন। এটি অলীকবাবু নামে এক ব্যক্তির নিজেকে নিয়ে বারফট্টাই করবার কাহিনি। এই অলীকবাবুকে প্রাথমিকভাবে কেবল উনিশ শতকেই স্থাপন করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' বইতে এ প্রহসন সম্পর্কে বলেছেন, "একবার ড্রামাটিক ক্লাবে অলীকবাবুর অভিনয় হয়। অলীকবাবু জ্যোতি কাকামহাশয়ের লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটি নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন।... কিন্তু ফরাসী ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। নয়তো হেমাঙ্গিনী কি আমাদের দেশের মেয়ে? এখনকার কালের হলেও সম্ভব ছিল, সেকালে অসম্ভব।"[৯]- অবনীন্দ্রনাথ এ প্রহসনে কালের চিহ্ন খুঁজে পান বটে, কিন্তু একে তিনি উনিশ শতকের নাটক বলে পড়তে চান না, বিশ শতকের নাটক হিসেবে দেখেন। অর্থাৎ 'অলীকবাবু' তাঁর কাছে সমসময়ের থেকে এগিয়ে থাকা নাটক। প্রসঙ্গত আর একটি সমালোচনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রিয়নাথ সেনের কাছে এই প্রহসনের উদ্দেশ্য "...কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সবল, উজ্জ্বল, বালকসুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি, নিছক বিশুদ্ধ হাসি।"[১০]- উনিশ শতকের প্রহসন সম্পর্কিত আমাদের প্রস্তাবকে এই বক্তব্য নস্যাৎ করে দেয়। প্রিয়নাথ সেন এ রচনায় কালকে খুঁজে পান না। এই দুই সমালোচনাকে সামনে রেখে আমরা বোঝার চেষ্টা করব 'অলীকবাবু'তে সমকাল এবং তাকে ঘিরে কোন তর্ক আছে কি না, কেনই বা এই প্রহসন লিখলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

প্রহসন শুরু হয় প্রসন্নর সংলাপ দিয়ে। বিধবা প্রসন্ন হেমাঙ্গিনীর পরিচারিকা। তাকে বিয়ে করতে চায় গদাধর, কারণ সে জানে বিধবা বিবাহ করলে টাকা পাওয়া যাবে- "আমাদের জগদীশবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে বিধবা বিয়ে চলতি না হলে দেশের ভালো হবে না। আর এই জন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্ছেন। এতে দেশের ভালোই হোক আর মন্দই হোক তাতে আমার কিছু এসে যায় না- আমার কিছু লাভ হলেই হল।"[১১] ফলত প্রসন্নকে বিবাহ প্রস্তাব দেয় গদাধর। প্রসন্ন বিধবা বিবাহ সম্পর্কে কিছুই জানে না- "একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ও মা কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কি গা পাগল হয়েচ না কি?"[১২] এই কথোপকথনের মধ্যে উনিশ শতকের চিহ্ন তো রয়েছেই। বিধবা বিবাহ কেন্দ্রিক যে টানাপোড়েন সংলাপের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে তা উনিশ শতকেরই টানাপোড়েন। প্রহসনের গোড়াতেই বলা হয়েছে হেমাঙ্গিনীর খানিকটা বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার বিয়ে হয়নি এবং এটা 'ঘেন্নার কথা'। গদাধর এর কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে, "সে

কি? এখনো বে হয়নি? তোমাদের কর্তা খেষ্টান নাকি?”[১৩] শুরু থেকেই বোঝা যায় উনিশ শতকের পটভূমিকাতেই এ প্রহসনকে স্থির করে বেঁধে রাখা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুযায়ী এ প্রহসনকে বিশ শতকের পটভূমিকায় স্থাপন করা মুশকিল।

এ প্রহসনে হেমাঙ্গিনী চরিত্রটি যতবার মঞ্চে প্রবেশ করে ততবার তার হাতে নভেল থাকে। নভেল যেন নিজেই একটি চরিত্র হয়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। হেমাঙ্গিনীর কাছে নভেল হল ‘জ্ঞানের কথা’র আকর। নভেল থেকে হেমাঙ্গিনী তিন ধরনের জ্ঞান অর্জন করে- জীবনচর্যা সম্পর্কিত জ্ঞান, জীবনদর্শন সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ভাষা (লিখিত ও কথ্য) সম্পর্কিত জ্ঞান। সাজগোজ সম্পর্কে হেমাঙ্গিনীর ধারণা নভেল-অনুমোদিত, “...চুলগুলো এলো করে রাখতে হয়-মুখে একটু দুঃখের ভাব আনতে হয়- কখনো বা চোখ মাটির দিকে করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়- মধ্যে মধ্যে খুব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে হয়- দেখ্ মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়না পরলে যত না হয় এক এক দীর্ঘনিশ্বাসে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়- এইরকম ভাব দেখালে নভেল-পড়া পুরুষগুলো একেবারে ভুলে যায়।”[১৪] নভেল পড়া পুরুষকে ভোলানোর জন্য নভেল পড়া মেয়ে নভেল অনুযায়ী সেজে যাচ্ছে। অলীকবাবু নভেলীয় সাজে সজ্জিত হেমাঙ্গিনীকে দেখে ‘হে প্রেয়সী, হে হৃদয়বল্লভ’ ইত্যাদি সম্বোধন করে। আপাতভাবে মনে হয় নভেল যেন নারী পুরুষ উভয়কেই গ্রাস করেছে কারণ অলীকবাবুর কথাও যথেষ্ট অতিরেকপূর্ণ এবং অতিনাটকীয়। কিন্তু এরপরেই অলীকবাবুর স্বগতোক্তি এই ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে- “এ কি! ঘোমটা নেই, চুল এলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপের মতো নিঃশ্বাস ফেলছে, ব্যাপারটা কি”[১৫] – দেখা যাচ্ছে নভেল পড়া মেয়ের সাজে নভেল পড়া পুরুষ ভোলেনি। নভেল নিয়ে হেমাঙ্গিনী আপ্লুত, নভেল তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে ভাবে নর-নারীর প্রেম বিষয়টির সৃষ্টিই হয়েছে নভেল আবিষ্কারের পর। অলীকবাবুর উদ্দেশ্যে চিঠি লেখে সে এবং সেই সূত্রে জানা যায় বিশেষণের আতিশয্যই যে ভালো লেখার শৈলি, এটা সে শিখেছে নভেল পড়ে। হেমাঙ্গিনীর প্রেমপত্রের ভাষা তাই নভেলানুসারী- “আমি জগতের সমক্ষে চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব তুমিই আমি স্বামী, শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, ...লক্ষবার বলিব তুমিই আমার স্বামী।”[১৬] হেমাঙ্গিনীর মুখের ভাষাও উপমাসমৃদ্ধ, প্রায় লেখার ভাষার কাছাকাছি- “দেখ পিসনি, আজ তটিনী সাগর উদ্দেশ্যে চলল- কল্‌কল্ নিনাদে চলল- দেখব কে তার গতি রোধ করে?”[১৭]

একটা বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে হেমাঙ্গিনী ও নভেলকে যেভাবে পেশ করতে চাইছেন লেখক তার মধ্যে একটি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি আছে। বস্তুত উনিশ শতকের পটভূমিকায় ‘নভেল’ শব্দটি ঋণাত্মক সাংস্কৃতিক তাৎপর্যবাহী। উনিশ শতকের ভাবনায় নভেল হল এমন এক ধরনের রচনা, যা বাস্তবতাবর্জিত, যেখানে সমসময়ের কোন চিহ্ন নেই, রয়েছে কেবল একধরনের রোম্যান্টিক আবিল কল্পনা। উনিশ শতকের

উপযোগবাদী সমাজে নভেল খুবই অনুপযোগবাদী একটি সাহিত্য-বর্গ। হেমাঙ্গিনীর উপর নভেলের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রহসনে প্রবল ঠাট্টা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ তথা তর্কের লক্ষ্য কী?- 'নভেল পড়া', না কি 'মেয়েদের নভেল পড়া' অথবা আরও বিশেষভাবে 'মেয়েদের পড়া'! বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু তার আগে আমাদের দেখা দরকার উনিশ শতকের সমাজ মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে কী ভাবছে। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ১৫৫ সংখ্যায় (আষাঢ়, ১২৮৩) 'স্ত্রী-শিক্ষা' সম্পর্কে লেখা হয়েছে- মেয়েদের লেখাপড়া করা উচিত, কিন্তু মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে। কারণ ছেলেরা যা শেখে মেয়েরাও যদি তা-ই শিখতে শুরু করে তাহলে "স্ত্রী প্রকৃতির উন্নতি হইবে না, স্ত্রী প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতিতে পরিণত হইবে, স্ত্রী পুরুষ হইয়া উঠিবে। অতএব বর্তমান প্রণালীর শিক্ষা অতীব দূষণীয়। ইহা প্রচলিত থাকিলে কাল সহকারে কমনীয় কামিনী প্রকৃতির মূলোচ্ছেদ করিয়া পৃথিবীকে পুরুষ প্রকৃতির আধার করিয়া দিবে। সুতরাং বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ছদ্মবেশে স্ত্রী হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমাদের কার্যদোষে জনসমাজ স্ত্রীত্ব শূন্য হইতে চলিল।"[১৮] 'সমাজ দীপিকা' পত্রিকায় ১৫ ই ভাদ্র, ১২৯২-এ প্রকাশিত হচ্ছে- "শিক্ষিত স্ত্রীলোক হস্তে কালি লাগিবার ভয়ে রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হইবে না। করতলে কার্কশ্য জন্মিবে এই আশঙ্কায় আর জলপাত্র, ভোজনপত্রাদি পরিমার্জনে ব্যাপৃত হইবে না। সে উল বুনিবে আর অবসরকালে বা আবশ্যকমতো 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠ করিবে।"[১৯]- এখানেই সমাজ মন আর 'অলীকবাবু' প্রহসনটি যেন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষার উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে হেমাঙ্গিনীর মুখে। কার্যত 'বন্দী' অলীকবাবু তার 'প্রাণেশ্বর' হলেও নভেল পড়া হেমাঙ্গিনী অলীকবাবুর কাছে 'বেহায়া বেহদ্দ' বলে প্রতিভাত হয়। হেমাঙ্গিনীর বাবা সত্যসিন্ধু বাবুরও শেষ মতামত এই যে- "...আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়েছিলাম, তার ফল এখন ফলেছে। রামরাম! কি লাঞ্ছনা। আর একটি ছোট মেয়ে আছে, তাকে আর লেখাপড়া শেখাচ্ছি নে- এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে, এমন কর্ম আর করব না।"[২০]- প্রহসনের পূর্ব নামকরণের যুক্তি এসে শেষ হয় মেয়েদের লেখাপড়ার বিরোধী একটি বক্তব্যে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, মেয়েদের লেখাপড়া করা উচিত কি উচিত নয়, এটাই এ প্রহসনের কেন্দ্রীয় তর্ক।

প্রহসনের এই মুখ্য তর্কে স্বয়ং প্রহসনকারের অবস্থান কী- সে সম্পর্কে এবারে আলোকপাত করা যেতে পারে। আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭৩) প্রসঙ্গে বলছেন- "এসময় আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম। তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। এই প্রহসনখানি প্রকাশিত হইবার পর প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম 'Indian Mirror'-এ আমার উপর কিছু না কিছু আক্রমণ থাকিতই।"[২১]- 'অলীকবাবু' তে মেয়েদের লেখাপড়াকেই ব্যঙ্গ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উক্ত উক্তির সাপেক্ষে প্রহসনকে বিচার করলে এ কথা

খুব ভুল হয় না। কার্যত ‘অলীকবাবু’তে উনিশ শতকে মেয়েদের লেখাপড়া বিষয়ক সমাজ-ভাবনার ছবিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই তর্কে প্রগতিশীল পক্ষ নেওইয়াটাই তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। নভেল পাঠ কী করে মেয়েদের ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, সেটিই প্রবল ব্যঙ্গের মাধ্যমে দেখাতে চান নাট্যকার। উনিশ শতক তার নিজস্ব তর্ক, নিজস্ব অবস্থান নিয়ে খুব স্পষ্টভাবেই বিরাজ করে এ প্রহসনে। প্রিয়নাথ সেনের মন্তব্যকে সমর্থন করে একে আর কেবল খাঁটি আমোদের নাটক বলা চলে না, তীব্র সংকটের প্রহসন হিসেবেই পাঠ্য হয়ে ওঠে ‘অলীকবাবু’।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.). *ভরত নাট্যশাস্ত্র (৩).* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন. ২০১৮. চতুর্থ মুদ্রণ. পৃষ্ঠা- ১০১

২. মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত (সম্পা.). *সাহিত্যদর্পণ.* কলকাতা: পুস্তকশ্রী. ১৩৬৭. প্রথম প্রকাশ. পৃষ্ঠা- ৫২৮

৩. ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পা.). *দীনবন্ধু রচনাবলী.* কলকাতা: হরফ প্রকাশনী. ১৩৬৩. প্রথম প্রকাশ. পৃষ্ঠা-১৩০

৪. তদেব. পৃষ্ঠা- ১৪৯

৫. তদেব. পৃষ্ঠা- ১৪৯

৬. তদেব. পৃষ্ঠা- ১৪১

৭. তদেব. পৃষ্ঠা- ১৬২

৮. তদেব- পৃষ্ঠা- ১৫২

৯. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ. *ঘরোয়া.* কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ. ১৩৪৮. পৃষ্ঠা- ১০১

১০. সেন, প্রমোদনাথ (সম্পা.). *প্রিয়পুষ্পাঞ্জলী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন বিরচিত.* কলকাতা: কালিকা প্রেস. ১৩৪০. প্রথম সংস্করণ. পৃষ্ঠা- ১২৯

১১. ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ. *অলীকবাবু.* হুগলী: শ্রীলালবিহারী বড়াল প্রকাশিত. ১৩২৮. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃষ্ঠা- ৪

১২. তদেব. পৃষ্ঠা- ৫

১৩. তদেব. পৃষ্ঠা- ৩

১৪. তদেব. পৃষ্ঠা- ৪৪

১৫. তদেব. পৃষ্ঠা- ৪৬

১৬. তদেব. পৃষ্ঠা- ৩৭

১৭. তদেব. পৃষ্ঠা- ৪৪

১৮. বামাবোধিনী পত্রিকা. ১৫৫ সংখ্যা. ১২৮৩. পৃষ্ঠা- ৭৪

১৯. মামুন মুনতাসির (সম্পা.). *দুই শতকের বাংলা সাময়িকপত্র.* কলকাতা: পুস্তক বিপণি. ২০০০. প্রথম প্রকাশ. পৃষ্ঠা- ১০১
২০. ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ. *অলীকবাবু.* হুগলী: শ্রীলালবিহারী বড়াল প্রকাশিত. ১৩২৮. দ্বিতীয় সংস্করণ. পৃষ্ঠা- ৮৭
২১. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার. *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি.* কলকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস. ১৩২৬. পৃষ্ঠা- ১৩৭

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও সংবাদ : পারস্পরিক সম্পর্কের এক সাহিত্যিক পর্যালোচনা

পৌলমী সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও সংবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যথাযথভাবেই উপন্যাসে বাস্তবতার প্রসঙ্গ উঠে আসে। আমাদের সমাজে বর্তমানে যা ঘটে চলেছে তা সংবাদ রূপে প্রতিদিন প্রতিফলিত হয়। সংবাদ এবং বাস্তব প্রকৃত অর্থে একই মুদ্রার দুটি দিক। বাস্তবে যা ঘটছে তাই সংবাদে দেখা যাচ্ছে । প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় সংবাদ ও বাস্তব একে অন্যের পরিপূরক। শিল্পসৃষ্টির জন্য কল্পনার সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আধুনিকতা হল আধুনিক জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা। অর্থাৎ আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যে বাস্তব পটভূমি থাকবে তথা বাস্তবমুখী ঘটনা বিরাজ করবে তা বলাই বাহুল্য। সাম্প্রতিক বাংলা ঔপন্যাসিকগণ স্বভাবতই আধুনিক। আধুনিক যুগ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের সৃষ্টি চৈতন্যের প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, তাঁর যুগের সমস্যা তাঁকে যদি স্পর্শ করে, তাঁর যুগের ধর্ম ও স্বরূপ সম্পর্কে তিনি যদি সচেতন থাকেন, তবেই তিনি তাঁর যুগে আধুনিক। ঔপন্যাসিককে আধুনিক হতে হলে তাঁকে যে শুধু বর্তমানের যুগ-পরিবেশের ধারকই হতে হবে, তাঁর শিল্পী-চৈতন্য হবে শুধু বহির্জগতের প্রতিফলনের যন্ত্র, এমন নয়। তিনি ভবিষ্যতের স্রষ্টাও হতে পারেন, তাঁর অন্তর্লোক নতুনের জন্মদাতাও হতে পারে। বর্তমান যুগ পরিবেশের অতিরিক্ত কিছুও তাঁর ধ্যানলোকে জন্মলাভ করতে পারে। এতে তাঁর আধুনিকতার বা বাস্তবতার ক্ষতি হয় না। তাই বলা যায়, সাহিত্য ও সংবাদ উভয়ের পক্ষে জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনার একটা সুযোগ পাওয়া যায় সাম্প্রতিক যুগের বাংলা উপন্যাসে তথা সাহিত্যে।

শব্দসূচক : সংবাদ, বাস্তবতা, আধুনিক বাংলা উপন্যাস, বেকার-সমস্যা, বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় আন্দোলন, নারী-প্রগতি।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উপন্যাস সর্বাধুনিক এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাখা। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর খুবই তাৎপর্যবহ। উপন্যাস বাস্তব নির্ভর শিল্প, উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক অতি নিগূঢ় ও বহুমাত্রিক। ফলে উপন্যাসে বাস্তবতার অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়। উপন্যাস জীবন নির্ভর শিল্প বলেই তাতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে জীবনবীক্ষা। আলোচ্য প্রবন্ধে সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও সংবাদের যোগসূত্র কতটা তা দেখতে চেষ্টা করব। উপরন্তু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক-এর মধ্যে যোগসূত্র তথা মেলবন্ধন কতটা তা দেখব। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত দশকের প্রবহমান সময়ে বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত

প্রভাবিত করেছে বাংলা সাহিত্যকেও। এপারের খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন সহ নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ও পালাবদল, ওপারের ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের জন্ম সহ নানা ঘটনার অভিঘাত, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন উপন্যাসের বিষয় হিসেবে এসেছে। এসেছে দেশ-বিদেশের দ্রুত বদলে যাওয়া সময়ের অনুপুঙ্খ।

সংগঠন ও কাহিনীর বিবেচনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশেই বাংলা উপন্যাস পরিপক্কতা অর্জন করেছিল । পরবর্তীকালে তা বিচিত্র ও বর্ণিল সংগঠন ও কাহিনী অবলম্বন করে এবং লাভ করে আন্তর্জাতিক মাত্রা । এ সব রচনায় ইউরোপীয় ও মার্কিন প্রভাব , পরিলক্ষিত হলেও দেশীয় প্রেক্ষাপটের অবলম্বনের প্রচেষ্টাও ছিল উল্লেখ করবার মতো । তবে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হুমায়ূন আহমেদের হাতে বাংলা উপন্যাস সকল বিদেশী প্রভাব কাটিয়ে আঙ্গিকে, ভাষায় ও বিষয়ে --- সব দিক দিয়ে স্বাবলম্বী ও শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে । ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা গল্পের চেয়ে বাংলা উপন্যাস পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তর হয়ে ওঠে । বাংলা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের নতুনতম অঙ্গ । আনন্দ সংকর এবং লীলা রায় উল্লেখ করেছেন যে, "১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় যখন প্রথম উপন্যাস লেখা হয়, এটি আমাদের জন্য নতুন ছিল, এটিতে ভাষার ব্যবহার এবং যে সমাজ ও তার সদস্যদের জন্য লেখা হয়েছিল তারাও নতুন ছিল" । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর মতো শক্তিমান লেখকদের অবিরল অবদানের ফলে বাংলা সাহিত্যের এই নতুন সৃষ্ট ধারাটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'নতুন' থেকে 'পরিপক্কতা' অর্জন করে ।

বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে । প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে । এর আখ্যানভাগে এবং রচনাশৈলীতে উপন্যাসের মেজাজ পরিলক্ষিত হয় । অচিরেই বাংলা উপন্যাসের একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে দীর্ঘ কাল বাংলা উপন্যাসে ইউরোপীয় উপন্যাসের ধাঁচ ছায়া ফেলেছে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে ঋদ্ধ করেছেন তাঁর হাতেও উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করেছে । শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আরেকজন প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক যিনি উপন্যাসের জন্য দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেছেন । তবে এঁরা সবাই মানুষের ওপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ১৯৮০'র দশকে হুমায়ূন আহমেদের সবল উপস্থিতি অনুভূত হওয়ার আগে বাংলা উপন্যাসের অধিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিকদের অবদান ছিল সংকীর্ণ । এ সময়কার কয়েকজন প্রধান লেখক হলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার , রমাপদ চৌধুরী , সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় , শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । তবে সত্তর দশক পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক

কবি জীবনানন্দ দাশের অনন্যসাধারণ উপন্যাস সমূহের অস্তিত্বের খবর । তিনি ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে ২২টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন ।

বাংলা উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও কমলকুমার মজুমদারের হাতে। এঁদের হাতে উপন্যাস বড় মাপের পরিবর্তে মানবিক অস্তিত্বের নানা দিকের ওপর আলোকপাত করে বিকশিত হয় । বস্তুত রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত সবচেয়ে কুশলী উপন্যাস শিল্পী । তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিকশিত হতে দেখা যায় । এঁরা উপন্যাসকে ব্যবহার করেছেন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক জটিলতার ওপর নিবিড় আলোকপাতের উদ্দেশ্যে । তাঁদের হাতে উপন্যাসে শিল্প শৈলীতে সঞ্চারিত হয়েছে দৃঢ় গদ্যের সক্ষমতা । মানবীয় ও সামাজিক বিষয়ের বিচিত্র বিবেচনা উপন্যাসকে সাধারণ পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন এবং একইসঙ্গে উপন্যাসের বাস্তবিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা উপন্যাসে সম্পূর্ণ নতুন করণকৌশল নিয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি বাংলা উপন্যাসকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। বাংলা উপন্যাস দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিকদের হাতে পরিপুষ্ট হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদ দেখালেন যে ইউরোপীয় আদলের বাইরেও সফল, রসময় এবং শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস লেখা সম্ভব।

একবিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের উত্তরাধিকার বহন করে । এ সময় নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসের স্বাক্ষর রেখেছেন কতিপয় লেখক। উত্তরআধুনিক ধ্যানধারণা অবলম্বন করেও লিখেছেন কেউ কেউ । একবিংশ শতাব্দীতে বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন লেখক হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ । এই সময় দেবেশ রায় উপন্যাসে যোগ করেছেন নতুন মাত্রা । উপন্যাসের প্রধান গুণ বাস্তবতাবোধ । বর্তমান সমাজে ঘটে চলা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের উপন্যাসে ঘটনারূপে স্থান দেন । অর্থাৎ উপন্যাসে বাস্তব ঘটনা প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । এক্ষেত্রে সংবাদের প্রাসঙ্গিকতা আসাটাই স্বাভাবিক । বর্তমানে দেশ-বিদেশের ঘটনা, পরিস্থিতি নিয়েই গড়ে উঠছে খবর । সংবাদের ছোঁয়া বর্তমানে উপন্যাসে না থাকলে তা পাঠকের পড়তে ভালো লাগে না । উত্তেজনাপূর্ণ টানটান পরিস্থিতি ও কাহিনী বাস্তবসম্মত না হলে উপন্যাসের প্রতি বর্তমান পাঠকের আগ্রহ কমে যায় ।

উপন্যাসের সঙ্গে সংবাদের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপন্যাসে উঠে এসেছে । আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমিঃ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তা প্রধানত দেখা দিয়েছে । আধুনিকতা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে । আধুনিকতা কোনো একটি স্থির ধারণা নয়, আধুনিকতা একটি প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক পর্ব । আমাদের এই যুগ, এই আধুনিক যুগ, সূচিত হয়েছে ১৯১৯-২০-র

পর থেকে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে । এখান থেকে আমাদের যুগের স্বতন্ত্র সমস্যা ও রূপ, নিজস্ব দর্শন ও প্রবণতা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে । কিন্তু স্পষ্টভাবে, 'আনুষ্ঠানিক ভাবে' , সাহিত্যে এই আধুনিকতা রূপ লাভ করল ইংরেজি ১৯২৩ সালে অর্থাৎ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে । এই সময় আধুনিক লেখক-গোষ্ঠী 'কল্লোল' প্রকাশ করে আধুনিকতার বাণী-প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন । আধুনিকতা ছাড়াও এই যুগের তথা সংবাদ ও সমাজের প্রধান প্রসঙ্গগুলি হলো শিল্পায়নের সূচনা ও যন্ত্রীকরণ, বিশ্বযুদ্ধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, দারিদ্র-দুর্ভিক্ষ- মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, সামাজিক ভাঙন ও মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, জাতীয় আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম, নব-নব চিন্তাধারা ও আশাবাদী জীবনদর্শন, শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নারী-প্রগতি । এই প্রসঙ্গগুলি তথা বিষয়গুলি আধুনিক উপন্যাসে শক্তিশালী জায়গা করে নিল ।

বিশ্বের সবখানেই সাহিত্যিকদের সাংবাদিক হবার নজির প্রচুর । সাহিত্যের সঙ্গে তথা উপন্যাসের সঙ্গে সংবাদপত্রের নিশ্চয় একটা গভীর যোগাযোগ আছে । আপাতদৃষ্টে যত গোলমেলে মনে হোক, দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র এখানেই যে, পৃথিবীর ঘটনাবলী উভয়ের উপজীব্য । সংবাদপত্র অবশ্য অনেকখানি সরাসরি ইতিহাসের উপাদান যোগায়। সাহিত্য তথা উপন্যাস যোগায় পরোক্ষে । ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক । ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, সেভাবে এদেশে প্রাচীন যুগে কিছুই লেখা হয়নি । কিন্তু বেদ, রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণ, অথবা কালিদাসের কাব্য থেকে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান চোখে পড়ে, যে কোনো যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক তা থেকে প্রকৃত ইতিহাসের অনেকটাই অনুমান করতে পারেন । অপরদিকে মহাভারতে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র ব্যাপারটা তো দস্তুরমত একালের সাংবাদিকতাসুলভ ধারাবিবরণীর সমতুল্য । ঘটনাবলী বর্ণনায় একালে সংবাদপত্রের যে ব্যবস্থা, প্রাচীনকালে তা ভিন্নরূপে ছিল এবং থাকাটা আবশ্যিক ছিল । সম্রাট বা শাসকদের জানতে হত দৈনন্দিন ঘটনাবলী এবং প্রতিটি পরবর্তী ফলাফল । সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে ডেভলপমেন্ট বলা হয় । এছাড়া পর্যটকদের মুখে-মুখে, হাটে-মাঠে বাজারে লোকজনের মারফত ছড়িয়ে পড়ত সব হরেকরকম খবর । একালেও যেমন সংবাদপত্রের পাতায় সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার সমস্যা আছে, ওইসব ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বইতে একই সমস্যা থেকে গেছে ।

খুব তলিয়ে মৌলিকভাবে দেখতে সংবাদপত্র কিন্তু আসলে তদন্তকারীর ভূমিকাও অচ্ছেদ্যভাবে পালন করে । এমনকি, সামাজিক তদন্তকারীর ভূমিকা সংবাদপত্রের উদ্ভবের সময় ছিল । এদিকে ইতিহাস হল ইংরেজি হিসটরির প্রতিশব্দ হিসেবে সংগৃহীত । হিসটরি এসেছে গ্রিক শব্দ হিস্টেরিন থেকে । তার মানে হল তদন্ত । হিসটরির প্রথম রূপকার হেরোডোটাস তদন্ত অর্থে কথাটা প্রয়োগ করেছিলেন । অতএব সংবাদপত্র এক অবর্জনীয় পরিবেশক ।

সাহিত্যিকের তথা ঔপন্যাসিকের ভূমিকা এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ । সংবাদপত্র তথা ইতিহাস বহিরঙ্গ নিয়ে মশগুল --- সে দেখে সমগ্রকে । ব্যক্তিত্ব তার চোখে অংশমাত্র । কিন্তু উপন্যাস দেখায় আরও তলিয়ে । আরও গভীর থেকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিকে --- সুতরাং তার সমাজকেও । একেকটি যুগের ভেতরকার রক্ত মাংস বিশ্লেষণ করে উপন্যাস বস্তুত ইতিহাসকেই সমৃদ্ধ করে তোলে । উপন্যাস আর সংবাদপত্রের গদ্যের আঙ্গিক পৃথক । কিন্তু সব খবরকে সাহিত্য করতে গেলেই বিপদ । খবরের নিজস্ব গতি প্রকৃতি ও ধাঁচ আছে । কারণ খবরের কারবার অবজেকটিভিটির সঙ্গে । উপন্যাসের কারবার সাবজেকটিভিটির সঙ্গে । তবু শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক অথবা নিপুণ ঔপন্যাসিক কোনো খবরে সাবজেকটিভ-অবজেকটিভ সমন্বয় ঘটিয়ে দিতে পটু । সংবাদপত্রের সাব-এডিটর যদি সাহিত্যের কারবারী হন, স্বাভাবিকভাবেই খবরকে সামান্য সাহিত্যের রঙে রাঙাতে প্রলোভিত হতেই পারেন ।

উপন্যাস ভাষাশিল্পী করে তোলে । সংবাদেও ভাষাশিল্প জরুরি । কোনো সাংবাদিক --- যিনি হয়তো সাহিত্যিক নন, তিনিও কিন্তু আসলে ভাষাশিল্পী । ঔপন্যাসিক নন, নিছক সাংবাদিক --- এমন বিস্তর লেখা উৎকৃষ্ট উপন্যাস হয়ে উঠেছে । ওয়াশিংটন পোস্টের রবার্ট-এ বেকারের লেখা ‘পোর্ট্রেট অফ জেন’ । সে এক অসামান্য রিপোর্টাজ এবং সাহিত্য । তেমনি বিষাদজনক এক ট্র্যাজেডির অবজেক্টকিভ বিবরণ ।

পরিশেষে বলা যায় সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস ও সংবাদপত্রের এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় উপরোক্ত আলোচনাতে । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাশে সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা হিসেবে উপন্যাস ও সংবাদপত্র (অবশ্যই সাহিত্য রসসমৃদ্ধ) যে যার অবস্থানে ভাস্বর ।

তথ্যসূত্র:

১। বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, কার্তিক লাহিড়ী, সারস্বত লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০।

২। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, ডঃ রামেশ্বর শ’, পুস্তক বিপণি।

৩। প্রবন্ধ বিচিত্রা, ডঃ দেবেশকুমার আচার্য, ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, প্রজ্ঞা বিকাশ পাবলিকেশন, জুলাই, ২০১৫।

আলকাপের আলোকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘মায়ামৃদঙ্গ’

সুজিত দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিনোদ বিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ (Abstract) : আলকাপ মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্টরূপ ও প্রসিদ্ধ লোকনাট্য। সাধারণত গ্রামীণ নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আলকাপের উৎপত্তি হয়েছিল। তবে ‘আলকাপ’ কথাটির মধ্যে ‘আল’ ও ‘কাপ’- এই দুটি সমার্থক শব্দই ‘রঙ্গরস’ এর প্রতীক। তাই ‘আলকাপ’ কথাটির প্রকৃত অর্থ আমোদপ্রমোদমূলক নাটিকা। এই কথাটির অর্থব্যঞ্জনাগত দিক দেখলে ‘ব্যঙ্গ রসাত্মক নাটিকা’ বা ‘রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক নাটিকা’ নামেও প্রচলিত। আলকাপ মূলত পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত – ‘আসর বন্দনা’, ‘ছড়া’, ‘কাপ’, ‘বৈঠকী গান’, ও ‘খেমটা পালা’। এই পাঁচটি অংশকে আলকাপের পরিভাষায় ‘পঞ্চরস’ বলা হয়। বলাবাহুল্য, আলকাপকে কেন্দ্র করে ওস্তাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। আলকাপ লোকনাট্যকে ভিত্তি করে তিনি রচনা করেন ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাস। এই উপন্যাসে কথাশিল্পী মুস্তাফা সিরাজ আলকাপ শিল্পীদের জীবন-যন্ত্রণা, হাসি-কান্না ও ক্রোধ লালসার অসাধারণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন আলকাপের প্রয়োগ বৈচিত্র্যতা লক্ষণীয়, অন্যদিকে তেমনি লোকসংস্কৃতির এক জ্বলন্ত দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
মূল শব্দ(Keyword) : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আলকাপ, মায়ামৃদঙ্গ, পঞ্চরস, মুর্শিদাবাদ, লোকনাট্য

মূল আলোচনা(Discussion)

আলকাপ হল মূলত এক প্রকার লোকনাট্যের শৈলী। সাধারণত এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা ও বীরভূম এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় প্রচলিত। ‘আলকাপ’ শব্দটি ‘আল’ এবং ‘কাপ’ শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। ‘আল’ শব্দের অর্থ ‘হুল’ বা ‘কণ্টক’ আর ‘কাপ’ শব্দের অর্থ ‘কৌতুক’ বা ‘প্রহসন’। ‘আল’ ও ‘কাপ’ শব্দ দ্বয়ের মিলিত সমন্বয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। যেমন সূক্ষ্ম তামাসা, রঙ্গ -ব্যঙ্গ, ধারালো কৌতুক ইত্যাদি । তবে আলকাপের সংজ্ঞা নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। ওস্তাদ ঝাঁকসুর মতে –

> "সংস্কৃত- মূলে কাপট্য থেকে কাপ- ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক। আর আল - মানে হল, মৌমাছির হুল। মধু খেতে হলে হুলের জ্বালাও সইতে হবে। তাই, কেমন কাপ? না- যার আল আছে।"[১]

অর্থাৎ আলকাপ গান শুধুমাত্র লোকহাসানো গানই না, হাসানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ত্রুটি, বিচ্যুতি, অসঙ্গতির ব্যঙ্গ – বিদ্রুপকে প্রতিবাদের সঙ্গে তুলে ধরার পাশাপাশি জনসাধারণকেও সচেতনতা করা হয়। বলাবাহুল্য, আলকাপ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> "এক প্রকার গ্রামীণ নাট্যের নাম 'আলকাপ'। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেই তা সমধিক জনপ্রিয়। যদিও অনুষ্ঠানটি ধর্ম নিরপেক্ষ তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তা বিশেষ সমাদার লাভ করেছে। আলকাপ পূর্নাঙ্গ নাটক নয়, তাকে গ্রাম্য জীবন চিত্র ভিত্তিক নাটকীয় নকশা বলা যেতে পারে।"[২]

আলকাপ গানের এক একটি দলে মূলত দশ থেকে বারোজন শিল্পী থাকেন। এঁদের নেতাদের বলা হয় 'সরদার' বা 'গুরু' বা 'ওস্তাদ'। তবে দু' তিনজন অল্পবয়সী শিল্পী আলকাপ দলে থাকে, যাদের বলা হয় 'ছোকরা'। এছাড়াও এই আলকাপ দলে অন্যান্য শিল্পীরাও থাকে। যথা – দোহার, সন্মেলক গায়ক, গায়েন(গায়ক)। আলকাপ মূলত পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত – 'আসর বন্দনা', 'ছড়া', 'কাপ', বৈঠকী গান' ও 'খেমটা পালা'। তবে এই পাঁচটি অংশকে আলকাপের পরিভাষায় 'পঞ্চরস' বলা হয়। এখানে 'পঞ্চরস' বলতে মূলত পাঁচমিশেলি আঙ্গিককে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, কলকাতা যাত্রাদলের অনুকরণে এর নাম হয় 'আলকাপ পঞ্চরস অপেরা'। বর্তমানে অনেক দলের নাম 'পঞ্চরস অপেরা' বা 'অপেরা' নামে প্রচলিত। বলাবাহুল্য, আলকাপের পঞ্চরস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

১। আসর বন্দনাঃ-

অন্যান্য লোকনাট্যের মত আলকাপের আসর বাঁধাধরা জায়গায় হয় না। এটি সাধারণত লোকালয় থেকে দূরে খোলামেলা মাঠে বা বাগানের সামান্য উঁচু জায়গাতে আসর বসতে দেখা যায়। আলকাপ গান শুরু করার পূর্বে যন্ত্রসঙ্গীত হতে থাকে। এই যন্ত্রসঙ্গীত শেষ হলে দলের নাচিয়ে ছোকরারা আসরে উঠে জয়ধ্বনি করে। আর জয়ধ্বনি শেষ হলেই ওস্তাদের আসর বন্দনা শুরু হয়।

২। ছোকরাদের খেমটা নাচ ও বৈঠকী গান :-

আসর বন্দনা পর্যায় শেষ হলেই ছোকরাদের খেমটা নাচ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকী গান পরিবেশিত হয়। এই বৈঠকী গানে থাকে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি সুরে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত এমনকি জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের গান।

২। ছড়া গানঃ-
বৈঠকী গান শেষ হলে ওস্তাদ বা মাস্টার কোন বিষয়কে ভিত্তি করে সাময়িকভাবে ছড়া গেয়ে থাকেন। তবে দোহারীরা ছড়া গাইতে পারে। দেশাত্মবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, রোগ-ব্যাধি, শিল্পীর পরিচয় ইত্যাদি ছড়াগানের বিষয় হয়।
৩। কাপঃ-
ওস্তাদের ছড়াগান শেষ হলে লাব্বার উঠে ছোকরাদের সঙ্গে পুরুষ ও নারীর বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পাতিয়ে নানা রসালাপ করতে থাকে আর প্রতিটি মুহূর্তকে রসঘন করে তোলে। তবে এর কাজ হল কৌতুক সৃষ্টি করে শ্রোতার মনোরঞ্জন করা ।

উপরিউক্ত আলকাপের রূপরেখার প্রেক্ষিতে আমরা আলকাপের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করতে পারি-
১। আলকাপের পালায় দুজন ছোকরা প্রয়োজন। তবে এরা সাধারণত নারীবেশি কিশোর হয়।
২। আলকাপের অভিনয়ের কোন লিখিত রূপ থাকে না। এটি মূলত কোন ঘটনা বা গল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে বলেছেন –

'আলকাপে তো লিখিত নাটক নেই। ঘটনটা শুধু জানা থাকে। তাকে স্থানকালপাত্র অনুসারে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। একই পালা প্রতি আসরে প্রতিবার নতুন নতুন চেহারা পায়। ঘষামাজায় ঝকঝকে হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার ধোপে যা কিছু গলতি, সব বাতিল হয়ে যায়। নতুন নতুন কথা আসে। যেন জলমেশানো দুধ থেকে কালক্রমে জলটুকু বাতিল করে দুধটুকু শ্রোতাদের ক্ষুধিত ঠোঁটের সামনে এগিয়ে দেওয়া।"[৩]

৩। গান ও ছড়া হল আলকাপের অন্যতম উপাদান।
৪। লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে আলকাপ গানের ব্যাপকতা লক্ষণীয় ।
৫। এটি মূলত গ্রামীণ অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের দ্বারাই অভিনীত হয়।
৬। এখানে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের বাতাবরণ আলকাপ গানকে এক গতিময়তা প্রদান করে, যা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।
৭। এর নাট্যরীতি ও অভিনয়রীতি অন্যান্য নাটকের অভিনয়ের থেকে অভিনব ও স্বতন্ত্র্যময়।
৮। আলকাপ মূলত দশ বা বারোজন শিল্পীর সম্বনয়ে গঠিত। কপে, ছোকরা, হারমোনিয়াম, বাদক, তবলচি, জুড়ি বা করতাল বাদক, সহ অভিনেতা এবং দোহারকি – এদেরকে নিয়েই গড়ে ওঠে আলকাপ দল।

অতঃপর, মুর্শিদাবাদের তথা উত্তরবঙ্গের প্রচলিত আলকাপ লোকনাট্যকে কেন্দ্র করে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসেই

আলকাপ শিল্পীদের জীবন যন্ত্রণা, হাসি-কান্না ও ক্রোধ লালসার পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রতে আলকাপের পরশকাঠির ছোঁয়া গভীরভাবে প্রতিফলিত। এবার আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে আলকাপের পরশকাঠির প্রভাব বা প্রয়োগ বৈচিত্র্যতা কতখানি রয়েছে তা তুলে ধরব।

তিনি 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের শুরুতে আলকাপের ছোকরার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন –

> "যারা পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী -তবু নারী নয়। যদি বা পুরুষ, সে পুরুষ স্মৃতির পুরুষ পরোক্ষ। যদি বা নারী- সে নারী অধরা নারী প্রত্যক্ষ কিন্তু বিভ্রম। দেহে কণ্ঠে মনে একান্ত কিন্নর ।"[৪]

অর্থাৎ বিশ বছরের এই কিশোর বা সদ্য তরুণের বর্ণনা করা হয়েছে। যার দেহসৌষ্ঠব বা কণ্ঠে সুন্দরতা নয়, চলনে-বলনে, আহারে-বিহারে তাঁকে নারীরূপে গড়ে তুলেছেন লেখক। এই নারী রূপী ছদ্মবেশী ছোকরা আলকাপের পঞ্চরস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আবার, কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রথমে আসরে ওস্তাদ ঝাঁকসুর সঙ্গে গঙ্গামনির সাক্ষাৎ। আর এই আসরেই গঙ্গামনি গুনগুনিয়ে গান করে-

> "সই আমার গঙ্গাজল হে
> সই আমার গঙ্গার জল
> জন্ম জন্ম ডুবলাম যত পেলাম না তো বুকের তল।"[৫]

এই গান মাত্র তিন মাসে ছড়িয়ে পড়ে দেশ- দেশান্তরে। মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে বীরভূম- বীরভূম থেকে দুমকা পূর্নিয়া সাঁওতাল পরগণা – এমনকি গঙ্গামনির দেশ কালুপাহাড়ি অঞ্চলে।

অতঃপর, কালের স্মৃতিতে ওস্তাদ ঝাঁকসুর চঞ্চল চিত্তবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে ছড়ার ধুয়োর মধ্যে দিয়ে –

> "নদীর স্রোতের মত কালের গতিতে আমার
> হেলায় বেলা বহে যায় গো।"[৬]

অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায়, নদীর স্রোত যেমন কালের গতিতে প্রবাহমান তেমনি ওস্তাদ ঝাঁকসুর অবহেলায় সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই গানের মধ্যে দিয়ে ওস্তাদ ঝাঁকসুর নিদারুণ জীবন যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ওস্তাদ ঝাঁকসু লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে আলকাপকে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। তাই ওস্তাদ ঝাঁকসু লোকশিক্ষার প্রসঙ্গে দেশভাগ জনিত একটি ধুয়োর পদ আসরে গেয়েছেন-

> "বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।
> (তোর) সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ রক্তধারায় লালে লাল।।

মনে করি হলাম স্বাধীন
আমরা মাগো চির পরাধীন-
হয়ে এখন বিশ্বের অধীন
অন্নবিনে নাজেহাল।।”[৭]

এই গানের মধ্যে দিয়ে পরাধীনতার অধীনে বসবাস এবং দারিদ্র্যতার ছবি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ। আবার, ঝাঁকসুর অন্য একটি গানে দেখা যায় –

“লাল মুখোরা গেছে চলে
সে কথায় যেওনা ভুলে
কালো মুখের তলে তলে
আড়াল থেকে ছড়ায় জাল
(এখন) দুই সতীনে চুলোচুলি
সতীন কারা? না- এই হিন্দুস্থান পাকিস্থান
দুই সতীনে চুলোচুলি
এর গালে চুন(ওর) গালে কালি
চুলো নিয়ে বিবাদ খালি
ঘরের চালেই ধরায় জ্বাল
বাংলা মা তুই কাঁদবি কতকাল।।”[৮]

অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান হয়ে দেশ স্বাধীন হলেও ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের অন্তকলহ বা বিবাদে দেশ জর্জরিত হয়ে পড়েছে আলোচ্য আলকাপ গানে তা প্রতিফলিত । এই আলকাপ গানের তৎকালীন সময়ের রাষ্ট্রের অবস্থার চিত্র কেমন ছিল তা ‘মায়ামৃদঙ্গ’ উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন।

আবার, বন্যেশ্বরের মেলায় ধনঞ্জয় সরকার ওরফে ওস্তাদ ঝাঁকসুর গলায়-

“(আমি)মানুষ দেখতে এসেছিলাম ভবে-
(আমার) এমন জনম আর কি হবে।
সাঙ্গ হল দেখা শোনা চুকিয়ে দেব লেনাদেনা
(এত) দেখেও তো দেখা হল না
তল পেলাম না ডুবে
(আমার) এমন জনম আর কী হবে।” [৯]

এই আলকাপ গানের মধ্যে দিয়ে তাঁর (ওস্তাদ ঝাঁকসুর) না পাওয়ার বেদনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। মানুষ হয়ে জন্মেছে তাই মৃত্যু অনিবার্য, অতিরিক্ত আশা করা বৃথা ইত্যাদি-র কথা এই গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, শ্রোতার নানা রূপ বিদ্রুপ ওস্তাদ ঝাঁকসুকে শুনতে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার গানে শ্রোতামণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে যায়। আবার, ঝাঁকসু শুধু নিজের দলের গৌরবই নয়, অন্য দলের গৌরবের জয়গান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাই আসরে সে উচ্চ কণ্ঠে গান গেয়েছেন –

“তোমরা দেখ গো ভাঙা দালানে,
বটের চারা বাড়ে কেমনে।।
আমার বুকে বাড়বে সুখে
যাব আমি শমন ভবনে-
বটের চারা বাড়ে কেমনে।” [১০]

তার এই গানের মধ্যে দিয়ে বিষাদের সুর ফুটে উঠেছে। এই গান আসরে জনপ্রিয় না হলেও বিষাদের করুণ বাতাবরণ তৈরি করেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কালীতলা বর্ডারে ওস্তাদ ঝাঁকসুর গানের মধ্যে দিয়ে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান দুই দেশের সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে –

“হায় রে হায়, কেমনে বাঁচব জান ।
হল হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান
ভাই রাখে না ভাইয়ের মান,
কেমনে বাঁচব জান।।
মোরা, হিন্দু মুসলমান
এক মায়ের সন্তান
ভায়ের মুখ দেখতে ভাইকে
ওনারা সব পাসপোর্ট চান,
কেমনে বাঁচব জান।।”[১১]

আসলে এই গানের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, সিরাজ হিন্দু ও মুসলিম জাতপাতের উপরে উঠে তাদেরকে শুধু মানুষ হিসেবে দেখেছেন। তার এই গানে হিন্দু ও মুসলিম যে একই মায়ের সন্তান তার বার্তাও ফুটে উঠেছে। আসলে তিনিই প্রথম কথাসাহিত্যিক যার সাহিত্যে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে হিন্দু ও মুসলিম মানুষের কথা। তাই এই প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক মুস্তাফা সিরাজের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

“ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাইনে। লেখক হিসেবে আমি চরিত্র বেছে নিই দরকার অনুযায়ী। হিন্দু মানুষ মুসলমান মানুষ কিছু বুঝি না। মানুষ বুঝি। এই দেশের মানুষ। তাদের ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। আমার কোন শুচিবায়ু নেই। মানুষ আমার কাছে শুধু প্রকৃতির সন্তান।” [১২]

আবার, তিনি তাঁর উপন্যাসে বর্ণবৈষম্যের সমস্ত বাধা নিয়ম চুরমার করে ব্রাহ্মণ সন্তান সনাতনকে আলকাপের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছেন। তাই সনাতনের গলায় আলকাপের সুর শোনা যায় –

“কী আনন্দ দেখে গো নভে নবীন চাঁদের উদয়
মায়ায় মায়ায় জন্ম যাক না, যদি আরেকজন্মে সত্যি হয়।” [১৩]

বলাবাহুল্য, এই সনাতনকে ওস্তাদ ঝাঁকসুর সঙ্গে ইসা পয়গম্বরের ভূমিকায় অভিনয় করতেও দেখা যায়। আসরে তার গলায় সুর শোনা যায় –

"হেথা- বাদশা ফকির সবায় সমান
হিন্দুরা শশ্মান বলে, মুসলমানে গোরস্থান।।
আবার- এইখানেতে যিনি খোদা
সেইখানেতেই ভগবান।।
সনাতন রায় ভেবে বলে
মুদলে চক্ষু যাব চলে
হিন্দু ভাইরা বলুন হরি, আল্লা বলুন মুসলমান।।" [১৪]

আসরে এই গানের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রীতি অন্যদিকে তেমনি হরি ও আল্লার মিলিত প্রতিধবনি শোনা যায়। আলকাপের রীতি প্রসঙ্গে সনাতন বলেছেন-

> "তবে- এ ভীষণ গোরস্থানে আমার উদয়, মনে বড় চিন্তা হয়, কে হারাল প্রিয়জন, না জানি কী অমূল্যরতন, তারে দিতে আশা, আমি পয়গম্বর ইসা ...." [১৫]

সনাতনের এই উক্তি শুধু দর্শকমণ্ডলীকেই মুগ্ধ করে না, এমনকি ওস্তাদ ঝাঁকসুকে পর্যন্ত মোহিত করে তোলে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কথাশিল্পী মুস্তাফা সিরাজের আলকাপ প্রেক্ষাপটে লেখা 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস যেন জনজীবনের রক্ত-মাংসের এক জীবন্ত দলিল। এই উপন্যাসে লেখক যেভাবে জীবনকেন্দ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংবেদনশীল মন ও কাঠামোর অবয়ব তুলে ধরেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। বলাবাহুল্য, 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসকে অবলম্বন করে পরবর্তীকাল 'মায়া' নামে নাটকও নির্মিত হয়। লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসটি আলকাপ লোকনাট্যের এক জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে কিংবা ভবিষ্যতে 'বুড়ো ঘোড়া' বলে বাতিল হবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যসূত্রঃ-

১। সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৬২
২। ভট্রাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা ০১২, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৬২, পৃষ্ঠা ১৩২
৩। সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃষ্ঠা ১৮৩
৪। ঐ, পৃঃ ১৬৩
৫। ঐ, পৃঃ ১৬৩
৬। ঐ, পৃঃ ১৬৮

৭। ঐ, পৃঃ ১৭৯
৮। ঐ, পৃঃ ১৭৯
৯। ঐ, পৃঃ ১৭৩
১০। ঐ, পৃঃ ২০৮
১১। ঐ, পৃঃ ১৮৬
১২। মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম(সম্পাদক), সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা-৩২, ২০১৩ জুলাই -ডিসেম্বর যুগ্ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৪৩
১৩। সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৬২
১৩। ঐ, পৃঃ ২১৭
১৪। ঐ, পৃঃ ২১৭
১৫। ঐ, পৃঃ ২১৭

‘ভূত ও মানুষ’ গল্পগ্রন্থে স্যাটায়ারিস্ট ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

দেবাশিস মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রভাত কুমার কলেজ, কাঁথি

বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন এমন সাহিতিক্যের সংখ্যা অতি অল্পই। যে কয়েকজন সাহিত্যিককে আমরা পাই তার মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে পারি। তিনি প্রৌঢ় বয়সে বাংলা সাহিত্য জগতে অবতীর্ণ হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছেন। তিনি মূলত হাস্যরসের শিল্পী, গল্প রচনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপই (Satire) তার ব্যবহৃত গল্পের মাধ্যম। ত্রৈলোক্যনাথের বহু বিচিত্র জীবন তাঁর সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা বৈঠকী গল্প ধারার সুপরিকল্পিত রূপ তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভট ভয়াল পরিবেশ রচনায় তিনি ছিলেন দক্ষ শিল্পী। মানুষের ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা ও হৃদয়হীনতাকে তিনি নির্মমভাবে রূপায়িত করেছেন। রূপকথাকে আশ্রয় করে তিনি সমাজের বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি রোমান্স প্রবণ কল্পনার জগৎত সৃষ্টি করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের পরবর্তী যুগে নিপুণ ব্যঙ্গ শিল্পী পরশুরামের সাথে তাঁর তুলনা অনেকে করে থাকেন এবং সে বিষয়ে অধিক কিছু বলারও নেই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক-কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য- “...ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রচনার পরিমাণ, শ্রেণিভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্যনাথ বোধ করি পরশুরামের উপর। আবার রচনার সূক্ষ্মতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা। ...ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরষ্কার ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে।”[১] ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ যে ধরনের তুফান তুলে থাকে তা শুধুমাত্র সকরুণ নয় তার মধ্যে আছে তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, যা নিদারুণও বটে। ফলত ত্রৈলোক্যনাথের রচনার প্রভাব মনের উপর গভীর ও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে। যে ব্যক্তি বা সমাজ তাঁর ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের লক্ষ-স্থল হয়েছে ত্রৈলোক্যনাথের বাণ সেখানে বেশ সুন্দরভাবে প্রবেশ করেছে। এদিক দিয়ে ব্যঙ্গ শিল্পী হিসাবে তাঁর অসাধারণত্বকে কোনো মতেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প-গ্রন্থ সংখ্যা মোট চারটি। প্রথম গল্প-গ্রন্থ ‘ভূত ও মানুষ’- এর গল্পগুলিতে স্যাটায়ার বা অন্যান্য হাসির বাতাবরণ কীরকমভাবে গল্পগুলিকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে তা-ই এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই গল্প-গ্রন্থে

'বাঙ্গাল- নিধিরাম', 'বীরবালা', 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' নামক মোট চারটি গল্প আছে। গল্প- গ্রন্থটির 'ভূত ও মানুষ' নামকরণের মধ্য দিয়ে বলা যায় লেখক এখানে ভূত ও মানুষ- এই দুইরকম চরিত্রের কথাই বলবেন। শুধুমাত্র 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটি বাদ দিয়ে অন্য তিনটি গল্পতেই ভূতের অবতারণা করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। খোলাখুলিভাবে সমাজের বিশেষ শ্রেণির মানুষের সমালোচনা না করে ত্রৈলোক্যনাথ ভূতের ছদ্মনামটুকু ব্যবহার করেছেন। আসলে লেখক সৃষ্ট নানা ভূত চরিত্রগুলো বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরই প্রতিনিধি স্থানীয়।

লেখক 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটিতে আমাদের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও তার নিষ্ঠুরতাকে, ধনীর সর্বব্যাপক প্রতিপত্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাছাড়া রূপজ প্রেমের পাশাপাশি আত্মজ প্রেমের ছবি অঙ্কন করে রূপজ প্রেমকে ব্যঙ্গ করেছেন। কাহিনিটি একটি শোকসন্তপ্ত জীবনের করুণ ব্যর্থতা দিয়ে রচিত। যদিও গল্পটিতে এই কারুণ্যকে প্রধান করে দেখানো হয়নি, তার পরিবর্তে মানব জীবনের এক ব্যথাভরা অসঙ্গতিকে তুলে ধরে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে।

নিধিরাম শোকসন্তপ্ত। এই যন্ত্রণা, শোক, জ্বালা ভোলার জন্যই। সে গঙ্গার কোলে তার জীবন সমর্পণ করে মৃত্যুর চির-শান্তি লাভ করতে চেয়েছে। কিন্তু তাকে মৃত্যুর পথ থেকে উদ্ধার করে নিয়তি যেন তার সাথে আর একবার নতুন করে পরিহাস করে গেল। নিধিরামের সাথে এককড়ির সাক্ষাৎ, হিরণ্ময়ীর সাথে বিবাহ প্রস্তাব, নিধিরামের পুনরায় বাঁচার সাধ, হিরণ্ময়ীর জন্য কষ্ট বরণ, শেষে আঘাত লাভ- এগুলোর মাধ্যমে নিয়তি নিধিরামকে এক করুণতম অভিজ্ঞতার মধ্যে এনে ফেলেছে। এরকম কাহিনি নতুন করে জীবন সত্যের সন্ধান দিয়ে আমাদের অবুঝ মনের কামনা-বাসনাগুলিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছে।

তৎকালীন সমাজ মানুষের ওপরে জাত, কুল-মর্যাদার স্থান দিত। মুমুর্ষ প্রায় তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যখন জীবনের শেষ দিন গুনছে, একফোঁটা জলের জন্য ছট্‌ফট্ করছে তখন সেই ব্যক্তির জাত-কুল বংশের পরিচয় চাওয়া যে কতখানি অমানবিক তা সহজেই অনুমান করা যায়। লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এমন অমানবিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, ব্যঙ্গের আঘাতে সেই অসঙ্গতিকে দূর করতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সামাজিক নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তারই সামান্য উদাহরণ এখানে দেওয়া হল– "দুইজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। নিধিরাম ধীরে ধীরে তাহাদিগকে বলিলেন– মহাশয়! পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কৃপা করিয়া যদি আমার মুখে একটু জল দেন, তাহা হইলে এই আসন্নকালে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি।"[২] এরকম পরিস্থিতিতে জল না দিয়ে এক ব্রাহ্মণ নিধিরামকে তার নাম, নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিধিরামকে জল না দিয়ে সেখান থেকে দুই ব্রাহ্মণ রৌদ্রের ভয়ে চলে গেলেন।

গল্পের মধ্যে লেখক এবার এক ধনী মুসলমানকে এনে দেখিয়েছেন যে আজকের দিনের মতো সেদিনেও ধনীর একটা প্রবল প্রতাপ সমাজে প্রচলিত ছিল, তখনও পয়সার জোরে কেউ কেউ সমাজের সর্বপ্রকার মান সম্মান আদায় করে নিত। লেখক এদেরই ব্যঙ্গ করে বলেছেন- "বদরুদ্দিন সেখ বলিয়া একজন ডাক্তার আছেন। এখন আর তিনি বদরুদ্দিন নাই। চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে জমিদারি কিনিলেন, এই স্থানে ইমারত বাড়ি করিলেন। ও টাকার মানুষ! যখন তাঁহার অনেক টাকা হইল। তখন তিনি 'বদরুদ্দিন সেখ' নাম ছাড়িয়া 'বৈদ্যনাথ সেন' নাম লইলেন। টাকা হইলে কি না হয়? ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে একগাছা সূতা তিনি পরিলেন। প্রথম প্রথম সূতাগাছটি কোমরে রাখিতেন, নাভির উপরে তুলিতেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে সূতাগাছটি কাঁধের উপর তুলিলেন। তখন সেটি যজ্ঞোপবীত হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় তিনি 'সেন' ছাড়িয়া 'শর্মা' উপাধি গ্রহণ করিলেন।"[৩]

গল্পের প্রধান কাহিনি নিধিরাম ও হিরণ্ময়ীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। হিরণ্ময়ী বড় সুন্দরী যুবতী। অবশ্য কুল যেখানে বড় সেখানে রূপের মূল্য ম্লান। কুলীনের দ্বারা বেষ্টিত সমাজকে বিদ্রুপ করেই লেখক বুঝি তাই বলেছেন "হিরণ্ময়ী পরমা সুন্দরী। কিন্তু কুলীনের ঘরে সৌন্দর্যের গৌরব নাই।"[৪] গরিব পিতাকে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনো উচ্চাশা রাখাও পাপ কেননা টাকাই সমস্ত কিছুর মূল্য নির্ণায়ক। লেখক এখানে ধনবান সমাজকে কটাক্ষ করেছেন- "যেমন উচ্চ আশা করিয়াছিলাম, সেইরূপ ফল পাইয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।"[৫]

হিরণ্ময়ী যে নিধিরামকে চন্দ্র-সূর্য-দেবতাদিগের সাক্ষী করে স্বামী বলে মেনে নিয়েছে, সেই হিরণ্ময়ীই নিধিরামকে বাঙ্গাল বলেছে "বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ! ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।"[৬] হিরণ্ময়ী নিধিরামকে বাঙ্গাল বলে বোধ হয় আত্মমহিমাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। চেয়েছে নিজেকে বুদ্ধিমতী বলে প্রমাণ করতে। কিন্তু সত্যিকারের বুদ্ধিমান কে তা আমাদের বুঝতে দেরি হয় না- "নিধিরাম কুরূপ, কদাকার বাঙ্গাল বটে, কিন্তু অভদ্র নয়।"[৭] নিধিরামের মতো মহৎ চরিত্রই হিরণ্ময়ীর মতো চরিত্রকে যেন ব্যঙ্গ করে। লেখক নিধিরামের প্রতি দরদ ও সহানুভূতির দৃষ্টি রেখে সমাজের সত্য রূপকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'ভূত ও মানুষ' গল্প গ্রন্থের 'বীরবালা' গল্পটিতে নায়ক দেবীসিংহ ক্ষণকালীন তন্দ্রাবেশে যে স্বপ্ন দেখেছে তারই বর্ণনা করেছেন লেখক। লেখক দেবীসিংহের স্বপ্নের মাধ্যমে দেশের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাকে ব্যক্ত করেছেন। 'বীরবালা' গল্পটি যে রূপকধর্মী সে কথা অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। এই রূপক কাহিনি একটি মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ড. সুকুমার সেন মহাশয়ও এই গল্পটিকে রূপক কাহিনি বলে অবিহিত করেছেন। প্রমথনাথ বিশীও বলেছেন- "বীরবালা একখানা রূপক কাহিনি। খুব সম্ভবত ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা, তাহার প্রাচীন গৌরব, ইংলন্ডের সহিত এদেশের যোগ

স্থাপন প্রভৃতিই কাহিনির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত।"[৮] ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও গল্পটি যে রূপকধর্মী তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পের প্রারম্ভেই- "পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন।"[৯] উক্তিটির মাধ্যমে সমগ্র কাহিনিতে লেখক রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন, কেননা ধর্মের প্রতি তৎকালীন জীবনের তামসিকতার প্রতি ব্যঙ্গ করা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আনুগত্য দেখানো সেই সমাজে কিছু কষ্টসাধ্য ছিল। তাই ব্যঙ্গ ও সত্যকে রূপকের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন লেখক।

ভারতের প্রাচীন গৌরব ও অকস্মাৎ সেই মহিমা থেকে পতন এবং পুনরায় হারানো গৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথের ইসারা রূপককে আশ্রয় করে বীরবালা গল্পে রূপায়িত হয়েছে। গল্পটিতে ভারতের প্রাচীন গৌরব থেকে পতনের যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তা বিশেষভাবে ব্যঙ্গাত্মক। গল্পের কাহিনিটি রাজপুতের বিশেষ করে ক্ষত্রিয়ের। তৎকালীন ভারতের যে গৌরব ছিল তা একান্তভাবেই রাজপুতের। অবশ্য পরবর্তীকালে ভারতের দীনহীন যে অবস্থার ছবি পাই তা বিশেষ করে ভ্রান্ত ধর্ম প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। অতীতে যে ভারতবর্ষ অতুলনীয় ছিল শৌর্য, বীর্যে, ত্যাগে, প্রেমে সেই ভারতবর্ষের মহিমা দীপ্ত রূপ এবং তার আলো যেন অমাবস্যা বাবাজীর মতো ছদ্মবেশী ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এই অমাবস্যা বাবাজী কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যার মতোই সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধের দ্যোতক। তার নামটিও এ গল্পে বিশেষ ব্যঙ্গপূর্ণ। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ধর্মান্ধতার চাপে সব বলিষ্ঠতা হারিয়ে ফেললই, এমনকি ক্ষত্রিয় বীরেরাও স্বধর্মচ্যুত হলেন। একদিকে অমাবস্যা বাবাজী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধের দ্যোতক অপরদিকে ভারত সিংহ রাজপুত ক্ষত্রিয়, তাকে মোহগ্রস্ত ভারতেরই প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে। অমাবস্যা বাবাজীর প্রভাবে ভারত সিংহ জড়ে পরিণত হয়েছে। লেখক তাই বলেছেন– "ভারত সিংহ এক্ষণে জড় পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, যা ভালো বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"[১০] এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে ছাড়েনি অমাবস্যা বাবাজী।

গল্পটিতে কমলাকে ধর্মের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে। অধর্মরূপী অমাবস্যা বাবাজী সুকৌশলে ভারত সিংহের নবজাত শিশুকন্যা ধর্মরূপিনী কমলাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলে। গল্পটিতে এভাবে চলে অধর্ম দ্বারা ধর্ম বিনাশের খেলা। অপর দিকে বীরবালা একাধারে অতীত ক্ষাত্রতেজের মূর্ত প্রতীক ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের মুক্ত প্রাণের উজ্জ্বল অগ্রদূত। গল্পে লেখক বীরবালাকে প্রকৃতপক্ষেই বীরা রূপে এঁকেছেন। তাই দুঃখে তার শুধু চোখের জল পড়ে না তা আবার বাষ্পও হয়ে যায় সহস্র কর্মে, কর্তব্যে ও প্রেমের উত্তাপে। তাইতো বীরবালা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে গমন করেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। সে সমস্ত ভয়কে, বিপদকে অগ্রাহ্য করেছে, সহস্র দুঃখের কাঁটা পদদলিত করেছে।

গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই ত্রৈলোক্যনাথ ইংরাজদের উদারতা ও ধর্মবোধের দ্বারা বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন আমাদের ধর্ম অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন এবং

ওদেশের ধর্ম প্রাণময় ও স্বচ্ছ। তিনি তাই অনুভব করলেন ভারতকে প্রকৃত স্বধর্মে ও স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে হলে পাশ্চাত্যের সাথে যোগসাধন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্যের সাথে মিলন মানে এটা নয় যে আমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হব বা নিজেদের জাতীয়ত্ব বিসর্জন দেব। বরং এটা বলা যেতে পারে যে আমাদের জীবনের যে আলো ছিল তা অল্প সময়ের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল, পাশ্চাত্য জীবনের স্বচ্ছ, সাবলীল ও প্রাণময় শক্তি দিয়ে তাকে আমরা আবার উদ্‌ঘাটন করব। আমাদের সেই হারানো গৌরব পাশ্চাত্য প্রভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। গল্পটিতে বীরবালা যে সাহেব ভূতদের সাহায্যে কমলাকে উদ্ধার করল– তা যেন তারই স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

ত্রৈলোক্যনাথ দেবীসিংহের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দাম্পত্যের একটি স্বরূপও উদ্‌ঘাটন করেছেন। হনুমানজী সেই সত্যকে দেখালেন দেবীসিংহের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। দেবীসিংহ যেভাবে শুধু রমণীর রূপেরই ধ্যান করে তা ভারতীয়দের বিশেষ করে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুর্বলতারই পরিচয়, এই দুর্বলতার প্রতিও তীব্র ব্যঙ্গ আছে গল্পটিতে। বীরবালা ভারতীয় নারীর আদর্শ। তার মধ্যে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বীরত্ব ও ভারতীয় জাতির প্রেম ত্যাগ, দুঃখবরণ– দুই-ই আছে। এটা দেখানোও লেখকের আরেকটি অন্যতম উদ্দেশ্য। লেখক গল্পটির মধ্যে গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও স্বভাব-সুলভ রঙ্গ-ব্যঙ্গ ছাড়তে পারেননি। হনুমান কর্তৃক দেবীসিংহের টিকি টানাটানিতে কৌতুক রসের অবতারণা করেছেন লেখক।

'ভূত ও মানুষ' গ্রন্থের 'লুল্লু' গল্পটি ভূত চরিত্র প্রধান গল্প। গল্পটি আজগুবি ভূতের গল্প হিসাবে বেশ উপভোগ্য। অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দেশ্য ভূতের গল্পের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি, তাঁর গভীর উদ্দেশ্য বিভিন্ন সভাধারী মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। এই রচনার মধ্যে যে অসংখ্য ভূতেদের ছড়াছড়ি প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদেরই অন্তরের অন্ধকার জাত। গল্প মধ্যে লেখক সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত সুশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন তবু একথা স্বীকার্য যে সত্যিকারের সুশিক্ষা গ্রহণ করলে মানুষের মনুষ্যত্বের মৃত্যু হয় না ।

গল্পটিতে জনৈক ভূত আমাদেরই দোষ দেখিয়ে বলেছে, যদি মানুষ মরা ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের আর ভূতগিরি করতে হয় না। এই যুক্তিও ব্যঙ্গাত্মক। এদেশে বিলাতি কাপড় আসে কারণ আমরা তা পরি, আবার ইংরেজ এদেশকে নিধন করে দিচ্ছে রেল কোম্পানি খুলে কেন-না আমরা রেলে তীর্থযাত্রা করি। দেশের অর্থ দেশেই থেকে যাবে যদি আমরা কাপড় পরা ও রেলে বেড়ানো বন্ধ করে দিই। তেমনি মানুষ মরা বন্ধ করলে ভূতদেরও আর ভূতগিরি করতে হয় না। লেখক ভূতের যুক্তি দ্বারা আমাদের সমকালীন উগ্র স্বদেশীয়ানাকেই কটাক্ষ করেছেন। আমাদের মতো মানুষেরা রেল কোম্পানি খুলতে পারি না, পারি না দেশীয় কাপড় তৈরি করতে অথচ বিলাতিদ্রব্য বর্জনের জন্য আন্দোলন করতে পারি। এ ধরনের মানুষের চিন্তা-ভাবনার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন। তিনি নিজ দেশের উন্নতির জন্য বহুরকম চেষ্টা

করেছেন তাই হুজুগ সর্বস্ব স্বাদেশিকতা সহ্য করতে না পেরে যুক্তি দিয়ে তার অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ লুল্লুর মাধ্যমে সাহেবিয়ানা এবং নকলপ্রিয় নব্যবঙ্গ সমাজের বিকৃত রুচিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। লুল্লু একজন নব্যসভ্য ভূত। নিজের কালো অপবাদ দূর করার জন্য সে রোজ সাবান মাখে। সমস্ত রাত সে বাড়ির বাইরে থাকে এবং ভোরে বাড়ি ফেরে। এগুলো সভ্য হওয়ার মানদণ্ড রূপে লুল্লু জাহির করেছে। লুল্লু ইংরেজি পড়া বাবু লোকেদেরই নকল করে সভ্য হয়েছে বলে গর্ব করে। গল্পটিতে পরস্ত্রীর প্রতি লুল্লুর লোলুপ দৃষ্টিও লক্ষণীয়। আমীরের স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্য সে নানা মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। আমীরের স্ত্রী লুল্লুকে প্রথমে গ্রহণ করতে না পারলেও পরবর্তী পর্যায়ে লুল্লু যখন মানুষের সংস্পর্শে এসে মনুষ্য সুলভ আচরণ করেছে তখন তাকে আমীরের স্ত্রী সহজভাবে গ্রহণ করেছে, শুধু তাই নয় বিনা সংকোচে তার পিঠে চড়ে অনেক জায়গায় যাতায়াতও করেছে। মানুষের সংসর্গে এসে যেমন দুর্দান্ত লুল্লুর পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তেমনি সমাজের কুটিল, হিংস্র মানুষগুলোও যখন প্রকৃত মানুষের পাশে আসবে তখন তাদের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেবে– এই আশ্বাস বাণীর প্রতিই ত্রৈলোক্যনাথ ইঙ্গিত করেছেন।

গোঁগোঁকে ত্রৈলোক্যনাথ পত্রিকার সম্পাদক ও তার বিচিত্র রচনা পদ্ধতি বর্ণনা করে যোগ্যতাহীন সম্পাদকদের ব্যঙ্গ করেছেন। গোঁগোঁ লেখা পড়া জানে না, শুধু ভূতের গালাগালি জানে সেটুকু সম্বল করে আমীর তাকে সম্পাদক করে বেশ রোজগার করেছে "একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত, গুলি চৌদ্দ পুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না"[১১] যারা সাহিত্যিক গুণের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অর্থলাভের জন্যই পত্রিকা সম্পাদনা করে থাকেন তারাই হয়ে উঠেছেন লেখকের কটাক্ষের পাত্র।

ধর্ম সম্বন্ধে এক ধরনের সংকীর্ণতা ত্রৈলোক্যনাথকে পীড়িত করেছে। লেখকের জীবনী থেকে জানা যায় তিনিও ধর্মান্ধতার কারণে বিলাত থেকে ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করে তবেই সমাজে উঠেছিলেন। তখনকার সমাজ ধর্ম সম্বন্ধে কীরূপ গোঁড়া ছিল লেখক লুল্লুর উক্তিতে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন– "আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাইরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যে রূপ অপক্ক মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেই রূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন।"[১২] ভারতের বাইরে গেলেই ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে এই কুসংস্কারকে লেখক স্পষ্টভাবে ব্যঙ্গ করেছেন গল্পটির মধ্যে।

গল্পের মধ্যে ঘ্যাঁঘোঁর প্রণয় কাহিনি বর্ণনা করে লেখক দেখিয়েছেন তখনকার সমাজে কারও কারও একাধিক বিয়ে হতো আবার কারও কারও বিয়েই হতো না। ঘ্যাঁঘোঁ নিজের দুঃখ প্রকাশ করে বলেছে– "সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরা ঘ্যাঁঘোঁ হইতে পারিলাম না। আর কত লোক দশটা কুড়িটা বিবাহ করিয়া ষোল আনার চেয়ে বেশি হইয়া পড়ে।"[১৩] ঘ্যাঁঘোঁর বিয়ে না হবার কারণ অন্য ভূতেরা তার বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। এরকম ভূতরূপী মানুষের প্রতি লেখক কটাক্ষ তো করেছেনই সাথে সাথে যে ঘ্যাঁঘোঁ তার প্রেমিকা নাকেশ্বরীকে দেখা অবধি তার ছবি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে এবং যখনই বিরহে কাতর হয়েছে সেই ছবি দেখে প্রশান্তি লাভ করেছে সেই ঘ্যাঁঘোঁরূপী প্রেমিকারাও লেখকের ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে লেখক ব্যবসায়ী, জ্যোতিষী, ভূতের রোজা এদেরও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদের প্রতি ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটি 'ভূত ও মানুষ' গ্রন্থের চতুর্থ তথা শেষ গল্প। গল্পটি সামাজিক, ব্যঙ্গাত্মক রচনা। আমাদের কুসংস্কার কিছুটা দূর হলেও সম্পূর্ণ যে বিলুপ্ত হয়নি তারই নিদর্শন পাই গল্পটিতে। ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক সৃষ্টি ডমরুধর চরিত্রটি, নয়নচাঁদকে তারই পূর্বরূপ বলা যেতে পারে। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারক হিসাবে নয়নচাঁদের প্রথম আবির্ভাব, আর ডমরুধরের মধ্যে সেই প্রতারণার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ গল্পটির মধ্যে হিন্দুদের প্রতি বিদ্রূপ আছে মনে করে ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকলে ত্রৈলোক্যনাথ একজায়গায় গল্পটি যে শুধু মনোরঞ্জনের জন্য রচনা করেছেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন – "নয়নবাবুর গল্পটি আমি করিয়াছি বটে, কিন্তু তার সব কথা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।"[১৪] অর্থাৎ লেখক গল্পটিকে হাস্য-কৌতুকের মাপ কাঠিতে বিচার করতে বলেছেন।

গল্পটিতে যেভাবে নয়নচাঁদ তার নিজের কাহিনি বর্ণনা করেছে তাতে সে যত হালকাভাবেই, কথা বলুক না কেন, সে যেন আমাদের ভাববিলাসিতাকে, আমাদের বুদ্ধিহীনতাকে, আমাদের ভ্রান্ত ধর্মচেতনাকে, এমনকি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষেরই হুজুগপ্রিয়তা ও যুক্তিহীনতাকে অবলীলাক্রমে ব্যঙ্গ করে গেছে। নয়নচাঁদ যে শীতলার ছড়া বেঁধেছিল তা শুনে আমরা হাসিতে লুটোপুটি খাই। সে প্রতিটি কাজে নিজেকে এমনভাবে জাহির করেছে ও বড় মনে করেছে তাতে আমাদের মনে হাসির উদ্রেক হয়, আমরা প্রচুর হাসি। নয়নকে লেখক এমনভাবে এঁকেছেন যাতে সর্বদা একটা হাস্যরস ঝরে পড়ে। তার চাল-চলন, তার প্রতিটি কথা, তার ভয়, তার বাহাদুরি, তার কান্না– সবকিছুতেই আমরা অফুরন্ত হাস্যরস উপভোগ করি।

আসলে আমাদের সমাজের গলদগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ স্যাটায়ারিস্টের আসনে বসে সমাজের এক বিশেষ গোষ্ঠীকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আক্রমণের বিষয় জাতি ও সমাজ। এই ব্যক্তি

নিরপেক্ষ আলোচনার জন্য তাঁর রচনায় হাস্যরসের প্রচুর উপাদান লক্ষ করা যায়। সমাজ-সংস্কারক মনোভাব নিয়েই তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। পূর্ববর্তী হাস্যরস স্রষ্টাদের সঙ্গে মিল থাকলেও তাঁর বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। তিনি আড্ডার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে একজন কথকের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে আক্রমণ করেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক কাহিনির স্রষ্টা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের স্থান নির্ণয় করা খুবই সহজ। বস্তুত তিনি যে ধরনের কাহিনি রচনা করে বাংলা সাহিত্যে অমরত্বের পাকাপাকি আসন দখল করেছেন সে ধরনের কাহিনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি লক্ষ করা যায় না।

সূত্র নির্দেশ :

১. দেবনারায়ণ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণী, পৃ. ১৮৯
২. সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১, কামিনী প্রকাশালয়, পৃ. ৫৫০
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮
৮. দেবনারায়ণ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৯৬, পুস্তক বিপনী, পৃ. ৫০
৯. সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১, কামিনী প্রকাশালয়, পৃ. ৫৭০
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১৪. দেবনারায়ণ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৯৬, পুস্তক বিপনী, পৃ. ৬২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। অজিতকুমার ঘোষ, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০২, করুণা প্রকাশনী।
২। আব্দুশ সাকুর, রসিক বাঙালি, প্রথম প্রকাশ (বাংলাদেশ) ফেব্রুয়ারি ২০০৯, প্রতিভাস।

৩। দেব নারায়ন রায়, ত্রৈলোক্যনাথ: জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি।

৪। পরিমল গোস্বামী, আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯, প্রথম বাংলা আকাদেমি সংস্করণ মাঘ ১৪১৬ (জানুয়ারি ২০১০), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৫। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ: কথাসাহিত্য ভাবনা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা মাঘ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০৫, রত্নাবলী।

৬। মীরা অধিকারী, পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ রচনা, প্রথম সংস্করণ ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০), সাহিত্য প্রকাশ (পরিবেশক)

৭। সান্ত্বনা চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ-স্বর্ণকুমারী-প্রভাতকুমারের গল্প, প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৩, পুস্তক বিপণি।

৮। সুদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), তৃতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১১, কামিনী প্রকাশালয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রাধা’ : আঞ্চলিকতা নয়, অঞ্চলচেতনা

সুচন্দ্রা রায়
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ‘রাধা’ সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা বহুলচর্চিত। এর কারণ তারাশঙ্করের এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ ও ঔপন্যাসিক উপাদানের সঠিক গ্রন্থনে বিচ্যুতি। ইতিহাসাশ্রয়ী এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এই বিচ্যুতিকে প্রাধান্য দেননি। তার কারণ তিনি ‘রাধা’ উপন্যাসকে একান্তভাবেই রাঢ়ের কাহিনি করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রাঢ় অঞ্চলের মাটিতে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারার স্বরূপ উন্মোচনে অতিপ্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এই বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। রাঢ়ের দেশজ স্বকীয়তাপূর্ণ বৈষ্ণব পরকীয়া রসসাধনার রূপোদ্ঘাটনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাই বৃহদর্থে তাঁর অঞ্চলচেতনার পরিচয় দেয়। এই কারণের জন্য তাঁকে আঞ্চলিক লেখক হিসাবে চিহ্নিত করাটা সঠিক সমালোচনা নয়। এই উপন্যাসে প্রকটিত তাঁর ধর্মচেতনার মধ্যে আসলে তাঁর অঞ্চলচেতনারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাকে তাঁর আঞ্চলিকতা বলে উল্লেখ করা অযথার্থ। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টিই বিশদে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস, রাধা, আঞ্চলিকতা, তারাশঙ্করের ধর্মচেতনা, ইতিহাসচেতনা, হার্ডি।

মূল আলোচনা:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ‘রাধা’ লেখা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে, প্রথমে এটি শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে বই আকারে পুনর্প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তী ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস রচনার একটি ধারা শুরু হয়েছিল। যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’ (১৯৫০), প্রমথনাথ বিশীর ‘কেরী সাহেবের মুন্সি’ (১৯৫৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ‘কলকাতার কাছেই’ (১৯৫৯), ‘বহ্নিকন্যা’ (১৯৬০), বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’ (১৯৫২), রমাপদ চৌধুরীর ‘লালবাঈ’ (১৯৫৪-৫৫), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিকিকিনির হাট’ (১৯৫৭), সমরেশ বসুর ‘উত্তরঙ্গ’ (১৯৫১) ইত্যাদি। সমসাময়িক উপন্যাস রচনার এই ধারা অনুসরণ করেই এ সময়ে তারাশঙ্কর লিখলেন ‘রাধা’।

সমালোচকদের মধ্যে ‘রাধা’ উপন্যাসকেন্দ্রিক আলোচনার ধারা মূলত দুটি দিকে যেতে দেখা গেছে। প্রথমত, এটা কতটা ঐতিহাসিক উপন্যাস; দ্বিতীয়ত, তারাশঙ্করের

ধর্মচেতনা এই উপন্যাসে কতটা প্রকট হয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে সমালোচকেরা প্রায় সবাই একমত যে, ‘রাধা’কে ইতিহাসাশ্রিত করে তোলার চেষ্টা করা হলেও ইতিহাসের উপাদান এই উপন্যাসের বহিরঙ্গেই রয়ে গেছ, মর্মমূলে প্রবেশ করত পারেনি। উপন্যাসের মূল ঘটনাবলীর আবর্তে এর কোনো ভূমিকা নেই। উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ, যেমন- নাদির শাহের দিল্লি আক্রমণ ও অত্যাচার, বঙ্গদেশে বর্গীর আক্রমণ ও হামলা, রাজশক্তির সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সংঘর্ষ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট মূলত মূল কাহিনির পাশাপাশি ঔপন্যাসিক প্রতিবেশ রচনা ও মূলত নায়কচরিত্র মাধবানন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারাশঙ্করের নায়করা জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়ে নিজের চরিত্রকে বিকশিত করে। যেমন- ‘ধাত্রীদেবতা’র শিবনাথ, ‘উত্তরায়ণ’-এর প্রবীর, ‘কবি’র নিতাই, ‘সপ্তপদী’র কৃষ্ণেন্দু, ‘গণদেবতা’র দেবু ঘোষ প্রত্যেকেই জীবন থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভের পর মহত্তর জীবনসত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। মূলত এই উপন্যাসে যেটুকু ইতিহাসের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়, হয়তো একটি অবক্ষয়িত দশকে দাঁড়িয়ে অতীতের আরেকটি অবক্ষয়িত সময়কালকে ফিরে দেখতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। এই উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলকে তিনি ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রাখলেও শুধু মগ আক্রমণ ছাড়া উপন্যাসে উল্লিখিত অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি কিন্তু এই অঞ্চলে ঘটেনি। এখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখ্য, “বাংলাদেশের ইতিহাস ঠিক রাজনৈতিক ঘটনামূলক নয়, ইহা ধর্মসাধনার মর্মকথা। এখানে যুগান্তর ঘটিয়াছে ইতিহাসের বহির্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নয়, অন্তরের ধর্মসন্ধানের এক একটি বেগবান প্রবাহের অনুসরণে।”[১] তাই হয়তো ইতিহাসের উপাদানগুলি বহিরাগতের মতই বাহ্যিক উপাদান হিসাবেই এই উপন্যাসে থেকে যায়। এই উপন্যাস আসলে ঐতিহাসিক ঘটনার উপাদানের আশ্রয়ে তারাশঙ্করের নিজস্ব কথকতায় কাল্পনিক রোমান্সধর্মী আখ্যানকাব্য।

দ্বিতীয়ত, এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের ধর্মচেতনা। সমালোচকদের মতে, এটিই আসলে এই উপন্যাসের চালিকাশক্তি। এখানে উল্লেখ্য যে, তারাশঙ্করের আখ্যানগুলিতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই তাঁর উপন্যাসের ঘটনাগুলিকে তিনি তৈরি করেন, যেমন- দুই গোষ্ঠীর ভাবসংঘাত বা দুই মতবাদের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা ইত্যাদি। ‘ধাত্রীদেবতা’য় দেখা যায় তারাশঙ্কর রচিত বহু আলোচিত, বহু চর্চিত নাটকীয় দ্বন্দ্ব-- ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীতন্ত্রের সংঘাত; ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’য় পাওয়া যায় দুই প্রজন্মের সংঘাত, উপকথা ও ইতিহাসের স্থানদখল নিয়ে দ্বন্দ্ব তথা প্রাচীন উপকথাকেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর জীবনধারার সঙ্গে নবোদিত নগরায়ণের দ্বন্দ্ব। তেমনই এই ‘রাধা’ উপন্যাসে পাওয়া যায় দুই ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। মাধবানন্দের স্বকীয়া শক্তির উপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণদাসী-মোহিনীর পরকীয়া বৈষ্ণব রসসাধনার সংঘাত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনাকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে ‘রাইকমল’ উপন্যাসটিও তিনি রচনা করেছিলেন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের উগ্র দ্বন্দ্ব ‘রাধা’

উপন্যাসেই প্রকট করেছেন বেশি। মূল আখ্যানভাগ এই সংঘাতের জটিল আবর্তেই আবর্তিত হয়েছে। এবং শেষ অবধি দেখা যায়, তিনি রাধাভাবেরই জয় ঘটালেন, এটিই তাঁর ধর্মচেতনাকে প্রকাশ করে। রাঢ় অঞ্চলের এই উপকথা রচনায় তিনি সচেতনভাবে রাধাভাবকেই কেন জয়ী করলেন আর স্বকীয়া সাধনাকে কেন পরাভব স্বীকার করতে হল, তা এই নিবন্ধে আলোচনাসাপেক্ষ। তবে এই আলোচনার বিস্তৃত পর্যায়ে অঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি এসেই পড়ে, কারণ তারাশঙ্করের এই ধর্মচেতনা অঞ্চল-নিরপেক্ষ নয়।

বাংলা সাহিত্যে নাগরিকতার দাপট ছাড়িয়ে আঞ্চলিকতার ধারণা আসতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক ঝাঁক তরুণ লেখকের হাত ধরে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পরবর্তীকালের সাহিত্য সমালোচনায় নগরজীবনের বাইরে অবস্থিত জীবনপ্রবাহের এই আখ্যানগুলিকে আঞ্চলিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেই থেকে আজ অবধি আঞ্চলিকতার ধারণায় বিশেষ কোনো বদল আসেনি। স্থূল অর্থে আঞ্চলিকতা বলতে নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার বাইরে গ্রামীণ জীবনযাপনকে বোঝায়। আর বিশেষ অর্থে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক আবহকে প্রতিবেশে রেখে সেই অঞ্চলের অধিবাসী কিছু চরিত্রকে ঘিরে কাহিনী রচনা করলে তাকে আঞ্চলিকতা বোঝায়। সেই হিসাবে তারাশঙ্কর অবশ্যই রাঢ়বাংলার আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক। এখানে সমালোচকদের কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, "তারাশঙ্কর সম্বন্ধে প্রথমেই যেটা মনে হয়, তিনি ও বীরভূম দুই সমার্থবাচক শব্দ। বৃহত্তর বীরভূম তথা রাঢ়ের জীবনপট অঙ্কণে তিনি একমাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবিদার। আর কোনো শিল্পীকে এ গৌরব প্রদান আজো সম্ভব নয়। এ নিয়ে সীমাবদ্ধ আঞ্চলিকতার বদনাম তাঁকে অনেকটাই সহ্য করতে হয়েছে।"[২] কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, "সব সাহিতিকেরই নিজস্ব একটি ভূগোল থাকে, কিন্তু তাঁদের মঞ্চমাত্র, তার উপর তাঁদের সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাঁদের প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তা সত্য। একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে তিনি লিখেছেন (সবসময় অবশ্যই নয়। মন্বন্তর, মহানগরী, সপ্তপদী, ১৯৭১ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি কলকাতার পটভূমিকায় লিখিত), কারণ তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যেই কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, যেমনটি দেখা যায় সেইসব লেখকদের মধ্যে, যাঁরা কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত চেনামহলের বাইরে সচরাচর যান না। যেমন নরেন্দ্রনাথ মিত্র।"[৩] তাহলে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সামাজিক বিন্যাস, জনজাতির জীবনযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে কথা বললে যদি আঞ্চলিক হয়ে যেতে হয়, তবে কলকাতার নগরকেন্দ্রিক জীবনের কথাকাররা আঞ্চলিক হবেন না কেন? আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেটা ঠিক কোন অঞ্চলের, কুবেরের সেই জেলেপাড়া আসলে

কোথায়, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে না। পদ্মানদীর পাড় বরাবর সুবৃহৎ অঞ্চলের কোথাও একটা তার জায়গা। তাহলে একে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে ভাবা হয় কেন? শুধুমাত্রই কলকাতার নগরজীবনের বাইরের নিম্নবর্গের মানুষের কথা ও তাদের জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে বলে? একটা সময়পর্বে এই ধরনের আঞ্চলিকতার ধারণার হয়তো যথেষ্ট কারণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই ধারণার আধুনিকীকরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

তারাশঙ্করকে রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক কথাকার হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার পিছনে আসলে কিছু যুক্তি কাজ করে। প্রথমত, আখ্যান রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় তাঁর রচনার মূল সম্বল। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্করের সমগ্র জীবন অভিজ্ঞতাই এই রাঢ় অঞ্চল ও তার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সেই ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা সাহিত্যরসমহিমান্বিত হয়ে উপস্থাপিত হওয়ার পর প্রতিটি পাঠক রাঢ় অঞ্চলকে নিবিড়ভাবে চিনতে পারে, তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারে। তাই তারাশঙ্করকে আঞ্চলিক কথাকার ভেবে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশেষ পর্যবেক্ষণ উল্লেখ্য, “তারাশঙ্করের মানসিকতা ও তাঁর চরিত্রগুলির আচরণের মূলে রাঢ় অঞ্চলের জলবায়ু ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ভূমিকা যেকোনো লেখকের বিকাশের পক্ষে স্থানীয় উপাদানের যতটুকু ভূমিকা ঠিক ততটুকুই। উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন এলাকা, এমনকি, কলকাতার আশে-পাশেও জল-মাটি-হাওয়ায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সামাজিক বৈশিষ্ট্য তো অবশ্যই। কিন্তু আমরা যখন এইসব অঞ্চলের লেখকদের নিয়ে আলোচনা করি, তখন এই স্থানীয় ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিকে ততটা নজর দিই না, যতটা দিই তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে।”[৪] দ্বিতীয়ত, তাঁর লেখায় আছে অজস্র মানুষের ভিড়, প্রচুর চরিত্র। এমনি কোনোক্ষত্রে তা অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত বলেও বোধ হয়। সব চরিত্রই শ্রেণিচরিত্র, তারা রাঢ় অঞ্চলের কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের উপস্থাপনের ভঙ্গিমায় সেটাই যেন মুখ্য হয়ে ওঠে। সমালোচকের কথায়, “উপন্যাসের পরিধি বাড়িয়ে নীচুতলার মানুষকে তাতে স্থান দেওয়া এবং তা বই-পড়া জ্ঞান দিয়ে নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে – এখানেই তারাশঙ্কর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে পেরিয়ে গেছেন।”[৫] আসলে উপন্যাস যেমনই হোক বা ঘটনা যাই থাক, এই মানুষগুলির কথা তথা রাঢ় অঞ্চলের আখ্যানকে অমর করে রেখে যাওয়ার আন্তরিক তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর লেখায় পাওয়া যায় রাঢ় অঞ্চলের এত মানুষ, বাহুল্য হলেও তাদের উপস্থিতি পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বগুলিকে তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন ও সেগুলিকেই করে তুলেছেন ঘটনার মূল উপজীব্য। রাঢ়ের সঙ্গে অত্যন্ত একাত্মতার ফলেই তিনি এই দ্বন্দ্বগুলিকে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন ও তাদের লেখনীর মাধ্যমে যথার্থভাবে তুলে ধরেছিলেন। এজন্যেও তাঁকে আঞ্চলিক কথাকার বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব শুধু রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়,

অন্যান্য অঞ্চলেও তা প্রবলভাবে বিদ্যমান, কিন্তু তাদের তারাশঙ্করের মত করে কেউ উপলব্ধি করে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার কথা ভাবেননি। "বীরভূমের সঙ্গে চব্বিশ পরগণার যে পার্থক্য তা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণের চেহারাটা একই। কাহারদের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের নীচুশ্রেণির মানুষদের আচরণগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে শোষিত মানুষ হিসাবে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তেমনি জমিদার – সে যে কোনো জেলারই হোক – একই ভাষায় কথা বলে, একইরকম জীবনযাপন করে, একইভাবে শোষণ করে।"[৬]

আসলে বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে আঞ্চলিকতার যে ধারণা রয়েছে তা অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীতে এভাবে ভাবা গেলেও এই একবিংশ শতাব্দীতে এভাবে কোনো ঔপন্যাসিককে আঞ্চলিক বলে নির্দেশ করে দেওয়া সঠিক সাহিত্য সমালোচনা নয়। বরং এটা সমাজচেতনা, ইতিহাসচেতনা, ধর্মচেতনার মত সাহিত্যিকের অঞ্চলচেতনার অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করাটাই অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। অঞ্চলচেতনা শব্দবন্ধটি প্রত্যেক সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করা সম্ভব। কারণ প্রত্যেক সাহিত্যিকের প্রতিটি আখ্যানের নিজস্ব ভৌগোলিক পটভূমি থাকে, আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আখ্যানের বিন্যাস নির্ধারিত হয়। তাহলে আর কোনো সাহিত্যিককে পৃথকভাবে আঞ্চলিকতাদোষে দুষ্ট হতে হয় না। কারণ তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতার ধারণা আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিকতার ধারণার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। দুজনকেই তাই একই আঞ্চলিকতার সংজ্ঞার ছকে ফেলে সাধারণীকরণ করে দেওয়ার অর্থ হয় না। আঞ্চলিকতার ধারণাটাই বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্নরকম। ঠিক যেখানটাতেই হার্ডির সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা করতে গিয়ে ভুল হয়ে যায়। হার্ডির লেখার সঙ্গে তারাশঙ্করের কথনরীতির মিলটা খুবই সুপারফিশিয়াল স্তরের, উপরি উপরি। বিষয়ের গভীরে ঢুকলে বরং মিলের চেয়ে অমিল বেশি প্রকট। হার্ডি সচেতনভাবে ওয়েসেক্স প্রদেশের অধিবাসীদের করুণ পরিণতি লিখেছেন; বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এটা বলার জন্য যে, কৃষি-অর্থনীতির মন্দায় সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনে কিভাবে নিয়তির দুর্যোগ নেমে এলো; তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে বিশেষ ভৌগোলিক স্থানের বিশেষ আখ্যান, যা শুধুমাত্র সেই অঞ্চলেরই সম্বল। তারাশঙ্করের রাঢ় অঞ্চলের কথকতা এর চেয়ে অনেক ব্যাপক। "যে রাঢ়ভূমির সন্তান তিনি, তার ভিত্তিমূলের রহস্য উদ্ধারই তাঁর কাজ। তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন রাঢ়ের মৃত্তিকাগঠন, সাংস্কৃতিক সন্নিবেশ, জল হাওয়া এবং লোকজীবনধারার মধ্যে বহুকালীন সমন্বয়ধারার একটা ইতিহাস আছে। সেই ঐতিহ্যের দ্বারোদঘাটনই তাঁর প্রথম দায়।"[৭] এক্ষেত্রে এটুকু বলা যায়, নগর-মফস্বল-গ্রাম-নির্বিশেষে কোনো ভৌগোলিক স্থানকে লেখক কোন পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিন্যাসে ঠিক কাদেরকে দেখাতে চাইছেন, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কী, লেখকের সেই আইডিওলজিটাই তাঁর অঞ্চলচেতনার প্রকাশ ঘটায়, আঞ্চলিকতার নয়। আঞ্চলিকতা বলে আলাদা বিষয়ের উপস্থাপনা না করে অঞ্চলচেতনার মধ্যেই সেই আলোচনাটি

সীমাবদ্ধ রাখা বোধহয় অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত, কারণ আঞ্চলিকতা বা আঞ্চলিক লেখক বললে সেই সাহিত্যিককে নগরকেন্দ্রিক সাহিত্যের মূল ধারা থেকে দূরে, একটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির মধ্য বদ্ধ করে সরিয়ে রাখার অর্থের ব্যঞ্জনা আসে, যা কোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই যথোপযুক্ত মূল্যায়ন নয়।

এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের ধর্মচেতনার সঙ্গে অঞ্চলচেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অজয় নদের তীরে জয়দেব কেন্দুলির স্থানমাহাত্ম্যকীর্তনই ছিল তাঁর এই উপন্যাস রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, তা তাঁর অঞ্চলচেতনারই পরিচয় দেয়। শক্তির উপাসকের পরাজয় ও বৈষ্ণব প্রেমসাধনা ধারার জয়লাভ – এই বিষয়টিকে তিনি রাঢ়বঙ্গের পটভূমিকায় কীভাবে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করেছেন উপন্যাসে—তা দেখা যাক—

অজয় নদের তীরে জয়দেব কেন্দুলি প্রায় হাজার বছর ধরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। চৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ে এই রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব সাধনা অত্যন্ত বিখ্যাত হয় ওঠে। এছাড়াও রাঢ় অঞ্চল এমনিতেই অনেক বৈষ্ণব পদকর্তা, সহজিয়া সাধক ও বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞদের জন্ম-কর্মস্থান। এই অজয়ের তীরবর্তী অঞ্চলে অজস্র শ্রীপাট ও আখড়া-সংস্কৃতির বাহুল্য চোখে পড়ে। পরকীয়া বৈষ্ণব রসসাধনা এখানে আকাশে বাতাসে মিশে আছে, এতটাই জোরালো এখানকার রাধাভাবের সাংস্কৃতিক আবহ। এখানে যতবার বহিরাগত শক্তি রাধাব্যতীত বৈষ্ণব সাধনা প্রচার করত এসেছে, ততবার নতিস্বীকার করে চলে গছে। মহারাণা জয়সিংহ প্রেরিত দিগ্বিজয়ী শাস্ত্রজ্ঞানী সত্যসন্ধানী পন্ডিত কৃষ্ণদেব জয়পুর, প্রয়াগ, কাশীতে স্বকীয়া মতপ্রতিষ্ঠা করে এসে শেষপর্যন্ত কাটোয়ার কাছে মালিহাটিতে রাধামোহন ঠাকুরর কাছে হেরে গেলেন। এমনকি রাধাতত্ত্বে দীক্ষিতও হলেন তাঁর কাছে। সেই কৃষ্ণদেবের শিষ্য নবীন সন্ন্যাসী মাধবানন্দ নিজে তারপর সাড়ম্বরে রাধাতত্ত্ব উচ্ছেদে অজয় নদ বেয়ে এই অঞ্চলে এসে নিজের আশ্রম বানায়। এখান থেকেই কাহিনির সূচনা হয়। কৃষ্ণদেব যখন রাধামোহন ঠাকুরের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাভূত হন, তখন তিনি বলেন, "এ পরাভব আমার ভ্রান্তি নিরসন।"[৮] মাধবানন্দেরও এই ভ্রান্তি নিরসনই এই উপন্যাসের আসল আখ্যান। তারাশঙ্কর এখানে যেন বারবার বলছেন কৃষ্ণদেব বা মাধবানন্দ স্বকীয়া মতপ্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণবধর্মের যে সংস্কার চেয়েছিলেন, সেটা আসলেই ছিল পরকীয়া সাধনতত্ত্বের সাধনপদ্ধতির সংস্কার, যে সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি শুরুতেই বলেছেন, "সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশ-জীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মত। ... বিলের জলে নিক্ষিপ্ত গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জনের লবণের স্বাদেই যেমন বিলের মাছের সমুদ্রজলের আস্বাদ বলে ভ্রম হয় – মানুষেরও ঠিক সেই অবস্থা।"[৯] অর্থাৎ, তিনি নিজেই বলছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব স্বমহিমান্বিত, কিন্তু সাধনপ্রণালী ব্যভিচারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সমস্যা আসলেই এইখানটায়। মাধবানন্দও সেই অনাচার উচ্ছেদ করতে এসেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে শুধু ধর্মসাধনা নিয়েই থাকতে পারেনি, এরপর তার

সঙ্গে কৃষ্ণদাসী-মোহিনীর সাধনপদ্ধতি নিয়ে জোরালো সংঘর্ষ বেধেছে, রাজনীতিতেও ধীরে ধীরে সে জড়িয়ে পড়েছে। তার পূজ্য দেবতাটির রূপও জটিলাকার হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত তার বিশ্বস্ত সঙ্গী কেশবানন্দ তার মঠটিকে রাজনীতিরই আখড়া বানিয়ে ফেলে, সে কিছু করতে পারে না। তার স্বপ্নের ধর্মরাজ্য তৈরি করা আর হয়নি, বরং সে কেশবানন্দের কর্মফলের বলি হয়েছে। সে তার আইডিওলজি, আবেগ আর ফ্যান্টাসির মিশেলে জীবনের যে লক্ষ্য স্থির করেছিল, তা আর বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি। তার ব্যর্থতা শেষপর্যন্ত তাকে অসুস্থ করে দেয়। ঠিক কী কারণে সে অসুস্থ, তারাশঙ্কর তা বলেননি। হয়তো এটা পরাভব স্বীকারের প্রতীকী লক্ষণ। এরপর বহুবছর বাদে মোহিনীক সে আবার যখন প্যারেজীর রূপে দেখে, তখন তার উপলব্ধি, "আজীবন নিবারিত জীবনসত্যের এ কী মহাপ্রকাশ!"[১০] তার নিজেকে পূর্ণ বলে উপলব্ধি হতে থাকে। অত্যন্ত কঠোর সাধক মাধবানন্দের এইরূপ পরাজয়স্বীকার আখ্যানের এই অংশ থেকে অসংগত ও আরোপিত মনে হতে থাকে। সমালোচকের মতে, "মাধবানন্দের জীবনের সেই মর্মান্তিক 'নাস্তিত্ব' কেন এভাবে পূর্ণ হলো, হওয়া উচিত কিনা, এইসব প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। আর তখনই মনে হয় যে দ্বন্দ্বচেতনা গল্প-উপন্যাস-নাটকের প্রাণস্বরূপ, এখানে তারাশঙ্কর তার যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারেননি।"[১১] আসলে মনে হয়, তিনি পারেননি তা নয়, তিনি সচেতনভাবেই এটা হতে দিতে চাননি। এখানে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরির উর্ধ্বে উঠে গেছে তার অঞ্চলচেতনা। রাধাভাবই জয়ী হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি উপন্যাস লিখতে বসেছেন। তাই মাধবানন্দ ততক্ষণ কঠোর, যতক্ষণ নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আখ্যানের স্বার্থে প্রয়োজন, শেষ অবধি তাকে অকলুষ আনন্দচিত্তে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে নতজানু হয়ে বসে মোহিনীকে বলতেই হয়েছে, "তুমি রাধা-- আমার রাধা।"[১২] মাধবানন্দের এইরূপ ভাগ্যবিড়ম্বনা সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "শ্যামের নিকট হইতে আনন্দস্বরূপিণী রাধাকে নির্বাসিত করিয়া, প্রেমের পরিবর্তে কঠোর শক্তির উপাসনা করিয়া, তিনি এক বিরাট সর্বব্যাপী শূন্যতাবোধের কবলিত হইয়াছেন, সীমাহীন, নীরন্ধ্র অন্ধকার মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। নবাবসৈন্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া তিনি গুরুতর আহত হইয়াছেন ও এই অচেতন অবস্থায় তাঁহার প্রত্যাখ্যাতা কিশোরীর শুশ্রূষায়, সস্নেহ পরিচর্যায় তিনি আবার সংজ্ঞা ও জীবন ফিরিয়া পান। এই অন্তিম অভিজ্ঞতা তাঁহার সমস্ত পূর্ব-বিদ্বেষ জয় করিয়া তাঁহাকে রাধাতত্ত্বে বিশ্বাসী করিয়াছে ও ভগবানের এই প্রেমময় দ্বৈত স্বরূপে বিশ্বাস ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ও তাঁহার প্রণয়-সাধিকার যুগপৎ জীবনাবসানে রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা শাশ্বত আদর্শের মহিমায় অভিষিক্ত হইয়াছে।"[১৩] মাধবানন্দ ও মোহিনীর মৃত্যুবরণের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের এই সমাপিকাও সমালোচিত। সমালোচকের মতে, "এই মৃত্যু কিন্তু জীবনসত্যের মহাপ্রকাশ নয়। নয় এই কারণেই যে, মাধবানন্দ প্রেমিক কৃষ্ণকে মানেননি; স্বকীয়াবাদকে চরম বলে মেনেছিলেন এবং তাতে যে সিদ্ধি আসতে পারে না তা নয়।... অথচ তারাশঙ্কর

যতক্ষণ পর্যন্ত মাধবানন্দকে মোহিনীর আসনে নতজানু করতে না পারছেন, ততক্ষণ নানাভাবেই মাধবানন্দের জীবনযাপনকে বিড়ম্বিত করেছেন। মাধবানন্দের দৃঢ়তা, সততা, কৃচ্ছ্রতা, বলিষ্ঠতা সমস্তই মূল্যহীন হয়ে গেছে রাধার অভাবে। এটা কখনোই জীবনসত্য হতে পারে না। মোহিনী যদি একাই মাধবানন্দকে ভালোবেসে ক্ষয়ে যেত, ক্ষতি কী ছিল? আর মাধবানন্দ তার ধ্যানে জাগরণে যে মুখ ভুলতে পারেননি, অথচ ভুলতে চেয়েছেন – এই কঠিন দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হলেই বা তাঁর গৌরব কম হত কী? আসলে তারাশঙ্কর একটি ধর্মীয় প্রেরণাকে বলবতী করতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণদাসীর অভিশাপ।”[১৪] এখানে উল্লেখ্য যে উপন্যাসের এই পরিণতি রচনায় তারাশঙ্কর বঙ্কিমচন্দ্রের লিখনশৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন। রাঢ় অঞ্চলে মাধবানন্দের এই পরিণতি যেন পূর্বনির্ধারিত, বঙ্কিমীয় স্টাইলে তাই কৃষ্ণদাসীর মাধ্যমে মাধবানন্দকে অভিশপ্ত হতে হয় যে এই রাধাভাবের কাছেই তাকে নতিস্বীকার করতে হবে। অন্যদিকে রাধাতত্ত্বের রসসাধনায় ব্যভিচারের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণদাসীর পাগলিনী হয়ে রাতের অন্ধকারে শ্মশানে মিলিয়ে যাওয়ার ট্র্যাজিক পরিণতিও বঙ্কিমীয় ট্র্যাজিক চরিত্রগুলিকে মনে করায়।

“পরকীয়া রসসাধনার সঙ্গে স্বকীয়া সাধনার ভাবসংঘর্ষই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। আবার পরিণামে গৌড়ীয় রসসাধনার কাছে বহিরাগত স্বকীয়াতত্ত্বের পরাভব প্রদর্শনই উপন্যাসের অভিপ্রেত।”[১৫] এখানে তারাশঙ্করের এই ধর্মচেতনার মধ্যেই আসলে রয়েছে তার অঞ্চলচেতনা। রাঢ়ের স্থানমাহাত্ম্য প্রচার করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই উপন্যাসের জন্য কলম ধরেছেন। অন্যান্য উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্নভাবে রাঢ়-অঞ্চলকে উপস্থাপিত করলেও এখানে ধর্মসংঘর্ষের মাধ্যমে আরেকটি ভিন্ন উপায়ে রাঢ়ের স্থানমহিমাকে প্রচার করলেন তিনি। তাই করতে গিয়ে এই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চরিত্রচিত্রণে, ঘটনাবিন্যাসে বা ঔপন্যাসিক উপাদানের সঠিক ব্যবহারে অসংগতি ঘটিয়ে ফেললেন, শুধুমাত্র তাঁর রাঢ়ের স্থানমাহাত্ম্য তুলে ধরার জন্য। তাঁর গভীর অঞ্চলচেতনার গুণেই তাঁর আখ্যানগুলিতে রাঢ়-অঞ্চল নিজেই যেন একটি চরিত্রে পরিণত হয়ে গেছে। এই রাঢ়ের বুকে জয়দেবের কেন্দুলিতে পরকীয়া প্রেমরসসাধনার মাহাত্ম্যের সামনেই মাথা নোয়াতে হবে সবাইকে, এটাই তারাশঙ্করের রচিত ইতিহাসাশ্রিত রাঢ়কেন্দ্রিক রোমান্সধর্মী উপকথা। অজয় নদের তীরে প্রেমসাধনার কথা। তার কথক হলেন তারাশঙ্কর।

তথ্যসূত্রঃ

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার. “রোমান্স-প্রধান উপন্যাস – প্রথম পর্যায়”. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা.* পঞ্চম সংস্করণ. কলকাতা. মডার্ণ বুক এজেন্সী. ১৩৬৭. পৃষ্ঠা ৫৮৪

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত. "তারাশঙ্করের শিল্পস্বভাব". *তারাশঙ্করের 'রাধা': একটি সমীক্ষা.* কলকাতা. দে'জ পাবলিশিং. ২০০৫. পৃষ্ঠা ১২
৩. চক্রবর্তী, দীপ্তেন্দু. "তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তাঁর সাফল্য". *তারাশঙ্করের দেশ কাল সাহিত্য.* কলকাতা. মডার্ণ বুক এজেন্সী. ১৩৬৫. পৃষ্ঠা ৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৫-৬
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত. "তারাশঙ্করের শিল্পস্বভাব". *তারাশঙ্করের 'রাধা': একটি সমীক্ষা.* কলকাতা. দে'জ পাবলিশিং. ২০০৫. পৃষ্ঠা ১২
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. "রাধা". *তারাশঙ্কর রচনাবলী.* পঞ্চদশ খণ্ড. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স. ১৩৫৭. পৃষ্ঠা ৩১৯
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ২৯১
১০. তদেব, পৃষ্ঠা ৫০০
১১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ. "তারাশঙ্করের 'রাধা': এক আশ্চর্য দ্বৈরথ". *তারাশঙ্কর অন্বেষা.* কলকাতা. রমা প্রকাশনী. ১৯৫৮. পৃষ্ঠা ১৪৬
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর. "রাধা". *তারাশঙ্কর রচনাবলী.* পঞ্চদশ খণ্ড. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স. ১৩৫৭. পৃষ্ঠা ৫০১
১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার. "রোমান্স-প্রধান উপন্যাস – প্রথম পর্যায়". *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা.* পঞ্চম সংস্করণ. কলকাতা. মডার্ণ বুক এজেন্সী. ১৩৬৭. পৃষ্ঠা ৫৮৪
১৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ. "তারাশঙ্করের 'রাধা': এক আশ্চর্য দ্বৈরথ". *তারাশঙ্কর অন্বেষা.* কলকাতা. রমা প্রকাশনী. ১৯৫৮. পৃষ্ঠা ১৪৬
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত. "কিম্বদন্তীমূলক বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পরিচয়". *তারাশঙ্করের 'রাধা': একটি সমীক্ষা.* কলকাতা. দে'জ পাবলিশিং. ২০০৫. পৃষ্ঠা ২৪

গোবিন্দদাসের রাধা : অভিসার জয়ের সংগ্রামী প্রতিমূর্তি

তাপস মণ্ডল
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

দর্শন অথবা শ্রবণ জনিত কারণে হৃদয়ে প্রেম ব্যাধি সঞ্চারিত হওয়ায় ঘর আর পথ যখন একাকার হয়ে গেছে তখন মিলনের তীব্র কামনায় রাধা ও কৃষ্ণকে ঘর ছেড়ে পথে নামতে হয়েছে পূর্ব নির্দিষ্ট সংকেত কুঞ্জে মিলিত হবার জন্য। এই যে মিলন উন্মুখ পথ পরিক্রমা তাই বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে অভিসার বলে পরিচিত।

' অভিসার ' কথাটির অর্থ হল অভিমুখে গমন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন-

" অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথবশংবদা।
স্বয়ং বাভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাভিসারিকা।। "[১]

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি অভিসারিকা রমনী হলেন সেই রমণী যিনি মন্মথ বশীভূত হয়ে মিলনের অধীরতায় পূর্ব নির্দিষ্ট সংকেত কুঞ্জে নিজে যাত্রা করেন অথবা প্রিয়তমকে যাত্রা করান। মিলনের আকুতি অভিসারের নিয়ামক হলেও অভিসারের মূল কথা হলো ঘর ও কুঞ্জের মধ্যবর্তী দুস্তর, দুর্গম, বিঘ্ন এবং বিপদ সংকুল পথ অতিক্রমণের অবিচল অভিজ্ঞতা। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে প্রিয়তমের ডাকে সাড়া দিয়ে রাধার অভিসার যাত্রার দুর্জয় পথ পরিক্রমার বিষয়কে কেন্দ্র করে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস , রায় শেখর প্রমুখ পদকর্তা বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু কেউই গোবিন্দদাসের সমকক্ষ হতে পারেননি। এই জাতীয় পদ রচনায় তিনি 'রাজাধিরাজ'। আসলে - "গোবিন্দদাসের অভিসার যেন প্রতীক অভিসার; তাহা উৎকৃষ্ট ধর্মগীতি- তাহা অভ্যাস যোগের শাস্ত্রকাব্য, বিঘ্ন লঙ্ঘনের যুদ্ধকাব্য এবং লক্ষ্যলাভের বিজয় কাব্য।"[২]

গোবিন্দদাসের রাধা কুলবধূ। লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাঁকে প্রিয়তমের কুঞ্জ অভিসারে যেতে হবে। তাই বহু সন্তর্পণে সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে এক পা এক পা করে লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিজয় যাত্রা করেছেন। তিনি শুধু প্রেমিকা নন, তাঁর অভিসার শুধু দেহ মিলনের আকুতি ভরা নয়, তাঁর অভিসার হল সর্বস্ব ত্যাগ করে অপ্রাপণীয়কে পাওয়ার জন্য দুশ্চর তপস্যা। রাধা এখনো অভিসারের পথে নামেননি। তবে সেই বিশেষ মুহূর্তটি আগত প্রায়। কারণ " ডেকেছেন প্রিয়তম কি রহিবে ঘরে।"[৩] শ্যামের বাঁশির শব্দে রাধার সংসার জীবন ছিন্নভিন্ন। তাঁর দর্শন পাওয়ার আশায় তিনি গৃহসুখের আশা ত্যাগ করেছেন। সুতরাং ঘর ছেড়ে পথে নামতে তো তাঁকে হবেই। তবে ঘর ছেড়ে পথে নামা যে কি সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা তার আঁচ রাধা হৃদয়ে অনুভব করতে পেরেছেন। তাই ঘরকেই করে তুলেছেন পথ। ঘরের

মধ্যেই দুর্গম পথ চলার অভ্যাসের মধ্য দিয়ে রাধা প্রকৃত অভিসার যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছেন-

" কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"[৪]

হয়তো রাধাকে অন্ধকার রাত্রির প্রবল বর্ষণের মধ্যেই প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। তাই রাধা আঙ্গিনার মধ্যে জল ঢেলে পিচ্ছিল করেছেন। সেই পিচ্ছিল আঙ্গিনায় কাঁটা পুঁতে করযুগলে নয়ন মুদিত করে রাত্রি জাগরণে পা টিপে টিপে দূর দুর্গমে চলার অভ্যাস করেছেন। তিনি কুলবধূ তাই নীরব অভিসারে যাওয়ায় বাঞ্ছনীয়। অথচ পরিস্থিতি প্রতিকূল। একে বর্ষা রজনী তাতে আবার পথে সর্পভীতি। কিন্তু এই সামান্য প্রতিকূলতায় গোবিন্দদাসের রাধার থেমে থাকলে চলবে না। তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে। সেই জন্য তিনি নিজের কঙ্কণের বিনিময়ে ওঝার কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন সাপের মুখ বন্ধ করার কৌশল-

" কর কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে।।"[৫]

অভিসার যাত্রা জয়ের স্বপ্ন সাধনাই রাধা এতটাই মশগুল যে গুরুজনদের কথা তিনি শুনেও শুনতে পান না। তিনি যেন বধির।

জনৈক সমালোচক বলেছেন বৈষ্ণবীয় অভিসার বিঘ্ন লঙ্ঘনের যুদ্ধ কাব্য। তার প্রমাণ আমরা পাই গোবিন্দদাস বিরচিত ' মন্দির বাহির কঠিন কপাট ' শীর্ষক পদটিতে। পদটি দুর্দিনাভিসারের পদ। পদটির মধ্যে রাধার দুর্জয় প্রেমাভিসারের রূপটি সুন্দর ব্যঞ্জিত হয়েছ। যদিও পদটি রাধার অভিসার যাত্রার প্রাক মুহূর্ত নিয়ে রচিত রাধার প্রিয় সখীর নাটকীয় একোক্তি। সেদিন রজনী বর্ষা মুখরা, ঝন ঝন শব্দে ঘন ঘন বজ্রপাত ঘটছে। বিদ্যুতের দীপ্তিতে দশ দিকের অন্ধকার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চোখে লাগছে ধাঁধাঁ। তদুপুরি গৃহদ্বার রুদ্ধ, কুঞ্জমুখী দূর পথ পঙ্কিল এবং শঙ্কিল। এই দুর্যোগ পূর্ণ রজনীতে রাধা শুধুমাত্র নীল বস্ত্র সম্বল করে অভিসার যাত্রায় প্রস্তুত। শুধুমাত্র একটি নীল বস্ত্র প্রবল বর্ষণ ধারাকে যে আটকাতে পারবেনা সে বিষয়ে সখীরা নিশ্চিত। তাই ব্যাকুল সখীরা সরল জিজ্ঞাসায় রাধার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন - " প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।"[৬]

মানতেই হয় এই পদেও শ্রীরাধার অভিসার যাত্রার বর্ণনা নেই। কিন্তু গোবিন্দদাস তাঁর আশ্চর্য কবি কৌশলে শ্রীরাধার অভিসারের পথে যে দুর্গম বিঘ্ন অপেক্ষা করে আছে তা উল্লেখ করে এই বিঘ্নের বিপরীতে সংকল্পবদ্ধ দৃঢ়ব্রত রাধার নীরবতাকে স্থাপন করে অনায়াসে বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীরাধার অভিসার বিঘ্ন লঙ্ঘনের যুদ্ধ কাব্য। শুধু তাই নয় পদটির ভণিতাংশে চিন্তাকূল সখীদের প্রশ্নের উত্তরে

গোবিন্দদাস কাকুবক্রোক্তির আশ্রয়ে যে কথা বলেছেন তারই মধ্যে সাংকেতিত হয়েছে বৈষ্ণবীয় প্রেমাভিসার তত্ত্বের শেষ কথা - " ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।।"[৭]

অর্থাৎ যে বাণ জ্যা মুক্ত হয়ে লক্ষ্য বস্তুর দিকে ধাবিত হয়েছে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা অসাধ্য। " কারণ অভিসারের মধ্যে আছে একটা অনিবার্য প্রাণাবেগ, সুদুর্জয় আত্মবিশ্বাস, অতন্দ্র সাধন-দীপ্তি, অপরিসীম উৎকণ্ঠার যন্ত্রণাময় আকূতি। তাহা কেবল প্রেমের লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই- তাহা কেবল আহ্নিক-গতির আত্মপরিক্রমা নহে- জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মকাব্য গুলিতে তাহা সৌরাবর্তনের গতিবেগ লইয়াছে। অনন্তের জন্য অন্তহীন পদক্ষেপ অভিসারের রূপ ধরিয়াছে।"[৮]

শাক্তদের সাধনা হল ভয়ংকরকে জয়ের সাধনা। কবি গোবিন্দদাসও বংশ পরিচয়ে শাক্ত ছিলেন। তাই শাক্ত কুলে জন্ম নেওয়া কবি রাধার অভিসারের মধ্যে দুসাধ্য সাধনের দৃঢ় সংকল্প,সর্ববিঘ্ন অস্বীকারের তেজস্বীতা এবং লক্ষ্য অভিমুখী দুরন্ত গতিকে অপূর্ব ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

কৃষ্ণ প্রেমময়ী রাধা প্রেমের প্রসাধন কলায় মুগ্ধা নায়িকা নন। বরং সাধনাবেগে উদ্দীপ্তা নায়িকা। সেই কারণেই কুল মর্যাদা ও নিজ মর্যাদাকে অনায়াসেই তুচ্ছ করতে পেরেছন। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক রীতি মেনে চললে সে ইহলোকে সুখ ভোগ করে আর সঞ্চিত পুণ্যের ফলেই তার স্বর্গবাস নিশ্চিত হয়। কিন্তু এ সবই তো আত্মসুখসার। রাধা এই আত্মসুখের সংকীর্ণ আবেষ্টনী ছিন্ন করতে পেরেছিলেন বলেই দুর্যোগময়ী নিশায় নিজের দেহগত সুখকে বিপন্ন করে পথে নামতে পেরেছিলেন। রাধার চিন্তার ক্ষেত্রে আছেন শুধুই শ্যাম। তাই সখীদের নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছেন -

" কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছুপর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগে।। "[৯]

অর্থাৎ কোটি শরের আঘাতে যার হৃদয় জর্জরিত সামান্য বারিধারা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। প্রেমের আগুন যার হৃদয় নিরন্তর সহ্য করেছে বজ্রের আগুন তার কি করবে!

আমরা বুঝতে পারি রাধা কৃষ্ণকে সর্বস্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং এরপর নিজের দেহের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা শুধু অমূলক নয় তা নিতান্তই অর্থহীন। বরং রাধার হৃদয় এই ভেবে ব্যাকুলিত যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো তার জন্য পথ চেয়ে সংকেত কুঞ্জে অপেক্ষা করছেন। নিজের দেহের চাইতেও প্রেমিকের উৎকণ্ঠা রাধার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে বৈষ্ণব পদাবলিতে শুধু নায়কের উদ্দেশ্যে মিলন পিয়াসী নায়িকার গমনকে অভিসার বলা হয়নি। সেখানে নায়িকার টানে নায়কের পথে নামাকেও অভিসার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভগবানের জন্য ভক্তই কেবল ব্যাকুল হন না। ভক্তের জন্য ভগবানও ব্যাকুল হয়ে থাকেন। তত্ত্বের ভাবনা যাই হোক না কেন

বৈষ্ণব কবিরা বুঝেছিলেন অভিসার আসলে সমুদ্র আর নদীর খেলা। সমুদ্রের টানে নদী ছুটে চলেছে ঠিকই কিন্তু সমুদ্রও স্থির হয়ে নেই। নদীর প্রত্যাশায় সেও নিরন্তর দুলে চলেছে।

বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব মতে জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু কৃষ্ণসেবা। প্রভূত বাধা বিপত্তিকে প্রতিহত করে রাধাকে তাই নামতে হয়েছে অভিসারে। রাধা যে পুঞ্জীভূত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে কৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হয়েছেন এর বিশেষ তাৎপর্যও আছে। বস্তুত পক্ষে এই বিঘ্ন লঙ্ঘনের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে প্রেমের অন্তর্নিহিত ধ্বংস সম্ভাবনাহীন প্রেমশক্তি বা দুঃখজয়ী স্বভাবটি। প্রেমের জন্য কৃচ্ছ্র সাধন তাঁর ঈশ্বর সাধনার ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ পথটি, সাধনার অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে স্পষ্ট প্রমাণিত করেছে। কুলকামিনী রাধা পথের সমস্ত বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে, যাবতীয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করে, সখীদের নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে দুরধিগম্য পথ পরিক্রমার শেষে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তখনই তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান হয়েছে। আর কৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ রাধার অভিসার ক্লান্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করে নিজেই তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়েছেন -

" আদরে আগুসরি   রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে   চরণ-যুগ মোছই
হেরইতে চিরথির আঁখি।।"[১০]

আশ্চর্যের ব্যাপার! প্রেমের মূর্তিমান দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে কোলে বসিয়ে নিজের করপদ্মে রাধার অভিসার ক্লান্ত চরণ যুগল মুছিয়ে দিলেন। রাধা হতবাক্–

" যাকর দরশনে   সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা।।"[১১]

যাঁর দর্শনে রাধার সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটেছে প্রেমের সেই মূর্তিমান দেবতা নিজে তার সেবা করছেন। আসলে "ভক্তের সাধনার কৃচ্ছ্রতায় ভগবানের চিত্তও সমবেদনায় ও প্রেমের মহিমায় আপ্লুত।"[১২] তাই কৃষ্ণ পরমযত্নে রাধার মুখে পান তুলে দিয়ে মিষ্টালাপে-" পুছই পন্থকি দুখ।"[১৩] আর শ্যামের জানুতে বিশ্রামরতা রাধা অভিসার যাত্রাকালীন পথের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে জানাতে থাকেন -

" মন্দির তেজি যব   পদচারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দূরন্ত পথ   হেরই না পারিয়ে
পদ যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ।।"[১৪]

ঘর ছেড়ে পথে নামতেই অন্ধকার রাত্রির ভয়ঙ্কর রূপ দেখে রাধার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। অন্ধকার দুর্গম পথ কিছুই দেখা যায় না। এমন সময় রাধার দু পায়ে সাপ জড়িয়ে ধরল। কুলকামিনী রাধা কি করবেন, কোথায় যাবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

তারই মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রবল বর্ষণ। তাতে আবার পদযুগল কাঁটার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁকে হার মানলে চলবে না। প্রিয়তমের দর্শন আশায় তিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছেন। বিঘ্ন লঙ্ঘনের যুদ্ধে তাঁকে জয়ী হতেই হবে। দুঃখের অবসানেই তো জয়ের আস্বাদ অনুভূত হয়। রাধাও শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। প্রিয়তমের দর্শনে তাঁর – " চির দুখ অব দূর গেল।"[১৫]

গোবিন্দদাসের রাধা সাধারণ দেহময়ী, নিশাচরী ,গোপন অবৈধ প্রেমের সঞ্চারিনী নায়িকা নন। কৃষ্ণকে তৃপ্ত করায় তার একমাত্র ব্রত। কৃষ্ণেন্দ্রীয় প্রীতিবাঞ্ছময় প্রতিকূলতা জয়ী এই নায়িকা দেহধর্ম, লোকধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। অভিসার জয়ের দুশ্চর তপস্যায় তাকে যথার্থ আরাধিকার মর্যাদায় উন্নীত করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার বলেছেন -

" যে অভিসারিকা তারই জয়
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
....
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি-
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।"[১৬]

তথ্যসূত্র :

১. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা) , ' সাহিত্য দর্পণঃ', পুস্তক শ্রী, প্রথম প্রকাশ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, কলিকাতা, পৃ. ১৫৯

২. শঙ্করী প্রসাদ বসু, 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭, কলিকাতা, পৃ. ২৪৭

৩. ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, 'বৈষ্ণব কবিতা', হাউস অফ বুকস্,পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ, ১৯৬১ ,কলিকাতা, পৃ. ১০৯

৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ' বৈষ্ণব পদাবলী ', সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬১, কলিকাতা, পৃ. ৬০৮

৫. তদেব, পৃ. ৬০৮

৬. তদেব, পৃ. ৬১৩

৭. তদেব, পৃ. ৬১৩

৮. শঙ্করী প্রসাদ বসু, ' মধ্যযুগের কবি ও কাব্য ', জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৭২, কলিকাতা, পৃ. ১৬৬
৯. সত্য গিরি (সম্পাদনায়) , ' বৈষ্ণব পদাবলী ', রত্নাবলী, চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ / প্রথম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩ , কলকাতা, পৃ. ২৫০
১০. তদেব, পৃ. ২৫৬
১১. তদেব, পৃ. ২৫৬
১২. সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ' বৈষ্ণব পদাবলী ', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৭-৯৮, কলিকাতা, পৃ. ১১২
১৩. সত্য গিরি (সম্পাদনায়), ' বৈষ্ণব পদাবলী ', ঐ, পৃ. ২৫৬
১৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) , ' বৈষ্ণব পদাবলী', ঐ , পৃ. ৬৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৬৬৭
১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ' পুনশ্চ ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পঞ্চম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২২ কলকাতা , পৃ. ৫৪-৫৫

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে নারী-ভাবনা : প্রসঙ্গ 'নারী হওয়া'

দেবাংকৃতা সরদার
গবেষক, প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : গ্রামবাংলার প্রকৃতি, মাটি, জল-হাওয়ার সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনগুলিকে কিংবা গ্রামসমাজের মানুষের মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন ধরনকে স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর রচনাশৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নারীর সত্তাকে বিশেষ ভাবে নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'সব গল্প মেয়েদের' গল্পগ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, এই গ্রন্থটি প্রধানত নারীদের কথাই বলে, মেয়েরাই এই গ্রন্থের গল্পের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাঁর এই সমস্ত ছোটোগল্পে নারী-জীবন, নারী-ভাবনা, নারী-সংগ্রাম এমনকি নারীর যৌনতার এক-একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর এই নারী-ভাবনার সঙ্গে অবশ্যই জড়িত হয়েছে রাজনৈতিক উন্মত্ততা, ক্ষিপ্রতা, নতুন শিল্প-অর্থনীতির যুগের সঙ্গে তাল রেখে নারীর বেঁচে থাকার সংগ্রামের কাহিনি। তাঁর এই গ্রন্থের একাধিক গল্পে সমাজে নারীর অবস্থানকে নির্ণয় করা হয়েছে আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক গঠন অনুযায়ী।
সূচক শব্দ : স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ছোটোগল্প, নামকরণ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক শ্রেণি, নারী।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ফেলে আসা কয়েকটি দশকসহ বর্তমান সময়ের একজন বিশিষ্ট ছোটোগল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং রম্যরচনাকার। সাহিত্যজগতে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় অবদান রেখেছেন। সমকালীন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি, মানুষে মানুষে মানবিক সম্পর্কের একাধিক সূক্ষ্মতার দিকগুলিকে তিনি তাঁর ছোটোগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি নানা সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে নবরূপে সৃষ্টি করেছেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৫১ সালের ২৪ শে আগস্ট। তিনি উত্তর কলকাতায় জন্মসূত্রে বেড়ে উঠেছেন। দেশলাইয়ের সেলসম্যান হিসাবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে। এরপর তিনি ভূমি-রাজস্ব দপ্তর, আবহাওয়া বিভাগ ইত্যাদি নানা জায়গায় কাজ করার পর দীর্ঘদিন আকাশবাণীতেও কর্মরত থাকেন। কর্মজীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে অতিবাহিত করেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাঁর লেখালিখির সূত্রপাত ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। পরবর্তী সময়ে তাঁর লেখা আরও অনেক বিখ্যাত গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর লেখা

প্রথম উপন্যাস ‘চতুষ্পাঠী’। এই উপন্যাসটি ১৯৯২ সালে শারদীয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-য় প্রকাশিত হয়। পরে এই উপন্যাসটি ১৯৯৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘হলদে গোলাপ’-এর জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন।[১]

স্বপ্নময় চক্রবর্তী বাংলা ছোটোগল্পকে নানান আঙ্গিক, বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ছোটোগল্পের ধারাকে তিনি নতুন পথে চালিত করতে সক্ষম ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি তাঁর গদ্যশৈলীও নতুন ধারার। ১৯৮২ সালে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন ‘ভূমিসূত্র’ প্রকাশিত হয়েছে।[২] তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি হল— ‘অষ্টচরণ ষোল হাঁটু’ (১৯৮৮), ‘ভিডিও ভগবান নকুলদানা’ (১৯৯৩), ‘জার্সিগরুর উল্টো বাচ্চা’ (১৯৯৫), ‘দশটি গল্প’ (১৯৯৫), ‘নির্বাচিত গল্প’ (১৯৯৬), ‘ব্লুসিডি ও অন্যান্য’ (২০১১), ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’ (২০১১), ‘সব গল্প মেয়েদের’ (২০১৭) ইত্যাদি।[৩] গ্রামবাংলার প্রকৃতি, মাটি, জল-হাওয়ার সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনগুলিকে, গ্রামসমাজের মানুষের নানা ধরনের মনস্তত্ত্বকে তিনি তাঁর রচনাশৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারী সত্ত্বাকে বিশেষ ভাবে নির্মাণ করেছেন। তাঁর ‘সব গল্প মেয়েদের’ গল্পগ্রন্থটির নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, এই গ্রন্থটি প্রধানত মেয়েদের কথাই বলে, মেয়েরাই এখানে গল্পের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাঁর এই সমস্ত ছোটোগল্পে নারী-জীবন, নারী-ভাবনা, নারী-সংগ্রাম এমনকি নারীর যৌনতার এক-একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এই নারী ভাবনার সঙ্গে অবশ্যই জড়িত হয়েছে রাজনৈতিক উন্মত্ততা, ক্ষিপ্রতা, নতুন শিল্প-অর্থনীতির যুগের সঙ্গে নারীর বেঁচে থাকার কাহিনি। সমাজে নারীর অবস্থানকে নির্ণয় করা হয়েছে আর্থ-সামাজিক-পারিবারিক গঠন অনুযায়ী। এমনকি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে সীমান্তবর্তী এলাকার নানা ঘটনাপ্রবাহ, পাচার সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ‘সব গল্প মেয়েদের’ এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে সবিতেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন—

> স্বাধীনতা দেশভাগ শিল্পায়ন, পঙ্কিল রাজনীতি, সেই সঙ্গে প্রমোটারি ব্যবসা কর্মহীনতা অস্বাভাবিক জনস্ফীতি প্রাচীন অর্থনীতির বুনিয়াদকে ভেঙেচুরে এক বহুস্তরীয় সমাজকে সৃষ্টি করেছে।
>
> এই সব সমস্যার প্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত স্বপ্নময় চক্রবর্তী নারীদের ছবি এঁকেছেন এক অসাধারণ মরমী সহানুভূতি-স্পর্শী লেখনীতে। আলোরানী, পুঁটু, সোনালি, জগার বউ, দুলালের মা, সুচিত্রার মতো মেয়ে কোথায় কী ভাবে সব হারিয়ে যাচ্ছে— সংখ্যাতত্ত্বে তার হিসেব মেলে না।...
>
> একদিকে শিক্ষার উগ্র আধুনিকতা আর একদিকে কুসংস্কার, একদিকে কর্তব্য আর একদিকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা, একদিকে শিক্ষার আবেদন আর একদিকে নারী-লোলুপতা আমাদের সমাজ তথা নারী-জগতের উথাল-পাথাল

> অবস্থা কী অসাধারণ মমতায় লেখক আমাদের সামনে এই গ্রন্থটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।[৪]

এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'নারী হওয়া' (পুরশ্রী, ২০০২) গল্পে দেখা যায় একজন নারীর 'নারী হয়ে ওঠা'-র পিছনে পারিবারিক-সামাজিক নারী নির্মাণের ধারণাগুলি কীভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র হল পুঁটু, যাকে ঘিরেই গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। গল্পের একেবারে শুরুতেই দেখা যায়, পুঁটুর বাচ্চা হবে, সে প্রসব যন্ত্রণায় ভীষণরকম কাতর। 'মা' হওয়ার মধ্যে দিয়েই যে নারীর জীবনের মূল সার্থকতা প্রকাশ পায়, সেই দিকটিকেই তীক্ষ্ণভাবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পুঁটুর শৈশবাবস্থা থেকে। পুঁটুর শৈশবাবস্থা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠা এবং পরবর্তী ধাপ নারী হয়ে ওঠার মধ্যেকার যে সময়পর্ব, সেই সময়ে তার প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনা, এই সমস্ত দিকই গল্পে খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

পুঁটু যে গ্রামে বড় হয়ে ওঠে, সেই গ্রামের নাম ডুমাডুমা, যার একেবারে কাছেই বাংলাদেশ সীমান্ত। এই গল্পে শিশুশ্রমিকের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম হয়, যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত পাচার নামক দুষ্কর্ম। এই কাজে ছোটো ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানো হয়ে থাকে, কারণ ছোটোদেরকে খুব একটা সন্দেহের চোখে দেখা হয় না, বা তারা খুব সক্রিয়ভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় পড়ে না। তাই সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও আইনের চোখে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। এই গল্পে দেখা যায়, পুঁটু যার কাছে বড়ো হয়, সেই কালিদাসী নামক মহিলাটি এইরকম বছর বারো বয়সী ছেলেমেয়েদের মোট কিংবা বোঝা বওয়ার কাজে লাগিয়ে দেয় কিছু অর্থ প্রাপ্তির আশায়। পুঁটুর বড়ো হওয়া প্রসঙ্গে গল্পে বলা হয়েছে—

> কালিদাসী পুঁটুরানির মাসি হয়। পাতানো মাসি হলেও আসল মাসির চেয়ে বেশিই করেছে। পুঁটুর মা যখন পুঁটুর বাপকে ছেড়ে শান্তিপুরে চলে গেল, বলে গিয়েছিল মেয়েকে দেখিস। পুঁটুর তখন ছ বছর বয়েস। পুঁটুর বাপের নাম দুলাল। কাজ করে মুখুজ্যে বাড়িতে। বাঁধি কিষেন। ঢেঁকিঘরে বাপ মেয়েতে থাকে। বাঁধি মুনিষদের জন্য আই আর এট এর মোটা চাল, পাঁচ মিশেলি তরকারি।...মুখুজ্যে বাড়িতে পুঁটুও জন্মদাসী। মুখুজ্যেকত্তার বড়খোকার মেয়ে হৈমবতী পুঁটুরই বয়সি। পুঁটু যখন হাঁটতে শিখেছে, হৈমর হাত থেকে পড়ে যাওয়া ঝুমঝুমি কুড়িয়ে পুঁটুকে দিয়েছে, হৈম যখন এক্কা দোক্কা খেলেছে, পুঁটু ওর সেফটিপিন খুঁজে দিয়েছে। হৈম যখন ওর পুতুলের বিয়ে দিয়েছে, পুঁটু তখন ভোজবাড়ির জন্য শালুক পাপড়ির লুচি ভেজেছে, তেঁতুল বিচির মাংস রেঁধেছে। পুঁটু পাঁচ বছর হতেই ঝাড়ু দেয়, পালং সাফ করে,...। পুঁটু যখন আরও বড়ো হয়েছে, কর্তাবাবুর পা টিপে দিয়েছে, হৈমর বাবার পাকাচুল

> বেছে দিয়েছে। কর্তাবাবু, গিন্নিমারা পুকুরে নাইতে গেলে যেন না পড়ে যায়, এজন্য ঝামা দিয়ে শ্যাওলা উঠিয়েছে। এমনি করতে করতে পুঁটু বড়ো হয়েছে।[৫]

উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নিরিখে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের সূক্ষ্ম তফাত লেখক সুকৌশলে গল্পের মধ্যে দিয়ে স্থাপন করেছেন। আর একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ করার মতো, সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নামকরণের তাৎপর্য। এই গল্পে দেখা যায়, নিম্নবিত্ত সামাজিক অবস্থানে বসবাস করা একটি শিশুকন্যার নামকরণ ও উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া একটি শিশুর নামকরণ। পুঁটু ও হৈমবতী, দুটি নামই বুঝিয়ে দেয় তাদের সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদার তফাত। পুঁটু, খেঁদি, বুঁচি, টেঁপি ইত্যাদি নামকরণের ইতিহাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নিম্ন অর্থনীতিতে বেড়ে ওঠা কন্যাসন্তান, নারীর অনাদরের, অবহেলার, বঞ্চনার ইতিহাস। তাই পুঁটুকে যতোই 'পুঁটুরানি' বলা হোক না কেন, সে কখনোই উচ্চ অর্থনীতির মধ্যে বেড়ে ওঠা হৈমবতীর মতো অর্থাৎ প্রকৃত 'রানি'-র মতো জীবন অতিবাহিত করতে পারবে না। মোটা চালের ভাত খেয়ে, সস্তা সবজির তরকারি খেয়ে, ঢেঁকিঘরে থেকে, উচ্চবিত্ত মানুষের সেবা করে জীবনধারণ করতে হয় পুঁটুর মতো মেয়েদের।

পুঁটুর বাবা ও মায়ের সামাজিক অবস্থান ও কার্যাবলীও একপ্রকারভাবে পুঁটুর ভবিষ্যতকে চিহ্নিত করে দেয়। তার বাবা উচ্চবিত্ত সমাজে জনমজুরের কাজ করে, মাকেও প্রথমে দেখা যায় ঝিয়ের কাজ করতে। কখনো কখনো উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষের শারীরিক চাহিদার যোগান দিতে হত পুঁটুর মা তরঙ্গিণীকে। দেহকে যখন অন্য পুরুষের সম্ভোগের কাজেই ব্যবহার করতে হচ্ছে, সেই নিরিখে আরও বেশি রোজগারের বাসনার বশবর্তী হয়ে পুঁটুর মা দেহব্যবসার কাজেই নেমে পড়ে। সেইসঙ্গে পুঁটুও মাতৃহীন হয়ে পড়ে। ফলে পুঁটু যখন শিশু থেকে কিশোরী জীবনে পদার্পণ করে অর্থাৎ তার 'ঋতুস্রাব' হয়, তখন সে পাশে সেভাবে কাউকেই পায় না, এবং সে সেইদিনই পিতৃহীনও হয়ে পড়ে, তার বাবা মারা যায়। পুঁটুর যেদিন ঋতুস্রাব হয়, সেদিনই তার বাবা দুলাল একটি নীল চশমা হাট থেকে কেনে এবং গাছ থেকে পড়ে মরে যাওয়ার সময়ও তার চোখে সেই চশমাটি পরা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই নীল চশমা পরে পুঁটুর বাবা সবই রঙিন দেখতে শুরু করে। বাজার চলতি এই সস্তা দরের চশমা চোখে দিলেই বাস্তব পৃথিবীর আসল রঙ, আসল রূপ হয়ে ওঠে মানুষের কাছে নীলাভ, রঙিন। যে চশমা আসলে আসলটাকে আড়াল করে রেখে নকলের পিছনে মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাই মেয়ের ঋতুস্রাবের লাল রঙকে সে নীল চশমা পরে কালো দেখে। বাস্তবের মাটি বড়োই কঠিন, বড়োই শক্ত। সূর্যের আলোর তীব্র, প্রখর তেজের মতোই এই বাস্তবের মাটি। সেই প্রখর আলোকে চোখে ধারণ করলেই মানুষের কষ্টের বোধ জাগরিত হবে, মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবে, মানুষ এর থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বেড়াবে। সস্তা দরের গগলস্ বা নীল চশমা সন্তানের

শারীরিক পরিবর্তনকে ঠাহর করাতে অক্ষম করে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের বেঁচে থাকাকেও অনিশ্চিত করে তোলে। আসলে এই ধরনের বোধ, ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে রাখতে পারলেই উচ্চবিত্ত আরও আরও প্রভাবশালী হবে আর নিম্নবিত্ত নিম্নই থেকে যাবে। তাই পুঁটুর বাবা-মাকে লোকের বাড়ি কাজ করার কারণে পুঁটুকেও 'জন্মদাসী'-তে পরিণত হতে হয়। সস্তা খাবারে, আনন্দে, জিনিসে, সস্তা সাজ-পোশাকে কিংবা সস্তা মনোরঞ্জনে নিম্নবিত্তের মন-মানসিকতাকে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হয় এই বাজার অর্থনীতি। আর এই জীবনযাপনে খুশি থেকে একদল মানুষ উচ্চবিত্তকে পুষ্ট করে চলে বিনা বাক্যব্যয়ে। গল্পের মাধ্যমে লেখক এই দিকটির প্রতিই গূঢ় ব্যঞ্জনা ছুঁড়ে দিয়েছেন।

মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক শ্রেণি অনুযায়ী রাজনীতি বর্তমান। দেখা যায়, পুঁটু ও হৈমবতীর প্রায় একই সময়ে ঋতুস্রাব হয় এবং সামাজিক অবস্থানগত কারণে তাদের প্রতি হয় আলাদা ব্যবস্থা, আলাদা ব্যবহার—

> দুলালের গামছায় বিড়ির গন্ধ।
>
> পুঁটুর বাবার ওই গামছাটা পুঁটু ছোঁয়নি। একটা চটের টুকরো দুই পায়ের মাঝখানে রেখে চেপে শুয়েছিল। আলাদা। ইউরিয়ার খালি বস্তা পেতে বাবার থেকে দূরে শুয়েছিল। পুঁটুর ভীষণ লজ্জা করছিল। মরে যেতে ইচ্ছা করছিল। ও যে মেয়েছেলে হয়ে গেছে। ইউরিয়ার বস্তা ঠিকরে চাঁদের আলোর মহামারি। ঘুম আসছিল না। হৈমবতী বড়ো দাদাবাবুর মেয়ে। কমাস আগে ওরও এ-রকম হয়েছিল। হৈম তখন উঠোনে এক্কা দোক্কা খেলছিল। রক্ত দেখতে পেয়েই কেঁদে উঠেছিল হৈমবতী। গিন্নিমা তখনই বেরিয়ে এসেছিল, হৈমবতীর হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরে। খাটে শুইয়ে দিল। গরম দুধ খাওয়াল, আর দুলালকে ডেকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল—কটা আপেল নিয়ে এসো। বাক্স ভরে আপেল যায় বাংলাদেশে। যারা পাচার করে, ওদের দশটা টাকা দিলে দু-তিনটে আপেল হাতিয়ে বার করে দেয়।[৬]

দেখা যায় হৈমবতী তার প্রথম কিশোরী জীবনে পদার্পণ করে যে ধরণের আদর-যত্ন পায়, তার ছিটেফোঁটাও পুঁটুর ভাগ্যে জোটে না। এমনকি তার বাবা মৃত্যুশয্যায় তাকে আপেল খাওয়াতে চাইলেও সেই ইচ্ছাটুকুও অপূর্ণ থেকে যায়। আপেল খাওয়ার প্রসঙ্গে দেখা যায়, পাচারের আপেল কিছু টাকার বিনিময়ে বড়োলোকদের বাড়ি আসে এবং তা তারাই ভক্ষণ করে। এই পাচার ক্রিয়ার সঙ্গে মূলত রাজনৈতিক নানা ধরণের হস্তক্ষেপ কাজ করে এবং দুষ্কর্মকে দিনের পর দিন পুষ্ট করে তোলার প্রধান কেন্দ্রে অবস্থান করে উচ্চবিত্ত শ্রেণি। তাই অর্থের বিনিময়ে পাচারের আপেল কিনে খায় হৈমবতীর মতো অর্থবান পরিবারের মেয়েরা।

গল্পে দেখা গিয়েছে পুঁটুর ঋতুস্রাব হওয়ার আগেই তাকে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। আসলে বড়োবাড়ির মেয়ে হৈমবতী যখন এক্ক দোক্কা খেলে, তখন পুঁটুকে করতে হয় গৃহকাজ। তার খেলার কোনোরকম ফুরসত থাকে না। বরং তাকে

তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি করে প্রাপ্তবয়স্ক করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলতে থাকে নানা উপায়ে। কন্যাসন্তানকে 'মেয়েমানুষ' হিসাবে তৈরি করার পরিধি এক এক অর্থনৈতিক সামাজিক পটভূমিতে এক এক রকম। ঋতুস্রাব হওয়ার পর হৈমবতী যখন বিশ্রাম নেয়, গরম দুধ খায়, তখন পুঁটুকে ভাবতে হয়, কি করে সে যোনিদ্বারের রক্ত আটকাবে, কীভাবে কাপড় ব্যবহার করবে, কে তাকে এগুলো করতে সাহায্য করবে। শেষপর্যন্ত তার পাতানো মাসি কালিমাসি তাকে এই কাজে সাহায্য করে। দুজনেই কন্যাসন্তান, কিন্তু দুজনের পরিস্থিতি ভিন্ন। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে একজন মেয়ের ঋতুস্রাব হওয়াকালীন সামাজিক বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ—

> বড়ো বউদি পুঁটুর দিকে চাইল, বলে উঠল সে, কী লো পুঁটু, বাঁধিয়েছিস। এইখানে দাঁড়া। দুধের গোরুকে ছুঁসনি তো!
>
> পুঁটুর খুব লজ্জা হয়। মাথা নিচু করে থাকে।
>
> শোন, দুধের গোরু ছুঁবি না।
>
> পটল খেতে যাবি না
>
> পান বরজে ঢুকবি না
>
> তুলসীগাছ ছুঁবি না।
>
> হেঁসেলে ঢুকবি না।
>
> পুঁটু মাথা নিচু করে থাকে।[৭]

এমনকি তাকে 'অশুচি' দাগিয়ে দিয়ে নিজের বাবার মৃতদেহ ছোঁয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সামাজিক এই ধরণের ট্যাবু প্রান্তিক অর্থনীতির সমাজের মেয়েদের জীবনকে কতটা অসহায়, কতটা যন্ত্রণাময় করে তোলে, এই গল্পই তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

পুঁটুর জীবনের মাতৃত্বের পর্ব দিয়ে এই গল্পের সূত্রপাত ঘটলেও গল্পের শেষ পরিণতি হয় শোচনীয়। কিশোরী অবস্থা থেকে শুরু করে বিবাহ পরবর্তী জীবনে পুরুষের লালসার শিকার হয়েছে সে নানাভাবে। পুঁটু বিবাহ করেছিল মাত্র সতেরো বছর বয়সে, নিজের ইচ্ছায় পছন্দের মানুষের সঙ্গে। বিবাহের আগে সে পাচারের কাজে যুক্ত ছিল এবং সেখান থেকেই স্বামী সুখেনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। টাকার বিনিময়ে তার স্বামী তাকে বি.এস.এফ.-এর হাতেও তুলে দেয়। লেখক এখানে সুকৌশলে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দায়িত্বে থাকা বি.এস.এফ.-এর নারী লোলুপতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশের মাটিকে যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের দ্বারাই যখন নারী যৌন নিগ্রহের শিকার হয়, তখন দেশ কীভাবে রক্ষা পাবে? রক্ষাকর্তাই ভোগীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই পাচার অথবা সীমান্তবর্তী এলাকায় দেহব্যবসা ইত্যাদি নানা ধরনের সামাজিক দুষ্কর্ম বজায় থাকে। সেইরকমই সামাজিক অন্যায়ের শিকার হয় পুঁটুর মতো মেয়েরা। তা সত্ত্বেও নিজের 'নারী হয়ে ওঠা'-কে সে কোনোভাবে রুদ্ধ করে নি। সে যখন মাতৃত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়, তখন তার সন্তানের

পিতা কে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই সন্তান জন্ম দিতে অগ্রসর হয়, তার নারীজন্মকে সার্থক করে তুলতে চায়। পুঁটুর অতি অল্প বয়সে মা হওয়া এবং অবশ্যই অপুষ্টি হল আর একটি অন্যতম কারণ, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এমনকি শিশুটিও ভূমিষ্ঠ হতে পারে না। শিশুকাল থেকে সস্তার জীবন নির্বাহ করে নিজেকে নারী করে তুলতে গিয়ে সে নিজের প্রাণের সঙ্গে আর একটি প্রাণকেও শেষ করে দেয়। অনাদর, অযত্ন, অবহেলা, অপুষ্টির পাশাপাশি উন্মত্ত রাজনৈতিক পরিবেশও তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকে। কালিদাসী প্রথমে পুঁটুর দাইয়ের ভূমিকা পালন করলেও শেষ পর্যন্ত বিপদ বুঝে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনোরকম যানবাহনও তখন পাওয়া যায় না, কারণ তারা সকলেই ভোটে খাটতে গিয়েছে। এমনকি হাসপাতালেও চলে অব্যবস্থা। একদল মানুষ ভোট দেয়, আর একদল মানুষ ভোটের বিনিময়ে নেতা, মন্ত্রী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের উন্নতিকর্মে রত হবে বলে যে ভোট প্রক্রিয়া চলে, তাতে আসলে সাধারণ মানুষের কোনোপ্রকার উপকার হয় না। তাই পুঁটুর মতো মেয়েদের মরতে হয়। এমনকি যে ছোট্ট প্রাণটা মায়ের শরীর ছিন্ন করে পৃথিবীতে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল, যে তার মায়ের দুধের আস্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছিল, সেও এই উত্তাল ভোটের সমাবেশে বাঁচতে পারে না, তাকে বাঁচাতে আসতে কেউই এগিয়ে আসে না—

> আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়ে দিল পুঁটুকে। সঙ্গে ডেথ সার্টিফিকেট। একজন ভবিষ্যতের ভোটার কমল।
>
> ভ্যান রিকশাতেই পুঁটুকে নিয়ে ফিরছিল কালিদাসী। রিকশাওয়ালা কোনও কথা বলছিল না। দমকা হাওয়া দিচ্ছিল। যে হাতটা পৃথিবী আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, সেই হাতটা রক্তমাখা কাপড়ে ঢাকা। দমকা হাওয়া কাপড়টাকে কাঁপায়। নাড়ায়। ইলেকট্রিকের খুঁটি থেকে খুঁটিতে ভোটের প্রতীক চিহ্নের শিকলি সাজানো, তার তলা দিয়ে পুঁটুর ডেড বডি যায়।[৮]

যাদের জন্য ভোটব্যবস্থা সচল হয়ে আছে, সেই রকম একজন মানুষ হল পুঁটু। ভোট আসে, ভোট হয়, ভোটের উত্তেজনায় মানুষ মানুষের কথা ভুলে যায়। আসলে ভোট হয় কাদের জন্য, ভোট পরবর্তী কার্যকলাপ কী? সাধারণ মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা তৈরি হয়? তারই উত্তর লেখক গল্পের সমাপ্তিতে ঘোষণা করেছেন পুঁটু নামক এক নারী চরিত্রের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। এইভাবে পুঁটু নামক একটি অতি সাধারণ মেয়ের জীবনচরিত রচনার মধ্যে দিয়ে সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে তাঁর নারী-ভাবনাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

উল্লেখপঞ্জি:

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'সব গল্প মেয়েদের', কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪২৪

২. ঐ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', কলকাতা: দে'জ, অগ্রহায়ণ ১৪২১

৩. মনোরঞ্জন সরদার (সম্পা.), ‘পথ সাহিত্য পত্রিকা’ ‘স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা’ (একাদশ বর্ষ), কলকাতা: অনন্যা, জুলাই ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৯০, ১৯২
৪. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ‘সব গল্প মেয়েদের’, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪২৪
৫. ঐ, ‘সব গল্প মেয়েদের’, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, মাঘ ১৪২৪, পৃষ্ঠা ৮৯
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৯১, ৯২
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৯২
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ১০২

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নির্বাচিত ছোটগল্পের নির্মাণ- শৈলী

অঞ্জলি পাইক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নির্বাচিত কয়েকটি ছোটোগল্পের নির্মাণ-শৈলী নির্দিষ্ট কতগুলি মানকের নিরিখে আলোচনা করা হয়েছে। যে যে মানকগুলিকে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল বিষয়বস্তু, নামকরন, চরিত্র এবং ভাষাশৈলী। গল্পগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন, নামকরন, চরিত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে গল্পকারের মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তা বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযত হয়েছে এবং চরিত্র গুলির সংলাপ হয়েছে বাস্তব সম্মত। সংলাপে কোন কোন সময় অবর শব্দ ব্যবহৃত হলেও তা চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে।
মূল শব্দ : মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ছোটোগল্প, শৈলী, মানক, বিষয়বস্তু, নামকরণ, চরিত্র, ভাষা।

মূল আলোচনা :

একবিংশ শতাব্দীর এক উপেক্ষিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। এ পর্যন্ত তিনি উপন্যাস লিখেছেন এক ডজনেরও অধিক আর ছোটলল্প লিখেছেন শতাধিক। পেয়েছেন বহু সম্মান ও স্বীকৃতি। একজন নিরক্ষর রিক্সাচালক যে এত সম্মানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন তা বিস্ময়ের বিষয়। তবুও তিনি উপেক্ষিত কারন কেউ তাকে উপেক্ষা করে গরিব রিক্সাচালক বলে আবার কেউবা ঘৃণা করে নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক বলে। আর কিছু উদার ব্যক্তিত্ব তার সাহিত্যের প্রশংসা করেন অপার বিস্ময় ও মুগ্ধতা নিয়ে। তবুও যেখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি ও তাঁর সাহিত্য সেখানে তিনি আমন্ত্রিত হন না ইংরেজি জানেন না বলে।

দলিত জীবনের দুঃখ বেদনা ও সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে স্বয়ং দলিত সাহিত্যিক বাংলায় খুব কমই আছেন। এদিক দিয়ে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর অবদান অনস্বীকার্য। পেয়েছেন বহু সম্মান ও স্বীকৃতি। যেমন – পশিমবঙ্গ বাংলা আকদেমি পুরস্কার, ২৪ ঘন্টা অনন্য সম্মান, দ্য হিন্দু প্রাইজ ২০১৮, দ্য গেটওয়ে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৯, রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ২০২০, দ্য জেসিবি পাইজ ফর লিটারেচার ২০১৯, দ্য ডিএসসি প্রাইজ ফর সাউথ এশিয়ান লিটারেচার ২০১৯, দ্য ক্রসওয়ার্ড ফর বেষ্ট ট্রান্সলেশন ২০১৯, দ্য মাতৃভূমি বুক অফ দ্য ইয়ার প্রাইজ ২০২০, শক্তি ভাট প্রাইজ ২০২২।

দু-একটি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখলেও মূলত কথাসাহিত্যে রচনায় তাঁর মুন্সীয়ানা। তাঁর রচিত কথাসাহিত্যগুলিকে মূলত চারভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আত্মজীবনী,
(২) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস,
(৩) অন্যান্য উপন্যাস,
(৪) ছোটগল্প।

বর্তমানে আলোচ্য তাঁর রচিত শতাধিক ছোটোগল্পের মধ্যে থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্পের নির্মাণশৈলী। শৈলীগত বৈশিষ্ট্য আলোচনার জন্য শৈলী বিচারের যে সকল মানকের কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শৈলীবিঙ্গানীরা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট কিছু মানকের উপর ভিত্তি করে আলোচনায় অগ্রসর হব। মানকগুলিকে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হল –

১।বিষয়-বৈচিত্র্য,
২।নামকরণ,
৩।চরিত্রচিত্রণ,
৪।ভাষাশৈলী।

তাঁর রচিত গল্পগুলি মূলত অজস্র বঞ্চিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প। তবে ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তুতে রয়েছে রকমফের।

নারীর জীবন যন্ত্রনাকে কেন্দ্র করে যে ছোটগল্পগুলি তিনি রচনা করেছেন সেগুলি হল ‘আলোর সন্ধানে,’ ‘খাঁচা ভাঙা বাঁধ’, ‘মধ্যরাতের চক্রব্যূহে’ ইত্যাদি। ‘আলোর সন্ধানে’ গল্পে খুসি নামক একটি পিতৃমাতৃহীন অসহায় কিশোরী মেয়ের জীবন যন্ত্রণাকে তুলে ধরা হয়েছে। পালিত মাসি কামিনীর কাছ থেকে নগদ দশ হাজার টাকায় কিনে এক নির্জন বাড়িতে বন্দী করে রাখে পুরুষোত্তম নামক এক নর পিশাচ। প্রায় প্রতি রাতে খুসিকে ধর্ষণ করে সে। একরাতে ঘুমন্ত পুরুষোত্তমসহ অভিশপ্ত বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে খুসি ছুটে চলে আলোকিত জীবনের সন্ধানে। ‘খাঁচাভাঙ্গা বাঘ’ গল্পে দরিদ্র বিধবার একমাত্র সম্বল মেয়ে সুন্দরীকে দূর সম্পর্কের মামা অভয় ভালো কাজ দেবার লোভ দেখিয়ে দিল্লীর এক বেশ্যালয়ে বেঁচে দেয়। সেখানে কিছুদিন নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর সুন্দরী খুব কষ্ট করে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে আসে কিন্তু বাড়ি ফিরে জানতে পারে তার সেই মামা তার মাকে নাকি তার কাছে পাঠিয়েছে। সে বুঝতে পারে তার মামা তার মাকে নিয়ে কি করেছে। মামার বাড়িতে গিয়ে প্রবল আক্রোশে সে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মামার উপর, ধারালো দাঁতে কামড়ে ধড়ে গলার নলি। ‘মধ্যরাতের ব্যূহচক্রে’ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে শ্যামা নামক চোদ্দ বছরের ভীত এক কিশোরীর মনস্তত্ত্বকে। সে সৎ বাবা বাঁকাই মালেক, দাদুর বয়সি মাস্টার পার্থসারথি বৈদ্য এবং পরিচিত আরও অনেক পুরুষের কুদৃষ্টি ও অশ্লীল আচরণ দেখে এবং টিভিতে তার মত অনেক মেয়ের সাথে ঘটা বীভৎস ঘটনার খবর দেখে সর্বদা ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। তার মনে হয় চারপাশের লোভী পুরুষের চক্রবূহ্যে সে আটকে পরেছে। অন্যদিকে মাথামোটা নীলকণ্ঠ কয়েকজন দুষ্টু লোকের প্ররোচনায় শ্যামার কাছে

জানতে যায় সে তাকে বিয়ে করবে কিনা। অন্ধকারে তাকে দেখে শ্যামা এমন চিৎকার করে যে চারপাশ থেকে লোক এসে মেরে তাকে থেঁতলে দেয়। লেখকের ভাষায় “গ্রামবাংলার হাজার হাজার মেয়ে ধর্ষিত – অপহৃত – নিখোঁজ – নিহিত। কোন মানুষকে আর আলাদা করে শনাক্ত করা সম্ভব নয় কে ধর্ষক কে অপহারক কে হন্তা। সবাই সবাইকে সন্দেহের বিষনজরে দেখছে। সমাজের আনাচেকানাচে জমে গেছে সন্দেহ আর আতঙ্কের বিষবাষ্প। বোকা মাথামোটা নীলকণ্ঠ কিছু না বুঝে ফেঁসে গেছে সেই আতঙ্কজনিত আক্রশের ব্যূহচক্রে।”

দলিত সম্প্রদায়ের জীবন যন্ত্রনা কেন্দ্রিক ছোটগল্প গুলি হল ‘ষড়যন্ত্র’, ‘নকশাল’, ‘জন্ম অপরাধ’, ‘লাঠি’, ‘বুধিয়ারা হারবেনা’ ইত্যাদি। মহাভারতের জতুগৃহের ঘটনার প্রেক্ষাপটে ‘ষড়যন্ত্র’ গল্পটি লেখা। গল্পের বিষয়বস্তু নিষাদ সম্প্রদায়ের অভুক্ত পাঁচ পুত্র ও তাদের মাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে মহলে এনে কুন্তি ও পঞ্চপাণ্ডব শত্রুর চোখে ধূল দেওয়ার জন্য নিজেদের মৃত্যুর নিদর্শন হিসাবে ঐ ছয়জনকে অচেতন করে পুড়িয়ে মারে। কুন্তি পাপবোধে জর্জরিত যুধিষ্ঠিরকে এই বলে সান্ত্বনা দেন “ ঐ ছয়জন, ওরা নিষাদ, অনার্য, ছোটলোক ছোটজাত। ওরা রোগে শোকে অনাহারে দৈবদুর্যোগে অনবরত মরতেই থাকে। খরা-বন্যা-মহামারিতে হাজারে হাজারে পোকামাকড়ের মতো মরে যায় । এই সব দেখে কি মনে হয় না যে, এরা মরবার জন্যই জন্ম নিয়েছে ।” এরপর যে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলচনা করা হবে সেটি হল ‘জন্মঅপরাধ’। এই গল্পে দেখা যায় বাবুলাল রুইদাস নামক এক হত দরিদ্র কলকারখানার মজুর তার সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য কষ্টকরে হলেও শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। ছেলে শ্যামলালকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ায়। মেয়েও মাধ্যমিক দেবে। এমন সময় তার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে পুলিশ কনস্টেবলের লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও দেড় লাখ টাকা ঘুষ না দিতে পারলে চাকরি পাবে না একথা জানতে পেরে সে নিজের একটি কিডনি বেঁচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এত চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় কারন যার কিডনি লাগবে সে মাড়োয়াড়ি যে মরে গেলেও চামার শ্যমলালের কিডনি নেবে না। ছেলের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অসহায় স্বগোতুক্তি “বাপরে আমি পারলাম না । পারলাম না আমি । আমি যে জন্মজনিত অপরাধী বাপ আমার ।” দলিত জীবনের যন্ত্রণাকে খুঁজে পাই আরও যেসব ছোটগল্পে তার মধ্যে ‘বুধিয়ারা হারবে না’ অন্যতম। এ গল্পে বুধিয়া নামে একটি নিম্ন সম্প্রদায়ের অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য বার বছরের ছেলে ম্যারাথন রেসে সবাইকে হারিয়ে দেয়। তার আগে তার মায়ের সব সন্তান না খেতে পেয়ে অপুষ্টিতে কেউ মাতৃগর্ভে কেউ দু-তিন বছর বয়সেই মারা গেছে ।বুধিয়ার বাবাও সর্প দংশনে মারা গেছে যখন তার বয়স মাত্র দু-আড়াই বছর। সে খিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ধর্মান্ধ মহবাত মহন্তর দেবতার সেবার জন্য করা সাতাশি একর জমির ফালের বাগান থেকে ফল চুরি করত এবং বাগানের কর্মচারীরা যাতে তাকে ধরতে না পারে তাই সে চিতার মত খিপ্র গতিতে দৌড়ে পালাত। তার এই দৌড়ান দেখে তাকে

দৌড়বিদ বানানোর জন্য বিরিঞ্চি দাস নামক একজন ক্রীড়া প্রেমী স্কুল মাস্টার বুধিয়াকে তার মায়ের কাছ থেকে কিনে নেন। এবং সুকৌশলে তাকে ম্যারাথন রেসের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। বুধিয়ার সাফল্যে তিনি গর্বিত হন। কিন্তু ছোটজাতের এমন উত্থান মেনে নিতে পারে না মহন্ত এবং তার মত আরও অনেকে। তাইত বিরিঞ্চি দাসের নামে কারা যেন শিশু নির্যাতনের কেস দায়ের করে। আর মহন্তও তাকে ডেকে এসব থেকে দূরে থাকতে হুমকি দেয়। সব বুঝে বিরিঞ্চি দাস বুধিয়াকে নিয়ে গোপনে গভীর জঙ্গলে দৌড়ের মাহড়া দিতে থাকে। এ খবর মহন্তর কানে উঠতেই বিরিঞ্চি দাসকে লোক দিয়ে খুন করায় সে। লেখকের ভাষায় "যে বুকে বালক বুধিয়াকে পুত্রসম আশ্রয় দিয়েছিল, সেই বুক সোজা বন্দুক দেগে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে খুনিরা।" তিনটি গল্পেই দেখা যাচ্ছে গল্পের প্রধান চরিত্রগুলির করুন পরিনতির জন্য দায়ী বর্ণভেদ প্রথা।এ যন্ত্রণা কেবল দলিতদের নিজস্ব। তবে লেখক আশাবাদী তাই বুধিয়া হেরে গেলেও মালাবত পূর্ণাকে যে কেউ থামিয়ে রাখতে পারেনি সে কথা উল্লেখ করেছেন। মাত্র তের বছর বয়সে সে পৃথিবীর সর্ব কনিষ্ঠ এভারেস্ট বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

নরনারীর প্রেম যেসব ছোটগল্পের বিষয়বস্তু তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'দেহপট', 'জান্তবতা', 'ছবি বদলে যায়' 'মাঝের মানুষ' 'রূপে অপরূপে' ইত্যাদি। তার গল্পের প্রেমিক প্রেমিকারা খুবই সাধারন। তাদের প্রেম দেহকে বাদ দিয়ে নয় বরং বলাযায় দেহকেন্দ্রিক। 'মাঝের মানুষ' গল্পে নিত্যগোপালের প্রেম, 'ছবি বদলে যায়' গল্পে কৈলাসের প্রতি মালতীর প্রেম এইরকম প্রেমেরই উদাহরণ। তবে প্রেমের গভীরতা দেহকে ছারিয়ে কখন কখন দেহাতীত স্তরেও পৌঁছে গেছে। 'দেহপট' গল্পে সুনীপার প্রতি আনন্দর প্রেম , 'রূপে অপরূপে' গল্পে বিবাহিত জগদীশের অচেনা অসহায় মহিলার প্রতি সহমর্মিতা মেশানো তীব্র ভালবাসা একটু অন্যরকম।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর অনেকগুলি ছোটগল্পের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ঘটনা কেন্দ্রিক। এরকম কয়েকটি ছোটগল্প হল 'সারমেয় সংবাদ', 'আর এক শিখণ্ডী', 'মুর্দাবাদ', 'পরিবর্তন চাই', 'ন্যাতা' প্রভৃতি। 'সারমেয় সংবাদ' এক অসাধারণ রচনা। এই গল্পে অসীম দাস নামক জনৈক লেখকের গুনগ্রাহী ছিলেন স্বয়ং প্রদেশপ্রধান। যেদিন থেকে সেই মন্ত্রীর কথায় নিজের স্বাধীন বক্তব্যকে ভুল বলে মেনে নিয়েছেন সেদিন থেকে তাঁর শরীরে অতিরিক্ত রোম গজাতে শুরু করেছে। এরপর রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে আসা নতুন প্রদেশমন্ত্রী অসীম দাসকে বঙ্গরত্ন কবি বিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করেন। আসলে তাকে কিনে নেন। এরপর নতুন প্রদেশমন্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে অসীম দাসের মধ্যে প্রভুভক্ত কুকুরের মত আচরণ দেখা যায়। তাঁর এও মনে হয় তাঁর সারা গা কুকুরের মত লোমে ভরে গেছে। 'আর এক শিখণ্ডী' গল্পে নোনামাটি বস্তির 'উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'র সর্বমান্য নেতা বিভু মণ্ডলকে শিখণ্ডী হিসাবে ব্যবহার করে শাসকদলের এম.এল.এ মৈনাকবাবু। তাঁকে বলা হয় তিনি যেন

বস্তিবাসীদের বোঝান যে বস্তি খালি করে দিলে এখানে যে কমপ্লেক্স হবে তাতে তারা ফ্লাট পাবে তাই তারা যেন কাজে কোন বাঁধা না দেয়। আর এজন্য তিনি মাসে পঁচিশ হাজার করে ভাতা পাবেন। একটা গাড়ি থাকবে তারজন্য যাতে তিনি বিভিন্ন বস্তিতে ঘুরে ঘুরে লোকেদের বোঝাতে পারেন।

এবার আসা যাক গল্পগুলির নামকরণ প্রসঙ্গে। যেকোন সাহিত্য কর্মের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার নামকরন। এই নামকরন বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন চরিত্রকেন্দ্রিক, বিষয়কেন্দ্রিক, ঘটনাস্থলকে কেন্দ্র করে, মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে অথবা ব্যঞ্জনাধর্মী। নামকরনের মাধ্যমে লেখক বিন্দুতে সিন্ধু দেখানোর কাজ করেন তাই তা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। সেই দুরূহ কাজ যে গল্পকার সুসম্পন্ন করেছেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর গল্পগুলির নামকরণের সময় ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণকেই বেছে নিয়েছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পের শিরোনামগুলি পলিফনিক মাত্রা পেয়েছে।

প্রত্যেক শিল্পীর মত কথা-শিল্পীরও সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় কিছু মৌলিক উপাদান। কোন চরিত্র চিত্রণের জন্য লেখক বিশেষ কতগুলি কৌশল অবলম্বন করেন। এ প্রসঙ্গে শৈলীবিদ পবিত্র সরকার বলেছেন, "গল্প-উপন্যাসে চরিত্র আঁকতে গিয়ে লেখকরা নানা উপায় বেছে নেন। উদ্দেশ্য, চরিত্রটিকে কম বেশি জ্যান্ত করে পাঠকদের সামনে ছেড়ে দেওয়া-যেন তারা নিজেদেরই একটা প্রাণ উপার্জন করে।" মনোরঞ্জন ব্যাপারীর গল্পগুলিতে অসংখ্য চরিত্রের ভিড়। তিনি সেই চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করার জন্য যে সকল কৌশল ব্যবহার করেছেন সেগুলকে নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা গেল।-

(১) লেখকের বর্ণনার মাধ্যমেঃ এরূপ বর্ণনা আবার দু প্রকার। যথা- (ক) সরাসরি কিছু শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যর একটা তালিকা পাঠকের সামনে হাজির করেছেন লেখক।

(খ) চরিত্রগুলির আচরন বা ক্রিয়া কলাপের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে,

(২) সংলাপ ও স্বগোতুক্তির মাধ্যমে,

'নাম-দাঁড়ি সংলাপ', 'বিবৃতি সংলাপ' ও 'প্রত্যক্ষ সংলাপ' এই তিন ধরনের সংলাপেরই চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলতে কম বেশী ভূমিকা থাকলেও 'বিবৃতি সংলাপ'-এর বিবৃতি অংশ এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পালন করেছে। তবে নামদাড়ি সংলাপ খুবই কম ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পগুলিতে প্রত্যক্ষ সংলাপের প্রাচুর্য লক্ষ্যনীয়। সংলাপে অনেক অশ্লীল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু সেগুলি উপযুক্ত স্থানে বসায় চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। কয়েকটি চরিত্রানুগ সংলাপ তুলে ধরা হল। 'সারমেয় সংবাদ' গল্পে অসীম দাসের বাড়ির কাজের মেয়ে সুভদ্রা তাঁকে বলে- "কী হল জ্যাঠামশাই । এখনও চ্যান করোনি ! আবনার কি শরীল খারাব !" সংলাপটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সুভদ্রা অশিক্ষিত তাই সে অসীম দাসকে একবার তুমি একবার আপনি বলছে। স্নান, আপনার, শরীর, খারাপ শব্দগুলির ভুল উচ্চারন করছে।

'জন্মঅপরাধ' গল্পে কিডনি চক্রের দালাল বিপ্লবের সংলাপের অংশ বিশেষ – "....মালটা যে মার্কেটে অচল তা কি জানতাম। পাঁচে বাতচিত পার্টি দুই অ্যাডভানস দিয়েছে। এ শালার সাথে দেড় কথা ছিল। ... " এ চরিত্রের সংলাপে অনেক অবর শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে যা চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তোলে। কিছুটা পড়াশুনা জানায় তার সংলাপে ইংরাজি শব্দ ও নানান ভাষার মানুষের সাথে ডিল করার জন্য হিন্দি শব্দও রয়েছে। ফলে সংলাপে এই কোড মিশ্রণ তার জন্য যেন অনিবার্য হয়ে পরে। স্বল্প পরিসরের এই আলচনায় সংলাপ নিয়ে আলোচনা এখানেই সীমাবদ্ধ রাখা হল।

সবশেষে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ছোটগল্পগুলির ভাষাশৈলী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক। গল্পগুলির ভাষা অতি প্রাঞ্জল। নানান সময় লেখকের বর্ণনা অংশে বা সংলাপে প্রবাদের প্রাসঙ্গিক ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। 'তোলাবাজ' গল্পে শিবপদ বাবু থানায় ঢোকার আগে গল্পকার বলছেন –" বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিশ ছুঁলে এক-শ আঠারো । কী যে আছে ভাগ্যে তা কে জানে !" এ যেন পাঠককে একটা ইঙ্গিত দেওয়া যে শিবপদ বাবুর কপালে বিপদ আছে। গল্পের শেষে দেখাযায় তোলাবাজদের সন্ত্রাস থানার বড়বাবু অপূর্ব রায় শিবপদ বাবুর কাছ থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা ঘুষ তথা তোলা নেন তার কুকর্ম ঢাকার জন্য। গল্পগুলির ভাষা কখন কখন হয়ে উঠেছে পদ্যধর্মী। কোন কোন বাক্যে সমান্তরতা গল্পগুলিকে সুখ পাঠ্য করে তুলেছে। অনেক অবর শব্দের ব্যবহার তার গল্পে পাওয়া যায়। সংলাপের শৈলী আলোচনার সময় এইসব শব্দ কিভাবে চরিত্র নির্মাণে সাহায্য করে তা দেখান হয়েছে। তার গল্পে অনেক জায়গায় প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলি আসলে বিস্ময়মাখা প্রশ্ন। যেমন- "এর মধ্যে কী কোনো গোপন বার্তা ছিল!", "তুমি মেয়ে না !" 'মাঝের মানুষ' গল্পের নিত্যগোপালের বিস্ময় মেশানো প্রশ্ন এগুলি। তবে প্রশ্নবোধক বাক্যও পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন – "কী যে এখন করে -নিত্যগোপাল বুঝে উঠতে পারছে না। ঐ মেয়েটাই-বা কি করবে ? কীভাবে যাবে? কোথায় ওর বাড়ি ?" সমান্তর এই প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি নিত্যগোপালের মনের প্রশ্নগুলো পাঠকের মনে সঞ্চালিত করে। আর এটাই লেখকের উদ্দেশ্য।

জেলে বসে মাটিতে কাঠের আঁচড়ে প্রথম বাংলা বর্ণমালা শিখেছিলেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। জেলফেরত রিকশা চালকের রিকশায় সওয়ারী হন দরদী কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। সেই ভাগ্যলক্ষ্মীর অপার স্নেহ ও উৎসাহে ১৯৮১ সালে 'বর্তিকা' পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মধ্যদিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু। তারপর কঠিন জীবন-সংগ্রামের মাঝেও সাহিত্যচর্চা চালিয়ে গেছেন এবং আজও লিখে চলেছেন। তাঁর সাহিত্য কোন টেবিল ওয়ার্ক নয়, নিজের জীবনের বাস্তব উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। তার রচিত ছোট গল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি যে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। তার মধ্যে থেকে কিছু নির্বাচিত ছোটগল্পের রচনাশৈলীর অতি

সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল যে তার ছোট গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিন যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনই বিষয় অনুযায়ী ভাষা, রচনা কৌশল ও নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

ক) আকর গ্রন্থ

১। ব্যাপারী মনোরঞ্জন (২০১৮): না-মরা মানুষ ও অন্যান্য গল্প, নদীয়া; তবুও প্রয়াস।

২। ব্যাপারী মনোরঞ্জন (২০১৮): জীবনের গল্প গল্পের জীবন, নদীয়াঃ তবুও প্রয়াস।

খ) সহায়ক গ্রন্থ:

১। মজুমদার অভিজিৎ (২০০৭): শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং।

২। মজুমদার পরেশচন্দ্র, মজুমদার অভিজিৎ (২০১০) : বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

৩। সরকার পবিত্র (১৯৮৫) : গদ্যরীতি পদ্যরীতি, কলকাতা : সাহিত্যলোক ।

৪। নাথ মৃণাল (১৯৯৯) : ভাষা ও সমাজ, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ ।

৫। বসুদত্ত শর্মিলা (২০১৪) : বাংলায় মেয়েদের ভাষা, কলকাতা : প্রমা প্রাকাশনি ।

৬। 'আপনি : তুমি : তুই'; অন্তর্ভুক্ত : আলাপ : সংলাপ : সম্ভাষ : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮, কলকাতা ।

অভাব জাত ‘বিভাব’

অঙ্কিতা মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: শম্ভু মিত্র রচিত নাটক ‘বিভাব’ নাট্যবিষয়ে ও উপস্থাপনা শৈলীতে ভিন্ন। নাটকটিতে নাটককারের বিশেষ নাট্যভাবনা ও জীবনবোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।নাটককার গ্রুপ থিয়েটারে নাট্যপ্রযোজনার আর্থিক সংকটের দিকটিকে যেমন নাটকে উপস্থাপন করেছেন তেমনই নতুন ধরণের অভিনয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। নাটকটি জুড়ে একটি অভাব বিরাজমান। বাস্তব জীবন, নাটকের বাস্তব ও নাট্যদলের নানা অভাবের স্বরূপকে ধারণ করে আছে এই নাটক। এই অভাবকে অবলম্বন করেই নাটককারের ঈপ্সিত নাট্যদর্শন অভিব্যক্ত ও ঘনীভূত হয়েছে নাটকে।
সূচক শব্দ : ‘শম্ভু মিত্র - অসামান্য নাট্যভাবনা - ‘বিভাব’ – অভিনেতা - তাৎক্ষণিক – নাটক - সংলাপ - বাস্তবগ্রাহ্য উপাদান - ভাব ভঙ্গি – কল্পনাশক্তি - স্বতন্ত্র কৌশল - কাল্পনিক অভিনয়রীতি – অভাব - হাসির উপকরণ – শাশ্বত জীবন সত্য।

মূল প্রবন্ধ -

অবিসম্বাদী নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র (২২ আগষ্ট, ১৯১৫ – ১৮ মে, ১৯৯৭)। তিনি এমন একজন শিল্পী যিনি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা ও গতানুগতিক শিল্পরূপে জীবনের রূপনির্মাণে তৃপ্তি পাননি। বারবার তাই সন্ধান করেছেন নতুন নাট্যবিষয়। নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে পাঠক ও দর্শককে উপহার দিতে চেয়েছেন নবজীবনভাষ্য। তাঁর রচিত নাটক বিষয়ে ও শিল্পশৈলীতে আমাদের জাগ্রত চৈতন্যাকাঙ্ক্ষী। সাহিত্যের নির্মাণ–ক্ষমা প্রজ্ঞায় রচিত শম্ভু মিত্রের নাটক সহৃদয় হৃদয়সংবাদী ও মনন সংবাহী।

শম্ভু মিত্রের অসামান্য নাট্যভাবনাসমাজের উপলব্ধির সঙ্গে বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে যে নাটকের জন্ম দিয়েছে তা আমাদের আত্মার এক আশ্চর্য মহাদেশ। যে নাটক মহৎ বাঁচার অনুপ্রেরণার দ্যোতক হয়ে ওঠে সেই নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছেন। তিনি রচনা করেছেন এমন নাটক যা কাব্যিকতা সৃষ্টির জোর না করে উপলব্ধির গভীরতায় ভাঙা–ভাঙা সংলাপে অভিনেতার স্বরগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছে কাব্য। শম্ভু মিত্র রচিত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকের মধ্যে ‘বিভাব’ নাট্যবিষয়ে ও উপস্থাপনা শৈলীতে তেমনই ভিন্ন এক অনুভব গড়ে তোলে, যা আমাদের গূঢ় অভিনিবেশ দাবী করে।

‘বিভাব’ নাটকটির রচনাকাল **১৯৫১** সাল। ‘বহুরূপী’ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায়, ডিসেম্বর **১৯৫৬** সালে নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের সময়

নাটককারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ২০ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে শ্রী সুধাংশু দাশগুপ্তর বাড়িতে (লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা) নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। 'বিভাব' নাটকটিতে নাটককার ও নাট্যশিল্পী শম্ভু মিত্রের বিশেষ নাট্যভাবনা ও জীবনবোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। পত্রিকায় প্রকাশের সময় এই নাটকের শেষে 'নিবেদন' অংশে লেখা হয়–

> "একজনের সামান্য একটা আইডিয়া বিস্তার করে অভিনেতৃবর্গ নিজের কথা প্রায় নিজে নিজেই বানিয়েছেন। ফলে, অভিনয়ে কিছু অদলবদল হয়েই যায়। তাছাড়া, এটা মুখ্যত অভিনেতৃদের দ্বারা বানানো বলে এর কথায় চেয়ে কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে হয়তো সামান্য একটু বৈশিষ্ট্য থাকে।"[১]

– নিবেদন অংশটি অনুসরণে দেখা যায় একটি বিশেষ আইডিয়াকে সামনে রেখে নাটকের অভিনেতারা তাৎক্ষণিকভাবে নাটক সংঘটিত করবেন পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে। নাটকের প্রারম্ভেই নাটককার গ্রুপ থিয়েটারে নাট্যপ্রযোজনার আর্থিক সংকটের দিকটিকে উপস্থাপন করেছেন। স্বতন্ত্র নাট্যানুশীলনে রত নাট্যদলগুলির সঙ্গে সরকারের অসহযোগিতা প্রসঙ্গটিও ব্যক্ত করেছেন। আবার মঞ্চে বাস্তবগ্রাহ্য উপাদান ব্যবহার না করে শুধু ভাব ভঙ্গি দিয়ে এবং দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে নাট্যাভিনয়ের এক স্বতন্ত্র কৌশল আয়ত্ত করে অন্য থিয়েটারের আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন– "তাই অনেক ভেবে চিন্তে আমরা একটা প্যাঁচ বের করেছি। যাতে স্টেজ-এর দরকার হবে না – যে কোনোরকম একটা platform হলেই চলবে, সিনসিনারি দরজা জানলা টেবিল বেঞ্চি কিছুরই দরকার হবে না। এমনকি বাংলা সরকারও না।"[২] এই নতুন ধরণের অভিনয়ের অনুপ্রেরণা নাটককার কোথা থেকে পেয়েছিলেন তাও তিনি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত তিনি সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন এবং নিজের দেখা ওড়িয়া যাত্রায় অভিনয় ভঙ্গির কথাও বলেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে মারাঠি 'তামাশা'র আসবাববিহীন কাল্পনিক অভিনয়রীতির কথাও বলেছেন এবং তা দেখে দর্শকদের নাট্যরস গ্রহণের অভিজ্ঞতার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। আবার যাপনের কাবুকি থিয়েটার ও রুশদেশীয় চিত্র পরিচালক আইনজেনস্টাইনের প্রসঙ্গ আলোচনার সূত্রে আইনজেনস্টাইনের অভিনয়ভঙ্গির কথাও বলেছেন। সেইসঙ্গে নাট্যমঞ্চে উপকরণের বাহুল্যকে বর্জন করে নাট্যাভিনয়ের স্বাতন্ত্র্যে গ্রুপ থিয়েটারের জনক শম্ভু মিত্রের উত্থানের ইঙ্গিতটিও প্রত্যক্ষ করতে পারি আমরা।

প্রথমেই দেখা যায় নতুন পদ্ধতিতে নাটক করবার উদ্দেশ্য নিয়ে শম্ভু মিত্র আসেন অমর গাঙ্গুলীর বাড়িতে। অভিনয়ের ভঙ্গিতে সেখানে বসে চা, সিগারেট খেয়ে পরিকল্পনা হয় সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী হাসির নাটক করবার। বক্স অফিসের চাহিদা অনুযায়ী হাসির নাটকের বিষয় হিসেবে বৌদির পরামর্শ অনুযায়ী 'লভ সিন'এ অভিনয় করা মঞ্চে। শম্ভু থাকবে, অমর ও বৌদি মিলে 'লভ সিন', 'প্রগ্রেসিভ লভ সিন' এ ভঙ্গি দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেও অভিনয়কালে হাসি পায় না কারোরই। অভিনেতারা

হাসির উপাদান অনুসন্ধানের জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। এই অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য জীবনকে মুখোমুখি চাক্ষুষ করা। কারণ শম্ভুর মনে হয়–

> "**শম্ভু :** জীবন কোথায়?
>
> **অমর :** (বুকে হাত দিয়ে) কোথায়?
>
> **শম্ভু :** রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে। এই চার দেয়ালের মধ্যে, এই ঘরের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যাবে না – হাসিও পাবে না –। সুতরাং চলো – বাইরে – হাসির খোরাক, popular জিনিসের খোরাক পাবে।"[৩]

অভিনয়ের ভঙ্গিতেই ভেসে ওঠে রাস্তার নানা টুকরো ছবি। তারপরেই তারা দেখেন যে হঠাত্ পেছন থেকে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। তাদের দাবী খাদ্য, কাপড়। অন্যদিক থেকে আসে পুলিশ। পুলিশ সতর্ক করে এই বলে যে মিছিল বন্ধ না করলে গুলি চলবে। পুলিশের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে জীবনের দাবী মাঠ দাঁড়ায়। বন্ধ হয় না মিছিল, চলতে থাকে স্লোগান। শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয় একটি ছেলে ও মেয়ে। মৃত্যুর দৃশ্যে শম্ভু মিত্র বললেন – 'এইবার বোধ হয় বাঙালী হাসবে।' জীবনের এই মর্মন্তুদ মুহূর্ত অমরকে ও দর্শককে হাসাতে পারবে এই প্রত্যাশা দিয়েই নাটকের যবনিকা। বিভাব নাটকের জন্ম হয়েছে অভাব থেকে। শম্ভু, অমর ও বৌদির ধারণা এই যে অভিনয়ের দ্বারাই হাসির খোরাক আনা সম্ভব। নাটকটিতে যে দুটি 'লভ সিন' আমরা দেখি তা সার্থকভাবে পরিকল্পিত হলেও হাসির উদ্রেক করতে পারেনি। তখন নাটককার চার দেওয়ালের বাইরে হাসির উদ্রেককারী উপযুক্ত বিষয় অনুসন্ধানে নামেন। সম্পূর্ণ নাটকটি জুড়ে একটি অভাব বিরাজমান। নাটুকে দলের অন্যতম সমস্যা হিসেবে শম্ভু মিত্র বরাবরই নাট্যমঞ্চ ও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবের কথা বলেছেন। তাই নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রেও এই অভাবকে কৌশলে জুড়ে দিয়েছেন নাট্যবিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে। নামকরণটি হয়ে উঠেছে বহু অর্থবোধক। নাটক করার প্রবল ইচ্ছা ও বোকামি থেকে যে নাটকের জন্ম সেখানে ইচ্ছেটুকু ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুরই অভাবের কথা বলা হয়েছে–

> "কোনো এক ভদ্রলোক পুরোনো সব নাট্যশাস্ত্র তল্লাস করে আমাদের এই অভিনয়ের নাম দিয়েছেন 'বিভাব নাটক'। সংস্কৃত হিসাবে তিনি ঠিক কি বেঠিক সে বিবেচনা করবেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা, কিন্তু নামের দিক থেকে আমাদের একটা সামান্য আপত্তি আছে। আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিৎ 'অভাব নাটক'। কারণ দুরন্ত অভাব থেকেই এর জন্ম। আমাদের এটা ভালো স্টেজ নেই। সিনসিনারি, আলো, ঝালর কিছুই আমাদের নিজেদের নেই। সঙ্গে থাকার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা।"[৪]

বস্তুত নাটকটি মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই ইঙ্গিত আমরা নাটকের উপান্তে উপনীত হয়ে অনুভব করি। তাই প্রেক্ষাপটেও রয়েছে জীবনকে বিপর্যস্ত করার মত এক অভাব, এক ঐতিহাসিক সত্য ক্ষণ। যেখানে জীবন রক্ষা করা এক বড় প্রশ্নের মুখোমুখি

দাঁড়ায় সেখানে আনন্দের অবসর গ্রহণীয় নয়। বাস্তব জীবন, নাটকের বাস্তব ও নাট্যদলের নানা অভাবের স্বরূপকে ধারণ করে আছে এই নাটক। এই অভাবকে অবলম্বন করেই নাটককারের ঈপ্সিত নাট্যদর্শন অভিব্যক্ত ও ঘনীভূত হয়েছে নাটকে। তাই নাটকটির নামকরণ 'বিভাব', সার্থক।

'বিভাব' নাটকটি মূলত আরেকটি নাটককে ধারণ করে আছে। নাটকটির অভিনয় দেখলে মনে হতে পারে তা আগে থেকে লেখা নয়। দর্শক অনুভব করবেন যেন তাদের সামনে দাঁড়িয়েই অভিনেতা – অভিনেত্রীরা নাটকের কাহিনি ও দৃশ্য নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে, যেখানে দর্শকরাও তার অংশ। নাট্যকর্মশালার ধরণেই নাট্যসংলাপ তৎক্ষণাৎ রচনা করা হতে থাকে। নাটক মঞ্চস্থ করার লক্ষ্যে কিছু নাট্যপদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচন করার কথাও এখানে রয়েছে। অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী বিভাব কথার অর্থ হল যার দ্বারা দর্শকদের মনে স্থায়ীভাবের উদ্রেক হয়। অর্থাৎ বিভাব হল রসের উৎপত্তির হেতু। এই নাটকেও নাটককার এমন কিছু করতে চেয়েছেন যার সাহায্যে দর্শকদের হাসি পায়। নাটকের শুরুতেই নাটককার জানিয়েছেন যে জনৈক ভদ্রলোক পুরনো নাট্যশাস্ত্র ঘেঁটে এই নাটকের নামকরণ করেছেন। নানাবিধ অভাবকে অবলম্বন করেই এই নাটকের বিন্যাস। নাটককার এই নাটকেও জীবনের শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরেছেন। নাটককারের মতে নাটক যেহেতু জীবনকেই অনুসরণ করে, তাই জীবনবিবিক্ত হয়ে চার দেওয়ালের মধ্যে সাজিয়ে তোলা জীবননাট্যে হাসির উপকরণ থাকতে পারে না, তা কখনোই দর্শকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া হাস্যরসও ঘনীভূত হয় 'হাস' নামক স্থায়ীভাব থেকে। আর এই ভাব জীবন সঞ্জাত। তাই রাস্তায় নেমে জনজীবন স্রোতের মধ্যেই জীবনরসের উদ্বোধন। বদ্ধ ঘরের মধ্যে হাসির খোরাকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নাটকের শেষে নাটককার সেই অভাব মোচন করে নাট্যরসের যথার্থ বিভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অবিকৃতভাবে বাস্তবের চরিত্রগুলি নাটকে হুবহু উঠে এসে বাস্তব জীবনচিত্রকেই নির্দেশ করেছে এবং নাটককারের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছে। নাটকটির উপস্থাপনায় বাঙালির উপনিবেশবাদী চেতনার প্রতি ব্যঙ্গ যেমন বর্ষিত হয়েছে, তেমনি এশিয়ার দেশ সমূহের প্রাচীন নাট্য ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানসিকতার প্রকাশও লক্ষ করা যায়। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'বিভাব' এক অত্যাশ্চর্য নাট্যানুভূতির নাটক।

শিল্প গুণে শম্ভু মিত্রের লেখা এই মৌলিক নাটক তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার নান্দনিক উপলব্ধিতে ভাস্বর। এই নাটকের বিষয় কেবলমাত্র সমকালীন সময় ও সমাজ–মানুষের জীবনের বাহ্যিক রূপাঙ্কনেই নিবিষ্ট থাকে নি, তা জীবনের অন্য অনুভূতির অভিমুখ রচনা করেছে। প্রতিটি চরিত্রই পাঠক ও দর্শকের মনে নির্দিষ্ট নাটকের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে অসংখ্য মানব চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে। আর তাই অভাব জাত 'বিভাব' অবলম্বনে আমাদের

চিত্তবৃন্তে জন্ম হয় যে গভীর রসানুভূতির, তা কেবল আমাদের দ্রবীভূত করে না, নিয়ে যায় অনাস্বাদিত পূর্ব এক চেতনালোকে।

তথ্যসূত্র:

১) শাঁওলী মিত্র (সম্পা), 'শম্ভু মিত্র রচনাসমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪,পৃ ৩৬৫

২) তদেব, পৃ ৩৩৯

৩) তদেব, পৃ ৩৭৬

৪) তদেব, পৃ ৩৬৫

আকর ও সহায়ক গ্রন্থ এবং সহায়ক পত্রপত্রিকা

১। শাঁওলী মিত্র (সম্পা), 'শম্ভু মিত্র রচনাসমগ্র ১', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪।

২। মিত্র শম্ভু, 'সন্মার্গ সপর্যা', এমসরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, সি., কোলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০২।

৩। মজুমদার স্বপন, – ১৯৪৮বহুরূপী '১৯৮৮', বহুরূপী, কোলকাতা৭৩ –, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

৪। মিত্র শাঁওলী (সম্পাদিত-সহ) ও রায় অনিত (সম্পাদিত), ধ্যানে ও : শম্ভু মিত্র' 'অন্তর্ধানে, নান্দনিক, কলকাতা৯ -, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৫। মিত্র শাঁওলী, 'তর্পন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা --৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮।

৬। মিত্র শাঁওলী, 'ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট .সি. লিমিটেড, কোলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬।

৭। মিত্র শাঁওলী, - ১৯১৫শম্ভু মিত্র '১৯৯৭ বিচিত্র জীবন'পরিক্রমা-, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।

৮। নাট্যচিন্'তা', সম্পাদকরথীন চক্রবর্তী -, শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭।

৯। '৩নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জানুয়ারি ১৯৯৩।

১০। '৬নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা, ১৯৯৯।

১১। 'বহুরূপী পত্রিকা', ১ থেকে ১০২ সংকলন, ১৯৫৫ ।২০০৪ –

১২। 'পশ্চিমবঙ্গ', শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা-১ বর্ষ ৩৪, সেপ্টেম্বর ২০০০।

১৩। 'দেশ', ৬৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় ১৪০৪, ২৮ জুন ১৯৯৭।

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্যান্টি’: একটি বিশ্লেষণের নিরিখে

টুম্পা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মেয়েদের কলমে লেখা মানেই মেয়েলি হবে বা পুরুষের লেখা পুরুষালি হবে এধরনের লিঙ্গবৈষম্যের চিন্তাভাবনা আমরা এই একুশ শতকে এসেও পালটাতে পারিনি অনেকেই। মেয়েদের লেখার তথাকথিত ‘মেয়েলি’ ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে এসে যে কিছুজন বলিষ্ঠভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে পাকাপাকিভাবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তাদের মধ্যে সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। ‘প্যান্টি’ উপন্যাসটি তারই স্বাক্ষর বহন করেছে। উপন্যাসটির নামকরণেই তিনি যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অন্তর্বাসকে নারীর আঘাতের উপরের প্রলেপ মনে করেছেন তিনি। উপন্যাসটিতে নারীর প্রেম ও যৌনতা, জটিল মনস্তত্ত্ব, তার অপমান, দুঃখবোধ, শ্লীলতা অশ্লীলতার বোধ ইত্যাদি খুবই সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। কথোপকথন ও স্মৃতিচারণাসূত্রে উঠে এসেছে দেশসম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, ধর্মসম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, মৃত্যুচিন্তা, অস্তিত্বচিন্তা প্রভৃতি। নারীর চিন্তাভাবনার বহুমুখী দিকের চিত্র আমরা পাই এই উপন্যাসে। উপন্যাসে সব চরিত্রই নামহীন, সর্বনামে চিহ্নিত করে ঔপন্যাসিক কিছু নির্দিষ্ট পাত্রপাত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এক সীমাহীন বিস্তার দিতে চেয়েছেন।
সূচক শব্দ : পিডোফিল, যৌনতা, মনস্তত্ত্ব, মাতৃত্ব, নারীত্ব, শ্লীলতা, অশ্লীলতা।

মূল প্রবন্ধ

বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উপন্যাসে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ভোগের ইচ্ছা, নারীর পতন, অত্যাচার, ধর্ষণ, মাতৃত্বের নতুন সংজ্ঞা ইত্যাদির চিত্র একটু ব্যতিক্রমীভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উঠে এসেছে নরনারীর সম্পর্কের চিত্র। আমরা তার ‘প্যান্টি’ উপন্যাসটি নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> “আমেরিকার লেখিকা এরিকা জঙের লেখায় যেমন নারীর উন্মুক্ত ইচ্ছার খোলামেলা প্রকাশ দেখা যায়, তার Fear of Flying (1973) থেকে আধুনিকতম Envening Memory (1997), Sappho’s Leap (2003)—এইসব উপন্যাসে, নারীবাদ, নারী-স্বাধীনতা, ভালোবাসা ও দ্বন্দ্ব নিয়ে যেমন জনপ্রিয় বা ‘Sugan in My Bowl’- এ খোলাখুলি যৌন-স্বেচ্ছাচারের ঘোষণা—ঠিক ততদূর সাহসী না হলেও ‘প্যান্টি’ নামের একটি উপন্যাস লিখে তিনি নারীত্বের নূতন দর্শন উন্মোচন করতে চাইলেন।”[১]

উপন্যাসের নাম মেয়েদের অন্তর্বাসের নামে। নামটা শুনে অনেক পাঠকই হয়ত চমকে উঠতে পারেন। উপন্যাসের কথক একটি মেয়ে যে একটি মৃত মেয়ের বাঘছাল প্রিন্ট প্যান্টি পরেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। পিরিয়ডের সময় তার কাছে অন্য কোনো অন্তর্বাস না থাকায় বাধ্য হয়েছিল সেই অন্তর্বাস পরতে। পরার পর তার মনে হয়েছে সে একাত্ম হয়ে গেছে মৃত মেয়েটির সঙ্গে। সেই মেয়েটির চাওয়া পাওয়া নিজের চাওয়া পাওয়া হয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে অনুভব করেছে অন্য একটি সত্ত্বার অস্তিত্ব।

"আসলে তার নারীত্বকে গলিয়ে নিলাম আমি। তার যৌনতাকে, তার প্রেমকে গলিয়ে নিলাম। তার বাসনা, ব্যভিচার কিংবা পাপকে, তার অপমান এবং দুঃখকে, তার লজ্জা এবং ঘৃণাকে গলিয়ে নিলাম। তার পরাজয়, তার ফিরে যাওয়াকেও গলিয়ে নিলাম আমি। আর তার দেশকেও তন্মুহূর্তে গলিয়ে নিলাম।"[২]

আসলে এই প্যান্টি বহু'র আঘাতের অন্তর্বাস। অথবা বহমান ইতিহাসের গোপন প্রত্যঙ্গকে মানুষের চোখের আড়ালে রাখার একটুকরো আচ্ছাদন। যা গোপন করার উদ্দীপক অশ্লীলতা থেকে ক্রমশ স্বীকার করে নেওয়ার শ্লীলতায় উত্তরণের চিহ্ন। আনন্দ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উপন্যাসটির ব্লার্বে তাই লেখা রয়েছে।

উপন্যাসে একটি চরিত্রেরও নাম নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্বনাম পদ ব্যবহার করা হয়েছে। এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন কোনও চরিত্রের নাম নেই। এখানে কি প্রায় সব মেয়েদের গল্প। যেকোনো মেয়ের গল্প হতে পারে এমনকি পাঠকেরও। তার জন্যই কি কোনও নাম দেওয়া হয়নি। যাতে সব পাঠক উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। বা এটাও হতে পারে নাম আসলেই একটা গল্প, প্লটের দাবী করবে উপন্যাসটি যা লেখিকার কাম্য নয়। কারণ তিনি কিছু পরিস্থিতির কথা তুলে এনেছেন যা প্রবহমান এবং পরিবর্তনশীল। এবং তা যে কারুর জীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হতে পারে। আর একারণেই উপন্যাসটির অধ্যায়বিভাজনেও কোনও পারম্পর্যসূত্রতা নেই। কারণ এটা মানুষের জীবনের গল্প যে কোনও সময় অপ্রত্যাশিত ভাবেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে।

পরিবার পরিজনহীন কথক মেয়েটি আশ্রয় নিয়েছে বাঘছাল পরিহিত মেয়েটির প্রেমিকের কাছে। মেয়েটি যে ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছে সেই ফ্ল্যাটেই পূর্বের মেয়েটি থাকত। তার স্মৃতি বিজড়িত ঘরে মেয়েটি থাকতে থাকতে বিশেষ করে সেই প্যান্টি পরলে ফিরে আসে তারা স্বপ্নের মধ্যে। তাদের শারীরিক মিলন ফিরে আসে। তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট হয় তার কাছে। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগলেও কথক মেয়েটি ত্যাগ করতে পারে না প্যান্টির মায়া। নতুন করে আর একটা প্যান্টি কেনার কথা ভাবতে পারে না। ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার কুড়িয়ে নিয়ে আসে। কারণ প্যান্টিটির মধ্যে খুঁজে পায় নিজের গন্ধ।

পূর্বের মেয়েটি অর্থাৎ 'সে' অপেক্ষায় থেকেছে অনেকদিন, প্রেমিকের কাছে সংসার পাবে বলে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রেমিকের কাছে, কিন্তু প্রেমিক তা

দিতে অস্বীকৃত হয়েছে। তাদের দুজনের মধ্যে প্রবল শারীরিক সম্পর্ক ছিল, হয়তো প্রেমও জন্ম নিয়েছিল ধীরে ধীরে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছে তার বাড়িতে, যে সময় প্রেমিকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাড়িতে সম্পর্ক জানানোর, বিয়ে করার। কিন্তু তার বলার আগেই মেয়েটি জানিয়েছে সে ফিরে যাচ্ছে সেই ছেলেটির কাছে, যে তার জন্য অপেক্ষা করেছে, যার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সে অপেক্ষা করেছে প্রেমিকের, আর তার অপেক্ষা করেছে সেই ছেলেটি। মেয়েটির আর তার প্রেমিকের কাছে কিছু চাওয়ার নেই। সে দাবী করেছে পুরুষটির কাছে, পূর্বস্মৃতি বিস্মৃত হতে। মুক্তি দিয়েছে দুজন দুজনকে। সেইদিনই সে দেয়াল জুড়ে এঁকেছিল নারীপুরুষের যৌনমিলনের বিচিত্র ভঙ্গী। সে ছবির মধ্যে একই সঙ্গে প্রবল যৌনতা ও নির্লিপ্তি ফুটিয়ে তুলেছিল। আর এই নিযুক্ত হয়ে থাকতেই সে চেয়েছিল।

"যেন ও বলতে চাইছিল সেক্স একটা আত্ম-আবিষ্কার, এবং নিজেকে আবিষ্কার করার মুহূর্তেই নিজেকে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করাই সেক্সের পরের অভিজ্ঞতা! কেননা তুমি আসলে সবসময়ই তোমার ভেতরে আর একজনকে চাও—সেক্স তোমাকে সেই অনুভূতিটুকু কিছুক্ষণ দিতে না দিতেই ফল ফাটিয়ে বীজ আলাদা করার মতো তোমাকে একা করে দেয়। সেক্সের পরের লগ্নের এই একাকিত্বই জীবনের অন্য সকল হতাশার শিকড়। তুমি চাও সংলগ্ন থাকতে, ব্যস, আর কিছুই চাও না তুমি—তার অধিক 'ইশ্বর' তুমি চাইতে পার না।"[৩]

বহুমাস পরে ফিরে এসে প্রেমিক সেই দেওয়ালের ছবিকে গাঢ় রঙ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু কথক মেয়েটির কাছে সেই মিলনদৃশ্য জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে। পুরুষটির সাহচর্যে থাকতে থাকতে সে নিজেও ভালবেসে ফেলেছে পুরুষটিকে। বিশেষ বোধে সে বুঝতে পারে পুরুষটি এখনও ওই মেয়েটিকে ভালবাসে। তাই সে বারবার শুনতে চায় তাদের প্রেমের গল্প। বাঘছাল প্রিন্টের অন্তর্বাস যে পরে সে নিশ্চয়ই শারীরিকসম্পর্কে অনেকটাই বন্য এটাও তার মনে হয়। আর সেই প্রবল যৌন ইচ্ছা সে নিজের মধ্যেও কল্পনা করে। পুরুষটিকে পেতে তার প্রচণ্ড ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার মনে হয় পুরুষটিকে ভাবলেই তার মনে এসে ভর করে প্যান্টির অধিকারী মেয়েটি। তাদের মিলন প্রত্যক্ষ করতে করতে সে আনন্দিত হয়। সেই মেয়েটির মত কথক মেয়েটিও ভালবেসে ফেলে সেই পুরুষকেই। তারও ইচ্ছে হয় বিয়ে করার, একটা সংসার করার। ফ্ল্যাটে থাকতে থাকতে ফুটপাতবাসীর প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, ভাত খেতে দেয়। আর এই অধিকারবোধের কারণেই বিদেশিনীর উপর রাগ হয়, যদি সে নিজের কাছে নিয়ে যায় বাচ্চাটিকে। বিদেশিনীটি নিয়ে গেলে সন্তানবৎ প্রতিপালন করে, মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ করে দিলে মেয়েটির ভালো হবে ভেবেও তার মন মানতে চায় না। অতিবর্ষণের সময় মাতৃত্বের পরম অনুভূতি নিয়ে তাদের মেয়েটিকে ভালবেসে নিজের কাছে এনে রাখে। আদব কায়দা শেখানোর চেষ্টা করে। যদিও সে বাচ্চাটিকে বদলাতে চেয়েছিল, কিন্তু বাচ্চাটি ভিখিরিই থেকে যায়। এই কারণে সে ফেরত দিয়ে আসে এবং

কষ্ট পায়। এসবের মধ্য দিয়ে তার অবদমনে লুকিয়ে থাকা একটা সংসারের স্বপ্ন প্রকাশ পায়।

"আর স্বপ্ন দেখি কোনও অতিরিক্ত দূরে সতেজ মৃত্তিকার ওপর গোলপাতা ছাউনির ঘরের দাওয়ায় বাচ্চাটা শুয়ে থাকে আমার আঁচলের ওপর। চাঁদধোয়া রূপালি জলে ভেসে যায় হঠাৎ জেগে ওঠা চর। তখন নিকোনো উঠোনের এক কোণে টগবগিয়ে ভাত ফোটে। ভাতের গন্ধে, আলুর গন্ধে, কাগজিলেবুর গন্ধে গাঢ়তর হতে থাকে আমাদের ঘুম। পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জোড়া বেদনাগুলো লোপাট হয়ে যায়।"[৪]

আর এ কারণেই স্বল্পদিনের জন্য এসেও অনেক গাছ লাগায় ফ্ল্যাটে। আর চলে যাওয়ার কথা উঠলে তাদের ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। সম্পর্কহীনতায় সে কষ্ট পায়। মানুষের সান্নিধ্য চায় সে। অপারেশনের সময় সে একটা হাত খোঁজে যে হাত রিস্কবন্ডে সই করতে পারে।

"আমি কি অনুধাবন করেছিলাম কোথাও-ই কোনও সম্পর্ক না থাকাটা কতখানি অসহায়জনক, মারাত্মকও কখনও কখনও!...আমি কি তার আগে বুঝেছিলাম কখনও পৃথিবীতে সম্পর্কগুলো এমন জীবন অভিমুখী? বুঝেছিলাম বেঁচে থাকতে সম্পর্ক লাগে?"[৫]

সেই মেয়েটিও তার প্রেমিককে বলে—

"লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ চারিদিকে অথচ আমি এমন কাঙাল? মানুষের সান্নিধ্যও কম হল শেষে? আজকাল মৃত্যুর কল্পনাতেও কোথাও কোনও মানুষ আসে না ভিড় করে।"[৬]

অনুরূপ সেই মেয়েটিও তাই চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় চরিত্রের কেন্দ্রতে 'সম্পর্ক' কথাটি বারবার উঠে এসেছে। বিভিন্ন সম্পর্ক তাকে চালিত করেছে বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায়, যা থেকে উঠে এসেছে জটিল মনস্তত্ত্ব। যদিও সেই দুই সত্ত্বাই স্বাধীন জীবনযাপনের কারণেই হোক বা অন্য কোনও কারণেই হোক আত্মীয়স্বজনহীন হয়ে পরেছিল। কিন্তু একটা সময়ে তারা সম্পর্কহীনতার যন্ত্রণায় ভুগেছে। দুজনের চিন্তাভাবনা একাকার হয়ে মিলে গেছে। আসলে যারা স্বাধীন জীবনযাপনের লক্ষ্যে, স্রোতের বিপরীতে চলতে গিয়ে অনেকসময়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সমাজ সংসার থেকে। একা চলার কথা ভাবলেও, সাহস জোগাড় করলেও একসময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখে পরতে হয় সেসময় পাশে কাউকে তীব্রভাবে চাইতে ইচ্ছে করে। সম্পর্কে জড়াতে মন চায়। এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে।

কথক মেয়েটিকে পুরুষটি চলে যেতে বলেছে অপারেশনের পর। কিন্তু মুখে মেয়েটিকে চলে যাওয়ার কথা বললেও সেই পুরুষটি যত্ন নিয়েছে মেয়েটির। ভালমন্দের দায়িত্ব নিয়েছে। রিস্কবন্ডে যখন সই করতে হয়েছিল, মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ককে উল্লেখ করেছিল সে এইভাবে—

"এই মানবীকে আমি ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে। ভালবেসে তার শরীর এবং মন সে দিয়েছে আমাকে। তাই তার এই শরীর আমার, মন আমার। অতএব, অপারেশনের আগে, পরে যা যা ওর দরকার তার সমস্ত দায়িত্ব আমার। অপারেশনের ঝুঁকি আমার! যদি কোনও দুর্ভাগ্যজনক কারণে এখানে ওর মৃত্যু হয়, আমিই গ্রহণ করব, বহন করব ওর মৃতদেহ।"[৭]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পুরুষটিও ভালবেসে ফেলেছে মেয়েটিকে।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে গুলিয়ে যায় যে এখানে কতজনের কথা আছে? তারা আলাদা? নাকি সবাই এক? নাকি দুজনের আলাদা সত্ত্বা আছে? সংবেদনশীল মন কেঁদে ওঠে একসঙ্গে ছ'-সাত বছরের আশিটি স্কুলছাত্রের পুড়ে মরার ঘটনায়। আর মনে পরেছে তার ছ'-সাত বছরের ছেলের কথা যে ঘরবন্দি অবস্থায় পুড়ে মরেছে, যখন সে অন্য পুরুষের কাছে শায়িত ছিল। আর এই কারণেই তার অতৃপ্ত বাৎসল্য স্নেহ ঝড়ে পরে সেই শিশুদের ওপর। "আমি পালালাম। যে আগুন জীবনের বৃত্তকে ঘিরে, পালিয়ে আমি পৌঁছলাম তার কেন্দ্রে..."[৮] তেমনি কথক মেয়েটির বাৎসল্যও উৎসারিত হয় রাস্তার অনাদরে বেড়ে ওঠা শিশুসন্তান দুটির ওপর। তাই রোজ সে ডিম সেদ্ধ ভাত নিয়ে যায়। আশ্রয় দেবার কথা ভাবলেও দ্বিধান্বিত হয়, কারণ সে নিজেই অন্যের আশ্রিত।

উপন্যাসটিতে শিশুর যৌননিপীড়নের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যা বর্তমান সমাজে আকছার ঘটতে দেখা যায়। 'সে' সর্বনামের অধিকারী মেয়েটির ঘুমের মধ্যে এসেছে বালিকাবেলার যৌন বিভীষিকার দিন, মিউজিক স্কুলের স্মৃতি। সেখানে সাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে একটা লোক দেখতে বাধ্য করেছিল নগ্ন ছেলেমেয়ের ছবির বই। নিজের ন্যাতানো পুরুষাঙ্গ দেখিয়েছে জোর করেই। অনেকদিন পর্যন্ত এই স্মৃতি তাড়া করেছে তাকে। ভয় দেখিয়েছে, জীবনের অনেক মোড়ে, বাঁকে, ভাঙা দেয়ালের পাশে, অন্ধকারে। কিন্তু এতদিন পর ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে নারীর অভীষ্ট অবধি, নারীত্ব অবধি পৌঁছাতে পারে এমন পুরুষাঙ্গ খুব কম পুরুষের আছে। আর এই কারণেই মুখোমুখি হয়েছে লোকটির—

"ভয়ের কী তবে? পালানো কেন? ফিরে গিয়ে সে বইটা খুলে ধরল লোকটার সামনে। একটার পর একটা পাতা উলটে দেখাতে লাগল, ঝাঁকাতে লাগল বইটাকে। সে তীব্র স্বরে চচাল—'ইরেক্ট, ইরেক্ট...' আর লোকটা সিঁটিয়ে গেল, লালা ঝরতে লাগল মুখ থেকে, নিজের জড়ভরত যৌনাঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য চোখে।"[৯]

এই ন্যাতানো পুরুষাঙ্গ কীসের প্রতীক? শিশুদের যারা যৌননিপীড়ন করে তারা কি কখনও সুস্থ মস্তিস্কের যথার্থ পুরুষ হতে পারে? এই কারণেই যৌননিপীড়নকারী পুরুষের পুরুষাঙ্গ ন্যাতানো বা অসুস্থ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

পুরুষত্ব ও নারীত্ব সম্পর্কিত নতুনভাবে ভাবতে পারি উপন্যাসটি পড়ে। নিরাপত্তাহীনতার বোধ কাউকে 'নারী' করে তোলে। আসলে নারীত্ব আর পুরুষত্ব একটা

করে কনসেপ্ট। পুরুষের মধ্যে নারীত্ব থাকতে পারে আবার নারীর মধ্যেও থাকতে পারে পুরুষত্ব।

উপন্যাসটিতে বিভিন্ন সমস্যার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্বের মেয়েটির চিন্তাভাবনার সূত্র ধরে উঠে এসেছে অনেকগুলি ক্ষেত্র। যদিও উপন্যাসের মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে কার কোন চিন্তা। দুজনের চিন্তাভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা করা যাচ্ছে না। তার যৌনতার বোধ, বৈধতা অবৈধতার বোধ, দেশসম্পর্কিত চিন্তা, সংবেদনশীল মন, ধর্মচিন্তা, ভালোবাসার বোধ, মৃত্যুচিন্তা, অস্তিত্বচিন্তা উঠে এসেছে উপন্যাসে। এসবে কি ঔপন্যাসিকের নিজের চিন্তার ছায়াপাত ঘটেছে? তার ভাবনায় এসেছে তার ধর্ম ও নারীত্ব কি এক? নাকি আলাদা? আলাদা হলে তা কোথায়? তার অনুভূতিতে উঠে এসেছে ধর্ম শরীরের স্নায়ুতন্ত্রের রিফ্লেক্সের মতই প্রকৃত। যে ধর্ম বিনা শ্রমে, বিনা দক্ষতায়, বিনা প্রশ্নে পেয়েছে। যা তাকে বহন করতে কোনও চেষ্টা করতে হচ্ছে না। আবার পরক্ষণেই তার উপলব্ধি—

"ধর্মনিরপেক্ষতা কোনও বিশ্বাস নয়, একটা পরিস্থিতি মাত্র যা বদলায়, বদলাতে পারে...!"[১০]

বৈধতা অবৈধতা সম্পর্কে উঠে এসেছে—

"সে ভাবছিল যে সে দেখেছে মানুষের অস্তিত্ব কী প্রকটভাবে বৈধতা এবং অবৈধতা, এই দুই শব্দের ভেতরের বিরোধের কাছে আত্মসমর্পিত! অথচ অবৈধতাই বৈধতার চরম উৎকর্ষ।"[১১]

জীবন মানে তার মনে হয়েছে মৃত্যুর তাড়া খেয়ে যেখানে পারা যায় সেখানে পালানো। বাঁচা মানেই শুধুমাত্র মৃত্যু থেকে বাঁচা। মৃত্যু আসলে ভয়ের আশেপাশেই থাকে।

"—কিন্তু বাউলা, তুমি এমন গান বেঁধেছ যে মরতে ইচ্ছে যায় না। সাধ হয় এই দেশ, এই মাটি, এই নদী, এই ধূপছায়া সব, সব পলতা লতা হয়ে জড়িয়ে ধরি—ওই সন্ন্যাসীর সামনে নতজানু হয়ে স্বীকার করি—দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে, অনেক!"[১২]

যে একথাগুলো ভাবতে পারে সেই মেয়েটিই নিজেকে ব্যর্থ মনে করে অনেকসময়। মৃত্যুচিন্তা আসে তার মধ্যে। মানুষের জীবনে ওঠাপড়া থাকেই। সুখদুঃখ জীবনের এপিঠওপিঠ। তার জন্য কি হেরে যেতে হবে জীবনের কাছে? পুরুষটির কাছে সে প্রেম চেয়েছিল, পেয়েছেও। কিন্তু সে সবকিছু ছেড়ে ফিরে গেছে মৃত্যুচিন্তায়। প্যান্টিটা সে নিক্ষেপ করেছে আগুনের মধ্যে। নারীজন্মের প্রতি সে তার যাবতীয় মায়া নিঃশেষ করে ফেলেছে। ক্লান্ত হয়েছে সে—

"না বেশ্যা, না ঈশ্বরী—তার কারও কাছেই ক্ষমা চাইবার নেই। উভয়ের পরিচয়ই তার জীবনে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। আদি গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আর কালাতিপাত করে লাভ নেই তার। সে এবার ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে ছুরিকাঘাত করবে নিজের

যোনিদ্বারে...বারংবার ছুরিকাঘাত করবে...সি উইল স্ট্যাব, স্ট্যাব অ্যান্ড স্ট্যাব হারসেল্ফ আনটিল ইট ডাইস!"[১৩]

মেয়েটির বা বলা চলে নারীর জটিল মনস্তত্ত্বের রসায়ন উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। আধুনিক সমাজের আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত মানুষ সম্পর্কহীনতা, অসহায়তা, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছে বারংবার। সংবেদনশীল মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো এই পরিণাম বেশিই ঘটে। এই উপন্যাসটি এরকমই এক বা একাধিক নারীর জীবনের আলেখ্য। পরিবারের বধু, মাতা, কন্যা হয়ে যে বা যারা থাকতে পারেনি, অথচ মনের মধ্যে সে আকাঙ্ক্ষা ছিলই। তাই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে তারা।

তথ্যসূত্র

১। আশাদীপ: ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। ২০১৪। কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক। কলকাতা। পৃ. ৫২৩
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা। ২০০৬, ১ম সং। প্যান্টি। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা। পৃ. ১২
৩। তদেব। পৃ. ৭৫
৪। তদেব। পৃ. ৩৭
৫। তদেব। পৃ. ৬৬
৬। তদেব। পৃ. ৪০
৭। তদেব। পৃ. ৬৭
৮। তদেব। পৃ. ৩৪
৯। তদেব। পৃ. ৫০
১০। তদেব। পৃ. ৪৫
১১। তদেব। পৃ. ১৯
১২। তদেব। পৃ. ৬০
১৩। তদেব। পৃ. ৭৯

আকর গ্রন্থ

বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা। ২০০৬, ১ম সং। প্যান্টি। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ

আশাদীপ: ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। ২০১৪। কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক। কলকাতা।

সাহা, অজয় ও মণ্ডল রামকৃষ্ণ (সম্পা.)। ২০২০। একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস সীমানা ও সম্ভাবনা। প্রভা প্রকাশনী: কলকাতা।

মারীর চড়ক থেকে উত্তরণের কবি বিষ্ণু দে

সুরজিৎ প্রামাণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ : বিগত শতকের বাংলা কবিতার জগতে কবি বিষ্ণু দে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাম। বাংলা কবিতায় তাঁর কবিতা অভিনব এক সংযোজন। রবীন্দ্র উত্তর যুগে যে সকল কবিরা বাংলা কবিতায় স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের সত্তা চেনাতে বিশেষভাবে স্বকীয়তার দাবিদার ছিলেন, কবি বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে অনন্য অসাধারণ। সমকালীন বিশ্ব সাহিত্যের পাঠক বিষ্ণু দে প্রতিনিয়ত নিজেকে গড়ে তুলেছেন কবিত্বের নিজস্ব প্রগাঢ়তায়, বিচিত্র উপমার খোঁজে, শব্দের গভীর ব্যঞ্জনায়, সংকেতের প্রাবল্যে কিংবা চিত্রকল্পের বহুমুখী অন্বেষণে। কবিতা আসলেই অভিনবত্বের মাঝি, তার বৈঠা এসে দাঁড়ায় নিত্য বহমান তরীটির উপর। তখন নিয়ত নতুন উপমা খুঁজে চলেন কবি, অভিনব প্রতীকে, অনামান্য রূপকের চিত্রকল্পে অথবা কাব্যের বিচিত্র পরিকাঠামোয়। অসীমকে সসীম করার জেদ ও আগ্রহ নিয়ে কবি প্রতিনিয়ত নিজস্ব ভাষার আভরণ, নিজস্ব শব্দ নির্মাণ, নিজস্ব সাংকেতিকতা প্রভৃতি বিন্যস্ত করতে তৎপর থাকেন কবিতার সাজ-সজ্জায়। বৈচিত্র্যময় কথনভাষ্যেই কবি জীবনের পূর্ণাঙ্গ মানে খুঁজে পেতে চান নিরন্তর। নিরন্তর জীবনকে নিয়ে যেতে চান পরিমিতিবোধের পরিশুদ্ধ নিগড়ে। আবার কখনও যুক্তিহীনতার তারতম্যে বিনষ্ট হয় জীবন, সময় ও তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিধি। আর বিষ্ণু দে প্রতিনিয়ত নিজের জগৎ গড়ে তোলার তাগিদে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন ইংরেজি সাহিত্যকে আশ্রয় করে, বিশ্ব সাহিত্যের একনিষ্ঠ একজন পাঠকের মতো। কাজেই বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে, পাশ্চাত্যের ছাপ থাকবে এটা স্বাভাবিক। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্যের টি. এস. এলিয়টের 'The Waste Land'-এর অবক্ষয় ভাবনার ছায়া বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও ছাপ রেখে গেল।
সূচক শব্দ : স্রষ্টা ও সৃষ্টি, স্বকীয়তা, সময়ের অবক্ষয়, প্রলাপ ও উত্তরণ।

মূল আলোচনা :

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ আর বিশ্ব সাহিত্যের নিবিড় পাঠের দক্ষতাই এলিয়ট, এজরা পাউন্ড কিংবা পাবলো নেরুদা প্রমুখের লেখায় বিশেষ মনোনিবেশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল বিষ্ণু দে-র বোধের বৈতরণীতে। বিষ্ণু দে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৯ সালে কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন কলকাতার সেন্ট পলস কলেজে। যেহেতু তাঁর ছাত্র জীবন কেটেছে ইংরেজি সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মধ্য

দিয়ে, তাই সঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি বিষ্ণু দে তাঁর গভীর অনুশীলন ও দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিগত অনুভবকে জারিত করতে পেরেছেন ইংরেজি সাহিত্যের নিত্য-চর্চায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। এরপর কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকায় রয়েছে,---- 'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৪), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০)', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩), 'আলেখ্য' (১৯৫৮), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৬০), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৮), 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে' (১৯৭০), 'ঈশাবাস্য দিবানিশা' (১৯৭৪), 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর' (১৯৭৫), 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭), 'আমার হৃদয়ে বাঁচো' (১৯৮০), এছাড়াও 'সংবাদ মূলত কাব্য'- এই কাব্যের কবিতাগুলি লিখিত হয় ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে এবং 'রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো লেখা ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে।

বিশ্বসাহিত্যের পাঠক বিষ্ণু দে-র সাফল্য তাঁর বিশ্ব বীক্ষার অনুসন্ধানে। কাব্য রচনার সূচনাপর্বে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে প্রভাবিত তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-বিরোধের ইশারা হয়তো কেউ কেউ পরিলক্ষণ করেন ঠিকই, কিন্তু সর্বতোভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের সরাসরি বিরোধিতা বা রবীন্দ্রনাথের অসীম ঐতিহ্যকে অস্বীকার, বোধ হয় সেভাবে করেননি, কেবলই রাবীন্দ্রিক মোহ-মায়া থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র এক কাব্যজগৎ-কাব্যভাষা নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিষ্ণু দে। পাশাপাশি তিনি এটাও মনে করতেন যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম মহাকালের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে যায় অসীমের কাছে। শত শত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেমন সূর্যের রণতূর্যটি বেজে চলেছে, ঠিক তেমনই রবীন্দ্র প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি বাঙালি মানসে বাঁশির সুরের মতো বেজে চলে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তে নিরন্তর। তাই তিরিশের এই কবির কাছে তিনি ম্রিয়মাণ হতে যাবেন কেন! বরং উল্টো দিকে শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো বিস্তৃতি পাবে তাঁর সৃষ্টির সু-ললিত ধ্বনি। বিষ্ণু দে তাঁর 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামের কবিতাতেই বললেন,---

'এখন কি বোঝো তুমি বিপরীতে এক অভিন্নতা,
রবীন্দ্রনাথের কথা : সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা?
স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষায় রাঙে যে-তীক্ষ্ণতা,
সে তীব্র বিষন্ন হর্ষে কেন তুমি হবে ম্রিয়মাণ?
জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্তৃত চেতনা
যে আবেগে মূর্ত, তাতে পূরবীই ইমনকল্যাণ।'১

----('রবীন্দ্রনাথ')

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' বিষ্ণু দে-র কাব্যমালায় এক অসাধারণ সৃষ্টি। এই কাব্যে কবি যুগের ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, আশাবাদ ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতার পারম্পর্যে। স্বাধীনতা অনতি-উত্তর ভারতবর্ষে নৈরাজ্য ও বিভেদের বিশৃঙ্খল বাষ্পপুঞ্জে প্লাবিত মাটিতে দাঁড়িয়েও, তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বিশ্বাসের এক কল্পিত ধ্রুবলোক। কারণ কবির মানব-অস্তিত্ব নিজেকে খুঁজতে চায় পারিপার্শ্বিক মানুষের মধ্যে থেকেই। বিশ্ব চরাচরের চির-বিস্ময়কে ভর করেই তৈরি হয় কবির নিজেকে জানার এই প্রবণতা। যেখানে 'স্মৃতি', 'সত্তা', 'ভবিষ্যৎ' কথাগুলি ব্যঞ্জিত হয় 'অতীত', 'বর্তমান' ও 'ভবিষ্যৎ'-এর তাৎপর্যে। বিষ্ণু দে অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, বর্তমানের সুবিশাল ফাঁকিকে যুগের কাছে ফুটিয়ে তুলতে চান সাবলীল কাব্যকথনে। আসলে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার কৃত্রিমতা সরে গেলেও, স্বাধীন ভারতের অবান্তর উন্মাদ বিলাসী খেলা কবির কাছে আরও বেশি কৃত্রিম বলে মনে হয়। অসহ্য হয়ে ওঠে সেই কৃত্রিমতা। বিষ্ণু দে-র মতো কবিরা সেই কৃত্রিম উন্মত্ততাকে 'নরক' বলে চিহ্নিত করতে পারেন। অবক্ষয়-জর্জর সভ্যতার ছবি আঁকতে পারেন নরকের মতো ভয়াবহ আকারে। যে নরকে জীবন হয়ে ওঠে ভাষাহীন, বেঁচে থাকার অস্তিত্বটুকু ভরে যায় দুঃস্বপ্নে অবিরত। তাই কবির উপলব্ধি----

'এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচবার আশা নেই, বাঁচাবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত'২

----('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

আসলে আমাদের চৈতন্যে মড়ক লেগেছে। মানুষ তার বোধ বুদ্ধি হারিয়ে কেবলই পরিণত হয়েছে পুতুল সত্তায়। তাই সভ্যতাকে আমরা নরক বানিয়ে ফেললেও, আমাদের জ্ঞান নেই কোনও। অজ্ঞানতার অন্ধকারে দিন-রাত হাবুডুবু খেতে খেতে, পৃথিবীতে আমরা টিকে থাকি শুধু। এ প্রচ্ছন্ন নরকের বিবাহসভায় বর না থাকলেও, নানারকম বরযাত্রী ভিড় করতে থাকে নির্লজ্জের মতো। 'বতর্মান ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে কবি বিগত অতীত আর অনাগত ভবিষ্যৎকে যেন একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। এ-কাব্যগ্রন্থে একশোর বেশি কবিতায় কালের মাপকাঠিতে বিষ্ণু দে স্বদেশ ও বিশ্বের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকতার পরস্পরবিরোধী অথচ পারস্পরিক সমন্বিত ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র

অন্বেষায় রত হয়েছেন। কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা আধুনিককালের সমুজ্জ্বল স্বদেশপ্রেম কবিতায় পরিণত হয়েছে। যা সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে'।৩ এসবের মধ্যে থেকে আদতে শুভবুদ্ধি-চেতনা সম্পন্ন মানুষের ঘোর অভাববোধ করেছেন বিষ্ণু দে। হৃদয়ের চেরাপুঞ্জিতে তিনি অনুভব করেছেন বর্ধিষ্ণু সাহারা ছেয়ে যাওয়া মুমূর্ষু বিকার। আর তার ঠিক পাশেই অভদ্র অমানুষেরা নির্বোধের মতো নিষ্ঠুর প্রলাপ করে চলেছে সর্বক্ষণ। কে জানাবে কাকে ধিক্কার! চরম দুর্দিনে উন্মত্ত বিলাসের খেলায় যখন মত্ত চারিদিক, যেখানে প্রতিদিন চৈতন্যের এক একটি প্রকাণ্ড আকাশ মরে যায় আঘাতে-অপঘাতে।

'আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।
কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবান্তর
উন্মাদ বিলাসী খেলা!'৪

----('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

অথচ কবি এই সামাজিক ব্যাধিকে আবার প্রাণ ভরে ঘৃণাও করতে পারেন না। কারণ সভ্যতার এই নরকে পরিনত হওয়া আদতেই কবির প্রাণকে যেন নিষ্প্রাণ করে দিতে চাইছে। এখানে এক একটি সৃজনশীল মানুষের মনের বিশ্বে যেন জঘন্য হিংস্র সাপেরা কিলবিল করে ওঠে। ঘরের চৌকাঠে অসহ্য 'বিছা' আর কদর্য চোখ ভরে যায় ক্রমাগত। তাই কবি এই মড়ক থেকে আকস্মিক পাপ ঘোচাতে চাইলে ঘৃণায় রী রী করে শরীর। তবু বিষন্ন হাওয়ায় পাতারা ঘৃণায় ঝরতে থাকলেও, মাটির প্রতি কবি বিষ্ণু দে-র ভালোবাসা প্রখর। যদিও অভাব, মৃত্যু, অনাহারে সকাল থেকে বিকাল চোখে পড়ে অপঘাতে মৃত্যু। ব্যঙ্গচিত্রের পোস্টারে ভরে যায় যে নরক, সেই নরকের এক একটি মৃত্যুও যেন বিকৃত। আসলে সভ্যতার এই অসম্ভব অবক্ষয়ে কবির চোখে সবকিছুই যেন নিঃস্বতা আর নিঃসঙ্গতায় ভরে গেছে। তাই এই সভ্যতার বুকে এমন কোনও সন্ন্যাসী চোখে পড়ে না, যিনি যুগের ক্লান্তি থেকে মুক্তির দিশা দেখাতে পারেন পবিত্র চেতনার জাগরণে। কাজেই জীবনানন্দ যখন তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'সুচেতনা' কবিতায় বলতে পারেন,----

'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে----এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;'৫

----('সুচেতনা' : জীবনানন্দ দাশ)

অন্যদিকে বিষ্ণু দে তাঁর 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এ বলেন,----

'এখানে অভাব মৃত্যু অনাহার অপঘাত সকাল বিকাল
মাসে মাসে মারীর চড়ক,

এখানে অরণ্য নেই, হিংস্র নেই, নেই আদিম মানুষ,
বানপ্রস্থবাসী উদাসী সন্ন্যাসী নেই,
এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকানো দীঘি,
বুদ্ধি মজা খাল, চোখ-কান সব বোধ চোরামাইলের চেয়ে বাসি,
এখানে হয়তো নেই আপামর কোনোই নরক।'৬

----('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

এই ভয়ঙ্কর সামাজিক অবক্ষয়কে বিষ্ণু দে যেন ব্লাড-প্রেসারের চিত্রকল্পে দেখেছেন। আর এর থেকে তিনি নিরাময়ের নিদান নির্দেশ করেছেন প্রকৃতির সত্তায় দৃষ্টি আরোপের মধ্য দিয়ে। কবি আকাশের দিকে তাকাতে বলেছেন এবং প্রার্থনা করতে বলেছেন সহিষ্ণু বৃষ্টির। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একদিন এই মরুভূমি পরিশুদ্ধ হবে। বন্ধ্যা ক্ষেত রূপ সভ্যতায় 'দর্বাদল শ্যাম, অবিরাম বৃষ্টি'ই সৃষ্টির সরস ফসল ফলাবে একদিন। তাই দুনিয়ার হাটে চেনা আধোচেনা মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাসের মধ্যেই 'মানবিক' হতে হবে আমাদের। এই মানবিকতার মন্ত্রেই দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। 'সুতরাং এ-কথাটা সুস্পষ্ট যে, বিষ্ণু দে-র প্রেক্ষণভূমি অবস্থিত হয়েছে দেশীয় মৃত্তিকার ওপর, কিন্তু তার প্রেক্ষণবিন্দু ছিল ওই অতলান্তিকের ওপর। তবুও খণ্ডবিশ্বের মাঝেই তিনি সন্ধান করেছেন শাশ্বত বোধিবৃক্ষ।'৭ এই আশাবাদেই কবি নরক থেকে মুক্তি লাভ করে স্বর্গ-প্রার্থীর সম্ভাবনার কথা বলেন। তখন নরকের আত্মগ্লানিতেই দাহ হয়ে যাবে আর একটি নরক। ছাদে কিংবা বসতিতে ; রক্তে কিংবা মজ্জায় ; অবসাদে কিংবা যন্ত্রণায় অথবা অবিরাম কান্নায় সিক্ত হতে হতেই সজলা-সুফলা ফুলে-ফলে মানব সভ্যতার শাখা-প্রশাখা হবে পল্লবিত। চৈতন্যের ক্ষিপ্র জাগরণে সেদিন 'প্রতিবাদ' হয়ে উঠবে মানুষের স্পষ্ট ভাষা। জীবন আর মৃত্যুর গোধূলিতে কালবৈশাখী আন্দোলিত হবে এ পৃথিবীতে। তাই----

'যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে
রূপান্তরে প্রাণ দাও অভ্যস্তের তিক্তের ক্ষুব্ধের
চৈতন্যের ক্ষুরধার ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্
জীবন মৃত্যুর এ গোধূলিই স্বচ্ছতা পাক
বৈশাখী রৌদ্রের আর কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে।'৮

----('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত')

কবির এই চাওয়ার মধ্য দিয়েই কবি তাঁর দৈনন্দিন যাপন ও সম্পর্ক পারম্পর্য চেনাতে পারেন। শব্দ আর ধ্বনির ইশারা যেন আত্মার ইশারায় পরিণত হয় ক্রমশ। এভাবেই আত্ম-আবিষ্কার থেকে ধারণার অবয়ব গড়ে তোলেন বিষ্ণু দে তাঁর নিজের চারপাশে। যা প্রাথমিকভাবে তাঁর একান্ত নিজস্বই। আর এই নিজস্ব ইশারার ধ্বনিটিই কবিতার পাতায় একদিন বিশ্ব-চরাচর মিলিয়ে দেয়। তাই সৃষ্টির সূর্যে জীবনের

গান জমে ওঠে বিষ্ণু দে-র কবিতার সৈকতে। মরণের ভ্রূকুটিতে পথের ধুলোয় হিম হয়ে যাওয়া সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের হাহাকারে স্মৃতির পাতায় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয় নিথর দেহের প্রেয়সী, জননী, সখী, সহকর্মীরা। ঘরে-বাইরে জ্বলে ওঠে অনির্বাণ আলো। প্রদীপের শিখায় দীপাবলীর মতো দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে সে আলোর সংগীত। উন্মুখর প্রতিটি মানব-চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। জীবনের ঘরে অবিরত বসন্তের স্বপ্ন নির্মাণ চলে গ্রীষ্ম, বর্ষা অথবা শীতের বৈচিত্র্যময় আবেগে। তাই অসহ্য মলিনতা ভরা ঘোলাটে 'সময়' বড়ো একঘেয়ে লাগে কবির। অজানা এক 'অবসাদে' স্নায়ু জর্জরিত হয়। জীবনের উদ্দাম প্রবাহে বিহঙ্গেরা কোথায় হারিয়ে যায়! ক্লেদ-পঙ্কিলতা ভরা জীবনের স্রোতে প্রত্যহ যেন ছন্দ কাটতে থাকে। নরকের অভ্যাসে জীবনের সুক্ষ অনুভূতিগুলো জট পাকিয়ে যায় প্রচন্ড।

'আপিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা কিংবা বুঝি ধর্মঘট
ঝামেলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট'৯

----('অন্বিষ্ট')

আত্মার এ হেন জাগরণেই কবি জড়-জাগতিক পৃথিবীর পচন ধরা সভ্যতাকে অস্বীকার করে, বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন অনায়াসে। আসলে কবি নিজস্ব চোখে সমাজকে যেমন দেখেন, তাঁর দৃষ্টির ঐশ্বর্যে মানুষের চৈতন্যও বহুমুখে ব্যাপ্তি পায়। কবি সেখানে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে নিতে চান। সন্ধ্যাদীপ জ্বলে ওঠার সাথে সাথে পৃথিবীর গান বেজে ওঠা ক্লান্তিহীন সমুদ্রের মতো নীলাকাশের দিগন্ত খুঁজে নিতে চান। তাই ছোটো ছোটো সুখ হৃদয়ে মিলিয়ে, বিস্তৃত হৃদয়ে বিশ্ব-নিখিলের তৃষ্ণায় নিমগ্ন হতে পারেন বিষ্ণু দে। 'আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে'-র আত্মদানে অনাগত শব্দের কর্মময় মিছিলে লাগে দোলা। রঙে রঙে ভরে ওঠা অসীমের সন্ধানে ঘোর লাগা স্তব্ধতা কেটে যায়। রোমাঞ্চিত দু'হাতের মুঠোয় তিনি ধরে নিতে পারেন 'অঘ্রান'। কাজেই স্মৃতি ও সত্তার মাধ্যমে জেগে ওঠা শব্দব্রহ্ম ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রূপ ফুটিয়ে তোলে নিরন্তর। অগ্নিবানের লেলিহান শিখায় ফুলের সৌন্দর্য ভস্মীভূত হলে, নিজের ধর্মের প্রতি মানুষ কেমন সন্দিহান হয়ে যায় তা তিনি দেখান,---- 'হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে আজ সন্ধিহান।'----('বিভীষণের গান')। তবুও তো মানুষের জীবন-তৃষ্ণা জাগে। কাতর স্বরেও সঞ্জীবনী সুধা পান করার তাগিদ উপলব্ধ হয়। নিঃসঙ্গ অন্ধকার-নরকের যাত্রা থামিয়ে, বিস্তীর্ণ সত্তায় 'মৃত্যুঞ্জয়' হওয়ার সাধ হয় মানুষের। যে কথা উপনিষদেও আছে---- Every human being wants to be happy. তাই সোনার সীতাকে মানুষ বুকে আঁকড়ে ধরে স্বর্গ জয়ের দুরাশা ত্যাগ করতে পারলেও, অমরত্বের বাসনা তার থেকে যায় আমৃত্যু। তবে এতকিছুর মধ্যেও যে পিতার ঔরসে আমরা রক্তমাংসের দেহ পাই, তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ছেড়ে সেই পিতার কাছেই নিজেকে আত্মসমর্পণ করার কথা বলতে চান কবি। তখন বিষম রুদ্রের বিষ উগরে দেখা যায়, উষার আকাশ

শ্মশানের গোধূলিতে কুয়াশায় ঢাকা। 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের 'বিভীষণের গান' কবিতায় সে কথাই যেন বলে যান বিষ্ণু দে,----

'জানি, জানি, তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর! প্রাণপ্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষ্ণায় কাতরে গোপনে গাই :
নয়নাভিরাম! প্রবল মরণে এ-রোগ হানো।'১০

----('বিভীষণের গান')

একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে, মানুষ মৃত্যুর প্রান্তিক সীমায় দাঁড়িয়েও জীবনের সঞ্জীবনী সুধার প্রার্থনা করতে পারে। আপাতদৃষ্টে বিষয়টি সাধারণ হলেও, আদতে তা প্রবল ব্যঞ্জনা-দ্যোতক। কারন যে আলোয় কবিতার খোলস ভাঙ্গা, কবিতাকে চিনতে না পারার অন্ধকারও সেখানেই। কাজেই দ্যোতক ও দ্যোতিত উভয় ক্ষেত্রেই গরল বা অমৃত সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কারণ কবিতাতো ডাক দেওয়া ও সাড়া দেওয়ার মধ্যেকার অলক্ষ্য পর্দার মতো। কবিতার ডাকেই আমাদের গন্ধ-বর্ণ-চেতনা আন্দোলিত হয়। আর কবির চেতনা প্রবাহিত হয় কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। যদিও কবি বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ভাব বিলাসের পক্ষপাতী ঠিক সেভাবে ছিলেন না। তবু বহু কবিতার ব্যঞ্জনা ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তাঁকে এলিয়টপন্থী বলে মনে করেন বহু আলোচক থেকে সমালোচক। প্রসঙ্গক্রমে টি.এস.এলিয়টের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি বলছেন,----

'poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion;'১১

----('The Sacred Wood : Essays on Poetry and Criticism' : T.S. Eliot.)

তাই যে আত্ম-সত্যের উচ্চারণে সময়ের ক্ষয়িষ্ণু সত্যের উন্মোচন করেছেন বিষ্ণু দে, তা নিশ্চিতভাবেই এক হিরণ্ময় সত্যের আখর আমরা মনে করতে পারি। উৎসবের শামিয়ানায় শ্মশানে, স্বদেশে- নরক যেখানে একাকার হয়ে যায়, সেখানেও শুভবুদ্ধির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হতে পারেন বিষ্ণু দে। তাই ঈশান কোনে যতই মেঘ জমে উঠুক, হাহাকারের কূল ডিঙিয়ে কৃষ্ণচূড়া একদিন লাল আবিরে মেতে উঠবেই, একথা জানেন বিষ্ণু দে-র মতো প্রকৃত কবিরা। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি বিষ্ণু দে আদতেই, তাঁর 'মনের কল্পনার উপর আস্থা রেখে, মননের অভিসারি কাব্য-সাধনায় সমস্ত সত্তাকে আকর্ষণ করেছেন। সংযোগ সমকাল এবং মানব- তাঁর কবিতার মূল উপকরণ। বামপন্থী কবি বিষ্ণু দে-র কট্টর বাস্তব চেতনার সঙ্গে পূর্বসূরী কবি প্রমথ চৌধুরীর বস্তু চেতনার ও ক্লাসিকাল শব্দ প্রয়োগে কোথাও যেন এক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে উত্তরসূরী

কবি বিষ্ণু দে কাব্যিক মেজাজে এবং কবিতায় ব্যঞ্জনা সঞ্চারে প্রমথ চৌধুরীর তুলনায় অনেক বলিষ্ঠ'।১২ আসলে কাব্য রচনার সূচনা লগ্নে বিষ্ণু দে-কে এলিয়টপন্থী রূপে চিহ্নিত করা গেলেও, পরবর্তীকালে তাঁর কাব্য রচনার রসদ হয়ে উঠেছে মার্ক্সবাদী দর্শন। আগের এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর বন্ধ্যাভূমির চিন্তা বিষ্ণু দে-র চোরাবালিতে ফুটে উঠেছে নিঃসন্দেহে। তবে চোরাবালির খরস্রোতায় প্রকাণ্ড একটা সত্তা বিলুপ্ত না হয়ে গিয়ে, বরং মানুষের প্রতি আস্থা স্থাপন করে ঘোড়সওয়ারের আগমনে তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছেন আজীবন কবিতার পবিত্র মশালটি ধরে। এখানে ঘোড়সওয়ার তাই অন্য আর কেউ নয়, সে সাধারণ মানুষকে জাগানোর জন্য সাধারণ মানুষেরই একজন প্রতিনিধি বা নেতৃত্ব স্বরূপ। তাই জনসমুদ্রে যখন জোয়ার লাগে তখন হৃদয়ে চড়া থাকলেও, সেই চোরাবালিতে দাঁড়িয়েই দিগন্তে গলা উঁচিয়ে আহ্বান জানানো যায়---- 'কোথায় ঘোড়সওয়ার?' কবি ঘোড়সওয়ারকে ডাকেন কারণ শূন্যতায় ভরে ওঠা পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র ঘোড়সওয়ারের মতো দৃপ্ত তেজ সম্পন্ন প্রকৃত যোদ্ধারাই। তাদের বিশ্ব-বিজয়ের বর্ষায় সংঘটিত হয় একেকটি বিপ্লব। আর মার্কসবাদী আদর্শে বিপ্লবের পথ ধরেই তো মুক্তি। তাই 'চোরাবালি' কাব্যের কবিতায় বিষ্ণু দে-র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,----

'দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?
হৃদয়ে আমার চড়া?'১৩

----('ঘোড়সওয়ার')

মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী কবি বিষ্ণু দে মার্কসবাদের পথ ধরেই মনে করেন বিপ্লবের পথে মানুষের কারারুদ্ধ জীবনে মুক্তির সূর্য উদিত হবে। তাই এই জরা-ব্যাধিগ্রস্থ সমাজে তিনি ঘোরসওয়ারকে আনতে চান মানুষের চেতনার জাগরনের জন্যই। মানুষের মধ্যে বাস করেই একজন স্বতন্ত্র, ভিন্ন দৃষ্টির মানুষ যেভাবে নেতৃত্ব স্থানীয় হয়ে ওঠেন, একইভাবে কবি সেই নেতাকে ঘোড়সওয়ারের মতো উদ্দীপ্ত মনে করতে পারেন। '১৯৩৮-এ রচিত চোরাবালি কাব্যগ্রন্থের ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতাটি আধুনিক কবিতার এক উল্লেখযোগ্য দিকদর্শন। ১৯৩৫ সালে তিনি এই কবিতাটি লেখেন। কবি তখন অর্থাৎ ওই বছরের জানুয়ারি মাসের চার-পাঁচ তারিখে রিউম্যায়্যাটিক ফিভারে শয্‌যাগত। আগের রাতে তাঁর জ্বরের ঘোর কেটে গেছে। ভোরের দিকে আচ্ছন্ন অবস্থায় কবি কাগজ-কলম চাইলেন এবং এক ঝোঁকে কবিতাটির প্রথমার্ধ সম্পন্ন করেন। এরপর ঘুম থেকে উঠে বাকি অংশটি শেষ করেন। এই কবিতাটির রচনার ইতিহাসটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবির অবচেতন মনে এই কবিতাটি রচনার যে-পূর্বপ্রস্তুতি চলছিল, যা তাঁর

চৈতন্যে এক ঝোঁকেই কবিতার অর্ধেক শরীরের প্রকাশ ঘটে এবং ‘ঘোড়সওয়ার’ কোলরিজের ‘কুবলাখানে’র মতোই হয়ে ওঠে ড্রিম পোয়েমের সমগোত্রীয়।'১৪ যে ঘোড়সওয়ারেরা পৃথিবীর কোনও শৃঙ্খলে থেমে যাবে না। যার বীরত্বের উত্তাল তরঙ্গ সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবে মুক্তির সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জন্য। কবি সেই প্রাণোচ্ছ্বল প্রতিরোধ প্রকট নেতার আবির্ভাবেরই প্রার্থনা করেন। জরা-জীর্ণ অঙ্গীকার উপেক্ষা করে সেই যৌবনোদ্দীপ্ত পুরুষ, কবির হৃদয়কে অঙ্গীকারবদ্ধ করে যায় প্রবল বিপ্লবের উৎকণ্ঠায়। মানুষ যার আহ্বান ধ্বনিতে মুখর হয়ে, ঐক্যবদ্ধতার প্রতিধ্বনি জাগাতে পারে পৃথিবীর অববাহিকায়। মানব-সভ্যতার বুকে সেই ঘোড়সওয়ারকে আনার জন্যই কবির যাবতীয় আয়োজন। তাই বারবার বিষ্ণু দে তাকে ডেকে চলেন ক্লান্তিহীন,----

'চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?'১৫

----('ঘোড়সওয়ার')

এখানে লক্ষ্যণীয়, 'হে প্রিয় আমার ... দেবে না অঙ্গীকার?' পংক্তিগুলি একই কবিতায় দু’বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই পংক্তিগুলির মধ্য দিয়ে 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটির সমাপ্তিও হয়েছে। আসলে 'উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যগ্রন্থে কবির হৃদয় যে-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে, সেই নিঃসঙ্গ পথেই আগমন ঘটেছে ঘোড়সওয়ারের। কবির ক্লান্ত-রিক্ত চৈতন্যে এনেছে সে এক অন্য গতির স্রোত। বিপ্লবের মুক্তিমন্ত্র ও সংগ্রামের জয়ডঙ্কা যেন খণ্ডিত কবিকে অখণ্ড করে তুলেছে। তাই পূর্ববর্তী কবিতার ছন্দের গতি আর পরিলক্ষিত হয়নি। এখানেই ধরা পড়ে তাঁর মানসিকতার পালাবদল।'১৬ সুতরাং একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমরা বলতেই পারি, ঘোড়সওয়ারের আগমনে এবং তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের অঙ্গীকারে বিষ্ণু দে নিজেকে যেমন অঙ্গীকারবদ্ধ করতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনি মানব-জাতির চৈতন্য-বৃক্ষটিকেও পল্লবিত করতে চেয়েছেন প্রবলভাবে। কারণ স্থবির সভ্যতার বুকে বল্লম উঁচিয়ে সভ্যতার ভীত-সন্ত্রস্ত দরজা ভাঙতে পারলে তবেই তো মুক্তি। তাই 'হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার'-একথা প্রকৃতপক্ষে বন্ধন থেকে মুক্তির পথকেই চিনিয়ে দেয়। একইভাবে দরজা ভাঙার এই প্রবল তেজ আমরা নজরুলের কণ্ঠেও ধ্বনিত হতে শুনেছি,---- 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট/ রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী/ ওরে ও তরুণ ঈশান/ বাজা তোর প্রলয় বিষাণ/ ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি'। আসলে কবি জাগতিক এই অসহ্য সভ্যতার বৈতরণীটি পেরিয়ে যাওয়ার জন্য

সাংঘাতিকভাবে উপলব্ধি করেছেন প্রবল চেতনাসম্পন্ন নেতার শূন্যতাকে। নেতৃত্বের অনন্ত শূন্যতা থেকেই কবি বিষ্ণু দে নিশ্চিতভাবে ঘোড়সওয়ারের আগমন প্রার্থনা করেন, সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব ঘোঁচানোর তাগিদে। ফলে আমাদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না যে, সভ্যতার এই মুক্তি ঘটানোর সাথে সাথেই কবি নিজের মনকেও উন্মুক্ত করতে চান নতুন সৃষ্টির সরস আঙ্গিকে।

তথ্যসূত্র :

১। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৮১
২। তদেব; পৃষ্ঠা-১৬০
৩। হাজরা, গৌতম; 'বিষ্ণু দে-র কবিতা ও একটি আত্ম-অন্বেষণ'; কালি ও কলম, ২৫ আগস্ট ২০২১, https://www.kaliokalam.com
৪। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৫৯
৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ; (সম্পাদিত) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃষ্ঠা-৯২
৬। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৬১
৭। হাজরা, গৌতম; 'বিষ্ণু দে-র কবিতা ও একটি আত্ম-অন্বেষণ'; কালি ও কলম, ২৫ আগস্ট ২০২১, https://www.kaliokalam.com
৮। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৬১
৯। তদেব; পৃষ্ঠা-১০০
১০। তদেব; পৃষ্ঠা-৩৯
১১। Eliot, T.S; The Sacred Wood : Essays on Poetry and Criticism; Methuen & co Ltd, 1920, London, Page 58.
১২। মিশ্র, ড.অশোককুমার; আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা; দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ ২০২০, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮৮
১৩। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৩

১৪। হাজরা, গৌতম; 'বিষ্ণু দে-র কবিতা ও একটি আত্ম-অন্বেষণ'; কালি ও কলম, ২৫ আগস্ট ২০২১, https://www.kaliokalam.com

১৫। দে, বিষ্ণু; বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৪

১৬। হাজরা, গৌতম; 'বিষ্ণু দে-র কবিতা ও একটি আত্ম-অন্বেষণ'; কালি ও কলম, ২৫ আগস্ট ২০২১, https://www.kaliokalam.com

‘নৈতিকতা’- তার সঙ্গে কিছু অধিকারের প্রশ্ন

শিবান্বিতা মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ : বৈষম্যভিত্তিক হিংসা আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। এই হিংসা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং তা বহু প্রচলিত, চর্চিত একটি বিষয় যা মানবিক নীতিত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। নৈতিক মানদন্ড যেহেতু মানবিক মূল্যবোধের ভার বহন করে তাই কেউ বলতেই পারেন যে মানবিকতার অনুষঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্য প্রসঙ্গ বহির্ভূত একটি বিষয়। কেননা মানবিকতার বোধটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ। যদিও বর্তমান প্রবন্ধটিতে নারীবাদকেই মানবতাবাদের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক হিংসাকে নারীবাদ তথা মানবতাবাদেরই একটি প্রেক্ষিত হিসেবে মনে করা হয়েছে। তারও নিজস্ব একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে যা নৈতিকতার দাবি রাখে।
মূল শব্দ : লিঙ্গ বৈষম্য, হিংসা, অধিকার, নৈতিকতা।

যেহেতু সামাজিক প্রেক্ষাকাট একরকম নয় – তার মধ্যে রয়েছে বিচিত্র স্তরবিন্যাস এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক এক সমন্বয়, সেহেতু নৈতিকতার সামান্য চেহারাও এখনও আলোচনা সাপেক্ষ। একজন মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা – এই বিশেষ ঘটনার বাস্তবিক রূপে, একদিকে রয়েছে সামাজিক জ্ঞান (বিশ্বাস) সজ্ঞাত ‘সন্দেহ’ অন্যদিকে রয়েছে ‘হত্যা’ (কাঠ) – যে দুয়ের মাঝখানে রয়েছে চেতন প্রাণ (বিষয়)। ঘটনার করণ মানুষ – সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ, সচেতন জনগণ। ‘সচেতনা’ ই তো তাকে সচেতন করে তোলে। যেমন সমাজে ডাইনি থাকা মঙ্গলজনক নয়। তার মানে, যে বা যারা হত্যাকারী তারা সমাজ সচেতন। কারণ সেই সমাজের সামাজিক জ্ঞানে বেষ্টিত রয়েছে ‘ডাইনি’ বলে এক সত্য ব্যাপার যা অমঙ্গলজনক। যারা মারছে তারাও তো বাঁচাচ্ছে, সমাজকে রক্ষা করছে। আবার আমরা বিশ্বাস করি – এই ঘটনা নিঃসন্দেহে অমানবিক। মনে রাখতে হবে, আমাদের এই বোধের পেছনে বিজ্ঞান ও আলোক প্রাপ্তির যে ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাস হত্যাকারী জনগণের নেই। সুতরাং একই সমাজে ‘ডাইনি’ – আখ্যাত মহিলা, হত্যাকারী জনগণ এবং আলোক প্রাপ্তি বিশ্লেষক – এই তিনটিই চেতন অস্তিত্ব। তাহলে নৈতিকতার বাটখারা সামাজিক পাল্লার কোনদিকে রাখবো? নিরীহ মানুষ – যাকে ‘ডাইনি’ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তার দিকে? নাকি যারা সমাজ রক্ষার ব্রতে অবিচল তাদের দিকে? নাকি আমরা আলোকপ্রাপ্ত তাই আমরাই বেশি নৈতিক? অথচ সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-ধর্মীয় অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজো হলে- সেই ‘বেশি নৈতিক’

মানুষের কিছু বলার থাকে না। অথচ আমাদের আন্দোলন নৈতিকতার আন্দোলন, মানুষের অবিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

দার্শনিক প্রশ্নটি উঠে আসে এই পরিসরে। নৈতিকতার প্রয়োগের ভিত্তিই কি সমাজের প্রেক্ষাকাট বিন্যাসের অন্যতম কারক? অর্থাৎ, সেই নৈতিকতাই কি মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব তৈরি করে? বর্তমান নিবন্ধে তাই এগিয়ে গিয়ে দেখে নিতে হবে – নৈতিকতার সঙ্গে জুড়ে থাকে যে আবিষ্কারের প্রশ্ন – অর্থাৎ, কতখানি অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আমার কাছে সমাজের অনুমোদন রয়েছে আর কোথায় কোন নৈতিক ভাবনায় আবার কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করার অধিকার নেই – সেই প্রশ্নটিকে।

শহরের মানুষ নীতিবোধের আবরণে নিজেকে আবৃত রাখে, যাতে সামাজিক অস্তিত্ব হিসেবে সে মর্যাদার আসনে বসতে পারে। যদি এর চেয়ে বেশি কিছু 'বেশি নৈতিক' মানুষের থাকত, তাহলে সমালোচনার পর তারা তথাকথিত 'ডাইনি' পূনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সামাজিক জ্ঞানের বৃত্তটিকেও বদলে নিত। 'ডাইনি' বলে কাউকে হত্যা করা আর কোনো শহরের নিরীহ জনসাধারণের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া আর 'সেকুলার' দেশে কোনো শিক্ষালয়ে সরস্বতী পূজো করা – এই তিন প্রেক্ষিতকে কি নৈতিকতার একই সূত্র দিয়ে বিচার করা যায় না?

এখন প্রশ্ন হলো 'হত্যা' কোনো না কোনো বিশ্বাসের জায়গা থেকে ঘটলে সেই বিশ্বাসটিকে ব্যাখ্যা করবো কীভাবে? 'বিশ্বাস' নামক প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো বেষ্টিত থাকে কীভাবে – এই প্রশ্নের উত্তরই বা কীভাবে দেওয়া হবে? 'বিশ্বাস' বলতে আমরা কী বুঝি?

'বিশ্বাস' একটি মানসিক ক্রিয়া। যখন আমরা নীতিশাস্ত্রের কথা বলি তখন আসলে আমরা একগুচ্ছ নৈতিক বিধির কথা বলি যেগুলো একজন ব্যক্তির আচরণকে পরিচালনা করে। এই নৈতিক বিধিগুলি একজন ব্যক্তির সামাজিক বিধির দ্বারা রূপায়িত হয়, সংস্কৃতিমূলক চর্চার দ্বারা রূপায়িত হয় যা ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। নীতিশাস্ত্রের কাজ হল বিশ্বাসগুলিকে প্রতিফলিত করা। সুতরাং 'বিশ্বাস' বলতে এখানে কিসের বিশ্বাসের কথা বলা হচ্ছে- এই প্রশ্ন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বলতে হবে মানুষের কোন আচরণটি ঠিক, কোনটি ভুল, কোনটি খারাপ এবং কোনটি ভালো ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্বাস নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে, যে বিশ্বাসগুলি থেকে মানুষের নৈতিক আচরণের মানদণ্ড নির্ধারিত হয়। ফলে নীতিশাস্ত্রের কাজ হলো 'বিশ্বাস'- এর ধারণাকে নৈতিক মূল্য দেওয়া। অতএব, নৈতিকতার ধারণা এবং তারসঙ্গে কিছু জরুরী অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন বর্তমান আলোচনায় আমার প্রধান বক্তব্যকে ঘিরে রয়েছে। প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে এই বক্তব্যের মৌলিক নির্দেশ রয়েছে মূলত 'দৃষ্টিভঙ্গী'র ওপর। অর্থাৎ, নৈতিকতা ও অধিকার সংক্রান্ত দার্শনিক বিতর্কের যে পালাবদল আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের সূত্রে জানতে পেরেছি তা আসলে এই দৃষ্টিভঙ্গীগত তফাতের একটা বিশেষ জায়গামাত্র, যেখানে আমরা দেখতে শিখেছি সতীদাহ একটি কু-প্রথা, বাল্যবিবাহ,

বহুবিবাহ, ডাইনি হত্যা ইত্যাদি ঘটনাগুলিও একে একে বিচার্য হয়েছে প্রাচ্যের কুসংস্কার তথা অনালোকিত সমাজচিন্তার ফসল হিসেবে। তাই কোন বিশেষ উপজাতি যখন নরমাংস ভোক্ষণের জন্য নরহত্যা বা ক্যানিবালিসম্ এর মত বিষয়কে সামনে তুলে ধরে তখন সে বিষয় হয়ে ওঠে বর্বরোচিত, অ-সভ্যতার নিদর্শন বৃত্তান্ত।

ইওরোপ-যতদিন পর্যন্ত না প্রাচ্যকে তার নিজের বৈজ্ঞানিক আলো সরবরাহ করলো ততদিন অবধি এই সমস্ত ঘটনাগুলো বিবেচিত হত প্রাচ্যবিদ্যার বিষয় হিসেবে। দর্শন এসে যুক্তির পরম্পরা সাজিয়ে পাশ্চাত্যের সেই বৈজ্ঞানিকতাকে সরঞ্জাম হিসেবে কাজে লাগিয়ে প্রাচ্যের এই সমস্ত ব্যবস্থাকে অ-নৈতিক ও অ-বৈজ্ঞানিক বলে তকমা এঁটে দিলো। যদিও একটা বোতামের সাহায্যে শহরকে শহর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মত নরকীয় ঘটনার বৃত্তান্ত উপস্থাপিত করতে পশ্চিমের দর্শন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নতুন করে ‘রাজনৈতিক’ বলে সেই সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা চলতে থাকে। ফলে মনে হতে লাগলো যেন যেহেতু হিরোসীমা নাগাসাকির প্রাণগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে হত্যা করা হয়েছিলো সেহেতু সেগুলি দর্শনের ‘অধিকার’ চর্চা না হ’য়ে হ’য়ে উঠলো অনধিকার চর্চা।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের বেঁচে থাকার সংলগ্ন মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ে যথার্থ এবং সার্বজনীন ব্যাখ্যা দেওয়া কখনোই সম্ভব হয়না, যদি আমরা হত্যার ইতিহাসের দিকে চোখ রাখি, যদি আমরা ষড়যন্ত্রের বিশ্বাস ঘাতকতার এবং সর্বপরি যৌনতার ইতিহাসের দিকে চোখ। আসলে অধিকারের প্রশ্নটিকে সত্তার প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত তৈরী করা দরকার। কাশ্মীরের মানুষের প্রতি রাজনৈতিকভাবে সহমর্মিতা পোশন না করে গুজরাটের মানুষের প্রতি অধিক সংবেদনশীল হওয়া আসলে কোন দার্শনিক চিন্তার ফসল নয়। ধর্ম ও রাজনীতি, আঞ্চলিক জমি এবং কেন্দ্রীয় অর্থের সরবারহ তথা অন্যান্য সম্পর্কের বণ্টন ইত্যাদির নিরিখে গোড়ে ওঠা সমসাময়িক রাজনীতির ভয়ঙ্কর দিক। ইদানিং একটা কথা নানা মহলে জোড় দিয়ে বলতে দেখা যাচ্ছে সেটা হল রাষ্ট্রের উঠনে দাঁড়িয়ে দেশদ্রোহীতার সংজ্ঞাও কিন্তু সময় নিরপেক্ষ নয়। আমি বলতে চাইছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ, তার অধিকারের জায়গা নিজেই ঠিক করে নেবে একথাও যেমন আইনসিদ্ধ নয়, তেমনি কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় ও মতাদর্শ সম্বলিত বিশ্বাসের জায়গা থেকে সময় সাপেক্ষভাবে নাগরিকের নৈতিকতা ও অধিকারের গণ্ডী--- বেঁধে দেবে সেকথাও হাস্যকর। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে অহিংসা এবং সহনশীলতাই যদি ভারতের পবিত্র সংবিধানের মূল বক্তব্যের জায়গা হ’য়ে থাকে তাহলে ভারত-পাকিস্থানের খেলায় কোন অনাবাসি পাকিস্থানী পাকিস্থানের পতাকা ওড়ালে বা কেউ সেই পতাকা ওড়ানোকে সমর্থন জানালে সেটা কখনোই দেশদ্রোহীতার আওতায় পড়তে পারে না।

ডাইনি হত্যাকান্ডের একজন শিকার বা একবিংশ শতকের এই মহা আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে সতীদাহ প্রথার কোন মধ্যপ্রাদেশিক নারীর বিচার দার্শনিক তথা নৈতিকতার যুক্তিবোধ দিয়ে বিচার করতে হলে সেই বিচারের তালিকায় দক্ষিণের দলিত

ছাত্র রোহিত, মেদিনীপুরের চুনী কোটাল কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের মনোরমা থাঞ্জম কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না। হত্যার কোনো শ্রেণী বিভাগ নেই। কোনো হত্যাকেই আমরা "ঐতিহাসিক" হত্যা বলতে পারি না। যেমন কলম্বাসের হত্যা, হিটলারের হত্যা, স্তালিনের ইত্যাদি তেমনি কোনো হত্যাকে ধর্মীয় হত্যাও আমরা বলতে পারি না, যেমন কুরুক্ষেত্রের হত্যা, দুর্গা কর্তৃক মহীসাসুরের হত্যা, রাম কর্তৃক রাবনের হত্যা ইত্যাদি। যদি এই সকল ধর্মীয় হত্যাকে আমাদের ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে লেজিটিমেট বলে ধরে নিতে হয় তাহলে আল-কায়দা বা অন্যান্য ইসলামিক জঙ্গীগোষ্ঠীর হত্যাকান্ডকেও আমাদের লেজিটিমেট বলে ধরে নিতে হবে? এখন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হত্যার সঙ্গে অধিকারের সংযোগটা ঠিক কোথায় তা খতিয়ে দেখা দরকার। আসলে 'অধিকার' শব্দটি সবক্ষেত্রেই একটি সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু কার সঙ্গে কার এই সম্পর্ক! দেখা যায় প্রভুত্ব- অধীনতা সম্পর্ক যেখানেই রয়েছে সেখানেই এই অধিকারের দাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মূলত এটি শুরু হয়েছিল ১৭৮৯ র ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। সেখানে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বিনাশ এবং ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাবা শুরু হয়েছিলো যে, 'অধিকারের দিক থেকে প্রতিটি মানুষ সমান'। আর এই চিন্তাধারারই 'ফসল 'ডিক্লারেশন অব দি রাইটিস অব দি ম্যান অ্যান্ড সিটিজেন'। যদিও এই ঘোষণাপত্রের পেছনে যে বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই সেই সময়ে সব মানুষের সমান অধিকারের দাবি জানানোর মত মহৎ উদ্দেশ্যের পরিণতি হিসেবে মানুষে মানুষে বৈষম্য বেড়েছে বৈ কমে নি। এই বৈষম্য লক্ষ্য করেই সমাজের নানা স্তরে মানবতাবাদীরা সেইসময় থেকেই আন্দোলন করে আসছেন, সঠিক অধিকারের দাবিতে। এই সব আন্দোলনের ফলে যেটা হলো তাতে দেখা গেলো যে একদিক গড়ে তো অন্য দিকে ভাঙে। সমাজে বৈষম্যের যেমন নানা দিক, নানা রঙ তেমনি অধিকারের আকাঙ্খাও নানা মাপের। মানুষই এই বৈষম্যের ভিত্তি। জার্মানে হিটলারের আধিপত্ত প্রবল জাতিবাদের দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গ সরকারের আধিপত্ত বিস্তার এবং চরম অত্যাচার প্রবল বর্ণবাদী চিন্তার দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম বিবাদ একটি ধর্মীয় বৈষম্যের দৃষ্টান্ত, ভারত পাকিস্থানের পৃথকীকরণ তারই ফসল। আবার লিঙ্গ বৈষম্যও বর্তমানে সমাজের আরো একটা অন্ধকার দিক। যদিও সমাজের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অধিকারহীনতার স্বীকার তথাপি নারী-বৈষম্য যেন সকল শ্রেণীর বৈষম্যের মধ্যেই সেঁধিয়ে রয়েছে। যেখানে বর্ণবৈষম্য দেখা যায় সেখানেও লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট, যেখানে অর্থবৈষম্য দেখা যায় সেখানেও নারী-পুরুষের ভেদাভেদ স্পষ্ট। আবার ধর্মীয় বৈষম্য বা জাতি বৈষম্যের মধ্যেও কোন না কোনভাবে নারীজাতির অবমাননা লক্ষ্য করা যায়। এই দিক থেকে বিচার করলে লিঙ্গবৈষম্য যেন সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক এবং ব্যাপক।

ভারতবর্ষের মত দেশে লিঙ্গবৈষম্য তথা নারী বঞ্চনার নমুনা অঢেল। কখনো শিক্ষিত সমাজে মুখোশের আড়ালে কখনো বা সরাসরিভাবে অশিক্ষার অন্তরালে। কেমন-সেই বঞ্চনা? দেখা যাক কয়েকটা দৃষ্টান্ত নিয়েঃ

দৃষ্টান্ত একঃ

"জীবন্ত নারী মাংস আগুনে জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময়ে বেঁধে রাখতে চেপে রাখতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে, কিংবা হয়তো আফিম জাতীয় জিনিষ গিলিয়ে দেবার ফলে অর্ধ অচেতন অবস্থায় শূন্য চোখে অসহায়ভাবে এলিয়ে পড়ছে"- এটি একটি নারীর সতী হওয়ার গল্প।[১]

দৃষ্টান্ত দুইঃ

"ডাইনি সন্দেহে বিহারে গত ১৫ বছরে এক হাজার সাঁওতাল রমণীকে হত্যা করা হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ রাজ্যের অধিবাসী-সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত 'হো'- এর বিরহোর গোষ্ঠীর মহিলাকে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস বর্তমান। যদি কোন মহিলাকে সন্দেহ করা হয় তাহলে তার আর রক্ষে নেই। অধিকন্তু তার পরিবার বর্গকে গ্রামচ্যুত করা হয়। ডাইনি বিষয়ক আধিভৌতিক চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় বিহারের পশ্চিম সিংভুম, ইন্দকাটা, আসনাটালিয়া, খাগিপি, সোনুকা, চক্রধরপুর, চাইবাসা, পূর্বসিংভূমের জামসেদপুর, পটমাদা, কুন্দ্রকোয়া প্রভৃতি এলাকার সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে।"[২]

দৃষ্টান্ত তিনঃ

"আমাদের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল ২০০৪ এর ১০ই জুলাই ইম্ফলে বামন কাম্পু মাখা লেইকেই গ্রামের থাঙযম মনোরমার হত্যা। মনোরমার হত্যার পরবর্তী দু'মাস সাড়া মনিপুর জুড়ে যে লড়াই ও প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে তার স্মৃতি হয়তো পুরোপুরি বিস্মৃতিতে ডুবে যায়নি। প্রতিবাদ, আন্দোলনে মুখর ছিল ভারতের রাজনীতি। মনোরমা খুন হয়েছিলো অসম রাইফেলস এর কয়েকজন সেনার হাতে। বাড়ির দরজা ভেঙে তারা মনোরমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, পরের দিন আবিষ্কার করা হয় তার বুলেট বিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত দেহ। শুধু দেহ নয়, ধর্ষিত মৃতদেহ"।[৩]

ভারতীয় সমাজ আজ উন্নত, আর তার নমুনা এই ঘটনাগুলোতেই স্পষ্ট। 'উন্নত' না-হলে মিডিয়ায় হত্যাকাণ্ডের এমন সুন্দর বিবরণ পাওয়া যেত কি? দৈনিক খবরের কাগজে অথবা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এরকম হাজার হাজার ঘটনা আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। এর শুরু হয়েছিল কবে- তার নির্দিষ্ট তারিখ কারোর জানা নেই। তবে এই আগুন নেভানোর চেষ্টা আমাদের মহান ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে। পথ প্রদর্শনের শুরু সেই রাজা রামমোহন রায় থেকে। ১৮১৮ সাল থেকেই তিনি এই সতীদাহকে বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সতীদাহের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- "Suicide and female murder, the most heirous crimes"। কিন্তু রামমোহনের এই প্রয়োগের পরেও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আমাদের রূপকানোয়ারের জ্বলন্ত সতী-হওয়ার ঘটনায় নারীর সাক্ষী হতে হয়। ১৯৮৭ সালে

ঘটনাটি ঘটেছিল, রাজস্থানের দেওরালয় গ্রামে, যেখানে রূপকানোয়ার ছিল একজন শিক্ষিতা, অবস্থাপন্ন পরিবারের বধূ, আর সেখানেই গন্ডোগোল। শিক্ষার আলো সমাজের নিম্নমানসিকতার কুসংস্কারকে বশ করতে পারেনি, তাই মৃতস্বামীর স্বর্গযাত্রাতেও সঙ্গী হতে হয় জীবন্ত স্ত্রীকে। রূপকানোয়ারের এই ঘটনাটির পরেই একটি আইন পাশ করা হল- " কমিশন অফ সতী প্রিভেনশন অ্যাক্ট, (১৯৮৭)"। কিন্তু কাদের জন্য এই আইন, আগেও তো ছিল আইন, " Sati Regulation of 1829", উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের করা। তাহলে রূপকানোয়ারদের এই পরিণতি হল কেন? কোন আইন তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দেবে? অবশ্যই বেঁচে থাকা বলতে শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকা নয়, সমাজে একজন মানুষের সম্মান নিয়ে (নারী হিসেবে আলাদা কোনো করুণাবাচক মর্যাদা নয়) বেঁচে থাকার অধিকার আজ অবধি কোনো আইন কোনো নারীকে দিতে পারে নি। আন্দোলন হয়েছে অনেক, এখনও হচ্ছে। একথা নিঃসন্দেহেই ঠিক যে, সতীদাহ প্রথা অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং পাশবিক, যাকে বর্ণনা করা একেবারেই দুঃসাধ্য। কিন্তু পাশাপাশি একথাও ঠিক যে, যদি সমাজ অত্যন্ত দয়াশীল হ'য়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো একজন নারীকে এভাবে তার বৈধব্য জীবনে কি যথাযথ সম্মান দিতে পারে?

বৈধব্যজীবন মানেও তো এক অসহনীয় জীবনযাত্রা, সে এক এমন কৃচ্ছসাধনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিধবা নারীকে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে সে 'এক পুরুষের'-ই সম্পত্তি ছিল, যার প্রয়াণের পর সেই নারীর জীবন এক 'নিঙরোনো ছিবড়ে' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তার মালিক তথা স্বামী তাঁর জীবনের সমস্ত রস নিঙরে নিয়ে চলে যায়- আর সেই মালিকের মৃত্যুর পর কখনো তার জ্বলন্ত চিতায় সঙ্গী হতে হয় আবার কখনো বৈধব্য পালন করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়। বিদ্যাসাগর মশাই অনেক চেষ্টা করেছিলেন, নারীর বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা নিরাময় করতে, কিন্তু সমাজ বড় অবাধ্য, সে তার নিজের নিয়মেই চলে।

নারী নির্যাতনের অপর একটি নজির হল 'ডাইনি প্রথা', সতীদাহের থেকে কোন অংশে কম 'ঘৃণ্য' নয়। যেসব অঞ্চলে শিক্ষার আলো একেবারেই প্রবশাধিকার পায়নি সেইসব অঞ্চলেই এই প্রথাটির বেশি প্রচলন দেখা যায়। বলা যেতে পারে এটি 'নিম্নবর্গের নিম্নবৃত্তি'। তাই উচ্চবর্গীয় মানসিকতা যাঁরা 'ডাইনি' সন্দেহে কাউকে হত্যা করে না; যাঁরা হয়তো সতীদাহ প্রথায় বিশ্বাসী, অথবা যাঁরা সমাজের রক্ষক তাঁরা এখনো অবধি নিম্নবর্গের এই পাশবিক আচরণ বন্ধ করার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন ক'রে উঠতে পারেননি। কারণ সমাজের রক্ষকই যে ভক্ষক তা মনিপুরের মনোরমা থাঙযমের ঘটনাতেই স্পষ্ট। ২০০৪ এর ১১ই জুলাই ভোর সাড়ে তিনটেয় ১৭ জন অসম রাইফেলসের জওয়ান মনোরমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে খুন করে একটি খেতের ধারে ফেলে রেখে চলে যায়। এবং এই খুনের বিবরণ এতই নৃশংস যে তা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না।

মনিপুর সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের অবৈধ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে যেসব আইন পেশ করা হয়েছিল (অর্থাৎ, পাঞ্জাব নিরাপত্তা আইন (১৯৫৩), উপদ্রুত এলাকা আইন, সশস্ত্র বাহিনী-আইন, টাডা আইন ইত্যাদি) সেইসমস্ত আইনের ওপর 'অধিকার' কায়েমের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী জওয়ানরা জঙ্গি সন্দেহ ভাজন পরিবার গুলির ওপর এইরকম পাশবিক অত্যাচারকেই একমাত্র অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলো।[৪] এর মধ্যে দিয়ে তারা এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে জঙ্গিদের এই আচরণই প্রাপ্য অথবা একরকমভাবেও ভাবা যেতে পারে যে 'জাতীয় নিরাপত্তা'র কাজে নিযুক্ত হ'য়ে তারা হয়তো এটাই মনে করত যে নারীদের যাচ্ছেতাইভাবে ভোগ করারও অধিকার তারা পেয়ে গেছে। তাই নিজের অধিকার প্রমাণ করার জন্য কখনো তারা মনোরমাদের ধর্ষণ করে খুন করতে পারে; কখনো সোহরাবুদ্দিন বা তুলসীরামকে লস্কর-ই-তাইবার জঙ্গি আখ্যা দিয়ে নির্বিকারে হত্যা ক'রে সোহরাবের স্ত্রী কৌসরবাঈকে গান্ধীনগরের এক খামার বাড়িতে ধর্ষণ করার পর খুন করে মৃতদেহ জ্বালিয়ে ফেলতে পারে; আবার কখনো বা সুস্মিতা চক্রবর্তীর মতো কাউকে কাউকে আত্মহননে বাধ্য করতে পারে। তাই 'অধিকার' শব্দটির যথার্থ অর্থ সমাজ তথা রাষ্ট্র এখন ঠিক করতে পারেনি। রাষ্ট্রই এই অধিকারের আইনকে লঙ্ঘন ক'রে নিজের অধিকার বজায় রাখে। যেখানে প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে বৈষম্য সেখানে 'নারীবাদ' বা 'মানবাধিকার সুরক্ষা কমিশন' সতই আন্দোলন করুক না কেন এর নিবৃত্তি কখনোই সম্ভব না।

জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই একজন নারী-নিরাপত্তাহীনতার শিকার। আজকের নারীরা সাহসী, তারা মাথা উঁচু ক'রে বাঁচার চেষ্টা করে, সংগঠন তৈরি করে এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিন্তু তবুও ভ্রূণ হত্যার ঘটনা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বৈ কমেনি। মাতৃত্ব নারীত্বের পরিণতি। আজকের নারীরা যতই আন্দোলন করুক না কেন 'মা' হওয়ার বাসনাকে কখনোই তারা বর্জন করতে পারে না। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতা এতই নির্মম যে এই মাতৃত্বের প্রতি যেন নারী-আর বিশ্বাস রাখতে পারে না। এই 'অবিশ্বাস এতদিন তাকে 'সন্তান উৎপাদন যন্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করার ফল স্বরূপ। 'সন্তান উৎপাদন যন্ত্র' এমনিই এক নারী তাঁর আত্মকথায় লেখেন-

" আমার বয়ঃক্রম যখন ১৮ বছর, তখন আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মায়, তাহার নাম বিপিনবিহারী। যখন আমার বয়স ২১ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন আমার একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম পুলিনবিহারী। আমার ২৩ বৎসরের সময় আর একটি কন্যা সন্তান হয় তাহার নাম রামসুন্দরী। ২৫ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম রাধানাথ। যখন আমি ৩০ বৎসরের, তখন আমার আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম চন্দ্রনাথ। আমি যখন ৩৪ বৎসরের তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম কিশরীলাল। তাহার পর আর একটি পুত্রসন্তান ছয়মাস গর্ভবাস করিয়াই গত হয়। পরে যখন ৩৭ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম প্রতাপচন্দ্র। তাহার পর যখন আমি ৩৯ বৎসরের তখন আর একটি কন্যাসন্তান হয়,

তাহার নাম শ্যামসুন্দরী। পরে আমি যখন ৪১ বৎসরের তখন সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটি জন্মে, তাহার নাম মুকুন্দলাল। ১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তানটি হয়, আর ৪১ বৎসরে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না।”[৫]

২৩ বছর ক্রমাগত সন্তান উৎপাদনের ফলে তার নারীত্বের মর্যাদা কি আদৌ বেড়েছে! নাকি এ-এক জলন্ত যৌন হিংস্রতার দৃষ্টান্ত! বরং এই প্রক্রিয়াটিকে বলা যেতে পারে-‘বৈধ আইনি হিংস্রতা’, যার একটি সামাজিক স্বীকৃতি আছে। মূলত নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দিতেই ‘বিবাহ’ ,নামক যে অনুষ্ঠানটির যথার্থতা, সেই কার্যক্রমটি যে একজন নারীর পক্ষে কতখানি অসম্মানের তা হিন্দু বিয়ের রীতি রেওয়াজেই স্পষ্ট। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর *বিবাহ প্রসঙ্গে* বইতে বিবাহের মন্ত্রগুলির মূল্যায়ন করে দেখিয়েছেন যে,

“ প্রথমত, প্রকৃতির সৃষ্ট যে নারী সে স্বভাবত অশুচি, অকল্যাণ, পুরুষপরতন্ত্র, হীন এবং কতকটা যেন ঊন মানব। বিয়ের অনুষ্ঠানের ও মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তার শুচিতা সম্পাদন করে’ বর তাকে নিজের পরিবারের ও সমাজের জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। নইলে সে সংসারে ও সমাজে অকল্যাণ আনবে; স্বামীকে হত্যা করবে, পুত্রদের হারাবে ও পশুর বিনাশের কারণ হবে। দ্বিতীয়ত, তার স্বতন্ত্র চিত্ত বলে কিছুই নেই বা থাকলেও না থাকাই বাঞ্ছনীয়, তার সে স্বতন্ত্র চিত্তের অবনমন ঘটিয়ে সম্পূর্ণ স্বামীর চিত্তের অনুগামী, স্বামীর ব্রতের অনুব্রতা হওয়াই তার চূড়ান্ত কর্তব্য। তৃতীয়ত, স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির কল্যাণ সাধনে সে আত্মনিয়োগ করবে”।[৬]

তাই রাসসুন্দরীর মতো নারীরা সন্তান ধারণে কখন আগ্রহী বা একাধিক সন্তানে তাদের আগ্রহ আছে কি না অথবা যৌন নিগ্রহে তার মতামতের অপেক্ষা তার স্বামী কিংবা সমাজ করে না। নারীরা চিরকালই পুরুষের ভোগ্য এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তবে একথা ঠিক যে বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে, অবশ্য পরিস্থিতির আঙ্গিক পাল্টেছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘বিবাহে’র ব্যাপক প্রচলন থাকলেও অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা কমেছে, ফলে বেড়েছে কন্যা ভ্রূণ হত্যা বা প্রাক্ বিবাহ নারীর গর্ভপাত। কারণ সামাজিক স্বীকৃতি না পেলে একজন নারী স্বেচ্ছায় ‘মা’ হতে পারে না। নারীর ইচ্ছাও তো সমাজ তথা রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এখানে রাষ্ট্রও যেন এক প্রবল প্রতাপশালী পুরুষ।

১৯২৯ সালে শিশু বিবাহের বিরুদ্ধে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তা লঙ্ঘন করে আজও ১৫ বছর বয়সী নাবালিকাদের বিবাহের পিঁড়িতে বসানো হয়। বলা বাহুল্য ‘বিবাহ’ নারী অত্যাচারের আরো একটি রূপ। ১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যায় যে কোলকাতা শহরে পঞ্চাশ শতাংশ নারীকে ১৫ বছর বয়সের আগেই হস্তান্তর করা হয়। এই বিষয়ে একটি তথ্য-

"১৮৭২ এ জনৈকা কুসুমকুমারী দেবী নামে একটি বঙ্গনারী সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এক যন্ত্রণাদগ্ধ চিঠি লিখেছিলেন। সাড়ে চার বছর বয়সে ৬১ বছরের এক বৃদ্ধের ঘরণী হ'য়ে আসার কাহিনী"। আবার প্রায় একশো বছর পরেও "এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে রাজস্থানের মাধোগড় গ্রামের চার বছরের মেয়ে হাসনার গল্প। তাকেও তুলে দেওয়া হয়েছে এক বৃদ্ধের হাতে। সেদিন কুসুমকুমারীর কৌলিন্য রক্ষার দায় প্রবল ছিল আর আজ একচিলতে সরষে ও গমের ক্ষেতের অধিকারী হাসনার বাবার কাছে দায়টি দরিদ্র ও ক্ষুধার। একশো বছরে এটুকু ছাড়া আর কিছুই বদলায়নি।"[৭]

ফলে সংসার জীবন থেকে কর্মক্ষেত্র যেকোনো পরিস্থিতিতেই নারী সমাজ বিপন্ন। বিশ্বজুড়ে নারী অত্যাচারের মাত্রাগুলি বিভিন্ন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার আঙ্গিকগুলি বদলেছে মাত্র। কখনো কণ্যা ভ্রূণ হত্যা ক'রে প্রমাণ করা সমাজে পুরুষই কাম্য, নারী নয়; কখনো সংসারের মধ্যে কাঙ্খিত পণ না পেয়ে দেবযানী বণিকদের মতো বধূহত্যার ঘটনা অথবা কখনো রূপকানোয়ারদের মতো সামাজিক হিংস্রতা ঘটিয়ে নারীজাতীর অসম্মান প্রদর্শন; আবার কখনো বা মনোরমা থাংযমের মতো নোংরা রাজনীতির বশবর্তী হ'য়ে নারী সমাজের ওপর পাশবিক অত্যাচার। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যাঁরাই করেছেন তাঁদেরিই সমাজে কোন না কোনভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। সেই হেনস্থারও কাঠামো পাল্টেছে। আজ বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র তথা সমাজের হিংস্রতা বেড়েছে না কমেছে তার মানদণ্ড নির্ণয় করা হবে কিভাবে! যেখানে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে গিয়ে বা বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে অথবা সতীদাহ প্রথা রুখতে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে 'অসামাজিক প্রথা'র প্রদর্শক হিসেবে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল সেখানেই আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দেখতে হয় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য মধ্যপ্রদেশের শিশু উন্নয়ন দফতরের অফিসার শকুন্তলা বর্মার পরিণতি। এই প্রতিবাদের জন্য তার হাত কেটে নেওয়া হয়। তাই কোন্ আইন দেবে মানুষের নিরাপত্তা! যেখানে হিংস্রতার প্রতিবাদ জানানোর জন্য মানুষ হিংস্রতাকেই বেছে নেয় সেখানে আইনের কার্যকারিতা কোথায়? যখন ইওরোপের নারীরা নারী-সমাজের চরম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য অন্তর্বাস পোড়ায় ঠিক সেই সময়েই কুয়েতি নারীরা তাদের বোরখা পুড়িয়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আবার অন্যদিকে মনোরমা হত্যার প্রতিবাদে মনিপুরের নারীসমাজ নগ্নতাইকেই বেছে নেয়- হিংস্রতাকে রুখতে সারা বিশ্বের নারীসমাজ উত্তাল। কিন্তু কোনো আইন তাদের লজ্জা ঢাকতে পেরেছে কি? আইনের সক্রিয়তা যদি আদৌ থাকতো তাহলে কুসুমকুমারী বা হাসনাদের মতো নাবালিকাদের 'বিবাহ' আটকানোর জন্য আজ উন্নত সমাজে শকুন্তলা বর্মার মতো এমন করুণ পরিণতি দেখতে হত না।

আসলে এসব কিছুর মূলে আছে 'অশিক্ষা'। 'শিক্ষা' বলতে কেবল প্রথাগত শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে না, 'শিক্ষা' বলতে এখানে নৈতিকতার শিক্ষা; মূল্যবোধের

শিক্ষা; 'মনুষ্যত্বের শিক্ষা'ই কাম্য। বিশ্বজুড়ে ক্ষমতাহীন মানুষেরা সকলেই অধিকারহীনতার শিকার, যদিও নারীদের অধিকারহীনতা চিরাচরিত, যা অন্যান্য নিম্নবর্গীয় অধিকারহীনদের মধ্যেও প্রকট। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন; ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের দাবি অনুযায়ী নারীর অধিকারকেও মানবাধিকার হিসেবে দেখা দেয় যেখানে নৈতিকতার প্রসঙ্গ বারবার আসে। এই সম্মেলনে পাঁচজন বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়, সেখানে ২৫টি রাষ্ট্রের নির্যাতিতারা তাঁদের নির্যাতনের বর্ণনা দেয় নিঃসংকোচে। দক্ষিণ কোরিয়ার সেই ষোড়শীও সেখানে নিজের পরিণতির বর্ণনা দিতে আসে, যাকে জাপানি সেনার মনোরঞ্জনের জন্য গ্রাম থেকে তুলে আনা হয়েছিল এবং সাত বছর ধরে তাকে লাগাতার ধর্ষণ করা হয় যার ফলে অকালেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে যায়। তাছাড়াও সার্বিয়া, বসনিয়া, তুর্কী, ক্রোয়েশিয়া, চিলি, পেরু, সুদান, আমেরিকা, কোস্টারিকা, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশ থেকে নির্যাতিতারা নিঃসংকোচেই নিজেদের নির্যাতনের বর্ণনা দেয়। সেই বৈঠকে প্রায় ১১ ঘন্টা ধরে ৩০ জন মহিলার অত্যাচারের কথা শোনা হয়। তাদের মধ্যে কেউ বাবার হাতে যৌন নিগ্রহের দৃষ্টান্ত, কেউবা সমাজের রক্ষকের হাতে আবার কেউ পাচার হ'য়ে বারাঙ্গনায় রূপান্তরিত। মূলত এই বৈঠকের পরই নারীর 'অধিকার 'মানবাধিকার' স্বীকৃতি পায়। কিন্তু বৃথাই এই চেষ্টা। যেখানে মানুষের মূল্যবোধ বা নৈতিকতার অভাব; যেখানে মানুষ সহানুভূতিশীল নয় সেখানে কোনো আইন পারবে কি মনোরমাদের সম্মান ফিরিয়ে দিতে!

সূত্রনির্দেশ :

১. দ্রষ্টব্যঃ ভাস্বতী চক্রবর্তী (২০০৩) "সতীদাহঃ অশেষ আগুন", *দেশপত্রিকা*। পৃষ্ঠাঃ ৩২-৪০

২. *শারদীয়া আজকাল পত্রিকা* (১৪০০ সন্) নীহার মজুমদারের বিশেষ নিবন্ধ "ডাইনি", পৃষ্ঠাঃ ৬১৭-৬২০ দেখুন

৩. দ্রষ্টব্যঃ ঊর্মি নাথ (২০০৭), *দেশপত্রিকা*। পৃষ্ঠাঃ ২৯-৩০।

৪. ২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর *দেশ পত্রিকায়* সুজাত ভদ্রের লেখা "অগ্নিগর্ভ মনিপুর" পৃষ্ঠাঃ ২৬-২৭ দ্রষ্টব্য।

৫. দ্রষ্টব্যঃ রামসুন্দরী দাসীর (১৯৯৫) *আমার জীবন* বইটি। পৃষ্ঠাঃ ৪৮, ৪৯।

৬. সুকুমারী ভট্টাচার্যের *বিবাহ প্রসঙ্গ* (১৯৯৬) পৃষ্ঠা ১৯ দ্রষ্টব্য।

৭. দ্রষ্টব্যঃ *দেশ পত্রিকার* (১৭ই এপ্রিল ২০০৫) পৃষ্ঠাঃ ৩৪,৩৫।

নবজাগরণের প্রেক্ষিতে রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তা

বিদ্যুৎ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ

সংক্ষিপ্তসার : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজ মেয়েদেরকে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। কুসংস্কার অশিক্ষা ধর্মীয় গোঁড়ামি, পর্দাপ্রথার প্রভাবে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মেয়েদের এই কঠিন সংকটের সময়েই বেগম রোকেয়া আবির্ভূত হন। বাঙালি মুসলমান সমাজে রোকেয়া-ই প্রথম পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকারের দাবি তোলেন, নারী-পরাধীনতার বিপক্ষে জোরালো মতামত প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়ে নারীসমাজকে শিক্ষার আলো দেখান।

সূচক শব্দ : মুসলিম, সমাজ, নারী শিক্ষা, প্রতিবন্ধকতা।

‘উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষার ইতিহাস মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের আয়োজনে ব্রিটিশ আধিকারিক, যাজক ও বাঙালি ভদ্রলোকের অংশগ্রহণের টানাপোড়েনের ইতিহাস। এই ইতিহাসের পাত্রপাত্রী একদিকে যেমন ব্রিটিশ আধিকারিক ও যাজকরা, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের দাক্ষিণ্যে গড়ে ওঠা কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি সমাজপতিরা। আর এই প্রক্রিয়ায় গতরখাটা সাধারণ মানুষের প্রায় কোন ভূমিকাই নেই। সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের যাবতীয় টানাপোড়েনের বাইরে অবস্থান করেছেন।[১] নগর জীবনের উপযোগী অল্পসংখ্যক মানুষের জন্য এই শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অশোক সেন মন্তব্য করেছেন, ‘বিদেশি শাসকের সঙ্গে এদেশীয় জনসাধারণের প্রতিনিয়ত বোঝাপড়া বিশেষ দরকার। এর জন্য চাই তেমন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকবৃন্দ যাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষী ভাষ্যকারের কাজ করবেন। তদুপরি বিদ্যাবুদ্ধি, সংস্কৃতির উৎসাহে তাঁরা সাহেবকে কেবল সেলাম দেবেন না, ইংরেজদের তৈরি জিনিসপত্রও পছন্দ করে কিনবেন। সেই শিক্ষানীতি এবং তার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বিস্তারে নব্য মধ্যবিত্তের চিন্তাধারা ও সামাজিক জীবনে নতুন সব অভিজ্ঞতার ওলটপালট আরম্ভ হলো।[২] শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিক্রমায় পর্ব থেকে পর্বান্তরে যে শিক্ষার বিবর্তন হয়েছিল তাকে অস্বীকারের একটা প্রবণতা এই সময়ে সৃষ্টি হল। এই প্রবণতায় দেশজ শিক্ষাকে উপেক্ষা করার জন্য সেই ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে যোগ ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেল। ফলে বাঙলার নবজাগরণে যে জনশিক্ষার বিস্তার হতে পারত তার পরিবর্তে হল পাশ্চাত্য ধারায় শহুরে অভিজাত

মধ্যবিত্তের এবং নিম্নবিত্তদের শিক্ষার সীমিত সুযোগ। ইতিহাস রচিত হল এই শিক্ষাক্রমকে নিয়ে। যেখানে নারীদের জন্যও একটু জায়গা রইল।

শিক্ষার সূত্রপাত হয় মানুষের জন্মের পর থেকে। প্রবহমান সময়, পরিবেশ, সমাজসংস্কার সব কিছুকে মানিয়ে নিতেই শিক্ষার শুরু। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় সবকিছুকে মানিয়ে নিতে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্য থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষ থাকে না। এই ধারাতেই সমাজের নারী-পুরুষ নিজেদের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দেয়। প্রাচীন কালের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা একই রকম থাকায় সমাজপরিবর্তনের শ্লথ গতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেনি। তবে রাষ্ট্রীয় চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করলেও কখনোই সমাজের সব মানুষের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেনি। তখন প্রতিষ্ঠান—বহির্ভূত শিক্ষা ছিল মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। প্রকৃতি পাঠ বা প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলাই ছিল শিক্ষা। ফলে শিক্ষা ছিল জীবনের সঙ্গে অন্বিত। যদিও এই শিক্ষার সঙ্গে সমকালীন পরিবেশের অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি সংকুচিত ধারাও বহমান ছিল। এই ধারাটি প্রথম বিপর্যস্ত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে। এর ফলে সুবিস্তৃত প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছিল অস্বীকৃত। লোকশিক্ষা প্রসারের পথটি হয়েছিল প্রথম বাধাপ্রাপ্ত। এই সময় থেকে ‘শিক্ষিত’র সংজ্ঞা হল ‘ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষিত। প্রাচ্যবিদ্যায় যাঁহারা পন্ডিত ছিলেন এতদিন যাঁহারা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এইবার তাঁহাদের আসন টলিল, নব্য শিক্ষিতের দল তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দূরপ্রসারী বিপ্লবের সূচনা ঘটিল।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল পর্তুগীজ বণিকদের আগমনের কিছুকাল পরে। তাঁরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তাদের স্বদেশীয় আদর্শে গঠিত কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পর্তুগীজদের পর দিনেমারদের সময়েই প্রটেস্টান্ট মিশনারিরা প্রথম এদেশে এসে পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজের আশেপাশে ইংরেজি শেখানোর জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাদ্রাজের পর ধীরে ধীরে বাঙলাদেশে মিশনারিদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম কেরী বাঙলাতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আসেন। তখন তিনি বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন।[৪] তবে বাঙলাতে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির এই সূতিকাগার থেকেই পরবর্তীকালে বাঙলায় অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি হয়েছিল। ১৮৫০সালের মধ্যে কলকাতা শহরে বেসরকারী উদ্যোগে ষাটটিরও বেশি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেকলের নির্দেশিত শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ১৮৩৫ সালে

মেকলে বলেছিলেন, 'we govern a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.'[৫]

মেকলের শিক্ষানীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল 'filtration theory' বা 'চুঁইয়ে পড়া নীতি' । ইংরেজি শিক্ষা দিতে হলে প্রথমে উচ্চবর্ণকে দিতে হবে। উচ্চবর্ণের মধ্যে এই নব্যশিক্ষার প্রসার হলে কালক্রমে তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে গিয়ে শেষে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এই তত্ত্বের সমর্থনে তখনকার কলকাতা শহরের হিন্দু মধ্যবিত্তদের একটি বড় অংশই ছিল। যদিও এই তত্ত্বের আদর্শগত দিক নিয়েই বিতর্ক ছিল। কারণ ভারতের জাতীয় জীবনে কোন সময়েই উচ্চবর্গের মানুষ আলোকিত হচ্ছে তার দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষ উপকৃত হয়নি। তাই এই তত্ত্বের প্রয়োগের সঙ্গে বিরোধেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর মেকলে নির্দেশিত বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতির ফলে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে। প্রতি জেলায় সরকারি স্কুল তৈরি হয়। সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় অর্থ ইংরেজি মাধ্যমের সরকারি স্কুলে ব্যয় করেন। ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, প্রথম যেদিন হুগলি কলেজ খোলা হয় সেদিনই বারোশ আবেদন জমা পড়ে। এই চাহিদা দেখে নানাস্থানে বেসরকারি ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠতে শুরু করে। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, যারা সরকারি বিদ্যালয় থেকে পাশ করবে, তাদের ভিতর থেকেই রাজকর্মচারি নিয়োগ করা হবে। ফলে বাড়তি উৎসাহে এখন থেকে ইংরেজি শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষার সমার্থক হয়ে উঠে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় চাকরি।[৬] পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে শুরু হয় পাস করার জন্য স্মৃতিনির্ভর শিক্ষা। প্রচলিত অর্থে মুখস্থবিদ্যা ।

ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির এই বিকৃত ভার সমাজকে বহন করে চলতে হয়। ভয়ানক ইংরেজি শিক্ষার পরিণতি অভিভাবকদের ভাবিয়ে তোলে। তার থেকে দেশজ শিক্ষার ধারাকে কেউ কেউ শ্রেয় মনে করে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর্থিক উপযোগিতার কারণে সংস্কৃত-আরবি-ফারসি এমনকি বাংলা শিক্ষায় শহুরে সচেতন বাঙালীরা উদাসীন হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জগতে বাঙালীরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন এবং আইন বিষয়েই বেশি উৎসাহিত হয়।[৭] এই সময়কালে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসে তাদের বিশেষ বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উডের ডেসপ্যাচে প্রথম দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারকে জনগণের শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করার পরামর্শ দেওয়া হয় । পাদ্রি লালবিহারী দের মত দুচারজন ব্যক্তি এই জনশিক্ষার হয়ে সওয়াল করেন। কিন্তু বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত বাঙালী এর বিরুদ্ধতা করেন। বিদ্যাসাগরও তাঁদের একজন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও জনশিক্ষাতে উৎসাহ দেখাননি।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (যা পরে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙলার স্ত্রীশিক্ষার জগতে সৃষ্টি হয় একটি নূতন অধ্যায়। এখানে প্রথম সংগঠিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য আদলে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হয়। 'ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে তদ্ব্যতীত আর কেহই পারেনা।[৮] এই স্কুলের তাম্রফলকে লেখা হয়েছিল 'HINDU FEMALE SCHOOL'। উচ্চবর্ণের উচ্চবিত্ত হিন্দু ছাত্রী ছাড়া এখানে অন্য কোন ছাত্রীর প্রবেশাধিকার ছিলনা, মুসলমান ছাত্রীও নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে এখানে শিক্ষার সূচনা হলেও অভিভাবকদের অনুমতিতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর সুযোগ ছিল। পাঠক্রম তৈরিতে হিন্দু মানসিকতায় আঘাত লাগতে পারে এরকম কোন বিষয় ছিল না। ছাত্রীদের ধর্মান্তরিত করার কোন লক্ষ্যও ছিল না।

উল্লেখ্য, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে যে সনদ আইন পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল তাতে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য সরকারি তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তার একটি পয়সাও স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়নি। এই সনদের ফলে মিশনারিরা শিক্ষাবিস্তারে, ধর্মপ্রচারে প্রচুর স্বাধীনতা অধিকারী হয়। তারা নারীশিক্ষা বিস্তার অনাথ আশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দেয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্দানশীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার শুরু করে,দেয়। শিক্ষার মধ্যে খ্রিস্টধর্মের অনুপ্রবেশ করিয়ে ধর্মান্তরেরও চেষ্টা করে। এই ধর্মান্তরের জন্য তাদের নারীশিক্ষাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু ফিমেল স্কুলের ক্ষেত্রে সেই বাধা দূরীভূত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক কুসংস্কার থেকে নারীশিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, গালি-গালাজের মধ্য দিয়ে প্রবল বিরোধিতা এলেও স্ত্রীশিক্ষাকে থামিয়ে রাখা যায়নি। গ্রাম্য পাঠশালায় ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা অত্যন্ত সাধারণ শিক্ষার উপকরণ নিয়ে পড়ালেখা শুরু করে। অতি সাধারণ উপকরণ নিয়েই এই প্রক্রিয়া চলে, 'বালির উপর আংগুল চালিয়ে তালপাতা বা কলাপাতায় ভূষোকালি দিয়ে লেখা ও পড়া একসঙ্গে চলত। মুখে মুখে শুনে ছাত্ররা নদ- নদী, গ্রাম,জন্তু-জানোয়ার, ফুল-ফল এর নাম জানত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ–কাহিনী শুনত, নামতা মুখস্থ করত। হাতের লেখার প্রতি যত্ন নেওয়া হত। দলিল দস্তাবেজ পুঁথি পড়তে শেখা ও চিঠিপত্র লিখতে শেখানো হত। কাজ চালানর মত হিসেব রাখতে শেখানো হত।[৯]

মেয়েদেরও শিক্ষার পদ্ধতি প্রায় একই রকম ছিল। পাঠশালাতে সব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পড়ত। গ্রাম্য শিক্ষার এই মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শহুরে ইউরোপীয় মডেলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা। যেখানে খ্রিস্টতত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত। স্থানীয় মানুষজনও কিছু কিছু স্কুল তৈরি করেছিল। যেখানে স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ ছিল। এছাড়া 'লেডিস সোসাইটি' পরিচালিত কিছু স্কুল ছিল। তার বাইরে কলকাতাতে এবং কলকাতার বাইরে মেয়েদের জন্য আরো অনেক স্কুল ছিল। যেখানে অনেক মুসলিম ছাত্রীও পড়ত।[১০] ধীরে

ধীরে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মানুষের বিরূপতা গেল কমে। হিন্দু ফিমেল স্কুল স্থাপনের পর স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করে পুরুষরাই মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাঙালী স্ত্রীসমাজ দেশজ শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ নিয়ে আধুনিক হয়ে উঠল। তবে তা সংখ্যার দিক দিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু খুব দ্রুত তা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

উনিশ শতকের সমাজ জীবনের বহু কৌণিক পরিবর্তন মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করেনি। এই সময় তারা ফেলে আসা দিনের স্বপ্নে ছিল বিভোর। ওয়াকিল আহমদ বলেছেন ‘উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর বাংলার মুসলমান সমাজের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীন, অধঃপতন ও অনিশ্চয়তায় এক ক্রান্তিকাল ছিল। হতাশা,সংশয়,দ্বন্দ্ব,গ্লানি ও অবসন্নতা নিয়ে জাতি কাল অতিবাহিত করেছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়,তারা সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার চেষ্টা করেনি। ব্যক্তি, সমাজ, সংগঠন কোন পর্যায়ে যুগ সম্পর্কে সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। ভাষার ক্ষেত্রে ফার্সির প্রাধান্য বজায় থেকেছে। মাতৃভাষা হয়েছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে, ফলে এগুলির উপকার থেকে সমাজ বঞ্চিত হয়েছে। কোম্পানির সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছাড়া অনুকূল বা প্রতিকূল কোন অবস্থাই স্পষ্ট ছিল না। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শীতল ও নির্বিকার।’[১১]

এরকম পরিস্থিতিতে শহুরে মুসলিমরা নানা কারণে ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে থাকলেও বাঙলার গ্রামীণ জীবনে বসবাসকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিমের মধ্যে প্রথাগত পদ্ধতিতে সহজলভ্য পাঠশালা,মক্তব,মাদ্রাসার যৎকিঞ্চিত শিক্ষার সুযোগ বন্ধ হয়নি। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পাঠশালা এবং মক্তবেই হয়েছে। সেখানে হিন্দু মুসলিম বালক বালিকা একসঙ্গে পড়েছে। পড়ার সঙ্গে লেখার অভ্যাসও চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় হিসেব নিকেশ সম্পর্কেও এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়েছে মাদ্রাসায়। এখানে ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও তার সঙ্গে আরবি কবিতা, ফেকাহ, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা পেয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানরা মক্তব, মাদ্রাসার বাইরে এসে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেনি বা সুযোগ পায়নি। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল মানুষরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে। শাসক শ্রেণীও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ‘উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে একটু একটু করে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে,সমাজে একক নেতৃত্ব না থাকলে জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে দাবি-দাওয়ার কণ্ঠ উচ্চারিত হয়। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং জ্ঞান-শিক্ষা-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলা ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমান স্বীয় জাতিসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে

সক্ষম হয়। গ্রন্থ,পত্র- পত্রিকা, সভা-সমিতি-আঞ্জুমান প্রভৃতি সমকালের সব ধরনের মাধ্যমকে গ্রহণ করে জাতির জাগরণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ পর্ব ছিল বাংলার মুসলমানের বিভ্রান্তি ও মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে ওঠার পর্ব। এক্ষেত্রে তারা আংশিক সফলতাও অর্জন করতে সক্ষম হয়।[১২] আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় যদিও তার সফলতা উনিশ শতকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও বিশ শতকে তার বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই শতকের প্রথমে স্ত্রীশিক্ষায় বাঙালীদের মধ্যে বেগম রোকেয়ার সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয় ।

'সুবেহ সাদেক' প্রবন্ধে রোকেয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত রেখেছেন, 'অন্ততঃপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে ! শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা— যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা,আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে ! শিক্ষা— মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি—দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে ! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।'[১৩] শিক্ষার এই সার্বিক চিন্তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য যুক্ত করা যায়, 'যে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণ সমূহের প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে; তাহা স্ত্রীশিক্ষা পদবাচ্যই নহে।'[১৪]

রোকেয়াও স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর সার্বিক বিকাশের সঙ্গে নারীজনোচিত গুণের বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের লক্ষ্য এক হলেও বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত তা ছিল নারীজনোচিত গুণের বিকাশ। তখন চাকরি এবং উপার্জনের দিকটি নারীর ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেনি। ফলে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উনিশ শতকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা অসাধারণ গুরুত্ব পাওয়ার ফলে প্রাচ্য ধারার শিক্ষা হয়েছে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। এই উপেক্ষা শিক্ষা এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির (ভারতীয়দের) অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। রোকেয়া বলেছেন, 'Although India must learn many lessons from the West, to impose on it the western system without modifications to make it suitable to us is a huge mistake. India must retain the elements of good in her age old traditions of thought and methods. It must retain her social inheritance of ideas and emotions, while at the same time by incorporating that which is useful from the West a new educational practice and tradition may be evolved which will transcend both

that of East and the West.'[১৫] তাঁর এই আদর্শ সাখাওয়াত স্কুলেও অনুসরণ করা হত।

তাঁর জীবৎকালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষকা এম ফাতেমা খানম মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর স্কুলে তফসির সহ কোরান পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, পার্শী, হোম নার্সিং,ফার্স্ট-এড্ রন্ধন,সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।'[১৬] 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের তারিণী- 'ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র- সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্ম্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম- নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎজীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।'[১৭]

তারিণী-ভবনের 'নারী- ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি'তে কুমারী, সধবা, বিধবারা 'বিবিধ সূচীকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন,পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রীর পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগী-সেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এই বিভাগে তারিণী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী এবং আতুরাশ্রমের জন্য নার্স প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারী-পীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধ-বিতরণ এবং রোগী সেবা করিতে গিয়া থাকেন।'[১৮] উনিশ শতকে কলকাতায় নবজাগরণের পুরোধারা পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ করে, প্রাচ্যশিক্ষার ধারাকে অবজ্ঞা করে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে মহার্ঘ করে এবং বহুদিনের অর্জিত প্রাচ্যশিক্ষার ভাল গুণগুলিকে উপেক্ষা করে যে ক্ষতি করেছিলেন, রোকেয়া বিশ শতকে তাঁর শিক্ষাচিন্তাতে সেই পথে অগ্রসর হননি। তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য ধারার মেলবন্ধন করে নূতন ধারায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষাচিন্তা করেছিলেন এবং তার প্রয়োগ করেছিলেন নিজের বিদ্যালয়ে। এখানেই তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য নিহিত ছিল।

তথ্য-নির্দেশ :

১. পরমেশ আচার্য, বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাচিন্তা : উনিশ শতক, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি,কলকাতা, ২০০৩,পৃ.২২৮–২২৯।

২. অশোক সেন, বাংলার অর্থনীতি, বাঙালির উনিশ শতক, তদেব, পৃ.৫২।

৩. অনাথনাথ বসু, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৩, পৃ.১৯।

৪. তদেব, পৃ.১০-১১।

৫. T.B. Macaulay, Minute dated 2 January 1835, in, H. Sharp, selections from Educational Records, part- 1, 1781-1889 (calcutta, 1920).

৬. অনাথনাথ বসু, তদেব, পৃ.২০-২১।

৭. পরমেশ আচার্য, তদেব, পৃ.২৪৯।

৮. যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃ.৪৮।

৯. অসিত বরণ মুখোপাধ্যায়, শহর চুঁচুড়া, নবারুণ প্রেস, কলকাতা,২০০২,পৃ.৮৬ ।

১০. যোগেশচন্দ্র বাগল, তদেব, পৃ.২১।

১১. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার মুসলমানের চিন্তা-ভাবনার জগৎ-উনিশ শতক, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, তদেব, পৃ-২২৬।

১২. তদেব, পৃ.২২৬।

১৩. মীরাতুন নাহার, সুদক্ষিণা ঘোষ, সুনীল পাল ও মানস জানা সম্পাদিত, রোকেয়া রচনা সংগ্রহ, তদেব, পৃ.৪৩৪।

১৪. স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতীয় নারী, উদ্বোধন, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ.৮৬।

১৫. মীরাতুন নাহার, তদেব, পৃ.৫০১-৫০২।

১৬. এম ফাতেমা খানম, বেগম রোকেয়া, সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন স্মারক গ্রন্থ, বুলবুল, ঢাকা, ২০০২, পৃ.১৮।

১৭. মীরাতুন নাহার, তদেব, পৃ.২০৬।

১৮. তদেব, পৃ.২০৬।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলার বাবু সংস্কৃতি ও দুর্গোৎসব

সন্দীপ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ, কোলকাতা

সারাংশ : ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একটি বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক প্রেক্ষিতে অবিভক্ত বাংলায় দুর্গাপূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই ধর্মীয় সামাজিক অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায় পারস্পারিক বিরোধ ভুলে একটি অখণ্ড সমাজ গঠন করতে পারেনি। এর জন্য দায়ী ছিল উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধতা। তদুপরি ইংরেজ আগমণের পূর্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই ছিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসক। এই শাসনের অবসান ঘটিয়েই বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইসলাম পন্থীদের সাথে কোন প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সপ্তদশ শতকের প্রথমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সহ অন্যান্য বিদেশি বণিকদের সঙ্গে বাংলার কিছু ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে জন্ম নিয়েছিল কিছু ধনী হিন্দু ব্যক্তি বা সম্প্রদায় আবার ব্রিটিশদের সাহচর্যে গড়ে ওঠে জমিদার -তালুকদার শ্রেণী; এদের সহযোগী হিসেবে দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি ও দেওয়ানদের নিয়ে বাংলায় গড়ে ওঠে বাবু বা জেন্টু শ্রেণী। নতুন এই উত্থিত শ্রেণীর আদর্শহীনতা, চারিত্রিক শৈথিল্য, পরধর্ম বিদ্বেষ এবং ব্রিটিশের মুসলমান বিরোধী দ্বি-জাতি তত্ত্বের পটভূমিতেই সপ্তদশ শতক থেকে বাবুদের হাত ধরে দুর্গাপূজা ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। উল্লেখ্য হিন্দুদের স্বকীয়তা রক্ষার দাবিকে কেন্দ্র করেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি পারিবারিক দুর্গোৎসব প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এই দুর্গোৎসব গুলি ভক্তিভাব ব্যতিরেকে শূন্যগর্ভ সামাজিক মর্যাদা, ইংরেজ চাটুকারিতা এবং শ্রেণীগত দলাদলির আখড়ায় পরিণত হয়.সময়ের বিবর্তনে ইংরেজ সমর্থন হীনতার কারনে পারিবারিক উৎসবের পাশাপাশি বারোয়ারি দুর্গাপূজার উদ্ভব ঘটে।
শব্দসূচক : বাবু, কোম্পানি, রাজবাড়ি, দুর্গোৎসব, নৃত্যগীত, সংস্কৃতি, বারোয়ারি।

প্রচলিত একটি মত অনুযায়ী আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মনুসংহিতার টিকাকার কল্লুকভট্ট গৌড়-বঙ্গের রাজশাহী জেলার তাহিরপুরে রায় বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের সাম্প্রদায়িক রীতিতে বিশ্বাসী শ্রেষ্ঠ শাসক তথা আকবরের সমসাময়িক ও সমদর্শী নীতিতে বিশ্বাসী কংসনারায়ন পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বা ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম মাটির প্রতিমায় দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেছিলেন। নিজ জমিদারির বিস্তার এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রায় বংশের বিখ্যাত তান্ত্রিক পন্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর

পরামর্শে শাস্ত্রীয় রাজসিক যজ্ঞের (বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ, গোমেধ) পরিবর্ত হিসাবে রাজসিকভাবে দুর্গোৎসব যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন[১]।শোনা যায় তখনকার দিনে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে তিনি এই উৎসব করেছিলেন। সমাজের উচ্চাসনে আসীন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের নির্দেশে এক ভূস্বামীর দ্বারা মহাযজ্ঞের পরিবর্ত রূপে প্রবর্তিত দুর্গাপূজা প্রথম থেকেই উৎসবের আকার নিয়ে সেদিনের সামন্ততন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। কংস নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহী জেলার ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎনারায়ণও প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাসন্তী উৎসব পালন করেছিলেন[২]। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সেদিনের রাজা ভোজের পারিবারিক উৎসবই ইতিহাসের পথ বেয়ে বাবুদের হাতে এবং আরো বিস্তৃত হয়ে বারোয়ারি তথা বর্তমানের সর্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলি তীরের সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে তিনটি গ্রামে ইজারা নেওয়ার সূত্রে বাংলার সাথে পাকাপাকি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য তার আগে ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, বণিকদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে জন্ম নিয়েছিল কিছু ধনী হিন্দু। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজদের দেশের শাসক শ্রেণীতে উত্তরণ এবং তাদের শাসন ও শোষণকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে একদিকে তৈরি করে নতুন জমিদার-তালুকদার শ্রেণী, অন্যদিকে দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি (বেনিয়ান) ও দেওয়ানদের নিয়ে এক 'বাবু বা জেন্টু' শ্রেণী গড়ে ওঠে। এই নতুন জমিদারদের বা জেন্টুদের সঙ্গে কোম্পানির কর্মচারীদের গড়ে ওঠে এক অশুভ আঁতাত। এই নব উত্থিত হিন্দুদের আদর্শহীনতা, চারিত্রিক কলুষতা, পরধর্ম বিদ্বেষ এবং ইংরেজদের মুসলমান বিদ্বেষের পটভূমিতেই সপ্তদশ শতক থেকে দুর্গাপূজা বিস্তার লাভ করতে থাকে। হিন্দুদের স্বকীয়তা রক্ষার দাবী এবং ব্রিটিশদের মোসাহেবির জন্যই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বেশ কিছু পারিবারিক দুর্গোৎসব প্রচলিত হয়েছিল।

আনুমানিক ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির আমলে প্রথম দুর্গাপূজাটি হয়েছিল কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষীকান্ত মজুমদারের হাতে। এই পরিবার থেকেই গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা গ্রামের ইজারা নিয়ে বাংলায় বাণিজ্য সনদ লাভ করেছিল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি। এর আগে অবশ্য ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজা করেছিলেন[৩]।তার উত্তর পুরুষ নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় একাধিক পূজা পার্বণের সূত্রপাত করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো করেছিলেন তাই নয়, অন্য ভূস্বামীদেরও এই পূজা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রায় পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা পুরুষের পোশাকে অস্ত্র নিয়ে যোদ্ধার বেশে সিংহরূপী বাহনের উপর দাঁড়িয়ে থাকতেন। পুজো উদ্বোধনের অংশ হিসেবে কামানের গোলা ফাটানো হতো। ১০৮টি পদ্ম দিয়ে দেবীকে অকালবোধনের রীতি অনুসরণ করে প্রতিমা নির্মাণ করা হতো ১০৮ মণ মাটি দিয়ে। সপ্তমীর দিন ১০৮

টি ঢাকের বাদ্য এবং ১০৮ টি পাঠাবলি দিয়ে পূজা সম্পন্ন করা হত। শেষে ১০৮ টি গাড়ি নিয়ে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাচ দেখানোর (বাঈজি নাচ) ব্যবস্থাও করেছিলেন[৪]।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির জয়লাভে শোভাবাজারের তালুকদার নবকৃষ্ণ দেব বিজয় উৎসব পালন করেন এবং সেই উপলক্ষে তার বাড়িতে ঠাকুর দালান প্রতিষ্ঠিত হয়। নবকৃষ্ণ দেব প্রবর্তিত এই দুর্গাপুজোয় লর্ড ক্লাইভ ঝুড়ি ভর্তি ফল, কিছু টাকা এবং বলির জন্য একটি পাঠাও উপহার দেন। রাজবাড়ির এই উৎসবে মোট ১০০১ টি পশুবলি হতো এবং কামানের গোলার শব্দে শুরু হত সন্ধিপূজা। এই উৎসবে কোম্পানির কর্মচারীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ থাকতো। তাদের জন্য আলাদা খানা-পিনা ও বিভিন্ন দেশের নাচ সহ অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা থাকত।উইলিয়াম কেরি রাজা নবকৃষ্ণের দুর্গোৎসব সম্পর্কে লিখেছিলেনঃ “The Majority of Company Crowded to Raja Nabakissen’s Where Several mimics attempted to imitate the manners of different nations.”[৫] ইংরেজ প্রভাবিত বাবু সংস্কৃতি এবং তাদের দুর্গোৎসব এক অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল; আর এই উৎসবে ইংরেজদের আমন্ত্রণ এবং তাদের সোৎসাহ যোগদানই তার বড় প্রমাণ। ইংরেজ ভূস্বামী J. H Holwell তাঁর Important Historical Events, 1766-এ লিখেছিলেনঃ “Durga Puja is the grand general feast of the gentos, usually visited by Europeans (by invitation) who are treated by the proprietor of the feast with fruits and flowers in season, and are entertained a every evening while the feast lasts, with bands of singers and dancers”. মনে হয় ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস-হলওয়েলের যুগে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ, আন্দুলের রাজা রামচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ প্রমুখের পারিবারিক দুর্গোৎসব "গ্র্যান্ড ফিস্ট অফ দি জেন্টুস" এ পরিণত হয়েছিল[৬]।

উত্তর কলকাতার ভূস্বামী গোবিন্দ কুমার মিত্র কুমোরটুলিতে যে দুর্গো উৎসবের অনুষ্ঠান করতেন তার আয়োজন শুরু হতো ১৫ দিন আগে থেকেই। আভিজাত্যের প্রকাশ স্বরূপ দেবীকে স্থাপন করা হত রুপোর সিংহাসনে। নিমন্ত্রিতদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকতো এলাহী পানভোজন ও গানের আসর। জোড়াসাঁকোর কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ী শিবকৃষ্ণ দাঁ তার দেবিপ্রতিমা সাজাতেন প্যারিস থেকে আনা পান্না জড়ানো অলংকার দিয়ে। মহারাজা সুখময় রায়ের দুর্গোৎসব সম্পর্কে তৎকালীন সময়ের Culcutta Chronicle থেকে জানা যায়, সাহেব মেমদের খুশি করার জন্য ইংরেজি সুরে ভারতীয় সংগীত পরিবেশনের চেষ্টা করা হতো[৭]। নব্য বাবুদের এই দুর্গোৎসব প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই পান-আহার ও বাঈজি নাচের উৎসবে পরিণত হয়েছিল। বাবুদের পরস্পরের অর্থ কৌলিন্য প্রদর্শন করার, সামাজিক মর্যাদা লাভের উপায় এবং

দলাদলির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দুর্গাপূজা। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র গোপী মোহনও পিতার মতো আড়ম্বর সহকারে দুর্গোৎসব পালন করতেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তার 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন পূজার শেষ অর্থাৎ নবমীর দিন আয়োজন থাকতো বাঈ, খেমটা, কবিগান ও কীর্তনের। এমনকি মেডেল পাওয়া শহরের বড় বড় বাঈজিরা ও খেমটাওয়ালিরা সেদিন দুর্গাপূজার আসর জমাতেন[৮]।

বাংলার দুর্গাপূজা যেহেতু তন্ত্রমতে সম্পন্ন হত, সে কারণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এই পূজায় অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের বাবুদের দুর্গাপূজা উপলক্ষে সবার নিমন্ত্রণ থাকলেও স্থানীয় মানুষদের দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণের, এমনকি পূজাবাড়িতে অনুপ্রবেশের অনুমতি পাওয়া যেত না। অনেক সময় তাদের অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হত। শোভাবাজার রাজবাড়িতে বারোদিন ধরে দুর্গোৎসব চলাকালীন সকলের নিমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও পূজার তিন দিন যখন ইংরেজদের নিমন্ত্রণ থাকতো তখন সাধারনের প্রবেশাধিকার ছিল খুবই নিয়ন্ত্রিত। দেব পরিবারের পূজায় ইংরেজদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যান্ডি, শেরি, শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা থাকত। সেখানে কিছু বাঙালি হয়তো নিমন্ত্রিত থাকতেন। কিন্তু ইংরেজদের ভোজনের সময় তাদের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ। যদি কেউ ভুল করে এসেও পড়তেন তাহলে তার কপালে জুটত চূড়ান্ত অপমান, অনেক ক্ষেত্রে মার[৯]। সাধারণের অংশগ্রহণ বলতে কুমোর, মালাকার, ঢুলি, ও অন্যান্য কারিগর। যাদের ছাড়া পূজা সম্ভব ছিল না। তবে সম্মান ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণের।

পারিবারিক দূর্গাপূজা একসময় কলকাতা ছাড়িয়ে পাশের জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমোদ প্রমোদের প্রকৃতি সেখানেও প্রায় একই রকম ছিল। এই বাবুরা চূড়ান্ত মত্ততার সাথে শুধু দুর্গাপূজাই করতেন না, আমোদ প্রমোদের বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করে সে খবর সকলকে জানাতেন। যেমন, হুগলির চুঁচুড়ার বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার ১৮২৭ সালে ২০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে Government Gazette পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সকল সাহেব-মেম ও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জানিয়েছিলেন, 'যারা নিয়ন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন এবং যারা পাননি, সকলেই যেন তার বাড়িতে ২৭ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশাল নৃত্য উৎসবে (Grand Nauch) যোগদান করেন। বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষ সবাইকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে তাদের জন্য টিফিন, ডিনার ও সুরাপানের উত্তম বন্দোবস্ত থাকবে [১০]। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসা এই নতুন ধরনের হিন্দুরা মদ খাওয়াকে উচ্চতর সংস্কৃতির অঙ্গ বলে মনে করত এবং দুর্গোৎসবেও তাই তারা সুরার বন্যা বইয়ে দিতে দ্বিধা করত না। ব্রিটিশদের তাবেদারি, দেওয়ানগিরি ও মুন্সিগিরি করে হঠাৎ ধনী হওয়া এইসব বাবুরা তাদের প্রভুদের খুশি করার উপায় ছিল দুর্গাপূজায় মদ্যপান ও নৃত্যগীতের আয়োজন করা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি একটি

হিসাব অনুযায়ী কলকাতা শহরের দুর্গোৎসবে ব্যয় হতো ৫০ লক্ষ টাকা এবং পাঠা বলি হতো হাজারেরও বেশি[১১]।

বাবুদের পারিবারিক দুর্গোৎসবে সাধারণ মানুষের যথাযোগ্য সম্মান ও যোগদানের সুযোগ না থাকার কারণে ১৭৯০ সালে বারো জন ব্রাহ্মণ মিলে নিজেদের চাঁদা তুলে শান্তিপুর এর কাছে গুপ্তিপাড়ায় দুর্গাপূজার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবেই সূচনা হয় বারো-ইয়ারি বা বারোয়ারি দুর্গাপূজার[১২]। সাধারণ হাটের ব্যবসায়ী বা মহাজনরাই ছিলেন এই পুজোর উদ্যোক্তা। সারা বছর ধরে অল্প অল্প টাকা জমিয়ে তারা এই আনন্দ উৎসবের আয়োজন করতেন। তাতে তারা ধনী পরিবারের আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক সময় এঁটে উড়তে পারতেন না। এ যেন পরবর্তীতে জাতীয় কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর(নরমপন্থি ও চরমপন্থি) দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-য় এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। বারোয়ারি তলায় সারারাত ধরে বাঈজি, খেমটা ও গাঁজার আসর চলত। সেই সঙ্গে থাকতো নানান রকম আখড়াই, হাফ-আখড়াই, সঙ ও যাত্রাপালার ব্যবস্থা[১৩]। নানা স্থানের ধনী মানুষরা বাজরা, পিনসে, নৌকা ভাড়া করে এই সঙ ও যাত্রাপালা দেখতে আসতেন। বিভিন্ন বারোয়ারি পুজোয় ছিল পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কোথাও প্রতিমার আকার নিয়ে, সঙ নিয়ে কোথাও যাত্রাপালা নিয়ে আবার কোথাও চুরুট, গাঁজা খাওয়ার আসর নিয়ে। একটি বারোয়ারি তলায় চুরুট, তামাক ও চরসের ধোঁয়ায় এমন অন্ধকার হয়ে যায় যে আধঘন্টা প্রতিমা দেখা যায়নি।[১৪]। এই সমস্ত বারোয়ারি পুজোয় ছোট ব্যবসায়ীরা প্রধান উদ্যোক্তা হলেও অনেক ধনী ব্যক্তিরাও সহযোগিতা করতেন। এরকম কয়েকজন ছিলেন বীরকৃষ্ণ দাঁ, অহেরীটোলার রাধামাধব দত্ত প্রমুখ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিসর্জনের সময় সেকালের শবরজাতির শবরোৎসবের অনুকরণে সারা গায়ে কাদা মাটি মেখে অশ্লীল গান ও বাদ্যের সাথে সাথে নানা রকম কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গি করে নৃত্যের প্রচলন ছিল। বঙ্গদেশে রচিত ‘বৃহদ্ধর্ম পুরান’-এ এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। মনে হয় বাংলার জমিদারতন্ত্রের সাথে জড়িত রাজসিকভাবে অনুষ্ঠেয় দূর্গাপুজায় নিম্ন জাতীয় মানুষের কৃষ্টিকে কিছুটা যুক্ত করে এই পূজার দিকে তাদের আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। প্রতিমা বিসর্জনের সময় যে বিসদৃশ নাচ ও সিদ্ধি খাওয়ার প্রচলন আছে তাও এই বাবু সংস্কৃতির ফেলে আসা রীতি বলেই মনে হয়। তাছাড়া বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে যাওয়া নিয়ে বিধিনিষেধ আরোপ[১৫] সে সময়ের সামাজিক অসাম্যের দিক নির্দেশ করে। নতুন আমদানি হওয়া এই বাবু সংস্কৃতিতে নৃত্য গীতের ভূমিকা সম্বন্ধে সেকালের পত্র পত্রিকাতেও কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৫৪ সালের ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর বর্ণনা অনুযায়ী ‘শোভাবাজারস্থ নৃপতি দিগের উভয় নিকেতনে নৃত্যগীতাদির মহাধুম হয়েছিল, সাহেবরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন’। আর জোড়াসাঁকো নিবাসী বাবু নবকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে দেবী পূজায় ‘নাচের মজলিস দর্শনের দর্শক মাত্রেরই চিত্তক্ষেত্র পুলকালোকে পরিদীপ্ত

হইয়াছিল, গায়িকা গনের তানমান শ্রবণ ও সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গিমা দর্শনে অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন, বিশেষত মধ্যে মধ্যে রণবাদ্যবৎ চিত্ত প্রফুল্লকর ইংলেন্ডীয় বাদ্যবাদন হইবায় সকলেই এক একবার মহাআনন্দ অনুভব করিয়াছেন[১৬]। অর্থাৎ উনিশ শতকে দুর্গোৎসব হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক মর্যাদা, ধন-ঐশ্বর্য প্রদর্শন এবং মদ ও নারীসঙ্গ বিনোদনের বিরাট মাধ্যম।

১৮১৩ সালে কোম্পানিকে দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের নতুন সনদ আইন অনুসারে মিশনারীরা এদেশে বসবাস ও খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হলে মিশনারিরা এদেশে আসতে শুরু করেছিল, পাশাপাশি কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা হিন্দু ধর্মের সমর্থনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ দেখা যায়। এই প্রতিবাদের অন্যতম বিষয় ছিল হিন্দুদের দুর্গোৎসবে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান, হিন্দু উৎসব উপলক্ষে দুর্গ ও জাহাজ থেকে কামান দাগা, হিন্দু উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রায় সামরিক বাদ্য বাজানো নিষিদ্ধকরন[১৭]।এই প্রতিবাদের ফলস্বরূপ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের দুর্গোৎসবে ইংরেজি কর্মচারীদের যোগদান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে যায় কোম্পানি কর্মচারীদের তাবেদারি করে হঠাৎ ধনী হওয়া এই বাবুরা যেভাবে দুর্গোৎসব উপলক্ষে জলের মতো অর্থ অপচয় করতেন বনেদিয়ানা দেখানোর জন্য তাতে অনেকেই শীঘ্রই দেউলিয়া হয়ে যান। যেমন চুঁচুড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদার যিনি অর্থ জালিয়াতির অভিযোগে শাস্তি পান এবং তাকে দিপান্তরে পাঠানো হয়। ধনীদের এই অর্থ ক্ষয়ের সাথে সাথে পারিবারিক পূজাও সংকুচিত হয়ে নব সংস্করণ রূপে সার্বজনীন দুর্গাপূজা দেখা যায়। ১৯১০ সালে প্রথম ভবানীপুরে এইরকম সার্বজনীন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে রামতনু মিত্র লেন, সিকদার বাগান সর্বজনীনের হাত ধরে ক্রমশ সর্বজনীন দুর্গাপূজা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে বর্তমানেও পারিবারিক দুর্গাপূজা টিকে থাকলেও পূর্বের আড়ম্বরের পরিবর্তে সংস্কার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়।

তথ্যসুত্র :

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৩৫০।

২. বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩১২।

৩. কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, দুর্গাপূজা ও কালীপূজাঃ ইতিহাসে দর্পণে, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৮০।

৪. বিমলচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাপূজাঃ সেকাল থেকে একাল, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইন্সিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড কালচার, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা-১৯১-১৯২।

৫. বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩১০।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৩১১।
৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, মাঘ, ১৩৮১, পৃষ্ঠা-২৭৮।
৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, প্রথম ভাগ; কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, চিরায়ত সাহিত্য সংগ্রহ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৩২।
৯. Sudeshna Banerjee, Durga Puja, Rupa and Company, 2004, page-44.
১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃষ্ঠা- ২৭৮।
১১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃষ্ঠা- ২৭৯।
১২. কল্যাণী বন্দোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা- ৮০।
১৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঐ পৃষ্ঠা- ২৩।
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬ ও ১৮।
১৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, দ্বিতীয় ভাগ, ঐ, পৃষ্ঠা- ৯৬।
১৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, আধুনিক যুগ, পৃষ্ঠা- ২৭৯।
১৭. ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা- ১৮৮।

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্প : নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনদর্পণ

শর্মিষ্ঠা জোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ত্রিবেনিদেবী ভালটিয়া কলেজ, রাণীগঞ্জ

সারসংক্ষেপ : দিব্যেন্দু পালিতের জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। নাগরিক মধ্যবিত্তের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি ষাটের দশকের অস্থির সংকটময় সময়ের সাহিত্যিক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নাগরিক মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব ছিল সঙ্কটে জর্জরিত। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সঙ্কট সবকিছু মধ্যবিত্তের জীবনে নিঃশব্দ পালাবদল ঘটায়। সেই পালাবদলের নিখুঁত চিত্র তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তের আর্থিক সমস্যা, অন্তর্মনের টানাপোড়েন, মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁর 'চিলেকোঠা', 'গন্ধের আবির্ভাব', 'তেজস্ক্রিয়', 'বাবা' প্রভৃতি গল্পে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে।
সূচকশব্দ : দিব্যেন্দু পালিত, নাগরিক মধ্যবিত্ত, আর্থিক সঙ্কট, মূল্যবোধের অবক্ষয়, উদ্বাস্তু।

মূলত ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। এই সময়ই আবার মধ্যবিত্তের ক্রমবিবর্তনের চরম সঙ্কটের কাল। এরা খুব বিত্তশালী নয় আবার একেবারে বিত্তহীন না। ১৯৪৩ এ মন্বন্তর, ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এরপর ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা লাভ ও দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট হয় উদ্বাস্তু সঙ্কট। এইসব ঘটনা মধ্যবিত্তের জীবনকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল। তাদের জীবনে দেখা দিয়েছিল নানা সঙ্কট ও বিপন্নতা।

দিব্যেন্দু পালিত এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টালমাটাল সময়ের গল্পকার। তাঁর কথায়,

> "এক অর্থে সেটা ছিল মোহভঙ্গের সময়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের চাপে মানুষও বদলাতে শুরু করেছে ততদিনে। উদ্বাস্তুরা থিতু হতে না পারায় বদলে যাচ্ছে বাঙালির শ্রেণি-চরিত্র। একান্নবর্তী পরিবার ভাঙছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ দৌড়চ্ছে উচ্চবিত্ত হওয়ার লক্ষ্যে, আর একটি অংশ যুঝছে নিম্নবিত্তে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে। বাড়ছে রাজনৈতিক চেতনা ও শহুরে হয়ে ওঠার প্রবণতা। অনন্যোপায়তা থেকে জীবনযাপন ও

> স্বনির্ভরতার নতুন স্বাদ পেতে সংস্কার ভেঙে প্রকাশ্য হচ্ছেন মেয়েরাও। চারদিকে অন্যরকম হওয়ার হাওয়া বাঙালি প্রোডাক্ট চিনছে, শিকছে ফ্যাশান, বিজ্ঞাপন তাদের শেখাচ্ছে অন্যরকম হতে।"[১]

সামাজিক এই পটপরিবর্তন, অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের ফলে মধ্যবিত্তের জীবনে দেখা দেয় দারিদ্র্য অনিশ্চয়তা, অস্তিত্বের সঙ্কট, মূল্যবোধের রূপান্তর। দিব্যেন্দু নাগরিক মধ্যবিত্তকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। মধ্যবিত্তের নানাবিধ সঙ্কট, মূল্যবোধের রূপান্তর, দোলাচলতা দিব্যেন্দুর একাধিক গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশবিভাগ নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। দেশবিভাগের ফলে দেখা দেয় উদ্বাস্তু সঙ্কট। ষাটের দশকের (১৯৫২-৫৩) খাদ্য সঙ্কট, উদ্বাস্তু সমস্যা ও ভিখিরির সংখ্যা বৃদ্ধিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়। দিব্যেন্দুর 'চিলেকোঠা', (১৩৭১), 'গন্ধের আবির্ভাব'(১৩৮১) গল্পে বিপর্যস্ত সমাজ, দৈনন্দিন বাজারের চেহারা ও মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের নানা সঙ্কটের ছবি উঠে এসেছে। 'চিলেকোঠা' গল্পটি প্রথম 'দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি খাদ্য সঙ্কটের পটভূমিকায় রচিত। কিছু স্বার্থপর, মুনাফালোভী মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাল গুদামজাত করে খাদ্যসঙ্কট তৈরি করে। ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে চরম দুর্ভোগ দেখা দেয়। মানুষের দিন কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়। কখনো শূন্য থলি নিয়ে বাজার থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। আলোচ্য গল্পে লীলা বসন্তের স্ত্রী। সে সকালে কাগজে পড়ে, সরকারি ব্যবস্থায় দোকানে চাল পাওয়া যাবে। তারই কথায় সাতসকালে উঠে চালের সন্ধানে বাজারে গিয়েছিল বসন্ত। কিন্তু কোথায় চাল? বসন্ত চাল না পেয়ে ক্ষুব্ধ, হতাশ হয়ে রিক্ত হাতে বাড়ি ফেরে। পরে বসন্ত হারানের কাছে জানতে পারে, মানিক দুবস্তা চাল পাচার করে তাদেরই চিলেকোঠায় রেখেছে। দিব্যেন্দুর বর্ণনায় বসন্তর মনোভাব,

> "যেন অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কিছু শুনছে, সেইভাবে দুপায়ে উঠে দাঁড়াল বসন্ত। নিঃশ্বাস বন্ধ।"[২]

রাগে, ক্ষোভে বসন্তর রগের দুপাশে টিপটিপানি শুরু হয়। যে চালের জন্য সকালে হন্তদন্ত হয়ে বাজারে ছুটেছিল সেই চাল তাদেরই চিলেকোঠায় মজুত আছে। বসন্ত পুলিশে খবর দিতে উদ্যোগী হয়। হারান তাকে বাধা দেয়। হারান স্বীকার করে,

> "সকালে মানিকের কাছে গিয়েছিলুম। আমিও চাল এনেছি। পুলিশে জানলে মানিক আমাদের ফাঁসাবে।"[৩]

বসন্ত হারানকে চাল ফেরত দিতে বললে সে জানায় চাল তার ভাগ্নেকে দিয়ে দিয়েছে। দিব্যেন্দুর বর্ণনায় বসন্তর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"বসন্ত থ মেরে গেল। হারান মিথ্যে বলছে না তো! রাগে, সন্দেহে মাথায় খুন চেপে গেল বসন্তর। দু-পা হেঁটে হারানের মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর হারানকে সুদ্ধ নিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল তক্তপোশে। পুরো একটা বস্তা উঁকি দিচ্ছে তক্তপোশের নীচে!"[৪]

বসন্ত চালের বস্তা টানতে গেলে হারান তার পা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আদর্শবান বসন্ত হারানকে 'শালা চোর' বলে লাথি মারে।

এই গল্পে শম্ভু ও হারান মানিকের এই অন্যায়, দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করেছে। তারা নিজের নিজের ভাগ বুঝে নিয়েছে। অভাব, অন্নচিন্তার অভিঘাতে শম্ভু, হারানের মতো অধিকাংশ মধ্যবিত্তরা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিবেককে বিসর্জন দিয়েছে। বসন্ত এই দুর্দিনেও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে প্রস্তুত নয়। বসন্তর মধ্যে লেখকের নিজস্ব ভাবনা, মূল্যবোধ, প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে দিব্যেন্দুও অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন। আলোচ্য গল্পে গল্পকার বসন্তর মাধ্যমে দুর্নীতির কারবারীদের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন। রাজনীতির নেতাদের ওপর বসন্ত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এই গল্পে রাজনীতির প্রতিনিধিদের প্রতারণা, নীতিহীনতা ও রাজনীতির অসারতা এবং মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কথা তিনি নিরাসক্তভাবে বয়ন করেছেন। বসন্ত রাজনীতির জটিলতার কথা বোঝে না। কিন্তু সে ভালো করে জানে,

"রাজনীতির কারবার একই সময়ে মানুষকে নিয়ে ও বাদ দিয়ে।"[৫]

কিংবা

"রাজনীতিতে সবাই মাসতুতো ভাই। ক্ষমতা যাদের হাতে তারা করছে অপব্যবহার।"[৬]

আমরা জানি রাজনীতির প্রতিনিধিরা ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাতে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করে। ক্ষমতা লাভের পর সেই মানুষদেরই ভুলে যায়। বসন্ত ভাবে সাধারণ মানুষ কাকে বিশ্বাস করবে? রাজনীতির, পার্টির লোক সবাই সমান, কেবল নিজেদের স্বার্থ বোঝে। এ যেন 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'।

আর্থিক সঙ্কট, উদ্বাস্তু সমস্যা থেকে পরিণতিতে একজন মধ্যবিত্ত নাগরিক কিভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে তারই মর্মন্তুদ কাহিনী 'গন্ধের আবির্ভাব' (১৩৮১)। গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্তের একটা বড়ো সমস্যা যে বাজার, সেই বাজারের চেহারা উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পে। পরিমল এক অসহায় মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী নাগরিক। সে সেকশান ইনচার্জ অফিসার। মাইনে সাতশো তেষট্টি টাকা। দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। বিলিংয়ের ইনচার্জ অফিসার বিমল মুখুজ্জ্যে,

পরিমলের সহকর্মী। গল্পকার বিমলের জবানিতে বর্ণনা করেছেন তৎকালে ভিখিরির ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি।

> ভিখিরি! বিমল বলল, দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিয়ালদার আশেপাশে দেখো! আমাদের ওদিকটা তো গিজগিজ করছে—”[৭]

জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। পরিমলের বর্ণনায় মধ্যবিত্তের সঙ্কটের কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

> “দিনকাল খারাপ, হু হু করে দাম বাড়ছে জিনিসপত্রের, বাঁধা আয়ে আর সংসার চালানো যাচ্ছে না। নিজেকে দিয়েই সে বুঝতে পারে ব্যাপারগুলো। দু-তিন মাস ধরে খুব হাত টেনে সংসার চালাচ্ছে প্রতিমা; না হলেই নয় এমন খরচ ছাড়া বাকি সবই বাদ দিয়ে যাচ্ছে। গত দুমাসে তারা একটাও সিনেমা দেখেনি, দুটো বিয়ের নেমতন্ন বাদ দিয়েছে অসুখের অজুহাতে। এক সেরের জায়গায় বাড়িতে এখন আধ সের দুধ রাখা হয়। সপ্তাহে পাঁচদিন একবেলা মাছ বা মাংস, অন্য বেলা নিরামিষ। সবই নিজেদের কষ্ট দিয়ে।”[৮]

মধ্যবিত্তের একটা অংশ এই দুর্দিনে পরিমলের মতো নানা উপায়ে নিজের সম্মান ও অস্তিত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর এক একটা অংশ বেঁচে থাকার জন্য বিবেক, সম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে অন্যকে প্রতারণার পথ বেছে নিয়েছে। পরিমলের সহকর্মী গিরিজাবাবু গতমাসে পরিমলের থেকে ছেলের মিথ্যা অসুখের কথা বলে ত্রিশ টাকা ধার নিয়েছিল। মাইনে পেয়ে টাকাটা শোধ করার কথা ছিল। গিরিজাবাবু সে কথা তো রাখেনি উপরন্তু চারদিন কথার খেলাপ করেছে।

> “একটা প্রেসক্রিপশন হাতে ভদ্রলোক এসেছিলেন তার কাছে—ছেলের অসুখ, টাকা নেই, কাল থেকে প্রেসক্রিপশন হাতে ঘুরছেন।”[৯]

পরিমল এমন সংবেদনশীল কারণে টাকা না দিয়ে পারেনি। সে বিয়ারার চেকে ত্রিশ টাকা দেয়। পরে নিখিল দাস তাকে বলে,

> “প্রেসক্রিপশনটা একবার দেখে নিলে ভাল হত না?... ওই ভাঁজ-করা কাগজ দেখিয়ে তিনজনের কাছে ধার নিয়েছে।”[১০]

পরিমল নিজের সহকর্মীর এমন প্রতারণায় বিস্মিত হয়। দুর্ভিক্ষ মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে কদর্যতায় ভরে তুলেছে। সৎকে শঠ, সরলকে প্রতারকে পরিণত করেছে। আর তাই গিরিজাবাবুর এরূপ আচরণে তার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে তার অসহায়তায় আমরা মর্মাহত হই। কেননা একজন শিক্ষিত বাবা কতটা বিপর্যস্ত হলে নিজের সন্তানের অসুখের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে টাকা ধার করে তা আমাদের অজানা নয়।

সকালে অফিসে এসেই পরিমল কোনো এক শরণার্থীকে দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করে। গিরিজাবাবুও ধারের টাকাটা এদিন দেয় না। সব মিলে তার আর্থিক সঙ্কটের চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। সে অফিস থেকে বেরিয়েই দেখে,

> "রুগণ একটা মানুষের কাঠামো, মুখ পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা, ... তাকে ঘিরে দুপাশে বসে আছে গোটা চারেক শিশু, বালক ও কিশোরী।... সাদা চাদরটার উপর কিছু পয়সা ছড়ানো।"[১১]

অন্নহীনতা, নিয়ত মৃত্যু এই মানুষগুলোকে হৃদয়হীন করেছে। স্বজনের মৃতদেহ নিয়ে তারা ভিক্ষায় বসেছে। পরিমলের মতো মধ্যবিত্তরাও আর্থিক সঙ্কটে সন্দেহপরায়ণ হয়েছে। তাই মৃতদেহ নিয়ে ভিক্ষার দৃশ্য দেখে তার সন্দেহ হয় মড়াটা সাজানো বলে। মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ এই দুর্দিনের ফসল। বিমল অবশ্য জানায়,

> "মানুষ মরে গেলে একরকম গন্ধ বেরোয়। আমি সেই গন্ধটা পেলাম।"[১২]

দিব্যেন্দুর সাহিত্যে গন্ধের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই গল্পে মরা মানুষের গন্ধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইসময়ে ভিখিরিদের দুঃসহতা এবং মধ্যবিত্তের অন্তর্মনের বিপর্যস্ততা চিত্রায়ণে। গল্পটি হয়েছে ব্যঞ্জনাময়। ভিখিরি ও মরা মানুষের গন্ধ পরিমলের মধ্যে একটা আতঙ্ক বা অব্যক্ত চাপ সৃষ্টি করে। ক্রমে তার জীবনকে নিঃসীম শূন্যতায় ভরে তোলে। সে বাড়ি এসে শোনে তার স্ত্রীর পেটিকোটটা চুরি হয়ে গেছে। গভীর রাতে স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তেও তার কানে আসে ভিখিরিদের আনুনাসিক স্বর। দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে শুধু পরিমল নয়, তার স্ত্রী প্রতিমাও জর্জরিত। সে যখন স্ত্রীর শরীরের গন্ধে ডুবে যাবার চেষ্টায় নিমগ্ন তখন প্রতিমা সাংসারিক অনটনের কথা জানায়।

> "এ টাকায় সংসার চলে না। কীভাবে চালাচ্ছি যদি জানতে।"[১৩]

পরিমল গভীর রাতে ঘরের জানলা দিয়ে দেখে ডাস্টবিনের কাছে নানা বয়সের কিছু মানুষকে। সে মরা মানুষের সেই গন্ধটাও অনুভব করে। ফলে একটা ভয়ার্ত অনুভূতি গ্রাস করে তাকে। ক্রমশ পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। মধ্যবিত্তের সংসার চালানো আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে। কলকাতায় ভিখিরির ঢল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক সঙ্কটকে ঘনীভূত করে তোলে। পরিমল বড়ো অসহায় বোধ করে। প্রতিদিনের দিনযাপন ছন্নছাড়া মনে হয়। সে যেন অমানবিক, মনুষ্যত্বহীন ও বিবেকহীন মানুষে পরিণত হয়। এক উদ্বাস্তু মহিলা তার ক্ষুধার্ত ছেলেটির জন্য একমুঠো খাবারের জন্য ভিক্ষা চায়। সে রূঢ়ভাবে বলে,

> "ওসব হবে না। যান, অন্য কোথাও দেখুন—"[১৪]

তার এমন রূঢ় কথার পরেও অসহায় মহিলা করুণ আর্তি জানায়,

> "ওভাবে বলবেন না, বাবা! হাতে নোয়া আছে, আমি ভদ্দর বাড়ির বউ। নেহাত বিপদে না পড়লে—"[১৫]

তার এই করুণ আর্তিতেও পরিমলের মনে ছোট্টো ছেলেটির প্রতি এতটুকু সহানুভূতি হয় না। তার এই রূপান্তরে প্রতিমাও অবাক হয়। নিজের স্বামীকে তার অচেনা লাগে। সে বলে,

> "কী জানি বাপু, তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ!"[১৬]

পরে পরিমল নিজেই অনুভব করে ঐ অসহায় মহিলার সঙ্গে এমন বর্বরোচিত আচরণ করা অনুচিত হয়েছে। আসলে সে যেন ওই মহিলা বা ভিখিরির মধ্যে নিজের ভবিষ্যতকে দেখে ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই ওই উদ্বাস্তু মহিলাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে সে যেন বিপদমুক্ত হবে এমনভাব দেখালো। তবে দিব্যেন্দু আশাবাদী, তিনি আশার আলো দেখিয়েছেন। পরিমলের মধ্যে এখনো বিবেকবোধ লোপ পায়নি। তাই সে নিজের দুর্ব্যবহারের জন্য আত্মগ্লানিতে ভোগে। সেদিন অফিসে গিয়ে আরো ভয়ঙ্কর খবর শোনে। বিমল জানায়,

> "হার্ডশিপের আলাউন্সের ডিম্যান্ডটা নাকি ম্যানেজমেন্ট নাকচ করে দিয়েছে। প্রোডাকশন কম, প্রফিট নেই। শুনছি ছাঁটাইও হতে পারে—"[১৭]

পরিমলের যেন পায়ের তলার মাটি ধ্বসে যায়। ক্রমবৃদ্ধির বাজারে ছাঁটাই হলে তারা খাবে কি? সে অর্থহীন চোখে বিমলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবলেশহীন চাহনি দেখে বিমল তার অসহায়তা অনুভব করে। সে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। বিমল বলে,

> "ওভাবে তাকাচ্ছ কেন! আগে হোক!"[১৮]

সমসাময়িক সামাজিক দুর্দশায় শুধু মধ্যবিত্তের আর্থিক সঙ্কট নয় আত্মিক সঙ্কটও ঘনীভূত হয়েছে। বিপর্যস্ত করেছে তার মননকেও। যার ফলে আলোচ্য গল্পে দেখি পরিমল মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গভীর রাতে ঘরের মধ্যেও সে মরা মানুষের গন্ধ পায়। সে ভীত-সন্ত্রস্ত গলায় স্ত্রীকে ভিখিরিদের আসার কথা বলে। সমসাময়িক ভিখিরি সমস্যা, আর্থিক সঙ্কটের অভিঘাতে পরিমলের বহির্জীবন ও অন্তর্মন বিপন্ন হয়েছে। সে যেন আসন্ন ভয়ঙ্কর সময়কে দেখতে পায়, যখন সবাই ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে। এমন নিষ্ঠুর নির্মম পরিণতির আশঙ্কায় সে একাকিত্ব, অসহায়তা অনুভব করে। দিব্যেন্দু সমাজের স্পন্দনকে, নাগরিক মধ্যবিত্তের বহির্জীবন ও অন্তর্মনের বিপন্নতাকে অপূর্ব দক্ষতায় বয়ন করেছেন পরিমল চরিত্রের মাধ্যমে। যেখানে প্রতিটি চরিত্র নিপুণভাবে সেই সময়ের মানসকে ধারণ করে আছে।

দারিদ্র্য, প্রয়োজন, ভালোভাবে বাঁচার তাগিদ মধ্যবিত্ত শ্রেণির নৈতিক অধঃপতন, মূল্যবোধের অবনমন ঘটায়। ধ্বংস ও ক্ষয়ের পথের যাত্রী করে তোলে তাদের। এমন এক গল্পের সার্থক দৃষ্টান্ত 'তেজস্ক্রিয়' (১৩৯৫)। এটি প্রকাশিত হয়

‘দেশ’ পত্রিকায়। গল্পটিতে রতন ও মায়া ট্রেনের কামরায় একটি মালিকহীন বস্তা দেখে। তারা ভাবে নিশ্চয় মোহর আছে তাতে। আর্থিক সঙ্কট, বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অপমান এবং মেয়েকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে বস্তাটিকে তারা বাড়ি নিয়ে যায়। তারা দেখে বস্তাটিতে একটি ধাতব ঘড়া আছে। সেই ঘড়ার মধ্যে পেন্সিলের মতো উজ্জ্বল চকচকে একটি পদার্থ রয়েছে। অভাববোধে জর্জরিত রতন ও মায়ার কাছে বেঁচে থাকার তাগিদটাই বড়ো হয়ে ওঠে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৈতিকতা বিসর্জন দেয় তারা। নগদ সাড়ে পাঁচশো টাকায় তারা ধাতব ঘড়াটি বিক্রি করে। রতন ভাবে এবার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে তারা তত্ত্ব দিয়ে আসতে পারবে।

> “মেয়েটা তা হলে বাড়ি ফিরবে। কাল বাইরে পর্যন্তও আসেনি, ভিতরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘বাবা, আবার আসবে তো?’ এসব ভেবে মায়ায় জড়িয়ে গেল রতন।”[১৯]

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার সময় রতন শোনে পুলিশ নিখোঁজ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান করছে। যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে আরো জানতে পারে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ,

> “...পঞ্চাশ না একশো গজের মধ্যে এলেই ক্যানসারে ধরবে।”[২০]

এই সমস্ত খবর শুনে সে বুঝতে পারে ধাতব ঘড়াটির মধ্যে থাকা উজ্জ্বল চকচকে পদার্থটি আসলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। যার দশ গজের মধ্যেই তারা ও তাদের ছেলেমেয়ে স্বপন-তমালীরা আছে। কারণ ঘড়াটি সে বাড়ির কাছেই কোনো এক দোকানে বিক্রি করেছে। আসন্ন অনিবার্য মৃত্যুভয় এক ভোঁতা অনুভূতিতে ছেঁকে ধরে তাকে। আতঙ্কিত রতনের সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। এখানে দিব্যেন্দু পালিত সমাজের নির্মম, রূঢ় বাস্তবরূপকে অঙ্কন করেছেন নিপুণ দক্ষতায়। তাই দেখি এই গল্পে ছাপোষা এই দম্পতি রূপকথার মতো ধাতব ঘড়া বা মোহর পেয়ে একদিনে বড়োলোক হয়ে যায় না। বরং তিলতিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যায়। মৃত্যু ভয়ে প্রহর গোনে তারা। মায়া রতনের কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞাসা করে,

> “...আমরা কি মরে যাব!”[২১]

বিপন্ন, নিঃসহায় এই দম্পতির লোভকে আমরা ঘৃণা করতে পারি না। অভাব, যন্ত্রণা এবং অপমান কোন স্তরে পৌঁছলে এক দম্পতি এমন কাজ করে তা সহজে অনুভূত হয়। সমব্যথী পাঠকগণ তাদের নির্মম পরিণতিতে ভাবিত ও মর্মাহত হয়। এই গল্পে শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের কথা আমাদের মনে পড়ে। ‘দেনাপাওনা’ গল্পে উনবিংশ শতাব্দী আর এই গল্পে বিংশ শতাব্দীর সমাজচিত্র অঙ্কিত। কিন্তু সেই সময়ে পণপ্রথাজনিত যে সমাজচিত্র দেখি আজও তা অপরিবর্তিত। ‘দেনাপাওনা’ গল্পে পণপ্রথার জন্য নিরুপমার মৃত্যু হয়। আর

'তেজস্ক্রিয়' গল্পে শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব না আসায় কল্যাণীকে শাস্তি পেতে হয়। তাকে বাপেরবাড়ি যেতে দেওয়া হয় না।

অভাবের ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের আরো মর্মান্তিক রূপ দিব্যেন্দু পালিত তুলে ধরেন 'বাবা'(১৩৯১) গল্পটিতে। গল্পটি 'পরিবর্তন' পত্রিকায় 'শারদীয়া' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে বাবার কারখানায় লক-আউট। মা আলাদা চাকরি করে। আমাদের সমাজ সংসারে নিয়ম এমনই যে উপার্জনে অক্ষম পুরুষের পরিবারে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। সকলের নিকটে সে হয়ে পড়ে অনাবশ্যক ব্যক্তি। স্বাভাবিকভাবেই লক-আউটের ফলে বাবা স্ত্রীর জীবনে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং উপেক্ষিত। স্ত্রী, স্বামীর অসহায় মুহূর্তে তাকে নির্ভরতা দান করেনি। তাকে প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গ বাণে বিদ্রূপ করেছে, তার পৌরুষকে আঘাত করেছে। স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। মেয়ের কথায়,

> "সেদিন বাবার কথা শুনে কেমন তেরিয়া হয়ে উঠল মা। বলল, সংসার চালাব, টাকা ধার দেব! পেয়েছ বেশ!"[২২]

বাবার মেয়েকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার ইচ্ছাকে মা বিদ্রূপ করে বলে,

> "মুরোদ নেই, ইচ্ছে আছে—!"[২৩]

মেয়ের সামনে এমন তিরস্কার, ব্যঙ্গ ও অপমানে বাবা অসহায় বোধ করে। হতাশাগ্রস্ত বাবাকে দেখে মেয়ের ইচ্ছে করে বাবাকে ভালোবাসতে তার যন্ত্রণা কষ্ট দূর করতে। কিন্তু সে কোনো উপায় খুঁজে পায় না। এইভাবে আর্থিক সঙ্কট থেকে অশান্তি, শেষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিচ্ছেদের দিকে এগিয়ে যায়। মেয়ে দেখে বাবা কীভাবে তার স্ত্রীর নিকটে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। মেয়ের জবানিতে বর্ণিত,

> "মা তখন পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। বোধহয় আশা করেনি বাবাকে। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কী ব্যাপার! এই সময় তুমি যে বড়!"[২৪]

স্ত্রীর এমন আচরণে বাবা স্তম্ভিত ও বিপন্ন হয়ে যায়। মেয়েকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে ব্যর্থতা, দাম্পত্য সম্পর্কে সঙ্কট এবং স্ত্রীর ব্যভিচারিতার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা মৃত্যুকে বেছে নেয়। মেয়ে একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখে যে কড়িকাঠের দিকে বাবা সর্বক্ষণ চেয়ে থাকে সেই,

> "কড়িকাঠ থেকে ফ্যানের লাগোয়া রডে ধুতির ফাঁস জড়িয়ে ঝুলছে বাবা।"[২৫]

বাবার মৃত্যুতে মেয়ের খুব কষ্ট হয়েছে। তবে তার মনে হয়েছে বাবা মৃত্যুর মাধ্যমে সমস্ত যন্ত্রণা, ব্যর্থতা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। বাবার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে তার মনে হয়েছে,

> "বড় সুন্দর দেখতে লাগছে বাবাকে।"[২৬]

অভাব এখানে শিশুমনকে অনেক বেশি পরিণত, নির্মম ও বাস্তবধর্মী করে তুলেছে। তাই বাবার মৃত্যুতে মেয়ে এমন মর্মান্তিক কথা ভাবতে পেরেছে। পরিবারে বাবা-মায়ের সম্পর্ক সুস্থ, সুন্দর না হলে শিশুমন কেমন বিপর্যস্ত হয়, সুন্দর শৈশব বিষিয়ে যায় সেদিকের প্রতিও আলোকপাত করেছেন গল্পকার।

দিব্যেন্দু নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক জীবনের যথার্থ রূপকার। নাগরিক জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর রচনায় উপস্থাপিত। নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রতিদিনের দিনযাপনে কঠোর সংগ্রাম, অস্তিত্বের সঙ্কট, মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অসহায়তা, আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি তাঁর আগ্রহের বিষয়। বহির্জীবন অপেক্ষা মানুষের অন্তর্মনের বিশ্লেষণই ছিল দিব্যেন্দুর অন্বিষ্ট। তিনি মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রাকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাকে আত্মস্থ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত মানুষ ও তাদের মন যেন ছিল তাঁর নিজের কররেখার মতো। ‘চিলেকোঠা’, ‘গন্ধের আবির্ভাব’ গল্পে সমাজের বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি চরিত্রের মনোজগতের কথা নিখুঁতভাবে বয়ন করেছেন গল্পকার। আলোচ্য গল্পগুলিতে মধ্যবিত্তের জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় শিল্প নিপুণতায় রূপদান করেছেন।

তথ্যপঞ্জি:

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়/২৩ শে জানুয়ারি, ১৯৯৪/ পৃষ্ঠা ১০
২। পালিত, দিব্যেন্দু/ চিলেকোঠা, গল্পসমগ্র-১/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯/ ৩য় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২/ পৃষ্ঠা ১২৩
৩। তদেব/ পৃষ্ঠা ১২৪
৪। তদেব/ পৃষ্ঠা ১২৪
৫। তদেব/ পৃষ্ঠা ১২২
৬। তদেব/ পৃষ্ঠা ১২২
৭। পালিত, দিব্যেন্দু/গন্ধের আবির্ভাব, গল্পসমগ্র-১/ প্রাগুক্ত/ পৃষ্ঠা ৩৮৩
৮। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮১
৯। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮১
১০। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮১
১১। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮২
১২। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮২
১৩। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮৫
১৪। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮৬
১৫। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮৬
১৬। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮৭

১৭। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮৭
১৮। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩৮৭
১৯। পালিত, দিব্যেন্দু/ তেজস্ক্রিয়, গল্পসমগ্র-২/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯/ ৩য় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৪/ পৃষ্ঠা ৩২৪
২০। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩২৪
২১। তদেব/ পৃষ্ঠা ৩২৫
২২। পালিত, দিব্যেন্দু/ বাবা, গল্পসমগ্র-২/প্রাগুক্ত/ পৃষ্ঠা ১৭১
২৩। তদেব/ পৃষ্ঠা ১৭১-১৭২
২৪। তদেব/ পৃষ্ঠা ১৭৫
২৫। তদেব/ পৃষ্ঠা ১৭৬
২৬। তদেব/ পৃষ্ঠা ১৭৬

ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন : এক ক্ষুধার্ত জীবনের আখ্যান

তন্ময় সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : মনোরঞ্জন ব্যাপারী বাংলা সাহিত্যের একজন উত্তরসূরী। খুব শৈশবে দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু। এরপর যত্রতত্র ঘোরাফেরা, ক্ষুধার জ্বালা, শরনার্থী শিবিরে থাকা, মা বাবা, ভাই বোনের মৃত্যু দেখার যন্ত্রণা। নকশাল আন্দোলন ও রাজনৈতিক কারণে হাজতবাস। জেলে এক চিটিং কেসের আসামী মাষ্টার মশাই কাছে ২৬ বছর বয়সে অক্ষর পরিচয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে রিকশা চালানো, মোট বওয়া, চায়ের দোকানে কাজ করা এরই মধ্যে লেখালেখি শুরু। ঘটনাক্রমে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। পড়াশোনার প্রতি কৌতূহল দেখে মহাশ্বেতা দেবীর সম্পাদনায় 'বর্তিকা' পত্রিকায় 'আমি রিকশা চালাই' মদন দত্ত ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। আত্মজীবনী 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি, যেখানে তিনি নিজের জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন।
সূচক শব্দ : উদ্বাস্তু, দলিত, চণ্ডাল, নিম্নবর্গীয়, অস্পৃশ্য, অচ্ছ্যুত, দাঙ্গা, শরণার্থী ক্যাম্প, দণ্ডকারণ্য, ক্ষুধার্ত, জিজীবিষা।

বাংলা কথাসাহিত্যের সার্থক স্রষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তারপর থেকে কথাসাহিত্যেরও বিষয় ও নির্মাণ শিল্পের নানান পরিবর্তন দেখা গেছে। সেই পরিবর্তনের ধারাতেই নিম্নবর্গীয় জীবনের চরিত্র চিত্রণ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে অবস্থান করেছে। যার সমগ্র রচনা-কর্ম জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষের নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিম্নবর্গীয়, দলিত, সর্বহারা মানুষদের কথা।

মনোরঞ্জন ব্যাপারী অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পিরিচপুরের সন্নিকটে তুরুকখালি নামক এক জায়গায় আনুমানিক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি এক হতদরিদ্র দলিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর জন্মের কথা নিজেই বলেছেন - "সেই রাতে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় উঠেছিল। যে ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল দরিদ্র মানুষের অনেকগুলো কুঁড়ে ঘরের খড়ের চাল। ভেঙে পড়েছিল বড় বড় গাছের মোটা,মোটা ডাল। মানুষ কাঁদছিল, হাহাকার করছিল, বাজ পড়বার বিকট শব্দে ভীত হয়ে পড়েছিল। মা আমাকে বুকের আড়াল দিয়ে রক্ষা করছিলেন সেই ক্রুদ্ধ প্রকৃতির রোষানল থেকে।"[১]

লেখকের মা বাবা দুজনেই ছিলেন সরল সহজ মানুষ। দেশভাগের আগে যখন সারা দেশ ঝলসে গেছে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল

শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, কবির, নানকের প্রেমবাণী। স্বার্থপর রাজনৈতিক সুবিধাবাদী মানুষদের জন্য। এক এক করে কলিকাতা, নোয়াখালী, বিহার সমস্ত জায়গাতেই দাঙ্গা প্রস্তুত করে রেখেছে। সেখানে শুধুই জন্ম নিয়েছে ঘৃণা আর ঘৃণা হিংসা ও প্রতিহিংসা। যার শেষ পরিণতি হল দেশভাগ। তৎকালীন সমাজে দেশভাগের কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের ভয়ে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে এক অচেনা, অজানা জায়গায় পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিল। যার ইতিহাস আজও সেরকমভাবে লেখা হয়নি। লেখক বলেছেন "দাঙ্গা! দু অক্ষরের ছোট্ট এই শব্দটার মধ্যে লুকানো আছে সেই ভয়ংকর মারণ বিষ যা মানুষকে বোধবুদ্ধি বিচার বিবেচনা হীন একটা পাগলা কুকুর তুল্য জীবে পরিনত করে দেয়। যার কাছে তখন দয়ামায়া স্নেহমমতা আশা করা বৃথা"[২]

এসব নানান কারণেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসতে বাধ্য হন। যারা আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল, শিক্ষিত, চালাক, উচ্চবর্ণের লোকেরাই সবার আগে পালিয়েছে। যে দু-চারজন আছেন তারাও যাওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করেছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে গরীব, অসহায় নিম্নবিত্ত মানুষেরা সেদেশে কোন সাহসে বাস করবে। বাবা-মা, আমি ও আমার ভাই চিত্ত এবং দিদিমাসহ -"মহান দেশ ভারতবর্ষে" পৌঁছালাম। প্রথম এসে কয়েক দিন কাটাতে হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে বাঁকুড়া জেলার শিরোমণিপুর ক্যাম্পে আনা হয়। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পারেন তাদের মতো কয়েক হাজার পরিবারকে আগে থেকেই এনে রাখা হয়েছিল। বিশাল বড়ো একটা মাঠে সারি সারি লাল ত্রিপলের ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়েছে। আট হাত লম্বা, ছয় হাত চওড়া তাবুর মধ্যে পাঁচ ছয় সাত সদস্যের এক একটা পরিবারকে গুঁজে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত “বাঁকুড়া একটি খরা প্রধান উষ্ণ জেলা”। যে সময়ে তাদেরকে আনা হয় সেটা ছিল গরমকাল। প্রখর দাবদাহে চারিদিকে যেন মানুষ হাঁসফাঁস করছে। জলকষ্ট প্রবল হওয়ার জন্য সদাশয় সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে দুটি মাত্র নলকূপ বসানো হয়। সেজন্য জল নেওয়ার জন্য মহিলাদের লম্বা লাইন সবসময়ই লেগে থাকতো। দু - এক ঘন্টা লাইন দিয়ে যেটুকু জল সংগ্রহ হোত সেই দিয়ে রান্না খাওয়া সহ বাসন স্নানের কোনরকমে হয়ে যেত। সরকারি গুদাম থেকে প্রতি চৌদ্দ দিন অন্তর সামান্য পরিমানে চাল ডাল ও নগদ কিছু টাকা দিতো। একে বলা হোত 'ডোল'। অনেকে বলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই চাল ডাল নাকি গুদাম জাত করে রাখা হয়েছিল সেনাবাহিনী জন্য। ক্যাম্পে কেরোসিনের অভাবে রাতের রান্না সূর্য ডোবার আগে সেরে ফেলা হোত।তাঁবুতে এত মানুষের রান্না হওয়ার ফলে সারা অঞ্চল বোটকা গন্ধে প্লাবিত হয়ে যেত। এই চালের ভাত আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে থাকতে অনেকের শরীর খারাপ, পেটের রোগ, ক্যাম্পে বার্ড ফ্লু রোগে মুরগীর মতো শয়ে শয়ে মানুষ মারা যেত। সুচিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছিল ক্যাম্পের শিশুরা। একদিন মনোরঞ্জন ব্যাপারীর প্রচণ্ড জ্বর অসম্ভব

মাথা যন্ত্রণা নিয়ে পেট যেন জয়ঢাকের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুইদিন পর পায়খানার সঙ্গে কাঁচা রক্তের স্রোত তার মধ্যে পেটের উপর নাড়িছেঁড়া যন্ত্রণা। এভাবে চলতে চলতে সারা শরীর অবসন্ন হয়ে গেল। প্রায় দু বছর দাপাদাপির পর মৃত্যুর দেবতা দয়া করে এই অসহায় মানুষগুলিকে একটু রেহাই দিয়েছিল। লেখকের শিরোমনিপুর ক্যাম্প কতদিনের তা সঠিক জানা নেই। তবে সেটা ১৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দ হবে। এরপর বাবার সখ হল আমাকে লেখাপড়া শেখাবেন। অন্ধত্বের যে কি কষ্ট তার বাবা মর্মে মর্মে জানেন। সেজন্য বাবা তার ছেলেকে অন্ধ রাখতে চান না। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষের লেখাপড়া শেখবার খুব একটা সুযোগ সুবিধা ছিল না। কিন্তু এখানে কিছুটা সুবিধা আছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্পের মধ্যেই একটা প্রাইমারি স্কুল চালু করা হয়েছে। ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করতে পারবেন। স্কুলে ভর্তি করার মনোবাসনা সাত আট দিন আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছেন বাবা তালগাছ ও বাঁশঝাড় কোথায় আছে তা খুঁজতে। শিশুশিক্ষায় এই দুটোর অবদান অসামান্য। তালগাছ থেকে বেঁছে বেঁছে এক গোছা তালপাতা আর বাঁশ বাগান থেকে দুইটি কঞ্চি কেটে এনেছিলেন। একটা ছোট আকারের আর একখানা হাত দেড়েক লম্বা। ছোটখানার মাথা দিয়ে থেঁতো করে করে হত কলম, আর বড়খানা দিয়ে হবে বেত। এরপর সেই শুভদিনে সকালবেলা স্নান করে প্রয়োজনীয় বইখাতা ও জিনিসপত্র দিয়ে বাবার হাত ধরে স্কুলে গেলেন। তবে স্কুলটি তাবু থেকে খুব একটা দুরে নয়। বাবা চেয়েছিলেন আমি যাতে মানুষ হই, কিন্তু স্কুলের সামনে এসে সেই আশার আলো একদিন দপ করে নিভে গেল। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প থেকে খবর এল সরকার থেকে চাল ডাল ও অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত তা আর মিলবে না। সরকার আর দায়িত্ব নিতে চাইছে না। দেশভাগ জনিত কারণে মানুষ বাধভাঙ্গা বন্যার জলের মতো একপ্রকার বাধ্য হয়ে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছে। এসব ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে ভাগ ছিল দুটো। একভাগ আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবর্ণের মানুষ। যাদের এককথায় বলা হয় ভদ্রলোক। আর একদল সব হারিয়ে নিঃস্ব, নিম্নবর্ণ, নিরক্ষর ও নির্ধন। এই কারনে সচ্ছল উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা কামার, কুমোর, জেলে, পোঁদ, হাড়ি, জোলা, মুচি মানুষদের সঙ্গে একসাথে থাকতে চাননি। এরা চুপিসারে সরকার ও নেতা-মন্ত্রীদের সহযোগিতায় কলকাতাসহ পার্শ্ববর্তী নানান অঞ্চলে দেড়শত জবরদখল কলোনি গড়ে নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবে চলতে চলতে সরকার ও নেতা-মন্ত্রীদের মাথায় এল দ্বিতীয় পরিকল্পনা 'দন্ডকারন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা'। যা স্থাপিত হয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর। বর্তমানে এর নাম ছত্তিসগড়। সাতটি জেলার মধ্যে অনুন্নত জেলা হলো বস্তর। এর ঠিক অনুরূপ উড়িষ্যার মধ্যে পিছিয়ে থাকা মালকানগিরি হল অনুন্নত জেলা। আর এই দুই প্রদেশের দুই জেলার অস্বাস্থ্যকর অনুন্নত দুর্গম ভূমির কিছু বনাঞ্চল সহ গঠন করা হয়েছে দন্ডকারন্য অঞ্চল। এখানেই রিফিউজিদের 'পুনর্বাসন' দেওয়া হবে। এখানকার মাটিতে

কাঁকর, পাথর, মুরোমের মাত্রা এতবেশী যে হালচাষ হয় না। তাই তারা চাষবাস জানেও না। বনে যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে বেঁচে থাকত। সরকার এখানে কায়দা করে রিফিউজিদের এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। একটা হচ্ছে তাদের পুর্ণবাসনের থাকার সহজ সমাধান, দ্বিতীয়টি হল বিশাল বনাঞ্চল জুড়ে সেগুন, মহুয়া, শাল, বীজা, গাছ ও বাঁশের অপার সম্ভার। এছাড়াও রয়েছে কেন্দুপাতার অফুরন্ত উৎপাদন।ফলে যেমন তেল, বাঁশে কাগজ, মহুয়ার ফুলে মদসহ বীজা, শাল, সেগুন দামী আসবাব। এখানকার মাটির নিচে তামা, লোহা, সিসা, বক্সাইট, ডলোমাইট সহ নানান খনিজ সম্পদ। পরিশ্রমী মানুষের অভাবে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। আদিবাসী মানুষরা এসব কাজে খুব একটা পারদর্শী নয়। তাই সুকৌশলে রিফিউজিদের নিয়ে এসে সেই কাজে যোগদান করানো বড়ো চক্রান্ত ছিল সরকারের।

এভাবে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর চলতে চলতে পেটে ভাত নেই, কাজ নেই, অসুখে ওষুধ নেই, হাত আছে কিন্তু কাজ দেবে কে। এমন অবস্থায় নিরুপায় হয়ে ক্যাম্প থেকে বহুদূরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত চাষির বাড়িতে গরু চড়ানোর কাজ পান। শর্ত ছিল তারা দুবেলা খেতে দিবে আর এক বছর থাকতে পারলে পুজোর সময় একখানা প্যান্ট, গেঞ্জি ও গামছা দিবে। তিনি জানিয়েছেন - "যে বয়সে শিশুরা বাস করে নানা রঙের এক মায়াবী জগতে, হেসে খেলে নেচে গেয়ে দুষ্টুমি করে দিন কাটায়, জীবন আমাকে ঠেলে দিল রঙরস স্বপ্নহীন এক কঠোর বাস্তবতার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দুটো বালতি বাঁকে বেধে দেড় মাইল দূর থেকে জল বয়ে এনে সবজি খেত ভিজিয়ে দুটো শুকনো মুড়ি চিবিয়ে ছাগল গরু নিয়ে মাঠে যাওয়া, দুপুরে এক ফাঁকে এসে ভাত খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে থাকা।"[৩]

সেই গরু ছাগল চড়ানোর কাজও তিন মাসের বেশি টিকলো না মালিকের অত্যাচারের কারণে। এরপর ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখেন তার এক কালো কুচকুচে বোন হয়েছে। বোন হওয়াতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো সাত। এই নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা সাতটা খ্রিস্টাব্দে প্রাণীকে কেমন করে বাঁচাবেন। এ এমন এক সংসার জন্ম কোন উৎসব নয়, বাড়তি একটা বোঝা। বাবা এবার ঠিক করলেন শিরোমনিপুর ক্যাম্পে না থেকে যাবেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ঘোলা দোলতলার রিফিউজি ক্যাম্পে। এখানে কয়েকজন কাকা জেঠু থাকেন। ঘোলা দোলতলার ক্যাম্পে কাকা জেঠুদের সহযোগিতায় একটা ঝুপড়ি মধ্যে থাকতে শুরু করলেন। কাজ হিসাবে ছিল মাদুর বোনা। ১৯৬৪ বাবা যাদবপুরে মজুরের কাজ শুরু করলেন। কোনদিন কাজ মিলত, কোনদিন মিলত না। যেদিন কাজ মিলত সেদিন বাড়িতে উনুন জ্বলত।অন্যদিন আধপেটা হয়ে জল খেয়েই কাটিয়ে দিতে হতো। বাবার না খেয়ে পেয়ে ছটফটানি, ছোটবোনের না খেয়ে পেয়ে মারা যাওয়া। মা নিরুপায় হয়ে কবেকার এক সরকারি কাপড় পচে ছিড়ে গিয়েছে। লজ্জা নিবারণের জন্য দিনের বেলায় এক কুঁড়ে ঘরে মশারি জড়িয়ে আত্মগোপন করে থাকা। শত প্রয়োজন থাকলেও দিনের বেলাতে বাইরে আসার

কোন উপায় ছিল না। তিনি বলেছেন - " শাস্ত্রে বলা হয়েছে মানুষ নাকি ঈশ্বরের এক মহান সৃষ্টি। চুরাশি কোটি যোনি ভ্রমণ করবার পর মানব জনম মেলে। এ এক দুর্লভ জনম। আমি মানব কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি। তাহলে যিনি আমাকে এমন মহান এমন সার্থক জীবন দিয়েছেন তাকে তো ধন্যবাদ দিতেই হয়। "[৪]

একদিন কাজের সন্ধানে লেখক যাদবপুরে আসেন। বাবা যেহেতু এখানে এসে কাজ পেয়েছেন, তাই ছেলেও পাবে এই বিশ্বাস ছিল। প্রথম রাতটা প্রবল জ্বর নিয়ে ধুলোময়লা পানের পিক ও সিগারেটের টুকরোর মধ্যে প্লাটফর্মে কাটিয়ে এক হিন্দুস্তানি চায়ের দোকানে ১০ টাকা বেতনে কাজ পান। একবার ডাক্তারের বাড়িতে কাজের জন্য নিম্নবর্ণ হওয়ার যে যন্ত্রণা অপমান সেটা ভুলে যাননি। তাই নিজে কাজ পাবার আশায় জাতি পরিচয় গোপন রেখে নামও পরিবর্তন করে নেন। নাম রাখেন জীবন দত্ত। রিফিউজি ও বাঙাল হল পশ্চিমবঙ্গ মানুষের কাছে সমার্থক শব্দ। যা পরিভাষায় গালাগালি দেওয়াও বটে। যেমন জোতদার, বুর্জোয়া, সুদখোর, প্রতিক্রিয়াশীল, রাস্তার কুকুর। কী অপরাধময় অভিশপ্ত জীবন। আমরা হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেই, বিভিন্ন রকম মূর্তি পূজা করি, একদল মুসলমান সেই অপরাধে আমাদের কাফের বিধর্মী শত্রু ভাবেন। আমরা নিম্নবর্ণ দলিত নমঃশূদ্র সমাজের মানুষ বলে, একদল উচ্চবিত্ত ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষ আমাদের অচ্ছুত, অস্পৃশ্য, ছোটজাত চণ্ডাল বলে গাল দিতে থাকে।

যাদবপুর থেকে পার্ক সার্কাসের এক চায়ের দোকানে কাজ পান। আগের মালিক মাসে ১০ টাকা দিতো। এ মালিক মাসে পঁচিশ টাকা দেবে। কিন্তু সে এলাকায় ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে কিছু সুবিধাবাদী লোক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। সেখান থেকে পালিয়ে এসে পালবাজারে এক দোকানে কাজ নেন। এরপর এভাবেই কখনো বিনা টিকিটে নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে আসামে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। কত মানুষের কত রকম কাজ করেছে। বেতন তো দুরের কথা কাজ করার পর খাবার টুকু মেলেনি। কিছু বললেই মার ছাড়া আর কিছু পাননি। এভাবে অপমান হতে হতে ফিরতি পথে লক্ষ্ণৌ কানপুরে কাজের খোঁজে বেরিয়েছেন। কিন্তু সেখানে বেতন কম থাকায় বেশিদিন আর কাজ করা হয়ে ওঠেনি। হয়তো বয়স কম বলে সবাই ঠকিয়েছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। বিচিত্র দেশের মানুষের প্রহার, লাঞ্ছনা, অপমান, প্রতারণা সঞ্চিত হয়েছে যা জীবনে স্মৃতির পাতায় থেকে যাবে। এভাবে কয়েক বছর বাইরে কাটিয়ে আবার কাজের খোঁজে যাদবপুরে ফিরে আসতে হয়। সময়টা ঠিক ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের সকাল। ট্রেনের মধ্যে এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘোলা দোতলার ক্যাম্পেই থাকেন। তাঁর কাছেই খবর পেলেন বাবা আর সেখানে থাকেন না। তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে যাদবপুরের শ্যামাকলোনীর উল্টোদিকে কুলদা কর্মকার নামে এক ভদ্রলোকের সহযোগিতায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাবা কাজ থেকে ফিরে আসার পর তার চোখে মুখে জীবন যন্ত্রণার ছাপ। ক্ষোপ ও হতাশা নিয়ে স্বেচ্ছায়

বাড়ি ছেড়ে প্লাটফর্মে থাকতে শুরু করেন। একদিন কাজের জন্য বাঘাযতীন মোড়ে যেতে হয়। সেখানে বিয়ে বাড়িতে কাজের জন্য সাড়ে তিন টাকা মজুরিতে যোগ দেন। তারসঙ্গে বিয়ে বাড়িতে নানান রকমের খাবার লোভ সামলাতে পারিনি। একদিন রাধুনি নরেশ ঠাকুরের অসুস্থতায় ভালো রান্নার খ্যাতি পেয়েও পূর্বপরিচিত এক লোক জাত পরিচয় চিনতে পেরে যাওয়ায় মার খেতে হয়। লেখক জানিয়েছেন - "এবার জামাই আর শ্যালক দুজনে চেপে ধরল আমাদের। বল তোদের কী নাম, কী জাত। জেরায় প্রকাশ হয়ে গেল - একজন দক্ষিণবঙ্গের কাওড়া আর একজন পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র। দুটোই জল অচল - অচ্ছুত। এরপর দুই মদ্যপ - জাত লুকিয়ে বামুনের হেঁসেলে ঢোকার অপরাধে আমাদের ধরে নিয়ে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে, কলা বাগানের মধ্যে। কান ধরে ওঠবস নাকে খত এই সব করালো আমাদের দিয়ে। এটা ওদের কাছে ছিল হয়ত মজা পাবার বিষয়। কিন্তু আমাদের কাছে ছিল চরম অবমাননাকর একটা ঘটনা। যা কোনদিন ভুলে যাবার মতন নয়।"[৫]

একদিন ভাই চিত্তরঞ্জনকে হাঁসচুরির অপবাদে উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে বিনা কারণে মার খেতে হয়। ভাই চিত্তরঞ্জনকে রক্ষা করতে গিয়ে বাবাও বঞ্চনার স্বীকার হন। এইভাবে সবদিক থেকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে হতে মনোরঞ্জনের মনে এক আলাদা মনোরঞ্জনের জন্ম হয়। ছোটভাই নিরু ও বোন অঞ্জু মাঠে খেলতে গেলে পাড়ার বাচ্চারাও খেলতে এসে ওদেরকে ছোটজাত বলে তাড়িয়ে দেয়। এই নিয়ে মনোরঞ্জনের সঙ্গে লড়াই লেগে গেলে সে পাল্টা মার দেয়। অনেক মনোরঞ্জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ঘর থেকে কুডুল এনে এক ছেলের কাঁধে কোপ বসিয়ে দেয়। এভাবে পাড়াতে বেপরোয়া সাহসের কথা জেনে দুই উঠতি মস্তান কাজল আর পনু দলে টানে। সেখান থেকে নানারকমের অস্ত্র চালানো, বোমা বাঁধা এসব শিখে যান। একদিন এলাকায় নকশাল বলে মনোরঞ্জনের নামে দুর্নাম ছড়িয়ে যায়। নেতা পিন্টু সেন সি ব্লকের পার্টি অফিসের সামনে পোস্টে বেঁধে প্রচণ্ড মারেন। এই খবর গিয়ে পৌঁছায় নকশাল নেতা আশু মজুমদার কাছে। পরবর্তীতে তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। শোষনমুক্ত এক শ্রেণিহীন সমাজ নির্মাণের কথা বলেন আশু মজুমদার। যে সমাজে মানুষ সবাই সমান এবং সম্মানীয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য থাকবে শিক্ষা চিকিৎসা খাদ, বস্ত্র বাসস্থান। কিভাবে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ সম্পর্কে জানতে হবে তাদের আদর্শ কি এসব শিক্ষা নিতে থাকেন। এভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সে মাও সে তুং, লেলিন মত বিপ্লবী হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেন। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রেফতার হন। কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকার জন্য বেঁচে যান। একদিন পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য দুই মস্তান পনু দাস ও তাতা দত্তের সামনে পুরনো শত্রুতার জন্য ধরা পরে যান। সেখানে তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। পরে নেতা খোকন দাসের জন্য খুব জোর বেঁচে যান মনোরঞ্জন।

একদিন গোয়েন্দা পুলিশের দল কুঁড়েঘরে হানা দিয়ে নকশাল নেতা সন্দেহে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে নানারকমের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন তথ্য না পেয়ে মারামারি করার একটা মিথ্যা কেস দিয়ে পুলিশ আলিপুর জেলে পাঠায়। এতদিন ক্ষুধার তাড়না, কাজের জন্য নানান জায়গায় ছুটে বেড়ানো। অনেক যায়গায় মার খেতে খেতে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে বুঝে গিয়েছেন। জেলখানায় তাঁর মামলা নিয়ে অনেকেই নানা প্রশ্ন করেন। কিন্তু লেখাপড়া না জানার জন্য কিছুই বলতে পারেন না। এক পাঠশালার মাষ্টার যিনি চিটিং কেসের আসামির চোখে পড়ে যান। এরপর তাঁরই সহযোগিতায় জেলে বসে ২৬ বছর বয়সে অক্ষর জ্ঞান হয়। একবার রক্তদানের শিবিরে রক্ত দিয়ে কিছু পয়সা পেয়ে জেলখানা থেকে খাতা-কলম কিনেন। তাঁর গুরু তাকে পড়তেই শেখাননি, শিখিয়েছেন বই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাণ্ডার। লেখক বলেছেন ‘জেলখানা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।’ এর ফলে মনে এক সুপ্ত বাসনা নিয়ে জেলখানা থেকে বেড়িয়ে বইপড়ার এক ভয়ঙ্কর নেশা কাজ করে। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য রিকশা চালানোর মাঝে ঠাঁই পেল বই। সময় পেলেই আশে পাশের লাইব্রেরি, বিভিন্ন ম্যাগাজিন, দেশী-বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় তেমনি লেলিন, মার্কসবাদ, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দেশ বিদেশের রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মগ্রন্থ, অনুবাদ সাহিত্য, লোকসাহিত্য, কথাসাহিত্য ইত্যাদি বই পড়তেন।

ঘটনাক্রমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় বইপড়ার কৌতূহল দেখে মহাশ্বেতা দেবী পরিচয় পেয়ে কেবল মুগ্ধ হননি। ভবিষ্যতে লেখালেখির জন্য মনোরঞ্জনকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন। অনেক কষ্টের পর মহাশ্বেতা দেবীর 'বর্তিকা' পত্রিকায় "রিকশা চালাই" শিরোনামে জানুয়ারি মার্চ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক জানিয়েছেন “মহাশ্বেতা দেবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা বর্তিকায় আমার লেখাটি স্থান পেয়ে যাওয়ায় - মানুষের দৃষ্টিপথে এসে গেলাম আমি। যাতে আর একটি বিশেষ মাত্রা যোগ হল যখন যুগান্তর পত্রিকার পাতায় এক পুস্তক সমালোচক আমার লেখাটির প্রশংসা করে দুলাইন লিখে দিলেন। যা আমার উৎসাহকে দশগুণ বাড়িয়ে দিল - আমি পারি। আমি পেরেছি।"[৬]

এরপর পেট চালানোর জন্য নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। কোথাও সেরকম কাজ না পেয়ে আবার যাদবপুরে ফিরে এসে রিকশা চালানোই পেশা হয়ে দাঁড়ায়। একদিন দণ্ডকারণ্য থেকে ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে বাবা-দাদার মৃত্যুর খবর শোনার যন্ত্রণা। সংসারের হাল ধরার গুরুদায়িত্ব স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে অন্ন সংস্থানের কঠিন সংগ্রাম মধ্যে পড়ে যান। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে সাইকেলে করে নিয়ে আসা, নাইট গার্ড, সাফাইকর্মী কাজ, চরম বাস্তবতা ও একদিকে বই পড়ার খিদে মনোরঞ্জনকে অতিষ্ঠ করে তুলে। অনিশ্চিত জীবন কাটানো যার কোন ভবিষ্যৎ নেই। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করা কি যে কঠিন সংগ্রাম সেটা ভালো করেই বুঝে গেছেন। এভাবেই কয়েক বছর কেটে যায়। যাদবপুর স্টেশনে হঠাৎ একসময়ের পুরনো শত্রু

তাতা দত্তের সহযোগিতায় এক আবাশিক হোস্টেলে রান্নার কাজ পান। সরকারি অনুমোদন না পাওয়ায় রান্নার কর্মচারীদের বেতন কম থাকায় সে কাজ কেউ করতে চান না। একমাত্র লেখাকে বৈষম্যমূলক সঙ্গী করার জন্যই তিনি এ কাজ নেন। তাঁর জীবনে নকশাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা শংকর গুহ নিয়োগীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রেণীবিভক্ত বৈষম্যমূলক এই সমাজ ভেঙ্গে শ্রেণিহীন নতুন সমাজ গড়তে নিয়োগীজির আদর্শকেই মনোরঞ্জন জীবনের আদর্শ বলে মনে করেন। তাঁর জীবনে এত লড়াই, যন্ত্রণা, দুর্ভোগ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতি মধ্য দিয়ে গিয়েছেন যেন তিনি সত্যি একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। যার জীবন সম্বন্ধে কোন মায়া মমতা নেই, আছে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে, শত কষ্টেও সে হার মানতে রাজি নয়। কেননা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে গরিব ও বড়োলোকের হয় না কারণ বর্ণ ভাগ করে, ধর্ম ভাগ করে, রাজনীতি ভাগ করে দুনিয়াতে নিম্নবর্ণ সাধারণ সৎ মানুষ কোথায় দাঁড়াবে মনোরঞ্জন তাঁর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' এ বিশাল পরিসরে ব্যক্তিজীবনে বড়ো হয়ে ওঠা ও বেঁচে থাকার নানান ঘটনাবলীর নিজের কথা বলে গেছেন। তাঁর নানান গল্পে একটি কথার আখ্যান বারবার ঘুরে ফিরে আসে - বেঁচে থাকার সংগ্রাম। অন্তহীন ক্ষুধা লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার খোঁজে মনোরঞ্জন চলেছেন এক নতুন জীবনের পথে। যে জীবন কোনদিন থেমে থাকবে না শুধু ছুটে চলবে। চণ্ডাল জীবনের সব কথাই কি তিনি বলতে পেরেছেন। কেন পারেননি তাঁর উত্তরও দিয়েছেন লেখার মধ্য দিয়ে। কঠিন বাস্তবতার মাধ্যমে ঘৃণিত জীবনের দ্বগ্ধ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা করা সহজ নয়। কেননা এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই পৃথিবীতে শুধু বেকার খেটেই গেছেন, নূন্যতম সম্মানটুকু পর্যন্ত পাননি এ সমাজে। সবসময় অবহেলিত, শোষিত বঞ্চনার স্বীকার হয়েছেন। ক্ষুধার যন্ত্রনায় ভুগেছেন প্রতিনিয়ত। এসব মানুষ তো সমাজ থেকে হারিয়ে যাবেন এটাই স্বাভাবিক। এদেরকে বুঝতে গেলে প্রচলিত ভাষা দিয়ে যা ধরা যায় না। তারপরেও বলার চেষ্টা করেছেন মনোরঞ্জন। ইতিবৃত্ত শব্দটির মাধ্যমে একটা অন্ধকার নিহিত আছে। এক অর্থে সেরকম নতুন কিছু নয়, সমাজটা শুধু বদলাচ্ছে, চাঁড়াল চাঁড়ালই থাকছে। দেশভাগ, পুনবার্সন, উদ্বাস্তু, দেশের রাজনীতির পক্ষপাতিত্ব, অন্যায়, অবিচার, জাত বিচারের আগুন কিভাবে একটি অবহেলিত মানুষদের পুড়িয়েছে তা তিনি দেখিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি। একাধারে হিন্দু পুরস্কার, বাংলা আকাদেমি পুরস্কারসহ একাধিক সম্মান পেয়েছেন। কত বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ও হচ্ছে। এ পর্যন্ত কত পত্র-পত্রিকায় লেখা একাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক তিনি। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ের অদম্য জেদ ও বেঁচে থাকার আর এক নাম মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তাঁর ভাষাবোধ পাঠককে অবাক করে দেয়, চণ্ডালের প্রতি মনুর বিধানের কথা

মনে করিয়ে দেয়। সমাজ দেশ-মাটির উদ্বাস্তু দলিত ও শিকড়ছেঁড়া এবং কৃষক নিম্নবর্ণ শ্রমিক জীবনের জাগরণ কেবল সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়েই নয়। এসবের জন্য জনসংযোগ দরকার। এত কিছুর পরেও সমাজ তাকে চণ্ডাল বলে ছুঁড়ে দিয়েছে বিদ্রুপ। চণ্ডাল কিভাবে দেখে তার জীবনকে, নমঃশূদ্ররা কীভাবে অনুভব করে জীবনধারা এবং অস্তিত্বের অপমান ও গ্লানি। বলা যায় বাংলা সাহিত্যে মনোরঞ্জন ব্যাপারী এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছেন তা হয়ে থাকবে চিরস্মরণীয়।

তথ্যসূত্র:

১। ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। “ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন”। দে পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, পৃ – ১৫

২। তদেব। পৃ – ২৫

৩। তদেব। পৃ –৩৯

৪। তদেব। পৃ – ৪৫

৫। তদেব। পৃ –১১৯

৬। তদেব। পৃ - ২১৫

ডোমজাতির ইতিকথা ও ডোমনীগান

মনোজ ভোজ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ

সারসংক্ষেপ : বাংলায় ডোমেদের প্রবেশ অর্বাচীন কালের নয়। অনেকে মনে করেন বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ বিহারে ডোমেদের আদি বাস। সেখান থেকে এলেও হাজার বছর আগে তাদের আগমন ঘটেছে। চর্যাপদে তাদের কথা পাওয়া গেছে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ডোমদের উল্লেখ রয়েছে। ছড়াতেও রয়েছে। ইংরেজ আমলে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। সেই সূত্রে তারা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে। মালদা জেলার একটি বিশেষ লোকনাট্য ডোমনীগানে ডোমেদের কথাই রয়েছে, তবু এখন বর্তমানে ডোমরা এই গান করে না। তবে ডোমদের তবে জীবন ও জীবিকার কথা ডোমনীগানে রয়েছে। এই গানের ভাষা খোট্টা ভাষা। এই ভাষা সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। এখন গান ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে চলেছে কারণ ডোমনিগান গাইবার মতো শিল্পীর অভাব।
সূচক শব্দ: ডোম, ডোমনি, জাতি, ডোমনিগান, সমাজ, সাহিত্য, জাতি, সম্প্রদায়, পুরাণ।

"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে / ঢোল ডগোর মৃদং বাজে।" এই পঙক্তিকটির ইতিহাস শৈশবে কখনো ভাবায় নি। বোঝার চেষ্টাও করিনি অন্তর্নিহিত অর্থ। পরবর্তীকালে স্পষ্ট হয়েছে, এর মধ্য দোর্দণ্ডপ্রতাপ অথচ সহজ সরল জাতির কথা উল্লেখ করেছেন ছড়াকার। যুদ্ধে এক সময় ডোমদের অপরিহার্য যোদ্ধা হিসেবে রাখা হত। তাদের বীরত্ব এতটাই ছিল যে আগে এবং বাগে ডোমেরা থাকত সৈন্য সজ্জায়। কেবল পদাতিক সৈন্য নয়, অশ্বারোহী সেনা হিসেবেও তাদের সার্থক অস্তিত্বকে প্রমাণ করে এই ছড়াটি।

দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবাংলার ডোমজাতি আজ অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞাত, একদিন তাদের এক মহান ঐতিহ্য ছিল। খৃস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে তাদের আধ্যাত্মিক সাধন-ভজনের জীবন খুব উন্নত ছিল।—
"বৌদ্ধাধিকারে সমাজে যাঁহাদের স্থান উচ্চ ছিল, পরবর্তীকালে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িল। অনেকে মনে করেন, ডোম, হাড়ী ইত্যাদি জাতির পূর্ব্ব পুরুষদের কেহ কেহ শ্রমণ ও আচার্য্য ছিলেন।"[১]

মধ্যযুগে তারা স্থানীয় ভূস্বামীদের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যরূপে যুদ্ধ করত। দেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমাজে তারা নীচের স্তরে নেমে এল, তারপর তাদের এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যাতে তারা 'অপরাধ-প্রবণ' জাতি বলে চিহ্নিত হয়। তারপর পুলিশের অত্যাচারের ফলে তাদের

বেশিরভাগ লোকই পশ্চিমবাংলার বাসভূমি ছেড়ে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের উপজাতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ ডোমেদের আদিবাস নয় বলে জানান নৃতাত্ত্বিকেরা। অনেকে মনে করেন বাংলার পশ্চিম দিকের কোন অঞ্চল থেকে বিশেষত বিহার থেকে ডোমেরা এসেছে। তবে সেও যে অর্বাচীন কালে নয়, তার প্রমাণ আমরা পাই 'চর্যাপদ'-এ। লক্ষণীয় বিষয়, 'চর্যাপদ'-এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে শুভ সূচনা ঘটেছে সেখানে উচ্চবিত্ত কিংবা নাগরিক জীবনের সমাজচিত্র নয়, সমাজের একেবারেই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ বিশেষত ডোমজাতির জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। 'চর্যাপদ'-এর কবিরা ডোমজাতিকে প্রতীকী চিত্রে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু সেই ডোমজাতির বাস্তবসম্মত যে বৃত্তি, তাদের গানে সেই অন্তর্বাস্তবতা প্রকট হয়ে ওঠে। মালদার ডোমনি গান সেই বাস্তব সমাজেরই জ্বলন্ত চিত্র।

'চর্যাপদ'-এ ডোম যুবতীকে নিয়ে যে সমস্ত পদ রচিত হয়েছে, সেগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তারা যেমন প্রেমিক জাতি তেমনই আমোদাহ্লাদ প্রিয়। '১৮' সংখ্যক পদে কাহ্নপাদ লেখেন 'ডোংবিত আগলি নাহি চ্ছিনালী' (ডোমনীর বাড়া ছিনাল নাই)। ডোমনির প্রেমে কাতর হয়ে ঈর্ষান্বিত উচ্চারণে কবি কাহ্নপাদ বলেন, 'মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ।' বলা যায় 'চর্যাপদ'-এর ডোম ও ডোমনির উপস্থিতি জানিয়ে দেয় ডোমদের সক্রিয় অস্তিত্ব বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে ডোম জাতির যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেখানে ডোমেদের শ্মশানচারী হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও ডোমেরা কেবল মৃতদেহই সৎকার করেনা, তারা মূলত বাঁশের কাজ করে। আবার অন্য দিকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বেহুলাকে ডোমনি সেজে ধুচুনী, চুবড়ি, হাতপাখা ইত্যাদি বাঁশের কাজের উপাদান বিক্রি করতে দেখা যায়। বেহুলা বলে, 'অতি হীন কুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি। মুচনী চুপড়ি বুনি... আর বুনি ডালা' (বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত)। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এক ডোমনীকে নৌকা চালাতে দেখা যায়।--- "ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী মনে মনে পাঁচে।/ হাসিতে খেলিতে গেলা ডোমনির কাছে।।" 'ধর্মমঙ্গল'-এর কালু ডোম বাঁশের কাজের বৃত্তির কথা বলেন। সমীরণ ঘাটি জানান, ডোমদের একটি মিথের কথা,---

"অনেক দিন আগে আমাদের সমাজের এক বুড়ি পুকুরধারে বসে চুবড়ি বুনছিল। এমন সময় ভগবান এসে বলেন, এই ডোমনি, কী করছিস রে? বুড়ি বলল, আমি গরিব মানুষ, চুবড়ি বুনছি, বাবা। ভগবান বললেন, তা তুই কী চাস? অনেক টাকাকড়ি, বাড়ি-বিলডিং, নাকি চুবড়িই বুনবি? বুড়ি বলল, এই বিত্তিটাই আমাকে দাও, বাবা। জন্ম জন্ম ধরে যেন এই করে খেতে পারি। ভগবান বললেন, বেশ আজ থেকে তোদের কাজ হবে ঝুড়ি বোনা। আজও আমরা সেই কাজ করে যাচ্ছি।"[২]

কেবল যে বাঁশের কাজই তাদের করতে হয়েছে তা নয়, তারা শ্মশানের কাজও করে থাকে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ডোমেরা অনেক ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রের বংশধর বলে মনে করেন। অর্জুন মল্লিক জানান-

"হামি ডোম আছি। ডোমরাজা। রাজা কেন? তামাম দুনিয়ার শ্মশান মশানের মালিক কে? ডোম।... আসলি কাম মুর্দা জ্বালানা। হর মুর্দাতে ডোম রাজার অধিকার।"[৩]

মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্র রাজা চণ্ডালের ঘরে নিজেকে বিক্রি করেন। ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভগবত ইত্যাদিতেও জানা যায় হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে বাস করতে করতে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে, সেখানে অবশ্য হরিশ্চন্দ্রের ক্রেতা কালু। তিনি এখানে ডোম নয় হাড়ি। লাউসেনের কাহিনীতে কালুডোমের কথা আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কালুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজা এবং পরবর্তীতে ডোমেরা একই সঙ্গে যেমন হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে নিজ বংশের সংযুক্তি ঘটান, তেমনই কালুডোমের সঙ্গেও নিজেদের যোগ করেছেন। বাংলা, বিহারে ডোম চণ্ডালেরা কাল্লু ডোমের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন।

'চর্যাপদ', 'ধর্মমঙ্গল' 'মনসামঙ্গল' এবং প্রচলিত ছড়া থেকে ডোম জাতির তিনটি বৃত্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, (১) তারা ক্ষেতিকাম করে, (২) কেউ বাঁশের কাজ করে, (৩) কেউ বা 'মুর্দা জ্বালানা' কাজ করে। তবে সর্বোপরি তারা বীর জাতি। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কালু ডোমকে নগর রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল। মদ্যপানের ফলে তার চেতনা না থাকায় যুদ্ধ বর্জন করে। কিন্তু লখাই ডোমনি কালুর এই হীন প্রস্তাব শুনে নিজেই ১৩ জন ডোম নিয়ে নগর রক্ষার ভার নেয়। এবং পুত্রকে যুদ্ধে পাঠান। অর্থাৎ দেখা যায় কেবল ডোম পুরুষরাই নয়, ডোম যুবতীরাও বীরত্বের অধিকারিণী।

প্রচলিত হয়ে আছে ডোম যুবতীরা রঙ্গরস প্রিয়, শিল্পীমনের অধিকারিণী। মালদহের পশ্চিমপ্রান্তে এক জাতীয় লোকগান 'ডোমনি' নামে পরিচিত। এই গান এক সময়ে বাংলার পশ্চিমাঞ্চল, বিহার প্রদেশের ডোমদের গান ছিল। কথিত আছে, গ্রামে বিবাহ উপলক্ষে যখন বরযাত্রী বা কনেযাত্রী হিসেবে পুরুষরা যেত তখন গ্রাম পুরুষ-শূন্য হয়ে গেলে মেয়েরা গ্রাম-পাহারা দেওয়ার জন্য সারারাত ধরে ডোমনিগান গায়। তারা নগ্ন হয়ে গ্রামের কেচ্ছা নিয়ে গান বাঁধতেন।[৪] পরবর্তীকালে আর্থসামাজিক কারণে বিহার অঞ্চল থেকে তারা মালদহের পশ্চিমে দিয়ারা অঞ্চলে উপস্থিত হয়। কিন্তু কোন রকম উপার্জনের সুরাহা এই অঞ্চলে এসে হয় নি বলে মাঙ্গনের পথেই হাঁটেন তারা। নববর্ষের প্রথম দিনটিতে এবং পরবর্তী অন্যান্য দিনেও গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে এসে আদিরসাত্মক গান তারা গাইতেন। বাড়ির কর্তার অস্বস্তি বেড়ে গেলে দ্রুত বিদায় করার জন্য তাদের দাবি মেনে নিয়ে মাঙ্গন দিতে বাধ্য হতেন। বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, পাটনা, গয়া ইত্যাদি জেলায় এই জাতীয় মাঙ্গনধর্মী গানের কথা বুকাননের বিবরণিতে (১৮০৮-১৮১২) পাওয়া যায়।

যে ডোমনি গান শুরু হয়েছিল নারীদের দ্বারা, অঞ্চল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গানের অধিকারী হল পুরুষরা। এমনকি 'নারী চরিত্র' অভিনয়ও করল পুরুষরা।

ডোমনি গান ১৪/১৫ জনের চরিত্র নিয়ে হয়। তবে এই গান দরিদ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়, যারা পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসেছে, তারাই গেয়ে থাকেন। লক্ষণীয় বিষয়, ডোমনিগানে ডোমজাতির ঐতিহ্য, পরম্পরা, স্বভাব, বৃত্তি ও সামাজিক অবস্থানের কথা রয়েছে-

"কচ্চা (কাঁচা) বাঁশকে সুপ (কুলা) চাঙারি
পক্কা বাঁশকে বেনিয়া (পাখা)
ঘুর ঘুর জে ছাউড়ি ডোমানিয়া
বিকি যাতো বেনিয়া।"
(সংগ্রহসূত্র: শ্রীমতী তারা মণ্ডল, রতুয়া থানা)

তাদের দুর্নিবার প্রেমের কথা ডোমনি গানে স্পষ্ট হয়ে আছে---

"হায় হায় ওহি পোক্ষারমে ছাউড়ি ডোমানিয়া
ডুবিকে ম্যরলই না।
মায়ে কিয়ে জানা ডোমানিয়া
গাল্লা গামছা দিয়ে পইয়া পড়ত্যান না।"[৬]
(সংগ্রহসূত্র: কোকু মণ্ডল, রতুয়া থানা)

মালদহের যে অঞ্চলে এই গান প্রচলিত আছে সেই অঞ্চলের কথ্য ভাষা 'খোট্টা' নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন 'কোরাঠা' বা 'কর্কশ' থেকে শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। 'চাঁই' সম্প্রদায়ের মানুষদের বিশেষত মহিলাদের বাচন ভঙ্গিতে এই ভাষা অকৃত্রিম রূপে পাওয়া যায়। "খোট্টা" ভাষা কেবল ডোমনিগানের ভাষা নয়, মধ্যযুগে 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এই ভাষারও উল্লেখ রয়েছে, -

"ক্রোধে সাধু মুখে বাঙ্গলা ভাষা না বেরায়।
সনকা বেনানী প্রতি বলিছে খোট্টা।।"

ডোমনিগান 'ডোমকচ' নামেও পরিচিত। ডোমকচ বা ডোমনিতে ডোমেরা বিষয় হয়ে রইল, কিন্তু ডোমজাতির গান আর এটি নয়। অর্থাৎ দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে ঐতিহ্যের পরম্পরায় বহু সৃষ্টিতে ডোমেরা বিষয় হয়েছে, কখনো রঙ্গরস প্রিয়তার মধ্য দিয়ে, কখনো বীরত্বের মধ্য দিয়ে, আবার কখনো বা অসহায়তার মধ্য দিয়ে। নিম্নবর্গীয় এই শ্রেণীটিকে তাই বিস্তৃতভাবে জানতে প্রয়োজন বাংলা সাহিত্যের নিবিড় পাঠ ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা।

তথ্যসূত্র:

১. ড. সেন দীনেশচন্দ্র, আর্য ও অনার্য্য সংমিশ্রণ, বৃহৎবঙ্গ : ১ম খণ্ড, ১৯৯৯।

২. ঘাটি সমীরণ, কে বলে ডোম?, দলিতের আখ্যানবৃত্ত, সংকলন / সম্পাদনা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঘ ১৪১১
৩. মল্লিক অর্জুন, শ্মশানডোম, দলিতের আখ্যানবৃত্ত, সংকলন / সম্পাদনা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঘ ১৪১১
৪. চৌধুরী সুবোধ, ডোমনি, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ১৯৯৯।
৫. সূত্র : ঐ
৬. সূত্র : ঐ

সাম্প্রতিককালের প্রাসঙ্গিক গল্পকার নলিনী বেরা'র ছোটগল্প : সীমাহীন নস্টালজিক আলেখ্য

অর্পন ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যের বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই, ধরা পড়বে 'লেখক'ই' গল্পের আধার, অর্থাৎ তাঁদের বৈচিত্র্যময় জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনাই গল্পের উপকরণ। গল্প উপন্যাসগুলো যেন মনে হয় মানবজমিনে এক-একটি চাষের ফসল। বয়ে যাওয়া নদী থেকে নালা খনন করে যেভাবে ফসল উৎপাদন করা হয়, ঠিক সেভাবেই বহতা জীবনের স্মৃতিপটে প্রতিভাসিত জীবনের কথা বর্তমান সাহিত্যর ফসল ফলায়। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে এমনই একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা। নলিনী রেরা'র ছোটগল্পে জন্মভূমির প্রতি গভীরতম ভালোবাসার বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ পাই; তাঁর স্মৃতিমেদুরতার প্রতিটি পাতায়, যা তাঁর সাহিত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। গল্পগুলিতে রয়েছে তৎকালীন গ্রাম্য-জনজাতির জীবনবৃত্তান্ত। বিদেশ-বিভুঁই থেকে বাড়ি ফেরার আকুতি। গল্পগুলিতে রয়েছে গ্রামের চারপাশ, আছে গাছের জঙ্গল, গাছের নাম সবকিছুতেই যেন অকৃত্রিম গ্রাম্য-প্রকৃতির প্রেমের চিত্র ফুটে ওঠেছ। নস্টালজিয়া একটি পরিমাপের মত এটি এমন একটি উপায় যা আমরা জিনিসগুলির ট্রাক রাখি, আমরা জীবনের অগ্রগতি নিরক্ষণ করি, কেবল নিজের জন্য নয়, এমনকি অন্য লোকদের জন্যেও, যাদের সাথে আমরা খুব সংযুক্ত। এইরূপ ভাব তাঁর গল্পের পরতে পরতে জড়িত। এমনই কয়েকটি গল্প হল: 'কুসুমতলা', 'বাবার স্মৃতি', 'হোমগার্ডের জামা', 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা', 'যে জীবন ফড়িংয়ের, দোয়েলের', 'ঘবা তিহা-র গল্প', 'খোরপোষ', ইত্যাদি। আলোচ্য গল্পগুলিতে জন্মভূমির নিম্নমধ্যবিত্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয় পাই, যাঁদের জীবনযাত্রা আলোর অভাবেও আঁধারে কেটে যাচ্ছে – "আমাদের ইতিহাস নেই/অথবা এমনই ইতিহাস"[১] এদের প্রতিভূ হয়ে লেখক নস্টালজিয়ার ক্যানভাসে উদ্ভাসিত ছবি ফুটিয়ে তোলে, বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে চান। এইভাবেই লেখকের ছোটগল্পগুলিতে সীমাহীন নস্টালজিয়ায় আলেখ্য অণু-পরমাণু সন্ধান করাই, এই গবেষণাধর্মী নিবন্ধটির মূল তাৎপর্য।

সূচক শব্দ: মাতৃভূমির প্রতি নাড়িত্বের সর্ম্পক, নস্টালজিক মনের গুরুত্ব, প্রত্যন্ত গ্রাম্য জীবনের ছবি, শহুরে জীবন কাটানোর স্বাদ, অনালোকিত ও অনালোচিত ভারতবর্ষের ছবি প্রভৃতি।

মূল আলোচনা:

কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা, যত বড় গল্পকার তাঁর চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ভাসান' (১৯৮৩)। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'বাবার স্মৃতি' (১৯৭৮), দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। বাংলা কথাসাহিত্যে নলিনী বেরা অতি পরিচিত হয়ে ওঠেন 'শবরচরিত' চারখণ্ডে (২০০৫), এবং 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' (২০১৮), উপন্যাসের জন্য। 'শবরচরিত' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার' আর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসের জন্য পেলেন 'আনন্দ পুরষ্কার'। ঝাড়গ্রাম-মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র লেখক নলিনী বেরা। তথাকথিত পুরস্কার-সম্মান-এর প্রত্যাশা না করেই নিজের জন্মভূমি, সুবর্ণরেখা অঞ্চলের স্বভাব জনজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনায় তিনি ব্রতী হন। নিজের জন্মভূমি বলতে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার 'বাছুরখোঁয়াড়' গ্রাম-এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানিয়েছেন "গ্রামকটি বাড়তে বাড়তে উত্তরদিকে সাঁওতালপাড়া-ভুঁইয়া-ভূমিজপাড়া ছাড়িয়ে প্রায় সুবর্ণরেখা নদীধার ছুঁয়ে ফেলেছে আর দক্ষিণদিকে, কুমোরপাড়া-কামারপাড়া-ডোমপাড়া ছাড়িয়ে 'তপোবন জঙ্গলমহল'-এ পৌঁছে গেছে, জঙ্গল পেরুলেই উড়িষ্যা।"[২] ('ভূতজ্যোৎস্না'-র ইতিকথা'–'নীললোহিত')। তাঁর ছোটগল্পে এই গ্রামের চারপাশে থাকা সাঁওতাল-ভূমিজ-কামহার-লোধা-শবর জনজাতির মানুষের চিত্র ফুটে ওঠেছে। নলিনী বেরার ছোটগল্পের বর্ণনায় রয়েছে অভিজ্ঞতা-নির্ভর জীবনবোধের বিস্তার। অতীতচারী দৃষ্টিভঙ্গির স্মৃতিমেদুরতায় তাঁর গল্পগুলিতে ভিন্ন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে তিনি শহরের বাসিন্দা হলেও, তাঁর নিজের গ্রামও তৎসন্নিহিত অঞ্চল তাঁকে মোহময় আকর্ষণে বেঁধে রেখেছে। যে গ্রামকে তিনি হাতের তালুর মতো জানেন ও চেনেন সেই গ্রামের প্রতি তাঁর সীমাহীন নস্টালজিয়া ধরা পড়েছে। লেখকের 'কুসুমতলা' গল্পে আমরা তারই প্রতিচ্ছবি পরতে পরতে দেখতে পাই। প্রতিটি পদক্ষেপেই মাতৃভূমির প্রতি আমরা তাঁর এক নাড়িত্বের স্বাদ অনুভব করি। জঠর-জ্বালায় শহুরে জীবনে ব্যস্ততায় মাতৃভূমির উপাদান হঠাৎ দেখতে পাওয়ায়, জন্মভূমির প্রতি তাঁর কতখানি ব্যাকুলতা ও আকুলতা তারই ছবি আমরা দেখতে পাই। রূপ-রস-বর্ণহীন শহুরে অন্ধময় জীবনে হঠাৎ পাওয়া মাতৃভূমির স্বাদ যেন আলোর বন্যা বয়ে আনে। এই গল্পে কথকের, তখনই তাঁর কর্ণকুহুরে প্রতিধ্বনি হয়; রবি-কবির 'প্রভাতফেরি' গান "আজ এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের 'পর/ কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান/ না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ/ জাগিয়া উঠিল প্রাণ/"[৩] পেটের জ্বালায় বাধিত হয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকতে হলেও মাতৃভূমিতে ফিরে আসার মর্ম-বেদনা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করতেন। এই গল্পে কথক রবি-কবির সৃষ্টি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার 'উপেন' চরিত্রের মত নিজের মর্ম-ব্যথা প্রকাশ করেছেন। কথক গ্রামের কুসুমতলার কাছাকাছি পৌঁছাতে না পৌঁছাতে বিড় বিড় করে বলে উঠেন "নম নম সুন্দরী মম"[৪] আবার কখনো বলে ওঠেন 'মাতৃজঠরের ওম্ পেলাম', "জননী

জন্মভূমিশ্চ”। মানব জীবন ভগ্যচক্রে যে অবস্থায় দিন অতিবাহিত হোক না, মাতৃভূমির নাড়ির সম্পর্ক বিন্দুমাত্র ছিন্ন হয় না বরং সেই জীবনে প্রতিটি স্থানে খুঁজে নেয় মাতৃভূমির রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ। গল্পের কথকও খুঁজে পান শহুরে জীবনের এই স্বাদ অহরহ চলার পথে – ‘বাসন উলি’, ‘আনাজউলী বুড়ী’, অবাঙালি বৃদ্ধর ‘কুসুমফল’, প্রভৃতি। তখনই মাতৃভূমির এক অনন্য স্বাদ খুঁজে পান আর অস্ফুটে বলেও ফেলেন- “ও হো স্বদেশ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরিয়সী”[৫]। কথক শহুরে নকল জীবনে, তাঁর আসল মাতৃভূমির রসস্বাদ পান; নস্টালজিক মনের মাধ্যমে তারই কথা ‘কুসুমতলা’ গল্পের প্রতিটি পাতায় ধরা পড়েছে।

‘বাবার স্মৃতি’ গল্পটি গল্পকার নলিনী বেরা ছোটগল্পের প্রথম প্রকাশিত গল্প। গল্পটি দেশ পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক গল্পটিতে স্মৃতি রোমান্থন এর মধ্য দিয়ে প্রিয়জনদের অনন্তকালব্যাপী অন্তরের অন্তস্থলে ধরে রাখার ও মনে রাখার ছবি এঁকেছেন। হারিয়ে যাওয়া পাশের মানুষদের আরো কাছে পাওয়ার চেষ্টা, এক নতুন রূপে, নতুন স্বাদে। আমাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়িত মানুষগুলি সাময়িকভাবে অবচেতন মনে অবস্থান করলেও, নস্টালজিয়ায় তাঁরাই উজ্জ্বল হয়ে আরো জ্বল জ্বল করতে থাকেন। তাঁদের দেহের মৃত্যু ঘটলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। তাঁরা এসে আমাদের মনের কোঠায় বাস করেন আর এই বেদনাময় স্মৃতিমেদুরতায় তাঁরা সদা প্রাণবন্ত। এই গল্পে কথক বাবা ও মা দুজনকে হারিয়ে শহরে জীবনে বড় চাকরি করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপন কাটলেও, শান্তির স্বাদ পাননি। ‘হঠাৎ টেলিগ্রাম’ এর মত যে কথাটা ভেসে আসে এবং কথককে শোকাগ্রস্থ করে, এই শোকের ছায়া সেদিন যেভাবে নেমে এসেছিল আজ আরো দীর্ঘতর থেকে দীর্ঘতম হয়েছে। বাবার মৃত্যুর দিনের যে শোক কথকে ছুঁয়েছিল, তা যে শত কেনারামের কান্না মিশালেও আমার সমান হবে না। এ যে একান্ত নিজের নীরব-নিশ্চুপে নস্টলজিক মনই তাকে অন্য স্বাদে ধরে রাখে। এই কথাই ‘বাবার স্মৃতি’ গল্পে মূলসুর- “এ তোমার কি বলচ, বাবার মৃত্যু খবর আগে কাঁদতে পারিনি বলেই কি বাবাকে ভালবাসি না, নাকি? বলা হয় না, আর এভাবে কোনদিনও বলা হবে না, তাই কথাটা মনে এলে অ-বলার মত কাঁদি। যেমন এখন। এই দেখ আমার দুচোখে টসটস জল, হাতের চেটো ভেসে যাচ্ছে।”[৬] তাঁদের প্রকৃত মূল্য আমাদের মনের আঙ্গিনায় বারে বারে ধরা পড়েছে লুকোচুরি খেলার মত – “একি মা লুকলুকানি খেলচ না তো? সেই ছেলেবেলার মতো ভেবে মাকে খুঁজতে লাগলাম। একসময় দেখি, খেতির সবচেয়ে বড় কুমড়োটা বুকে আঁকড়ে মা বসে আছে, তার চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে। দেখতে পেয়ে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল, বলল, ‘খোকা, তোর বাবার হাতে বড় পয়া ছিল রে।”[৭] যে মানুষটার সাথে দিনরাত্রি ঝগড়া বাঁধত, স্মৃতিরপাতায় সেও আজ মধুময় হয়ে ওঠেছে।

‘হোমগার্ডের জামা’ গল্পটিতে গ্রামের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র ধরা পড়েছে। গল্পের নায়ক সুকুমার অর্থের অনটনে শহরে হোমগার্ডের চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে।

অর্থকারী শহর সুকুর পেটের জ্বালা মেটালেও মনের ক্ষুধা আর প্রখর হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ সুকুমারকে বছর যেতে না যেতে গ্রামে ফিরে আসতে আমরা দেখি। তারপরও সুকুমারকে সতত বেদনা পেতে দেখি, তার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠা চাকরি জীবনের জন্য। তার পরিচয় আমরা পাই সযত্নে তুলে রাখা হোমগার্ডের জামার মধ্য দিয়ে। এই বেদনা কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছিল তাও আমরা দেখি, মধ্যরাতে শুনতে পাওয়া কথক, সুকুকাকার গানে – "ছোটকাকা নেই, বড় নির্ভাবনায় ছোটকাকীর কোলে ঘেঁষে শুয়ে পড়েছি, মধ্যরাতে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলে শুনি গান হচ্ছে গুনগুন করে – "দুটি পাখি দুটি তীরে মাঝে নদী বহে ধীরে' ওপারে তুমি রাধে এপারে আমি, মাঝে নদী নীরবে বহে" কিংবা "এ কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি মাঝখানে নদী বহে চলে যায়" - শুধু নদী নদী।"[৮] গল্পে সুকুমার অতীতমোহের জন্য 'হোমগার্ডের জামার' গল্প রত্নার মতো সবাইকে নানা কৌশলে বলে, আনন্দ ও সান্ত্বনা পাওয়ার অবিরাম চেষ্টা করে – "দুর্দিনে দুর্বিপাকে পড়ে দিন দিন যতই পিষ্ঠ হচ্ছে আমাদের ছোটকাকা ততই জনে জনে ডেকে ডেকে সে তার হারানোর হোমগার্ডর সার্ভিসের গল্প করে।"[৯] বাস্তব জীবনে যা কিছু অ-মূল্য বলে মনে হয় এবং জীবনকে বিষাদে পরিণত করে; স্মৃতিমেদুরতায় তাই সবকিছুই এক অমূল্য রূপ পায়। তাকে যেন মানুষ আরো সোহাগে মোড়ে পুঁটলি বেঁধে রাখে পরতের পর পরত। এই গল্পে ছোটকাকী তাঁর স্বামীর সযত্নে রাখা হোমগার্ডের জামা, বিনুকে সেই জামা দেখানোর ব্যাকুলতা যেন অতীত প্রেম-প্রীতি ধারাকে আরো সংযত দৃঢ় করার গোপন সংকল্প করে চলে। আমাদের এই অতীতমোহই নস্টালজিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট। নস্টালজিয়া অসংখ্য সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে। আমরদের জীবনের অতীতকে মনে রাখতে অনুপ্রাণিত করে। এটি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের, আমাদের মা-বাবা-ভাই-বোন, আমাদের বন্ধুদের সাথে, আমাদের বন্ধনের অংশ। এটি আমাদের অন্য মানুষের সাথেও সংযুক্ত করে। নস্টালজিয়া সেই অর্থে খুব সুস্থ সামাজিক অবেগ। এই চিত্রই আমরা দেখি, এই গল্পের নানান শাখায়, ছোটকাকা চাকরিহীন জীবনে হোমগার্ডের জামার গল্প, ছোটকাকীর হোমগার্ডের জামার আরো কয়েক পরত কাপড় বেশি বাঁধার গল্প, এছাড়া কলকাতাবাসী কথক বিনুর চোখ দিয়ে অতীতমোহ ফুটিয়ে তোলার গল্প, তারই স্বাক্ষর রেখে যায় – "আমি বিনু ততক্ষণে ঘাড় হেঁটে করে বাষ্পাকুল চোখে দেখে যাচ্ছি - কেমন ধীরে ধীরে জামার পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের ছোটকাকা মেজকাকা একটা গোটা পরিবার, একটা গ্রাম..."[১০]

'ঘোড়া ও সর্ষেদানা' গল্পে গল্পকার স্মৃতিবিজাড়িত জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে আদিম ও আধুনিককালের তাল-মিল অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। চৌষট্টি অতিক্রান্ত উমাকান্ত সিং দিকচক্রবাল অস্তগামী সূর্যের অন্তিম আলোকচ্ছটায় স্মৃতিমৃদুরতায় আঁকা পূর্বকাল ও তৎকালের গোটা শতাব্দীর যাবতীয় গুণাবলী ফুটিয়ে তুলেছেন, 'শতব্দীমঙ্গল' রচনার মধ্য দিয়ে – "রচনার বিষয় গদ্যে হোক পদ্যে হোক

তুলে ধরতে হবে এমন একটা মৃত অথবা জীবিত অদ্ভুত চরিত্রের মানুষকে যার মধ্যে বিগত শতাব্দীর যাবতীয় গুণাবলী আছে।”[১১] স্মৃতিবিধুরতা, গভীর উপলব্ধির মানুষরাই অতীত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ-আহ্লাদ যেমন বিচার করেন এবং তার থেকেও জীবন চলার নতুন নতুন পথের অনুসন্ধান করতে পারেন। এই গল্পে উমাকান্ত সিংকে লক্ষ টাকার পুরস্কার পেতে অথবা হারিয়ে যাওয়া মেয়ের অনুসন্ধানের সবুজ সংকেত আমরা আনুমান করতে পারি। এইভাবে নস্টালজিয়ায় বর্তমানের বাঁচার স্বাদকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।

নলিনী বেরার ছোটগল্পে তার বহমান জীবনের প্রতিটি ঘটনায় যেন গল্পের উপকরণ হয়ে গেছে। সময়ের অভিঘাতে, কাঁচ টাকার প্রাদুর্ভাবে গ্রামের অতীত সংস্কৃতি নেই, গ্রাম সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস, গ্রামের জীবন সভ্যতার ‘ডিটেলস’ গল্পগুলিতে অসাধারণ বর্ণায় প্রকাশ হয়েছে। জন্মভূমির মাটির সঙ্গে তাঁর আবাল্য নাড়ির সম্পর্ক, সেখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁর আশৈশব প্রাণের নিবিড়তা, তাঁর মনকে অহরহ স্পর্শ করে রয়েছে। তারই চিত্র-বিচিত্রতার ছবি ফুটে উঠতে আমরা দেখি নলিনী বেরা’র ‘যে জীবন ফড়িংয়ের, দোয়েলের’ গল্পেও। গল্পের নায়ক দ্বিজপদ আট বছর বাদে গ্রামে ফেরার বেদনা-মিশ্রিত মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে – “মায়া-মমতা বিষয় আশায় ছাড়লে তবে লোকে সন্ন্যাসী, দ্বিজপদ এসব ছেড়ে নিজের কেরিয়ার গড়তে আটটি বছর কলকাতার হোদোয়।”[১২] আট বছর আগে ও পরের মাতৃভূমির মানুষ-প্রকৃতি-সংস্কৃতির রূপ বৈচিত্রের তুল্যমূল্য পার্থক্য দ্বিজপদের স্মৃতিচারণে ধরা পড়ে। হারিয়ে যাওয়া জঙ্গল, রোহিণীগ্রাম, দুটো জামগাছ, চায়ের স্টল, ভাই নিরাপদ এর ক্লাবে পড়ে থাকার ঘটনা প্রভৃতি অর্থাৎ আট বছর আগের ইতিহাসের আমূল পরিবর্তন। কথককে কালের নিয়মে বয়ে যাওয়া পরিবর্তিত গ্রাম-বৈচিত্র্যকে নিঃশব্দে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে। কথককে আট বছর আগের মাতৃস্বাদের রূপ-রস-গন্ধ নীরবে, একান্তে গ্রহণ করতে দেখি – “দ্বিজপদ হাতে টিপে দেখল, মধ্যমা বেঁকিয়ে গাঁট্টা মেরে শুনল- আট বছর বাদের গ্রাম কী বলে? আর কী বলে, বলে তুমো আছ আমো আছি”[১৩]। দ্বিজপদের জীবনচক্রে বিদেশ-বিভূঁইয়ে কাটতে হয়। তাঁর ভাগ্যচক্র মা দুর্গা ও ধানহুলো মাছের মত ক্ষণিক সময়ের জন্য মাতৃভূমিতে থেকে ভেসে যেতে হয়, তাদের জীবনের সাথে যেন একসূত্রে তাঁরও জীবন বাঁধা। তবুও গ্রাম্য জীবনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতা স্মৃতিপটে বিজড়িত রয়েছে। গল্পের কথককে আবৃত্তি করতে শুনি, কবি জীবনানন্দ দাশের “আট বছর আগের একদিন” কবিতার লাইন – “ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন কোন বিকীর্ণ জীবন/অধিকার করে আছে ইহাদের মন”[১৪] স্বদেশভূমির প্রতি গভীরতম নাড়ির সম্পর্ক মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকতে পারেননি। দ্বিজপদের নস্টালজিক মনের গহনে তাহাদের ছবি বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসে।

পল্লী-প্রকৃতির লেখক নলিনী বেরা সমাজসচেতন আগ্রহী মনোভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে, তাঁর রচিত গল্পগুলিতে। সমাজের যে প্রান্ত থেকে লেখক

উঠে এসেছেন, সেই জনজাতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবনযাত্রার বৈচিত্রকে ভারতবর্ষের বুকে তুলে ধরার অবিরাম চেষ্টা দেখেছি 'ঘবা তিহা-র গল্প'। গল্পের নায়ক বিশ্বেশ্বরের ফেলেআসা 'গ্রাম্য' মালমশলাই, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেছে। বিশ্বেশ্বরের কবিতার খাতার নামকরণ সেইরূপ 'সে গ্রামে এখনো কবিতা আছে'- এম.এ পড়া বিশ্বেশ্বরের এই কবিতার বিষয়বস্তু শুধু তার মনের খাতায় জমাট বাঁধানো নয়। তাঁর মাতৃভূমির প্রতি ঋণশোধের এক কৌশল যেন ব্যবহার করেন। কলকাতার কৈলাস বসু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে তাবুড় দিয়ে বিশ্বশ্বর সাঁপুই লিখে চলেছে - "এখনো আঁদাড়ে কাঁদাড়ে ফোটে ফুল। শুশনি দঙ্গল ঢেকে থাকে গ্রামের পুকুর। কলমিনাড়ায় বেড় দিয়ে খেলা করে জলঢোঁড়া সাপ। আজও বর্ষায় কলরব করে ওঠে শতকোটি ভেক।"[১৫] শুশনি দঙ্গল, কলমিনাড়ায়, জলঢোঁড়া ইত্যাদি উপাদানগুলি যেন তৎকালীন নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম্য জীবন-যাপনের চিত্র ফুটে ওঠে। 'বঘা তিহা'র গল্প' অর্থাৎ বাঘ হাতির গল্পর মত বিশ্বেশ্বরেরও উল্টো জীবন অতিবাহিত হয়। বিশ্বেশ্বরও তাঁর আত্মীয়স্বজন-বাবা-কাকা-ভাই-বোন সপরিবারে একসাথে জীবন কাটানোর ইচ্ছে থাকলেও, কালের অমোঘ নিয়মকে বারে বারে মেনে নিতে হয়েছে। হাতিদের মত দলছুট হতে হয়েছে। তাঁকেও কাল কাটাতে হয় বিদেশ-বিভূঁইয়ে। জীবনের এই দুই দ্বন্দ্বে বিশ্বশ্বরকেও শেষ অবধি মেনে নিতে হয় অমোঘ নিয়মকে, আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয় মুঠোভরা স্মৃতি। এই গল্পের অন্তিমে আমরা তাঁর চিত্র লক্ষ্য করি – "সুধারাণী জানেন, এভাবে আর কতদিন লড়বে বিশ্বেশ্বর। আজ হোক কাল হোক তাকে নতুন ভাষা, নতুন হাঁটা শিখতে হবে। আর এম. এ পড়া বিশ্বেশ্বরের কাছে সে সব ততো কঠিন নয়।"[১৬]

লেখকের লেখা 'খোরপোষ' গল্পে একই সুর ফুটে ওঠতে আমরা দেখি। গ্রাম ও গ্রামের চারপাশের সীমাহীন মাতৃভূমির রসস্বাদ। লেখকের ছেলেবেলা কেটেছিল জঙ্গলমহলের এক গ্রামে, যা ছিল বর্তমান ভারতবর্ষের বুকে অনালোকিত অনালোচিত এক প্রত্যন্ত নিম্নবর্গীয় অঞ্চল। লোধা-সাঁওতাল-ভূমিজ-কামাহার-শবর জনজাতির মানুষজন। লেখক যেন তাঁদের শারিক হয়ে নিজেদের মর্ম-বেদনার কথা সমগ্র ভারতবর্ষকে জানাচ্ছেন, করমশাইর কাছে গল্প বলার ছলে – "আমি জানি আমার সহজ শৈশব/ কেটেছে পুকুর পাড়ে হিঙচারগাছ আর/ কেদারের বউ দুজনেই পাশাপাশি দেখেছে/ আমাকে, ধবলী ছাগল সুনা সাঁওতাল/ দেখেছি বাঁদর নাচ কেঁদারার ছো দিনমান-"[১৭] এইভাবে লেখক কখনো গল্পের উত্তম রূপে প্রবেশ করে, স্মৃতিমেদুরতায় তাঁদের ছবি আঁকতে গিয়ে ভুলে যান তার বর্তমান অবস্থার কথা। 'মুহূর্তে চাকুরিস্থল কলকাতা, কফি হাউস, শহরে বন্ধুবান্ধব - সব উধাও।'[১৮] কখন যে পৌঁছে যান গাছ মানুষ বা মানুষ গাছের দেশে, যেখানে শুধু হিড়মিচা, ঘলঘসই, আঁটারি, চরচু, কুচলা, শাল, পিয়াশাল... কত রকম গাছ। অথবা গাছের চেয়েও বেশি দেখেছি মানুষ - রাইবু, চামটু, গুড়গুড়িয়া, সামাই, ঢালো দিদি, গুরমা, ধনু, সুনা সাঁওতালের গল্পে। এদের জীবনযাত্রায় কখনো উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে ওঠে না। বরং হেরিকেনের নীলচে

টিমটিমে আভা নিয়ে কোনমতে টিকে থাকে। গল্পের কথক যেন মিচকানো হেরিকেনার পলতেটাকে উসকে বাড়িয়ে দিয়ে আরো এক গ্রাম্য ভারতবর্ষের বার্তা যেন জনে জনেকে জানাতে চান। তাঁদের অবিকল রূপ আঁকতে গিয়ে লেখক সশরীরে উপস্থিত না হলেও, সীমাহীন নস্টালজিক মনের কাছে বারে বারে আশ্রয় নেন ।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সমস্ত গল্পগুলিতে গল্পকার সীমাহীন নস্টালজিকতার অঙ্কনে আতিশায্যতা দেখাননি। রয়েছে গ্রাম্য প্রকৃতির মত নির্মল-সহজ-সরল রূপের ও ভাবের বর্ণনা। গ্রামের সবুজ-সতেজ জঙ্গল ঘেরা অকৃত্রিম, অনাতিশয় অতীত দিনের কথা রয়েছে। গল্পগুলি তাই আপন মহিমায় মাতৃত্বের রসে পরিপুষ্ট। এই স্বাদ আমরা নলিনী বেরার পূর্বসূরি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পথের পাঁচালী’, ‘আরণ্যক’, অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ প্রভৃতি কথাসাহিত্যেও লক্ষ্য করি। তবুও যেন মনে হয় নলিনী বেরার গল্পগুলিতে সীমাহীন নস্টালজিয়ায় ফুটে ওঠে মাতৃত্বের নিগূঢ়তম টান ও অখন্ড নাড়িত্বের সম্পর্ক, এক আলাদা মর্যাদায় লেখককে ভূষিত করেছে। নলিনী বেরার গল্পের সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাঁর চিরপরিচিত রক্তের সম্পর্কে বাঁধা, পরম আত্মার আত্মীয়; ‘খোরপোশ’ গল্পে সুনাভাগ্না, ঢোলো দিদি, ‘কুসুমতলা’ গল্পে কংসাহরি সাঁওতাল, খেকরে মাই, ‘এই এই লোকগুল’ গল্পে হংসী নাউড়িয়া, প্রমথনাপিত, প্রভৃতি। এছাড়া নয়গ্রাম, কুঠিঘাট, গোপীবল্লভপুর, সুবর্ণরেখা নদী, পাঁচকানিয়া, কমলাসুলি, ডুলুং নদী, পঁড়াছেচা, দুধমারি, প্রভৃতি সবকিছুর গ্রাম্য-প্রকৃতির ছবি ফুটে উঠেছে তার গল্পে। এছাড়া সেখানকার নানা জাতি-সংস্কৃতির উল্লেখ, হাটুয়া ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার, লেখকের জন্মভূমি ও তার চারপাশ নিয়ে সীমাহীন নস্টালজিয়ায় জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। স্মৃতিমেদুরতার প্রতিটি পাতায় মাতৃভূমির এই গভীরতম অনুভূতি ও নাড়িত্বের টান আমরা অন্য কোথাও খুঁজে পাই না। এখানেই লেখক অদ্বিতীয়। আবার শহুরে জীবনের প্রতি তিক্ত মনোভাবও লক্ষ করি। এমনই করে লেখক তাঁর জন্মভূমির মানুষজনের জীবন-যাত্রা, যে আলোর অভাবে আঁধারে কেটে যাচ্ছে, তাঁহাদের চিত্র গল্প আকারে ফুটিয়ে তোলে; বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে চান। এভাবেই সমাজসচেতন লেখক নলিনি বেরা মাতৃভূমির প্রতি পূর্ণ দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য পালন করে, মাতৃহঋণ শোধ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন। গবেষেণার দৃষ্টিভঙ্গিতে, গল্পকার গল্পকারের ছোটগল্পগুলিতে সমগ্র ছোটগল্পগুলি গভীর নস্টালজিক মনের স্মৃতিমেদুরতা, আবেগঘন মাতৃভূমির সুধারস অবিকৃত রূপে অণু থেকে পরমাণুর এক নিটোল আলেখ্য।

তথ্যসূত্র:

১)	ঘোষের, শঙ্খ, *‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’*, ‘ আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’, দে’জ পাবলিশিং, দে সুধাংশুশেখর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা,

২) সৃজনী, কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পা.) , '*বিষয়ঃ নলিনি বেরা বিশেষ সংখ্যা*', Vol.27: Special Issue: November 2019 ISSN 2278-8689

৩) বেরা, নলিনী, 'কুসুমতলা' পৃ:-৩১ , *'সেরা পঞ্চাশটি গল্প',* দে'জ পাবলিশিং, দে সুধাংশুশেখর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

৪) তদেব, পৃ:-৩৪

৫) তদেব, পৃ:-২৯

৬) তদেব, 'বাবার স্মৃতি', পৃ:-৩৮১

৭) তদেব, পৃ:-৩৮১

৮) তদেব, 'হোমগার্ডের জামা', পৃ:-১৩৪

৯) তদেব, পৃ:-১৩৫

১০) তদেব, 'ঘোড়া ও সর্ষেদানা', পৃ:-৮৮

১১) তদেব, 'যে জীবন ফড়িংযের, দোয়েলের', পৃ:-১৬১

১২) তদেব, পৃ:- ১৬৫

১৩) তদেব, পৃ:- ১৬৮

১৪) তদেব, 'ঘবা তিহা-র গল্প' পৃ:-৪১৭

১৫) তদেব, পৃ:-৪৩২

১৬) তদেব, 'খোরপোষ' পৃ:-৯৫

১৭) তদেব, পৃ: -১০৪

১৮) আধিকারী, অমর, *'বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন' (১৯৫০-২০০০),*

সহায়ক আর্কাইভ্যাল ও বৈদুতিন তথ্য:

১) https://pagefournews.com

২) https://dwaipayanblogspot.com

৩) https://bn.ninanclsonbooks.com

৪) https://www.apa.orgnostaliga.com

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ-যুদ্ধ, মন্বন্তর ও মানুষ

আশিস কুমার সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

সংক্ষিপ্তসারঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের বুকে যে কয়েকজন ছোটগল্পকার সেই সময়কালের বাংলার সংকটময় পরিস্থিতিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ছোটগল্পের পাতায় জীবন্ত দলিল হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইতিহাসসচেতন ও সময়সচেতন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম একজন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের পাতায় পাতায় তুলে ধরেছেন সমকালীন মন্বন্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের অসহায়তার ছবি। মারী, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, কেরোসিনের অভাব প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল মানুষকে মহা জীবনসংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল। গ্রাম বাংলার সংকটময় পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারির মাধ্যমে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিল একশ্রেণীর মুনাফাখোর মজুতদার জমিদার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'দুঃশাসন', 'পুষ্করা', 'নক্রচরিত', 'হাড়' প্রভৃতি গল্পগুলি যার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আলোচ্য এই প্রবন্ধে 'দুঃশসন' ও 'পুষ্করা' গল্প দুটি আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের মতো পরিস্থিতিতে বাংলার গ্রামীণ সমাজের অসহায় মানুষের জীবন বিপর্যয়ের বাস্তব চিত্রকে বাস্তববাদী লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কতখানি সফলতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

সূচক শব্দঃ পুষ্করা, দুঃশাসন, মারী, মড়ক, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর পরবর্তী সময়ে বাংলার গ্রামীণ সমাজের অসহায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন যখন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু মুনাফাখোর সুদখোর মহাজন জমিদার তাদের সংকীর্ণ ব্যাক্তিস্বার্থকে কায়েম করার লক্ষ্যে নেমে পড়েছিল সারা বাংলা জুড়ে। নিষ্ঠুরতার সেই চরম নিদর্শনের বাস্তব রূপ দেখতে পাই বাংলা প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পের পাতায় পাতায়। বাংলা সাহিত্যের বুকে যে কয়েকজন ছোটগল্পকার সেই সময়কালের বাংলার সংকটময় পরিস্থিতিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে ছোটগল্পের পাতায় জীবন্ত দলিল হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইতিহাসসচেতন ও সময়সচেতন লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম একজন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের পাতায় পাতায়

তুলে ধরেছেন সমকালীন মন্বন্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের অসহায়তার ছবি। মন্বন্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকার। মারী, খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকট, কেরোসিনের অভাব প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল মানুষকে মহা জীবনসংকটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল। গ্রাম বাংলার সংকটময় পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারির মাধ্যমে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিল একশ্রেণীর মুনাফাখোর মজুতদার জমিদার।

মুনাফাখোর অমানবিক মজুতদারের নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর লেখা ‘দুঃশাসন’ (১৯৫২)গল্পে। গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যুদ্ধের সময় গ্রাম-বাংলার বাজারে যে ভয়াবহ বস্ত্রসংকট দেখা দিয়েছিল তারই বাস্তব রূপচিত্র। গল্পের প্রথমে দেখি একটি লোক তীর্থের কাকের মতো বসে রয়েছে একজোড়া কাপড়ের জন্য। লোকটির কাতর প্রার্থনা একজোড়া কাপড় যদি সে পায় তাহলে অন্তত তার মান ইজ্জত থাকে। নাছোড়বান্দা লোকটি দুহাতে দেবীদসের পা আঁকড়ে ধরার পরও দেবীদাসের কঠিন হৃদয়ে ছিটে ফোঁটা করুণার উদ্রেক ঘটেনি, বরং লোকটির আচরণে সে রীতিমতো বিরক্ত হয়েই গম্ভীর ও ক্রুর কণ্ঠে বলে-“কী করবি বল- সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা। কাপড় থাকলে কি আর তোকে দিতাম না? আমার কাজই তো ব্যবসা করা- ঘরে মাল পচালে আমার কোন লাভ আছে বলতে পারিস”[১] দেবী দাসের কাছে নিষ্ফল হয়ে শেষপর্যন্ত লোকটি নিরাশার অন্ধকারে কিছুক্ষণ পাথরের মতো স্থির থেকে সেখান থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ঝানু মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর মতো দেবীদাস উপলব্ধি করেছে, গভীর সংকটময় পরিস্থিতিতে যদি এই সমস্ত মানুষকে কাপড় বেচে তাহলে তার ব্যবসার মুনাফা লাটে উঠবে। তাই ভাইপো গৌরদাস লোকটিকে অন্তত একটি কাপড় দেওয়ার অনুরোধ জানালে দেবী দাস ভ্রুভঙ্গি করে বলে –“ওকে একখানা দিলে দুঘণ্টার মধ্যেই দোরগোড়ায় উল্টো চণ্ডীর মেলা বসে যেত না? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশি নেবার উপায় নেই। পর পর কতগুলো মামলা হয়ে গেল– দেখছিস না?”[২]

দেবীদাস মস্ত বড়ো একজন ব্যবসায়ী। কাপড়ের একজন বড়ো আড়তদার। খুচরো থেকে পাইকারি সবটাই সে বিক্রি করে। তার কাপড়ের উপর কাছাকাছি আট-দশখানা হাট নির্ভর করে। কিন্তু যুদ্ধপরিস্থিতিতে বস্ত্রের গভীর সংকটের সময় সরকারী দামে কাপড় বিক্রি করলে মুনাফাতো দূরের কথা পড়তা পোষাবে না।

গৌরদাস এখনো দেবীদাসের মতো পাকা ব্যবসায়ী হতে পারেনি। তাই এই সমস্ত ঘটনাকে মন থেকে মেনে নিতে তার কষ্ট হয়। সভয়ে ইতস্ততভাবে সে দেবীদাসের উদ্দেশে বলে-“কিন্তু এভাবে চলবে কদিন?”[৩] পাকা ব্যবসায়ীর মতো এ সবকিছুকে পাত্তা না দিলেও থানা থেকে আসা এল.সি.কানাই দে কে পাত্তা না দিয়ে পারে না। কানাই দে এসেছে দারোগা শচীকান্তর হয়ে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা নিতে।

পঞ্চাশ টাকা চাঁদা শুনে দেবীদাস চমকে উঠলেও কানাই কিন্তু নির্বিকার চিত্তে জানিয়ে দেয় –"আলবৎ। সমুদ্র থেকে এক আঁজলা।"[৪] চাঁদা চাওয়ার উদ্দেশ্য, দারোগাবাবুর শখ মেটাতে যাত্রার আসর বসবে থানায়।

বস্ত্র সংকটের পাশাপাশি কেরোসিনের অভাবে গ্রামে গ্রামে আলো জ্বলে না। অন্ধকারেই তলিয়ে থাকে গ্রামগুলো। গ্রামের অন্ধকারের ভয়াবহতা যে কতখানি ভয়ঙ্কর তা গল্পের মধ্যেই গল্পকার নিখঁত বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন- "কেরোসিনের অভাবে আজকাল অন্ধকারেই তলিয়ে থাকে গ্রামগুলো। বাঁশবনের ছায়ায় জংলাপথের পাথুরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকাল চলাফেরা করে– মানুষ, শেয়াল আর সরীসৃপ। কার মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎটা যেন আদিম একাত্মতায় ফিরে গেছে । রোজ দু'তিনটে করে সাপে কাটার এজাহার আসে থানাতে,- মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর হিংসা যেন নির্মম হয়ে উঠেছে। ওদিকে মুচিপাড়ার একটি মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে, পরশু দিন নিষুতি রাত্রে ওর ঘরের বেড়া ভেঙে শেয়ালে ছেলে চুরি করে নিয়েছে। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।"[৫] এই দৃশ্য যখন গ্রামের সর্বত্র তখন উল্টোদিকে ভিন্ন দৃশ্যও চোখে পড়ে। দারোগাবাবুর শখ মেটাতে আয়োজিত যাত্রার আসরের ডে-লাইটের আলোগুলোর অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বলতা যেন গ্রামের মানুষের চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে থাকে। এই আলোয় উদ্ভাসিত হতে থাকে আয়োজক শচীকান্তর ভাবভঙ্গি। যুদ্ধের বাজারে গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড়ের আশায় তীর্থের কাকের মতো দেবীদাসের পায়ের কাছে মাথা নত করে বসে থেকেও নিরাশার অন্ধকারে ফিরে আসতে হয়। তখন কিনা সেই দেবীদাসের কৃপায় ক্ষমতাবান শচীকান্তর গায়ে দুষ্প্রাপ্য আদ্দির পাঞ্জাবিটা হাওয়ায় উড়তে থাকে। আর শচীকান্ত যখন গ্রামের মানুষগুলোর উদ্দেশে বলে –"ওরে বোস, বোস তোরা– বসে পড়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই তো গান- তোদেরই তো জন্যেই দেড়শো টাকা খরচা করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম। নে– বসে পড়।"[৬] তখন "অর্ধনগ্ন অর্ধভুক্ত মানুষগুলো যেন কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না।"[৭]

যাত্রাপালার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান'। যাত্রাপালায় দ্রোপদীর আর্তনাদের তীব্রতায় গৌরদাসের মনে হল-"-সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রোপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে? কে বলবে!"[৮] যুগসচেতন ও ইতিহাসসচেতন সুদক্ষ গল্পকার কালের নিয়মে ইতিহাস পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পের মধ্যে –"...ইতিহাসের চাকা চলেছে ঘুরে। ওদিকে রাত শেষ হয়ে গেল। ডে-লাইটের আলোগুলো ক্রমেই ম্লান হয়েই আসছে। ওপাশে নদীর বুক থেকে থেকে শিরশির করে আসছে শেষ রাত্রির হাওয়া। মানুষগুলোর রাত-

জাগা চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু সে চোখ তারা বুঝতে পারছে না। ঘটনার গতি উড়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে– একটুখানি চোখ বন্ধ করলেই তারা পিছিয়ে পড়বে।"[৯]

যাত্রা শেষে ভাইপো গৌরদাসকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পথে দেবীদাসের মনে পড়ে যায় লক্ষণ মুচিকে তৈরি করতে দেওয়া জুতো জোড়ার কথা। তাই জুতো জোড়ার খবর নিতে গিয়ে মুচিপাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি পড়ে ঘাট থেকে জল নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নগ্ন এক ষোড়শী মেয়ের উপর। চমকে উঠে তারা। শরীরের কোথাও এক টুকরো কাপড় নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন। গল্পকারের ভাষায় –"যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।"[১০] যাত্রাপালায় দ্রোপদীকে বিবস্ত্র করার শাস্তি পেতে হয়েছিল দুঃশাসনকে। কিন্তু এযুগের দুঃশাসন যখন সারা বাংলার বস্ত্র হরণ করছে তার শাস্তি দিতে এগিয়ে আসবে কে?

তাই হয়তো নিঃশব্দে দুজনে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তখন গৌরদাসের মনে হয়েছে- "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?"[১১]

তাই গল্পের শেষে দেখি রাত্রি শেষে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুতভাবে বিষণ্ণ ও পাণ্ডুর। আর দিনের আলো ফুটতে দেখা যায় ফসলহীন রুক্ষ মাঠের ভাঙা আল বেয়ে একদল লোক হেঁটে চলেছে। আর তাদের কাছে থাকা শানিত হেঁসোগুলো সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে। যা দেখে গৌরদাসের খুব ভয় করতে লাগল। দেবীদাসের মুখের বিষণ্ণতা ও পাণ্ডুরতাও কি শুধুই রাত্রি জাগরণের, নাকি বহুদিনের সঞ্চিত পাপের ফল ভোগের আশঙ্কায় শঙ্কিত। যুগসচেতন ও ইতিহাস সচেতন সুদক্ষ গল্পকারও গল্পের শেষে দিনবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা গল্পের নামকরণ ও বিষয়ভাবনাকে গভীরভাবে ব্যঞ্জিত ও তাৎপর্যবাহী করে তুলেছে বলা যেতে পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের 'পুষ্করা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়। পরবর্তী সময়ে 'দুঃশাসন' গল্পগ্রন্থে এবং তারও পরে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থে গল্পটি জায়গা পায়। যুদ্ধ, মন্বন্তরের পটভূমিতে পুষ্করা গল্পটি রচিত। পচা মড়ার গন্ধ জানিয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের অবস্থা ভালো নয়। চারদিকে চলছে মৃত্যুর বীভৎস লীলা খেলা। কলেরার মড়ক লেগেছে আশেপাশের দশখানা গ্রামে। আবালবৃদ্ধবনিতা কারুর ছাড় নেই এই নিয়তির এই বিভৎস খেলা থেকে। "ছ মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো– দিব্যি আছে, কোনো রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে।"[১২] এই মড়ক থেকে থেকে দশখানা গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে প্রচলিত তিথি নক্ষত্র ও শাস্ত্রীয় বিধিকে লঙ্ঘন করে শুক্লা চতুর্দশীর রাতে আয়োজন করা হয়েছে মা শ্মশানকালীর পূজা। সকলের বিশ্বাস একমাত্র মা'ই পারবেন মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর খেলা থেকে গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে। গ্রামের মানুষের উপর মায়ের কোপের ফল এই

মহামারী মড়ক। তাই মা'কে সন্তুষ্ট করার জন্য বেশি দক্ষিণার বিনিময়ে নিয়ে আসা হয়েছে তর্করত্নমশাইকে। আশ্বিনের শুক্লাচতুর্দশীর রাত্রে তর্করত্ন বসেছেন মা শ্মশানকালীর পূজায়। পেছন ফিরে তাকালেই- "নিঃশব্দ ঘুমন্ত গ্রাম। ঘুমন্ত! আতঙ্কে মূর্ছিত- মৃত্যুতে অসাড়। যে বাড়িতে সাতটি লোক ছিল তার চারটিই হয়তো মরে শেষ হয়ে গেছে, একজনের হয়তো ভেদবমি ধরেছে আর আকি দুজন খুব সম্ভব শহরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতকে কালো মেঘ অমাবস্যার মুখোশ পরিয়েছে– এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো নদীর কালো জলকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে।"[১৩] মায়ের পুজোর একমাত্র উদ্দেশ্য মা'কে সন্তুষ্ট করে পুষ্করা রোধ করে গ্রামকে ও গ্রামের অসহায় মানুষকে বাঁচানো। তাই জমিদার বলাই ঘোষ তিথি নক্ষত্রের নিয়মের তোয়াক্কা না করে মায়ের পুজোর আয়োজন করেছে। আশ্বিনের শুক্লাচতুর্দশীর জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশে রাশি রাশি কালো মেঘের ঘনঘটা এবং সন্ধ্যায় নদীর জলের রূপালী স্বচ্ছতা হারিয়ে গিয়ে কালো পিঙ্গলবর্ণ যেন বহন করে এনেছে এক বীভৎস হিংস্রতার সংকেতকে।

এইরূপ থমথমে পরিবেশে তর্করত্ন মশাই মায়ের পুজোয় বসেছেন। পাশেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার তেল প্রায় শেষের দিকে। সাদা দীপ্তি ক্রমে নীলাভ হয়ে আসছে। তারই কাছেই বসে কাশীকুমোর গাঁজা খাচ্ছে আর গায়ের পোকা তাড়াতে তাড়াতে তর্করত্নের-জানতে চাইছে শিবাভোগ গ্রহণের বিষয়ে। রাত্রি প্রায় শেষের পথে। কিন্তু মা এসে শিবাভোগ গ্রহণ না করলে তর্করত্নের সব প্রচেষ্টা বৃথাই হবে। এই ভয়ঙ্কর মড়ক থেকে বাঁচানো যাবে না গ্রামকে। তর্করত্নের চোখ যখন অশ্রুভারাক্রান্ত তখন কাশীর সকৌতুক উক্তি-"ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদেতেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিমসে লুচি আর পোয়াটাক বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।"[১৪] তর্করত্ন কাশীকে জোর ধমক দিলেও তাঁর মনে কিন্তু আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হতে থাকে। কাশীর সংসারে কাশী ছাড়া সকলে মড়কে মারা গেলেও তর্করত্নের সংসারে ছেলেপিলে সকলে রয়েছে। তর্করত্নের উক্তিতে আভাসিত হয়ে উঠে তৎকালীন বাংলার গভীর সংকটের ছবিটি-"তিনশো টাকা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে কদিন! আর এই দুর্ভিক্ষের বাজার। মৃত্যু যেন চারিদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে- একেবারে সমস্ত গ্রাস না করে তার খিদে আর মিটবে ন। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার বাকি আছে কোথায়।"[১৫] তবে তর্করত্নের এখনো আশা শিবাভোগ গ্রহণ করতে আসতেই হবে মা'কে। বহু অপেক্ষার পর তর্করত্নের চোখে মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে ওঠে। মনে মনে তর্করত্ন ভাবতে থাকেন তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। দেবী শুনেছেন তাঁর প্রার্থনা। তর্করত্ন দেখলেন কালীর মতো কালো অন্ধকারের মধ্যে শিবাভোগের সামনে আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। দু হাত দিয়ে সে গোগ্রাসে ভক্ষণ করছে শিবাভোগ। ভীত শুকনো কণ্ঠে একেবারেই নিঃশব্দে বিড় বিড়

করে বলতে থাকে– “দেবী, প্রসন্না হও, প্রসন্না হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, মারী ভীতদের রক্ষা করো। প্রসন্না হও”[১৬] এক ভয়ঙ্কর নীরবতার মাঝে শুধু ঘড়ির কাঁটার টিক টিক টিক শব্দ আর শিবাভোগের কঠিন হাড় চিবানোর শব্দ তর্করত্নের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। হাড় চিবানোর ক্রমাগত শব্দে ভীত তর্করত্নের সমস্ত শরীর যখন প্রায় অসাড় সেই রূপ এক হাড় হিম পরিবেশে হঠাৎ এক প্রচণ্ড অট্টহাসিতে পুরো শ্মশানটা যেন কেঁপে ওঠে। সেই ভয়ঙ্কর হাসিতে ঘুমন্ত কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলি জেগে আর্তনাদ করে উঠে। তর্করত্ন যখন চোখ খুলেন তখন গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া পদধ্বনি ভেসে আসছে তাঁর কানে। তিনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন– “-জয় মা শ্মশান কালী, জয় মা’... ওরে বাজা বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা- বাজা জয় মা শ্মশান কালী, জয় মা মহাকালী।”[১৭]

সূর্যের আলো ফোটার আগেই গ্রামের ঘরে ঘরে রটে গেল এই অদ্ভুত ঘটনার কথা। মৃত্যু কবলিত গ্রামের প্রায় সকলের প্রাণে আজ আনন্দের প্লাবন। সকলের আশা গ্রামে থাকবে না আর মহামারী মন্বন্তর। তর্করত্নের চোখেও আনন্দের অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যার পর তর্করত্নের গাড়ি ছাড়ল। দক্ষিণা তিনশো টাকার জায়গায় বেড়ে হল পাঁচশো টাকা। কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলোয় গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎই গাড়োয়ান গাড়ি থামালে তর্করত্ন ডাকাতের ভয়ে চমকে উঠলে গাড়োয়ান বলে– “রাস্তার ওপর ডোমপাড়ার পাগলিটা পড়ে আছে বাবু।”[১৮] বিষাদভরা গলায় গাড়োয়ান তর্করত্নকে আরও জানায়–“অকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরেছে বোধহয়।”[১৯] তর্করত্ন ভীত কণ্ঠে গাড়োয়ানকে গাড়ি হাঁকাতে নির্দেশ দেন আর দুহাত কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বলতে থাকেন–“দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা। পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী, তুমি মহাকালী, তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।”[২০] কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বলাই ঘোষ কিংবা স্বয়ং তর্করত্ন নিজেই যা বুঝতে পারেননি, গল্পের শেষে লেখক সেই সত্যকে প্রকাশ করে লিখেছেন-“একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেনি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ঐ ডোমপাড়ার পাগলীটার রূপ ধরেই- আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে– কালীর মত জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে একফোঁটা জলের জন্য। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারে নি।”[২১]

মন্বন্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকার। মারী, খাদ্যসঙ্কট, বস্ত্রসঙ্কট, কেরোসিনের অভাব প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল মানুষকে মহা জীবনসঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল। গল্পটির মধ্যে আমরা দেখি একদিকে মানুষ না খেতে পেয়ে মড়কের কবলে পড়ে মারা যাচ্ছে, অথচ সেই সময়-প্রেক্ষিতে বলাই ঘোষের মতো মহাজনরা নিজের পরিবারকে রক্ষা করার

জন্য তিনশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে শ্মশানকালীর পূজার জন্য শহর থেকে 'সিদ্ধপুরুষ' তর্করত্নকে নিয়ে এসেছে। শেষপর্যন্ত তর্করত্নের পূজায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই শিবাভোগ গ্রহণ করেছেন, এই বিশ্বাসে তর্করত্নের দক্ষিণার পরিমাণও আবার তিনশো থেকে বেড়ে পাঁচশো হয়ে যায়, সঙ্গে জুটে রাজতুল্য আতিথেয়তা। মন্বন্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলার সংকটময় পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কালোবাজারির মাধ্যমে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিল একশ্রেণীর মুনাফাখোর মজুতদার জমিদার। সুদখোর মহাজনেরা, যারা জোঁকের মতো গরীবের রক্ত শোষণ করে সেই, দলের প্রতিনিধি স্বরূপ বলাই ঘোষ অনায়াসে তর্করত্নকে দক্ষিণা হিসেবে পাঁচশো টাকা বের করে দেয় যা সেই গরীবের রক্ত শোষণের ফলে উপার্জিত অর্থ। একদিকে মন্বন্তর ও যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলার সাধারণ মানুষের অসহায় জীবনযন্ত্রণা অন্যদিকে সেই অসহায় পরিস্থিতিতে সংস্কার বিশ্বাসের উপর ভর করে সেই অসহনীয় পরিস্থিতিতে থেকে মুক্তি পাওয়ার অপচেষ্টা গল্পটিকে গভীর তাৎপর্যবাহী করে তুলেছে বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী;দ্বিতীয় খণ্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ; ১৪২৫, পৃ- ৩৬৩

২। তদেব; পৃ-৩৬৩

৩। তদেব; পৃ-৩৬৪

৪। তদেব; পৃ-৩৬৫

৫। তদেব; পৃ-৩৬৬

৬। তদেব; পৃ-৩৬৬-৩৬৭

৭। তদেব; পৃ-৩৬৭

৮। তদেব; পৃ-৩৬৮

৯। তদেব; পৃ-৩৬৮

১০। তদেব; পৃ-৩৬৯

১১। তদেব; পৃ-৩৬৯

১২। তদেব; পৃ-৩৭৯

১৩। তদেব; পৃ-৩৮০

১৪। তদেব; পৃ-৩৮১-৩৮২

১৫। তদেব; পৃ-৩৮২

১৬। তদেব; পৃ-৩৮৩

১৭। তদেব; পৃ-৩৮৪

১৮। তদেব; পৃ-৩৮৫

১৯। তদেব; পৃ-৩৮৫

২০। তদেব; পৃ-৩৮৫

২১। তদেব; পৃ-৩৮৬

মর্ম মেঘ ও সোনালি ডানার চিল : আত্মঘাতী অবচেতন মনের স্বরূপ

আর্জুমুন নেহার বানু
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়সংক্ষেপ : ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের কথা আমরা সকলেই কম বেশি জানি। আমাদের মনের গভীরে প্রতিনিয়ত কী ঘটে চলেছে তা আমাদের অজানাই থেকে যায় অনেক সময়। আমাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণ আমরা অনেক সময়ই খুঁজে পাই না। একুশ শতকের কথাসাহিত্যিক তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে অবচেতন মনকে নিয়ে নানা খেলায় মেতেছেন। মানুষের অবচেতন মনের সঙ্গে চেতন মনের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা যে কীরূপ ভয়ংকর হতে পারে তার বর্ণনা তিনি করেছেন তাঁর 'মর্মমেঘ', 'সোনালি ডানার চিল' উপন্যাসের আখ্যানের প্রতিবেদনে। এছাড়াও অবচেতন মনের নানা ধরণের ঘাত প্রতিঘাত, স্ববিরোধ তাঁর রচনায় উঠে এসেছে।

কথাসাহিত্যিক তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৭৮ সালের ১২ই জুলাই, নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরে। তাঁর প্রতিটি লেখাতেই আমরা এক ব্যতিক্রমী স্বর ফুটে উঠতে দেখি। আমাদের এই বহমান জীবনকে তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর অসংখ্য আখ্যানে। মানব জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয় ছাত্রজীবন থেকেই। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে 'মুদ্রা' পত্রিকায়। কলেজে থাকাকালীন 'অভিযোজন' নামে একটি গল্প লিখে প্রশংসিত হন। এছাড়াও স্যামুয়েল বেকেটের জীবনী, কাইফি আজমীর কবিতা, নিসিমি ইজিকিয়েলের কবিতা, কমলা দাসের কবিতা অনুবাদ করেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় 'বাবা' গল্পটি। এর কয়েক বছর পর ২০১২ সালে আমরা পাই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মায়াকাচ'। লেখা প্রকাশিত হয় 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'আনন্দমেলা', 'সানন্দা' সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একুশ শতকের কথাকার তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অবচেতন মন তার নিজের ইচ্ছানুসারে মানুষকে কীরকম নির্মম খেলায় নামতে বাধ্য করে তার জ্বলন্ত চিত্র তাঁর উপন্যাসগুলি। এই স্তরের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি ক্রমশ মানুষকে নিজের আয়ত্তে করতে থাকে। একসময় মানুষ না চায়লেও তার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করে বসে। মানুষের মনে এই অবচেতনের ফলে সৃষ্টি হওয়া দ্বন্দ্ব যে কত ভয়ংকর রূপ নিতে পারে তা তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে উঠে এসেছে। আমরা তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস এখানে আলোচনা করব –

'মর্মমেঘ' (২০১৩) ও 'সোনালি ডানার চিল' (২০১৬)।

'মর্মমেঘ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। কাহিনির প্রধান চরিত্র নীলাদ্রিশেখর ভৌমিক সরকারি হাসপাতালের এক নামী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। শৈশব কাল থেকেই নিদারুণ দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বর্তমানে সে একজন প্রতিষ্ঠিত সফল ডাক্তার। তার সহকর্মী ডাক্তার জয়ন্ত মনে করে পেশেন্ট মানেই এক-একটা দু'পাওয়ালা দাঁতফোকলা গাঁধী-হাসিমার্কা দেড়শো টাকা। কিন্তু সহকর্মী ডাক্তারদের মতো নীলাদ্রি এমন ভাবতে পারে না। রোগীর জীবন ফিরিয়ে দেবার আনন্দ সে আর অন্য কিছুতে পায় না। কিন্তু পেশাদারি জীবনের এই বিরাট সাফল্যও নীলাদ্রির দাম্পত্যজীবনের চরম ব্যর্থতার কাছে হেরে যায়।

নিজের ডাক্তারি পেশার চরম ব্যস্ততার জন্য বিয়ের তিন বছরের মধ্যে শেষ দু'টো বিবাহবার্ষিকী, দু'টো জন্মদিন আর কিছু টুকরো অনুষ্ঠানে সে কথা রাখতে পারেনি। জীবন যৌবনের সব থেকে সেরা সময়টা উপভোগ করার জন্য তারা এখনো পর্যন্ত সন্তান নেয়নি। কিন্তু স্ত্রী স্বর্ণালীকে এক নির্বিকল্প একাকিত্ব আর উদাসীন শৈত্য ছাড়া সে আর কিছুই দিতে পারেনি। পুরো বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, ফলে সারাদিন ব্যস্ততাহীন, কর্মহীনভাবে কেটে যায় স্বর্ণালীর। সারাদিন বাড়িতে একা ঘোরা-ফেরা করার সুবাদে তার মনে নানান ধরনের এলোমেলো চিন্তারা জট পাকায় এবং মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। আসলে নীলাদ্রি ও স্বর্ণালীর মূল সমস্যা তাদের দাম্পত্য সংকট। অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও নীলাদ্রি ক্রমশ যৌন অক্ষমতার শিকার হয়ে চলে। নারীর যৌবন ক্ষণস্থায়ী, আর স্বর্ণালীর সৌন্দর্য এই সময় শীর্ষবিন্দু ছুঁয়েছে। একটা একটা করে দিন চলে যায়, আর এক গাঢ় অপরাধবোধ নীলাদ্রিকে আঁকড়ে ধরে। নিজের প্রতি স্বামীর উদাসীনতা দেখে স্বামীর প্রতি জটিল, দুর্বোধ্য হতে চায় স্বর্ণালীর মন। নীলাদ্রি সম্পর্কে সে ভাবে লোকটা যেন আগুনের ব্যবহার না জানা প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব। আর তাই নীলাদ্রির ব্যবহারে স্বর্ণালীর রাগ হয়। সে ভাবে–

> *"একটাই জীবন-লোকটার কোনও অধিকার নেই তার জীবনটাকে এভাবে বরবাদ করার। পুড়ে খাক হতে উন্মুখ তার শরীরের প্রতিটি কোষ লোকটাকে ক্ষমা করতে রাজি নয়।"* [১]

কিন্তু পরমুহূর্তেই সে স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তার মনে হয় ডাক্তারদের হেনস্থা হবার ঘটনা হয়তো নীলাদ্রির মনে অবসাদ তৈরি করছে।

সারাদিনের অসহ্য একাকিত্ব ও তার থেকে তৈরি হওয়া মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে স্বর্ণালী তার কলেজ জীবনকে ঘিরে এক গল্প তৈরি করে। সে জানায় কলেজ জীবনে এক ছেলে তাকে পছন্দ করত এবং সেই ছেলে এখন তার সাথে দেখা করতে চাইছে। সব শুনেও নীলাদ্রি তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া জানায় না। চরম অসন্তুষ্ট স্বর্ণালী স্বামীকে প্রশ্ন করে–

"একজন ভালো ডাক্তার হওয়ার যেমন তোমার তাগিদ আছে, একজন স্বামী হওয়ার তাগিদ নেই!" [২]

স্বর্ণালীকে মুখে কিছু না বললেও তার বানানো গল্পটা প্রভাব ফেলে নীলাদ্রির মনে। সে ভয় পায় এই ভেবে -

"ছেলেটা নতুন করে আসায় যদি অতিকায় সব ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্বর্ণালীকে! মানুষ তো! প্রকৃতির কাছে অসহায় হয়ে যদি স্বর্ণালী কিছু করে বসে!" [৩]

যদিও সে স্বর্ণালীকে কখনোই দ্বিচারিণী বলে মনে করে না। তবুও নীলাদ্রির অবচেতনে স্বর্ণালীকে হারানোর ভয় জাঁকিয়ে বসে। ধীরে ধীরে নীলাদ্রি বুঝতে পারে তার এই সমস্যা যত না শারীরিক তত বেশি মানসিক। সে নিজেই গোপনে অ্যাডভাইস নিতে আসা মানুষদের বহুবার বলেছে–

"যৌনতা বাহ্যিক কোন ওষুধ বা এড দিয়ে আনা যায় না।...সবটাই মানসিক খেলা।" [৪]

তার নিজেরই অন্যকে দেওয়া এই উপদেশ যে তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ এত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তা নীলাদ্রি ভাবতেও পারেনি। তাই হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরে স্বর্ণালীকে ছাদে জ্যোৎস্না উপভোগ করতে নিয়ে যায়, মিলিত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে আগের মতোই তার সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে পড়ে, নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় সে আগের মতোই। বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ক্ষোভে, রাগে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে জলের রিজার্ভারের দেওয়ালে ঘুষি মারে। ভাবতে থাকে–

"দু'পয়সাও দাম নেই এই শরীরটার, কোনও গুরুত্ব নেই। এত সব ধন মান নাগরিক সাফল্য সব অর্থহীন।" [৫]

একই ঘটনার প্রতিফলনে স্বর্ণালীও মেজাজ হারিয়ে ফেলে। তবুও নিজের ক্ষণস্থায়ী হতাশা ঝেড়ে ফেলে স্বর্ণালী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়। স্বর্ণালীর মধ্যেও এক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এক এক বার সে ভাবে তার জীবন এভাবে চলতে পারে না, নীলাদ্রি তার জীবনটা শেষ করে দিচ্ছে। আবার পরক্ষণেই ভাবে নীলাদ্রির কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছে, তার উচিত স্বামীর পাশে দাঁড়ানো। এভাবে উচিত–অনুচিতের মাঝে দুলতে থাকে স্বর্ণালী। অন্যদিকে বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে নীলাদ্রি মানসিক অবসাদে ভোগে। তার নিজেকে মনে হতে থাকে অকর্মণ্য, অপুরুষোচিত হীন, দুর্বল। সে ভাবে স্বর্ণালীর জীবনটা সে শেষ করে দিল, ভাবতে থাকে তার জন্য স্বর্ণালীর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

বিভ্রান্ত নীলাদ্রি একসময় অনুধাবন করে তার এই সমস্যাটা গাইনোকলজিস্টদের কাছে এক অতি পরিচিত অভিশাপ। প্রতিদিন যাদের খোলা শরীর দেখতে হয়, তাদের এসব দেখে শিহরণ জাগে না। কারণ শরীরের কারবার করতে গিতে শরীর নিয়ে রোমাঞ্চ উবে যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। ক্লাস নাইনে

পড়াকালীন বায়োলজি পাঠ্য বইয়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের চ্যাপ্টার পড়ার সময় নীলাদ্রি এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করার পাশাপাশি একটা নিষিদ্ধ আনন্দও পেত। ফলে পরবর্তিতে এই সমস্ত জিনিস আরও বিস্তারিত পড়তে গিয়ে সেসব নিয়ে নেশা ধরে যায় নীলাদ্রির। আর এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিত জানতে গিয়ে নীলাদ্রির বোধের জগতে এসব কাঠামো পাকা জায়গা করে বসে, পাশাপাশি অবচেতন মনেও এসব জাঁকিয়ে বসে।

ডাক্তার হওয়ার সুবাদে ছাত্রাবস্থা থেকেই তার নারীশরীর নাড়াচাড়া করার সূত্রপাত। ফলে নীলাদ্রির অবচেতনে এই নারীশরীর তার সমস্ত পুঁজ, রক্ত নিয়ে একটি কাঠামো তৈরি করে। আর নীলাদ্রি এই কাঠামোর গভীরতায় পৌঁছে বহিরঙ্গের আকর্ষণে আর ফিরতে পারে না। আসলে বোধের জগতে পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এক একটা স্ট্রাকচার। নীলাদ্রির চেতনার একেবারে প্রাথমিক স্তরে স্বর্ণালী একটা নারীমূর্তি হিসেবেই ধরা দেয়। কিন্তু নীলাদ্রির অবচেতন মনে স্বর্ণালী তার সমগ্রতা নিয়ে আসে না। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি হিসেবে আসে। আর এখানেই পোঁতা আছে সমস্যার বীজ। মিলনের চরম মুহূর্তে নীলাদ্রি না চায়তেই তার অবচেতন মনের ভাবনাটা তার মনের চেতন স্তরের মধ্যে ঢুকে বাধা সৃষ্টি করছে, তার শরীরকে জাগতে দিচ্ছে না। নীলাদ্রি প্রাণপণে চেষ্টা করেও কিছুতেই সফল হতে পারছে না। প্রতিবারই সফল হয়ে উঠছে তার অবচেতন মন। দুঃসহ অপরাধবোধে ভুগতে থাকা নীলাদ্রি স্ত্রী স্বর্ণালীকে তার সমস্যার কারণ বোঝাতে চেষ্টা করে–

> *"যেসব গোপনাঙ্গ সাধারণত পুরুষদের কাছে ভয়ানক কামনার, অনেক সাধ্য সাধনার পর পাওয়া গুপ্তধনের মতো, আমার মতো একজন গাইনির কাছে সেগুলো খুবই নিউট্রাল অসাড় যৌন আবেদনহীন মাংসের দলা।"* [৬]

মানসিক অবসাদে ভারাক্রান্ত নীলাদ্রি বুঝতে পারে তাকে যে করেই হোক তার সমস্যাটা মেটাতে হবে। অপ্রকৃতিস্থ হাতিকে যেমন তার মাহুত পোষ মানায়, তেমনভাবেই তাকে তার সমস্যাটাকে সামলাতে হবে, তার মনের ওপর তার কর্তৃত্ব কায়েম করতে হবে। তাই নীলাদ্রিকে আমরা বলতে শুনি–

> *"আসল কাজটা হল শরীরের সম্ভ্রমটা ফিরিয়ে আনা-ডিগনিটি অফ হিউম্যান বডি।...ভিতর থেকে বিশ্বাসটা ফিরুক, নারীশরীরই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নির্মাণ।"* [৭]

ফলত নিজের মনের সাথে নিজেরই বিরোধ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে হাসপাতালে এক তরুণীর মৃত্যুকে ঘিরে নীলাদ্রি ভাগীদার হয় এক সুতীব্র অপমানের। এর ফলে তার মনে চেপে বসে এক জটিল মানসিক চাপ। অবচেতন মনে এক পাপবোধ এসে ঢুকতে থাকে অনবরত। অথচ চেতনা জানে সেটার বাস্তবভিত্তি নেই। তবুও সে কিছুতে মন বসাতে পারে না। স্বর্ণালীকে বলে–

> *“ডাক্তারি বোধহয় আমার জন্য নয়। এমন একটা নির্মম পেশা আর আছে কিনা জানি না।”* [৮]

নীলাদ্রি অনেক চেষ্টা করেও তার অবচেতন মনের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে না। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায় স্বর্ণালী, স্বামীকে এই ঘেরাটোপ থেকে বের করতে তাকে নিয়ে ঘুরতে যায় সিকিম। এই সিকিমে ঘুরতে এসেই স্বর্ণালীর কাঠামোর ভিতরের নারীকে আবিষ্কার করে সে। এই সিকিমে এসেই নীলাদ্রি সৃষ্টির আদি্ মুহূর্ত থেকে বয়ে চলা চিরন্তন ভালোবাসার চোরাস্রোতকে খুঁজে পায়। অবচেতন মনের সব বাধা কাটিয়ে নতুন করে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায় এই দম্পতি।

‘সোনালি ডানার চিল’ উপন্যাসটি ২০১৬ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়। বাবা পিটার নিয়াজভের ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে দেহব্যবসার র‍্যাকেট মারফত উজবেকিস্তান থেকে ভারতে আসে শ্বেতাঙ্গ তরুণী ওলগা। ভারতে এসে ফেরুজা নামক এক মহিলার তত্ত্বাবধানে দিল্লিতে দেহব্যবসা শুরু করে সে। কিন্তু একদিন ফেরুজাসহ ওলগাদের ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে অভিনব কাপূর ওলগাকে থানা থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এরপর ওলগাকে নিয়ে কাপূরের এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়। সাদা চামড়ার ওলগাকে সে গড়ে তুলতে চায় নব্য বিপণনবাদী উচ্চবিত্ত ভারতীয় সমাজের এক মহার্ঘ্য পণ্য হিসেবে। শুরু হয় ওলগার ট্রেনিং, নতুন নামকরণ হয় রুকসানা। সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে ওলগার জন্য তৈরি করে রুটিন।

এহেন ওলগার সঙ্গে আলাপ হয় দেবজ্যোতির। প্রথমবার সুন্দরী ওলগাকে দেখে আলাপ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে দেবজ্যোতি। আর ঠিক এই সুযোগটাই কাপূর কাজে লাগাতে চান, তিনি চান ওলগার সাথে মিশে দেবজ্যোতি যদি তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তিনি বিয়েটা দিয়ে দেবেন। তাতে ভারতে ওলগার থেকে যেতে সুবিধা হবে। ফলে কাপূরের আগ্রহে দেবজ্যোতি আসতে শুরু করে কাপূরের বাড়িতে। কিন্তু ওলগা তাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায় না, বরং হাবভাবে দেবজ্যোতিকে ওর তাচ্ছিল্য বুঝিয়ে দেওয়ার এক নিষ্ঠুর আনন্দ পেয়ে বসে তাকে। নিজের প্রতি ওলগার এই তাচ্ছিল্য দেখে রাগ হলেও দেবজ্যোতি তাকে এড়িয়ে চলতে চায় না। শ্বেতশুভ্রা স্বর্ণকেশরিণীদের প্রতি অবচেতন মনের দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে বারবার ওলগার কাছে যেতে প্ররোচিত করে। দিনদিন কেমন একটা জালে জড়িয়ে পড়ে দেবজ্যোতি। ওলগার ছবিটাকে সে যতই তাড়াতে চায় ততই যেন ছবিটা মাথার ভিতরে গেড়ে বসছে। ঘুমের গহন থেকে শুরু করে অফিসের ইলাস্ট্রেশন বোর্ড পর্যন্ত সব জায়গায় ঢুকে পড়ে তার মনোযোগ তছনছ করে দিচ্ছে। তার প্রতি ওলগার তাচ্ছিল্যে দেবজ্যোতির পৌরুষ অপমানে দিশেহারা হয়ে যায়, পাল্টা প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। সে ভাবে–

> *"ধুততারিছাই-তোর দিকে তাকাতে বয়ে গেছে,-কোথাকার কোন কুইন ভিক্টোরিয়া এলেন।"* [৯]

কাপূরের বাড়িতে সে আর যাবে না ঠিক করলেও দেবজ্যোতি ওলগার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াতে পারে না। শেষ পর্যন্ত কাপূরের কথামতো ওলগা দেবজ্যোতির সাথে আলাপ করে। ওলগাকে মুখোমুখি পেয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে না দেবজ্যোতি। নিজের চোখের এই ধরনের নির্লজ্জতায় নিজের ওপরই রাগ হয় দেবজ্যোতির–

> *"বাড়িওয়ালা মানুষটার কথা অমান্য করে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো নিজের ইচ্ছে মিটিয়ে বেড়ানোটা যে ওর কী বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে!"* [১০]

ধীরে ধীরে ওলগার সাহচর্যে দেবজ্যোতি হাঁপিয়ে ওঠে, বিরক্ত হয়। তার ঘুমের মধ্যেও ওলগা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়, মগজের গভীর নীল হ্রদে নামে, সাঁতরে বেড়ায় একূল থেকে ওকূল। দুঃসহ এক লজ্জায় কুঁকড়ে যায় দেবজ্যোতি, আত্মধিক্কারে খানখান হয়ে যায় সে। সে দিল্লিতে কি এসব করতে এসেছে? প্রশ্ন করে মনকে। বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা তো তার অজানা নয়। নিজেকে আটকানোর অনেক চেষ্টা করলেও ওলগার ফোন এলে আর না করতে পারে না দেবজ্যোতি। ওই বাড়িটাই যেন হয়ে উঠেছে তার একমাত্র রিক্রিয়েশন হাউস আর মলগুলো যেন স্বপ্নপুরী। চাইলেও এই মোহ কাটাতে পারে না সে। তার মন না চায়লেও শরীর একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে অক্লান্ত ঘুরে বেড়াতে চায়। সবসময় তো আর বেয়াড়া শরীরটা আত্মার পুলিশি খবরদারি পছন্দ করে না। আত্মধিক্কারে নিজেই নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে তার।

ওলগার সঙ্গে ট্যাঙ্গো নৃত্য প্রাকটিস করতে শুরু করে দেবজ্যোতি। আর এই নাচ রপ্ত করতে গিয়ে ওলগার ছোঁয়া পেয়ে তার রোমকূপেরা কাঁটা সদৃশ জেগে ওঠে। সে টের পায় রোমাঞ্চিত রক্তকণা আর স্নায়ুসুতোর মধ্যে দিয়ে ওলগা একটু একটু করে তার ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। টের পেলেও সেটা ঠেকানোর সাধ্য দেবজ্যোতির হয় না। ফলত, মধ্যরাতের ঘুমের অচেতনের ভেতরে ওলগার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরা। আত্মকেন্দ্রিক ওলগার দিক থেকে কোনোরকম ভালোলাগা না থাকলেও একটা গোটা দিন দেবজ্যোতি ওকে না দেখে থাকতে পারে না। হঠাৎ একদিন এক অচেনা লোককে ওলগার গাড়িতে উঠতে দেখে হকচকিয়ে যায় সে। তারপর থেকেই তার মনের সুস্থিতিটুকু তছনছ হয়ে যায়। অবচেতনে মেয়েটার গোপন আসা-যাওয়াকে সে নস্যাৎ করে দিতে চায়, কিন্তু তার মন উতলা হয়ে ওঠে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে ওলগাকে ফলো করা শুরু করে, হোটেলে ওলগাকে দেখে তার নাম ধরে ডেকে ওঠে। ওলগা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। নিষ্ঠুরভাবে অপমান করে দেবজ্যোতিকে। ওলগাকে ঐভাবে প্রকাশ্যে নাম ধরে ডাকার পর প্রবল পাপবোধে ভুগতে থাকে দেবজ্যোতি, ভেবে

পায় না কীভাবে ওলগার মুখোমুখি হবে। সে জানে ওলগা তার মুখদর্শন করবে না। কিন্তু সে বুঝে পায় না ওলগাকে না দেখে সে কীভাবে থাকবে। সে বলে–

> *"আমি যে তলিয়ে গেছি, দিনদিন জালে জড়িয়ে পড়েছি অসহায় পোকার মতো, এখন তো আর সেই জাল ছিঁড়ে বেরোনোর সাধ্যি নেই! আমার দিনরাত সব বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।"* [১১]

কী করবে ভেবে না পেয়ে সে ছুটে যায় কাপূরের কাছে। কাপূরকে অনুরোধ করে–

> *"এরকম উন্মাদের মতো অবস্থা হবে তা কি ছাই জানতাম! মন আর আমার হাতে নেই, শেষ দু'রাত ঘুমোইনি, কড়া ডোজের ঘুমের বড়ি খেয়েছি কিন্তু এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারিনি, আজও ঘুম আসবে না। এভাবে চলতে থাকলে আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়ব না হয় পাগল।"* [১২]

একসময় কাপূরের অভিসন্ধি জানতে পারে দেবজ্যোতি। তার মন কিছুতেই মানতে চায় না ওলগাকে প্রস্টিটিউট হিসেবে। বুকের পাঁজরার ভেতরে একটা কষ্ট মোচড় দিয়ে ওঠে তার। দেবজ্যোতি বুঝতে পারে তার জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে আক্ষরিক অর্থেই যাকে বলে দিনগত পাপক্ষয়। মনের এই অচলাবস্থা কাটাতে সে ওলগার সাথে দেখা করে। সে ওলগাকে সাবধান করতে চায়, ওলগাকে জানায় কাপূর তার সাথে ওলগার বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ওলগা জানায় সে সবকিছুই জানে, প্রথম থেকেই সে চায়নি দেবজ্যোতির জীবনটা নষ্ট করে দিতে, আর এজন্যই সে প্রথম থেকে দেবজ্যোতিকে পাত্তা দিতে চায়নি। সে দেবজ্যোতিকে বারণ করে কাপূরের সাথে যোগাযোগ রাখতে। ওলগা চলে গেলে নির্বোধের মতো বসে থাকে দেবজ্যোতি।

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলির প্রায় সমস্ত উপন্যাসে অবচেতন মনকে নিয়ে নানা খেলায় মেতেছেন। অসামান্য দক্ষতায় জীবনপ্রবাহের আলো-ছায়া লেখনীতে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ করেই অবচতনকে নিয়ে চলে আসেন সর্বসমক্ষে। আর তাকে নিয়ে চলতে থাকে তার ইচ্ছেমতো খেলা। তবে তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর কাহিনির ভাষাকে জটিল করেননি, তাঁর গল্পকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কলমের শক্তিতে ছিঁড়ে ফেলেছেন মনের গোপন কুঠুরির সমস্ত অন্ধকারময় জাল। অবচেতন মনের প্রভাবে মানবমনের বিকার, তার অন্তর্দাহ, দ্বন্দ্ব সমস্ত কিছুই তিনি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে তাঁর লেখায় প্রকাশ করেছেন, যা আমরা অন্য লেখকদের লেখায় খুব একটা দেখতে পাই না। আমাদের ব্যবহারিক জীবন আজ অন্যরকম। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোও অনেক পরিবর্তিত। গাওদিয়ার শশী ও কুসুমের সেই মনস্তত্ত্বও আর আগের মতো নেই, অনেক পরিবর্তিত। আর এই অন্য রকম পরিবর্তিত কাহিনীই উঠে এসেছে কথাসাহিত্যিক তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতে।

তথ্যসূত্র :

১।	তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় : মর্মমেঘ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ. ২৮।
২।	তদেব, পৃ. ৭২।
৩।	তদেব, পৃ. ১১০।
৪।	তদেব, পৃ. ১১১।
৫।	তদেব, পৃ. ১১৭।
৬।	তদেব, পৃ. ১২৪।
৭।	তদেব, পৃ. ১২৮।
৮।	তদেব, পৃ. ১৬৭।
৯।	তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় : সোনালি ডানার চিল, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১০৪।
১০।	তদেব, পৃ. ১১০।
১১।	তদেব, পৃ. ১৫৩।
১২।	তদেব, পৃ. ১৫৪।

'অচেনা বীরাঙ্গনাগণ' : বাংলা শিকার-সাহিত্যে মেয়েরা

অনিন্দিতা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে শিকারকে কেন্দ্র করে এক নতুন সাহিত্যবর্গের সূচনা হয়। ভারতাগত ব্রিটিশ শিকারিদের কাছে ভারতীয় অরণ্যে শিকার ও শিকার-সাহিত্য যেমন ঔপনিবেশিক শাসকের শৌর্য-বীর্য-পৌরুষ-ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রকাশ ও বিপন্নের ত্রাতা প্রজামঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুশাসকের ভাবমূর্তি গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠে, তেমনি বাঙালি শিকারি ও শিকার-সাহিত্য লিখিয়েদের কাছেও বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলি বিশেষত জাতীয়তাবাদী কালপর্বে বাঙালির ভীরু, মেয়েলি কাপুরুষ অপবাদগুলি মোচন করে বাঙালির বীরত্ব, পৌরুষের প্রতীকী পুনরুদ্ধার ও আভিজাত্য প্রদর্শনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শিকার ভারতে আইনত নিষিদ্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা শিকার-সাহিত্যের ব্যাপক রমরমা দেখা যায়। শিকার মূলত পুরুষালি ক্রিয়া বলে বাংলা শিকার-সাহিত্যে মেয়েদের 'নো এন্ট্রি'। কিন্তু সত্যিই কি মেয়েরা সম্পূর্ণই গরহাজির?তাদের নেই কি কোনও বীরত্বের পরিচয়?বাংলা শিকার বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে মেয়েদের ভূমিকা কি নেহাৎই গৌণ?নাকি তারাও হাজির হয়েছে বিশেষ কোনও ভূমিকায়?

সূচক শব্দ : বাংলা শিকার-সাহিত্য, জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার, নারীর বীরত্ব, বিকল্প বীরত্ব, অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ, Ecofeminism.

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বাগানের বাঘ'গল্পের ('রামধনু', ১৯৪০খ্রিঃ) ডানপিটে মঞ্জুকে নিশ্চয় মনে আছে?দীপু, প্যাঁচাদের মতো মঞ্জুরও সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা বাঘ শিকারের। যদিও দুই দিদির মতে 'মেয়েরা বাঘ শিকার করে না, খালি দেখে।'[১] মঞ্জু দিদিদের কথার তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বাঘ শিকারে সক্রিয় অংশগ্রহণও করে। গল্পকার সরস ভঙ্গিতে জানিয়ে দেন 'কচি বয়সেই মনের মধ্যে নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠাতে'[২]ই মঞ্জুর এহেন ব্যতিক্রমী ব্যবহার। অবশ্য মঞ্জুর দু'দিদিই নয়, সাধারণভাবে তামাম বিশ্বেই প্রচলিত ধারণা হল – শিকার মূলত পুরুষালি ও পৌরুষোচিত ক্রিয়া (exclusively manly and masculine activity)। কেবলমাত্র আমজনতাই নয় ক'দিন পূর্বেও বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, গবেষকদেরও ধারণা ছিল – প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই শিকার পুরুষদের ক্রিয়া, মেয়েরা ছিল সংগ্রাহক। ২০১৮ সালে দক্ষিণ-আমেরিকার আন্দেজ পর্বতমালায় আবিষ্কৃত শিকারের অস্ত্রশস্ত্রসহ ন'হাজার বছরের প্রাচীন ১৭-১৯ বছর বয়সী এক মেয়ের সমাধি[৩] এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকে সারা বিশ্বেই কয়েকজন নারী-

শিকারিরও (Beatrix Scott, Fanny Eden, Emily Eden, Lady Ouvry, E.Barrett প্রমুখ) উত্থান ঘটে।

ভারতে প্রাচীন দেবী মূর্তিগুলিতে, লোককথা-পুরাণে নারীর দ্বারা বধ্য পশুর উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভিল, গন্ড, ওঁরাও সম্প্রদায়ের মেয়েদেরও নানা দেশীয় পদ্ধতিতে ছোটোখাটো শিকার করতে দেখা যায়। মোগল চিত্রকলায় মেয়েদের শিকারের চিত্র বর্তমান। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ছয়টি বুলেটে চারটি সিংহ শিকার করেন বলে প্রসিদ্ধ।[৪]ব্রিটিশ আমলে শিকার নামক বিনোদন-ক্রীড়াটি যেমন বীরত্ব, পৌরুষ ও ঔপনিবেশিক-শাসকের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে, তেমনি মেমসাহেবদের কাছেও শিকারপার্টিতে অংশগ্রহণ হয়ে ওঠে বিরল কৃতিত্বের বা শ্লাঘার বিষয়। অজানা ভারতীয় অরণ্যে শিকার-অভিযান কালে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, শিকার-ক্রীড়া স্বচক্ষে দেখার শিহরণময় অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদগ্রহণ, রাজকীয় খানাপিনা–ক্যাম্পজীবন–মেলামেশা – কোর্টশিপের সুযোগ লাভ ইত্যাদি কারণেও শিকার-সহযাত্রী হতে মেমসাহেবরা অনেকেই আকর্ষণবোধ করতেন।Isabel Savory, Mrs. W. W. Baillie, Mary Procida, Alan Gardner, Olive Smythics, Catherine Minna Jenkins-রা শুধু শিকার সঙ্গী/দর্শকই নন, নিজেরাও সম্বর-নীলগাই-বাঘ-চিতা ইত্যাদি শিকার করেছেন। তাঁদের লেখা শিকার-অভিজ্ঞতাগুলি শিকার সম্বন্ধে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বতন্ত্রতা বুঝতে ভীষণই মূল্যবান।[৫] দেশীয়দের মধ্যে কোচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবীর স্মৃতিকথায় যেমন শিকার-সঙ্গী হবার বর্ণনা মেলে তেমনি রাজকন্যা গায়ত্রীদেবী তাঁর বারো বছর বয়সে প্রথম প্যান্থার শিকারের ও পরে জয়পুরের মহারানিরূপে স্বামীর সঙ্গে বাঘ, হরিণ শিকারের স্মৃতিচারণ করেছেন। জম্মু-কাশ্মীরের মহারানি তারাদেবী ও কেরলের শিকারিকুট্টি-আম্মা থ্রেস্যা থোমাসেরও শিকারে খ্যাতি ছিল।

সুতরাং উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু থেকেই যখন বাংলায় শিকার-সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে, তখন সংখ্যায় নগণ্য হলেও বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ দেশি-বিদেশি নারী-শিকারির বাস্তব নজির ছিল। কিন্তু তবুও বাংলা শিকার-সাহিত্যভূমিতে – তা বিদেশি শিকার-সাহিত্যের বঙ্গানুবাদই হোক কিংবা বাংলা মৌলিক শিকার-সাহিত্যই হোক – নারীশিকারি তো বহুদূর, নারী শিকার-অভিযাত্রী বা শিকার-দর্শকও প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলা শিকার-সাহিত্যে মেয়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ, মূলত Victim রূপেই তারা উল্লিখিত; অর্থাৎ অধিকাংশক্ষেত্রেই মানুষখেকো বা আক্রমণাত্মক বন্যজন্তুর শিকারে পরিণত হয় মেয়েরা। গল্পের পর গল্পে দেখা যায় মেয়েটির ঘাতক ভয়ঙ্কর বন্যজন্তুটিকে শিকার করে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে (স্বপনবুড়োর 'বাঘ শিকারের কাহিনি', বুদ্ধদেব গুহর 'টাঁড়বাঘোয়া') কিংবা কখনো-কখনো হিংস্র জন্তুটির মুখ থেকে অসহায় মেয়েটিকে উদ্ধারে (বন্দে আলি মিঁয়ার 'বাসিখেকো বাঘ') – আবির্ভূত হন কোনও অসীম সাহসী শিকারিপুরুষ। আর বিস্তীর্ণ

জনপদের দীর্ঘদিনের ত্রাস মানুষখেকোর শিকার সফল হলে গ্রামের মেয়েদের দেখা যায় বিপন্ন মানুষের রক্ষাকর্তা ঐ দুঃসাহসী বীর শিকারিকে ফুলে গানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্বর্ধনা জানাতে। কোনো কোনো গল্পে (শিবশঙ্কর মিত্রের 'বেদে বাউলে', সতীনাথ ভাদুড়ির 'তবে কি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বাঘ', বুদ্ধদেব বসুর 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে') দেখা যায় – শিকারির বীরত্ব, বেপরোয়া দুঃসাহস, বিপন্ন জনপদকে রক্ষার ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ কিংবা বলিষ্ঠ রুক্ষ বন্য পৌরুষ (sexual conquest) অথবা জীবন-উদাসী নিঃসঙ্গ প্রেমিকসত্তার মিশেলে যে দুর্নিবার রোমান্টিক আবেদন তাতে নারীরা স্বেচ্ছায় বারেবারে আকৃষ্ট হয়, হয় মুগ্ধবিবশ।[৬]

উপরোক্ত ভূমিকাগুলি ছাড়া তবে কি বাংলা শিকার-সাহিত্যে মেয়েদের আর কোনও বিশেষ রূপেরই সাক্ষাৎ মেলে না?কেন্দ্রীয় চরিত্রায়ণ হিসেবে কি তারা বেমালুম গরহাজির?

সেকালে ভারত তথা গ্রামবাংলা ছিল জলা-জঙ্গল-বন্যপশুপাখিতে ভরভরন্ত। ফলে অরণ্যলগ্ন অঞ্চলে কিংবা কাজকর্ম, যাতায়াতের পথে বুনোজন্তুর সামনে পড়ে যাবার ঘটনাও হামেশাই ঘটত। আকস্মিকভাবে ভয়ঙ্কর জন্তুর সামনে পড়ে সাহস, উপস্থিত বুদ্ধিবলে অথবা দৈবক্রমে মেয়েদের আত্মরক্ষায় সমর্থ হবার ঘটনা ঘটত না এমন নয়। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ব্যাঘ্রচরিত' গল্পে ('রামধনু', ১৯৩৯খ্রিঃ) উঠে এসেছে রাতে বদ্ধঘরে বাঘের উপস্থিতি টের পেয়ে এক বিধবা কীভাবে লেপমুড়ি দিয়ে নিশ্চল পড়ে থেকে ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচেন। স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়েদের মধ্যে সাহস, বীরত্ব ও হিংস্রতার স্ফুরণ সেভাবে দেখা না গেলেও, 'মাতৃত্ব' বা স্নেহ-বাৎসল্যের টানে কিংবা 'পত্নীত্ব' বা প্রেম-ভালোবাসার জোরে অনেক সময়ই তারা নিজের জীবন বিপন্ন করেও নানা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক কার্য ঘটিয়ে ফেলে। 'রামধনু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঘে মানুষে' গল্পে বর্ণিত হয়েছে এমনই এক ওড়িয়া মায়ের আশ্চর্য বীরত্ব-কথা যে বাঘের মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে হাতের গয়না দিয়েই বাঘের চোখে তীব্র আঘাত করে বাঘ তাড়ায়। শিবনাথ শাস্ত্রীও 'মুকুল' পত্রিকায় পাঠকদের শুনিয়েছিলেন এক আটপৌরে গৃহবধূর বাঘের মুখ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে উনুনের জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাড়া করার অদ্ভুত সাহসিকতার গল্প। শুধু এই দু'টি গল্পেই নয়, স্বামী-সন্তানকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় শিকারি-জন্তুর বিরুদ্ধে মেয়েদের দুর্জয় বিক্রমের আখ্যানধারাটি বাংলা সাহিত্যে মাঝে মধ্যে প্রায়ই উঠে এসেছে। মানবীমাতার মাতৃত্বই হোক বা পশুমাতার – 'মাতৃত্ব'বৈশিষ্ট্যটি বাঙালি সাহিত্যিকদের অতীব প্রিয়। উদাহরণস্বরূপ লীলা মজুমদারের 'দুই মা' ('কাগ নয়', ১৯৮১খ্রিঃ) থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত শিল্পী দত্তের 'জঠর' গল্পের ('অন্তরীপ', ২০২২ খ্রিঃ) কথা বলা যায়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'বনে জঙ্গলে'র (৮ম সংস্করণ, ১৯৩৫ খ্রিঃ) অন্তর্ভুক্ত 'রমণীর বিক্রম' গল্পটিতে দেখা মেলে এক ব্যতিক্রমী নারীর – নারী-শিকারি

কাইরমনের। দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে শিকারে যাওয়া উইলিয়ম ম্যাকলিন সাহেবের শিকার-দলে ছিল আহিরিণী কাইরমন। সাহেব খালে নেমে বাঘ শিকারে উদ্যত হলে কাইরমন বারণ করে। কিন্তু তার নিষেধ শুনলে লোকে সাহেবকে 'কাপুরুষ' বলবে ভেবে সাহেব তা উপেক্ষা করেন; এবং অচিরেই সাহেব বাঘের হামলায় মৃত্যুমুখে পড়েন। কাইরমনই তখন অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে বাঘ শিকার করে সাহেবকে বাঁচায়। ত্রাণকারী রূপে পুরুষ-শিকারির অতিপৌরুষের ছকে বাঁধা Super-Hero ইমেজটির বদলে গল্পটিতে নারী-শিকারি কাইরমনের শিকার-দক্ষতা, অরণ্য-অভিজ্ঞান, নিশান-নৈপুণ্য ও বীরত্বকেই তুলে ধরা হয়েছে। তবে বাংলা শিকার-সাহিত্যগুলির প্রবল ভিড়ের মধ্যেও আর একটি কাইরমন বা তার সমগোত্রীয় নারী-শিকারির সাক্ষাৎ মেলা ভার। বহু পরে, এমনকি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে শিকার আইনত নিষিদ্ধ হবারও পরে, বুদ্ধদেব গুহ অরণ্যপ্রেমী, বন্যপ্রাণীদের প্রতি বিবেকবান, শিকারি ঋজুদাকে নিয়ে যে সিরিজ লিখতে থাকেন (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে) তাতে 'রুআহা' (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫খ্রিঃ) থেকে ঋজুদা ও রুদ্রের যোগ্য সঙ্গীরূপে যোগ করেন তিতিরকে। তিতিরই প্রথম বাঙালি মধ্যবিত্ত/উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে যে বাংলা শিকার বা জঙ্গল-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থেকেছে। তিতির রাইফেল চালানোয় দক্ষ, রুদ্রের চেয়েও নিশানা নিপুণ, গাড়ি চালানোতেও ওস্তাদ, বুদ্ধিমতী, বহু ভাষা জানা, কলকাতা মডার্ন হাইস্কুলে পড়া, ঝকঝকে স্মার্ট সুন্দরী কিশোরী। তবে 'রুআহা'তে চোরাশিকারিদের টক্কর দেবার কালে তিতিরকে দিয়ে বুদ্ধদেব হেহেদের তীরধনুকে মানুষ মারালেও, বেশ কিছু কাহিনিতে মানুষখেকো ভয়ংকর বাঘ বা বিপজ্জনক গুন্ডা হাতির শিকারকালে হয় তিতিরকে সেবারের অ্যাডভেঞ্চারে আনেননি, নয় অ্যাডভেঞ্চারে এলেও তিতির ও ভটকাইকে সাধারণত বনবাংলোর নিরাপত্তায় রেখে শুধু রুদ্রকেই ঋজুদার শিকার-সঙ্গী করেছেন।

শিকার-অভিযানে মেয়েদের উপস্থিতি অনেক সময়ই পুরুষ শিকারি ও স্থানীয় গাইড বা ভৃত্যদের কাছে মেয়েদের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যধিক দায়িত্বের বা ভয়ংকর চাপের ব্যাপারও হয়ে উঠত। শিকার দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রিয় নারীটির বা প্রভুপত্নীর আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকলে শিকার জন্তুটিকে লক্ষ করে ইচ্ছামত গুলি চালাতে পারত না। ফলে কখনো-কখনো শুধু শিকারই ব্যর্থ হত না, নিজেদেরও চরম বিপদে বা মৃত্যুমুখে পড়ে যেতে হত। পূর্বোক্ত 'বাঘে মানুষে' গল্পটিতেই ওড়িয়া মায়ের বীরত্বের কাহিনিটির পাশাপাশি উঠে এসেছে এক বিদেশি নারী-শিকারির বাঘে-মানুষে ভয়ংকর লড়াইয়ের কাহিনিও। আফ্রিকায় যাওয়া এক মেমসাহেব স্বামীর সঙ্গে সিংহ শিকারে বেশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। একবার ফাঁদ থেকে পালানো এক চিতার সন্ধানে সাহেব কাফ্রিচাকরকে সঙ্গে নিয়ে বের হন। আহত চিতার পিছু পিছু যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সাহেব মেমকে ঘরেই থাকতে বলে যান। কিন্তু এত বড়ো অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ হাতছাড়া না করতে স্বামীর নিষেধ অমান্য করে মেমসাহেবও

বন্দুক নিয়ে খানিক পরই বেরিয়ে পড়েন। তার চিতা শিকার অবশ্য ব্যর্থ হয়। কেননা স্বল্প এগোতেই চোখাচোখি হওয়া মাত্র চিতা মেমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভয়ে মেম বন্দুকে গুলি ভরতে ভুলে যান। ফলে মাটিতে জড়াজড়ি করে চলে চিতা ও মানুষে জীবনমরণ ভয়ানক লড়াই। দৈবক্রমে কাফ্রিচাকরের দৃষ্টিতে পড়ায় সে ও সাহেব ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু স্ত্রীর গায়ে গুলি লাগার ভয়ে সাহেব গুলি করতে ভরসা পান না, খালি হাতেই চিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যান। শেষে অভিজ্ঞ কাফ্রিচাকর নিজ জীবন বিপন্ন করে চিতার কান দুটো চেপে ধরে চিতাকে মেমের উপর থেকে নামাতে চেষ্টা করলে সাহেবের গুলিতে চিতার মৃত্যু হয়। মেমসাহেবও সে যাত্রা রক্ষা পান। নারীশিকারির বিরলতম সাক্ষাৎ যদিবা গল্পটিতে মেলে, কিন্ত তার বিচক্ষণতা, শিকার দক্ষতার সেভাবে পরিচয় মেলে না। বরং শিকার অ্যাডভেঞ্চারের লোভে তার হটকারি সিদ্ধান্তের ফলে তিনি চিতা শিকারের বদলে নিজেই চিতার শিকারে পরিণত হচ্ছিলেন; সেই সঙ্গে স্বামী ও কাফ্রিচাকরেরও জীবন প্রায় বিপন্ন করেন। মেমসাহেবের ভয়কে জয় করে জীবনপণ মরিয়া লড়াইয়ের টানটান রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা গল্পটিতে থাকলেও গল্পকার মনে করিয়ে দেন – 'বাঘের চেষ্টা ব্যর্থ হয় মেমসাহেবের পাল্‌টা আক্রমণে নয়, দৈবের ব্যাপারে।'[৭] বিপন্ন নারী-শিকারিটিকে দৈবক্রমে সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন দুই পুরুষ – সাহেব ও কাফ্রিচাকর।

মেমসাহেব, রাজপরিবারের মেয়েদের ও উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়েদের শিকারের কিছু নজির থাকলেও ভারতীয় তথা বাঙালি সাধারণ পরিবারের মেয়েরা শিকার-ক্রীড়া থেকে বাস্তবে ছিল বহুযোজন দূরেই। ঘরেবাইরে মেয়েদের নানা সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডির জন্য বনেজঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চার (dangerous outdoor activity-তে) সঙ্গী হওয়া বা দক্ষ শিকারি হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই বাস্তবতার খাতিরে বাংলা সত্য ঘটনা নির্ভর শিকার কাহিনিতে মেয়েদের উপস্থিতি সেভাবে সম্ভব ছিল না। তবে মনগড়া কাল্পনিক শিকার কাহিনিতেও কিন্তু বাঙালি সাহিত্যিকরা মেয়েদের বন্দুক হাতে শিকারি–বীরাঙ্গনার মূর্তিতে সেভাবে উপস্থাপিত করেননি। ঔপনিবেশিক কালপর্বে শিকারকে যতই 'স্পোর্টসে'র মান্যতা দেওয়া হোক, তাকে নিছক 'মার্ডারে'র থেকে পৃথক বলে চিহ্নিত করা হোক, শিকারের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যুক্ত থাকে একটি রক্তাক্ত হত্যালীলা বা হত্যার প্রচেষ্টা। ফলে শিকারে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে নিশান দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে একান্তই আবশ্যক হয় শিকারির শারীরিক মানসিক দৃঢ়তা, আশ্চর্য নির্লিপ্ততা ও স্নায়বিক কাঠিন্য। এজন্যই সম্ভবত বাংলা সত্য বা কাল্পনিক যেকোনও শিকার কাহিনিতেই মেয়েরা শিকারি রূপে প্রায় অনুপস্থিত। মেয়েদের নিষ্ঠুর, কঠোর হৃদয়, হিংস্র শিকারির বদলে তাদের দয়া-মায়া-স্নেহ-বাৎসল্য-করুণা-ক্ষমার কোমল মূর্তিটিকেই বাঙালি মানসে জারি রাখতে বাঙালি শিকার-সাহিত্য লিখিয়েরা অধিক সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে বাংলা শিকার কাহিনিগুলিতে অনেক সময় একটি অন্যরকম বিকল্প ধারারও সংযোজন হয়েছে।

সঙ্কর্ষণ রায়ের 'বন্যরা বনে'তে (১৯৫৭ খ্রিঃ) মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরির জঙ্গলে কয়লাখনির সন্ধানরত কথক ও গোপীনদা গাইড দৌলতের অনুরোধে দৌলতদের গাঁয়ের মুখিয়ার গরু হত্যাকারী চিতাবাঘের শিকারে যায়। গরুর অবশিষ্ট লাশের কাছে মাচায় অপেক্ষাকালে হঠাৎ দৌলতের হাতের স্পটলাইট যায় থমকে। ঝোপের আড়াল থেকে মড়ির দিকে ছুটন্ত ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে গোপীন রাইফেল তুললে দৌলত আর্তস্বরে বাধা দেয়। কারণ তা চিতাবাঘ নয়, তারই মা মরা কিশোরী মেয়ে রগ্‌গী। রগ্‌গীকে মৃত গরুর পা ধরে টানতে দেখে তারা তিনজনই বিস্মিত, হতবাক হয়ে পড়ে। ঠিক সেমুহূর্তেই ওপাশের ঝোপ পুনরায় নড়ে উঠলে মেয়ের আশঙ্কায় ভীত কম্পিত দৌলতের আলো ফেলার শক্তি লোপ পায়। আলোর অপেক্ষা না করেই গোপীনের রাইফেল গর্জে ওঠে। চিতাবাঘের গর্জন ও কিছু পতনের শব্দ হয়। পরে লাইটে দেখা যায় রগ্‌গীর একদম কাছেই মুখ থুবড়ে পড়ে রক্তাক্ত মৃত বিশাল চিতাবাঘ। মেয়ের প্রাণ বাঁচানোতে দৌলতের গোপীনের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ থাকে না; কিন্তু ভাগ্যজোরে বেঁচে যাওয়া রগ্‌গী গোপীনের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হেনে কান্নাভেজা কম্পিতস্বরে চিতাবাঘটা মারার জন্য কৈফিয়ৎ চায়। রগ্‌গীর গরুর মৃতদেহ ধরে টানার অদ্ভুত আচরণের রহস্যভেদ হলে গোপীনদের সঙ্গে পাঠককেও পুরো চমকে যেতে হয়। শিকারিদের থেকে চিতাবাঘটিকে বাঁচাতেই ভুক্তাবশিষ্ট লাশটাকে রগ্‌গী সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। অন্য আরও চিতাবাঘ থাকলে তার সন্ধানে চিতাবাঘের গুহাটা চিনিয়ে দিতে গোপীনরা সাধ্যসাধনা করলেও রগ্‌গী রাজি হয় না কিছুতেই। শিক্ষিত ভদ্রলোক শখের শিকারি গোপীনের মতে আমাদের দেশ আফ্রিকা নয়; এদেশে চিতাবাঘ মাত্রই মানুষের ক্ষতি করে তাই আত্মরক্ষার্থে তাদের মেরে না ফেলে উপায় নেই। কিন্তু শিকারি–গোপীন এমনকি নিজের বাবার থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে অরণ্যলগ্ন গাঁয়ের মেয়ে রগ্‌গী। খাদ্যখাদকের স্বাভাবিক নীতিতেই চিতাবাঘ ক্ষুধার তাড়নায় মুখিয়ার গাইকে মেরেছে বলে সে ভালোই জানে ও বোঝে। এই অপরাধে চিতাবাঘটিকে একেবারেই মেরে ফেলা হোক সে চায়নি। তার কথায় উঠে এসেছে গভীর সত্য – হিংস্র বুনোজন্তু খাদ্য ও আত্মরক্ষা ছাড়া সাধারণত অকারণে হত্যা করে না। মানুষই শিকারের আমোদ বা যশ প্রাপ্তির নেশায় নির্বিচারে বন্যপ্রাণী হত্যা করে।

'বন্যরা বনে'তে আরেক আশ্চর্য নারী যুগলের স্ত্রী বাঘের হাতে স্বামীর মৃত্যু হলেও প্রতিশোধ রূপে বাঘ শিকার চায়নি। বরং তার বিচারে – বাঘটিকে মানুষখেকো হতে বাধ্য করেছিল যারা তারাই আসল দোষী। চিলখার স্থানীয়দের নিষেধ সত্ত্বেও নিছক শিকারক্রীড়ার আমোদের জন্য কয়লাখনির চীফ ইন্সপেক্টর বহিরাগত ভাল্লাসাহেব স্থানীয় রাজাবাহাদুরের ক্ষমতার বলে বাঘিনীকে শিকার করেন। এতে বাঘটি ক্ষেপে গিয়ে মানুষখেকোতে পরিণত হয়। তাই যুগলের স্ত্রীর মতে ভাল্লাসাহেব ও রাজাবাহাদুর ঐ মানুষখেকোর শিকারে পরিণত হলে তবেই স্বামীর মৃত্যুর সঠিক ও ন্যায্য প্রতিশোধ হবে। মানুষখেকোকে বাঁচিয়ে রাখা বিপজ্জনক বলে শোকার্ত যুগলের স্ত্রীর কথা শোনা

হয় না, সেই রাতেই বাঘশিকারের ব্যবস্থা হয়। বাঘ শিকার রুখতে নিজ জীবন বিপন্ন করেও রাতের জঙ্গলে একাকিই ছুটে যায় যুগলের স্ত্রী; শিকারি গোপীনদের বাধাদানের চেষ্টা করে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে প্রকাণ্ড বাঘ তার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়লে গোপীনের গুলিতে বাঘটি ধরাশায়ী হয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিকারক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে এমন এক চূড়ান্ত সংকটমুহূর্তে যখন গোপীন এক গুলিতেই হিংস্র জন্তুটিকে মারতে সফল না হলে রগ্‌গী বা যুগলের বউ বন্যজন্তুটির আক্রমণে হয়তো মারা যেত। কিন্তু রগ্‌গী বা চেতনাপ্রাপ্তির পর যুগলের বউ উভয়ের কাছেই নিজের সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে ফেরার চেয়েও বড়ো হয়েছে বন্যপ্রাণীটির মৃত্যুর ঘটনাটি।

রগ্‌গী ও যুগলের স্ত্রীর সূত্রে আমাদের মনে পড়তে বাধ্য লীলা মজুমদারের ‘কুঁকড়ো’ গল্পের (‘কাগ নয়’, ১৯৮১ খ্রিঃ) কুমুকে। শীতকালে খিদের চোটে বন থেকে নামা শিয়ালে কাঠগুদামে থাকা কুমুর পোষ্য সাদা মোরগ কুঁকড়োকে নেয়; পড়ে থাকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। শিয়ালের উপদ্রব বাড়লে মোড়লের হুকুমে গাঁসুদ্ধু সবাই খুশি মনে শিয়াল শিকারে নামে। শিয়াল শিকারে গ্রামবাসীদের বিকট হইহই শব্দে কুমু ভাবে ‘শেয়ালের পাল এবার মজা বুঝছে। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে’।[৮] কিন্তু চোখের সামনে তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত এক সাদা শেয়ালকে গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে গা ঘষটাতে ঘষটাতে কাঠ গুদামের খোলা দরজা দিয়ে কোনও মতে ঢুকে পড়তে দেখে কুমু কুঁকড়োর হত্যাকারী শিয়ালদের প্রতি পূর্বমুহূর্তের প্রতিহিংসা স্পৃহাকে ধরে রাখতে পারে না। করে বসে এক আশ্চর্য কাণ্ড। দ্রুত গুদামের দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয়। পড়ে থাকা দু’ফোঁটা রক্তে মাটি ছড়িয়ে দেয়। ফলে শিয়ালের খোঁজে বাবা কাকা এসেও চুপচাপ বাড়ি ও ঘুমন্ত কুমুকে দেখে অন্যত্র চলে যান। পরদিন দরজা খুলতেই দেখা যায় সাদা মা-শেয়াল মরে পড়ে। তার কোল ঘেঁষে বসা সাদা শেয়ালবাচ্চাটাকে কুমু পরম মমতায় বুকে তুলে নেয় ও পশুসংরক্ষণের লোকের হাতে বাচ্চাটিকে তুলে দিয়ে বলে ‘ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও মেরো না।’’[৯] শেয়ালছানাটির কুমুর ‘কুঁকড়ো’ নামকরণেই স্পষ্ট – কুমুর অনুভূতিতে তার মৃত সাদা মোরগ ও মা মরা সাদা শেয়ালছানাটির মধ্যে আর কোনও তফাৎ নেই।

বাংলা শিকার–সাহিত্যগুলিতে হিংস্র বুনোজন্তুর কবলে প্রিয়জনকে হারিয়ে পুরুষরা সাধারণত তীব্র আক্রোশে বুনোজন্তুটির নিধনেই প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে চায় (‘টাঁড়বাঘোয়া’য় বাসমতীর মৃত্যুর বদলা নিতে শিকারে যেতে চাওয়া লোকটি কিংবা ‘বাঘ শিকারের কাহিনি’র স্ত্রীর মৃত্যুতে আর্তনাদকারী মুংরাকে আশ্বাস দানকারী শিকারি অরবিন্দ)।সেখানে আশ্চর্য হলেও মেয়েরা ঘাতক বুনোজন্তুটির প্রতিও অনেকসময় আক্রোশ চিরকাল পুষে রাখে না। হয়তো নিজেদের অসহায়তার জন্যই ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা, দৈব, নিয়তি বলে মেনে নেয়। কখনও তারা বন-বন্যজন্তু-বনের কুহকময় নেশা থেকে স্বামী সন্তানকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চায় (শিবশঙ্কর মিত্রের

'সুন্দরবনের আর্জান সর্দারে'র মা ও স্ত্রী); আবার কখনো-কখনো রগ্‌গী, যুগলের বউ বা কুমুর মতো ভারী বিস্ময়কর ভূমিকাও তারা গ্রহণ করে ফেলে।

বাংলা শিকার-সাহিত্য লিখিয়েরা এভাবে কখনো-কখনো হিংস্র নির্দয় শিকারখেলার বিপরীত মেরুতে মেয়েদের হাজির করেছেন, মেয়েরা যেখানে তাদের নারীসুলভ গুণ ও কোমলপ্রবৃত্তি নিয়েই হাজির। নারীরা স্বভাবজ দয়া-মায়া, আবেগ-সহানুভূতি, ক্ষমা-করুণা, স্নেহ-মমত্বের দ্বারা বন্যপ্রাণের শিকারের বদলে তাদের সুরক্ষায় সচেষ্ট। অরণ্যলগ্ন গ্রামের মেয়েদের কাছে অরণ্য হল অর্থনীতি ও দৈনন্দিন নির্ভরতার উৎস। বনজ সম্পদ সংগ্রহকালে অনেকসময় তারা বুনোজন্তুর কবলে পড়ে, প্রিয়জনকে হিংস্র জন্তুর শিকারে পরিণত হতে দেখে, তবুও অরণ্য-অরণ্যপ্রাণীদের প্রতি এমনকি উপদ্রবকারী হিংস্র প্রাণী থেকে অতিনগণ্য তুচ্ছ প্রাণীর প্রতিও তাদের আশ্চর্য দরদ, একাত্মতা। এখানেই পুরুষদের সঙ্গে, শিকারিদের সঙ্গেও তাদের বড়োসড়ো ফারাক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা নিজেদের অবহেলিত নিপীড়িত অসহায় অবস্থার সঙ্গে মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত, দমিত অসহায় বন্যজন্তুর সাযুজ্যও হয়তো উপলব্ধি করে। অরণ্যের নির্বিচার ধ্বংস, অরণ্যপ্রাণীদের অকারণে নিধনেও সাধারণত তাদের সায় থাকে না। তারা সহাবস্থানেই অধিক বিশ্বাসী। পরিবেশ সংরক্ষণবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ ছাড়াই নিজেদের অরণ্য অভিজ্ঞতা থেকে, হয়তো পারস্পরিক নির্ভরতার স্বার্থেও তারা নিজেদের মতো করে অরণ্য প্রকৃতি, প্রাণীদের রক্ষা করতে চায়। কখনও শিকার রদে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও একাকিই শিকারিদের কঠিন প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড়িয়ে যায়। কখনও নেহাৎই বাচ্চা মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ মমত্বের জোরে বন্যপ্রাণের প্রতিও সহমর্মিতা অনুভব করে, বাড়িয়ে দেয় গোপন শুশ্রূষার হাত। বড়োদের চোখে ধুলো দিয়েও তাদের বাঁচাতে চায়। প্রতিশোধস্পৃহাকে পরাজিত করে, ব্যক্তিগত দুঃখবেদনাকে চেপে বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণে উদ্যমী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলে। শিকার নিপুণ দুর্ধর্ষ বীরাঙ্গনা এই মেয়েরা নয় ঠিকই, কিন্তু শিকারের বিপ্রতীপে অরণ্য – অরণ্য প্রাণীদের সুরক্ষায় তারা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফেলে তাও তো কোনও অংশে কম বীরত্বের নয়।বাংলা শিকার সাহিত্যের লেখকরা মেয়েদের মেয়েলি গুণগুলিকে প্রাধান্য দিয়েই পুরুষ-সর্বস্ব শিকার-সাহিত্যের সমান্তরাল বা কিছুটা বিপ্রতীপেই এভাবেই গড়ে তোলেন বিকল্প এক শিকার-সাহিত্য বা শিকারবিরোধী শিকার-সাহিত্য ধারাও। যার প্রাসঙ্গিকতা আজও সমান জরুরি বা বলা ভালো আরও বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। তারই সঙ্গে আজ একবিংশ শতাব্দীতে এই আখ্যানগুলি প্রকৃতি-নারীবাদের (ecofeminism) দৃষ্টিকোণ থেকেও অতীব মূল্যবান পাঠ।

তথ্যসূত্র :

১। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, রামধনু ১৩শ বর্ষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৬।

২। তদেব।

৩। Wilamaya Patjxa, Female Hunter, Peru, https://www.science.org (accessed 19th April, 2023)

৪। মোগল যুগে শিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ জানতে দ্রষ্টব্য Mahesh Rangarajan, India's Wildlife History (New Delhi : Permanent Black, 2001), 11-21.

৫। ভারতাগত ব্রিটিশ নারী-শিকারিদের নিয়ে Fiona Mani তাঁর Ph.D. Thesis (History Dept. West Virginia University, 2011)-এর একটি অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

৬। এই নিয়ে একটি চমৎকার প্রবন্ধ 'শিকারি অভিসারী' শারদীয় বারোমাস, ২০০৭-এ লেখেন চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল।

৭। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রামধনু ৫ম বর্ষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ২৯৮।

৮। লীলা মজুমদার, কাগ নয়, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা-৪০।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৪১।

স্ত্রীশিক্ষা থেকে দেশের কাজ : উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদে বাঙালি মেয়েরা

অর্পণ নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সকলেই মানবেন বিশ শতকের গোড়ায়বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মতো এতবড় জাতীয় রাজনৈতিক ইভেন্ট উনিশ শতকের শেষভাগে জাতীয়তাবোধের সূচনাকাল থেকে ছিল না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন উপনিবেশ মুক্তির রাজনীতিতে প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক ইভেন্ট যেখানে বাঙালি মেয়ের গণপরিসরে অংশগ্রহণ ছিল, এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে মতামত ছিল। এই গণপরিসরটির জন্যেই সে মতামতকে আমরা 'বাঙালি মেয়ের' –এই বহুবাচনিক সাধারণ বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে পারি। উল্লেখ্য বঙ্গভঙ্গ প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে কেবল নিজে চিন্তা করা নয়, পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যপক অংশের মেয়েদের ভাবানোর প্রয়াস চলেছে। অংশগ্রহণ করানোর প্রয়াস চলেছে মেয়েদের প্রত্যক্ষ্য প্রচেষ্টায়, চিন্তায়-চেতনায়। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

১৯০৫ সালে (১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে) প্রকাশিত হয় সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত মহিলা' পত্রিকা। এটিই সম্ভবত মহিলা সম্পাদনায় মেয়েদের রাজনীতি সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। এর দু বছর পর ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদনায় 'সুপ্রভাত' পত্রিকা। 'সুপ্রভাত'কে অবশ্য বাঙালি মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত পত্রিকা বলা যাবে না, তবে এখানেও মেয়েদের মনে স্বদেশপ্রেম-দেশভক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একাধিক লেখা প্রকাশিত হতো। এদুই পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের কৃতকর্মের হদিশ কেবল পাওয়া যাবে তা নয়, তারসাথে এগিয়ে থাকা অংশের মেয়েদের স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কিত চিন্তা, মেয়েদের ভূমিকার প্রশ্নটি সম্পর্কে ভাবনা – গণপরিসরে তা ছড়িয়ে দেওয়ার নমুনাগুলিও পত্রিকা থেকেই পাওয়া সম্ভব।

সম্পাদিত পত্রিকা বাদেও প্রত্যক্ষত ঐ আন্দোলনের কর্মসূচীতে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কমলা দাশগুপ্ত তাঁর '***স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী***' গ্রন্থে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দলনের সময় সভা-সমিতি করে মহিলাদের স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এমন ৯ জন বাঙালি মেয়ের নাম উল্লেখ করেছেন-

মুক্তকেশী দেবী
সুশীলাসুন্দরী সেন
চিন্ময়ী দাস

নবশশী দেবী
সুশীলা সেন
কমলেকামিনী গুপ্তা
প্রিয়বালা গুপ্তা
গিরিজা গুপ্তা
সুরমা সেন।[১]

উদাহরণের পরিমাণ না বাড়িয়ে আমরা জরুরী প্রশ্নটি উত্থাপন করি- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই গণপরিসরে মেয়েরা কীভাবে এই আন্দোলনের কর্মসূচীতে জড়িয়ে পড়লেন? মেয়েদের এই অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক পূর্বসূত্র ঠিক কেমন?

এই ঐতিহাসিক পূর্বসূত্রের অনুসন্ধানেই আমরা ফিরে তাকাব উনিশ শতকে নারীপ্রগতির দিকে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের কালের ইতিহাসের দিকে। এবং ঠিক এইখানের আমাদের বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে জাতীয়তার বোধ উন্মেষের কাল ঠিক কবে একথা দিনক্ষণ মেপে হয়তো বলা যাবে না। তবে জাতীয়তার বোধ উন্মেষের কাল হিসেবে একটি ঘটনার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ন বসু ১৮৬১ সালে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপন করলেন। যোগেশ চন্দ্র বাগল লিখেছেন "স্বদেশী শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, এক কথায় যাহা কিছু আমাদ্বিগের নিজস্ব তৎসমুদয় রক্ষণ ও পোষণ করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য"।[২] ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু সভার জন্যে একটি অনুষ্ঠানপত্র লেখেন ইংরেজিতে। যেখানে লেখেন – "It is proposed that a society be established by the influential members of native society for the **promotion of national feeling** among the educated natives of Bengal."[৩]

রাজনারায়ন বসুর এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যপকতর রূপ নেয় জাতীয় মেলার মধ্যে। ১৮৬৫ সালে ৭ই আগষ্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন 'ন্যাশানাল পেপারস'। পত্রিকা সম্পাদনার দ্বায়িত্ব ছিল নবগোপাল মিত্রের ওপর। 'ন্যাশানাল পেপারস'-এ রাজনারায়ণের 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'র অনুষ্ঠান পত্রখানি হুবহু মুদ্রিত হয়। রাজনারায়ণ বসু 'আত্মচরিতে' লিখেছেন "শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন"।[৪]

এখন প্রশ্ন হলো এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্যে সভা সমিতি, পত্রিকা, কিংবা তারই কর্মসূচী হিসেবে হিন্দু মেলার উদ্ভব; ঠিক এই সময়ে বাঙালি মেয়েদের পরিস্থিতি কেমন? নারীপ্রগতি- নারীমুক্তির হালচাল কেমন ঐ একই সময়ে?

(আমরা অবশ্য রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা ও হিন্দু মেলার জন্ম লগ্নকেই একমাত্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষের লগ্ন বলতে চাইছি এমন নয়। একথা ঠিক যে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের চিন্তার মধ্যে দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাবলম্বন – জাতির উন্নতির এদুই ভিত্তি প্রচারিত হত। এছাড়াও গিরিশ ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সোমপ্রকাশ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী', এসব পত্রিকাও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাবলম্বনের উন্মেষে সহায়তা করে। আমরা কেবল আলোচনার সুবিধার্থে একটি ঘটনা ও সময়কে বেছে নিচ্ছি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান, হেমচন্দ্রের বৃত্তসংহার, ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি মূলক কবিতা, পরে মাইকেলের রচনা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমের উপন্যাসও জাতীয় ভাবাবেগ-বোধ তৈরিতে যথেষ্ট উদ্দীপনা তৈরি করেছিল।)

উনিশ শতকে নারীপ্রগতির একেবারে প্রথম ধাপ নিশ্চিতভাবেই নারীশিক্ষা। বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য, পরে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি বেথুন সাহেবের উদ্যোগে ও রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষা সমর্থকদের সহযোগিতায় ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে'র যাত্রা শুরু হয় মাত্র ২১ জন ছাত্রী নিয়ে। ১৮৫০ এর দশকের আগেই কেউ কেউ স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে কলম ধরেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়কে'র কথা। তবুও আমরা মোটামুটি উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের ইতিহাসের দিকেই ফিরে দেখতে চাইছি কারণ তখনও দেশীয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যে খুব সমাদৃত এমন নয়। ১৮৫০ সাল নাগাদও ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে বাড়ির মেয়েদের যারা লেখাপড়া শেখাতে পাঠাচ্ছেন তারা সকলেই প্রায় ব্রাহ্ম। এবং ভদ্র ঘরের মেয়েরা এই যে বাড়ির বাইরে গিয়ে লেখাপড়া শিখছে- একারণে সমকালীন সমাজে ঐ সব পরিবার তীব্র কটাক্ষের শিকার হয়েছিলো। মদনমোহন ঘোষকে প্রায় ৮/৯ বছর সমাজচ্যুত থাকতে হয়। গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্তের মেয়ে ও ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়।[৫] উল্লেখ্য ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল ইনফ্যান্ট নার্সারি স্কুল।

মেয়েদের শিক্ষা অন্তঃপুরে হবে, নাকি বাড়ির বাইরে স্কুল ভবনে হবে এনিয়ে বিতর্ক চলছে ১৮৫০-৬০-এর বছরগুলিতে। সেই সাথে বিতর্কের আরও একটি জায়গা ছিল- মেয়েদের কী ধরণের শিক্ষা দেওয়া হবে? অর্থাৎ মেয়েদের কোন বিশেষ রূপে নির্মাণ করা হবে এ নিয়ে বিতর্ক চলছিল। যাই হোক এরপর উনিশ শতকের ছ'য়ের দশকে অন্তঃপুর থেকে বের হয়ে একেবারে সাগরপারে পাড়ি দেবে বাঙালি মেয়ে। ১৮৬৯-এ খ্রিষ্টান দত্ত পরিবারের সদস্য গোবিন্দচন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যাকে

নিয়ে, ১৮৭১-এ ব্রাহ্ম যুবক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে বিলেত যাবেন। ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বিলেত পাঠাবেন ১৮৭৭ সালে।[৬] পুরুষের সুযোগ্য সঙ্গী হিসেবে গড়ার জন্যেই নব্যশিক্ষিত বাঙালি পুরুষের বাঙালি মেয়ের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি- এমন ভাবে মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তির বিষয়টিকে অনেকে বুঝতে চেয়েছেন। প্রথাগত ভাবে ব্রাহ্মধর্মে অদীক্ষিত বিলেতফেরত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, ১৮৬৭ নাগাদ যখন স্ত্রীকে 'সংস্কৃত' করার প্রয়োজনবোধ থেকে ইংরেজি আদব কায়দা শেখান, দুবার ইংল্যান্ডে যান স্ত্রীকে নিয়ে, তখন মেয়েদেরকে পুরুষের সুযোগ্য সঙ্গী হিসেবে গড়ার দৃষ্টিভঙ্গিটি জোরদার হয়। তবুও বাঙালি নব্যশিক্ষিত পুরুষের মেয়েদের লেখাপড়া কিংবা অন্তঃপুর থেকে মুক্তির দেওয়ার পেছনে যে মানসিকতাই কাজ করে থাকুক না কেন, একথা নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করা যাবে না, এই সব প্রয়াসই বাঙালি মেয়ের স্বাধীনতার বোধকে বিস্তৃত করেছিল। সেকারণেই কৃষ্ণভাবিনী দাসীর মতো বাঙালি মেয়ে '*ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*' গ্রন্থে ইংল্যণ্ড ভ্রমণে অন্তঃপুর থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভবের কথা লিখতে পারেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি উনিশ শতকে নারীপ্রগতির একেবারে প্রথম ধাপ নিশ্চিতভাবেই নারীশিক্ষা। নারীপ্রগতির ধাপ হিসেবে যার সূচনা হয়েছিল লেখাপড়ার অধিকার দিয়ে সে অধিকার ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে উনিশ শতক জুড়ে। অধিকারের বন্ধনীতে স্বাধীনতার বোধ এসে যুক্ত হয় একসময়। বিশেষত সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একটি দিকই ছিল মেয়েদের বিভিন্ন অধিকারগুলির জন্য লড়াই। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সে লড়াই করেছিলেন মূলত কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবক। ক্রমে মেয়েরাও লড়াইয়ের উত্তরাধিকার বহন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে যে ব্রাহ্ম যুবকরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে সংস্কার আন্দোলনে নেমেছিলেন তাদের কয়েকজনের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮৫৭ থেকে নারীস্বাধীনতার পক্ষে ময়দানে নামেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি মূলত 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লিখতেন নারী স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে। এছাড়া বাংলাদেশে তরুণরা যাতে সংস্কার আন্দোলনে আকৃষ্ট হন লক্ষ্য ছিল সেদিকেও। কেশব সেন প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'। এই সভার পক্ষে স্ত্রীশিক্ষা এবং সমাজে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত হবার নানাবিধ অধিকারের দাবিতে প্রচার করা হতো। কেশব সেনের নারীমুক্তির প্রশ্নে আরো একটি বড় অবদান হলো ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্ম বিবাহ বিল 'বিশেষ বিবাহ বিল' নামে আইনসভায় পাশ করানোর জমি প্রস্তুতির লড়াই সংগঠিত করা। এই বিলে মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স বলা ছিল ১৪ এবং ছেলেদের ১৮। তাছাড়াও এই বিলে ছেলে-মেয়ে উভয় দিক থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল। উনিশ শতকে মেয়েদের সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে এ এক মস্ত দিক সন্দেহ নেই। 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'র অন্যতম সদস্য উমেশচন্দ্র দত্ত 'বামাবোধিনী সভা'র পক্ষে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকাতেই সম্ভবত প্রথম মেয়েরাও লেখা প্রকাশ করতেন। সংস্কার আন্দোলন তথা নারীমুক্তি-নারীপ্রগতিতে

মেয়েদের বোঝাপড়া 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র অসংখ্য নমুনা থেকেই লব্ধ। এছাড়াও উল্লেখ্য মনোমোহন ঘোষের নাম। আমরা ইতিপূর্বেই মনোমোহন ঘোষের স্ত্রীকে 'সংস্কৃত' করার তাগিদের কথা উল্লেখ করেছি। ইনি ছিলেন 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। ১৮৬১-৬২ নাগাদ ইনি পূর্ব্ববঙ্গে দাসী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এছাড়া বরিশালের দুর্গামোহন দাস ১৮৬০-৬৫ নাগাদ নারী-মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি তার বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন।

এরপর উল্লেখ করতে হয় বিক্রমপুরের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। ১৮৬৯ সালে তাঁর হাত ধরেই প্রতিষ্ঠা হয় 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার। ১৮৭০ সালে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে' অবলাবান্ধবের একটি সংখ্যার সূচিপত্র আছে। এই সূচির একটি প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- (নারীদের) **'সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা'**। উল্লেখ্য হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৬৭ সালে। ফলে ১৮৭০-এ মেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত- এবিষয়ে প্রবন্ধ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আমাদের মনে হয়। দ্বারকানাথের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অবদানের কথা আর একটু উল্লেখ করেই আমরা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে মেয়েদের অবস্থানের প্রসঙ্গটিতে বিশদে আসব।

বরিশালের দুর্গামোহন দাস, যার কথা একটু আগেই উল্লিখিত, তিনি নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়'। দ্বারকানাথ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। আড়াই বছর পরে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় উঠে গেলে দ্বারকানাথ স্থাপন করেন 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'। এখানেই সরলা দাস ও কাদম্বিনী বসু(পরে গাঙ্গুলি, দ্বারকানাথের স্ত্রীও) এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আমরা জানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের এন্ট্রান্সের ব্যবস্থা তখন ছিলনা, সেকারনে কাদম্বিনী বসুকে নানান ঝক্কি পোয়াতে হয়েছিল।

যাইহোক আমরা 'অবলাবান্ধবে'র সূচীতে মেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষার উল্লেখ পেলাম। আরো একটি তথ্য এখানে উল্লেখ্য যে হিন্দু মেলাকে আমরা গোড়ার দিকে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লগ্নের কর্মসূচী হিসেবে দেখেছি সেই মেলার তৃতীয় অধিবেশনের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। হিন্দু মেলার তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৬৯ সালে বেলগাছিয়া উদ্যানে চৈত্র সংক্রান্তিতে আয়োজিত) মেয়েরা কারু ও চারু শিল্প সামগ্রী প্রদর্শনের সুযোগ পান। স্বীকৃতি স্বরূপ 'হিন্দু মেলা' নামাঙ্কিত এক একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হয়[৭]। এখানে যে মেয়েরা স্বীকৃতি স্বরূপ রৌপ্য পদক পান তাদের নাম সরাসরি উল্লেখ করা ছিল না। তাদের পরিচিতি অংশটি অত্যন্ত জরুরী। পরিচয় লেখা ছিল এভাবে-

মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার।

শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বসুর পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্রের পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন মল্লিকের পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার।
শ্রীযুক্ত বাবু হরিবল্লভ বসুর পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার।
শ্রীমতি সতী দেবী।
কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়।

পরিবারে পুরুষের পরিচিতিতেই নারীর পরিচিতি। লক্ষ্যনীয়, নারী-স্বাধীনতা বা মেয়েদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জাতীয়তাবোধও একটি অংশ হিসেবেই আসে। সেকারণেই মেয়েরা অন্তরালে থেকেও শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে স্বদেশিকতা ছুঁয়ে থাকার অধিকার পায়, 'অবলাবান্ধব' মেয়েদের প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শিক্ষা বিষয়ে উল্লেখ করে প্রবন্ধে। তবে প্রয়োজন কতটুকু তা অবশ্য পুরুষের হাতেই নির্ধারিত। অর্থাৎ বলতে পারি মেয়েদের ধ্রুব কিছু লক্ষণকে অপরিবর্তিত রেখে ব্রাহ্মযুবকেরা স্ত্রীস্বাধীনতার কথা ভাবছিলেন। এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষলগ্নেও মেয়েদের অবস্থান তাই ছিল সংকুচিত। এরপরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় আত্মবোধে দৃপ্ত হয়ে ১৮৮৫তে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলে সামাজিক অধিকারের সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কাজে মেয়েরা ভূমিকা গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসছেন।

যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল একদল তরুন ব্রাহ্ম যুবকের হাত ধরে মূলত লেখাপড়া সহ অন্যান্য সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তা ক্রমে এসে পৌছাঁয় দেশের কাজে মেয়েদের অধিকারের দাবিতে। সবচেয়ে জরুরী হলো অধিকারের দাবিতে স্বয়ং মেয়েদের কণ্ঠস্বর পেতে থাকি আমরা। যে বছর কৃষ্ণভাবিনী দাসীর *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* প্রকাশিত হবে সেই ১৮৮৫ সালেই 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৯২ বৈশাখ সংখ্যায়) স্বর্ণকুমারী দেবী 'একটি প্রস্তাব' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধের মূলকথা দেশের কলঙ্কমোচনে, পীড়িতের রক্ষায় পুরুষের যোগ্য সঙ্গী হিসেবে মেয়েদের স্ত্রী, মা, বোন ইত্যাদি রূপে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে।[৮] ১২৯৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে 'ভারতী'তে প্রবন্ধ লিখবেন 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' শিরোনামে। পরের বছর ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ভারতীতে প্রকাশিত হবে কৃষ্ণভাবিনী দাসীর 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' নামের প্রবন্ধ। সেইসব প্রবন্ধে লিঙ্গ পৃথকীকরণের কথা, 'স্ত্রীলোক কেবল পুরুষের জন্য সৃষ্ট' – একথার তীব্র প্রতিবাদ পাচ্ছি আমরা। বোঝা যাচ্ছে মেয়েদের চেতনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারের কথা উঠে আসছে। উঠে আসছে লিঙ্গ রাজনীতির বোধ। দেশের জাতীয় রাজনীতির পরিসরে যখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের চেতনা অঙ্কুরোদ্গম

থেকে ক্রমে বিস্তৃতির পথে হাঁটবে, তখন মেয়েদের লেখাপত্রে, মেয়েদের অধিকারের বন্ধনীতে দেশের কাজের কথাও আসবে ধীরে ধীরে।

আর একই সাথে পরাধীন দেশের জাতীয় রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের মধ্যে খুবই সামান্য পরিমানে হলেও জায়গা করে নেবেন মেয়েরা। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন মোট ৬ জন নারী প্রতিনিধি। এদের মধ্যে দুজন বাঙালি- স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলি)। পরের বছর ১৮৯০ সালে কলকাতা অধিবেশনেও (ষষ্ঠ অধিবেশন) যোগ দেবেন এই দুই কৃতী বাঙালি নারী। এই অধিবেশনে আবার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর ১৯০১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের জন্যে 'ভারতী' সম্পাদক সরলাদেবী চৌধুরাণী গান লেখেন-

"গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান..."

এ গান অধিবেশনে 'সকলের ভিতর একটা পুলক সঞ্চরণ করলে'- জীবনের ঝরাপাতায় লিখেছেন সরলাদেবী।[৯]

উনিশ শতকে নবচেতনারই ফসল হিসেবে সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ- আশাকরি মানবেন সকলেই। সংস্কার আন্দোলন যেমন করে একরকম ভাবে মুক্তিরই নিশান বহনকারী, যেকারণে সংস্কার আন্দলনের মধ্যেই নারীমুক্তির অবস্থান। আবার জাতীয়তাবোধও জাতীয় মুক্তির প্রেরণাদায়ী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের যে ইতিহাসনমুনা আমরা দেখিয়েছি, প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কার আন্দলনই জাতীয়তাবোধের কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল- একথাও সর্বজনবিধিত। পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে বাঁক নেবে। ফলে আমরা বলতে পারি, সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে নারী-প্রগতিতে নিজেদের করনীয় সম্পর্কে 'বামাবোধিনী' বা অন্য পত্রিকার পাতায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মেয়েদের বোঝাপড়া ক্রমে জাতীয়তাবোধের বিকাশ কালে জাতীয়মুক্তি কর্মসূচীতে 'মেয়েদের করণীয়'তে এসে পৌঁছেছিল। সংস্কার আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে বাঙালির নতুন আত্মচেতনা বিকশিত হয়েছিল মেয়েদের মেধা-মননেও। পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গী হিসেবে মেয়েদের নানান সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অর্ধশতকে দেখা গেল জাতীয়তার বোধ যখন ক্রমে বিস্তৃতীর পথে এগোচ্ছে তখন মেয়েরাও পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবেই জাতীয় রাজনৈতিক কাজে যোগ দেবার অধিকারের কথা বলছেন। এ অধিকার সংকুচিত, প্রশ্নবিদ্ধ সন্দেহ নেই। তবে এর তাৎপর্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

উল্লেখপঞ্জি :

১) কমলা দাশগুপ্ত। *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* । র্‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন : কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১। পৃষ্ঠা- ২৩৯

২) যোগেশ চন্দ্র বাগল। *জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*। প্রকাশক- শ্রীসলিলকুমার মিত্র এস কে মিত্র অ্যাণ্ড ব্রাদার্স : কলকাতা, ১লা আশ্বিন ১৩৫২। পৃষ্ঠা- ২

৩) ছবি বসু। *বাংলার নারী আন্দোলন।* দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, আগষ্ট ২০১২। পৃষ্ঠা- ৫১

৪) রাজনারায়ণ বসু। *আত্মচরিত*।প্রকাশক- পি সি দাস কুন্তলীন প্রেস : কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা- ২০৮

৫) স্বপন বসু (সম্পাদিত)।*উনিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষা।* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১২। পৃষ্ঠা- ১৫-১৬

৬) গোলাম মুরশিদ। *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী।* নয়া উদ্যোগ : কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১। পৃষ্ঠা- ৬৪-৬৫

৭) যোগেশ চন্দ্র বাগল। *জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত*। প্রকাশক- শ্রীসলিলকুমার মিত্র এস কে মিত্র অ্যাণ্ড ব্রাদার্স : কলকাতা, ১লা আশ্বিন ১৩৫২। পৃষ্ঠা- ১৫

৮) স্বর্ণকুমারী দেবী। *রচনা সংকলন* । দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০০। পৃষ্ঠা- ২৫৯।

৯) সরলাদেবী চৌধুরাণী। *জীবনের ঝরাপাতা*। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা, এপ্রিল ২০১৬। পৃষ্ঠা-১২৬।

ব্যঙ্গের বাণে বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্প

সাহেব দাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় একটি চিরস্মরণীয় নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বলাইচাঁদ সাহিত্য জগতে বনফুল ছদ্মনামে অধিক পরিচিত। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকায় বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রচুর কবিতাও প্রকাশ করেন তিনি। পরবর্তীকালে সমাজের নানা রকম অসঙ্গতি লক্ষ করে ডাক্তারি পড়ার সময় এবং চাকরিতে যোগদানের পরেও মানব জীবনের নানান অভিজ্ঞতার বিষয়কে নিয়ে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য হাস্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে যে ছোটগল্পগুলি রচনা করেছেন তা সমগ্র পাঠককে গল্প পাঠের আগ্রহী করে তুলেছে। বনফুলের ছোটগল্পগুলি পাঠ করলে আমরা তার ডাক্তারি অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সমাজস্থিত বেকার যুবকদের হতাশা, অল্প শিক্ষিতদের অহংকার, বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয়গুলি লক্ষ করেছি। গল্পকার বনফুল তাঁর গল্পে এই বিষয়গুলিকে তুলে সমাজে বসবাসকারী মানুষদের সুষ্ঠুভাবে সোজা পথে চলার সর্বদা একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন। এতে ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর কোন মানুষকেই তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। বনফুলের এই বিদ্রোহী মনোভাব পাঠক সমাজে নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

মূলশব্দ : সাহিত্যপ্রীতি, ডাক্তারি অভিজ্ঞতা, ভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাবেশ, সমকালীন সমাজ, চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি, হাস্যরস, সাহেবি পোশাক পরিহিত বাঙালি, করুণরস, ভন্ড মানুষ, কাম প্রবণতা।

মূল আলোচনা :

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় একটি চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। যিনি বনফুল ছদ্মনামেই পাঠককুলের কাছে পরিচিতি লাভ করে রয়েছেন। শৈশব থেকেই সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসা জন্মানোর ফলে কবিতা, নাটক, উপন্যাস দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার বৃদ্ধি করলেও প্রধানত ছোটগল্পের জন্যই তিনি অধিক পরিমাণে সর্বসাধারণের কাছে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত আজও। তিনি বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে প্রতিনিয়ত ছোটগল্পকে নিয়ে নূতন নূতন সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে বাংলা ছোটগল্পকে সাহিত্যের শিখরে প্রবেশ করিয়েছেন।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বনফুল। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন

উদার মনের, বন্ধুবৎসল প্রকৃতির মানুষ। মাতা মৃণালিনী দেবীও ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, উদার গৃহবধূ। বাড়ির চারপাশ নদী, জঙ্গল, পাহাড় দিয়ে বেষ্টিত থাকায় বনফুল শৈশব থেকেই পিতা-মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একান্নবর্তী পরিবারে থেকে খোলা মনের মানুষ হয়ে ওঠেন। বড়ো কথা সেই সময় 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'বসুমতী', 'হিতবাদী' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি বাড়িতে নিয়মিত আসায় তাঁর সাহিত্যের প্রতি প্রীতি লক্ষ করা যায়। বনফুলের এই সাহিত্যপ্রীতির স্ফুরণ ঘটে বাল্যকালে পয়ার ছন্দে রচিত প্রথম কবিতা 'ময়ূর'-র মধ্য দিয়ে। এরপর 'মাসিক' পত্রিকায় লেখা বের করা, 'পরিচারিকা' পত্রিকায় 'ঊষা', 'দুর্বা', 'প্রদীপ' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। এই ডাক্তারি পড়া নিয়ে বনফুলের মধ্যে সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ এক নূতন অভিজ্ঞতা যা পরবর্তীকালে তার ছোটগল্পের বিষয় হতে সাহায্য করেছে।

বনফুলের ছোটগল্পগুলি গভীরভাবে পাঠ করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর গল্পে বিভিন্ন বৈচিত্রের সমাবেশ রয়েছে। যেমন- চরিত্রপ্রধান গল্প, ডাক্তারি অভিজ্ঞতার গল্প, সমাজসমস্যা মূলক গল্প, শিশুচরিত্র বিষয়ক গল্প, প্রকৃতিপ্রধান গল্প এবং ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক গল্প। কবিতার সাথে সাথে তাঁর ছোটগল্পেও যেভাবে ব্যঙ্গ ও হাস্যরস প্রাধান্য লাভ করেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। বনফুল মানুষকে ভালোবাসতেন। ভালোবেসে তাদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করতেন। চাকরি সূত্রে এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের গভীর জীবনবোধ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে আচার-আচরণ, অহংকার, নীতি-আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়গুলিকে সমাজের কাছে তুলে ধরে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ছাঁচে ঢেলে ছোটগল্পগুলি রচনা করেন।

বনফুল ডাক্তারি অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন 'নাথুনীর মা'। গল্পে মুখরা শাশুড়ি পুত্রবধূকে 'পোড়ার মুখী' বলে গালাগাল করবে কিন্তু শাশুড়ির মুখ থেকে 'পোড়ার' শব্দ বের হয়েই 'লক্ জ' হয়ে যায়। পুত্রবধূ শাশুড়িকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেই ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেই শাশুড়ির মুখ থেকে বাকি শব্দ 'মুখী' উচ্চারিত হয়। তখনই গালাগালটি সম্পূর্ণ হয়। শাশুড়ি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার সমকালীন সমাজে পুত্রবধূ এবং শাশুড়ির সংসারে যে নিত্য কলহ চলছিল তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

চিকিৎসা ব্যবস্থার নানা অসংগতির কথা তুলে ধরে রচনা করেন 'চেহারা বদল' গল্প। গল্পটিতে ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে চিকিৎসা সম্পর্কে কুসংস্কার দানা বেঁধে রয়েছে এবং তা নিয়ে অজ্ঞতাবোধের পরিচয় মিলেছে এমন সব সরস ঘটনা ঘটিয়েছেন গল্পকথক। দেখা গেছে এ দেশের মানুষ এখনো পর্যন্ত কবিরাজি চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে বিশ্বাসী। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে কোনো যোগ নেই এদের। গল্পে জমিদার পুত্র নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে তিন কবিরাজের চিকিৎসাকে ভুল ধরেও তাদের সন্তুষ্ট করতে চিকিৎসা করার ঘটনাটি হাস্যকর। আবার এক

রোগীকে ফল কাটার পরামর্শ দিলে তাকে তাল কেটে খাইয়েছে, বার্লি খেতে বললে বালি খাইয়েছে। এইরকম ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার সমাজে মানুষের বাস্তব অবস্থার চিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'মাত্র দশটি টাকা' গল্পে নিখিলবাবু বিধুবাবুর কাছে দশ টাকা ধার নিয়ে বেশ কয়েকবার টাকা না দিয়ে ঘুরিয়েছেন। একদিন হঠাৎ করে নিখিলবাবুর বাড়িতে বিধুবাবুর গলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসায় নিখিলবাবু চোর কুঠুরিতে লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু সেখানে বোলতা থাকায় তাকে কামড় বসায় এবং বাম চোখ ফুলে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। অন্যদিকে বিধুবাবুও টাকা আদায়ের কায়দায় কলার খোসায় পা পিছলে অসম্ভব রকম আঘাত পায়। এতে তারা একে অন্যের কাছে এসে 'বাঁচান' বলে ওঠেন। এই ঘটনা পাঠকের মনে হাস্যোদ্রেক হলেও নিখিলবাবুর মতো মিথ্যেবাদী, ভন্ড চরিত্রকেও পাঠকের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছেন।

'চতুরীলাল' গল্পে কৃপণ চতুরিলালের ব্যবহার দেখে পাঠক হেসে ফেটে পড়ে। চতুরীলাল ডাক্তারখানায় গিয়ে চিকিৎসার পর ডাক্তারি ফিজ নিয়ে দরদাম করতে থাকে। এই চতুরীলালই আবার সেখানে সিফিলিসে আক্রান্ত এক মহিলা রোগীকে দেখে তার বিনা চিকিৎসায় অর্থাভাবে মারা যাওয়া মায়ের কথা মনে পড়ায় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। চতুরীলালের স্বভাব দেখে পাঠক হাসলেও তার মাতৃস্নেহের পরিচয় পেয়ে পাঠকমন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

'দশবছর' গল্পে রোমান্টিক প্রেমানুভূতির মধ্যে দিয়েও স্মিত হাসির সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। নায়ক সোমনাথ চিঠি লিখতে বসেছে দশ বছরের প্রাক্তন প্রেমিকা পুষ্পর জন্যে। বর্তমানে পুষ্পর বিলেতে বাস করা মিস্টার রজত রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু সোমনাথ পুষ্পকে এখনো ভুলতে পারেনি। ঘটনাক্রমে মিস্টার রজত রায় মারা যাওয়ায় সোমনাথ পুষ্পকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অন্যদিকে পুষ্পও সোমনাথকে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে। এমতাবস্থায় একদিন সোমনাথ চিঠি লেখা শেষ করে মনের আনন্দে নিচে নেমে আসতেই এক মোটা, ঘাড়-গর্দানে মেয়েকে দেখে যে কিনা বাড়ির নম্বর দেখে বেড়াচ্ছে। পরস্পরে তারা বাক্যালাপ করে নিজেদেরকে চিনতে পেরে অবাক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকে। রোমান্টিক ভাব কল্পনায় দুজনের দৃশ্যে পাঠক মনে বেশ হাসির উদ্রেক হয়।

'বাল্মীকি' গল্পে গল্পকার মনুষ্য চরিত্রের দোষত্রুটিগুলি তুলে তার প্রতি কটাক্ষ করে হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। গল্পকথক একজন কৃপণ স্বভাবের মানুষ। ঘরের প্রতিটি জিনিসই কোথায়, কীভাবে রয়েছে তা তাঁর হুবহু ঠোঁটস্থ। তার মনে সবসময় ঘুরপাক খাচ্ছে বাড়ি থেকে কেউ কিছু একটা সরিয়ে নিচ্ছে নাকি! এই সন্দেহের বসেই সর্বদা সে অস্থির। তাই শেষমেষ ঠিক করে বসলেন চাকরগুলিকে পাহারা দেওয়ার জন্য তিনি বিবাহ করবেন। শ্রীমতি মনোমোহিনী দেবীকে বিবাহ করলেন। বধূকে চাকরের উপর নজর রাখার দায়িত্ব দিয়ে বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে দেখেন মনমোহিনী

ইকনমিকস্ বই পড়ছে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কথকের এই কৃপণতা সমকালীন সময়ে বেশ ব্যঙ্গপ্রবণ।

'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে বনফুল মধ্যবিত্ত বাবু সম্প্রদায়ের দোষ-ত্রুটি গুলিকে তুলে ধরে তাদের ব্যঙ্গের কশাঘাতে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন। গল্পের শ্রীপতি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে প্রথম শ্রেণীতে বেশ কিছু জিনিস সহ ট্রেনে উঠে পড়েন। কেননা বাকি দুই শ্রেণীর কামরায় মানুষের ওঠার জায়গা ছিল না বলে। শ্রীপতির আবার গত তিনরাত্রি ঘুম হয়নি বলে তিনি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন ট্রেনে ঘুমিয়েই যাবেন। প্রথম শ্রেণীতে সাহেবি পোশাক পরা বাঙালি ভদ্রলোক মুখে ধূমায়মান পাইপ নিয়ে বিনা টিকিটে উঠে পড়েন। 'পাঞ্জাবি ক্রু' এসে ভাড়া চাইলে শ্রীপতি তার জিনিসপত্র সহ নিজের সমস্ত ভাড়া চুকিয়ে দেন অন্যদিকে সাহেবি পোশাক পরিহিত বাবুটির কাছে ভাড়া চাইলে ভাড়া না দিয়ে সমানে তর্ক করে যান। অপমানিত হওয়া শ্রীপতিই বাবুটির সমস্ত ভাড়া মিটিয়ে দেয়। গল্পকার সমাজে এই দুই শ্রেণীর মানুষের বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বাবু শ্রেণীর মানুষের ভন্ডামি গুলোকে পাঠকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

'স্ত্রী চরিত্র' গল্পতে গল্পকার গল্পের ভিতর গল্প রচনা করেছেন। স্ত্রী শ্রীমতী সুনন্দা পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া 'গল্প নহে' গল্পটি পড়তে পড়তে নায়িকা নির্মলার জন্য কষ্ট পেয়ে ওঠে। এমনকি চোখ থেকে জলও এসেছে তার। পরক্ষণেই সুনন্দা জানতে পারে, গল্পটি তারই স্বামী লিখেছে নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে নিয়ে। তখন সহানুভূতির সাথে প্রবলভাবে জেগে ওঠে ঈর্ষাও। গল্পকার মানবচরিত্রে সহানুভূতির সাথে সাথে ঈর্ষাকে ফুটিয়ে হালকা কৌতুকের পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

'অনির্বচনীয়' গল্পে ক্ষণিকা খাস্তগীর একজন ইংরেজিতে অনার্স, বি.এ করা মেয়ে। যার বিবাহের প্রস্তাব আছে জয়ন্তবাবুর সঙ্গে। এই প্রস্তাব শুনে ক্ষণিকা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। তখন তারই বান্ধবী সুজাতা জয়ন্ত বাবুকে বিবাহ করে। অল্পদিন পরে দেখা যায় ক্ষণিকাই আবার জয়ন্ত বাবুকে 'লভ ম্যারেজ' করে নিয়েছে। অর্থাৎ পুরো গল্পে ক্ষণিকার মধ্যে অন্যের দেখে হিংসা করে তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে হাস্যকর।

'অতীতের রাণী' গল্পে মানুষের মনুষ্যত্বহীনতার চিত্রকে তুলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পের এক বৃদ্ধা ভিখারিণী গত দুদিন ধরে না খেয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে দুটো খেতে চেয়েছে। অন্যদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে সুন্দরী নায়িকার আকর্ষণীয় চিত্র দেখার জন্য প্রচুর মানুষের ভিড় জমেছে। সকল মানুষই বৃদ্ধা ভিখারিণীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে কেউই দয়া করে এগিয়ে আসেনি। ভিখারিণীও শেষমেষ অধৈর্য হয়ে পুলিশের মুখের দিকে ভিক্ষে করা বাটিটি ছুঁড়ে দেয়। পুলিশও তার লাঠির আঘাতে বৃদ্ধাকে মাটিতে ফেলে দেয়। বৃদ্ধা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। বৃদ্ধার এই করুণ ছবির সাথে গল্পকার সমাজের মনুষ্যত্বহীনতাকে দেখিয়েছেন।

'খেঁকি' গল্পে গল্পকার এক কুকুরের আত্মজীবনী তুলে ধরে তার মুখে যে সব সংলাপ বসিয়েছেন তাতে আমরা না হেসে পারিনা। কুকুরটির সব লোম উঠে গিয়ে পুরো শরীরে ঘা হয়ে যায় এবং চোখেও ঠিকমতো সে দেখতে পায়না। স্টেশনে পাতা আর ঠোঙ্গা নিয়ে অন্য কুকুরদের সাথে ধস্তাধস্তি করে এমতাবস্থায় সে আকাশ কুসুম ভাবনা-চিন্তা করে কোন এক পূর্বপুরুষ তার 'বুল ডগ' ছিল বলে। তাই আজকের এই দুর্দিন আগামীতে সুদিন হয়ে উঠবেই। এমনই একদিন এক সাহেবের Dog Box-এ রাখা কুকুর হারিয়ে যাওয়ায় কুলি মিঠ্ঠু তাকে ধরে নিয়ে Dog Box-এ সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাহেব যেভাবে তাকে অপমান করেছে এবং কুকুরটি তার আত্মজীবনীতে যেসব সংলাপ উচ্চারণ করেছে তাতে হাসির সাথে দুঃখও অনুভূত হয়েছে। এখানে সাহেবদের আচরণে লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে কুকুরটির স্বপ্নভঙ্গের হতাশার ছবিকে তুলে ধরেন।

'অদ্বিতীয়া' গল্পে পুরুষের কামপ্রবণ মনকে দেখিয়ে গল্পকার পাঠককে হাসিয়ে ছেড়েছেন। গল্পে নায়কের স্ত্রী প্রভাবতী চার বছরে ছয়টি সন্তান প্রসব করে এবং একটি শিশুরও জন্ম দেবে বলে। প্রভাবতী মনে করে তার স্বামী তাকে খুবই ভালোবাসে। সে মারা গেলে স্বামী কষ্টবোধ করবে। আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে না। তাই স্বামীর কাছে প্রভাবতী অদ্বিতীয়া। স্বামীর প্রতি এই বিশ্বাস রেখে দিদির সাথে রীতিমতো বাজিও ধরে কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যায় সপ্তম সন্তানটি প্রসব করার সময় প্রভাবতী মারা যায় আর প্রভাবতীর দিদির দেওয়া একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে সংসার বাঁচানোর দোহাই দিয়ে সংযম হারিয়ে স্বামী বিবাহে রাজি হয়ে যায়। গল্পকথাক প্রেম-ভালবাসাকে দূরে সরিয়ে কামাতুর হয়ে উঠেছে। গল্পকথকের এই কাম প্রবণতার পরিচয়কে লেখক বেশ ব্যঙ্গ করে দেখিয়েছেন।

'সাধু' গল্পে লেখক ভারতবাসীর মনে সাধুর প্রতি অন্ধবিশ্বাস দেখিয়ে জীবু চরিত্রের স্বার্থলোভকে তুলে ধরেছেন। জীবু সংসারহীন, সাধুত্বের কোন পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও এক লোককে সাধু বানিয়ে ফেলে। এতে নিউমোনিয়া রোগে ভুগতে থাকা রোগী সাধুর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে সেরে ওঠে। যদিও তার পিছনে ছিল পূর্বে দেওয়া ডাক্তারের ওষুধ সেবন। কিন্তু এই ওষুধকে অগ্রাহ্য করে সাধুকেই প্রাধান্য দেয় সকলে। এরপর থেকে গ্রামের সকলেই সাধুকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু বলে ভাবতে শুরু করে। সাধু নিজেকে সকলের কাছে অলৌকিকতাহীন বললে সকলে তা মেনে নেয়নি বলে সাধু সব ছেড়ে অন্যত্র প্রস্থান করে। এখানে জীবু চরিত্রকে দিয়ে সমকালীন সমাজের ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করেছেন।

'অভিজ্ঞতা' গল্পে মানুষের অহংবোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গল্পে দুজন রোগীর দুই পিতাকে তুলে ধরে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের চিত্র এঁকেছেন। দুই রোগী টাইফয়েডে আক্রান্ত। গল্পকথক তাদের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেন প্রথম রোগীর পিতা একজন ডাক্তার। ছেলের অল্পকিছু হলেই বারবার অহংকারের বসে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা

করার কথা বলেছেন। মা-ও বাবার মতোই অহংকারী। চিকিৎসায় ছেলেটি মারা যায় বাবা-মায়ের কাছে হতাশার কথা শুনতে শুনতেই। অন্যদিকে সরল সাধারণ ভদ্রলোকটির ছেলেও মারা যায়। বাবা তাতে শোকগ্রস্ত হয়ে ডাক্তারের পায়ের ধুলো দিতে বলে ছেলের কপালে। আশীর্বাদও করতে বলেন। শুধু তাই নয়, শেষকৃত্যের জন্য ছেলেকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এক হাজার টাকা হাসপাতালের নামে দান করেন। শেষে জানা যায়, তার পিতা একজন বিলিতি ডিগ্রিধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন। ডাক্তারের এই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রত্বের ব্যবহারের সঙ্গে ওই অল্পজ্ঞানী ডাক্তারের হীন চরিত্রকে তুলে ধরে ব্যঙ্গ করেছেন গল্পকার।

'দুধের দাম' গল্পে এক বৃদ্ধ ভিখারীর ট্রেন যাত্রীকে তুলে ধরে শিক্ষিত ভদ্র বেশধারী সমাজকে যেমন ব্যঙ্গ করেছেন তেমনি অল্প শিক্ষিত কুলিকে এনে তার মাতৃস্নেহকেও ফুটিয়ে তোলেন। প্লাটফর্মের মানুষগুলো হুড়মুড় করে ট্রেনে চড়ছেন বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই। বৃদ্ধা তাদের কাছে কাতরস্বরে সাহায্য চাইলেও কেউই এগিয়ে আসেনি। অনেক কষ্টে টিকিট কেটে বৃদ্ধা ট্রেনের মধ্যে উঠে পড়ে। সবাই নিজের মতো পা ছড়িয়ে জায়গা করে বসলেও বৃদ্ধার জন্য কেউ এক তিলও ভাবেনি। উল্টে তাকেই আবার 'বিনা টিকিটের প্যাসেঞ্জার' বলে কটাক্ষ করেছে। ট্রেন থেকে সবাই নিজের মতো করে নেমে যায়। নিষ্পাপ বৃদ্ধার দিকে সাহায্যের জন্যে একটি হাতও এগিয়ে আসেনি। অবশেষে এক কুলি এসে বৃদ্ধাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য অন্য ট্রেনে চাপিয়েও দেয়। সাহেবি পোশাক পরা ট্রেনের ওই বাবুভাইয়াদের বর্বরোচিত আচরণে বিদ্ধ হয়ে ব্যঙ্গ করে গল্পটি গল্পকার রচনা করেন।

ভিন্ন রীতির স্বাদ নেওয়ার জন্য বনফুল রচনা করেন 'উৎসবের ইতিহাস'। এখানে সমকালীন সময়ে চাকরির আকাল দেখিয়ে সুপারিশ করে চাকরি দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি লাভ করেছে। গল্পে নায়ক নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম.এ। তবুও তাকে অন্যের হাত ধরে মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরিতে ঢুকতে হয়। এই চাকরি হওয়ায় সে ভোজের আয়োজন করেছে। শুধু তাই নয়, এক কুৎসিত মেয়ের পাণিগ্রহনের জন্যও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে নরেন।

'ট্রেনে' গল্পে এক বৃদ্ধ খবরের কাগজে নিবিষ্ট হয়ে এক হাতে মোটা বর্মা চুরুট ধরিয়ে দানাপুর যাচ্ছিলেন। ট্রেনে চেপে পরের স্টেশনে উনিশ-কুড়ি বছরের এক যুবক ওই ট্রেনে ওঠে। যুবকটি নিজের থেকে বৃদ্ধের সাথে পরিচয় করতে চাইলে বৃদ্ধ রেগে ওঠে। পরে বৃদ্ধের হাতের কাগজ চেয়ে নেয় যুবক। খবরের কাগজের খবর নিয়ে জমে ওঠে দুজনের ভাব। আবার যুবকের মাসিক পত্র চেয়ে বৃদ্ধ একটি গল্প পায়। শুরু হয় পরস্পরের কথোপকথন। বৃদ্ধের গল্পটি হল- সৈরভী নামক এক মেয়েকে সে প্রেম করে। তাই নয়, তার গর্ভে দু'মাসের একটি ছেলেও ছিল। হঠাৎ সৈরভী একদিন উধাও হয়ে জমিদারের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে শুনে বৃদ্ধও আর পাত্তা দেয়নি। গল্পটি শুনে যুবক বলে 'সৈরভী আমার মা' কিন্তু বাবার নাম হারাধন বসাক, যা বৃদ্ধের নামের সঙ্গে

মেলেনি। বৃদ্ধটি যুবকের বাবা না হওয়ায় সে বৃদ্ধের কাছে চুরুট চেয়ে বসে। অর্থাৎ পুরো গল্পটিতে গল্পকার উনিশ-কুড়ি বছরের যুবকের বড়োদের প্রতি অশ্রদ্ধা যেমন দেখিয়েছেন তেমনি বৃদ্ধের চরিত্রহীনতার পরিচয়ও ব্যঙ্গের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

মৃদু কটাক্ষ করে ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়ে রচিত হয়েছে 'উচিত-অনুচিত' গল্পটি। গল্পে অশোক ও শফরীর বিয়েতে তাদের বাবা-মায়ের আপত্তির কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও তারা বিবাহে আপত্তি জানায়। সেই আপত্তিকে অবহেলা করে তারা পালিয়ে বিয়ে করে নেয়। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ওই অশোক ও শফরীই তাদের একমাত্র মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আনে গল্পকথকের ছেলের সঙ্গে। আজ অশোক ও শফরী সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এখানেও তাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহে আপত্তির কোন কারণ ছিল না। তবুও গল্পকথক রাজি হতে পারেননি। অর্থাৎ সমাজে উচিত-অনুচিতের মাপকাঠি কীভাবে নিজের কাছে বদল হয়ে যায় তাই ব্যঙ্গের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

'জাগ্রত দেবতা' গল্পে সনাতনপুরে মহাদেবকে জাগ্রত দেবতা বলে সকলেই জানে। বিশ্বাস করে বিপিন চৌধুরী, মুখুজ্যে, ঘোষাল ইত্যাদি ব্যাক্তির অবস্থার পরিবর্তনের পিছনে মহাদেবই মূল কারণ। তাই বছরের অন্য দিনগুলিতে কোন কিছু না হলেও বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সকলে মহাদেবের প্রচণ্ড আরাধনা করে উৎসব করে। অপরদিকে মহাদেবের মাহাত্ম্যে ঐদিন একটি লোকও পাগল হয়ে যায়। এবছর কিন্তু কোন লোকেরই পাগল হওয়ার ঘটনা কোথাও শোনা যায়নি বলে সকলেই (একমাত্র প্রবীণ নীলমণি বাদে) ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কায় ফেটে পড়ে। দেবতার প্রতি মানুষের এই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনকে ব্যঙ্গ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

'অণুবীক্ষণ' গল্পে গল্পকথক এক লোকের কদর্য চেহারা, মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, ঠোঁটে ঘা দেখে সিদ্ধান্ত নেয় সে সিফিলিস রোগাক্রান্ত। কিন্তু রক্ত পরীক্ষায় তার কোন রোগ ধরা পড়েনি। অন্যদিকে যে লোকের দিকে গল্পকথক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, যার সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস কণ্ঠস্থ, ভারতবর্ষের বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য রয়েছে তার রক্তেই মেলে সিফিলিসের জীবাণু। বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্র বেশধারী মানুষদের এইভাবে সামাজিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করে পাঠকের সামনে হাজির করেছে।

'নদী' গল্পে গল্পকথকের বাল্যবন্ধুর মেয়ে আদরিণী সে অত্যন্ত সুন্দর এবং মেধাবীসম্পন্ন শিক্ষিত। বিবাহের জন্য বাবা পাত্র খুঁজছে। পাত্রের বাবারা মোটা অঙ্কের টাকা পণ হিসেবে চেয়ে বসায় সম্বন্ধ বারবার ভেঙে যায়। কেননা আদরিণীর বাবা পণ দিতে অপারগ। তাই আদরিণীও সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এক মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। লেখক গল্পটিতে পাত্রপক্ষের লোভী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে কটাক্ষ করেছেন।

'একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' গল্পে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত শহরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এক ইতিহাসের পন্ডিত এসেছেন আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে। চোখ

বুজেই বক্তৃতা করা তার অভ্যেস। তাই সভার মধ্যে চোখ বুজেই একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করছেন। হঠাৎ গল্পকার তাকে থামতে বলায় তিনি লক্ষ করলেন তার বক্তৃতা শোনার জন্য হলঘরে কেউ নেই। গল্পকার পন্ডিতের স্থান-কালের প্রতি এই অজ্ঞানতার মূর্খতা দেখিয়ে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন।

'মুগুর' গল্পে গল্পকার দেশ স্বাধীন হয়েও কিভাবে আশাহত নির্জীব হয়ে দিনযাপন করছে সেই সমাজের ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন। দেশে চাকরি নেই, মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ঘুষ দিয়ে চাকরি করছে। মাশল পাওয়ার শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। স্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষ রামগুরু ছেলের টাইফয়েড চিকিৎসায় ওষুধ জোগাড় করতে পারেনা, পুরানো বন্ধু পঞ্চানন মাশল পাওয়ার কাজে লাগিয়ে ওষুধের সাথে সাথে এক বস্তা গোবিন্দভোগ চাল আর একটা বড় রুইমাছও বাড়িতে পৌছে দিয়েছে।

'দাঙ্গার সময়' গল্পে ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচয় রয়েছে। দাঙ্গার সময় মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কায় যখন হিন্দু গল্পকথক ভীত, মাস্ অ্যাটাকের আশঙ্কা করে প্রস্তুত হচ্ছেন ঠিক সেইসময়ই আক্রমণকারী ভেবে গল্পকথক বন্দুক চালিয়ে বসেন তারই কাছে আশ্রয় চাইতে আসা বাল্যবন্ধু রহিমকে। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর রহিম আর্তস্বরে বন্ধু পরেশকে জানায় যে, সে পাটনা থেকে বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এই করুণস্বর তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে প্রতিনিয়ত যে সুস্থ মানবিকতার মৃত্যু ঘটে চলে তাই গল্পকার ব্যাঙ্গের আকারে বোঝাতে চেয়েছেন।

উপরোক্ত গল্পগুলি পাঠ করে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, বনফুল তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে ঢেলে রচনা করা ছোটগল্পগুলিতে সর্বক্ষণ মানুষকে ব্যঙ্গের আঘাতে তাদের সমাজ জীবনের সচেতনতা সম্পর্কে সমানভাবে বার্তা দিয়ে চলেছেন। এখানে বাবু সম্প্রদায়ের অন্যায়-অত্যাচারের সমস্ত অসঙ্গতির দিকগুলিকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবেই অল্পশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, ভক্তিরও প্রকাশ পেয়েছে। তার এই ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে তিনি কোথাও হিউমার জাতীয়, কোথাও স্যাটায়ার জাতীয় হাস্যরস আবার কোথাও করুণ রসেরও সাহায্য নিয়েছেন। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য গল্পকারদের থেকে এখানে তিনি এক অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়ে রয়েছেন আজও।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

- ❑ নন্দী, ড. ঊর্মী, বনফুল : জীবন, মন ও সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭, কলকাতা
- ❑ মুখোপাধ্যায়, ড. নিশীথ, বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ : ১৯ শে জুলাই ১৯৯৮, কলকাতা

- ঘোষ, ড.অজিতকুমার, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, করুণা প্রকাশনী, পঞ্চম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০১৫, কলকাতা
- বনফুলের ছোটগল্প সসমগ্র (প্রথম খন্ড - চতুর্থ খন্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫৮-১৩৬০, কলকাতা (পি.ডি.এফ)

ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় বনফুলের অনুগল্প

শ্রেয়সী দাস
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা ছোট গল্পের অদ্বিতীয় লেখক হলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বনফুলের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ছোটগল্প হিসেবে 'শ্রীপতি সামন্ত', 'বুধনি' ইত্যাদি গল্প পড়ে আমি বনফুলের ছোটগল্পের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। যার ফলস্বরূপ আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাকার থেকে জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনটি সংগ্রহ করে ফেলি এবং বনফুলের ছোটগল্পের একটি বিশেষ শ্রেণী লক্ষ্য করি। সেটি হল ব্যঙ্গাত্মক ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে বনফুলের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোট গল্পের পরিণত রূপ লাভের পর এক বাক বদল ঘটেছে যে কজন কথাশিল্পীর হাতে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বনফুল। লেখক হিসেবে বনফুল বৈচিত্র পিয়াসী, ছোট গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি সাহিত্যে সকল সাক্ষাতে তার অবাধ বিচরণ থাকলেও ছোটগল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে নিজস্ব এক জীবন দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। আমার মনে হয়েছে বনফুলের ছোটগল্পে অন্যতম একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেণী হল ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প। যেখানে রসক্তি নয়, বক্রোক্তি হলো তার গল্পের আশ্রয়। বনফুলের ছোটগল্পের এই বিশেষ শ্রেণীটি নিয়ে আমি মূল গ্রন্থে আলোচনা করব।

বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম শাখা, ছোটগল্পের অদ্বিতীয় লেখক হলেন বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বনফুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছোট গল্পের মধ্যে অন্যতম এবং তাৎপর্যপূর্ণ শ্রেণীর ছোটগল্প হল ব্যঙ্গাত্মক ছোট গল্প। এই শ্রেণীর ছোটগল্পের মধ্যে বনফুলের সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে বস্তুত পক্ষে বলা যায় এই শ্রেণীর ছোট গল্প গুলির মধ্যে প্রাধান্য পায়নি রসক্তি প্রধান ভাবে ফুটে উঠেছে বক্রতী।

ব্যঙ্গ কৌতুকে বনফুলের লেখনী ক্ষুরধার। ঈশ্বর গুপ্ত ও ত্রৈলোক্যনাথের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে তিনি ব্যঙ্গকৌতুক রসকে পরিপুষ্টি দিয়েছেন। মানুষের চরিত্রের যেখানে অসঙ্গতি দেখেছেন সেখানেই ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। একজন ন্যায়-নিষ্ঠ শাসক যেমন নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে মুখে হাসি নিয়ে পিঠে চাবুক চালাতে দ্বিধা করেন না, বনফুল তেমনি মানবচরিত্রের স্খলনে স্খলিত চরিত্রের পিঠে চাবুক হানেন ঠোঁটের কোণায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের হাসি নিয়ে।

বনফুলের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন -

"তার পরিমিতিবোধ,আখ্যানধর্মী সহজ-সরল বর্ণনা- ঋজু স্পষ্ট এবং তির্যক, অতি অল্প কথায় অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কন, ব্যঙ্গাত্মক সরসিক দৃষ্টিভঙ্গি, গল্প শেষে আকস্মিকতা এবং প্রাণখোলা হাস্যরস। "১

বনফুলের বেশ কিছু গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছে সেই গল্পগুলোতেই ব্যঙ্গের বাণ ধারালো হয়ে উঠেছে। বনফুলের এই ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বণিক ও শাসক ইংরেজের প্রশ্রয়ে আমাদের দেশে একশ্রেণীর অকর্মণ্য, ভোগাসক্ত, মেরুদন্ডহীন ইংরেজদের পদলেহনকারী,চাটুকার মানুষেরা বঙ্গদেশে গজিয়ে উঠেছিল যারা বাবুসম্প্রদায় নামে পরিচিত। বাবুসম্প্রদায়ের বিলাসবহুল উচ্ছৃঙ্খল নীতিহীন জীবনযাপনে বাঙ্গালীর একাংশ দেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই শ্রেণীর বাবুসম্প্রদায়ের অদ্ভুত আচার-আচরণ নিয়ে আমাদের দেশের বহু লেখক বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকরহস্য' গ্রন্থের ‘বাবু' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে এই শ্রেনীর মানুষদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। অবশ্য তারও আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থে, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সমাজ বিষয়ক কিছু কবিতায় এই বাবু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রূপ হেনেছেন। বাবু সম্প্রদায়ের বিচিত্র চালচলন আচার-আচরণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়ায়নি। ‘শ্রীপতি সামন্ত' গল্পে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের মাধ্যমে বাবু সম্প্রদায়ের দোষত্রুটিগুলির একটি বিশেষ দিককে উন্মোচিত করেছেন তিনি, যাতে মধ্যবিত্ত বাবু সম্প্রদায় নিজেদের চরিত্রের ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং দোষগুলি সংশোধন করে। আলোচ্য গল্পে শ্রীপতি সামন্ত তৃতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট কেটে রাত্রি আটটায় স্টেশনে এসে দেখেন ট্রেনে তিল ধারণের স্থান নেই। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলছে। মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি, এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি মোটামুটি খালি। সেখানেও সাহেবি পোষাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসে আছেন, মুখে ধুমায়মান একটি পাইপ। শ্রীপতি সামন্ত অনেক ছোটাছুটি করেও কোথাও উঠতে পারলেন না, অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যাবেন। আর তাছাড়া শরীরের প্রয়োজনেই ওই রাত্রে ঘুম তাঁর বড় প্রয়োজন। কেননা বিগত তিন রাত্রে তাঁর ঘুম হয়নি। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি বুদ্ধি এল। গার্ডের সঙ্গে কথোপকথনরত ছোট বাবুকে গিয়ে ধরলেন যদি ফার্স্ট ক্লাসে একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বাধ সাধলেন প্রথম শ্রেণীর সাহেবী পোশাক পড়া যাত্রীটি। তিনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “দ্যাট কানট বি! আই ক্যান্ট অ্যালাউ।” সামন্ত মহাশয় করজোড় করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় হল। সামন্ত মশায় কোনরকম কোন উপায় বের করতে না পেরে জোর করে উঠে পড়লেন ফার্স্ট ক্লাসে, সঙ্গে এক বান্ডিল খালি বস্তা,দুই হাঁড়ি গুড়,একটি তরমুজ,দুটো প্রকান্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোচকা ও পুটুলি এবং একটিন ঘি। ট্রেন ছেড়ে

দেওয়ার পর যথাসময়ে 'ক্রু' এসে ভাড়া চাইলেন। সামন্ত মশায় 'ক্রু'র নির্দেশ মত নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। এরপর 'ক্রু' বাঙ্গালী সাহেবটির কাছে টিকিট চাইলে সে বলে "মাই টিকিট ইজ ইন মাই স্যুটকেস, প্লীজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।" কিন্তু ক্রু নাছোড়বান্দা। অবশেষে দেখা গেল যে তার কাছে কোন টিকিটই নেই। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি যাকে অবজ্ঞা করছিলেন সেই শ্রীপতি সামন্তই তার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

লেখক এই গল্পে পাশাপাশি দুটি চরিত্র নির্মাণ করেছেন। একদিকে শ্রীপতি সামন্ত খুবই সাদামাটা লোক যার পরনে একটি আধ ময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলি ধূসরিত একজোড়া দেশী মুচীর তৈরী চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ফাটা চশমা এবং সুতা-বাধা চশমার ফ্রেম পরিহিত। অন্যদিকে সাহেবী পোশাক পরিহিত বাঙ্গালীবাবু যার মুখে ধুমায়মান একটি পাইপ, এবং বাঙ্গালী হলেও যিনি ইংরেজীতে কথা বলতে ভালোবাসেন। শ্রীপতি সামন্তর টাকা পয়সা থাকলেও কোনরকম ঠাটবাট নেই। তাই তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটতেই তিনি অভ্যস্ত, অন্য দিকে ঠাটবাটের অভাব নেই কিন্ত টিকিট না কেটে ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। এই দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে লেখক বাবু শ্রেণীর চরিত্রের অন্তঃস্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। আসলে বনফুল ভন্ডামি সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি ভন্ড বাবু সম্প্রদায়ের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এখানে।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হাস্যরসিক কিন্তু এমন হাস্যরসিক তিনি নন যিনি ব্যঙ্গের চাবুকে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে দেন। তাই অনেক গল্পে তিনি যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তা অবশ্যই বুদ্ধিদীপ্ত এবং হিউমার রসসিক্ত। তাই বাবুবেশধারী টিকিটহীন ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীটিকে চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আর তা তিনি করেছেন তাকে দিয়েই যাকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত প্রচন্ড অবজ্ঞা করছিলেন বাবুটি। অথচ চাইলেই শ্রীপতি সামন্ত তাকে টিটকারী করতে পারতেন, তাকে করা অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিতে পারতেন পালটা অবজ্ঞা করে। কিন্তু সে পথে যাননি তিনি। বরং তিনি বলে ওঠেন— "ও কুরু মহাশয়, - বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি! কটা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি- ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার। "

মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া মানুষদের প্রতি কটাক্ষ রয়েছে 'দুই খেয়া' গল্পে। পাড়াগায়ের দুই বন্ধু উমেশ ও নবীন একই সঙ্গে ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রওনা দিতে গিয়ে দেখে খেয়ার শেষ নৌকা চলে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। অথচ তাদের সেদিনই যেতে হবে। কেননা ঠিক তার পরের দিনই তাদের ভর্তি হতে হবে। কিন্তু কেমন করে তারা যাবে? হঠাৎ করে তাদের নজরে পড়ে একটু দূরে একটি নৌকা দাড়িয়ে আছে। নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে মাঝি জানায় যে কোনও এক দারোগা সাহেবকে নিয়ে যাবার জন্য ওপারের এক জমিদার নৌকা পাঠিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে উমেশ নিজেকে সেই দারোগা বলে পরিচয় দেয় এবং নৌকায় উঠে পরে। কিন্তু

নবীন নাছোড়বান্দা। মিথ্যার আশ্রয় সে নেবে না। ফলস্বরূপ তার আর ডাক্তারি পড়তে যাওয়া হয় না। পঁচিশ বছর পর দেখা যায় সেই উমেশ এখন মেজর ইউ.সি.চ্যান্ডা। যার কথাবার্তায় প্রকাশ পায় দেমাক এবং কথায় কথায় যার পয়সার অহঙ্কার। ফলস্বরূপ অসময়ে নিজের গায়ের মাঝিও তাকে পার করতে রাজী হয় না। অথচ সে মাঝিই অপেক্ষা করতে থাকে নবীনের জন্য নবীন তাকে কিছু না বলা সত্ত্বেও। লেখক জানিয়েছেন : "নবীন ডাক্তার হতে পারেনি। হয়েছিল দেশ-সেবক। " মিথ্যাশ্রয়ী মানুষদের এভাবেই কটাক্ষ করেছেন এ গল্পে।

ডাক্তারি অভিজ্ঞতা নির্ভর 'অনুবীক্ষণ' গল্পটি বনফুলের ব্যঙ্গরসের গল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সামজিক পর্যবেক্ষণ খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে গল্পটিতে। গল্পকথক রক্ত পরীক্ষা করতে বসে যে লোকটার কদর্য চেহারা, মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, ত্রি সন্ধ্যা, সদা-সঙ্কুচিত ভাব, ইংরেজি জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি দেখে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তাঁর ঠোটের ঘায়ের কারণ সিফিলিস ছাড়া অন্য কিছু নয়। রক্ত পরীক্ষায় কিন্তু তার কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ যে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে গল্প কথক মুগ্ধ হয়ে গেলেন, সক্রেটিস থেকে শুরু করে স্ট্যালিন পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের ইতিহাস যার কণ্ঠস্থ, ভারতবর্ষেরও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ যার নখদর্পণে, ব্রহ্মচর্যের পথকেই যিনি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করেন রক্ত পরীক্ষায় তার রক্তেই পাওয়া গেল সিফিলিসের জীবানু। গল্পকথকের ডাক্তার বন্ধু সব শুনে বললেন : "তাই তো প্রত্যাশা করেছিলাম। বিলিতি এডুকেশনের মজাই ওটা এম.এ.ডি.লিট প্রচন্ড বিদ্বানা" বিলিতি এডুকেশনে শিক্ষিত ভদ্রতার মুখোশধারী মানুষগুলিকে বনফুল এ গল্পে বিদ্রূপ করেছেন 'দুধের দাম" গল্পে বনফুল মানুষের মনুষ্যত্ববোধহীনতাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন একজন ট্রেনযাত্রী বৃদ্ধাকে সামনে রেখে। মানুষগুলো এতটাই মনুষ্যত্ববোধহীন যে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এত মানুষের মধ্যেও একজন বৃদ্ধা যখন পড়ে যান তখন সেদিকে কেউ লক্ষ করতে পারেন না। আর যাঁর হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকে বুড়ি পড়ে যান, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক হলেও বৃদ্ধের প্রতি তার কোনও করুণা হয় না। উল্টে বৃদ্ধাকে সধমক উপদেশ দেন : "পথ দেখে চলতে পার না? আর একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিড়ে যেত যে।" এরপর ট্রেন এলে ছুঁড়িয়ে খুড়িয়ে অতিকষ্টে টেনে চাপলেও কেউ এই বৃদ্ধাকে একটু সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে না। যে যার মত পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও বৃদ্ধাকে কেউ একটু করুণা করে বসার সুযোগ করে দেয় না। বৃদ্ধার কাছে বৈধ টিকিট থাকা সত্ত্বেও সকলেই মনে করে যে সে বিনা টিকিটের যাত্রী। এরপর ট্রেন থেকে নামার সময় পায়ের ব্যথায় কাতর বৃদ্ধা নামতে একটু সহযোগিতা করার জন্য সকলকেই কাতর অনুরোধ করলেও কেউ সেদিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে না। উল্টে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয় : "ভিখিরী মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? ..." অবশেষে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে একজন বৃদ্ধাকে অতি যত্নে কোলে করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন এবং গন্তব্যস্থলে যাবার ট্রেনে উঠিয়ে

দিলেন। বনফুল এ গল্পে বাঙ্গালীর বাবুয়ানার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন। তারা সাহেবী পোশাক পরে যতই সভ্য হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন তা যে মুখো যাত্র ভেতরে রয়েছে চূড়ান্ত বর্বরতা সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন বনফুল এ গল্পে। তাই শ্বেতবর্ণ সাহেব ফার্স্ট ক্লাসে এভাবেই দেশের গরীব মানুষেরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ আয়োজন বেশ বড় মাপের সেখানে। “সত্যিই বড় হাসপাতাল। বড় বড় থাম-সারি সারি বাড়ি। গিজ গিজ করছে লোক। ” এভাবেই বনফুল দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করেছেন এ গল্পে।

'সেকালের রায়বাহাদুর' গল্পটিও ব্যসপ্রধান। এ গল্পে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে এক বিশেষ শ্রেণীর ভারতবাসীর মানসিকতাকে। একদিকে ভারতবর্ষের হাজার, হাজার মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ বলি দিচ্ছে অন্যদিকে ভারতবাসীরই কিছু অংশ তলে তলে ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করছে, ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুগত্য করছে। কম কথার মধ্যে কত বেশি বলা যায় এ পরীক্ষায় বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল অদ্বিতীয়। তার বাক্য অনলংকৃত অথচ সুন্দর,সরল অথচ বলিষ্ঠ, চিত্তহারী অথচ ক্ষুরধার।

তথ্যসূত্র :

ড. সরোজমোহন মিত্র, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, তুলসী প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ' ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৩৮

*তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যবহৃত গল্পের অংশগুলি জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প' থেকে নেওয়া হয়েছে,বাণীশিল্প,প্রথম প্রকাশ জৈষ্ঠ ১৩৫৫,পৃষ্ঠাঃ-৫৭-২০৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬।

২) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম প্রকাশ:- আগস্ট ১৯৮২

৩) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, লেখকের মুখোমুখি, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ- ভাদ্র, ১৩৬১,

৪) ঊর্মি নন্দী, বনফুল : জীবন, মন ও সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বই মেলা ১৯৯৭

৫) জগদীশ ভট্টাচার্য, বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বাণীশিল্প, ১৪এ টেমারলেন কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫

৬) চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, বানী শিল্প, ১৪এ টেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৫

৭) চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র ২য় খন্ড, বানী শিল্প ১৪এ টেমারলেন, কলকাতা ৭০০০০৯, সেপ্টেম্বর ২০০5.

৮) প্রমথনাথ বিশী, বনফুলের ছোটগল্প, কথাসাহিত্য, বনফুল সংবর্ধনা সংখ্যা আষাঢ় ১৩৬৪

৯) বিপ্লব চক্রবর্তী, বনফুল, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্র ভবন ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ২০০৫

১০) বনফুল, *পশ্চাৎপট,* বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণঃ২০১৪

১১) ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩,পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ) -২০০৩

১২) নিশীথ মুখোপাধ্যায়, বনফুলের জীবন ও সাহিত্য, বর্ণালী ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশঃ-১৯ জুলাই ১৯৯৮

১৩) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণঃ২০০১,পৃষ্ঠা ৬৮৪

১৪) সরোজমোহন মিত্র, *বনফুল:*সাহিত্য ও জীবন, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণঃ- ১৯শে জুলাই ১৯৯৯,

১৫) সুকুমার সেন, *বনফুলের ফুলবন,* সাহিত্য লোক, ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬,প্রথম প্রকাশ দোল পূর্ণিমা ১৩৯০

মৈমনসিংহ-গীতিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচয়

সেখ হোসেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সময়কাল মোটামুটি ভাবে ধরা হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত। এই সময় পর্বের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই, বাংলার সমাজ ছিল দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান। এদের জাগতিক সম্পর্ক ছিল পরস্পর বিরোধী। শাসিত ও শাসকের, স্বদেশী ও বিদেশীর। আদর্শগত বিরোধ ছিল ধর্ম ও দর্শনের, আচার ও আচরণের। ধর্মাদর্শের স্বাতন্ত্র্যের মূলে ছিল নিরাকার সাকারের, একেশ্বর ও বহুদেবত্ববাদের। এই বিভেদ থেকেই বিরোধ, বিরোধ থেকে বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা। বিরোধ বিভেদ আর বিদ্বেষের অনুরাগে রঞ্জিত হয়েই কবিহৃদয় নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। এই ঘৃণা, অবজ্ঞা, অবহেলা দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ ব্যবধান সৃষ্টি করছিল। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য এর স্পষ্ট নিদর্শন। সমসাময়িক কালেই রচিত হয়েছিল গীতিকা সাহিত্যগুলি। পল্লী কবিদের রচনায় এই পারস্পরিক বিদ্বেষ্ ভাব প্রায় দূরীভূত। মৈমনসিংহ-গীতিকা গুলিতে দেখা যায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের সৌহার্দ্যের পরিচয়। হিন্দু এবং মুসলমান বহু শতাব্দী কাল পরস্পর একত্রে বসবাস করার জন্যই এই প্রীতির ভাব গড়ে উঠেছিল।

গীতিকাগুলি সংগৃহীত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ ও মৈমনসিংহের গায়েন ও বয়াতিদের কাছ থেকে। এরা ছিল নিরক্ষর এবং সমাজের সমস্ত রকম কলুষ প্রভাব থেকে মুক্ত। বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার অমূল্য সম্পদ গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে। বাংলার পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলি চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, মৈমনসিংহ, পার্বত্য ত্রিপুরার নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত কৃষক সমাজে এগুলি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর উপদেশদাতা ছিলেন স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় । চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালাগানগুলি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা প্রথম খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যা' নামে। ঐ একই বছর গীতিকাগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'Eastern Bengal Ballads - Mymonsingh(vol.1part.1)'। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়-এর সম্পাদনায় পূর্ববঙ্গ গীতিকার চারটি খন্ডে মোট পঞ্চান্নটি গীতিকা প্রকাশ পায়। এর মধ্যে প্রথম খন্ডটিতে দশটি পালা আছে। এটাই হল মৈমনসিংহ-গীতিকা। এই গীতিকার পালা গুলি হল মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান

ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কি? এবং মৈমনসিংহ-গীতিকার এই পালাগুলিতে সম্প্রীতির কথা কিভাবে উঠে এসেছে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব।

পৃথিবীতে জাতি ধর্ম বর্ণভেদে বহু মানুষ একত্রে বাস করে। নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের যে ভাব বিদ্যমান থাকে তাই হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। বাংলার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এদেশে এসে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাংলার পরিবেশ পরিস্থিতি কখনোই সম্প্রদায়গত বিভেদ সৃষ্টি করেনি। বরং অসাম্প্রদায়িক চেতনাকেই আরো মজবুত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কই ব্যাপকভাবে বাংলা লোকজীবনের দৈনন্দিনতাকে, সামাজিক মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এই টানাপোড়েন যথার্থভাবে বুঝতে হলে - "ঐতিহাসিকের পক্ষে ঐতিহাসিক কাহিনীর ধূলিধূসর প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যের সিন্ধুতীরে অবগাহন এমনকি নিমজ্জন ও অত্যাবশ্যক।"[১]

মূলত প্রণয়ঘটিত রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে পাঁচালীর ঢঙ্গে গীতিকাগুলি রচিত হয়েছে । মঙ্গলকাব্যের সমসাময়িক কালে উদ্ভূত হয়েছিল এই গীতিকাগুলি। দেব মাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্যগুলি স্থান পেয়েছিল বাংলাদেশের চণ্ডীমণ্ডপ এবং বারোয়ারি তলায়। সেখানে যাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক, কেবলমাত্র তারাই গীতিকার রস আস্বাদন করেছে। গীতিকার কাহিনিগুলি সাধারণ মানুষের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হত। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সভায় পরিবেশিত এই গীতিকাগুলির শ্রোতা ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ -

"সভা কইরয়া বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।।"[২]

এখানে ইন্দু অর্থে হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেছেন গীতিকার। আমাদের এখানে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই পালাগান আস্বাদন করতেন। আসলে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানরা ভারতে শাসন করার ফলে, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মেলবন্ধন ঘটেছিল। সমাজে তারা মিলেমিশে বাস করতে শুরু করেছিল।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় ধনী আর দরিদ্রদের মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে, স্বদেশী ও বিদেশীর মধ্যে যতটা বিরোধ ছিল, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততটা ছিল না। মহুয়া পালার গীতিকার দ্বিজ কানাই, জন্মসূত্রে একজন নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ। সভাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি তিনি কাব্যের বন্দনা করেছেন। সেখানে তিনি যেমন পূবেতে 'ভানুশ্বর' দক্ষিণে 'ক্ষীর

নদী সাগর' উত্তরে 'কৈলাস পর্বতে'র বন্দনা করেছেন, তেমনি পশ্চিমে 'মক্কা'র বন্দনা করেছেন। যা অসম্প্রদায়িক মনোভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত -

" পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান।।"[৩]

প্রসঙ্গত, মক্কা প্রত্যেক ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে অতি পবিত্র স্থান। তারা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করে। শুধু তাই নয়, মক্কাতে অবস্থিত ক্বাবা শরীফের দিকে মুখ করে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। তাছাড়াও গীতিকার 'আলাম-কালাম' কিতাব আর কোরানেরও বন্দনা করেছেন। এবার পালা শুরু হয়েছে হুমরা বেদে মহুয়াকে চুরি করে নিয়ে এসে তাকে পুত্রী স্নেহে বড় করে তোলে। দেশে-বিদেশে তাকে নিয়ে খেলা দেখাতে যায়। বামনকান্দাতে এলে নদ্যার চাঁদ মহুয়া রূপে মুগ্ধ হয়। অবশেষে বেদের দল নিজ দেশে ফিরে যায়।তাহলে তাদের ভালোবাসা কি প্রতিষ্ঠা পাবে না?কিন্তু নদ্যার চাঁদের পক্ষে তা অসহনীয়। তাই মহুয়ার খোঁজে নদ্যার চাঁদ ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করে বেড়িয়ে পরে । অবশেষে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। মহুয়া এক সাধুর কবলে পড়ে। মহুয়াকে সে নানা ভাবে প্রলোভন দেখায়। মহুয়া তাতে রাজি হয় না। সাধু বলে -

" আর যে কত দিবাম কন্যা নাহি লেখাযোখা।
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙ্গা শাখা।"[৪]

শাঁখা হল সামুদ্রিক শঙ্খ থেকে তৈরি বলয়াকৃতি একপ্রকার অলংকার। সাধারণত হিন্দু বিবাহিত নারীদের হাতে এই অলংকার দেখা যায়। সিঁদুর নোয়া পলার সাথে সাথে দুই হাতে সাদা রঙের শাঁখা ব্যবহার করেন তারা। এটি মেয়েদের বিবাহের সময় তার পিতামাতা কন্যাদের দেয়। অনেক সময় বরও কিনে নিয়ে আসে । এই শাঁখা ব্যবহারের মধ্যে অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িয়ে আছে। হিন্দু বিবাহিত নারীরা স্বামীদের মঙ্গল কামনায় এটি ব্যবহার করে থাকে। স্বামীর মৃত্যু হলে এটি খুলে ফেলে বা ভেঙে দেয়। এই শাঁখা প্রসঙ্গ তুলে গীতিকার যেমন হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষদের আবেগকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তেমনি দেখতে পাই একসময় বেদের দল মহুয়া ও নদের চাঁদের সন্ধান পেয়ে গেলে হুমড়া বেদের নির্মম মানসিক অত্যাচারে মহুয়া নিজেকে শেষ করে দেয় এবং নদের চাঁদকে হত্যা করা হয়। এই দুটি নিথর দেহকে পালাকার কোন শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করেনি বরং তাদের কবর দেওয়ার কথা বলেছে-

" হুমরার আদেশে তারা কয়বর কাটীল ।
একসঙ্গে দুইজনে মাটী চাপা দিল।।"[৫]

কবর কেটে মাটি দেওয়ার রীতি ইসলাম ধর্মে বিদ্যমান। একে দাফন করা বলা হয়। ইসলাম ধর্ম ছাড়া ইহুদিরাও মৃতদেহকে মাটিতে দাফন করে থাকে। মৃতদেহকে দাফন করার কথা তুলে পালাকার ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের চেতনায় অনুরণন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।এভাবেই পালাকার তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে মহুয়া পালায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেছেন।

একইভাবে মলুয়া পালায় আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনেক নিদর্শনই খুঁজে পাই। মলুয়ার বিবাহের সময় হিন্দু ধর্মের খুঁটিনাটি বেশ কিছু রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়- যেমন, বিবাহের আগে মলুয়ার বাবা গনক ঠাকুরকে ডেকে পাঞ্জি-পুঁথি দেখে বিয়ের লগ্ন ঠিক করা। জয়াদি, জুকার, গান-বাজনা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। আজকের সমাজেও তা সমানভাবে বিদ্যমান। মলুয়ার চিমটি দিয়ে দুয়ারের মাটি তোলা, হলদি চাকি চাকি তৈল সিন্দুর এই সমস্ত রীতির ব্যবহার দেখা যায়। আবার মলুয়ার পালাতে 'নজর মরিচার' প্রসঙ্গ এসেছে। নজর মরেচা হল একটি বিশেষ ধরনের প্রথা। এটা হল কোন অমুসলমান পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিতে হলে সরকারকে অর্থ দিয়ে তার অনুমতি নিতে হত। সর্বোপরি, দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত পূর্ববঙ্গগীতিকায় মলুয়ার কবির উদ্ধৃতিতে সম্প্রদায় বিশেষের হিংসাত্মক মনোভাব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সম্প্রীতির অকাট্য নিদর্শন হিসাবে রয়ে গেছে পংক্তি গুলি -

" হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর দড়ি
কেহ বলে আল্লাহ কেহ বলে হরি।
বিছমিল্লা আর ছিড়িবিষ্টু একই গেয়ান
দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান।।"[৬]

মৈমনসিংহ-গীতিকার সব পালাগুলিতেই প্রায় উর্দু শব্দের ব্যাপক প্রভাব আমরা দেখতে পাই। বাংলা ভাষা এই সমস্ত শব্দগুলিকে এমন ভাবে আত্তীকরণ করে নিয়েছে যা নিজের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে মুসলমান শাসনের সুদূরপ্রসারী বিস্তার কালের জন্য। আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষা আমাদের চাষীর কুটিরে, এমনকি হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। বাংলার অভিধান থেকে এখন তা মুছে দেওয়া চলে না। গীতসাহিত্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সম্পদ। পালাকারগণ হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ ছিলেন।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা যেমন মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা পাই, ঠিক তেমনি বিপরীত দিক থেকে হিন্দু নায়ক ও মুসলমান নায়িকাও পায়। যেমন, নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত চন্দ্রাবতী পালায় আমরা দেখি, চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের রচয়িতা, দ্বিজ বংশী দাসের কন্যা। চন্দ্রাবতী বাবার শিব পূজার জন্য প্রতিদিন নির্জন পুকুর ধারে ফুল তুলত। একদিন জয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আস্তে আস্তে তাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। তারা মিলনের জন্য আকুল হয় এবং তাদের মিলনের কোন বাধাও

ছিল না। অবশেষে ঘটকের দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব আনা হয় এবং সেই মত চন্দ্রাবতীর পিতা বিবাহের সমস্ত রকম আয়োজন প্রায় শেষ করে ফেলেছেন, এমন সময় খবর পাই কাউকে না জানিয়ে জয়ানন্দ হঠাৎ এক মুসলমান সুন্দরীকে বিয়ে করেছে। এই অনাচার সম্পর্কে গীতিকার বললেন -

"অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার
যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার।।"[৭]

এছাড়াও মুসলমান কবি, কালিদাস গজদানী এবং মমিনা খাতুনের প্রেম অকুণ্ঠিত ভাবে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। একই সঙ্গে ঈশাখাঁ এবং কেদার রায়ের ভগিনীর প্রেমের চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। অপর একটি পালায় সুরৎজামাল ও ব্রাহ্মন রাজকন্যা অধুয়ার প্রেম প্রসঙ্গ আছে। আসলে এ সকল পালাগানের স্রোতা ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ। গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের তিলমাত্র অনুসরণ নেই।

অনেক পালাতেই দেওয়ান সাহেবের অত্যাচারের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু একে মুসলমানী অত্যাচার বলে অভিহিত করা যায় না। কেননা অত্যাচারিত মানুষ শুধু হিন্দু ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ছিল। এরা ছিল সাধারণ দুর্বল মানুষ। কাজেই এটা ছিল দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার-যেমন, আমরা মলুয়া পালাই দেখি দেওয়ান জাহাঙ্গীর মলুয়ার উপর নানা ভাবে অত্যাচার করে চলেছে। আবার অন্যদিকে শুধুমাত্র মলুয়ার কথাতেই কোন রূপ বিচার আচার না করে কাজীকে শুলে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন -

"হুকুম করিয়া দেওয়ান কোটালীরে বলে।
কাজীরে ধরিয়া শীঘ্র দেও নিয়া শুলে।।"[৮]

দেওয়ান ভাবনা পালায় দেওয়ান ভাবনা সুনাইকে দেখে পাগল হয়ে যায়। তাকে বিয়ে করতে চায়। আবার এই কাজে তাকে সাহায্য করেছে সুনাইর মাতুল ব্রাহ্মণ ভাটুক ঠাকুর। একদিকে যেমন অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা অপরদিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক হিন্দুকুল তিলক হিরনসাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার নির্মম মূর্তিও আমরা দেখতে পাই। অর্থাৎ, এসবই ছিল প্রবলের অত্যাচারে নিদর্শন। এখানে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নয়। ভেদ হল ক্ষমতার। মুসলমান রাজত্বে মুসলমানের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল। কাজেই মুসলমানের বাহুবল বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। বিপরীত দিকে হিন্দু রাজত্বে হিন্দুদের বাহুবল বেশি হওয়ায় স্বাভাবিক। কাজেই এই দোষ ক্ষমতার, কোন সম্প্রদায়ের নয়।

গীতিকাগুলির মধ্যে শুধু সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নয়, শব্দেরও সম্প্রীতি আমরা লক্ষ্য করি। যেমন, 'খাজনা' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তেমনি 'রাজস্ব' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে 'আসমান-আকাশ' 'জমিন-মৃত্তিকা' প্রভৃতি শব্দ একইসাথে ব্যবহৃত হয়েছে । এই সমস্ত বিদেশী শব্দগুলো বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করেছে।

আসলে মুসলমানী বাংলা বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতি বাংলা, এদের কোনটাই বাংলার স্বরূপ নয়, এগুলি বাংলা ভাষার বিদ্রুপ ও একান্ত অপরিহার্য।দেশের জলবায়ুতে ও আলোকে এরা পুষ্ট হয়েছে এবং বাঙালির নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে।

কাজেই দেখা যায় গীতিকার সর্বত্রই মানব জীবনের স্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে হিন্দু বা মুসলমান বলে পৃথক কোনো জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই কোন একটা বিশেষ ধর্মের দেববাদের প্রচারও এর লক্ষ নয়। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে একটি মাত্র জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল মানব জাতি। গীতিকাগুলিতে তাই চণ্ডীদাসের বাণীর যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়

" সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"[৯]

ভালোয়, মন্দয়, সুখে ও দুঃখে মেশানো বাংলার গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত বাস্তব চিত্র যেমন পাওয়া যায়। তেমনি ধর্মবর্ণনির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সম্প্রীতির একটা অসাধারণ নিদর্শন হিসাবে গীতিকাগুলি স্বতন্ত্র। হিন্দু-মুসলমানের ভাবনিরপেক্ষ যে সমাজনীতির স্বীকৃতি- তার মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব নীতিই জয়ী হয়েছে। নায়ক নায়িকার আত্মনিবেদনের মধ্যে উচ্চ-নীচ সমাজ শ্রেণিরূপের কোন পার্থক্য নেই। সমাজ-শাসন-নিরপেক্ষ ব্যাপক মানবধর্মের মধ্য দিয়েই নায়ক-নায়িকারা তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও প্রেম ব্যক্ত করেছে- "মৈমনসিংহ-গীতিকার নারী চরিত্রে যে আদর্শ ফুটিয়াছে তাহা যেন আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ব্যালাড রূপ বলিয়া মনে হয়। ... পবিত্র প্রেমের অপূর্ব লিপিচিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া পল্লীর নিরক্ষর কবিগণ পুঁথিপত্র, শাস্ত্র-সংহিতা ও মৌলবী পুরোহিতের পাঁতি লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকেই তাঁহারা রত্নদ্বীপের অচঞ্চল শিখার মতো মনে করিয়াছেন। এই প্রেমে প্রতারণা আছে, আঘাত আছে, বিরহের পীড়ন আছে- আর তাহার সঙ্গে আছে নারীর সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদন, প্রিয়তমের জন্য জাতিকুল খোয়াইবার অবিস্মরণীয় কাহিনী।"[১০]

তথ্যসূত্র :

১) সরকার, শ্রীজগদীশ নারায়ণ, মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু -মুসলমান সম্পর্ক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা-৩
২) সেন, রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, কলকাতা-৭০০০৪৮, প্রথম প্রকাশ -১৯১৮, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৫৮,পৃষ্ঠা -৩
৩) ঐ,পৃষ্ঠা-৩
৪) ঐ,পৃষ্ঠা-২৯
৫) ঐ,পৃষ্ঠা-৪১

৬) সেন, দীনেশচন্দ্র (সং),পূর্ববঙ্গগীতিকা, ১৯৩২, পৃষ্ঠা-৯৪
৭) ঐ,পৃষ্ঠা-১১৩
৮) ঐ, পৃষ্ঠা-৯০
৯) মজুমদার, বিমানবিহারী, চণ্ডীদাসের পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭, পরিশিষ্ট-৩, পৃষ্ঠা - ৩৫১
১০) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,তৃতীয় খন্ড দ্বিতীয় পর্ব (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৪৪৩

প্রাচ্য রসতত্ত্ব এবং সুধীরকুমার দাস গুপ্তের ‘কাব্যালোক’ গ্রন্থ

নীলকমল বাগুই
অতিথি শিক্ষক, জহরলাল নেহেরু রাজকীয় মহাবিদ্যালয়
পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল শত সহস্র বছর পূর্বেই । সাহিত্য প্রধানত শ্রুতি, দৃশ্য এবং লেখ্য এই কয়েকটি ভাবে শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়ে আসছে । সাহিত্য রচনায় একটি বিশেষ ফর্ম আছে; সেই ফর্মে কবি রচনা সৃষ্টি করে থাকেন। সাহিত্য কেন সৃষ্টি হল, সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই বা কী, সাহিত্য সমাজের জন্যকতটা হিতকর কিংবা অহিতকর—মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রয়োজনেই সাহিত্য রচিত। কবি-লেখক সাহিত্য সৃষ্টির একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে বহন করে রচনায় ব্রতী হন। বাস্তব সমাজ অর্থাৎ লৌকিক জগত এবং গভীর ভাবনায় কল্পনা মিশ্রিত শব্দ ও অর্থের প্রকাশে রচনা হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে সমাদৃত।ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহস্রাধিক বছরের মনস্বিতা এবং মনীষার প্রয়াসে সৃষ্টি হয়েছে প্রাচ্য কাব্যতত্ত্বের । কাব্যের সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে এবং ব্যাখ্যানে প্রবীণ ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণের সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত কাব্যতত্ত্ব বা অলঙ্কারশাস্ত্রে । এই গৌরবময়অলঙ্কারশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী স্বহৃদয় সামাজিক । রসতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ভরত মুনিকে কেন্দ্র করে যে রসতাত্ত্বিক ধারা গড়ে উঠেছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। রুদ্রট, ভট্ট লোল্লট, শঙ্কুক, নায়ক, অভিনবগুপ্ত প্রমুখেরা বিভিন্ন ‘বাদে’র প্রবক্তা সেই সম্পর্কে আলোচনার পরিসর রয়েছে। প্রবেশক। ভরতমুনির পরবর্তী সময়ে কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা।বাংলা ভাষায় লালমোহন ভট্টাচার্যের ‘কাব্য নির্ণয়’, অতুলচন্দ্র গুপ্তের ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ‘কাব্যবিচার’, সুধীরকুমার দাস গুপ্তের ‘কাব্যালোক’ প্রভৃতি গ্রন্থে অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সুধীরকুমার দাস গুপ্তের ‘কাব্যালোক’ গ্রন্থ বাংলা কাব্যতত্ত্বকে নতুন রূপ দান করেছেন। সেই বিষয়ে আলকপাত করা হবে।

সূচক শব্দ : রসতত্ত্ব,অপূর্ববস্ত-নির্মাণক্ষমা, সংবিদানন্দ, স্বহৃদয় সামাজিক,বাসনালোক।

মূলপ্রবন্ধ:

আচার্য ভরতমুনির ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থ ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব বিচারের প্রবেশক। ভরতমুনির পরবর্তী সময়ে কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র একটি ভাষায় চর্চার সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় অন্য ভাষায় এমন কি ইউরোপীয় ভাষাতেও চর্চা সুদূর প্রসারি হয়েছিল। বাংলা ভাষায় লালমোহন ভট্টাচার্যের ‘কাব্য নির্ণয়’, অতুলচন্দ্র গুপ্তের ‘কাব্যজিজ্ঞাসা’, সুরেন্দ্রনাথ

দাশগুপ্তের ‘কাব্যবিচার’, সুধীরকুমার দাস গুপ্তের ‘কাব্যালোক’ প্রভৃতি গ্রন্থে অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । সুধীর কুমার দাস গুপ্তের ‘কাব্যালোক’ গ্রন্থটি ১৯৪৭ সালে (বাংলায় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) প্রথম প্রকাশিত হয়। বাঙালি পাঠককে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা দিতে এই গ্রন্থের অবদান অতুলনীয়। প্রথম অধ্যায় দ্রুতি কাব্য ও দীপ্তি কাব্য ; দ্বিতীয় অধ্যায় রস ও ভাব, যথাক্রমে ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি, বস্তু ও বিভাব, এবং পঞ্চম অধ্যায় শব্দ ও অর্থ। ‘কাব্যালোক’ গ্রন্থে প্রাচ্য আলংকারিকগণের গ্রন্থ এবং প্রাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ কাব্যতাত্ত্বিকদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করে তাঁদের মতামত বিচার বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করেছেন লেখক। লেখক বাংলা কাব্যতত্ত্বকে নতুন রূপ দান করেছেন--- বাংলা সাহিত্য থেকে উদাহরণ নির্বাচনের দিকে লক্ষ রেখে। কাব্যালোক’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাসহ আলোচনা এবং এই অধ্যায়ে লেখকের মৌলিকত্বের দিকটি আলোচ্য বিষয়-- সেদিকে লক্ষ রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

ভরত পরবর্তী আলংকারিকগণ কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় ‘কাব্যের’ সংজ্ঞায় তাঁদের নিজস্ব অনুভূতি বাক্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেছেন । ‘কাব্যালোক’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ‘দ্রুতি কাব্য এবং দীপ্তি কাব্য’ । এই অধ্যায়ে প্রথম অংশের নাম ‘কাব্য-সংজ্ঞা’ । সংস্কৃত পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলতে চেয়েছেন, প্রাচ্য আলংকারিকরা ‘কাব্য’ সংজ্ঞায় তাঁদের নিজস্ব ভাবনার শব্দরূপ দিয়েছেন যা একে অন্যের থেকে ভিন্নরূপ—

> “আমার মনের সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে চিন্তা কয়েকটি মাত্র শব্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপরের মনের পরিবেশে সে চিন্তা কখনও সেই কয়টি শব্দ সার্থক ও সমগ্র রূপ লাভ করিতে পারে না।”[১]

কাব্যের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য লক্ষণা, ব্যঞ্জনা, অনুমান, ধ্বনি, কল্পনা, প্রভৃতি বিষয় স্মরণে রেখে লেখক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত পাঠকের কাছে ক্ষুদ্রাকারে কাব্যের সংজ্ঞা উপস্থাপন করে বিষয়ের গভীরে পৌঁছাতে চেয়েছেন । আমরা কাকে কাব্য বলব-- এই প্রশ্নের যে সংজ্ঞাগুলি লেখক দিয়েছিলেন তার মধ্যে দুইটি সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল—

> “১) কবি তাহার অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রতিভার বলে স্বহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের অন্তরে অলৌকিক আনন্দনিস্যন্দী অন্তর্জগৎ বা বহির্জগতের ব্যাপারময় যে শব্দার্থের সহযোগ সৃষ্টি করেন তাহার নাম কাব্য।
> ২)‘আনন্দময় বাক্যই কাব্য।”[২]

আলোচ্য লেখক কাব্যের যে সংজ্ঞাটি প্রথমে দিয়েছেন, শেষের উল্লেখিত সংজ্ঞাটি প্রথমটির সংক্ষিপ্তসার। বাক্যত্ব’ এবং ‘আনন্দময়ত্ব’ --- দুই প্রধান বিষয় শেষের উক্ত সংজ্ঞা পাওয়া যায়। চিন্তার পরিধি বিস্তারে নজরে আসে কাব্যের সৃষ্টিকর্তা কবি, কবির

সহচর কাব্য পাঠক বা শ্রোতা অথবা সহৃদয় সামাজিক সবই ঐ উপরোক্ত সংজ্ঞায় বর্তমান। লোকাত্তর আনন্দ প্রদান কাব্য পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য, তার সমাধান রম্যবোধ বা রসেই, কিংবা ধ্বনিতে; আলম্বন বিভাব হল অন্তবর্তীজগৎ অথবা বহিঃজগতের অপরূপ বস্তু এবং সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক কাব্যের পদার্থ শব্দার্থ --- এইগুলির সবই পরিলক্ষিত হয় উপরোক্ত অণু-সংজ্ঞাটির মধ্যেই। কাব্য সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রথম সংজ্ঞায় লেখক উপস্থাপন করেছেন।

প্রসঙ্গত, লেখক 'কাব্য' এবং 'সাহিত্য' যে একার্থক তা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণ' সমজাতীয় গ্রন্থের উদাহরণ। প্রাচীনকাল থেকে কাব্য বা সাহিত্য, নাট্য, কাব্য বা সাহিত্যের শিল্প ও রূপবিভেদ বলে প্রচলিত । কবির সৃষ্টি কর্ম যে বাঙময় তার নির্মাণকৃত ফলই কাব্য--- কবি সুনিপুণ কার্যদক্ষতা শব্দে পরিবর্তিত করে এই শিল্পকর্মটির নামাঙ্কন করেছেন 'কাব্য' । যে ক্ষমতায় কবি তা উৎপন্ন করেন সেটি হল 'প্রতিভা' । 'ধ্বন্যালোক'এর লোচনে আচার্য অভিনবগুপ্ত 'প্রতিভা'র লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন----

"প্রতিভা – অপূর্ব্ববস্তু নির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা, ভস্য
বিশেষো রসাবেশবৈশদ্য সৌন্দর্য্যং কাব্য নির্ম্মাণক্ষমত্বম।"[৩]

অর্থাৎ 'প্রতিভা হচ্ছে অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা, তার অন্যতম ভেদ হচ্ছে সৌন্দর্যময় কাব্য রচনার ক্ষমতা, সেই সৌন্দর্য্য রসাবেশের দ্বারা নির্মিত।'প্রাবন্ধিক জানান কবি বিস্ময়কর সহজাত সৃজনীক্ষমতা বলে বস্তুজগৎ থেকে শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম উদ্গত অক্ষিমান জগতের বাইরে এক চমৎকার জগৎ তৈরি করে, সেই কারণেই কবির কাব্যজগৎ অলৌকিক, অপূর্ব এবং অনির্বচনীয়। 'অগ্নিপুরাণ' এ বলা হয়েছে প্রজাপতি ব্রহ্মাই হল কাব্য সংসারে কবি, এই বিশ্ব সংসার তাঁর নির্দেশিত পথেই নিয়ন্ত্রিত হয়।এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধের কথা স্মরণে আসে---

"সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ নহে, তাহা রচয়িতার নহে
তাহা দৈববাণী।"[৪]

লেখকের অভিমতে, শ্রেষ্ঠ কবি কাব্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আনন্দময়ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সত্তার প্রতিষ্ঠা দেন । প্রাচ্য আলংকারিকগণ কাব্যকে দৈববাণী এবং দৈবসত্তাই কবিলিখনীক্ষমতা স্বরূপ মনে করেন, তাই কবিসত্তাকে রজস্তমোমুক্ত দৈব ব্যাপার বলেছেন । অনুশীলন, সৌকুমার্য এবং রুচিপূর্ণ কাব্য পাঠকের সুনিপুণ সাধনা যাঁর মধ্যে বর্তমান তিনিই সহৃদয়। লৌকিক সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সহৃদয় সেই কারণে তিনি সামাজিক। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের রচয়িতা আনন্দবর্ধন 'সহৃদয়' সম্পর্কে বলেছেন---

"কে চিদ্বানাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্ব মূচূস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ মন সহূদয়মনঃ প্রীতরে তৎস্বপম্ ।।'

অর্থাৎকেউ কেউ বলেছেন তার তত্ত্ব অনির্বচনীয় । তাই সহৃদয় ব্যক্তির মনঃপ্রীতর জন্য আমরা তার স্বরূপ বলছি।"[৫]

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'লোচন'কার অভিনবগুপ্ত সহৃদয় সম্পর্কে বলেছেন, কাব্য অনুশীলনের অভ্যাসবশে হৃদয় দর্পণ অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় যাঁরা বর্ণনায় বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা বা তন্ময়তা লাভ করতে পারেন তারাই সহৃদয় । সহৃদয়গণ নিজেদের মধ্যে কবির বাসনালোকের মিল অনুভব করেন কিংবা মিলনের জন্য অনুশীলন করেন। যেমন বলা যায়--

> "যে বিভাবাদি বিষয়ক অর্থ হৃদয়সংবাদী অর্থাৎ যা এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের মিলন ঘটাতে পারে তার ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা চর্ব্বনাই রসাভিব্যক্তি।"[৬]

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 'লোচনটীকা'কার আচার্য অভিনবগুপ্তকে অনুসরণ করে 'হৃদয় সংবাদ'- এর অর্থ নির্ধারণ করেছেন । প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব বিচারে তাঁর মতামত,গ্রিক সাহিত্যেও নাট্য ও কাব্য-বিচারে সহৃদয় সামাজিকের অবস্থান শীর্ষে।তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টটল, বুচার প্রমুখ কাব্যতাত্ত্বিকগণের মতামত উল্লেখ করে 'সহৃদয়'-এর বিশেষ গুণাবলী প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্য আলংকারিকগণের এবং সংস্কৃত পণ্ডিতগণের গ্রন্থ থেকে 'আনন্দদায়ক' বা 'আনন্দস্বভাব' অথবা 'আনন্দাত্মক' শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। 'ধ্বন্যালোক' এবং 'লোচন'টীকা অনুসরণ করে তিনি কাব্যের স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। 'লোকোত্তর বা অলৌকিক কাব্যই আনন্দময় । এই কাব্যানন্দকে অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'পরমব্রহ্মস্বাদসচিব' এবং বিশ্বনাথ কবিরাজমতে 'অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়' এবং 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।'

কাব্যের সংজ্ঞা বিচার প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রাচ্য আলংকারিকগণের কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থরাজির সহায়তায় বিচার বিশ্লেষণ করেছেন । প্রাচ্য আলংকারিকগণ কেবল 'আনন্দ' শব্দের সমার্থক শব্দ রূপে 'হ্লাদ, 'আহ্লাদা, 'নিবৃর্তি', 'চমৎকার' ও 'রস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। নিম্নে আলংকারিকগণের শব্দচয়ন পরিবেশিত হল---

ক) আনন্দবর্ধন--- আহ্লাদ, হৃদয়াহ্লাদ।

খ) অভিনবগুপ্ত--- সংবিদানন্দ।

গ) মম্মট ভট্ট--- নির্বৃতি, রস এবং আনন্দ।

ঘ) বিশ্বনাথ কবিরাজ--- রস।

ঙ) পন্ডিতরাজ-জগন্নাথ---রমনীয় লোকোত্তরাহ্লাদ।

'কাব্যালোক' গ্রন্থের লেখক রস এবং আনন্দকে দেখেছেন প্রাচ্য আলংকারিকগণের উদ্ধৃতাংশ উল্লেখ করে। লেখকের মতে, আনন্দ ভাবকে অবলম্বন না করেও অন্য অবলম্বনেও হতে পারে। ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক' গ্রন্থে বলা হয়েছে কাব্য থেকে যে অর্থের বোধ জাগরিত হয়, সেই আত্মজ্ঞাত আনন্দ স্বরূপই আস্বাদ্যঃ অর্থাৎ

রস । এখানে আনন্দ এবং রস একার্থক মনে হতে পারে। হেমচন্দ্রের 'কাবানুশাসন' গ্রন্থে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়---

> "আনন্দ সদ্য রসস্বাদ হইতে জাত উৎপন্ন হয়, তখন অন্য বেদ্য বিষয় থাকে না; তা ব্রহ্মাস্বাদের ন্যায় একপ্রকার প্রীতি-বিশেষ ।"[৭]

এই প্রসঙ্গে সুধীর কুমার দাশগুপ্ত বলেছেন----

> "বাস্তবিকই রস ও আনন্দ শব্দ দুইটি মৌলিক অর্থে এবং অর্থের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এক নহে । রস কেবলমাত্র ভাবাশ্রিত আনন্দ, কিন্তু ভাবাশ্রয় ছাড়াও রম্যার্থ ও অলংকার প্রভৃতির আশ্রয়ে আনন্দ প্রকাশ পাইতে পারে এবং প্রকাশ পাইয়া থাকে । রস সাধারণত emotional pleasure, আনন্দ emotional pleasure, intellectual pleasure বা অন্যবিধ pleasure-ও হইতে পারে ।"[৮]

আলোচ্য লেখক সুধীর কুমার দাশগুপ্ত পাশ্চাত্য সমালোচক, কবি, দার্শনিকগণ কাব্যানন্দ বা কাব্যের আনন্দ বলতে যে শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন, তা দেখিয়েছেন--- Delight, Exaltation, Passion, Joy এই শব্দগুলি ব্যবহার করতেন । 'কাব্যালোক' গ্রন্থে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রাচ্য আলংকারিকগণের মতামতের সঙ্গে প্রাশ্চাত্য আলংকারিকগণের মতবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাব্যানন্দ শব্দটির প্রায়োগিক রূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রস শব্দটি বোঝানোর জন্য আলোচ্য প্রাবন্ধিক 'তৈত্তিরীয়উপনিষদ'-এর ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন----

> "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'।

অর্থাৎ 'রসই তিনি কারণ রসকেই লাভ করে এই পুরুষ (জীব) আনন্দীভূত হন ।"[৯]

সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, 'যা রসিত হয় অর্থাৎ আস্বাদান যোগ্য তাই হল রস'।আচার্য ভরতমুনি রস সম্পর্কিত যে শ্লোকগুলি উল্লেখ করেছিলেন তা অবলম্বন করে পরবর্তী আলংকারিকগণ রসবাদের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা – বিশ্লেষণ করেছেন। 'ধ্বন্যালোক'-এর 'লোচনটীকা'য় অভিনব গুপ্ত স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন—কাব্য মাত্রই রস সমৃদ্ধ। তাঁর পরবর্তী সময়ে মম্মট 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' এই মতবাদ স্থাপন করলেন; কাব্যের প্রয়োজনে 'পরনির্বতি' শব্দের অর্থ বোধ নিরূপণে দেখালেন রসাস্বাদনই আনন্দ, অন্য কোনো আনন্দ নয়। মম্মটের মতে, ভাবকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে রস আস্বাদনই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' এই একই কথা বলেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথ তাঁর 'রসগঙ্গাধর'

গ্রন্থে বিশ্বনাথের মতের বিরুদ্ধালোচনা করেছেন। জগন্নাথ পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করে মন্তব্য করেছেন---

"রত্যাদি বিশিষ্ট ভগ্নাবরণ চিৎ স্বরূপই রস ।"[১০]

সুধীর কুমার দাশগুপ্ত প্রাচ্য আলংকারিক ও কবিগণ, পাশ্চাত্য সমালোচক এবং কবিগণের বিভিন্ন মতামত অনুসরণ করে বলেছেন ----

> "বাল্মীকি, বেদব্যাস অথবা শেক্সপিয়র বা মিল্টন কিংবা আমাদের মধুসূদন দত্ত অথবা রবীন্দ্রনাথের রচনায় এমন অনেক অংশ আছে যাহা প্রাচীনদের কথিত রসগুণে উজ্জল নহে; তাহাদের কাব্যত্বের কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে ।"[১১]

তিনি এই প্রাচ্য আলংকারিকগণের মত বিচার করে কাব্যের সংজ্ঞায় 'রস' শব্দ প্রয়োগ না করে 'আনন্দ' শব্দের ব্যবহার করেছেন। কারণ ---

প্রথমত, মানবহৃদয়স্থ **স্থায়িভাবই হল রসের একমাত্র আধার ।**

দ্বিতীয়ত, 'আনন্দ' স্থায়িভাব ছাড়াও অন্যভাব অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত বাক্-নির্মিতি স্বতোৎসারিত উক্তি, অর্থগৌরবসহ যে কোনো বিস্ময়কে অবলম্বন করে তা উদ্ভাসিত হয় ।

তৃতীয়ত, উপনিষদ এবং বেদান্ত অনুসরণ করে লেখক আনন্দ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। আত্মার শুদ্ধিকরণ স্বরূপ আনন্দ উপলব্ধির জন্য কাব্য প্রচেষ্টা ।

'রস'কে 'আনন্দ' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার নতুন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে প্রথম আলোচ্য লেখক প্রচলন করেছিলেন ।

পরবর্তী অংশে 'সমগ্র কাব্য ধারণা'য় দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্য বিচার করেছেন । ভারতীয় দর্শনে স্ব-স্বরূপই আত্মা। এই 'আত্মা' অনুরূপে 'আমি'র বাসনালোকের দ্বারা জগত ব্যাপিত হয় , ভারতীয় দর্শনে তাকে ত্রিবিধ গুণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে---

"ক) সত্ত্বগুণ (ধর্ম প্রখ্যা বা প্রকাশীলতা)

খ) রজোগুণ (প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া বা পরিবর্তনশীলতা)

গ) তমোগুণ (স্থিতি বা জাড্য অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়া ধর্মের বোধন শীলতা)"[১২]

সত্ত্বগুণময় চিত্ত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ--- প্রকাশ ও আনন্দই মুখ্য।ইউরোপীয় দর্শন অনুসারে 'cognition' ও 'feeling' হচ্ছে এই সত্ত্বগুণের ধর্ম । 'Willing' রজোগুণাশ্রিত। হৃদয় সত্ত্ব ও রজঃ এই উভয় গুণের বিপরীত ধর্ম যুক্ত হল তমোগুণ । আনন্দ প্রকাশ রূপ হচ্ছে সত্ত্বগুণাশ্রিত। আনন্দই কাব্যের উদ্দেশ্য তার সাধন হৃদয়গত

ভাব ও অর্থের উপাদান স্বরূপ শব্দার্থ। বাক্যের ধর্ম প্রকাশশীলতা তাই সত্ত্বগুণ আশ্রয়ই হৃদয় থেকে আমরা সমগ্র আলোচনায় অগ্রসর হব।

আলোচ্য গ্রন্থের নামাঙ্কিত অধ্যায় ‘দ্যুতি কাব্য ও দীপ্তি কাব্য’ এই বিশ্লেষণে সুধীরকুমার দাশগুপ্তের গবেষণাকৃত ফল প্রকাশিত হয়েছে । সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ‘হৃদয়বৃত্তি’ ও ‘বুদ্ধিবৃত্তি’ প্রসঙ্গে চিত্তের দুটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন । ১) দ্রুতি গুণ ২) দীপ্তি গুণ। “দ্রুতি গুণের কারণে ভাব বাসনালোকে দ্রাবিত করা হলে তাকে বলা হয় দ্রুতি কাব্য। দীপ্তি গুণের কারণে অর্থের মন্থনের বাসনালোককে দীপ্তিময় করে, তাকে বলে দীপ্তি কাব্য ।”[১৩] এই দুই কাব্য সম্পর্কে লেখক এর অভিমত----

> “দ্রুতিময় কাব্য দেয় চিত্তে আস্বাদন, অবলম্বন তার
> হৃদয়গত ভাব; দীপ্তিময় কাব্য দেয় চিত্তে রম্যবোধ,
> অবলম্বন তার বুদ্ধিগত রম্যার্থ।”[১৪]

দ্রুতি কাব্য কে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—ভাবোক্তি, স্বভাবোক্তি ও রসোক্তি। দীপ্তি কাব্য কে দুই ভাগে--- গৌরবোক্তি ও বক্রোক্তি । শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় করে ভাব যদি রসের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে তাকে রসকাব্য অথবা ‘রসোক্তি’ বলা হবে।সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতানুসারে তা শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ি কাব্য। যে কাব্যে চিত্তের স্থায়িভাবকে আশ্রয় করে আনন্দের প্রকাশ শৈলী প্রাপ্তি ঘটে সেটি রস প্রধান কাব্য, তাকে রসাত্মক বাক্য কিংবা রসোজ্জলা উক্তি বা রসোক্তি বলে। স্থায়িভাব অনুসারে সৃষ্টি হয় বলে তা স্থায়ি কাব্য এবং সর্বকালীন সর্বজন স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ বাক্য অর্থাৎ কাব্য । যেখানে শব্দ এবং অর্থকে আশ্রয় করে ভাবই প্রধান হয়েছে, কিন্তু সেখানে রসে উত্তীর্ণ হয়নি; ভাবই প্রধান তাই তাকে বলা হয় ভাবকাব্য কিংবা ‘ভাবোক্তি’ ।[১৫]বস্তুর নিজস্ব অভ্যাসবশে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়, সেখানে পাঠার্থীর ‘প্রীতি-সন্তুষ্ট-হৃদয় দ্রাবিত হয়ে ভাব ধর্মের প্রকাশ ঘটে; যাকে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তার 'কাব্যালোক' গ্রন্থে নাম দিয়েছেন ‘স্বভাবোক্তি’।’প্রাচীন কাব্যতাত্ত্বিকগণের গ্রন্থ অবলম্বন করে লেখক দ্রুতি কাব্যও দীপ্তি কাব্যের ভাগ গুলি আলোচনা করেছেন।

বিষয়ের গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যা চিত্তকে নিরুৎসাহিত করে তোলে; সেদিকে দৃষ্টি রেখে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত দ্রুতি ও দীপ্তি কাব্যের ভাগগুলিকে পাঠক চিত্তে উজ্জল করার জন্য প্রত্যেকটি ভাগের উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা এবং বর্ণনা করেছেন।সুধীরকুমার দাশগুপ্ত পূর্বাচার্যগণের অভিমতগুলো সমুচিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাঁর নিজস্ব মত নতুন ভাবে সংযোজিত করেছেন। ভাবগম্ভীর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাই কেবলমাত্র নয়, তিনি যথোপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে পাঠকের কাছে দ্রুতি কাব্য এবং দীপ্তি কাব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। রসোক্তির সঙ্গে অন্যান্য কাব্যের মিশ্রণে তিনি উদাহরণ প্রয়োগের দেখিয়েছেন।

ঋষি কবি-কর্মে রসোক্তি এবং বক্রোক্তি পরিলক্ষিত হয় , এই ক্ষেত্রে রসই মুখ্য হয়, অন্যান্য উপাদান রসকে পরিপূর্ণ করে । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর পঞ্চম স্বর্গে প্রমিলাকে নিদ্রাভঙ্গ করতে এসে মেঘনাথ বলেছেন---

"ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি,রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল; মিল, প্রিয়ে, কমল লোচন
উঠ, চিরানন্দ মোর; সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ,কান্তে, তুমি রবিচ্ছবি;----
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন;
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার; নয়ন-তারা; মহার্হ রতন;
উঠি দেখ,শশিমুখি,কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মন্জু কুন্জবনে
কুসুম ;"[১৬]

উক্ত কবিতাংশ মধ্যে রসোক্তি এবং বক্রোক্তি দুইটি আছে। অলংকারের প্রয়োগ এবং ভাষাকৌশল বিশেষে তা বক্রোক্তি। এখানে অতিশয় পুষ্ট এবং উজ্জ্বল করেছে কাব্যের আত্মা, শৃঙ্গার-সম্ভোগ রস অনুভূত হয় । স্থায়িভাব হল রতি তাই রসোক্তি হয়ে উঠেছে ।

রসোক্তি ও গৌরবোক্তি শ্রেষ্ঠ কবিগণের শিল্প সৃষ্টিতেই পরিলক্ষিত হয় । রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ---

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে
মিলন মধুর লাজে ।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে
আজি সেই চির-দিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে ।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি।
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি

সকল কালের সকল কবির গীতি ।”[১৭]

উক্ত কবিতাংশে অর্থগৌরব পরিলক্ষিত । জোড়া প্রেমের যে আদি-অন্ত প্রবাহমানতা যা অনেক রূপে দেখা হলেও তার মূল ‘প্রেম ভাব’ । এই কাব্যের অর্থ দার্শনিকতা থেকে মুক্ত হয়ে কাব্য রসে পরিণত হয়েছে । রতি ভাবে শৃঙ্গার রস প্রকাশিত । ‘নাট্যশাস্ত্রের’ ভাষ্যে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ‘মিলন ও বিরহ একই রতি , পরস্পরের চেতনা, পরস্পরের ঐক্য জ্ঞান, ইহার আর বিচ্ছেদ নেই ।’দ্রুতি কাব্যের মধ্যে ভাবোক্তি কাব্যেও আছে---- রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘কৃষ্ণকলি’ কবিতাটি বিশ্লেষণ করা হল---

“কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলাদিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিলনা তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের ‘পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।
ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ।”[১৮]

কবি কৃষ্ণকলিকে দেখেছিলেন, কৃষ্ণকলিও কবিকে দেখার সময় ‘কালো হরিণ চোখ’ কবির ভাবলোকে স্মৃত হয়েছিল । তাই বর্ণনায় কখনো ‘জ্যৈষ্ঠের কাজল মেঘে’, ‘আষাঢ়ের তমাল-বনে’ কিংবা ‘শ্রাবণ রাতে’ কবির চিত্ত উদ্ভাসিত হয়েছে । এই কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়নি, ভাবলোকেই থেকে গেছে । তবে রস অপেক্ষা সৌন্দর্য মাধুর্যতা হৃদয়ে তাঁর আস্বাদ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সুধীর কুমার দাশগুপ্ত দ্রুতি কাব্য এবং দীপ্তি কাব্যের ভাগগুলি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

নৈসর্গিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কাব্যের বিষয় করে বিহারীলাল স্বভাবোক্তির প্রয়োগ করেছেন। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্য হিমালয়কে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা সত্যই নিপুণ নৈসর্গ চেতনার ফলস্বরূপ। বিহারীলালের এই কবিতাটি পাঠ করে আমরা স্বভাবোক্তির রস নিষ্পত্তি ঘটানোর প্রয়াস করা যেতে পারে---

"কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতারে!
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে।
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার। (১২)
তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়;
কেমন পাকম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায়!(১৩)
জলঝরা ঝরঝর,
সমীরণ সরসর,
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারি দিকে;—
চমকি আকাশময়
ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিখে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে;
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার। (২৪)
আবরিয়ে কলেবর
ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন!
যেন ভৈরবের গায়
আহ্লাদে উথুলে ধায়
ফণা তুলে চুল্‌বুলে ফণী অগণন।"[১৯]

'সারদামঙ্গল' কাব্য গ্রন্থের চতুর্থ সর্গের ১২,১৩,২৪,২৫স্তবক পাঠ করলেই পাঠকের বাসনালোকে নৈসর্গিক স্বভাবোক্তির উন্মেষ লক্ষিত হয়। তার জন্য পাঠকের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর প্রয়োজন পড়ে না হৃদয় চক্ষুর সাহায্যে অভিনব এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করে হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয় । এই বাস্তব বর্ণনা বৈচিত্রের আলোকে

লৌকিক জগত থেকে উত্তীর্ণ হয় লোকোত্তর আনন্দে সেখানেই নৈসর্গিক লেখক বিহারীলালের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থের ‘নববর্ষ’ কবিতাটি স্বহৃদয় পাঠকের কাছে স্বভাবোক্তি হয়ে উঠেছে। স্বভাব কাব্যের ভাব এবং তা থেকে জাত যে রস তা উল্লাসিত হয়। কবির হৃদয়গত ভাবের সাথে একাকীত্ব হয় পাঠকের হৃদয়। এই কবিতাটি উদাহরণ হিসেবে প্রয়োগ করে আমরা দেখাতে পারি রবি-কাব্যও স্বভাব কাব্যে উন্নীত হতে পারে---

“হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে॥
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক-- কবরী খসিয়া খুলিছে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে, কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে--
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লির কাছে রে ।।”[২০]

কবিতাটিতে স্বভাবজাত যে বর্ণনীয়ভবন প্রাপ্ত হয়ে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয় একাকার হয়ে গেছে তা শ্রেষ্ঠ কবির অনুশীলন প্রতিভা প্রজ্ঞার ফলে।বিহারীলালের বর্ণনায় হিমালয়ের যে রূপ বৈচিত্র্য তা শুধুমাত্র বাইরের আভরণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে কবির বাসনালোকে বর্ষার যে চিত্র তা ভাব উল্লাসে পরিণত হয়েছে।
সুধীর কুমার দাশ গুপ্তের গ্রন্থ অবলম্বন করে দীপ্তি কাব্যকে তিনি দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ‘গৌরবোক্তি’ এবং ‘বক্রোক্তি’। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থের ৩৬ নম্বর কবিতাটির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন গৌরবোক্তি---

“শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে

চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।"[২১]

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো শ্রেষ্ঠ কবিতার উদাহরণ। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সবকটাই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা নয় এখানে অর্থ গৌরব রম্যবোধের প্রাধান্য অনেক বেশি। ঋষি কবিদের অহরহ অনুশীলন ক্ষমতাবলে আসে অর্থ গৌরব। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির মধ্যে রস কাব্যের বৈশিষ্ট্য না পাওয়া গেলেও তা গৌরব কাব্যে পরিণত হয়েছে।লেখক সুধীর কুমার দাশগুপ্ত কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ অবলম্বন করে উদাহরণের সাহায্যে দীপ্তি কাব্য এবং দুটি কাব্যের উদাহরণ গুলি পাঠকের সামনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

বক্রোক্তি কাব্যের উদাহরণ প্রয়োগের দ্বারা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'সমৃদ্ধ হয়েছে। সুধীর কুমার দাশগুপ্ত যে অংশটি উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন নিম্নে তা আলোচনা করা হল---

"চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায় ।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ।।
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্ররে দেখিলে ।
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে ।।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল ।
কৃষ্ণচন্দ্র-হৃদে কালি সর্বদা উজ্জল ।।
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয় ।
কৃষ্ণচন্দ্র দুইপক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ।।"[২২]

ভারতচন্দ্র এই রচনাটিকে ব্যতিরেক এবং যমক অলংকারসহ বক্রোক্তি কাব্যের উদাহরণ দিয়ে সৌন্দর্যবর্ধক করেছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্র বিচারে পাঠক মনে রসের উন্মোচন হয় না, কিন্তু অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হবার প্রয়োজন । ভাবগম্ভীর বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ পাঠে এবং সংস্কৃতের অর্থ প্রাচুর্যের সঙ্গে মননশীল না হয়ে উঠতে পারার জন্য বাঙালি পাঠক অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায় । সেই দিকটি নজরে রেখে 'কাব্যালোক' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লেখক সুধীর কুমার দাশগুপ্ত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ প্রয়োগ করে পাঠকের চিত্ত ভাবসিক্ত করে রসোত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন । যা লেখকের মৌলিকত্বের দিক নির্দেশ করে সাহিত্যের আঙিনায় ।

তথ্যসুত্র :

১ । দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার, কাব্যালোক, দে'জ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৮, পৃষ্ঠা- ১

২ । তদেব, পৃষ্ঠা – ১

৩ । আনন্দবর্ধন, ধবন্যালোকঃ (সম্পাদক: সেনগুপ্ত, শ্রীসুবোধচন্দ্র ও কালীপদ ভট্টাচার্য), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ২৯

৪ । দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার, কাব্যালোক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ২

৫ । আনন্দবর্ধন, ধবন্যালোকঃ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ৩

৬ । দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার, কাব্যালোক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩

৭ । তদেব, পৃষ্ঠা – ১০
সদ্যো রসাস্বাদজন্মা নিরস্ত- বেদান্তরা ব্রহ্মাস্বাদসদৃশী
প্রীতিরানন্দঃকাব্যানুশীলন, ১/৩

৮ । তদেব, পৃষ্ঠা – ১০

৯ । তদেব, পৃষ্ঠা – ১১

১০ । ঘোষ, বিদ্যুৎ বরণ, রসগঙ্গাধর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭

১১ । দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার, কাব্যালোক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা – ১৫

১২ । তদেব, পৃষ্ঠা – ১৬

১৩ । তদেব, পৃষ্ঠা – ১৮

১৪ । তদেব, পৃষ্ঠা –২২

১৫ । তদেব, পৃষ্ঠা – ২২

১৬। https://bn.m.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%AE_%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97

১৭ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনন্ত প্রেম
https://www.tagoreweb.in/Verses/manasi-6/ononto-prem-51
date- 17/02/2020 time - 2pm

১৮ । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, https://www.tagoreweb.in/Songs/bichitra-237/krishnakoli-ami-tarei-boli-5867 date- 10/10/2020 time- 5.05pm

১৯ । তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬-৩৭

২০। তদেব , পৃষ্ঠা- ৬৯

২১। তদেব , পৃষ্ঠা- ৭৬

২২। তদেব , পৃষ্ঠা- ৭৬-৭৭

স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার দুই বিপ্লবী সংগঠন

জয়িতা সিংহ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য লর্ড কার্জন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেন। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বললেও তার আসল উদ্দেশ্য ছিলো বাংলার জনশক্তিকে দুর্বল করা। সেইমতো তিনি ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। তারফলে সমগ্র বাংলা জুড়ে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বদেশী বয়কট আন্দোলন পুরোপুরি সফল না হওয়ায় আবেগ প্রবন বাঙালীর অতৃপ্ত দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদ নতুন পথ ও পদ্ধতির অনুসন্ধান করতে থাকে। শেষপর্যন্ত বাংলায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতি বিশেষত অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলায় বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিলো এক অর্থাৎ মাতৃভূমির শৃঙ্খলমচন। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা দেশের মুক্তির জন্য তাঁদের নিজেদের জীবনের সর্বস্ব মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গ করেন।
সূচকশব্দ : ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বিপ্লবী সমিতি।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলা জুড়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে বাংলার সমগ্র জনগণ বিশেষত কৃষক, শ্রমিক বাংলার ছাত্রসমাজ এমনকি নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। বাঙালীরা বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেন, বাংলার ছাত্রসমাজ পিকেটিং এ অংশ নেয়। এছাড়াও ধর্মঘট, অনশন, প্রভৃতির মাধ্যমে বিরোধিতা করতে থাকে। এই আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়কে জড়িয়ে নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে সুমিত সরকার চারটি ধারাকে চিহ্নিত করেছেন যথা নরমপন্থী ধারা, গঠনমূলক স্বদেশী, রাজনৈতিক চরমপন্থা এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ।[১] বাংলার যুবশক্তি এই বিপ্লবী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। তবে তাঁদের মধ্যে বিপ্লবের পন্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ছিলো। একটি গোষ্ঠী মনে করতেন যে যুবকদের কঠোর শৃঙ্খলা ও আদর্শবাদের দ্বারা তৈরী করে, তাঁদের দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের হত্যা করে ব্রিটিশ শাসন ব্যাবস্থার মনোবল ভেঙে ফেলা। অপর একটি গোষ্ঠী বিশ্বাস করতেন যে ভাবেই হোক অস্ত্র সংগ্রহ করে সম্মুক সংগ্রামে ইংরেজ পুলিশ ও সেনাদলকে দু-চারটে খন্ড যুদ্ধে পরাস্ত করলে

ব্রিটিশ সরকার অচল হয়ে পড়বে। তৃতীয় গোষ্ঠীর মতছিল বিদেশ থেকে অস্ত্র সাহায্য লাভ করে এবং বিপ্লবীদের কঠোর শৃঙ্খলার ও সমরিক নিয়মে আবদ্ধ করে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হবে। ভারতীয় সেনাদলকে প্রচারের স্বপক্ষে আনার কথাও তাঁরা ভাবেন। বিপ্লবীদের মধ্যে সকলেই বাস্তব বুদ্ধির লোক ছিলেন এমন নই, অনেকে ছিলেন ভয়ানক রোমান্টিক এবং তারাও আত্মবিসর্জনএ পিছু ছিলেন না। আবার তাঁদের মধ্যে সকলেই যে সাহসী ও দৃঢ় চিত্ত ছিলেন এমন নয়, বেশিরভাগ বিপ্লবী লোহার মতো কঠিন হৃদয় হলেও কেউ কেউ পুলিশী নির্যাতনের মুখে আত্মসমর্পন করে গোপন তথ্য বলে ফেলতো। তবে একথা ঠিক যে বিপ্লবীরা নিজেদের নিরপত্তা ও স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন এবং মাতৃভূমি কে রক্ষা করার জন্য সর্বত ভাবে প্রস্তুত ছিলেন।[২]

বাংলাতে ১৮৬০-১৮৭০এর মধ্যের দশক গুলি থেকে জঙ্গি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। শরীরচর্চা, জাতীয় সাংকৃতিক কাজকর্ম অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় আখড়া বা ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় পেশীশক্তি এবং ইস্পাত দৃঢ় স্নায়ু বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে। অন্যদিক উপনিবেশিক শাসক কুলের ধারণা ছিলো বাঙালীরা দুর্বল কাপুরুষ তাঁদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। বাঙালিদের ওপর থেকে এইজাতীয় তকমা সরিয়ে ফেলার জন্যই দৈহিক শক্তি বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়।এটি ছিলো সেই অর্থে একটি মনোস্তাত্বিক আন্দোলন। বাঙালীদের পুরুষত্বের প্রতীকী পুনরুদ্ধার এবং পরাক্রমশালী বীরের সন্মান ছিলো তাঁদের বৃহত্তর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এর অঙ্গ। এছাড়াও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ প্রচারিত আদর্শের ওপর ভিত্তি করে দৈহিক বলিষ্ঠটা অর্জন, জাতীয় গর্বের অনুভূতির বিকাশ সাধন এবং সমাজ সেবার সংকল্প জাগানো।[৩]

বাংলায় প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু হয় ১৯০২খ্রী: থেকে। এই সময় বাংলায় চারটে দল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনটে কলকাতায় ও একটি মেদিনীপুরে। প্রথম মেদিনীপুর সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২সালে, হেমচন্দ্র কানুনগো ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এই সমিতি প্রতিষ্টা করেন। এরপর সরলা ঘোষাল কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটি ব্যায়ামগার প্রতিষ্টা করেন। যদিও এর আগে বাংলায় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি, যেমন জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মিলে ১৮৬৭সালে গড়ে তোলেন সঞ্জীবনী সভা। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ১৮৯৭সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আত্মন্নতি সমিতি। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ব্যারিস্টার প্রমোথনাথ মিত্র ও সতীশ চন্দ্র বসু নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি।১৯০৫সাল পর্যন্ত বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন মোটামুটি ভাবে চলতে থাকে। তবে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বিপ্লবীদের আন্দোলন এ জোয়ার আসে। এই সময় ১৯০৬সালে পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বারিন্দ্র কুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের নেতৃত্বে যুগান্তর দল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

ভারতের ইতিহাসে বাংলাকে বিপ্লববাদের প্রাণ কেন্দ্র বলা হয়। ইতালির কার্বোনারি প্রভৃতি গুপ্ত সমিতির মতোই বাংলায় গড়ে ওঠে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল। সতীশ চন্দ্র বসু জেনারাল এসেম্বলি ইনস্টিটিউশন এর ব্যায়ামগারে কাশীনাথ সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি পরিচালনার সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মদন মিত্র লেনে ১৯০২সালে অনুশীলন সমিতি গঠন করেন। এই সময় সতীশ চন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথ মিত্রের যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সভাপতি হন। এই সমিতির সদস্যরা লাঠিখেলা ও দেহচর্চা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে এই নাম গ্রহণ করা হয়। এই সমিতিতে কিশোর বয়স্ক সদস্যদের ব্যায়াম ও নিয়ম শৃঙ্খলার শিক্ষা দেওয়া হতো।[৫] ইতিমধ্যে অরবিন্দ এর নির্দেশে বারোদা থেকে যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বাংলায় আসেন। পরে বারিন্দ্র কুমার ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ ও এই সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন প্রথম দিকে অনুশীলন সমিতি কোনো বৈপ্লবিক কাজকর্মের সঙ্গে লিপ্ত ছিলো না। তবে পরবর্তী কালে বঙ্গভঙ্গ, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় প্রভৃতি ঘটনা যেন সমিতির কার্যকলাপ এ এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করলো। কলকাতা ও সান্নিহিত অঞ্চলগুলিতে যেমন দর্জিপাড়া পটলডাঙ্গা খিদিরপুর হাওড়া শিবপুর ইত্যাদি অঞ্চল এ অনুশীলন সমিতির কার্যালয় স্থাপিত হয়। তবে পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতি ছিলো সবচেয়ে প্রভাবশালী। এই সমিতির প্রায় ৫৮০টি শাখা কার্যালয় ছিলো। এই সমিতির সাথে যুক্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিরা হলেন মাখন লাল ঘোষ ও নলিনীকান্ত ঘোষ। ঢাকার অনুশীলন সমিতি শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। বস্তুত ১৯০৫-১৯০৬সালের পর থেকে গুপ্ত সমিতিগুলির প্রভাব এতো বৃদ্ধি পায় যে,১৯০৬সালের ডিসেম্বর এ বাংলাদেশের বিপ্লবীরা এক মহা সম্মেলন এ সমবেতো হন। এই সভার সভাপতি ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র। ময়মনসিং, ঢাকা, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নদিয়া, যাশোহর, বর্ধমান, ও মেদিনীপুর থেকে বিভিন্ন সদস্যরা এই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন।[৬]

পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতির মধ্যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দেয়। যেমন চিত্তরঞ্জন দাস নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আদর্শে আস্থাশীল ছিলেন। স্বয়ং প্রমথনাথ মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসু শরীরচর্চা ও জন-কল্যাণ মূলক কাজকর্মে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন। অন্যদিকে দেখা যায় বিপ্লবী বারিন্দ্র কুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা 'no compromise ','রাজাকে', সোনার বাংলা প্রভৃতি ইস্তেহারের মাধ্যমে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেন।[৭] যাইহোক বারিন্দ্র কুমার ঘোষের উদ্যোগে ১৯০৫সালে ভবানী মন্দির নামে একটি বৈপ্লবিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নির্জন স্থানে একটি ধর্মীয় কেন্দ্র স্থাপন করে বিপ্লবী আন্দোলন প্রচারের কথা বলা হয়। বারিন্দ্র কুমার ঘোষের প্রচেষ্টায় ১৯০৬সালে

যুগান্তর নামে বিপ্লবীদের একটি মুখপাত্র প্রকাশিত হয়। যুগান্তর পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিলো সাত হাজার। ১৯০৮সালে সরকারি আদেশে এই পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। যুগান্তর পত্রিকায় প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃনা প্রচার করে। 'মুক্তি কোন পথে ' নামক বইয়ের দ্বারা বারিন্দ্র গোষ্ঠী ভারতীয় সৈনিক দের মধ্যে বিপ্লবী ভাব ধারা প্রচার এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহএর পরামর্শ দেয়। বিপ্লবী যুবকদের বিদেশে পাঠিয়ে অস্ত্র নির্মাণের কৌশল শিক্ষার কথাও বলা হয়। যুগান্তর পত্রিকার নাম অনুসারে বারিন্দ্র গোষ্ঠী যুগান্তর গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়।[৮] বারিন্দ্র কুমার, হেমচন্দ্র, প্রফুল্লচাকি পূর্ব বাংলা ও আসামের লেফ্টনেন্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন। তবে তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয়। বারিন্দ্র কুমার কলকাতার মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে একটি বোমা তৈরী কারখানা স্থাপন করেন। আর এই বোমা তৈরী করার দায়িত্বে ছিলো প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র উল্লাসকর দত্ত। এই সময়ে হেমচন্দ্র কানুনগো ইউরোপে যান এবং প্যারিসে জনৈক দেশত্যাগী রুশের কাছে বোমা তৈরির ফর্মুলা শিক্ষালাভ করেন। ইতিমধ্যে যুগান্তর গোষ্ঠী অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সরকার এই ষড়যন্ত্র এর কথা বুঝতে পেরে তাকে বিহারের মজফরপুরে বদলি করেন। বারিন্দ্রের নির্দেশে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকি তাঁকে হত্যা করার জন্য মজ:ফরপুর যান। কিন্তু তাঁরা ভুলবশত মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যাকে হত্যা করেন। প্রফুল্লচাকি আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন। বিচারে তাঁকে ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁদের এই আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাস এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[৯]

এই ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ মুরারীপুকুর বাগান বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বহু বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা, কার্তুজ, গুলি ইত্যাদি উদ্ধার করে। এবং অরবিন্দ, বারিন্দ্র, উল্লাসকর, হেমচন্দ্র সহ ৩৪জন বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে আলিপুর বোমা মামলা শুরু করেন।[১০] বিচার চলাকালীন নরেন্দ্রনাথ গোসাই নামে জনৈক দুর্বলচিত্ত বিপ্লবী রাজসাক্ষী হয়ে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জেলের মধ্যে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু তাঁকে হত্যা করেন। ফলে উভয়ের ফাঁসি হয়। যাইহোক ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাসের আইনি দক্ষতায় শেষপর্যন্ত অরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেও বারিন্দ্র কুমার, উল্লাসকর সহ অনেকের আন্দামান জেলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। মুক্তির পর অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি ছেড়ে পন্ডিচেরি চলে যান। এই ঘটনার পর বিপ্লবী আন্দোলন কিছুটা স্থিমিত হয়ে পরে।[১১]
স্বদেশী আন্দোলন বিশেষতঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে সরকার বিভিন্ন দমন নীতি গ্রহণ করেন যেমন পত্র পত্রিকা কণ্ঠরোধ করেন। বিপ্লবী সমিতিগুলিকে বেয়াইনি ঘোষণা করেন ও বিভিন্ন নেতাদের নির্বাসিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যখন কলকাতার বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন ঢাকায় পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমিতির

সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃতলাল হাজরা প্রমুখ। এই সমস্ত বিপ্লবীদের দ্বারা কয়েকটি দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে নরিয়া, রাজেন্দ্রপুর, মোহনপুর, রাজনগর প্রভৃতি স্থানে।[১২] যাইহোক বাংলার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কে সামাল দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের আধিপতি পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ১৯১১সালে ভারতে আসেন এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন ও বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯০৯সালের মরলেমিন্ট আইন, ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ প্রভৃতি ঘটনা নরমপন্থী নেতাদের খুশি করে। আবার আবেদন নিবেদন নীতি ফিরে আসে এবং বাংলায় বিপ্লবী সমিতি গুলির বৈপ্লবিক কার্যকলাপ কিছুটা হলেও কমে আসে। তবে পরবর্তীকালে বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলন কে লক্ষ্য করে তারা পুনরায় জেগে ওঠে এবং নতুন উদ্যোমে তাঁদের সন্ত্রাসবাদ কে এগিয়ে নিয়ে চলে।[১৩]

যাইহোক আমরা শেষে এইটুকু বলতে পারি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যা চেয়েছিলেন তা হল অত্যাচারী সারকারী কর্মচারীদের, গুপ্তচর দের বা বিস্বাসঘাতক দের হত্যা করে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে। তাঁরা চেয়েছিলেন স্বদেশী ডাকাতি করে অর্থভান্ডার গড়ে তুলে স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই অর্থ ব্যায় করতে। এমনকি বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়েছেন। চক্রান্ত ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। গণ অভূত্থানের কোনো পরিকল্পনা তাঁদের ছিলো না। এই কারণেই অধ্যাপক সরকার 'সন্ত্রাসবাদ ' কথাটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন, যা অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এই বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ কথাটি মেনে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. সুমিত সরকার - আধুনিক ভারত, ২০১৪, পুনর্মুদ্রণ, পৃ:- ৯৬-৯৭
২. অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাহাত - ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, শ্রীধর প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট – ২০০৭, পৃ:-১৫২
৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় -পলাশী থেকে পার্টিশান ও তারপর, পুনর্মুদ্রণ, ২০২২, পৃ:-৩১১
৪. তদেব পৃ:-৩১২
৫. অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাহাত - ভারত ইতিহাস পরিক্রমা পৃ:-১৫২
৬. সমর কুমার মল্লিক – আধুনিক ভারতের রূপান্তর (১৮৫৭-১৯৪৭), বিংশ প্রকাশ মে ২০২২-২০২৩, পৃ:-৩৯২-৩৯৩
৭. তদেব পৃ:- ৩৯৩
৮. অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাহাত – ভারত ইতিহাস পরিক্রমা পৃ:-১৫৩
৯. সমর কুমার মল্লিক – আধুনিক ভারতের রূপান্তর(১৮৫৭-১৯৪৭) পৃ:-৩৯৪
১০. অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাহাত – ভারত ইতিহাস পরিক্রমা পৃ:-১৫৩
১১. সমর কুমার মল্লিক – আধুনিক ভারতের রূপান্তর(১৮৫৭-১৯৪৭) পৃ:-৩৯৪
১২. তদেব পৃ:-৩৯৪
১৩. তদেব পৃ:-৩৯৫

খাদ্য সমস্যা থেকে বিধিবিধানের অসারতা : মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্প

সঞ্জীব মণ্ডল
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : মহাশ্বেতা দেবী হলেন সাহিত্য সাধিকা ও সমাজ সেবিকার এক মিলিত রূপ, যাঁদেরকে আমরা সাধারণত 'লেখক কর্মী' বা 'writer activist' নামে অভিহিত করে থাকি। তিনি বিভিন্ন শ্রেণির গল্প লিখেছেন। যথা- অন্ত্যজ শ্রেণি, নারী কেন্দ্রিক, বীরগাথা, ইতিহাসধর্মী, বাস্তবধর্মী প্রভৃতি। তিনি এসব শ্রেণির গল্প লেখায় ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার রূপ যেমন ধরা পড়েছে বিভিন্ন গল্পে, তেমনি পাঠকদের কাছে চিরকালীন ক্ষতের মতো দাগ রেখে যাওয়া কিছু গল্পও রেখে গেছেন। যেগুলি সাহিত্যের আঙিনার পাশাপাশি মননের গভীরে চিরকালীন স্থানলাভ করে। তেমনই বাস্তবধর্মী কয়েকটি গল্প- ভাত, জাতুধান, সাঁঝ সকালের মা প্রভৃতি। এই গল্পগুলিতে কিভাবে ক্ষুধার তাড়নায় নিজেদের উদর পূরণের তাগিদে কর্মে লিপ্ত হয়েছে, সেই ক্ষুধাকে আশ্রয় করে সমস্ত রকম বিধিবিধানকে একপ্রকার অমান্য করেছে, নিজেদের খাদ্যের প্রতি স্পিহা-আখাঙ্খাকে পূরণ করতে সফল হয়েছে, তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ গল্পগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: ভাত, খাদ্য, ক্ষুধা, উদর, বিধিবিধান।

মূলপ্রবন্ধ:

বিশ শতকের স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের কথাকার মহাশ্বেতা দেবীর নাম বাংলা সাহিত্যের আসরে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল মন্ত্রই ছিল মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও সহানুভূতি-সম্পন্ন স্নেহপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি একটি স্বচ্ছ শোষণহীন এবং সমানাধিকার প্রাপ্ত শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই নিম্নবর্গীয় সমাজের চিত্ররূপ অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি শুধুমাত্র তাদের নীরব আবেদনকেই ভাষা দেননি, তাদের অপ্রাপ্তিজনিত যন্ত্রণা, নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট-হতাশা, অনাহার, ক্ষুধা, শোষণ-বঞ্চনার কথা যথাযথ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী নিজের লেখা প্রসঙ্গে নানা মন্তব্য করেছেন, যা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না তিনি কোন বিষয়টি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যেমন – তিনি বলেছিলেন, "আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বার বার ফিরে ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The Voiceless Section of Indian Society. এই অংশ এখন শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ো বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না।

আমি পারি কিনা জানি না, চেষ্টা করি মাত্র।..."[১] তাই তাঁর গল্পগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অনেকগুলি ছোটোগল্পে নিম্নবর্গ মানুষের প্রান্ত ও ব্রাত্য জীবনের সমস্যাগুলি বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছে।

মহাশ্বেতা দেবী দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের সময় ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যার ফলে সমাজকর্মী হিসেবে উপলপ্ধ জীবন অভিজ্ঞতায় অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত বিভিন্ন মানুষের পাশে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল ক্ষুধা বা ক্ষুন্নিবৃত্তি। খিদের জ্বালায় জর্জরিত এই মানুষগুলির জীবনে খাদ্য সমস্যা যে কতটা ভয়াবহ, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গল্পে। তিনি আত্মকথনে স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে – " ... স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারি কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। ..."[২]

আলোচ্য খাদ্য সমস্যার উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে এই নূন্যতম চাহিদা যা নির্যাতিত, বঞ্চিত সমাজের মানুষদের আজও পূরণ হয়নি। যারা প্রশাসন ও রাষ্ট্রের কাছে প্রতিকার চেয়েও পায়নি। অগত্যা প্রতিকারের পথ তারা নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে। এরকমই কয়েকটি মৌলিক চাহিদা নির্ভর গল্প – ভাত, জল, নুন, ঘর, মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ, রাক্ষস, জন্মতিথি প্রভৃতি গল্পে গল্পকার বিষয় হিসেবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এখন আলোচ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে তেমনই কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণ করে নেওয়া যেতে পারে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পটি ১৯৮২ সালে ম্যানিফেস্টো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে রয়েছে চিরক্ষুধার্ত মানুষের কথা। গল্পের প্রধান চরিত্র উচ্ছব নাইয়া (উৎসব), গ্রাম থেকে এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে হারিয়ে অনাহারক্লিষ্ট যন্ত্রণায় পাগলের মতো হয়ে, জ্ঞান হারিয়ে কলকাতার পথে এসেছে কাজের সন্ধানে। শুধু দুবেলা দু'মুঠো ভাত খাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তার এই আসা। অনাহারক্লিষ্ট উৎসব শুধুমাত্র ভাত খেতে পাবে বলে চোদ্দ দফায় কাজ করতে রাজি হয়েছে। সে কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে পরিবার বিরহের অমানসিক যন্ত্রণাকে বুকের ভেতর চেপে রাখে, শুধুমাত্র ভাত খাবে বলে। বাসিনীর থেকে শুনেছে বড়োলোকের বাড়িতে বাদা থেকে চাল আসে, অনেক লোক খায়। খিদের জ্বালায় জর্জরিত উৎসবের মাথার মধ্যে বার বার ঘুরতে থাকে রকমারি চাল ও তা থেকে তৈরি নানান পদ – "ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোটা সাপটা চাল।"[৩] এক সময় উৎসব চেয়েই বসে বাসিনীর

কাছে – "এক মুষ্টি চাল দে। গালে দে জল খাই। বড্ড ঝ্যামন আঁচড় কাটতিছে পেটের মধ্যিখানে। সেই ক'দ্দিন ঘরে আঁদা ভাত খাই না।"[৪]

বিরাশি বছরের গৃহকর্তা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মৃত্যুকে রোধ করার জন্য যজ্ঞের আয়োজন, সেই যজ্ঞের কাঠ কাটতে এসেছে উৎসব। বেল, ক্যাওড়া, অশ্বত্থ, বট, তেতুল গাছের কাঠ আধ মণ করে নিয়ে আসা হয়েছে। সেগুলো সব এক মাপে কাটতে হবে। - "উৎসব আড়াই মণ কাঠ কাটলো সে ভাতের হুতাশে। নইলে দেহে ক্ষমতা ছিল না।"[৫] ভাতের জন্য কতটা পরিমাণ আকাঙ্খা দেহ মনে মস্তিষ্কে কাজ করলে তবে একজন মানুষের পক্ষে অভুক্ত থেকে বিরামহীন ভাবে কাজ করতে পারে, তা ভাবলেই আমাদের মনে শিহরণ জাগে।

পুজো শেষ হওয়ার পরেই রোগ শয্যায় শায়িত বিরাশি বছরের মুমূর্ষু গৃহকর্তা মারা যান। ফলে নতুন শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী, আশৌচ বাড়িতে যা রান্না হয়েছিল সেগুলি ফেলে দিতে হবে। স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন উৎসব যখন বুঝে যায়, ফেলে দেওয়া হবে সমস্ত ভাত তরকারি, তখন সে হিংস্র হয়ে ওঠে। তার মাথার ঠিক থাকে না, কোনো নিয়মরীতির তোয়াক্কা না করে, বিধি নিষেধের বাঁধা না মেনে সে বাসিনীর হাত থেকে মোটা চালের পিতলের ডেকচিটি নিয়ে ছুটে চলে যায় সকলের নাগালের বাইরে স্টেশনের দিকে। - " বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারে নি। খেতে খেতে তার যে কি হয় মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন।"[৬] উৎসব পাগলের মতো কবজি ডুবিয়ে আকণ্ঠ ভাত খায় এবং নিরন্ন পেটে ভাতের ভার নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মনিবরা এসে বাড়ির পেতলের ডেকচি চুরির অপরাধে তাকে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যায়।

খাদ্য সংকটে পরে সমস্ত বিধিবিধানকে ভেঙ্গে দিয়ে উৎসব তার উদর পূরণ করেছে। যে কারণে আমাদের বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় না যে, মানুষের খিদের জ্বালা সমস্ত রকম আইন কানুনকে অমান্য করে উদর পূরণের চেষ্টাতেই থাকে, সেখানে স্বয়ং বিধাতারও কোনো নিয়ম চলে না। ফলে উৎসবের মতো সৎ মানুষকে চুরির দায়ে জেলে যেতে হয়, সেখানে তার অনুভূতি অপর পক্ষ বুঝতেই পারে না।

'জাতুধন' গল্পের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাজুয়া তিওর অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত এবং অবহেলিত শ্রেণীভুক্তের মানুষ। এই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য দারিদ্র তাদের জীবন জুড়ে সর্বদাই লেগে থাকে। যখন যেরকম সম্ভব সেভাবেই এরা জীবিকার সন্ধান করে। জীবিকা যাই হোক না কেন অন্ন জোগাড় করার তাগিদটাই এদের কাছে বড়ো। এদের নেতা, বৃদ্ধ মাতং নানাভাবে এদের অন্নের সংস্থান করার চেষ্টা করে। সাজুয়ার পেটের খোরাক যে অন্য পাঁচজনার চাইতে আলাদা একথা মাতং ভালোভাবেই জানে। তাই মাতং চেষ্টা করে ওর জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে। অবিশ্বাস্য কম মজুরি ও পেট

ভাতায় সজুয়ার পাশাপাশি অন্যান্যদের কন্ট্রাক্টরের পথ মেরামতি, জোগারি কাজ করতে আপত্তি নেই বলে মাতং এর পক্ষে এদের জন্য কাজ জোটাতে অসুবিধা হয় না। বেলেটি গ্রামের মহাজন রাম সিংগির জমিতে এই তিওররা বর্গাদার। যে জমিতে তারা বর্গাদার, জমিটি চরজমি হওয়ায় সব সময় চাষ বাসের উপযোগী থাকে না। কেননা চরটি যদি একবছর জেগে থাকে অন্যবছর ভাগীরথী তাকে ভাসিয়ে দেয়। সাজুয়াদের মধ্যে তাই অন্ন সংস্থানের জন্য ভিন্ন কাজের উপর নির্ভর করতেই হয়। বিশেষ করে সাজুয়ার অন্নের তাগিদটা যে কতটা প্রয়োজন তা বোঝা যায় মহাজন রাম সিংগির কথাতে – "এর কথাই বলছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু'কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।"[৭]

মহাজন রাম সিংগির মাতৃ শ্রাদ্ধে সাজুয়ার খাওয়ার বহর আরো স্পষ্ট রূপ পায়। সেখানে সে ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল। সাজুয়ার খাওয়া দেখেই পুরুত ঠাকুর তার নাম দিয়েছিল জাতুধান। 'জাতুধান' মানে যে রাক্ষস, সাজুয়া তা জানার পর একটা শিরোপা জুটেছে ভেবে বেশ আনন্দও পেয়েছিল। এই সাজুয়া বোঝে, সে বেশিদিন ঘরে বসে থাকলে মা বউয়ের ভাতে টান ধরবে। কেননা কম খেয়ে বেশিদিনের জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখাটা সাজুয়ার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই মা বউকে আশ্বস্ত করে পেটের টানে সাজুয়াকে বাইরে বের হতে হয়। এই খাদ্যের স্পৃহা আকাঙ্খা সাজুয়ার মনেও যে কতটা পরিমাণ রয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় কাটোয়া থেকে কাজ করে ফেরার দিন। সেখানে মহাজন কুন্ডুবাবুর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর দিন তার কাকা মারা যায়। আশৌচ শুরু হয়ে যাওয়াতেই বিধান অনুযায়ী সমস্ত ভাত, তরকারি, ফল-সিন্নি ফেলা যাবে। কিন্তু জাতুধান সাজুয়া সমস্ত বিফলে যাওয়ার আগে তাদের থেকে চেয়ে নেয়। মাতং এ প্রসঙ্গে জানায় – "এই হতভাগা বলে দাও দেখি, খেয়ে লই। খেল বটে! সেদিন খেল, পরদিন খেল , আমরাও খেলাম, কিন্তুক ও খেল আমাদের দশজনার সমান।"[৮] এইরকম খিদে নিয়ে ঘরে থাকাও যে ঘরের মানুষের চালে টান ধরানো তা সাজুয়া বোঝে বলেই মন না চাইলেও তাকে বেরোতে হয়। বিশেষ করে বউ এবং কোলের ছেলেটার জন্য ওর ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

আবার যখন বন্যায় চর ভেসে গেছে কিনা তা দেখার জন্য সাজুয়াকেই যেতে হয়, তখন সেখানে চর অক্ষুন্ন দেখে সে মাচার মধ্যে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে চর ভেসে যায়। সাজুয়ার জন্য অনেক খোঁজ খবর নিয়ে তার কোনো সন্ধান মেলে না। শেষ পর্যন্ত একটা মরাকে সাজুয়া বলে প্রমাণিত হওয়ায় মাতংরা খড়ের পুতুল পুড়িয়ে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে। সাজুয়ার শ্রাদ্ধের জন্য রাম সিংগির কাছে মাতংরা চালের দাবি করে। তারা চালের বস্তা সাজুয়ার বাড়িতে রেখে দেয়। চালের স্পর্শে তারা সাজুয়ার স্পর্শ অনুভব করে।

কিছুদিন পরে একরাত্রে ফিরে আসে জীবিত সাজুয়া। মাতং যখন বলে চাল ফিরিয়ে দিতে হবে কারণ ও চাল শ্রাদ্ধের চাল। সাজুয়া তখনই স্থির করে চালের বস্তা

নিয়ে সে চলে যাবে অনেক দূরে। মাতং সামান্য আপত্তি করে জানাই নিজের শ্রাদ্ধের চাল খেতে নেই। - " দেও দেবতার রিষে পড়বি।"[৯] সাজুয়া উত্তরে জানাই – "পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার রিষ বেরথা যায়।"[১০] শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য সাজুয়া সমস্ত বিধিবিধানকে উড়িয়ে দিয়ে চালের বস্তা নিয়ে অন্য জায়গায় পলায়ন করতে সাহস করেছে। এইভাবেই জাতুধান সাজুয়া সমস্ত কুসংস্কার ভেঙ্গে দিয়ে গল্পের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে দেখি জটি ঠাকুরানী ও তার নির্বোধ যুবক ছেলে সাধনকে। তবে কেমন করে একজন গর্ভধারিনী মা, সাঁঝ সকালের মা হয়ে উঠল তার ইতিহাস একটু অন্যরকম। জটিরা ছিল মেদিনীপুরের পাখমারা জাতির যাযাবর মানুষ। ওদের নিজস্ব ঘর ছিল না, ওরা পাখি ধরে, পাখি বেঁচে জীবনধারণ করতো। সুবর্ণরেখার চরে পাখি ধরতে গিয়ে জটির প্রথম উৎসব কান্দোরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উৎসবদের জাত ব্যবসা ছিল চিকনপাটি বোনা। জটি তার সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে এই উৎসবের সঙ্গেই ঘর বাঁধল। পাখমারাদের নিজস্ব সমাজ ছাড়া বিবাহ রীতি ছিল না। জটি সেই রীতি লঙ্ঘন করে নিজ জাতের কাছে ফিরে যাবার পথ বন্ধ করেছে। জটির ঘরে যখন ছেলে হল সকলে আনন্দে আত্মহারা। সাধনের মুখে প্রসাদ দেওয়ার দিন উৎসব তাদের সমাজকে ভাত-খাসি খাওয়াল। উৎসব আনন্দে চোলাই খেয়ে মারা গেল। জটি পাঁচ বছরের ছেলে সাধনকে নিয়ে অকূল সাগরে পড়লো।

নানা অভিজ্ঞতার পর জটির যখন মনে হল নিজেকে ও ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত পথ বন্ধ। এই সময় তার মাথায় খেলে গেল অলৌকিকতা দিয়ে নিজের চারিদিকে বর্ম না আঁটতে পারলে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। সেই থেকে জটি দিনমানে ঠাকুরানী, সাঁঝ ও সকালে সে সাধনের মা। জটি পুজো পেত আর তাবিজ মাদুলি দিত। তার বদলে ভক্তদের থেকে টাকা পয়সা নিত না, নিত এক পালি চাল। নিজে না খেয়ে ছেলে সধনকে সাঁঝ ও সকালে ভাত খাওয়াত। অনন্ত অভাবের মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও সাধনের পেটে খিদের আগুন কখনও নিভতো না। আর এই ক্ষুধার্ত ছেলের ভাত জোটাতে জোটাতেই জটিকে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। কেবলমাত্র অনাহারে কাটাতে কাটাতে জটিকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে।

মায়ের কথা রাখতে সাধন ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে কাজে লেগে যায়। কালীঘাটের পুরুত বামুনকে ধরে আঠারো টাকায় শ্রাদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করে। সব কিছুতেই টাকা ধরে কাজ সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধের কাজে যে চাল দিয়েছে সাধন, সেগুলি পুরুতের প্রাপ্য। কিন্তু শ্রাদ্ধ শেষে ওঠার সময় সেই চালগুলি সে গামছায় বাঁধে। বন্ধু বলরাম নানারকম বুঝিয়ে শ্রাদ্ধের চাল খেতে নেই বললে, সে যুক্তি সাধন কানেও নেয় না। বরঞ্চ বন্ধু ও পুরুত দুজনকেই গাল দিয়ে সেই চাল নিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। - "সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে, ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভাল গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে,

ততদিন ওর কাছে সাঁঝ সকালের মা বাঁধা থাকবে। মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের উপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।”[১১]

খাদ্য সমস্যার মধ্যে পড়ে চরিত্রগুলি কিভাবে ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধানের নিয়ম-কানুনকে মানতে পারেনি, তা মহাশ্বেতা দেবী অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরেছেন এই গল্পগুলির মাধ্যমে। যা তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টির বিচক্ষণ প্রতিরূপ।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী মহাশ্বেতা। ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, বইমেলা জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৯

২. তদেব, পৃ: ১০

৩. তদেব, পৃ: ২১০

৪. তদেব, পৃ: ২১০

৫. তদেব, পৃ: ২১৩

৬. তদেব, পৃ: ২১৬

৭. দেবী মহাশ্বেতা। 'বেহুলা'। অন্যধারা, কলকাতা- ৩৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, পৃ: ৫৬

৮. তদেব, পৃ: ৫৯

৯. তদেব, পৃ: ৭৫

১০. তদেব, পৃ: ৭৫

১১. দেবী মহাশ্বেতা। 'স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প’। নাথ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা- ৭৩, পৌষ ১৩৬৬, পৃ: ৮৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার। 'কালের পুত্তলিকা’। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, আশ্বিন ১৪০২

২. চক্রবর্তী সুমিতা। 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়’। পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, জুন ২০০৪

৩. দাশ উদয়চাঁদ। 'ছোটোগল্পের বর্ণালি’। দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা- ৯, অক্টোবর ২০০৭

৪. দত্ত বীরেন্দ্র। 'বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'। পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, আগস্ট ১৯৮৫

৫. দে অমর (সম্পাদক)। 'গল্প সরণি' মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা। গল্পসরণি প্রকাশন, কলকাতা- ২৮, বার্ষিক ১৪১৮

৬. দেবী মহাশ্বেতা। ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’। দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, বইমেলা জানুয়ারি ২০০৪

৭. দেবী মহাশ্বেতা। ‘বেহুলা’। অন্যধারা, কলকাতা- ৩৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

৮. দেবী মহাশ্বেতা। ‘স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প’। নাথ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা- ৭৩, পৌষ ১৩৬৬

বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও ব্যাসকৃত মহাভারত

হরিপদ মহাপাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ মহাকাব্য রূপে মহাভারতের নাম প্রসিদ্ধ। কেবলমাত্র আকৃতির দিক দিয়ে মহাকাব্য বিশাল নয়, বিষয়বস্তু দিক দিয়েও এটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বলা হয়, এমন কোন বিষয় নেই যা মহাভারতে পাওয়া যায় না।

" যদিহাস্তি তদন্যত্র , যন্নেহাস্তিন তৎ কুত্রচিৎ'।

মহাভারত সম্পর্কে একটি লোকোক্তি প্রচলিত আছে ---

' যন্নভারতে তন্নভারতে'

যা মহাভারতে নেই তা ভারতেও নেই।

ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা ,সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, রাজনীতি ,সমাজনীতি ,অর্থনীতি , শিল্পকলা, প্রভৃতি সকল বিষয়ের একত্র সমাবেশ ও সমন্বয়ে ঘটেছে মহাভারতে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি এই মহাকাব্য ভারতীয় জনসমাজে শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি এটি একটি আদর্শ মহাকাব্য হিসেবে মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান পেয়েছে। মহাকাব্যে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণর চরিত্রকে অনুসরণ করে ভারতীয় সমাজ, সমাজ ব্যবস্থা গঠনে এক পথ নির্দেশিকা খুঁজে পেয়েছে। তাই এই মহাকাব্য ভারতীয় বহু প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হয়ে সকল স্তরের মানুষের ঘরে ঘরে একটি আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে স্থান পেয়েছে।

সূচকশব্দ : জাতীয় মহাকাব্য ,ধর্মগ্রন্থ, মহাযুদ্ধ, সামগ্রিক সাহিত্য, সমাজ সাহিত্য।

রামায়ণের মতো মহাভারত ও ভারতীয়দের কাছে একাধারে জাতীয় মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ।ভরত বংশীয়দের মহাযুদ্ধের কাহিনী এর মূল বিষয়বস্তু হলেও এই কাহিনীর ছত্রছায়ায় এসে মিলিত হয়েছে অজস্র উপাখ্যান অসংখ্য উপদেশ ও ধর্মের অনুশাসন। বিষয় বৈচিত্র এবং বিশালতার জন্যই এই মহাকাব্য মহাভারত নামে আখ্যাত হয়েছে--- "মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।" পাশ্চাত্য পণ্ডিত Winternitz মহাভারত কে সামগ্রিক সাহিত্য আখ্যায় অভিহিত করেছেন----- "A whole leterature".বস্তুত এই বিসালায়তন মহাকাব্য ভারতবর্ষের শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম চেতনার সমগ্র তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই মহর্ষি বৈশম্পায়ন যথার্থই বলেছেন----'যদিহাস্তি তদ্ন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎক্কচিৎ।'১ ।।

এই মহাভারত আবার অতীত ইতিহাসের আকর।এর মধ্যে আছে পুরানের তাৎপর্য, ধর্মের শ্বাশ্বত আবেদন এবং পুরা সাহিত্যের অসাধারণ চিত্রকল্প। এই

মহাগ্রন্থটি যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীর জনমানষে ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

ভারতবর্ষের ধর্ম কর্ম ও সমাজনীতির চিরাগত আদর্শ আছে যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ।মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র গুলির মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সেগুলি স্বকীয় গৌরবের চির ভাস্বর।

এই গৌরব মন্ডিত চরিত্রগুলি আজও ভারতবাসীর আদর্শ তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সাধুতা ও সদাচারের মুহূর্ত বিগ্রহ ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাধুতা ও সত্যবাদিতা, সৌম্যদর্শন কর্মবীর অর্জুনের আলোক সামান্য পৌরুষ-গৌরব, মধ্যম পাণ্ডব ভীমের অপপ্রতিরোধ্য ও অজেয় বাহুবাল, ক্ষত্রিয়াভিমালিনী দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, ধর্মপ্রানা গান্ধারীর মনস্বিতা, দানবীর কর্নের পুরুষকারে অবিচল প্রত্যয়, বিদুরের ধর্মপ্রাণতা, জগতবরেন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মমন্ত্রে অখণ্ড ভারত রচনার মহিমাদর্শ - এ সকল ভারতবাসীর প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শাশ্বত প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাভারতের সন্নিবিষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য, লৌকিক নীতি ও উপদেশ,ধর্ম ও দর্শনের উন্নততর চিন্তাধারা আবহমান কাল ধরে ভারতীয়দের সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। ভক্তি ও ঈশ্বরের করুণাই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় মহাভারতে উদঘোষিত এই মতকে ভারতবাসী চরম সত্য বলে জেনেছে। সাংখ্য ও যোগ মহাভারতের মূল দার্শনিক মতবাদ হলেও বেদান্ত মত ও এখানে দুর্লভ নয়। ‘সনৎসুজাতীয়'২ নামক অংশে প্রতিফলিত হয়েছে বেদান্তের উচ্চচিন্তা। এসবের প্রভাব ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী।

ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের বর্ণ কুটির পর্যন্ত মহাভারতের অমৃত কথা আজও পরম শ্রদ্ধায় পতিত হয়। সেই সুধানি শ্রাবি কাহিনী শ্রবণ করে মানুষ পবিত্রতার স্পর্শ পায়। কোন ধর্মানুষ্ঠানে, বারব্রতে, শান্তি স্বস্ত্যয়নে, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে, পূজা পার্বণে এখনও মহাভারত পাঠ করা হয় ।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, জ্ঞান কর্মযোগ ও ভক্তির সঙ্গমস্থল। এই গীতার বাণী শ্রবনে লোক নিজেকে কলুষমুক্ত বলে মনে করে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গীতা পাঠ ও গীতা দান আবশ্যিক পবিত্র কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। এর সাতশত শ্লোকে বিধৃত আছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করে গীতা বিশ্ব মানবের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।এইভাবে মহাভারত হয়ে উঠেছে প্রাচীন ভারতবর্ষের যুগায়ত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিধি-বিধান ধর্ম দর্শন এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির এক বিরাট চিত্রশালা।এক কথায় মহাভারত হলো বিশ্বকোষ আর এই বিশাল গ্রন্থ থেকে ভারতবাসী চিরকাল আহরণ করে চলেছে তার ধর্মজীবন ও ভাবজীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান।

সাহিত্যে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে ও মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণভাণ্ডারে মহাভারতের প্রভাব বলে শেষ করা যায় না। মহাকবি

কালিদাস তার অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের উপাদান মহাভারত থেকে গ্রহণ করে স্বকীয় প্রতিভার আলোকে তাকে কালো তীর্ণ করে তুলেছেন। ভারবি,' কিরাতার্জুনীয়,' মাঘের "শিশুপালবধ", শ্রীহর্ষের "নৈশধ চরিত" , রাজশেখরের বালভারত' প্রভৃতি মহাকাব্য ও নাটকের আখ্যান ভাগ মহাভারত থেকেই আহৃত। মহাভারতের অমৃতধারা ভারতীয় কবি মানুষকে চির অভিষিক্ত করেছে। ব্যাসদেব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন- "সর্বেষাং কবিমুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি।' অর্থাৎ তাঁর মহাভারত কথা সর্বকালের কবিদের উপজীব্য হবে। মহর্ষি বেদবাসের সেই প্রত্যাশা ফলবতী হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যে ও মহাভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট, বাঙালি কবি কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করে বাঙালির কাব্যরস পিপাসু হৃদয়কে কাব্য রসের বারিধিতে অবগাহন করিয়েছেন, বাংলায় রচিত অন্যান্য মহাভারতের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এর 'পান্ডববিজয়' শ্রীকরনন্দীর 'অশ্বমেধ কথা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও মহাভারত অনূদিত হয়েছে।রামানন্দ সাগর পরিচালিত দূরদর্শনে পরিবেশিত বাংলা ও হিন্দি কাহিনী চিত্র 'মহাভারত' অনায়াসে সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরকে জয় করেছে।

বাংলা সাহিত্যের উপর মহাভারতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।কবি মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' ও 'শর্মিষ্ঠা' কাব্যের বিষয়বস্তু মহাভারতের আখ্যান প্রবাহের পরিচয় দেয়। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের উপাদান ও মহাভারত থেকে আহৃত।আলংকারিক আনন্দবর্ধন মহাভারতকে শান্ত রসাশ্রিত মহাকাব্য রূপে চিহ্নিত করেছেন।কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে স্বজন হারানো শ্মশান প্রান্তরে যুধিষ্ঠিরের মনে বৈরাগ্যের যে ব্যাকুলতা দেখা দেয় তা এক উদাস শান্তির সাক্ষ্য বহন করে। এই শান্তির কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর" সোনার তরী" কাব্যের" পুরস্কার" কবিতায় বলেছেন---

" বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সকল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির মানবের প্রাণে।"

সাম্প্রতিককালের বাংলা নাটক কে এবং যাত্রাপালায় মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী নানাভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। সারথি , কর্ণার্জুন ,কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ,দ্রৌপদী, শকুনি, শকুনির পাশা ,দানবীর কর্ণ প্রভৃতি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালা গুলি বাঙালি হৃদয়কে জয় করেছে।তাছাড়া বিষয়বর্ণনায় নয় প্রকৃতি রূপচিত্র কল্পনায়, চরিত্র চিত্রনে এবং রস পরিবেশন এর ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য বহুলাংশে মহাভারতের কাছে ঋণী। স্থাপত্য ভাস্কর্যে ও মহাভারতের প্রভাব স্পষ্ট। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে সৌধ এবং প্রাসাদে মহাভারতের বিভিন্ন চিত্র উৎকীর্ণ আছে। অনেক মন্দিরের গাত্রে লিখিত আছে গীতার বিভিন্ন শ্লোক, ভারতীয় সমাজ, জীবন, সাহিত্য ও শিল্প মহাভারত থেকে যুগে যুগে প্রাণসত্তার অপরিহার্য শক্তি আহরণ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. মহাভা আদিপর্ব ৬২/৫৭

২. মহাভা শান্তি পর্ব ৫/৪১/৪৬

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, রাজশেখর বসু, স্পেকট্রাম অফসেট ১৪২৭।

২. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ ২০১০

৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, যুধিষ্ঠির গোপ, সংস্কৃত বুক ডিপো ২০১৭।

৪. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ দেব কুমার দাস, শ্রী বলরাম প্রকাশনী ১৪১৪।

৫. সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, ডক্টর বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক ওয়ার্ল্ড ২০০৬

৬. সংস্কৃত সাহিত্য পরিচয়, অর্ধেন্দুশেখর বাঁশুরি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ২০১৯

৭. সংস্কৃত সাহিত্য ইতিহাস, ডঃ উমাশঙ্কর শর্মা, চৌখম্বাভারতী একাডেমি ২০১৯

শৈলেন ঘোষের নাট্যচর্চা ও রচনায় শিশু-কিশোর চরিত্র

রিয়া পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : শিশু ও কিশোর সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষ ছিলেন অসামান্য কবি প্রতিভার অধিকারী। তিনি একদিকে যেমন ছোটগল্প রচয়িতা, ঔপন্যাসিক, তেমনি নাট্যকার ও দক্ষ পরিচালক। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত তাঁর এই লেখালেখির বিস্তার। তাঁর নাটকের সংখ্যাও যথেষ্ট বলা যায়। লেখকের সমস্ত নাটকগুলি শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে রচিত। তিনি আজীবন শিশুদের মনোজগত ও সৃজনশীলতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা চিন্তা করে 'শিশুরঙ্গন' নামে একটি নাট্য সংগঠন তৈরি করেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে তাঁর প্রথম পরিচিতি প্রাপ্ত হয় নাটকের মাধ্যমে, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাঁর রচিত নাটকগুলিতে শিশুরা যেমন একদিকে কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি বাস্তব জগতের ভাল-মন্দের যাবতীয় গুণাবলীকে চিনতে শেখে। শিশুদের নাটকের ক্ষেত্রে তিনি দুঃসাহসিক কতগুলি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা তাঁকে সফলতা এনে দেয়। বর্তমান পাঠক সমাজকে তাঁর রচিত নির্বাচিত কয়েকটি নাটক ও শিশু-কিশোর চরিত্রদের নিয়ে আলোচনা করাই এই নিবন্ধের মূল অন্বিষ্ট।

সূচক শব্দ : অর্ধশতাব্দী, অভিনয়, নাটক, শিশুরঙ্গন।

মূল আলোচনা:

শৈলেন ঘোষ (১৯২৮-২০১৬) অর্ধশতাব্দীর ও বেশি সময় ধরে আজীবন শিশুদের প্রতি 'ভালোবাসা' ও 'মমত্ববোধ' থেকে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। শৈলেন ঘোষের সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ হাওড়া অ্যাংলো সংস্কৃত হাইস্কুলের শিক্ষক মহাশয়দের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। এই উদ্দীপিত মনোভাব তাঁর পরবর্তী সাহিত্যাঙ্গনের পথকে বিস্তৃত ও সুগম করে তুলেছিল। মাস্টার মহাশয়দের সাহচর্যে প্রথম সুযোগ হয় নাটকে অভিনয় করার। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক মঞ্চস্থ করার পর অমলের মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে বেদনাহত করে, কারণ 'অমল যা কিছু হতে চেয়েছিল তার কিছুই হতে পারলো না'। লেখকের বালক বয়সের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এরপর তিনি প্রথম তাগিদ অনুভব করেন নাটক লেখার। অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় লেখেন 'ঘরের খেয়া' নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব এনেছিলেন, লেখকের থেকে আমরা জানতে পারি- "এখানে অমলের সব ইচ্ছা পূর্ণ হলো, কিন্তু তৃপ্ত হলো না তার মন। ঘরে ফেরার প্রবল আকাঙ্খা তার মনে থেকে গেল।"[১] লেখকের

শিশু বয়সেই অমলের বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে নাটক রচনার যে সূত্রপাত, যা তাঁর পরবর্তী নাট্যচর্চার জীবনেও শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এক নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, নম্র স্বভাবের, সদা হাস্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত এই গুণের জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'ঘরের খেয়া' অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সময় খবর পেলেন তাঁর প্রিয় শিক্ষক সুনীল সরকার স্কুলের চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ হয়ে চলে যাচ্ছেন। শৈলেন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন, কিছুদিন পর আকস্মিক কোন এক কারন তাঁর শিক্ষক আসেন কলকাতায় খবর পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রন জানান নাটক দেখার। মঞ্চশয্যা, অভিনয় পরিচালনা সমস্ত নিজের উদ্যোগে করেন। তাঁর নাটক দেখে সুনীল সরকার অভিভূত হয়ে জানান- "গুরুদেব যদি জীবিত থাকতেন, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতাম। তিঁনি নাটকটি পড়ে নিশ্চয়ই খুশি হতেন।"[২] এই কথাতে লেখকের চোখে জল আসে এবং এই কথাটিই তাঁর 'সারাজীবনের প্রেরণার উৎস' হয়ে ওঠে, যা তিনি দীর্ঘজীবনে বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সুনীল সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'ক্ষণিকা' থেকে তাঁর প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তি হয়। বালক বয়সের এই প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁর মননশীলতাকে ঋদ্ধ করে তুলেছিল।

শৈলেনের সাহিত্যসম্ভার যেমন বিচিত্র, জীবনও তেমনই বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। নাটকে সাফল্য ও প্রথম পুরষ্কার লাভ তাঁর সৃজনক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' বিভাগে তাঁর লেখা পাঠালেন। বিমল ঘোষ (মৌমাছি) তাঁর লেখা পড়ে চিঠি পাঠান দেখা করার জন্য। শৈলেনকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন- "তুমি এত ছোট জানতাম না।"[৩] বিমল ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর সংগঠিত 'মণিমেলা' মহাকেন্দ্রে যোগদান করেন। **১৯৫৫** সালে লিখলেন দ্বিতীয় নাটক 'দত্যিদানোর ছানা'। 'মণিমেলায়' সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই নাটক লিখে ও প্রযোজনার জন্য পেলেন প্রথম পুরস্কার। এই সংগঠনের জন্য বিমল ঘোষের অনুরোধে আবারো লিখলেন দুটি নাটক 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' ও 'দানবের মুখোশ'। দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'কিরণমালা' গল্পের নাট্যরুপ প্রথমটি, দ্বিতীয়টির পটভূমি চীন ও ভারতের যুদ্ধ থেকে নিলেন। এই সময় তাঁর জীবনে ঘটে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' নাটকের মঞ্চায়ন দেখতে এলেন 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমির কর্তা মামা ওয়াদেকর এবং নরেন্দ্র দেব'। তার কিছুদিন পর চিঠি আসে তাঁকে আকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হবে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' নাটকের জন্য। শৈলেনের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তাঁকে পুরস্কার দেওয়ার সময় বলেন- "খুব কম বয়সে সফল হলে!।"[৪] শিশু নাটকের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরল ঘটনা। তাঁর এই সুখ্যাতি ও ব্যাপ্তি শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে এক মহাবিস্ময়। যেখানে আমরা জানি, শিশু সাহিত্যের ওপর বর্তমানে কোন আকাদেমি

পুরস্কার তেমন নেই। অল্পবয়সে তিনি সমস্ত ক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্ত করেছিলেন, এই সফলতাই তাঁকে একজন যোগ্য শিশুসাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য 'মণিমেলা' মহাকেন্দ্রে একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা কোনোভাবে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর নিজের চেষ্টায় গড়ে তুললেন 'শিশুরঙ্গন' প্রতিষ্ঠান ১৯৭০ সালে। স্থান হিসাবে পেলেন বউবাজার শিশুতীর্থ স্কুলে একটি ছোট্ট ঘর। ১৯৭১ সালে সরকারের রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তিনি নিজস্ব রচিত প্রায় ১৫ টি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেন। শিশুরঙ্গনে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন 'মিতুল নামে পুতুলটি' কলকাতার রবীন্দ্র সদনে। এই নাটকটি সকলের কাছে প্রশংসাযোগ্য হয়ে উঠল। তিনি শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন যেন কোনো ভুল বার্তা তাদের কাছে না যায়। কারন শিশুরা অনুকরণ করতে ভালোবাসে ও সেখান থেকেই শেখে। 'মণিমেলা' কে কোনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্টি করেননি তিনি, গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আদর্শ রূপে। দীপ্তকণ্ঠে জানিয়েছেন- "ব্যবসায়িক আউটলুক নিয়ে কাজ করতে পারিনি এবং করা উচিত নয় বলে আমার মনে হয়। প্রফেশনাল হওয়াটা কোনো গর্হিত কাজ নয়। প্রফেশনাল না-হলে উন্নতমানের নাটক প্রযোজনা করা যায় না, ওই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুমি কোনো নাটক মঞ্চস্থ করছ, ঠিক আছে, সেইটে তোমার লক্ষ্য থাক, কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে যে—ছোটোদের আনন্দটাই সবচেয়ে বড়ো কথা, তাদের কোনো রকম অসুবিধায় সেই আনন্দ মাটি হয়ে যাক এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।"[৫] শিশুরঙ্গনে প্রত্যেকেই স্বেচ্ছাসেবক রূপে কাজ করতেন এবং চাঁদা দিয়ে সদস্য হতেন। এই প্রচেষ্টা ও উদ্দমের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের সাহায্য করেন। নিয়মিত রূপে নাটক করার জন্য একটি হলকে ব্যবহারের অনুমতি দেন। এই শিশুনাট্য সংগঠন তৈরি হয়েছিল গরীব, নিম্ন মধ্যবিত্ত বস্তির শিশু ও কিশোরদের নিয়ে। এদের শেখাতেন নিজের হাতে অভিনয়, গান, নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ। শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কোন কিছু আরোপিত করার উপর তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। শিশুরঙ্গনকে নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করেছেন কীভাবে শিশুদের নাটকের প্রতি আগ্রহ তৈরি করবেন, কিন্তু তা বলে অর্থহীন কোন নাটক বা নীতিকথামূলক কাহিনিকে বিষয়বস্তু করেননি। তাঁর অভিপ্রায় ছিল শিশু-কিশোরদের টিভি, কমিক্সের পাতা থেকে বের করে সৃজনধর্মী কাজে একনিষ্ঠতা বাড়াতে, তাঁর নাটকে গ্রহণ করলেন রূপকথা এবং তার ছদ্মবেশে বাস্তবের রূপ, অ্যাডভেঞ্চারের মত কাহিনি। শিশুরঙ্গনে প্রতি বছর একটি করে নাটক অভিনীত হত। তিনি প্রায় ২৫ টি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, সেগুলি হলো- 'দত্যিদানোর ছানা', 'আলো', 'জাদুর পুতুল', 'পিলপিলসাহেবের টুপি', 'এসপ্ল্যানেডের কুমির', 'ভালুক নিয়ে ভেলকি' , 'খুদে যাযাবর ইসতাসি', 'আবু ও দস্যু সর্দার', 'পিরামিডের দেশে', 'জাদুর দেশে জগন্নাথ', 'বাগডুম সিং', 'বেণু ও ঝিরির গল্প', 'জয়', 'ভালোবাসার ছোট্ট হরিণ', 'ছেলেবেলার রবিঠাকুর', 'স্বপ্ন দেখার নায়ক', 'সোনালির দিন', 'তুসি জাদু জানে',

'টুসটুসির গান', 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান', 'রুপাকে নিয়ে রূপকথা', 'মাণিক দিয়ে গাঁথা', 'টোরা বাদশা' ইত্যাদি। লেখকের পরিশ্রম ও ভালোবাসায় শিশুরঙ্গন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সফল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন- "শৈলেন ঘোষের আমন্ত্রনে আমি একাধিকবার তাঁর বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছি। দেখে অবাক হয়েছি প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করেছে এই সব গরিব অকিঞ্চন ঘরের ছেলেমেয়েরা। তাদের দীপ্ত মুখ ও হর্ষধ্বনিতে বুঝতে পারা যায় এক কঠিন জীবন থেকে ক্ষণিকের এই মুক্তি তারা কতটা উপভোগ করছে। শৈলেনবাবু কাজটি জীবনের একটি ব্রত হিসাবেই নিয়েছেন। এ তাঁর অর্থ উপার্জনের কোন পন্থা নয়।"[৬] তিনি নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে কতগুলি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন এবং নাটকের যাবতীয় কার্যপ্রণালীতে তাঁর ছিল অপরিসীম কৌতূহল। তিনি নাট্যমঞ্চে চিরাচরিত ব্যবস্থা ভেঙ্গে সংলাপ রেকর্ডের ব্যবস্থা করেন, তাঁর এই প্রচেষ্টায় শিশুরা খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এছাড়াও 'ত্রিস্তর মঞ্চ ও পাপেট' তাঁর আবিষ্কৃত। নাটকগুলিতে আবহ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত ব্যক্তিরা যেমন- ভি বালসারা, উৎপলেন্দু চৌধুরী, মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের চরিত্র নির্বাচন, মঞ্চ পরিকল্পনা, আলো, পোশাক, সঙ্গীত রচনা ও রিহার্সাল সবেতেই তাঁর পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা ছিল অননুকরনীয়। তিনি শিশুদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর নাটকে মূক, বধির, দৃষ্টিহীন এবং বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের বিনা টিকিটে নাটক দেখার ব্যবস্থা করে দিতেন, এবং 'সকলের সমান অধিকার' এই ধারনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুরঙ্গনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বম্বে, পুনে প্রভৃতি জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন- "শিশুরঙ্গন নামে যে সংগঠনটি শৈলেন গড়ে তুলেছে তাঁর উদ্দেশ্যর কথা ভাবুন। ও চেয়েছিল, যে সব শিশুর জীবনে আলো নেই, হাসি নেই, মজা নেই, আশা-ভরসা নেই, তাদের কাছে একটা নতুন জীবনের খবর পৌঁছে দিতে। আমাদের শিশুরঙ্গন তো বড়োলোকেদের প্রতিষ্ঠান নয়। শৈলেনের সঙ্গে কাজ করে বুঝেছি যে এটাকে বড়োলোকেদের হাতে ছেড়ে দেবে না। এখানে কারা আসে কাদের নিয়ে নাটক করি আমরা? সবই তো মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। আমাদের শিশুরঙ্গনের সংসার তাদের নিয়ে।"[৭] বার্ধক্য বয়সে এসেও প্রতিনিয়ত তিনি শিশুদের উৎসাহবর্ধন করেছেন। পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন কারিগর এবং তৈরি করেছেন বর্তমানে অনেক সফল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের।

এবার আমরা তাঁর নাটকের কতগুলি বিশেষত্বকে জেনে নেবো। শৈলেন ঘোষের নাটকগুলি মূলত রূপকের ছদ্মবেশে লেখা। তাঁর নাটকগুলি কল্পনা ও বাস্তবের নির্যাস নিয়ে তৈরি। চরিত্রগুলিও অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের। তিনি বাস্তব জীবনের কঠিন পরিস্থিতি ও সেখান থেকে সম্যসার সমাধানও দেখিয়েছেন। রূপকের অন্তরালে রূপকথাকে ব্যবহার করেছেন, সেখানে পশু-পাখি, প্রকৃতি, জড়বস্তু সকলেই বাঙ্ময়।

শৈলেনের পূর্বে দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিঁনিও এই ঘরানার লেখক। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা ইংরাজি সাহিত্যের লুইস ক্যারল, জে এম ব্যারি, রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, লুইসা মে অ্যালকটের ছায়া পাই। তাঁর নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্ররা 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' করেছে। প্রতিটি নাটকের বিষয়বস্তু বিচিত্র। 'মিতুল নামে পুতুলটি' এই নাটকে আমরা লোভী, স্বার্থপর মানুষের পরিচয় পাই, যারা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করে আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় ফেলে দেয়। এসবের পাশাপাশি ছড়া ও গানের ব্যবহার করেছেন প্রত্যেকটি নাটকে। তাঁর নাটকে আসার আলো দেখতে পেয়ে বেঁচে থাকে চরিত্ররা, তারা সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত, ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। নাটকে চরিত্রদের নামগুলি বেশ কৌতুকপূর্ণ যেমন- সরসে, ধানতি, খোঁদল, তালফুলুরি, নড়েভোলা, লাট, বেলাট, বদনচাঁদ ইত্যাদি। 'স্বপ্ন দেখার নায়ক' নাটকে কতগুলি পথশিশুদের দেখি তাদের উপর কর্তৃত্ব করে এক যুবক কারণ সে তাদের পথের থেকে তুলে এনে কাজ দিয়েছে এবং কাজের অর্ধেক টাকা সে নিয়ে নেয়। অথচ সাণ্টু নামে যুবক কোন কাজ করে না, খুবই নির্দয় এই শিশুদের উপর। তখনই বিদ্রোহ করে উঠে চার পথ শিশুদের মধ্যে একজন যার নাম ধানতি। ধানতি মাথায় করে ইট তুলে কাজ করে কিন্তু তার মন চলে যায় স্কুলের দিকে, পড়াশুনা করে খুব বড় হতে চায়। এই স্বপ্নের পথে বাঁধা হয়ে দাড়ায় সাণ্টু। অন্য বন্ধুরা তখন মশকরা করে বলে ওঠে– "জন্মেছিস ফুটপাথে। স্বপ্ন দেখছিস মহারাজ হওয়ার।"[৮] ঘটনাচক্রে ধানতি তার সাহসিকতার পুরস্কার হিসাবে স্কুলে ভর্তি হতে পারে এক পরিবার পায়। তখন সকলে মিলে সাণ্টুকে শায়েস্তা করে। স্বভাবতই তাঁর এই নাটক সমাজ সচেতনমূলক অর্থাৎ পথশিশুদেরও জীবনের মূল স্রোতে আসার অধিকার আছে, যদি সহৃদয় ব্যক্তিরা তাদের মানবিকতা দেখায়। আমরা একটু লক্ষ করলেই সাণ্টুর মতো এইরকম হীনচরিত্র মানুষদের দেখতে পাই। নাটকে লেখক তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেও বাস্তবে ফুটপাতে জন্ম নেওয়া শিশুরা প্রত্যেকেই পরিস্থিতির শিকার। 'সুনামি' নাটকে প্রকৃতির আশীর্বাদের পাশাপাশি অভিশাপের দিকটিকে লেখক জানিয়েছেন শিশু-কিশোরদের। 'দুই চাঁদের নাটক' এখানে বদনচাঁদ ও সাধনচাঁদ দুইজনে অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু কিন্তু তারা ভিন্ন জাতির, সেজন্য রাজার রাজপ্রাসাদে কখনই আসতে পারে না প্রহরীরা তাদের সবসময় বাঁধা দেয়। তারা হঠাৎ প্রহরীদের তাড়া খেয়ে অলক্ষ্যে রাজার বিছানার নীচে আশ্রয় নেয়। রাজা তাদের ভূতের ছদ্মবেশ ধরে সততার পরীক্ষা নেয় এবং দুজনেই উত্তীর্ণ হয়। রাজা তখন সকল রাজ্যবাসীকে জানায় বদনচাঁদ ঝাড়ুদারের ছেলে এখন থেকে রাজপুত্র এবং সাধনচাঁদ তার বন্ধু দুজনেই রাজমহলে থাকবে। এখানে লেখক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গুণের বিচারে শ্রেষ্ঠতাকে বিচার করেছেন। মাঝে মাঝে নাটকে মন উদাস করা সংলাপ শুনতে পাই, 'আমার নাম টায়রা' নাটকে এক মুসাফীরের বন্দুকে পাখির মৃত্যু হয়, তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে- "শিকার করতে করতে হামভি একটো জানোয়ার

বনিয়ে গিয়াছি। হাঁ, হাম একটো জানোয়ার কাল হাম একটো পাখি মারিয়া ফেলিয়াছি। এতনা ছোটাসে একটো পাখি গাছের উপর খেলা করছিল, উসকা মা উসকো খানা খিলাচ্ছিল। আর হামার ভিতরকা শয়তান বন্ধুক উঁচা করকে গুলি করে দিল।”[৯] টায়রার সংস্পর্শে এসে মুসাফিরের মনে তার মেয়ের ছবি ফুটে ওঠে ও তার মানসিক পরিবর্তনও ঘটে। নাট্যকার জানাতে চেয়েছেন সমাজের মানুষের পশু-পাখিদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ তার প্রতিবাদ করিয়েছেন নাটকের টায়রা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

লেখক শিশুদের নাটক কেমন ভাবে লেখা উচিত সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন –“ছোটদের নাটক রচয়িতাদের অবশ্যই জানতে হবে, শিশুর কল্পনাকে কেমন করে আরও উন্নত করা যাবে, কেমন করে মনুষ্য চরিত্রের বিচিত্রতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটানো যাবে, কেমন করে তার খেলা আর কাজের মধ্যে সেইসব উপলব্ধি সঞ্চারিত করা যাবে।”[১০] তাঁর প্রতিটি নাটকে শিশু ও কিশোরেরাই মুখ্য চরিত্রে থাকে। শৈলেনের নাটকে সহজ, সরল সংলাপ লক্ষ করি। নিজস্ব একটি রীতি তৈরি করতে পেরেছিলেন সে জন্য তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তা ছিল। তিনি প্রতিটি নাটক রচনা করতেন মায়া-মমতার দ্বারা সে জন্য মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হৃদয়ের ব্যক্তি থাকলেও তাকে ভালো হবার সুযোগ দিতেন। নিরলস পরিশ্রমী, দীর্ঘ সাতাশি বছরের জীবনে অকৃতদার এই মানুষটি শিশুদের জন্যই জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

শৈলেনের নাটকের সংখ্যা প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। এ পর্যন্ত লেখকের সমস্ত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। শৈলেন ঘোষের ৬ টি নাটক নিয়ে ‘ছোটদের নাটক সমগ্র’ নামে লালমাটি প্রকাশন বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখনও বহু নাটক অগ্রন্থিত। তাঁর এই নাটকগুলি যদি পাঠকের কাছে সহজলভ্য হত, তাহলে আমরা তাঁর নাটকের প্রতি তন্নিষ্ঠ ও সাহিত্যানুরাগের যথার্থ পরিচয় পেতাম। তিনি কখনই সাফল্য ও যশোলিপ্সুর আকাঙ্খী ছিলেন না। সেইজন্য তাঁর বেশিরভাগ নাটকই সাহিত্যের কালের বিচারে হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। লেখক লক্ষ করেছিলেন শিশুদের জন্য রচিত নাটকগুলিকে সাহিত্যের জগতে এক অবহেলার চোখে দেখা হয়, তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন- “আজকে শিশু-নাটক একান্ত ভাবে ‘দুয়োরানী’-র মতোই রয়েছে। অর্থাৎ কি না তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করার মতো অভিভাবকদের মন গড়ে ওঠেনি।”[১১] এখানেই আমরা তাঁর নিখুঁত শিল্পীসত্তার ও সত্যানুসন্ধানী মনের পরিচয় পাই।

উল্লেখপঞ্জি :

১. শৈলেন ঘোষ, যখন আমি ছোটো, মনে পড়ে-বড়োদের ছোটবেলা, রচনা সংগ্রহ, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৩৮।

২. শৈলেন ঘোষ, প্রবন্ধ, শৈশব, দ্র পূর্বোক্ত রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৪৯৬।

৩. শৈলেন ঘোষ, শিশুদের উপযোগী সাহিত্য আর হচ্ছে না, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫০।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫১।
৫. শৈলেন ঘোষের উক্তি। দ্র পূর্বোক্ত রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৭৬৫।
৬. শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত, তিতলি সাহিত্য পত্রিকা, শৈলেন ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২, নদীয়া, পৃষ্ঠা ৬।
৭. পূর্বোক্ত তিতলি সাহিত্য পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৪৭।
৮. শৈলেন ঘোষ, ছোটদের নাটক সমগ্র, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৮।
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৫।
১০. শৈলেন ঘোষ, ঠিক নাটক কাকে বলি, দ্র পূর্বোক্ত রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৫৩৪।
১১. শৈলেন ঘোষের উক্তি, দ্র পূর্বোক্ত রচনা সংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৭৬০।

শৃঙ্খল ঝঙ্কার : এক বন্দী নারীর আখ্যান যখন ইতিহাস

কৃষ্ণ কুমার সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)
গোপ প্রাঙ্গণ, পশ্চিম মেদিনীপুর

অনুচিন্তন : আত্মজীবনী হল আত্মবিশ্লেষণ। এই আত্মবিশ্লেষণের কেন্দ্রে থাকে নিজের জীবন, পারিপার্শ্বিক জগত এবং সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও অন্যান্য বিষয়। আত্মজীবনীকারের লেখার মধ্যে দুটি সত্তা সক্রিয় থাকে। একটি ব্যক্তি সত্তা – যেখানে ব্যক্তি নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকে এবং নিজের প্রাণ পুরুষকে প্রত্যক্ষভাবে গোচারীভুক্ত করতে চায়। দুই সামাজিক সত্তা-- যেখানে লেখক বস্তুজগতের সাথে সংযোগ সাধনে ব্রতী হন। নিজেকে সমাজ ও দেশ সেবায় বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে আত্মজীবনীকে আত্মগবেষণাও বলা যেতে পারে। এরকমই একটি আত্মজীবনী হল বীণা দাসের 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার'। ২৪টি পরিচ্ছেদে লেখিকা এখানে বিন্যস্ত করেছেন ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের দিনগুলির যে টানাপড়েন ও ওঠানামা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর এই স্মৃতিকথায় স্থান পেয়েছে। তাঁর এই স্মৃতিকথা থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, মানুষের স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্খা এবং লেখিকার নিজের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপ থেকে কংগ্রেসের যোগদানের এক দীর্ঘ ইতিহাস জানা যায়। আত্মকথন যে ইতিহাসের উপাদান আশ্রিত হতে পারে, তা 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' নামক আখ্যানটি আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
সূচক শব্দ : আত্মজীবনী, আত্মকথন, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, বীণা দাস, ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ:

স্মৃতিকথা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। জীবনের নানা উত্থান পতন, টনাপোড়েন, আত্মনিষ্ঠ চিত্র-বিচিত্রের জলছবি আর কোথাও তেমন সহজপ্রাপ্য নয়। ভিন্নমুখী জীবন, বিচিত্র জগতের কত অজানা অভিজ্ঞতা, সংসার, সমাজের অনেক উত্থান-পতনজনিত হাসি কান্না, বৈচিত্রপূর্ণ মানস গঠন ও নানা জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে যখন নিজের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবন মেলে ধরেন তখন লেখক ও পাঠক উভয়ের মনে সৃষ্টি হয় এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসের বিচিত্র মিলনক্ষেত্র। তাই এই জাতীয় রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। আবার সেটা যদি হয় কোন রাজৈতিক ব্যক্তিত্ব তাহলে তো আর কথা নেই। সে স্মৃতিকথা ইতিহাস হয়ে উঠতে বাধ্য। মূলত সহজ সরল ভাষায় ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণ ব্যক্তি যখন নিজে পরিবেশন করেন তখন

আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বলা হয়। আত্মজীবনী রচনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নয়।[১] এ দেশে খ্রীস্টান মিশনারীদের আগমনের আগে ও পরে আত্মপ্রকাশের রীতি ও ধরণ একই রকম ছিল না। নিজের সম্পর্কে লেখার বাসনা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ হতে থাকে। এইভাবে আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্বিক ইত্যাদি ধারায় আত্মজীবনীর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সাধন ঘটাতে থাকে। এই বৈচিত্র্যমন্ডিত প্রকাশভঙ্গি তথা জীবন দর্শনের প্রতি লক্ষ রেখে আশুতোষ রায় তাঁর *“বাংলা আত্মচরিত-সাহিত্যের ধারা”*[২]নামক গ্রন্থে আত্মচরিতগুলিকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত বিশ্লেষণাত্বক ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। সেই স্তরগুলি হল –ক.আপন ব্যক্তিত্ব স্বমহিমায় প্রকাশিত,খ. ব্যক্তি চেতনা সমষ্টি চেতনায় উদবেলিত,গ. আত্মবলয় সৃষ্টি অপেক্ষা গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বোধিত, ঘ. আপন ব্যক্তিত্ব তত্বভাবনায় উদ্ভাসিত। এবং ঙ. মনিষীর স্মৃতিকথা অনুলেখক কর্তৃক পরিবেশিত।

এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের বিচারে বীণা দাসের *“শৃঙ্খল ঝঙ্কার”* স্মৃতিকথাকে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। কারণ এখানে বীণা দাস ব্যক্তিগত জীবনকে বিনাস্বার্থে দেশের ও দশের সেবায় নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি পরাধীন দেশের শৃঙ্খলামোচনের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ স্বদেশ ব্রতী এবং পবিত্র নারীর অনবদ্য স্মৃতিকথা। বীণা দাসের মত আত্মোৎসর্গ পরায়ণ মানুষের জীবন ব্যক্তিক হলেও তা দেশের মহৎ ও বৃহৎ চাঞ্চল্যময় ইতিহাসের অন্তর্গত। তাই সেই জীবনের অনুধ্যানে প্রয়োজন তথ্য, তার সঙ্গে স্মৃতি উন্মোচন। স্মৃতিকথা ও ইতিহাস কথার পারস্পরিক কথা পাঠই জীবন অনুধ্যান তাৎপর্য লাভ করে। ২৪ টি পরিচ্ছেদে লেখিকা বিন্যস্ত করছেন তাঁর জীবন প্রসঙ্গ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের দিনগুলির যে টানাপড়েন ও ওঠানামা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর এই স্মৃতিকথায় স্থান পেয়েছে। তাঁর এই স্মৃতিকথা থেকে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, মানুষের স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্খা এবং লেখিকার নিজের সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপ থেকে কংগ্রেসের যোগদানের এক দীর্ঘ ইতিহাস জানা যায়। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস আমরা জানতে পারি। তাঁর বন্দী জীবনের কাহিনী আমাদের অনেক অজানা বিষয়কে জানতে সাহায্য করেছে।

দেশ যখন ক্রমশ অধঃপতনের পথে চলে তখন আদর্শবোধ, আত্মত্যাগ এবং অতীত গৌরব গাথার স্মরণের প্রয়োজন আছে। শ্রীযুক্তা বীণা দাস একাধিক স্মরণযোগ্য ব্যক্তিত্বের একজন, আজকের মানুষ যাদের ভুলে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে চরমপন্থী মতবাদের অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। *ঐতিহাসিক* অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর *‘ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চরমপন্থী পর্ব*গ্রন্থে দেখান নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ যখন ইংরেজদের বিবেক জাগাতে একেবারে ব্যর্থ হয়, তখন সন্ত্রাসবাদের মধ্যেই অরবিন্দ, তিলক প্রমুখের সাফল্যের হাতছানি দেখতে পাচ্ছিলেন।

দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, শরৎচন্দ্রের 'পথের দবী' রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতা কে বাঁচিতে চায় রে' রবীন্দ্রনাথের 'শিকলদেবীর ওই যে পূজাবেদী', নজরুলের 'ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে বাঙালীর দিবাকর', বঙ্কিমচন্দ্রের '*আনন্দমঠ*, গীতা, অরবিন্দ ঘোষের চিন্তা প্রভৃতি দিয়েছিল আদর্শগত প্রেরণা। অনুশীলন ও যুগান্তর এবং আরও কিছু গোষ্টীর সক্রিয়তার কালকে শিথিলভাবে অগ্নিযুগ আখ্যা দেওয়া হয়। এই অগ্নিযুগের অগ্নি কন্যা ছিলেন বীণা দাস- যদিও তাঁর কর্মজীবন পরবর্তীকালে ভিন্ন পথবর্তী হয়। বীণা দাস তাঁর 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' আত্মকথায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি দুবার জেলে গিয়েছেন। দুবার জেল বন্দী যথাক্রমে সাত বছর ও তিন বছর সময়ে তিনি জেলের জীবন বর্ণনা করেছেন তাঁর আত্মকথায়।

বীণা দাস ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা ও মা দুজনেই সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীণা দাস এর মাতৃভূমি শৃঙ্খল মোচনের প্রেরণা এসেছিল তাঁর পিতা বেণীমাধব দাসের কাছ থেকে। বীনা দাসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৩৬ বছরের জীবন (১৯১১-১৯৪৭) বিচিত্র ওঠানামার মধ্যে বয়ে চলেছিল- সেই যুগ, সেই দিনগুলো, আর সেদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে কিছুটা ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন—

> "একদিন যে ঝড়ের উদ্দাম হাওয়া গৃহের শান্ত সুখনীড় থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে দঃসাহসী যাত্রাপথের মাঝখানে টেনে নিয়ে ফেলেছিল, সেই দুর্দম ঝড়ই তো ক্রমে ক্রমে বিরাট হয়ে, প্রবল হয়ে সারাদেশেরই যা-কিছু জীর্ণ, যা-কিছু স্থবির, যা-কিছু আবর্জনাময়, নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়ে সারাদেশটাকে মুক্তির উপকূলে এনে দিল। আমার এই যাত্রাপথের প্রতি ছত্রে, প্রতি ছত্রের অন্তরালে থাকবে সেই প্রবল ঝড়েরই পদধ্বনি।" [৩]

সেই সময়কার একটা ঘটনা তাঁকে দেশের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল। ইংরেজ বড়লাটের পত্নী তাঁর স্কুলে আসবেন। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে ফুল দিয়ে, এবং তা তাঁর পায়ের কাছে ছড়াতে হবে। এই ঘটনা তাঁর মনে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন থেকেই তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করেন। আত্মকথায় তিনি এই ঘটনা ব্যক্ত করেছেন-

> "সমস্ত মনটা বিদ্রোহ করে উঠল, কাউকে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলাম। চুপ করে ক্লাসে গিয়ে বসে রইলাম, অপমানে চোখে জল আসছিল। খানিক পরে দেখি আরো দুটি বন্ধু পালিয়ে ক্লাসে এসে বসল। গভীর উত্তেজনায় তিনজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করলাম: দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করব।" [৪]

এছাড়া শরৎচন্দ্রের 'পথের দবী', নির্বাসিতের আত্মকথা', 'কারা কাহিনী', 'বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রভৃতি বইগুলি দুর্বলতার মুহূর্তে মনোবল দিয়েছে, হৃদয়কে দৃঢ়

করেছে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর বিপ্লবী ও বিদ্রোহী চরিত্র প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশনের বয়কটের সময় কলেজে হরতাল শুরু করেন। তাদের আন্দোলন সফল হয়। তাদের এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে বাংলাতে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তিনি স্বেচ্ছাসেবিকার দলে যোগ দেন। এরপর যুগান্তর গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশগ্রহন করেন। বিপ্লবী সদস্য, অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র-ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় এই উপকরণগুলি সংগ্রহ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দেশের দুর্গতি লাঞ্ছনা দুর করাই তখনকার যুব সমাজের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রথম ও প্রধান যে মনোভাব সেদিন দেশের তরুণকে পাগল করে তুলেছিল সে হল স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্খা। এরই সঙ্গে রঙ্গলালের[৫]—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে",রবীন্দ্রনাথের[৬]—"শিকল দেবীর ওই যে পূজাবেদী,/চিরকাল কি রইবে খাড়া,/পাগলামি! তুই আয় রে দুয়ার ভেদি,/ভূলগুলো সব আন রে বাছাবাছা" ও নজরুলের [৭]—"ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় বাঙালীর দিবাকর,/উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার",প্রভৃতি গান বাঙলার তরুণের রক্তে তখন আগুন ধরিয়ে দিত। আকন্ঠ মুক্তির পিপাসা, বীর্যের মহা মূল্য দিয়ে হারানো স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনার দুর্দম আকাঙ্খা অন্তরের অন্য সমস্ত আকাঙ্খাকেই ডুবিয়ে দিয়েছিল।

এরপর বীণা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন পরাধীনতা কি এবং ব্রিটিশ শাসকরা কিভাবে ভারতকে শোষণ করেছেন। দেশ-জোড়া অভাব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, আর ভীরুতা কিভাবে দেশকে গ্রাস করেছে। ব্রিটিশদের ক্ষমা নয়, দেশকে ব্রিটিশ দুঃশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাদের সেই অভিযান কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁরা জানত দু চার জন ইংরেজ রাজকর্মচারীর অপসারণে ব্রিটিশ রাজশক্তি পরাভূত হবে না। তবু তাদের কয়েকজনকে তাঁরা আঘাত করেছিল, কারণ সেই ব্যক্তিরা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক স্তম্ভ। তাদেরই উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এতবড় সাম্রাজ্য। তাদের আঘাত করলে সেই আঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গায়ে গিয়েই লাগবে। শান্তি দাশগুপ্ত, সুহাসিনী দত্ত, নীনা দাস, আইরিনি খাঁ প্রমুখরা একত্রিত হয়ে দেশের মুক্তির জন্য গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ব্রিটিশের এই পাপের ইমারতকে ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখেছিল। তাই বীণা দাস আত্মোৎসর্গের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ডিগ্রী নেওয়ার সময় কনভোকেশন হলে কিংবা কলকাতার রেশকোর্শে গভর্নরকেগুলি করার জন্য যুগান্তর দলের কর্মী কমলা দাশগুপ্তের কাছে রিভলবার চান। ১৯৩২ সালে ৬ ই ফেব্রুয়ারি সিনেট হলে কনভোকেশন উপলক্ষ্যে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বীণা দাস তাঁর উপর গুলি চালান। কিন্তু সফল হননি এবং এরপর গ্রেপ্তার হন। বিচারে ৯ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। এই পর্বে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মেদিনীপুর জেল। তারপর হিজলী ও বাংলাদেশের নানা জেলে কাটানোর পর গান্ধীজীর সক্রিয়তায় ১৯৩৯ সালে সাত বছর জেলে কাটানোর পর মুক্তি পান।

মুক্তির পর বীণা দাস গুপ্তদল ও হত্যার রাজনীতি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। 'ফরোয়ার্ড' নামে সাপ্তহিক এবং 'মন্দিরা' নামে রাজনৈতিক মাসিক পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে বীণা দাস টালিগঞ্জের চালকল বস্তিতে দরিদ্র মজুরদের সাথে পরিচিত হন। ১৯৪১-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসের সম্পাদিকা। এই সময় গান্ধিজীর ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রচার করতে গিয়ে হাজরা পার্কে তাদের সভায় জৈনিক প্রহরারত সার্জেন্টের হাত চেপে ধরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন বছরের জেল হয়। ১৯৪৫ সালে আবার জেল থেকে মুক্তি। মূলত এই কাহিনীই 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' এই স্মৃতিকথায় স্থান পেয়েছে।

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কনভোকেশনে গভর্নরের জীবননাশের চেষ্টার জন্য বীণা দাসের ৯ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। প্রথমে লালবাজারের দোতলার একটা ধরে ৫-৬ দিন বন্দী রাখা হয়। পরে প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তর। মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা এই জেলে বন্দী। সকলেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে এখানে এসেছে। বাংলার বাইরে গুজরাটের মেয়েরাও এসেছে। এখানে বীণার সঙ্গে অমিতার দেখা। বাড়ির লোকজনও দেখা করতে আসছে যাকে ইন্টারভিউ বলা হচ্ছে। আসছে নানা খাবার ও অন্যান্য জিনিসও যেগুলো সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া হচ্ছে। বীণা প্রেসিডেন্সী জেলের বর্ণনায় লিখেছেন

> "ফিমেল ইয়ার্ডে ঢুকতেই দেখি চারদিকে অসম্ভব ভিড়। চোখটা ভিড়ের মধ্যে থৈ খুঁজে পাবার আগেই একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল---"মনু"! চেয়ে দেখি আমাদেরই ক্লাসের মেয়ে অমিতা। তারপর ক্রমে ক্রমে কাছে এগিয়ে এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন নানা বয়সের কত পরিচিত, অপরিচিত মেয়েরা---সত্যাগ্রহ করে সকলে জেলে এসেছেন।"[৮]

পরের দিন মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে কলকাতার মত এখনেও মেয়েদের ভিড়। তফাৎ এখানে বেশির ভাগ বন্দী দরিদ্র গ্রামের মেয়ে। সুদূর পল্লি থেকে কত ছোট বাচ্চা কলে নিয়ে মেয়েরা চলে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে। তাঁরা একেবারে অশিক্ষিত প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে বউ। তাদের কপালে, পিঠে লাঠির দাগ, আরও অন্য অত্যাচারের চিহ্নও আছে। এখানে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিফেনশন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত শান্তি – সুনীতির সঙ্গে দেখা। হাতপাখা, ফুল এগুলি জেলের সেলের মধ্যে রাখাতেও জেল কর্তৃপক্ষের আপত্তি। কারণ জেল আরামের জায়গা নয়। বীণা লিখেছেন—

> "একদিন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় উঠান থেকে একরাশ বেল আর রজনীগন্ধা এনে ঘরে রেখেছি। সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করতে এসেই জেলারের গর্জন, "জমাদারনী, ঘরে এত ফুল কেন, ফেলে দাও শিগ্‌গির।" তারপর

> আমার দিকে তাকিয়ে: "আপনার বোঝা উচিত, এটা জেল, আর বিলাসিতার জায়গা জেল নয়।" ৯

নানা ঘাত প্রতিঘাতে জেলখানায় সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ হয়ে উঠত তাঁরা। আশা নেই, উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, বৈচিত্র নেই, উঠতে ভাল লাগে না, তবু উঠতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা ভাল এই বিপ্লবীদের জীবনটাই ছিল দেশের পায়ে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়ার সামগ্রির মত। এর একটি মুহুর্তও তাদের ছিল না। বিলাসিতা নেই আমোদপ্রমোদ নেই, শুধুই ক্লেশ। দেশের স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সুখী হয়ার কোন অধিকার নেই, কোন তরুন তরুণীর। তাদের চরিত্রই আলাদা, তাঁরা পেশাদার বিপ্লবীদের মত। জেলের বাইরে যেমন প্রতিবাদ করে গিয়েছেন, জেলের ভিতরেও তাদের সেই প্রতিবাদ অব্যাহত আছে। জেলে জমাদারুনী বা মহাদারুনী যখন একটা চিরুরগণ হাঁপানির আসামিকে ধরে লাথি মারবে তার প্রতিবাদ করব না সেটা হয় নাকি? জেলের খাবার, বিভিন্ন পরিষেবা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জেলের মধ্যেই তাঁরা প্রতিবাদ করেছে। ফিমেল ইয়ার্ডে ঢুকে জেলার নানারকম অনাচার শুরু করেছিল। এর বিরুদ্ধে শান্তি, সুনীতি ও বীণা দাস অনশন আরম্ভ করেন। অন্যরাও এতে উৎসাহ দিয়েছিল। সাত দিন অনশনের পর তাদের দাবী মানা হল। জেলের মধ্যে তাদের প্রথম জয়। ফলস্বরূপ জেলারকে এই জেল থেকে সরানো হল। তবে বীণাকেও মেদিনীপুর থেকে হিজলীতে সরানো হল। যেখানে অধিকাংশ মহিলারা রাজবন্দী। শান্তিকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুনীতিকে ঢাকায় পাঠানো হয়।

১৯৩২-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছরের জেলবন্দী। জেলের মধ্যে নিজেদেরকে কোন দিনও বিচ্ছিন্ন করে একক করে দেখতেন না। সবাইকে সমানভাবে দেখা ও তাদের হাসিকান্না সমানভাবে ভাগকরেনিয়েছিলেন। কারণ তাদের জীবন বিরাট জাতির জীবন মরণের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেখানেই তাদের পরম সান্ত্বনা, আর সার্থকতার নিবিড় উপলব্ধি। দেশের জন্য, মানুষের জন্য যারা লড়াই করে চলেছে তাদের পাশে চিরদিনের জন্য নিজের একটুখানি স্থান করে নেওয়া। মানুষকে চেনার প্রকৃষ্ট স্থান জেল। মানুষের সবকুছু সীমাবদ্ধ আবেষ্ঠনীর মধ্যে ধরা পড়ে। কোনকিছুই গোপন করার জায়গা নেই। নিজেকে জানার চরম পরিক্ষা হয় জেলের ভিতর। হিজলীতে বীণা দাস তিন বছর ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

> "হিজলীর তিন বছর সাধারণ জেলজীবনের চেয়ে অন্যরকম ছিল। এখানে নিয়মের কড়াকড়ি অনেকখানি কম। তাছাড়া অন্য রাজবন্দিনীদের সঙ্গও ছিল আমাদের কাছে পরম লোভনীয়। .....বই এখানে ছিল অপর্যাপ্ত—বাড়ির বই তো রয়েছেই। তাছাড়া ডেটিন্যুদের নিজেদের কেনা বইও ছিল, ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকেও নিয়মিত বই আনানো হত। এতগুলো মনের মতো বই একসঙ্গে দেখে, অনেকদিনের উপবাসী মন যেন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এক-একদিন

> সারাক্ষণই প্রায় বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতাম।।..............শুধু পড়াশুনাই নয়। নানারকম খেলাধুলা, গান, অভিনয়, প্রতিযোগিতা, তর্ক-আলোচনা সব মিলিয়ে হিজলীটাকে আমরা ছোটোখাটো একটি 'শান্তিনিকেতন' করে তুলেছিলাম। প্রায়ই উৎসব লেগে রয়েছে—কখনো বর্ষামংগল, কখনো রবীন্দ্রজয়ন্তী, কখনো বা বিজয়া-সম্মিলনী।" [১০]

কিন্তু এই পরিবেশও বেশিদিন ভাল লাগেনি, আবার একঘেয়েমি। এই সময় মহাত্মাগান্ধী রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য মুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন। ১৯৩৮ সালে গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ। এক বছর পর ১৯৩৯ এ বীণা দাস মুক্তি পেলেন সাত বছর জেলে থাকার পর।

দীর্ঘদীন জেলের মধ্যে থাকার ফলে দেহমনে, ভিতরে বাইরে প্রকান্ড রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। সকলের মতই তারও স্বাস্থ্যের পরিবরতন ঘটেছে। অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে, কেউ বা মরণাপন্ন হয়ে জেল থেকে মুক্তি পেল। অনেকে কিছুদিনের মধ্যে মারাও গেল। জেলের মধ্যে থাকাকালীন অনেকের পরিবারে সদস্যদের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখছে সবকিছু বদলে গিয়েছে। বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে কিনা সেই চিন্তা তাদের তাড়া করে চলেছে। কিন্তু বীণার মধ্যে এইচিন্তা বেশিদিন কাজ করেনি। বীণা বেরিয়ে এগিয়ে চললেন অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে। বীণার অন্যান্য সঙ্গীরা কেউ সংসার জীবনে প্রবেশ করেছে। কেউ আর রাজনীতি করবে না, কেউ বিলাতে চলে গেছে, আবার কেউ বা মারা গিয়েছে।

কিছুদিন জেলের বাইরে থেকে নিজের শরীরকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। মুসুরিতে বেড়াতে যাওয়া। কিন্তু এভাবে বেশিদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেননি। পুনরায় রাজনীতির কর্মজাল তাঁকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ১৯৩২ এর রাজনীতি ও ১৯৪২ এর রাজনীতি এক নয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। দেশের অবস্থা বদলে গেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্খা ছড়িয়ে পরেছে জনসাধারণের মধ্যে, চারিদিকে চলছে কিষান আন্দোলন ও মজদুর অন্দোলন। রাস্তায় লাল ঝান্ডার শোভা যাত্রা। এখন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব যুব সমাজে খুব বেশি। এই নতুন আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা দেশের বিপ্লবী মনকে আকর্ষণ করেছে। ভারতে গণবিপ্লব আনতে হবে কিন্তু নেতৃত্ব ইংল্যান্ড বা রাশিয়ার হাতে এটাই প্রশ্ন। বিলেতের কমিনিষ্ট পার্টির 'পলিটব্যুরো' থেকে নির্দেশ এল, এখনই জাপান-জার্মানী ভীতি অতি উৎকটভাবে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি 'জনযুদ্ধ' হয়ে উঠল। কমিউনিষ্টকে বাদ দিয়ে কমিউনিজমকে গ্রহণ করা যায় কিনা তা নিয়ে কংগ্রেসে প্রশ্ন উঠেছিল। কমিউনিজমকে ভারতীয় করে তোলা যায় কিনা তেমন একটা ভাবনা চলছিল।এরফলে কংগ্রেস ধীরে ধীরে গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৩৪ সালে জহরলাল নেহেরু প্রথম কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক স্থান দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। ফলে

কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। সুভাষচন্দ্র এই সময় কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন।

১৯৩৯ সালে বীণা দাস জেল থেকে মুক্তির পর গুপ্তদল হত্যার রাজনীতি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। এইসময় দুটিঘটনা দুটি ঘটনা দেশের ও জাতির পক্ষে দুঃখের ও হতাশার ছিল। ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীর স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। এই সময় গণসংযোগের খুব প্রয়োজন ছিল। যেটা খুবই কঠিন কাজ। জেলের মধ্যে থাকার ফলে সেই কাজটা সহজ হয়েছিল বীণা দাসের কাছে। তিনি জেল খানাকে 'দুঃখের ঘর' বলেছেন। যেখানে তিনি দেখেছেন গ্রামের মহিলারাই সমাজের বিরুদ্ধে, সংসারের বিরুদ্ধে, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং জেলে গেছে। শ্রমিকদের সাথে তার প্রথম পরিচয় টালিগঞ্জের চাল কলে। তাঁরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। সাহিত্য চর্চার সুযোগও বীণা দাসের এসেছিল। 'মন্দিরা' নামক মাসিক পত্রিকা যেটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ছিল তার সঙ্গে তার যোগ ছিল। উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ প্রচার। একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সদস্য পদ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্যা হল নতুন প্রজন্মের কাছে কংগ্রেস সেকেলে, রোমাঞ্চহীন, বুড়োদের জন্যই। তাঁরা চাইতএক্ষুনি সংগ্রাম আরম্ভ করো। তাদের কাছে কমিউনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক বেশি আকর্ষণীয়।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়েছে। দেশের আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গান্ধীজী ও রাজেন্দ্র প্রসাদ সকলেই দেশকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলছিল। কিন্তু সেই সময় বাংলা অনেকটাই প্রাণহীন ও পিছিয়ে ছিল। ১৯৪২ ক্রিস্টাব্দ গান্ধীজী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলে দেশের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু দেশজোড়া অসংখ্য নেতারা সারা দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলল। গণসংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়লেও বাংলাতে কিছু হয়নি। যেখানে আগে বাংলা সভা, সমিতি আন্দোলনের ও বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাংলা যা আগে ভাবতো,পরে সারা ভারত তাই ভাবতো। তাই বীণা দাস 'ডু অর ডাই' এই মন্ত্রে বাংলাকে অনুপ্রানিত করার চেষ্টা করলেন। কারণ তিনি দক্ষিন কলকাতার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন। হাজরা পার্কে সভা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪২ খ্রিঃ থেকে ১৯৪৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তার জেল হয়।

বীণা দাসের তিন বছরের জন্য দ্বিতীয়বার জেলবাস হয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে। তার বন্দীর সাত আট দিন পর থেকে আগস্ট আন্দোলনের বন্দীরা জেলে আসতে লাগলেন। তার কাছ থেকে ধারাবাহিক খবর পাওয়া যেত। কারণ জেলে যে খবরের কাগজ আসত তা কালি লাগানো থাকত। ১৯৪২ সালে নভেম্বর ডিসেম্বর নাগাদ আন্দোলনে ভাটা পরেছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে 'ইন্টারভিউ' পেতেন এক

ঘন্টার জন্য। জেলের সামগ্রিক পরিস্থিতি খুব খারাপ। আর আশার কথা ১৫ ই আগস্টের পর দাগী আসামী ও খুব খারাপ অপরাধী ছাড়া সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখনে খুব ছোট শিশুরাও জেলে আসত তাদের মায়ের সঙ্গে। জেলের মধ্যে নানারকম জলসা, অভিনয়, উৎসব, রাজনৈতিক দিন উদযাপন হত। বীণা দাসের সাথে লেলিনের স্বপ্ন দেখা। সর্বহারা মানুষের সাথে বিপ্লবীদের তফাতে থাকা নিয়ে আলোচনা। কংগ্রেস নেতারা অভিজাত শ্রেণির নেতা, তাঁরা কোনদিন জনগণের সাথে মিশতে পারেনি। ভারতের গণবিপ্লব পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৩৫০ সালে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ষোড়শ পরিচ্ছেদে। সেখানে সরকারের চালের লরি কিছু মহিলা লুঠ করেছে। বীণা দাস বিশ্বাস করছে না বাড়ির মহিলারা লুঠ কতে পারে। তার মতে দল বা কারোর মদত আছে।

১৯৪৫ সালে বীণা দাসের মুক্তি ৩ বছর জেল বন্দীর পর। বেরিয়ে দেখেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। যুদ্ধে ভারত ক্ষতবিক্ষত, অভুক্ত, দুর্ভিক্ষের নাগপাশে জরানো মৃতকল্প ভারতবর্ষ। নৈতিক জীবন একেবারে তলানিতে। ১৯৪৫ খিস্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে এখনই আন্দোলন নয়, শক্তি অর্জন কর তারপর ডাক এলে আন্দোলন। ১৯৪২ এর পর বাংলায় কংগ্রেসের প্রতি সবার আগ্রহ বেরে যায়। জনসভা ও সদস্যপদের জন্য জনগণের ভিড় লক্ষ করার মত। শহরে গোলমাল, অশান্তি, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। কলকাতায় কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন দায়িত্বে আছে ক্ষমতা নেই এই অবস্থায়। ইতিমধ্যে ১৯৪৬-১৯৫১ পর্যন্ত বীণা দাস পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সদস্যপদ লাভ করেন। তখন তিনি মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের অভাব ঘুচবে ও যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়া যাবে। এই সময় ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়। আজদ্ হিন্দ বন্দিদের মুক্তির জন্য ছাত্ররা ডালহৌসি প্রবেশের জন্য শোভাযাত্রা করেছিল। গুলিতে অনেকের প্রাণও গিয়েছিল। যদিও এই আন্দোলন কংগ্রেস নেতৃত্বকে না জানিয়ে হয়েছিল। বীণা দাস সেই ছাত্র আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেননি। এখনে বলার বিষয় সারাদেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ কি নেতৃত্ব দিতে পারবে না? আবার সেই কংগ্রেসের উপর তলার নির্দেশ পেতেও সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা জয়লাভ করেছিল। তাদের এই জয় ইংরেজদের পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় যুবকদের স্বসম্মান বিদ্রোহের জয়। এরপর কলকাতার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ দেখা গেল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব মুশকিলে পড়ে যায়। কারণ এই আন্দোলন করার জন্য উপরতলার নির্দেশ নেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব জনগণকে ধৈর্য ধরতে বলল। এখনও সেই সময় আসেনি। কিন্তু কংগ্রেসের সেদিন আর এল না। ইংরেজরাই বলছে সারা ভারতবর্ষ এখন বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে।

১৯৪৬ খিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কলকাতায় আগুন জ্বলে ওঠে। গৃহযুদ্ধ শুরু হল হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষে। কেবল কলকাতা নয় সারা দেশের এর প্রভাব লক্ষ করা গেল। অনেকের মতে কংগ্রেস যদি ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে

ভারতের স্বাধীনতার জন্য এতটা সময় ব্যয় না করত তাহলে এমন গৃহযুদ্ধ ঘটত না। এই দাঙ্গায় বীণা দাস নোয়াখালি যান। সেখানে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান। এই সময় তিনি কংগ্রেসের সম্পাদিকা থাকার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঐ সময় অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মীরা ধর্মঘট ডেকেছিল। এতে কমিউনিষ্টদের হাত ছিল না। কংগ্রেস নেতারাই এটাকে পরিচালনা করেছিল। কলকাতায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল কিষাণ মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব সমর্থন করেননি এবং কোনও সাহায্যও করেনি। বীণা দাসের নেতৃত্বে ধর্মঘট সাফল্য লাভ করেছিল। এখানে দেখার বিষয় কংগ্রেস শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যস্ত, শ্রমিক কৃষকদের কথা ভাবছে না। সুতরাং বলা যেতে পারে তারা ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি।

বীণা দাস যখন নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা করছেন তখনই কাগজে পড়লেন ৩ই জুন মাউন্ট ব্যাটেনের ভাষণ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আরও নিশ্চিত। তবে ভারত ব্যবচ্ছেদ হবেই অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। কলকাতায় ফিরে বীণা দাসের চিন্তা হল দেশ তো স্বাধীন হবে, এরপর তাঁরা কি করবেন। স্বাধীন দেশ গড়েতোলার কাজ তবে কিভাবে, কিহবে তার পদ্ধতি। তিনি স্যোসালিজম আনতে চান কিন্তু সেখানে পৌঁছাবার পথ কি? কিষাণ মজদুর রাজের কথা আগেই বলা হয়েছিল এর কি হবে। বাড়ির সবাই স্যোসালিস্ট পার্টিতে কাজ করে কংগ্রেসে তাদের আস্থা নেই। বীণা দাস সবাইকে ১৫ই আসস্টের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। স্বাধীনতার দিন কারা পতাকা তুলবেন এটা নিয়ে বীণাদাসের ভাই তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। যারা পতাকা তুলছেন তাঁরা এই পতাকাকে একদিন কত অপমান করেছেন, তাদের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন যোগ নেই, বা যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের সহযোগী হিসাবে দেখা গিয়েছিল। যারা সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলন করেছিল তাদের ডাকা হল না। বীণা দাসের সংগ্রামের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। তিনি লিখেছেন--

> “আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় আজও লেখা হয় নি। আজও আমরা অপেক্ষা করে থাকব—আজও পথচলা আমাদের শেষ হয় নি।”[১১]

‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ পর্যালোচনা করার পর আমরা বীণা দাসের দৃষ্টিতে তৎকালীন ভারতের কিছু চিত্র সম্যকভাবে উপলবদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। যা আমাদের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহারে অনেক সাহায্য করবে। এইদিক থেকে ‘শৃঙ্খল ঝঙ্কার’ নামক আত্মকথনটি হয়ে উঠেছে সার্থক ইতিহাস আশ্রিত আত্মজীবনী।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ :

১. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্য প্রকরণ,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০১।

২. আশুতোষ রায়, *বাংলা আত্মচরিত সাহিত্যের ধারা,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশন, ১৪১৪।

৩. বীণা দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার: ১ম পরিচ্ছেদ,* কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ.১৩।

৪. বীণা দাস, *তদেব, ২য় পরিচ্ছেদ,*কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন,২০১৫, পৃ. ১৮।

৫. **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** (জন্মঃ ১৮২৭ - মৃত্যুঃ ১৩ মে, ১৮৮৭) একজন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং প্রবন্ধকার।তিনি মূলত স্বদেশপ্রেমিক কবিরূপে বিখ্যাত। তার রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী* এবং *শূরসুন্দরী*। টডের *অ্যানাল্স্ অফ রাজস্থান* থেকে কাহিনীর অংশ নিয়ে তিনি *পদ্মিনী উপাখ্যান* রচনা করেন। তার মৃত্যুর পর স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যানের অংশ – "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়" খুবই বিখ্যাত ছিল।

৬. **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (৭ই মে, ১৮৬১ - ৭ই আগস্ট, ১৯৪১)অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস ও ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন তার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প ও ১৯১৫টি গান যথাক্রমে *গল্পগুচ্ছ* ও *গীতবিতান* সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৭. **কাজী নজরুল ইসলাম** (২৫ মে ১৮৯৯ – ২৯ আগস্ট ১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রগতিশীল প্রণোদনার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখযোগ্য।পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ – দুই বাংলাতেই তাঁর কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত। নজরুলের গানের সংখ্যা চার হাজারের অধিক। নজরুলের গান নজরুল সঙ্গীত নামে পরিচিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বীরঙ্গনারা তাঁর গান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতেন। বীণা দাসও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না।

৮. বীণা দাস, *তদেব,৪র্থ পরিচ্ছেদ,*কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ. ৩৫।

৯. বীণা দাস, *তদেব,৫ম পরিচ্ছেদ,*কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ. ৩৯।

১০. বীণা দাস, *তদেব, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ.পৃ. ৪৪-৪৫।

১১. বীণা দাস, *তদেব, ২৩ পরিচ্ছেদ,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ.১২৭।

নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকধর্মের অবক্ষয় : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

প্রদীপ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কৃষ্ণনাথ কলেজ

সারসংক্ষেপ : অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের সমাজের প্রধান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতীবাদ জানিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল প্রায় শতাধিক লোকধর্ম। কিন্তু বর্তমানের হাতেগোনা কয়েকটি বাদের সকলেই আজ লুপ্ত। দেশভাগ বাংলার লোকধর্মের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। লোকধর্মের স্রষ্টারা ছিলেন সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর। বর্তমানে এই লোকধর্মের প্রতি এই বঞ্চিত শ্রেণীর আগ্রহ লক্ষ্য করা জায় না। লোকধর্মের অবক্ষয়ের আর একটি কারণ হল সমাজের উপর তলার মানুষের বিরোধিতা ও অবহেলা। এছাড়া অনেক সময় এদের উপর নেমে এসেছে নানা শারীরিক অথ্যাচার। সামগ্রিকভাবে এই সকল কারণে বাংলার লোকধর্ম আজ বিপন্ন। সাহেবধনী, বাউল, মতুয়া সম্প্রদায় এখনও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও পরিবর্তন ঘটেছে তাদের সাধন পদ্ধিতি ও রীতিনীতিতে।
সূচক শব্দ : লোকধর্ম, নেতিবাচক, বঞ্চিত, সাহেবধনী, বাউল, মতুয়া।

মূল আলচনা :

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে চৈতন্য ভক্তি আন্দোলন ও সুফীবাদের প্রভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটে। যেগুলি লোকধর্ম, গৌণধর্ম নামে পরিচিত। নতুন গড়ে ওঠা এই ধর্মমত ছিল প্রান্তিক মানুষের প্রাণের ধর্ম। লোকধর্মে না ছিল শাস্ত্রীয় ধর্মের মত কোন বাঁধাধরা নিয়ম নীতি, না ছিল উচু নিচু ভেদাভেদ। এখানে মানুষ তাদের মনের আবেগ নির্দ্বিধায় ব্যাক্ত করতে পেরেছিল। তাই প্রান্তিক সমাজে লোকধর্মের এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষ প্রভাব বিভিন্ন গ্রন্থে এই লোকধর্মের যে তালিকা পাওয়া যায় তার তালিকা বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। *বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়* গ্রন্থে বর্ণিত সেই তালিকা এইরকম- বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধ্বিনীপন্থি, সহজিয়া, খুশীবিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রামসাধনীয়া, জগবন্ধু ভজনিয়া, দাদুপন্থি, রায়দাসী, সেনাপন্থি, রামসহেনি, মীরাবাঈ, বিথুলভক্ত, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়িক, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতী, গোবরই, পাগলাপন্থি, তিলকদাসী, দর্পনারায়ানী, বড়ী, অতিবড়ী, রাধাবল্লভী, সখিভাবুকী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, সাধনপন্থি, চুড়াপন্থী, কুরাপন্থি, বৈরাগী, নাগা, আখড়া, দুয়ারা, কামধেনী, মুকুটধারী, সংযোগী, বার সম্প্রদায়কা ভাঁট, মহাপুরুষী ধর্মসম্প্রদায়ী, জগমোহনী, হরিবোলা,

রাতভিখারী, বিন্দুধারী, অনন্তকুলি, সৎকুলি, যোগী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, পন্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, চামারবৈষ্ণব, হরিব্যাসী, আপাপন্থী, সৎনামি, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, অহামদপন্থি, বীজমার্গী, অবধূতী, ভিঙ্গল, মানভাবী, কিশোরীভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব, জোন্নী, নরেশপন্থি, দশামার্গী, পাঙ্গুল, বৈউড়দাসী, ফকিরদাসী, কুম্ভপাতিওয়া, খোজা, গৌরবাদী, বামে কৌপীন, কপীন্দ্র পরিবার, কৌপীনছাড়া, চুড়াধারী, কবিরপন্থি, খাকী ও মুকুলদাসী।'[১]

চৈতন্যোত্তর যুগের বাংলায় যে বৈচিত্র্যময় লোকধর্ম গোষ্ঠী সমাজের মূলস্রোতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বভিন্ন রীতিনীতির রিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোকধর্ম অনুসারী গোষ্ঠী যেমন- বাউল, কর্তাভজা, বলরামী, সাহেবধনী,মতুয়া সম্প্রদায় বিশ শতকেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সফল হলেও বর্তমানে এদের অস্তিত্ব বিপন্ন।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী ১৯৭০ এর দশকে যখন বাংলার লোকধর্ম সমন্ধে অনুসন্ধান করেন তখনই এদের অস্তিত্বের সঙ্কট লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলাহাড়ি ও সাহেবধনী সম্প্রদায় সম্পর্কে ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে লেখেন বলাহাড়ি সম্প্রদায় ও তাদের গান এবং সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান। তিনি নদিয়ার নিশ্চিন্তপুরে হাড়িরামের শিষ্যদের যে তালিকা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এখন আর কেউ জীবিত নেই। আর নতুন প্রজন্মের কেউ হাড়ি সম্প্রদায়ে ভূক্ত হওয়ার প্রবণতা নেই। নিশ্চিন্তপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বলাহাড়ি সম্প্রদায় এর একটি পরিবারও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন প্রশ্ন হল এই রকম একটি সম্প্রদায় যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষ মাথা উঁচু করে ধর্মাচারণের অধিকার লাভ করেছিল তারা আজ কেন বিলুপ্ত? নিশ্চিন্তপুরে টিকে আছে শুধু হাড়িরামের খড়ম, মৃত বেলগাছ আর নতুন আশ্রম, সেখানে হাড়িরামের কোন শিষ্য এর দেখা মেলে না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন।

দেশবিভাগ হাড়ি সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। দেশভাগের ফলে হাড়িদের প্রধান কেন্দ্র নিশ্চিন্তপুর চলে যায় পূর্বপাকিস্তানের মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রধান কেন্দ্র থাকে ভারতের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে এই বিভাজনের ফলে নিশ্চিন্তপুরের হাড়ি সম্প্রদায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া পরিসংখ্যানে দেখা যায় ধারাবাহিক ভাবে এই জেলায় হাড়িদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। একটি তালিকা দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক-

সাল	হাড়িদের সংখ্যা
১৮৭২	৪,১১৩ জন

১৮৮১	৬,৪১৫ জন
১৮৯১	....
১৯০১	৫,০৬৯ জন
১৯১১	৪,০৩৫ জন
১৯২১	৩,৭২৯ জন
১৯৩১	৩,২৮০ জন
১৯৪১	২,২৬০ জন
১৯৫১	১,৮৪৯ জন

(Mitra, A, The Tribes and Castes of West Bengal, West Bengal Press, Alipur, 1953, p-101)

অষ্টাদশ শতকে ভারতে জাতি, রাষ্ট্রের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সমাজ নানা জাতি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করতেন সমাজে কিছু উচ্চ শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তি। নিচুতলার মানুষের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিলনা। এই পরিস্থিতিতে বলরাম নিচু শ্রেণির মানুষকে বাঁচার পথ দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতে জাতি রাষ্ট্রের ধরণা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে এবং সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কমে আসে। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে সমাজে সকলের সমান অধিকারের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি স্বাধীনভাবে যে কোন ধর্ম পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আর এই কারণে সমাজের গৌণধর্মগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে আর প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীতা কমে এসেছিলো।

যে কোন ধর্ম প্রসারের জন্য প্রয়োজন হয় শাসক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রচার। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ে কোন উচ্চ শ্রেনির মানুষ নেই। কোন প্রভাবশালী বা শাসক এই ধর্ম গ্রহণ বা সমর্থন করেনি। বরং সমাজের উচ্চশ্রেণি, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। “Aristocratic Brahmanism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity.”[২] এই প্রবল বিরোধিতা বলাহাড়িদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এছাড়া নিশ্চিন্তপুরের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন চোখে পরার মত। কৃষির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়েছে। সে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। কিন্তু বলাহাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সমাজের উচ্চশ্রেণির কাছে সে অবহেলিতও। তাই নতুন প্রজন্ম বলরামকে ভক্তি করলে এই ধর্ম আর নতুন করে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না। আর হাড়িরামের কোন সন্তান ছিল না। তাই বংশ পরম্পরায় এই মত ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কর্তাভজা বা সাহেবধনী সম্প্রদায় আজও টিকে থাকার একটি কারণ হল তাদের বংশের উত্তরাধিকারীদের উপস্থিতি। এই উত্তরাধিকারদের কেন্দ্র করে মানুষ

আজও মানুষ সমবেত হয়। বর্তমানে বলরাম তাই টিকে আছেন নিশ্চিন্তপুরের মানুষের মনে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস হাড়িরাম এখনও তাদের রক্ষা করছেন। তাঁর মহিমা লোক মুখে প্রচলিত। আর হাড়িরাম এই ভাবেই সকলের মধ্যে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন।

এছাড়া লৌকিকধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় অন্ত্যজ জাতির ভিড় করার কারণ ছিল উচ্চবর্ণের অত্যাচার। আজ সেই অত্যাচার নেই। আজ ব্রাহ্মণ, শুদ্র, উচ্চ-নিচু সকলেই এক হয়ে গেছে। ধর্মীয় পীড়ন, শোষণ অন্ত্যজ জাতির উপর কোন ধর্মই করে না। বর্তমানে প্রতিটি ধর্মের উৎসব অনুষ্ঠান সকল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সাড়ম্বরে পালন করে থাকে। জাতপাত নিয়ে উচ্চ সমাজের মানুষ আজ আর তেমন ব্যস্ত নন। আধুনিক শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের মনে ক্ষুদ্র জাতিধর্ম জাতধর্মের। বেড়াজাল ছিন্ন হয়ে সেখানে সাম্যভাব জাগরিত হয়েছে। প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে হৃদয়ের আকর্ষণে সকলেই আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। ফলে গৌণধর্মের প্রতি আকর্ষণ অন্ত্যজ জাতির মধ্যে তেমন সাড়া জাগায় না। এখন তারা শুধুমাত্র উৎসবের আনন্দেই, ভক্তির টান তত প্রবল নয়।

কালের চক্রে সাহেবধনী সম্প্রদায় নিজেদেরকে কতটা সজীব রাখতে পারবে তা ভাবার বিষয়। তবে সম্প্রদায়ের দু'জন মরমী সাধক শিল্পী কুবির গোসাঁই ও তাঁর শিষ্য যাদু-বিন্দুর গান অক্ষয় হয়ে থাকবে গানের ভাষা উপমা চিত্রকল্পের জন্য। এসব গান বাঁচিয়ে রাখতেই হবে কারণ এগুলো শুধু ধর্মীয় সাধন রীতিকেই প্রকাশ করেনি, প্রকাশ করেছে এই ধর্মের উদ্ভবের সময়কালের সামাজিক জীবনযাত্রাকে। গানগুলোর মাঝে আমরা সামাজিক জীবনযাত্রার নানা ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজে পেতে পারি। মানুষের চেতনাহীন জীবনে গানগুলো একদিকে যেমন চেতনার সঞ্চার করবে, অপরদিকে নতুন করে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা যোগাবে। তাই প্রায় অবলুপ্তির পথে সাহেবধনী সম্প্রদায় এগিয়ে গেলেও এই গানগুলো হয়তো এ সম্প্রদায়কে আবার তার হৃত গৌবর ফিরিয়ে দিতে পারে।

মুর্শিদাবাদে এত সংখ্যক বাউল থাকতেও তারা আজ রয়েছে সংকটময় অবস্থায় এবং তাদের কোন খ্যাতি নেই। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, "আমার বিচারে মুর্শিদাবাদ জেলা বাউল ফকিরদের বৈচিত্র্যে, গুরুত্বে এবং চলমানতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বলে 'living tradition' তার সবচেয়ে উজ্জ্বল নমুনা, কিন্তু তাদের খ্যাতি নেই লোকসমাজে বা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসে। কারণ জেলাটি কলকাতা থেকে অনেক দূরে, ইসলামিক ঐতিহ্যের কারণে হিন্দু এলিটিস্টদের পক্ষে খুব রোচক নয় এবং সেখানকার গায়করা পূর্ণদাসের মতো বিদেশ দাঁপিয়ে আন্তর্জাতিক জয়জয়কার লাভ করেনি।"[৩]

বিশ শতকের শেষের দিকের বাউলদের সাথে একবিংশ শতকের গোরার দিকের বাউলদের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেছে- "যে-বর্গের সাধক গুরু আর ফকিরদের তখন সঙ্গ করেছি

এখন তাঁরা বিরল প্রজাতি, না হয় অদৃশ্য।"[৪] বাউলদের এই অবস্থার পিছনে রয়েছে নানা কারণ। বাউল আখড়াগুলি গড়ে উঠেছিল কোন গ্রামের নির্জন স্থানে, লোকচক্ষুর অগোচরে যেখানে সাধারণ মানুষের আনাগোনা নেই। বাউল সাধনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের দরকার হয়। বর্তমানে এই পরিবেশের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই গবেষক আহমেদ মিনহাজ লিখেছেন, এ যুগ বাউল হবার উপযোগী নয়। জীবনধারণের সমস্যা এত কঠিন হয়ে গেছে, বাউলরাই আজকাল বাউল হতে চান না। গ্রামগুলোতে অভাব দিন দিন বাড়ছে, নগরে বাবুয়ানা ঢুকে পড়েছে, কে আর গভীর মন নিয়ে বাউলের গান শুনবে, বাউলকে গ্রাসচ্ছাদনের সুরাহাটুক করে দেবে। এখনো যারা বাউল আছেন তারা আগের মতো গুহ্য শাস্ত্রের চর্চা করে না....।[৫] একথা অস্বীকার উপায় নেই যে বর্তমানের যান্ত্রিক সভ্যতা গ্রামগুলির পরিবেশকে নষ্ট করেছে। আর এই নতুন পরিবেশ আদর্শ বাউলের পক্ষে অনেকটাই ক্ষতিকর।শিক্ষিত ভদ্র সমাজ কখনই বাউলদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিল না। বাউলদের 'চারচন্দ্র ভেদ' ভদ্র সমাজের কাছে ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময়য় বাউলদেরকে 'মুতখেকো' বলা হয়েছে। তাদের সাধনাকে 'কদর্য' 'বীভৎস' 'জঘন্য' বলে নিন্দা করা হয়েছে।[৬] তবে বাউলদের এই সাধন কৌশল আমাদের শিক্ষিত মানুষের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। এর জন্য বাউল সাধনার গভীরে প্রবেশ করা দরকার। *বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ* গ্রন্থে বলা হয়ে, বীর্য পানরত পুরুষ নিজের বীর্য দ্বারাই শরীরে এন্টিবডি উৎপন্ন করে এবং তাতে শুক্রাণু উৎপাদন অল্প হয়। তাই দেখা যায় বাউলদের সন্তান সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। 'চারচন্দ্র ভেদ'-এর পেছনে বাউলদের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন শিক্ষিত ভদ্র সমাজ বিষয়টি ভালো ভাবে না নেওয়ায় বাউলরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

বাউল সমাজের বেশ কিছু পরিবর্তন তাদের পূর্বের বিশুদ্ধ অবস্থা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখনাকার বাউল হয়ে উঠেছে প্রফেশনাল। এই প্রফেশনাল বাউলদের সম্পর্কে অধ্যাপক আদিত্য মুখোপাধ্যায় হতাশ হয়ে লিখেছেন, 'বাউল' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মনের ক্যানভাসে একটি উদাসীন মানুষের ছবি ভেসে ওঠে- গেরুয়া পোষাক, ধম্মিল করে বাঁধা চুল, বগলে গাবগুবি বা আনন্দ লহরীর চোরা সুর। কিন্তু যত দিন যায়, বাউলের পোষাকেও বদল হয়। কেঁদুলির মেলায় গেলে এ সত্যটি সুন্দর ধরা পড়ে। পবন দাস এখন জিনস্ ব্যবহার করে বেশি, নিতাই দাস প্যান্ট-শার্ট পরে, নক্ষত্র দাস, বিপদতারণ দাস, কার্তিক দাস সবাই সাধারণ মানুষের মতো থাকে। গৌর আর সে গৌর নেই, বিশ্বনাথ দাস মারুতি কেনার নেশায় মগ্ন, আনন্দ দাস ভারতে গান গাইতে পছন্দ করে না। ... আবার একজন বিদিশীনির সঙ্গ না করলে এই সময়ের বাউলের মনও ভরে না, সঠিক অর্থে বাউল জীবন বৃথা হয়ে যায়।[৭] তবে মুর্শিদাবাদে এখনও অনেক বাউল আছে যারা সৎভাবে জীবন যাপন করে, দরিদ্র, ভক্ত প্রাণ এবং বাউল পন্থাকে মন থেকে মেনে নিয়েছে।

দিন দিন বাউলদের শিষ্য সংখ্যা কম হবার আর একটি কারণ হল বাউল সাধনায় সফল শিষ্যের সংখ্যা অনেক কম। বাউল সাধনার সবকটি স্তর অতিক্রম করে সাধকের সন্মান লাভ করে অল্পকিছু শিষ্যই। অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন, রামানন্দ গোঁসাইয়ের পনেরো জন শিষ্যের মধ্যে মাত্র একজন সাধকের সন্মান লাভ করেছে।[৮] আবার সকলেই যে সাধক হবার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করে এমন নয়। অনেকেই আসে সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার তাগিদে। আবার অনেকে আসে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লোভে।

এই সব কারণের জন্য মুর্শিদাবাদের দিন দিন যে বাউলের সংখ্যা কমে এসেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর নতুন করে এই পন্থা গ্রহণ করার আগ্রহও লক্ষ্য তেমন করা যায় না। এছাড়া মুর্শিদাবাদের বাউলদের উপরের রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা'র *বাউল ফকির ধ্বংসের ইতিবৃত্ত* নামক গ্রন্থে। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাউল ফকীরদের ওপর অত্যাচারের যে তালিকা তৈরি করেছেন তা থেকে এই জেলার বাউলদের দুর্দশার একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই তালিকাটি কয়েকটি বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল-

অত্যাচারিত	ঠিকানা	সময়	অত্যাচারী	অত্যাচারের প্রকৃতি
তাজ মল্লিক, আলী বকস, নজরুল, অম্বিয়া বিবি	হরিশপুর হরিহরপাড়া মুর্শিদাবাদ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭৩	কামালুদ্দীন ও অন্যান্য	মার, জোর করে তৌবা কোরান, চুল কাটা, নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা
ইব্রাহিম ফকির, কাদের ফকির	দুর্গাপুর আমতলা, নওদা, মুর্শিদাবাদ	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭৩	সাধু হাজী, গোলাম মূর্তাজা ও অন্যান্য	বলপূর্বক চুল কাটা, তৌবা কোরান, চুল কাটা, নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা, গ্রাম ত্যাগে বাধ্য করা
নৈমুদ্দিন	নারায়ণপুর করিমপুর, নদিয়া	ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭৩	গ্রামের ধর্মান্ধ	নির্যাতন ও বয়কট
সোলোমান শেখ ও অন্যান্য	রামপুর কুঠি, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ	১৮.৯.১৯৭৯	সাদের আলী, নাসিমুদ্দীন, সৈয়দ জায়দুল খাঁ, মুস্তাক শেখ	মারা, চুল কাটে আশ্রম ভেঙ্গে গ্রাম থেকে বহিস্কার
আবদুল লতিপ শেখ	দুর্লভপুর, নওদা, মুর্শিদাবাদ	১২.৪.১৯৮৪	ফাজিল মৌলবী, মানোয়ার ও সাত্তার বিশ্বাস	বোনের মাথা ফাটানো, গান করার জন্য বর্শা দিয়ে মাটিতে গেঁথে রাখা

আলী, সোলেমান শেখ, আব্দুর রহিম	গোপীনাথপুর বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ	১৬.৭.১৯৮৫	হজরত শেখ, সিরাজ হাজী, নজরুল	আশ্রম পুড়িয়া দেওয়া, গালি
রুস্তম, আকশেদ, সাদের	কুচাইডাঙ্গা, করিমপুর, নদিয়া	১১.১১.১৯৮৭	জালালউদ্দীন, হাসানুজ্জাম ও অন্যান্য	সাধুসভা বন্ধ, মাঠবন্ধ, গানবন্ধ, বয়ক, গ্রামছাড়া, বাড়ি ভাঙ্গা, প্রহার, ফসল চুরি
নূজলাম হক ও তার স্ত্রী	ঝাউবোন, নওদা, মুর্শিদাবাদ	২৩.২.১৯৯৫	কালাম ও তমাল মালিত্যা	ফকীরের ঝোলা কেরে নিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া

(ঝা শাক্তিনাথ, *বাউল ফকির ধ্বংসের ইতিবৃত্ত,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ. পৃ. ৩৯-৪৪।)

তিনি মুর্শিদাবাদের যে ২১৮টি পরিবারের ওপর সমীক্ষা করেছিলেন তাদের মধ্যে ১৩৪টি পরিবার কোন না কোন সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারিত হয়েছে।[৯] আবুল আহসান চৌধুরী বাউল নিগ্রহের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল বাউলদের প্রভাবের ফলে শাস্ত্রশাসিত ধর্মানুরাগীদের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি আর এর ফলে মোল্লা, মৌলবি, পুরোহিতদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কমে যাওয়া।[১০]

অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা লিখেছেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় নূতন উদ্যমে বাউল দমন শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। ফেব্রুয়ারি মাসে নওদা থানার মুসলিম লীগ এম.এম.এ নাসিরুদ্দিন খাঁ (মন্টু খাঁ) মুসলমান সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বাউলদের উপর অত্যাচার শুরু করে। বর্ধমান জেলার গোলাম মুর্তাজা, নদিয়ার আলতাফ মৌলবি এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে বাউল ধ্বংসের পরিকল্পনা করে।[১১] মন্টু খাঁ ও মৌলবিদের নেতৃত্বে বাউল ধ্বংসের জন্য গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। হরিহরপাড়া, নওদা জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় বাউল নিধন। তৎকালীন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক বাউলদের উপর এই নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে অবগত হন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেন। হরিহরপাড়া নওদা থানায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। বাউলদের উপর হামলাকারী ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত আসামীরা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা ভবিষ্যতে বাউলদের উপর কোন অত্যাচার করবে না। এই শর্তে হামলাকারীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার হয়।[১২]

যদিও এর পরেও মুর্শিদাবাদের বাউলদের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়নি। ভগবানগোলার রামপুর গ্রামে, হরিহরপাড়ার স্বরূপপুর, বহরমপুরের ছয়ঘরি প্রভৃতি স্থানে নানা সময়ে বাউলদের উপর হামলা হয়েছে। এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাউল ফকিররা গড়ে তুলল 'বাউল-ফকির সংঘ'। অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা এই

সংঘের সভাপতি হন। তিনি আলোচনা সভা বা সংবাদপত্রে তুলে ধরেন এই জেলায় বাউলদের উপর অত্যাচারের বিবরণ। 'আজকাল' পত্রিকায় ২১/৪/১৯৮৪, 'বর্তমান' পত্রিকায় ২৪/৩/১৯৯৪, 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' ২৪/৫/১৯৯৫ এবং ২৫/৫/১৯৯৫, 'প্রতিদিন' পত্রিকায় ২৪/৭/১৯৯৬-এ বাউলদের উপর নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশিত হয়।[১৩] এর ফলে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষ বাউলদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ বাউলদের উৎসাহ দান ও তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেছে। তবে সামগ্রিকভাবে মুর্শিদাবাদের বাউলরা এখনও দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করে চলেছে। এই অবস্থায় এর কতদিন বাউলরা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে তা নিশ্চিত করা বলা মুশকিল।

দেখা যাচ্ছে একদা প্রবল প্রতিবাদী আন্দোলন হিসেবে গড়ে ওঠা লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির আজ বিলুপ্ত। যে হাতে গোনা কয়েকটি সম্প্রদায় টিকে আছে তাদেরও পরিবর্তন ঘটেছে ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সাধন পদ্ধিতে। নদিয়ার নিশ্চিন্তপুরে বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের কোন শিষ্য আজ আর দেখা জায় না। বলরাম- তনু প্রতিষ্ঠিত আশ্রম এর যায়গায় গড়ে উঠেছে নতুন আশ্রম। বলরাম প্রতিষ্ঠিত বেলগাছটি আজ মৃত। এই বেলগাছটির জরাজীর্ণ অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে এই অঞ্চলে বলাহাড়িদের অবস্থা।

একিভাবে বৃত্তিহুদা গ্রামে সাহেবধনীরা টিকে আছে হাতেগোনা কিছু শিষ্য নিয়ে। এই গ্রামে পাল বংশধরদের মধ্যে নবকুমার পাল ও হেমন্ত পালের পরিবার বসবাস করেন। হেমন্ত পালই আশ্রম দেখাশোনা ও দীনদয়ালের সেবা করেন। তার পুত্র সঞ্জয় পাল বর্তমানে শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে যুক্ত এবং সাহেবধনী সম্পর্কে তার বিশেষ কোন আগ্রহ নেই। তার কাছে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তার স্পষ্ট উত্তর, "আমি এসব কিছু জানি না, বাবা জানে।"[১৪] এই গ্রামেই অবস্তিত সাহেবধনীদের তাত্ত্বিক নেতা এবং এই সম্প্রদায়ের প্রধান গানের রচিয়াতা কুবির গোঁসাইয়ের সমাধি। বর্তমানের এই স্থানে বসবাস করেন কুবিরের পোষ্যোপুত্র কৃষ্ণদাস বৈরাগ্যের বংশধর নবকুমার বৈরাগ্য ও তার পুত্র প্রসেনজিত। নবকুমার বৈরাগ্য জানিয়েছেন, দিন দিন শিষ্য সংখ্যা কমে যাওয়ায় লোপ পেয়েছে পূর্বের গৌরব।[১৫]

বলাহাড়ি ও সাহেবধনীদের তুলনায় কর্তাভজাদের অবস্থা কিছুটা ভালো। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ হল বংশ পরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের প্রচেষ্টা এবং এই সম্প্রদায়ে শিক্ষিত মানুষ থাকায় তারা এই সম্প্রদায়ের প্রচারে নানা উদ্যোগ নিতেপেরেছিল। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা দুলাল চাঁদের সময় কর্তাভজাদের জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি ১৮৯৭ সালের শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলেনে আমিন্ত্রিত হয়েছিলেন। যদিও এই আমন্ত্রণ আসার আগেই তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন। তবে বর্তমানে এদের সদস্য সংখ্যাও কমে এসেছে। সম্পত্তি নিয়ে

দেখা দিয়েছে পরিবারে ভাঙ্গন। রামশরণ পালের বংশধরা আজ আর ঘোষপাড়ায় বসবাস করেন না। আর বেশিদিন যে তারা নিজেদেরকে সজীব রাখতে পারবে না তা প্রায় নিশ্চিত।

তুলনামূলক ভাবে মতুয়ার অনেকটাই সজীব। নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এদের আধিক্য দেখা যায়। নমঃশূদ্র সম্প্রদায় মতুয়া ছত্রছায়ায় এসে একত্রিত হয়েছে এবং এই একতাই হয়ে উঠছে তাদের শক্তি। এই শক্তির ওপর ভর করে তারা যোগদান করেছিল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান একদিকে যেমন তাদের সুযোগ করে দিয়েছিল কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ে আবার এই রাজনীতিই এই সম্প্রদায়ে ভাঙন ঘটিয়েছে। অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, ২০১১ সাল পর্যন্ত মতুয়া সম্প্রদায় জোটবদ্ধ ছিল ফলে তাদের শক্তিয় বেশি ছিল। কিন্ত ২০১১ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরে।

লোক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এই চরিত্র বদলের প্রধান কারণ হল আর্থ-সামাজিক-সানাস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন। বাউল বা মতুয়া সম্প্রদায় সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও সাধন পদ্ধিতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তাই তার এখনও টিকে আছে। কিন্তু বলাহাড়ি, সাহেবধনী বা কর্তাভজা সম্প্রদায় আর্থ- সামাজিক পরিবর্তনর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে আমূল পরিবর্ত করে নিতে পারিনি। তাই তারা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

তথ্যসূত্র:

১। গোস্বামী শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র, *বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয় ব্যবস্থা ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রথম খণ্ড*, কলকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ.পৃ. ৫১-৫২।

২। ভট্টাচার্য যোগেন্দ্রনাথ, *হিন্দু কাস্ট অ্যান্ড সেক্তস*, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোঃ, কলকাতা, ১৮৯৬, পৃ. ৪৮৩।

৩। চক্রবর্তী সুধীর, *বাউল ফকির কথা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০1৪, পৃ. ৩১।

৪। তদেব, পৃ. ৩৭।

৫। তদেব, পৃ. ৬৯।

৬। তদেব,পৃ.৭৯।

৭। মুখোপাধ্যায় আদিত্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল*, শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ২৩২।

৮। চক্রবর্তী সুধীর, *বাউল ফকির কথা*, আনন্দ, কলকাতা, ২০1৪, পৃ. ১২৫।

৯। ঝা শাক্তিনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৮২।

১০। হোসেন মোবারক খান, *লালন সমগ্র*, গীতাঞ্জলি, বাংলাবাজার ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫৬।

১১। ঝা শাক্তিনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

১২। তদেব, পৃ. ২৭৮।

১৩। তদেব, পৃ. ২৮৫।

১৪। সাক্ষাৎকার : নাম- সঞ্জয় পাল বয়স- ৩৯ (আনু.), পেশা-শিক্ষক ঠিকানা- বৃত্তিহুদা গ্রাম, নদীয়া। তারিখ- ১০.০৩.২০১৯ । সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- প্রদীপ মণ্ডল, স্থান- বৃত্তিহুদা গ্রাম।

১৫। সাক্ষাৎকার : নাম- নবকুমার বৈরাগ্য বয়স- ৪৮ (আনু.), পেশা-কৃষক, ঠিকানা- বৃত্তিহুদা গ্রাম, নদীয়া। তারিখ- ০২.০১.২০২০ । সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- প্রদীপ মণ্ডল, স্থান- বৃত্তিহুদা গ্রাম।

লিঙ্গ বৈষম্য : সমাজের মূলস্রোতে তার প্রভাব

মুনমুন দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
হাজী এ. কে. খান কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

সারসংক্ষেপ : পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় নারী ও পুরুষের মধ্যে যে লিঙ্গ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, তা সমাজ নির্মিত। এই লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাটি পরিবার, শিক্ষা, কর্মজগৎ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে লালিত হয়। এই লিঙ্গবৈষম্যের ফলে কন্যাভ্রূণ হত্যা থেকে শুরু করে, নারী পাচার, শিশুশ্রমিক প্রভৃতি কুফলগুলি নারী এবং সর্বোপরি সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এই কুফলগুলির বিরুদ্ধে সার্বিক সচেতনতা ব্যতীত আইন প্রণয়ন নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র। সার্বিক সচেতনতার জন্য নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং নিজ নিজ সৃজনশীলতার স্বাধীন প্রকাশ আবশ্যক। তাহলেই একটি সমাজ উন্নয়নশীল সমাজে উন্নীত হওয়ার অধিকারী হবে।
সূচকশব্দ : লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষায় বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিজ্ঞাপন ও চলচিত্রে বৈষম্য, নারী পাচার, শিশু শ্রমিক, ইত্যাদি।

মূল আলোচনা :

'One is not born, but rather becomes, a woman.'১

সিমোন দ্য বোভোয়া যথার্থই বলেছিলেন, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে। নারী হয়ে ওঠার বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোকেই নির্দেশ করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই কিছু জৈবিক পার্থক্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে শুধু নারী এবং পুরুষের মধ্যেই নয়, দুজন নারী অথবা দুজন পুরুষের মধ্যেও জন্মগত এই জৈবিক পার্থক্য বিদ্যমান। নারী ও পুরুষের অথবা দুজন নারীর অথবা দুজন পুরুষের মধ্যে শারীরিক ও ক্রোমোজমের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি মানবসত্তার যে পরিচয় সূচিত হয়, তাকে যৌন পরিচয় (Sex Identity) বলে। সুতরাং নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মসূত্রে যে জৈবিক বৃত্তির প্রকাশ ঘটে, তাকে যৌন পরিচয় বলে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন পরিচয়ের ভিত্তিতে যে পার্থক্য দেখা যায় সেটা শুধু নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রভেদ সৃষ্টি করে তা নয়, সেটা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তি প্রভেদকেও সূচিত করে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ উভয়ের মধ্যে কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যকে গড়ে তুলেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য জনিত কারণে উভয়ের কাছ থেকে বিশেষ কতকগুলি পৃথক পৃথক আচরণ প্রত্যাশা করা হয়। জন্মমুহূর্ত থেকেই একজন কন্যাশিশু

ও একজন পুত্রশিশুকে লালন পালনের মধ্যে দিয়ে আচরণগুলো তাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই আচরণগুলি যথাযথ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একজন কন্যাশিশু নারী হয়ে ওঠে এবং একজন পুত্র শিশু পুরুষ হয়ে ওঠে। নারী ও পুরুষ হয়ে ওঠার মধ্যে কোন জৈবিক পরিচয় কাজ করে না, এখানে কাজ করে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণের অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যাশিত নারী ও পুরুষের পৃথক-পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে উভয়ের যে পরিচয় গড়ে ওঠে তা লিঙ্গ পরিচয় (Gender Identity) নামে পরিচিত। সুতরাং লিঙ্গপরিচয় সমাজ নির্মিত। যেখানে কতকগুলি গুণকে পুরুষালী গুণ বলে চিহ্নিত করে, তার বিপরীত গুণগুলিকে মেয়েলি গুণ রূপে ধার্য করা হয়। নারী ও পুরুষের গুণাবলীর বন্টনের মাধ্যমে পুরুষ ক্ষমতাসম্পন্ন, ইতিবাচক মানবসত্তায় এবং নারী ক্ষমতাহীন, অবলা, নেতিবাচক মানবসত্তায় পরিণত হয়। নারী ও পুরুষের লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা পার্থক্যই লিঙ্গ বৈষম্যকে সূচিত করে। এ প্রসঙ্গে শেফালী মৈত্র বলেন,

> ‘To begin with the gender identity of men and women is characterized by the following binaries : rational / emotional, abstract / concrete, assertive / submissive, agentic / indecisive where the first term of each set characterized man. The binaries are culture specific. What needs to be noted is not the actual content of the binaries but their structure. In each culture of male gender features have greater value than the female gender features.’২

লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় ক্ষমতার নিরিখে নারী একেবারে প্রান্ত দেশে অবস্থিত। ফলে পুরুষ তার ক্ষমতাবলে নারীকে অবদমিত করে রাখে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রধান বা প্রত্যক্ষ কারণ হল লিঙ্গ বৈষম্য। লিঙ্গবৈষম্যের সমস্যাটি সমাজের অনেক গভীর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরিবার বা কর্মক্ষেত্রের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সাথে লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাটি মানুষের চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন - (ক) পরিবার, (খ) শিক্ষা, (গ) কর্মজগৎ, (ঘ) বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্র, প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাকে লালিত করে।

(ক) পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবার হল লিঙ্গ বৈষম্যের পালন ক্ষেত্র। পরিবারের অভ্যন্তরে থেকেই একজন শিশু সন্তানকে লালন-পালনের মাধ্যমে তার মধ্যে সমাজ নির্ধারিত লিঙ্গের ধারণা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ছোট থেকেই একজন কন্যা সন্তান ও একজন পুত্র সন্তানকে পৃথক পৃথক আচরণ অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সমাজ নির্মিত নারী ও পুরুষ করে তোলা হয়। একজন কন্যা সন্তানকে

খেলার সামগ্রী হিসেবে পুতুল, রান্নাবাটি দিয়ে তাকে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করা হয়। অপরদিকে, একজন পুত্র সন্তানকে গাড়ি, ফুটবল প্রভৃতি খেলার সামগ্রী দিয়ে তাকে পুরুষালী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করা হয়। একটু বড় হওয়ার পর থেকেই উভয়কে তাদের পোষাক ও বাইরে ঘোড়ার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ সম্পর্কেও সচেতন করা হয়। একজন ছেলে তার পছন্দ মতন পোশাক পড়তে পারে, তার ইচ্ছামতন বাইরে ঘোরাফেরা করতে পারে। কিন্তু একটি মেয়ের সেই স্বাধীনতা থাকে না। তাকে নিজের পছন্দ নয়, অপরের পছন্দ মতো অর্থাৎ 'পররুচী' পোশাক পড়তে শিখতে হয়। সব সময় বাড়ির বাইরে যাওয়ার বা ঘোরাফেরার অনুমতি থাকে না। এইভাবেই একজন কন্যা সন্তান নিজের ইচ্ছা বা পছন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ নারী হয়ে ওঠে। পরিবারের অভ্যন্তরে পুত্র ও কন্যা সন্তানের এই অসাম্য লালন পালনের প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতের লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাকে লালিত করে। মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাষায়,

> 'জন্মলগ্নে সে জানে না সে নারী না পুরুষ। তারপর প্রতি পদে তাকে টিপ পরিয়ে, ঝুঁটি বেঁধে, পুতুল খেলিয়ে, রান্নাঘাটি ধরিয়ে দিয়ে, বাইরে ঘোরা বন্ধ করে, পা ছড়িয়ে বসলে শ্বশুরবাড়ি দূরে হবে বলে, সরহলুদ মাখিয়ে সামাজিকভাবে তাকে মেয়েলি করে তোলা হয়। তার সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোড অফ কন্ডাক্টের বিধিনিষেধ।। লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা ও বিভাজন আরোপ করে সমাজ।। আচরণে, আলাপচারিতাতে, সাহিত্যে, দর্শনে, গানে, কবিতায়, ঠাট্টায়, পোষাক নির্বাচনে, এই লিঙ্গনির্মাণ চলতে থাকে অনিঃশেষপ্রক্রিয়ার মতো।'৩

(খ) পরিবার হল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাস্থল এবং বিদ্যালয় হল দ্বিতীয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে পরিবারগুলি লিঙ্গ বৈষম্যের যেমন চোরাবালি তৈরি করত, সেই রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়গুলিও পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যে বিদ্যালয় মানুষের চরিত্র গড়ার কাজে নিয়োজিত থাকে, সেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মধ্যেই নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী বীজ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতিতেও নারী ও পুরুষের সাম্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের লেখক বা সম্পাদকরা যে পুরুষতন্ত্রের চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, তারা তাদের পুস্তকগুলি থেকেই বোঝা যায়। পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ছবি, ছড়া, মূল্যবোধ, সচেতনতার ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের সম্পর্কে তেমন কিছু বলা নেই; যা আছে পুত্রশিশুদের জন্য। ছবির মাধ্যমে যখন শিশুদের পশু, পাখি, ফল, ফুল চেনানো হয়েছে; সেখানে সবকিছু খোকার মারফত শেখানো হয়েছে, খুকুর সেখানে কোন ভূমিকা নেই। আবার পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের অষ্টম শ্রেণীর

'লার্নিং ইংলিশ টেপ থ্রি' পাঠ্যপুস্তকে রায় পরিবারের দৃষ্টান্তে সন্তান পালনের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যমূলক পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রায় পরিবারের কন্যা অরুণাকে সেখানে তার নিজের ও ভাই মিহিরের বিছানা করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়ার কাজ করতে হয়। আবার পড়াশোনার কাজের ক্ষেত্রে তাকে তার পিতার সাহায্য নিতে হয়। অথচ রায় পরিবারের পুত্র মিহিরকে তার নিজের কোন কাজই করতে হয় না, শুধু পড়াশোনার কাজটি করে অন্য কারোর সাহায্য ছাড়াই। এই পক্ষপাতের মধ্যে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে মেয়েরা ঘরের কাজে পটু আর ছেলেরা পড়াশোনার কাজে। এইরকম পক্ষপাত থেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ইঙ্গিত করছে যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম।

	বিছানা করা	**কাপড় কাচা**	**বাসনমাজা, ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা**	**হোম ওয়ার্ক**	**দোকান বাজার করা**	**রেশন তোলা**
শ্রীরায়	নিজের বিছানা করা	নিজের কাপড় কাচা	×	অরুণাকে সাহায্য করা	√	√
শ্রীমতী রায়	নিজের বিছানা করা	নিজের কাপড় কাচা	তিনটি কাজ করা	×	×	×
মিহির (ছেলে)	×	×	×	নিজে করা	×	×
অরুণা (মেয়ে)	নিজের ও মিহিরের বিছানা করা	নিজের ও মিহিরের কাপড় কাচা	বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়া	বাপের সাহায্যে করা	×	×

” ৪

(গ) লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। নারী পুরুষের কর্ম জগতের অসাম্যতা লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাকে আরো উৎসাহিত করে। এঙ্গেলস বলেন,

আদিম সমাজে নারী ও পুরুষের কর্মজগৎ ছিল এক। উভয়েই একসাথে জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে যেত। সেই সময় নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের পরিসরের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে যখন পশুপালন ও চাষবাস শুরু হয় তখন থেকে নারী ও পুরুষের কর্মজগতের পরিসরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। চাষবাস শুরু হওয়ার সময় থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদের সূচনা হয়। উদ্বৃত্ত সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারীর কর্মক্ষেত্রের পরিসর গৃহের অভ্যন্তরে স্থির হয়। সেখানে তার কাজ হল গৃহকর্ম সম্পাদন করা এবং প্রজননের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সম্পদের উত্তরাধিকারীকে জন্ম দেওয়া ও লালন পালন করা। এইভাবে নারীকে গৃহবন্দী করে তাকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়। অপরদিকে পুরুষের কর্মজগতের পরিসর হয় বাহ্য জগৎ। যেখানে সে নিজের শ্রমশক্তির বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তার উপার্জিত অর্থের সাহায্যে সংসার চলে এবং নারীকে জীবন অতিবাহিত করার জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। এইভাবে আর্থিক দিক থেকে পুরুষ স্বনির্ভর স্বাধীন সত্তায় পরিণত হয়, আর নারী পরিণত হয় পরনির্ভর পরাধীন সত্তায়। রিনিতা মজুমদার এঙ্গেলসের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলেন,

> "Engels divides human history into savagery, barbarism, and civilization in accordance with the different ways in which human production system changed. During savagery human production was mainly concerned with fruit gathering (early savagery) and fishing (later savagery). During this time several families lived together and property was communally owned; there was no significant social exchange of goods except very small exchanges of tools. Division of labour was a very simple sexual division : man hunted and gathered and the women took care of things belonging to the household."৫

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে নারী দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে কর্মক্ষেত্রের বাধ্যজগতে নিজের একটা স্থান করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সেখানেও পুরুষেরই আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। কর্মক্ষেত্রের বাহ্য জগতে নানা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ কর্মচারীদের তুলনায় নারী কর্মচারীদের পারিশ্রমিক অনেক কম, চাকরিতে পদোন্নতির সুযোগ নারীর খুব একটা থাকে না, নারীকে মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হয় বলে পুরুষ চাকরি প্রার্থীর আবেদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, নারী পুরুষের তুলনায় কম শিক্ষালাভের সুযোগ পায় বলে তাকে পুরুষের থেকে কম দক্ষ বলে ধরে নিয়ে পুরুষের তুলনায় অনুন্নত পদে নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে নারীকে

নানাভাবে যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন হায়রানি বলতে বোঝায়, বিভিন্ন ধরনের খারাপ মন্তব্য, খারাপ আচরণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রভৃতি যা যৌন প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। নারীর প্রতি এই ধরনের নির্যাতন নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য তাকে সুনিশ্চিত করে। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "..."Sexual harassment" is defined as "unwelcome sexual advance, request for sexual favours, and other herbal or physical contact of a sexual nature" that interferes with one's employment or work performance or create a "hostile or offensive work environment" (EEOC, 2011b, Para 1-2). Another definition for sexual harassment is "where any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the propose or effect of violet in the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment" (McGolgan, 2004)."৬

(ঘ) পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের অত্যন্ত লজ্জাজনক ক্ষেত্র হল বিজ্ঞাপন ও চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক জগৎ। বিজ্ঞাপনের জগতে নারী যৌন পণ্যে পরিণত হয়েছে। সাবান, ক্রিম প্রভৃতি প্রসাধনী দ্রব্য থেকে শুরু করে, পোষাক, নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের প্রধান অঙ্গ হল নারী। বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে দিয়ে এটাই ফুটে ওঠে যে, নারীকে হতে হবে সুন্দরী, নিখুঁত, কোমল। নারীকে বিজ্ঞাপনে গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজকর্ম, স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য সুস্বাদু রান্না করে খাওয়ানো, শিশুর স্বাস্থ্য ও আরামের ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি গতানুগতিক ছকে বাঁধা ভূমিকাতেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় রূপে ও গুনে নারীকে পুরুষের কল্পিত মানবী রূপে দেখানো হয় বিজ্ঞাপনে।

বিজ্ঞাপনের মতো চলচ্চিত্রগুলিতেও নারীকে পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গির চাহিদা অনুযায়ী তুলে ধরা হয়। চলচ্চিত্রগুলিতেও নারীকে পুরুষের কাছে আনুগত্য প্রদর্শনে অথবা যৌনবস্তু হিসেবে দেখা যায়। প্রথমটি অর্থাৎ পুরুষের কাছে আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গতানুগতিক চাহিদার মধ্যে পড়ে। অপরদিকে, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ যৌনবস্তু হিসাবে নারী হল পুরুষের মনোরঞ্জনের বিষয়। পুরুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাস্তবে প্রকাশ লাভ করে। বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের মধ্যে এমন একজন নারী কেন্দ্রীয় চরিত্রে থাকে যাকে পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে দেখা যায়; অথবা সেই নারীকে শারীরিক অত্যাচার, ধর্ষণ রূপ যৌন নির্যাতনের

শিকার হতে দেখা যায়; অথবা সেই নারীর শারীরিক সৌন্দর্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে অধিক আকর্ষণীয় করে দেখানো হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> “১৯৭৬ সালে মুক্তি পাওয়া হিন্দি ও গুজরাটি ছবির ভিত্তিতে পাঠকের একটি লেখা থেকে জানা যায় ফিল্মগুলিতে তরুণী, সুন্দরী, যৌন আকর্ষণসম্পন্না মেয়েদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, এবং মেয়েরা সকলেই কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে পরিচিত; মেয়েদের অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, নির্ভরশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভীরু ও অযৌক্তিক জীব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, পুরুষেরা দুমুখো নৈতিক মানদণ্ড ব্যবহার করে, পুরুষের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মুখে মেয়েরা বশ মানে। ইতিবাচক এইটুকুই যে প্রদর্শিত সব মহিলাই শিক্ষিত ও কেউ কেউ আত্মবিশ্বাসী। সেই সময় হিন্দি ছবিতে ভালো মেয়ে খারাপ মেয়ে আলাদা থাকত। সাদা শাড়ি পরা নিষ্পাপ সুন্দর নায়িকা আর খোলা পোশাকের, নীতিহীন, সিগারেট খাওয়া ভ্যাম্প।”৭

নারী ও পুরুষের মধ্যে পরিবার, সমাজ, আইন প্রভৃতির সকল অবস্থানের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য খুব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। আর এই সকল ক্ষেত্রেই নারী সেই বৈষম্যের শিকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূল লক্ষ্যই হল নারীকে সমাজের মূলস্রোত থেকে দূরে রাখা। আর তার জন্য নারীকে বিমুর্ত যুক্তির চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে আবেগ সর্বস্ব জটিল মানসিক স্তরে নিমগ্ন রাখাই সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদ্দেশ্য। তাই উচ্চবৃত্ত থেকে নিম্নবৃত্ত, শ্বেতাঙ্গ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ সকল নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। যে পরিবার কন্যাশিশুর সবথেকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল সেখানেই লিঙ্গবৈষম্যের আঁতুরঘর। যে শিক্ষা সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার সেখানে লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ বপন করা হয়। যে কর্মজগতে নারী অর্ধেক অংশীদার, যেখানে সে নিজেকে স্বাবলম্বী করতে সচেষ্ট, সেখানেই নারীকে নানা নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এমনকি মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রেগুলিতেও, যেমন- বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্রের জগতেও নারী পণ্য। এই প্রকার লিঙ্গবৈষম্যের ফলে নারীর প্রাপ্ত বঞ্চনা ও অবদমনের রূপ খুবই ভয়াবহ। পুরুষের সুবিধার জন্য অথবা আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নারীকে যৌন অত্যাচার, ধর্ষণ, এমনকি মৃত্যুর কোলেও আশ্রয় নিতে হয়। এক্ষেত্রে তথাকথিত কিছু আইন কানুনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে নীতি-নৈতিকতার দোহাই দিয়ে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নেও নারীকেই পরাজয় শিকার করতে হয়। তা না হলে, ধর্ষণের বিধানের ক্ষেত্রে ধর্ষিতাকে ধর্ষককে বিবাহ করার নির্দেশ দেয় এই আইন ব্যবস্থা! এর চেয়ে আর কি বড় দৃষ্টান্ত হতে পারে নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যের ভয়াবহতার। লিঙ্গ বৈষম্যের ফলস্বরূপ কন্যা ভ্রূণহত্যা, পাচার চক্র, শিশু শ্রমিক, প্রভৃতি তীব্র আকার ধারণ করছে।

লিঙ্গে বৈষম্যের ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একাংশ নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করাকেই অভিশাপ বলে মনে করে। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে সন্তান সম্ভবা নারীর ভ্রুণের যৌনপরিচয় জানা যাচ্ছে। সেই ভ্রুণ যদি যৌনপরিচয়ের ভিত্তিতে কন্যা ভ্রুণ নির্ধারিত হয়, তাহলে তাকে জন্মের পূর্বেই মাতৃ গর্ভেই হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। হত্যা বিষয়টি যেমনই হোক না কেন তা আইনত অপরাধ বলেই গণ্য হওয়া উচিত। কারণ প্রত্যেক সত্তারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই অধিকারকে উপেক্ষা করে অবাধে চলে কন্যাভ্রুণ হত্যা। আবার এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পৌঁছায়নি অথবা কোন কারনে ভ্রুণের লিঙ্গনির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, সেখানে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে বিভিন্ন উপায়ে অবলম্বন করে হত্যা করা হয়। এছাড়াও সন্তান বিসর্জনের নামে কন্যাহত্যার প্রথাও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। সন্তান বিসর্জন দেওয়ার বিষয়টি হল একটি মানত প্রথা, যেখানে অধিক সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দেওয়ার পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল। অনেক সময় দেখা গেছে, কোন দম্পতির একাধিক সন্তান লাভের কামনা না থাকলেও তাদের প্রথম সন্তান যদি কন্যা হয়, তাহলে সন্তান বিসর্জনের নামে সেই কন্যা সন্তানকে হত্যা করেছে। লিঙ্গ বৈষম্যের এই করুন পরিণতি প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "প্রধানত কন্যাসন্তান বিসর্জন ছাড়াও সামাজিক কারণে বাংলায় কন্যা হত্যার দৃষ্টান্ত বিরল নয় কোন যুগেই। প্রধানত কন্যার সম্ভ্রম ও বিয়ের নানাবিধ সামাজিক সংকট এড়ানোর জন্য পিতা মাতা এই নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে হত্যা করা হতো বিষ খাইয়ে, মুখে নুন দিয়ে, গলাটিপে, শ্বাসরোধ করে, মাটিতে পুঁতে, পানিতে ডুবিয়ে। বারবার কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্রোধান্ধ পিতা এমনকি পারিবারিক নিগ্রহে জর্জরিত অভিমানী মাতা কন্যা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হত্যা করেছে বিশ শতকের বাংলায় এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে।"[৮]

লিঙ্গ বৈষম্যের অপরাধ মর্মান্তিক ফল হল নারী পাচার। কন্যাভ্রূণ হত্যা ও কন্যা শিশু হত্যার কারণে বেশ কিছু জায়গায় পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ভারতের এই সমস্যার সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ে, উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে। যেখানে নারীর সংখ্যা এতই কমে গেছে যে বহু পুরুষ বিবাহের জন্য কোন মহিলাই পাচ্ছে না। আর তার ফল স্বরূপ জন্ম নিচ্ছে নারী পাচার চক্র। এই নারী পাচার চক্রে কন্যা শিশু অপসারণ করে, কাজের লোভ দেখিয়ে, গরীব মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত জায়গায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা খুব কম, সেখানে পাচারকারীদের কাছ থেকে নারী ক্রয় করে আনা হয় বিবাহের জন্য। তবে নারী পাচারের বিষয়টি যে শুধুমাত্র নারী ক্রয় করে বিবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, তা কিন্তু নয়। নারী পাচারের সাথে আরো যে বিষয়গুলো খুব ঘনিষ্ঠভাবে

যুক্ত, সেগুলি হল - ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজন, পতিতালয়ে বিক্রয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করা, প্রভৃতি। অর্থাৎ নারীর জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই পুরুষের নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। তাই নারী পুরুষের কাছে পণ্য বা ব্যবসায়িক সামগ্রী স্বরূপ। যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য যত বেশি সেখানে নারী পাচার চক্র তত বেশি সক্রিয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "In South Asia, gender biases begin with the birth of a girl child. Starting with aborting girls in the womb, there are biases that do not allow the basic rights of education, healthcare, or speech to women. Due to this patriarchal social system, women are subjugated and oppressed within the family, community, and Society at large. These factors create vulnerability that leaves women with fewer options, if any. As a result, women have been brought and sold. The hypocritical cultures still retain strong taboos concerning women's character and shame those who are forced into prostitution. ... It is clear from demographic analysis that places in South Asia that are source areas where traffickers find girls are also where gender biases are highest."[৯]

লিঙ্গ বৈষম্যের আরো একটি কুফল কন্যা শিশু শ্রমিকের আধিক্য। যদিও শিশু শ্রমিকের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই শোষিত হয়, তা সত্ত্বেও কন্যা শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এখানে ছেলেদের থেকে একটু বেশিই থাকে। কারণ কন্যা শিশুরা পরিবারের মধ্যেই প্রান্তিয় স্থানে থাকে। অভাবের সংসারে কন্যা শিশুকে নিজের বাড়ির গৃহশ্রমের সাথে সাথে বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজে নিয়োগ করা হয়। আবার পাচার চক্রের মধ্যে দিয়ে ক্রয় করা অনেক কন্যা শিশুই শিশু শ্রমিকে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে অনেক কন্যা শিশুকেই তার বয়স উপযোগী কাজের চেয়ে অনেক কঠিন কাজও করতে হয়। অনেক কন্যা শিশুই ইঁটভাটাতে ইঁট তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। সেখানে প্রখর গ্রীষ্মেও আগুনের তাপের মধ্যে তাদেরকে সামান্য পারিশ্রমিক অথবা শুধু দুবেলা খাবারের বিনিময়ে কাজ করতে হয়। একটি কন্যা শিশুর যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে ওঠার সময় তখন তাকে ক্রীতদাসের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। গ্রামাঞ্চলের কৃষি কাজ থেকে শুরু করে, গবাদি পশুচারণ, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, দূর অঞ্চল থেকে জল নিয়ে আসা, এবং শহরাঞ্চলে কল-কারখানা, দোকান, ফেরিওয়ালা, গৃহভৃত্য, পতিতাবৃত্তি, প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকে এই কন্যা শিশু শ্রমিকেরা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ছেলে শিশু শ্রমিকের চেয়ে কন্যা শিশু শ্রমিককে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করা হয় বলে কন্যা শিশু শ্রমিকেরই চাহিদা বেশি থাকে। পরিবারে আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পেই হোক, অথবা পাচার চক্রের

কাছ থেকে ক্রয় করে আনা ক্রীতদাসই হোক - উভয় ক্ষেত্রেই এটি নিকৃষ্ট ও বর্বরসুলভ আচরণ। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "Gender discrimination also effects the occupations that male and female child labours are involved in. Gender discrimination is any exclusion on distinction based on sex or gender that leads to an inequality of opportunity or treatment. Such discrimination can be direct or indirect. ...Some examples are as follows:
>
> Direct discrimination: Studies have found that, on average, girls are paid less than boys for doing the same job.
>
> Indirect discrimination: In many cultures, boys are valued more than girls, who are socialized to a lower status. Parents (parents in particular) may invest more in their son's education then their daughters', and girls are often pulled out of school at an earlier age than boys."১০

নারীর প্রতি হওয়া নির্যাতন ও বঞ্চনার রুখতে বিভিন্ন সময়ে নানা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু সেই আইনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পরিকাঠামোয় পুরুষ কর্তৃক রচিত, তাই তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। কারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা না আনতে পারলে আইন কখনও কার্যকর হতে পারে না। এই সচেতনতা গড়ে তুলতে নারী ও পুরুষ উভয়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীকে শিক্ষা লাভ করে যেমন অন্তরের অন্ধকার দূর করতে হবে, তেমনি বাহির জগতের অর্থনীতিতে পুরুষের সমান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আপরদিকে, পুরুষকেও নারীর অধিকারগুলি ফিরে পেতে সমানভাবে উদ্যোগী হতে হবে। কারণ নারী হল সমাজের অর্ধেক অঙ্গ। সেখানে যদি লিঙ্গবৈষম্য দূর করা না যায়, তাহলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি বা অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সমাজের অর্ধ অঙ্গ রূপে পুরুষ কখনোই একক ভাবে সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটাতে সক্ষম নয়। আর সমাজের সার্বিক উন্নতি ব্যতীত পুরুষও সম্পূর্ণ উন্নয়নশীল সমাজের সুফল ভোগ করতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং শুধুমাত্র নারীর স্বার্থে নয়, পুরুষের স্বার্থেও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে লিঙ্গ সমতা বাঞ্ছনীয়। লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে নারী এবং পুরুষ সমভাবে নিজ নিজ সমানাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে এবং নিজে নিজে দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রভৃতি ক্ষেত্রকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে নারী এবং পুরুষ উভয়ই একটি উন্নয়নশীল সমাজের সুফল ভোগের অধিকারী হবে।

তথ্যসূত্র :

১. Simone De Beauvoir, The Second Sex, Translated and edited by H.M. Parshley, London, Picador, 1988, p. 295

২. Shefali Moitra, Feminist Thought, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2002, p. 10

৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩

৪. তদেব, পৃ. ১১৬

৫. Rinita Mazumdar, Introduction to Feminist Theory, Towards Freedom, 2005, p. 45-46

৬. Hussin Jose Hajase, Sexual Harassment in the Workplace : An Exploratory Study from Lebanon, Journal of Management Research, Vol. 7, No. 1, 2015, p. 108

৭. মল্লিকা সেনগুপ্ত, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১১২

৮. মাহমুদ শামসুল হক, বাঙালি নারী হাজার বছরের ইতিহাস, হাতেখড়ি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২২

৯. Nairruti Jani, Thomas P Felke, Gender bias and sex-trafficking in Indian Society, International Social Work, USA, 2015, p. 13

১০. Anita Amorim, Gender Equality and Child Labour, Publications of the International Labour Office, U.K., 2004, p. 19

মল্লিকা সেনগুপ্তের 'Mrs.বাংlish এর আত্মবিলোপ' : মাতৃভাষা নাকি বকচ্ছপের জয়জয়কার?

শিবানী মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর মতে বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষা প্রবেশের সমস্যা বহুদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে। সমস্যার সূত্রপাত যখনই হোক না কেন বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার সংকট এবং ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষার আগ্রাসন 'গরমাগরম চায়ে পে চর্চা' বলা যেতে পারে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই একাধিক সাম্প্রতিক ঘটনার মতো ভাষা সংকটের বিষয়টিও একুশ শতকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিরা কম-বেশি ইংরেজি শব্দ বাংলা বাক্যে ব্যবহার করে থাকে, যার নামকরণ করা হয়েছে বাংরেজি অথবা বাংলিশ। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত 'Mrs. বাংlishএর আত্মবিলোপ' কবিতায় একাধিক ইংরেজিশব্দ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে বর্তমান সময়ে এটি একটি আলোচনার বিষয়। নিজে বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেছেন। বাংলা ভাষায় সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বায়ন এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে বসবাস করে যুব প্রজন্মকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া থেকে আটকে রাখা সম্ভব নয় নইলে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়তে হবে। ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আর তাই ইংরেজি ভাষার প্রভাব পড়ছে বাংলা ভাষার উপর। অনেকে বাংরেজি/বাংলিশ বিষয়টিকে বকচ্ছপ বলে তাচ্ছিল্যের সুর চড়ান। এই সমস্যা ভাষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয় নাকি বকচ্ছপের জয়জয়কার-তারই আলোচনা করা হবে আলোচ্য প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ : আগ্রাসন, বাংলিশ, বিশ্বায়ন, ডিজিটাল, বকচ্ছপ।

মূল আলোচনা :

"শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, আমার ভাষা সংকর; অর্থাৎ আমার বাংলার ভিতর থেকে ইংরেজি শব্দ স্ব-রূপে মাঝে মাঝে দেখা যায়। এ অপবাদ সত্য। তবে বাংলার ভিতর ইংরেজি ঢুকলে ভাষা যদি সংকর হয়, তা হলে শুধু আমার নয়, দেশশুদ্ধ লোকের ভাষা সংকর হয়ে গেছে।"[১]

প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর কথাতেই স্পষ্ট বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষা প্রবেশের সমস্যা বহুদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে। সমস্যার সূত্রপাত যখনই হোক না কেন বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার সংকট এবং ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষার আগ্রাসন 'গরমাগরম চায়ে পে চর্চা' বলা যেতে পারে। খুব স্বাভাবিকভাবেই একাধিক সাম্প্রতিক ঘটনার মতো ভাষা সংকটের বিষয়টিও একুশ শতকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের নজর এড়িয়ে যায়নি। আশির দশকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লেখালেখির পাশাপাশি সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। প্রসঙ্গত বলা ভালো তিনি যে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতেন তখন সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বাংলা ভাষায় গবেষণা অভিসন্দর্ভ লেখার অনুমতি ছিল না। একপ্রকার লড়াই করে তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় সমাজতত্ত্ব বিষয়ে অভিসন্দর্ভ লেখার অনুমতি আদায় করে নেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, দেশ-বিদেশের একাধিক বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব যেমন তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই অনেক বাঙালি চরিত্রকে নিয়েও তিনি লিখেছেন। অন্যান্য অনেক ভাষার কবিতাকে বাংলায় যেমন অনুবাদ করেছেন, আবার বাংলা কবিতা পাঠের জন্য ছুটে গিয়েছেন দেশ এবং দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও। বাংলা ভাষায় কবিতা লিখে একাধিক পুরস্কারও পেয়েছেন। খুব সহজেই অনুমেয় মাতৃভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা না থাকলে এসব সম্ভব হত না। তিনি যে সময়ে লেখালেখি করতেন সেই সময় বিশ্বায়নের প্রভাব প্রত্যেক দেশবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। শুধু দোরগোড়ায় বললে ভুল হবে, নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে বলা চলে। তাছাড়া ব্রিটিশ রাজত্বকালে দীর্ঘদিন কলকাতা ভারতের রাজধানী থাকায় ইংরেজির প্রচলন এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাঙালিদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি যার ফলে বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগের আধিক্য বেড়েছে এবং এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হওয়ার একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই এইরকম একটি বিতর্কিত বিষয়কে কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন কবি। ২০০৫ সালে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখা 'ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'Mrs. বাংlishএর আত্মবিলোপ' কবিতাটির নামকরণটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খুব সচেতনভাবেই কবি নামকরণের ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের মধ্যে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেছেন ঠিক যেমনভাবে আমরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এমনকি সম্পূর্ণ কবিতাটির মধ্যেও একাধিক ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেছেন যা খুব সুন্দরভাবে বর্তমান যুগোপযোগী অবস্থানকে নির্দেশ করেছে।

যেকোনো ভাষার বৈশিষ্ট্যই হল অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে নিজের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা কারণ যে কোনো জীবন্ত ভাষার ক্ষেত্রে অন্য ভাষার শব্দমিশ্রণ একটি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য বিষয়। মূলত যে ভাষা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ সেই ভাষার উপর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ন ভাষা প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ

হিসাবে বলা যেতে পারে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে একসময় ফার্সি ও আরবি ভাষা বাংলা শব্দকোষে স্থান পেয়েছিল। ঠিক তেমন ভাবেই বর্তমানে ইংরেজি কিংবা হিন্দি ভাষার প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সেই একই- ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে বহুল প্রচলিত দুই ভাষা ইংরেজি অথবা হিন্দি জানাটা বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ভাষাদুটি বিশেষ করে ইংরেজি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে বাংলা বাক্যে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেটাকে আমরা 'বাংরেজি' বা 'বাংলিশ' বলে জানি। বাংলা ভাষার এই নতুন রূপের উপকারিতা এবং অপকারিতা দুই-ই আছে।

নতুন প্রজন্ম এই যে কথায় কথায় 'বাংলিশ' শব্দ ব্যবহার করছে এর জন্য তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দোষও দেওয়া যায়না। কারণ বর্তমানের যা পঠনপাঠন প্রণালী, কর্মক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার চাহিদা ইতাদি বিষয়ে চাইলেও আমরা ইংরেজি ভাষার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারব না। এই সব কিছুর মধ্যে আরো একটি বিষয় যা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তা হল বিশ্বায়ন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাঙালিরা এখন সদাসর্বদা তৎপর। বর্তমান সময়ের এই দ্বন্দময় চিত্রটিকে খুব সুন্দরভাবে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। এই কবিতায় কবি বেশ কয়েকটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন- Expecto Petronum, Master, World Rule, Quidditch, Gossip, fly, diaspora, hybrid, sacrifice, global ইত্যাদি। আমরা সবাই কমবেশি হ্যারি পটার-এর গল্প পড়েছি বা series দেখেছি। এই যে 'সিরিজ' শব্দটি ব্যবহার করি আমরা সেটিও ইংরেজি শব্দ। এর বাংলা যদি করা হয় তাহলে ক্রম বা পরম্পরা এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। শব্দগুলো অন্যক্ষেত্রে পরিচিত হলেও এই ক্ষেত্রে অনেকেই এর অর্থ বুঝতে পারবে না কারণ আমরা এই শব্দগুলোকে এই নামেই জেনে অভ্যস্ত। যাই হোক, Harry Potter সিরিজটি ব্রিটিশ লেখিকা জে.কে. রাউলিং-এর রচিত সাত খন্ডের একটি উপন্যাস যার মূল বিষয় হল কল্পকাহিনী ও রহস্য। এই কাহিনীতে খারাপ শক্তির বিরূদ্ধে লড়াই করার সময় মূলত যে মন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাই হল 'expecto patronum'। মন্ত্রটির সরাসরি হিন্দি অনুবাদ করা হয়েছিল- 'পিতৃদেব সংরক্ষনম'। এই সিরিজেই একটি খেলার কথা পাওয়া যায় যার নাম- 'Quidditch'.

এখন প্রশ্ন হতেই পারে কবি এই শব্দগুলো কিংবা এই সিরিজটি কবিতায় কেন উল্লেখ করেছেন? এর কারণ Harry Potter সিরিজটি এতটাই জনপ্রিয় একটি কাহিনী যে এখনও পর্যন্ত বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত বই সিরিজ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সিরিজের জনপ্রিয়তা এতটাই তুঙ্গে যে কমপক্ষে চৌষট্টিটি ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে এবং প্রায় ৩২৫ মিলিয়ন কপির বেশি বই বিক্রি হয়েছে। আসলে কবিতায় উল্লিখিত ছোটো বাচ্চাটি বিশ্বের পরিচিত ঘটনাবলীর খোঁজ রাখে আর দেশ-দুনিয়ার খবর রাখার ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ার জন্য ইংরেজি ভাষাটা তাকে ভালোভাবে

রপ্ত করতে হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই ভাষার প্রভাব মাতৃভাষার উপর পড়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন- "এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজি জ্ঞানের ভাষাও কতক পরিমাণে বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে অনেক নূতন জ্ঞান, অনেক নূতন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, তাই তাদের বিলেতি নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। যেহেতু দেশের জনগণ ইংরেজি-শিক্ষিত নয়, সে কারণেই বাংলা ভাষা থেকে অনেকে চান 'আইডিয়া'কে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে।"[২]

কবিতার দ্বিতীয় লাইনে ব্যবহৃত 'Office' এবং 'Fridge' শব্দদুটির আক্ষরিক বাংলা করলে তা সহজে আমাদের বোধগম্য হবে না কারণ এই বিদেশি শব্দগুলো আমাদের মনের ভিতর ঢুকে গেছে আর তাই এই শব্দগুলোই আমাদের মুখে মুখে ঘোরে। ঠিক একইভাবে ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় ভাষা হিন্দি শেখানোর প্রতি প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বাঙালিদের মধ্যে। কবিতাটির মধ্যে আরো একটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মোবাইল গেমের কথা উল্লেখ করেছেন কবি, তা হল- 'Pokeman Master'। এই জাপানী ভিডিও গেমটি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক সফল এবং লাভজনক ভিডিও গেম হিসাবে পরিচিত। খুব স্বাভাবিকভাবেই ছোটো বাচ্চারা এই গেমের মাস্টার হতে চায় যাতে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাওয়া যেতে পারে। অনেকে এই বিষয়টিকে 'বকচ্ছপ' ভাষা বলে তাচ্ছিল্যের সুর চড়ান কিন্ত শ্রীমতী বাংলার মতো কষ্ট হলেও আমাদেরকে ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে মেনে নিতেই হবে। বর্তমানে বিশ্বায়ন এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সময়ে অবস্থান করে মাতৃভাষায় ইংরেজি ভাষার প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। কবিতার মধ্যে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি- "আমাদের ছেলে হবে একই সঙ্গে global এবং গোপাল।"[৩]

তবে এক্ষেত্রে আমাদের একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ যেমন থাকবে তেমনভাবে আমরা যেন নিজেদের মাতৃভাষাকেও ভুলে না যাই। অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে বাংলা ভাষা যেন তার নিজস্ব গন্ধ ও পেলবতা হারিয়ে না ফেলে। মাতৃভাষাটা হোক ভাবনার খোলা আকাশ, ভালোবাসার ঠিকানা। ঠিক যেমনভাবে প্রবোধচন্দ্র সেন মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেছেন-"বাঙালির মুখ থেকে বিলেতি কথা কেউ খসাতে পারবেন না, অতএব সে চেষ্টা কেউ করেনও না। আমরা চাই শুধু লিখিত ভাষায় বিদেশী শব্দ বয়কট করতে।"[৪] আর তাহলেই বাংলা ভাষার সজীবতা বজায় থাকবে- "এ যুগে ইংরেজেরা আমাদের অনেক জিনিস দিয়েছে, যা আমাদের ভাষায় স্বনামে এবং আমাদের ঘরে স্বরূপে আছে ও থেকেও যাবে। একটা সর্বলোকবিদিত উদাহরণ দেওয়া যাক। বোতল গেলাস বাংলা ভাষা থেকে কখনো বেরিয়ে যাবে না। বাংলা যদি একদম বেসুরা হয়ে যায়, তা হলেও বাঙালিরা ওষুধ খাবে, আর মাথা ঠান্ডা করবার জন্য তেল মাখবে। অতএব আমাদের কাঁচের পাত্র চাই। তার পর ইংরেজ-প্রবর্তিত নূতন কর্মজীবনও তৎসম অবস্থায় না

হোক তদ্ভব-রূপে বজায় থাকবে।”[৫] কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর কবিতার শিরোনামে ‘আত্মবিলোপ’ শব্দটি এবং কবিতার শেষে “অতঃপর মহাসুখে ঘরকন্না করতে লাগল”[৬] বাক্যটির মাধ্যমে এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহবস্থানের মধ্য দিয়ে সময় ও অবস্থানকে মাথায় রেখে যতটুকু প্রয়োজন নিজেকে বিলোপ করে একাধিক ভাষার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাতে করে বাংলা ভাষার সচলতা বজায় থাকবে, শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

তথ্যসূত্র :

১। চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, অষ্টম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৩, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ: ২৭৮

২। চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, অষ্টম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৩, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ: ২৮০

৩। সেনগুপ্ত, মল্লিকা, কবিতাসমগ্র, প্রথম সংস্করণ, মার্চ, ২০১২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ: ৩৮৩

৪। চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, অষ্টম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৩, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ: ২৮০

৫। চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ, অষ্টম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০৩, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ: ২৮০

৬। সেনগুপ্ত, মল্লিকা, কবিতাসমগ্র, প্রথম সংস্করণ, মার্চ, ২০১২, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ: ৩৮৩

অপরাধের অন্ধকারে নিমজ্জিত ঔপনিবেশিক বাংলা : বর্ধমান জেলার ডাকাতির ইতিহাস

নূরমহম্মদ সেখ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ : ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রচুর সংখ্যক দাকাতি শুরু হয়েছিল। ফলত একদিকে বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হওয়া ও শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা হওয়াই এখানেও প্রচুর সংখ্যক ডাকাতি হয়েছিল এবং এর পাশাপাশি অন্যদিকে বিভিন্ন সময় এখানে দুর্ভিক্ষ হওয়াই সাধারণ কৃষক মানুষেরা ডাকাতির কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। এই জেলায় বেশ কয়েকটি ডাকাত দলের নাম পাওয়া যায়; যথা- রমজান ডাক্তার বা সরকার এর দল, কানাই ডোম এর দল ইত্যাদি। ডাকাতরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতো অপরাধ করতে। একাজে তাঁরা মদত পেয়ে থাকতো স্থানীয় জমিদার, ঘুষখোর দারোগাদের মতো মানুষদের। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের কাছে এরা রবিন হুড'র ভুমিকাও পালন করতো।

শব্দসূচক : রমজান ডাক্তার, কানাই ডোম, জমিদার, দারোগা, রবিন হুড ইতাদি।

১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারি পাশ হওয়া IPC অনুযায়ী অপরাধকে ৬ টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) রাজ্য, পাবলিক, সেফটি ও বিচারের বিরুদ্ধে অপরাধ। (২) ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (যেমন- হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই, অপহরণ), (৩) ব্যক্তি ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (ডাকাতি, burglary, robbery, সিঁধ কেটে চুরি /DRBT), (৪) ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছোটখাটো সহিংসতা, (৫) সম্পত্তির বিরুদ্ধে ছোটখাটো সহিংসতা, (৬) উপরোক্ত অপরাধগুলি ছাড়াও অন্যান্য অপরাধসমূহ।[১] ১৮৭২ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে বাংলার পাঁচটি বিভাগেই ক্রমশ অপরাধ বেড়েই ছিল।[২] কিন্তু পাঁচটি বিভাগের তুলনাই বর্ধমান বিভাগে সম্পত্তিগত অপরাধ বেশি হয়েছিল।[৩]

ওয়ারেন হেষ্টিং ১৭৭৪ সালের ১৯ শে এপ্রিল 'ফৌজদার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা' করেন বিভিন্ন ধরনের ডাকাতি রুখতে। কারন ১৭৭২ সাল থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে বর্ধমান জেলা সহ বাংলার অন্যান্য জেলাতেও ডাকাতদের বিভিন্ন দল মাশরুমের মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করেছিল, ফলত সমাজে অপরাধের মতো একটি বাজে প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল।[৪]

১৮৪৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যেও হুগলী সহ বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ডাকাতির প্রবনতা একেবারে কমেনি। এই সময়ের মধ্যে বর্ধমানে ঘটা ডাকাতির সংখ্যা দেখানো হল-

১৮৪৭-১৮৫১	১৮৫২-১৮৬৪	১৮৬৫-১৮৭৫	১৮৭৬-১৮৯৯	১৯০০-১৯০৪	১৯০৫-১৯১২
১০১	২৫	১৫	৭	১৪	১২

সূত্রঃ Arun Mukhrejee’s Crime and Public Disorder in Colonial Bengal: 1861-1912, p. 42

১৮৫২ থেকে ১৮৬৪ সালের সময়ের মধ্যে Dacoity Commissioner ও ঐ বিভাগের বেশ কিছু কর্মচারী বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার উপর বিশেষ নজর রাখেন।[৫] একদিকে যেমন ধরা পড়া অপরাধীর স্বীকারোক্তির জন্য তাঁর উপর চালানো হত অকথ্য অত্যাচার, তেমনি অন্যদিকে স্থানীয় থানার দারোগা-পুলিশদের ঘুষ দিয়ে অনেক অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়ে যেত।[৬]

তবে সবসময় এইধরনের ঘটনা যে পেশাগতভাবে অপরাধীদের দ্বারা ঘটত তা নয়; অনেকসময় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, যেমন- কৃষি মজুর, ছোট কৃষক, ছোট শিল্প শ্রমিক যারা সাধারণত চাষাবাদের উপর অনেকটাই নির্ভর করে জীবনযাপন করে থাকতো, অভাব দেখা দিলে খাদ্য বা বেঁচে থাকার তাগিদে ডাকাতি তথা দস্যুবৃত্তি করে থাকতো।[৭] এই প্রেক্ষিতে এটাই বলা যায় যে চুরি বা ডাকাতি বা অন্য কোন অপরাধমূলক ঘটনা যেকারনেই করে থাকুক না কেন তা যে সমাজ বিরোধী কাজ সেটা বলতেই হয়।[৮] শুধু খাদ্যের তাগিদে বা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই যে ডাকাতির মতো ঘটনাগুলি ঘটাত তা সঠিক নয়, অনেকসময় দেখা যেত ধনশালী হয়ে ওঠার জন্য বা অনেকে সৎভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত না থাকায় পেশা হিসাবে চৌর্যবৃত্তি গ্রহন করে থাকতো।[৯] সকল দরিদ্র মানুষই যে অপরাধমূলক কাজে নিযুক্ত হয়েছিল তা যেমন সঠিক নয় এবং তেমনি সকল অপরাধী যে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষরাই হয়ে থাকতো সেটাও নয়।[১০]

চোর-ডাকাতদের নিজস্ব দল থেকে থাকতো। দলের প্রধানকে ‘সর্দার’ বলা হত। চুরি-ডাকাতির পরিকল্পনা করতেন সর্দার। কোথায়, কবে বা কার বাড়িতে ডাকাতি করা হবে তা সর্দার ঠিক করতেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খবরাখবর গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাখতেন।[১১] এছাড়া দলের সদস্যদের কার কি কাজ থাকবে সেটা তিনিই ঠিক করতেন। ফলস্বরূপ ডাকাতি করা সম্পত্তির বেশীরভাগটাই তিনি নিতেন।[১২] ডাকাতদল চুরি করতে যাওয়ার সময় অস্ত্র হিসাবে সঙ্গে রাখত সিঁধকাঠি, লাঠি, কুড়ল, তরবারি ইত্যাদি।[১৩]

১৮৯০ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে বাংলায় রেলপথ ও রাস্তার সম্প্রসারণ খুব হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে হুগলী নদীর ধারে বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল। এই কারনে উত্তর ভারত থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ বাংলার বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় আসতে শুরু করে এবং বসতি স্থাপন শুরু করে এবং এই মানুষদের

দ্বারা প্রচুর সংখ্যক অপরাধ (বিশেষভাবে burglary) ঘটতে থাকে।[১৪] উনবিংশ শতকের শেষের দিকে বর্ধমান জেলায় ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে ছিল। ১৮৭৪ সালে বাংলার অন্যান্য জেলার চাইতে এখানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডাকাতি হয়েছিল।[১৫] ১৮৯১ সালের বিবরণ অনুযায়ী বর্ধমানে আগত মোট অভিবাসী ছিলেন ৮১১৮৫ জন।[১৬] এই জেলা মূলত শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হওয়াই আগত অভিবাসীদের দ্বারা বহু সংখ্যক অপরাধ হতে শুরু করেছিল। এখানে প্রতি লাখ জনসংখ্যার নিরিখে অপরাধ সমূহের হিসাব-

	TC	RtMDR	DRBT
১৮৮১	১৭৯.৮	৩	৬২.৮
১৮৯১	৩৪০.৩	৫.৮	৯০.২
১৯০১	৩২৫.২	৫.৩	১০৭

সূত্রঃ Arun Mukhrejee's Crime and Public Disorder in Colonial Bengal: 1861-1912, p. 49

BPAAR ১৮৯০ সালের হিসাবে দেখাচ্ছে যে এই জেলায় burglary ও চুরি (মোট ১৪৭ টি) সর্বাধিক হয়েছিল এবং এর মধ্যে অর্ধেক অপরাধ ঘটেছিল শুধুমাত্র রাণীগঞ্জে।[১৭]

ডাকাতদলের সাথে অনেকসময় জমিদারদের ভালো সম্পর্ক থেকে থাকতো। গ্রাম বাংলাতে জমিদারেরাই সন্দেহাতীতভাবে ছিলেন ডাকাতদের মিলন বিন্দু। অর্থাৎ ডাকাতদের সঙ্গে জমিদারদের একটি যোগাযোগ ছিল। ডাকাতদল জমিদারদের লাঠিয়ালের কাজ করে থাকতো। ব্যাকল্যান্ড সাহেব বলেন- "landowners who too often are more interested in sheltering the criminal than in giving him upto justice".[১৮] তবে একথা ঠিক যে, জমিদার বা সাধারনভাবে সমাজের সমর্থন না পেলে ডাকাতদের পক্ষে এক জেলা থেকে অন্য জেলাতেও গিয়ে ডাকাতি করা সম্ভব হতনা। সেইসময় দেখা যেত যে কলকাতার ডাকাতেরা হুগলী ও মেদিনীপুরে, এবং হুগলীর ডাকাতেরা বর্ধমান ও বীরভূমে কর্মসম্পাদন করত। আবার এই তিনটি জেলার ডাকাতেরা সাধারণ মানুষের দ্বারাই বর্ধমানে সকল ধরনের লুঠের কাজ করতো।[১৯] মূলত ডাকাত সর্দাররা প্রতিবেশী জেলাগুলোতে ডাকাতি করলেও তাদের প্রধান ঘাঁটি থাকতো নিজের জেলায়।[২০] এবং এই ডাকাত দলে স্থানীয় বিভিন্ন বর্ণ-ধর্ম-জাতির মানুষ যোগ দিত।[২১] বর্ধমানে সাধারণত ভূমিজ, বাগদী, ছোট ভাগিয়া মুচি ও তুতিয়া মুসলমান জাতীর মানুষেরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকতো।[২২]

১৮৫২ সালে বর্ধমানে মোট ৬৫ টি ডাকাতি হয়েছিল। সেইসময়কার কুখ্যাত ডাকাত সোনা ফকিরের সদর দপ্তর ছিল সেলিমাবাদ থানার কুলিঙ্গ গ্রামে। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল গাঙুর থানার কেতু জমাদারের বাড়ী আক্রমণ এবং সেখানে আক্রমণ করে প্রচুর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল পরিবারের সদস্যদের উপর।[২৩]

১৭৯৩ সালে বর্ধমান জেলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও লুণ্ঠনকারী ডাকাত ও দস্যু দলের মুখ্য নেতাদের তালিকা-

সর্দার বা প্রধানের নাম	নির্দেশক চিহ্ন	অপরাধীদের সাধারণ আবাস্থল	প্রতিটি দলের বর্ণিত শক্তি	অপরাধ প্রমাণে প্রস্তাবিত পুরস্কার
বাগুয়াহাড়ী অনুপাহাড়ী গোলকলাহাড়ী	এ	পৌঙ্কার হাউস, আজমতশাহী ও বর্ধমান	১০০	১০০ ১০০ ১০০
বৃন্দাবান্দদোস (দাস) বৃন্দাবন দূলিবদোস (দাস) বৈরাগী	এ	নিয়ানপাড়াবর্ধমান	১০	৩০ ৩০
আফজুল হাউড়ি	সি	হাররিশানপারি, বর্ধমান	১০০	ধরা পড়েছিল

সূত্রঃ সেন, রণজিৎ, বাংলার সামাজিক ডাকাতি পৃষ্ঠা. ৬৯-৭১

এখানে বর্ধমান জেলার কয়েকটি ডাকাত দলের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখ্য-

রমজান ডাক্তার বা সরকার এর দলঃ বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত বাজার নামক গ্রামের একদা বাংলার সেনাবাহিনীতে সৈনিকের কর্মে নিযুক্ত রমানি রমজান সরকার বা রমজান ডাক্তার এই দলের নেতা ছিলেন। এছাড়া এক সময় তিনি বানপাড়া ও কৃষ্টবাদি নামক দুই গ্রামে ডিসপেনসারি খুলে চিকিৎসা ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। এছাড়াও বর্ধমান শহরে একটি মিষ্টির দোকানও বেশ কিছুদিন চালিয়েছিল। এই বর্ধমান

শহরে কর্মসূত্রে বসবাস কালে কিছু অপরাধযোগ্য মানুষের সাথে মেলামেশা করতে শুরু করে এবং সকলে মিলে একটি ডাকাতি দল গড়ে তোলেন এবং সাধারনভাবেই জনসম্মুখে এই দল রমজান ডাক্তারের দল নামেই কুখ্যাতি অর্জন করে। এই দলটি মূলত ৬৯ জন নিয়ে গঠিত হলেও সকলেই কিন্তু ডাকাতির কাজে নিযুক্ত থাকতো না। এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেনির ভদ্রলোক সমাজের মানুষ ছিলেন, যারা প্রত্যক্ষভাবে দল পরিচালনার কাজে মদত দিয়ে থাকতো। মোটকথা, এই দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন ২৬ জন, এদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন মুসলমান এবং বাকি সকলেই ছিলেন জাতিতে হিন্দু। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন কাটোয়া থানার অন্তর্গত, ৯ জন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত, ও বাকি ৩ জন ছিলেন বর্ধমান থানার অন্তর্গত গ্রামের বাসিন্দাসমূহ। আকড়া ডাকাতির (কাটোয়া থানা, কেশ নং ৫, ১৫ই মে ১৯২৩ সাল) তদন্ত করতে গিয়ে এই দলের কার্যকলাপ পুলিশের নজরে আসে (যদিও ১৯০৩ সাল থেকেই, যখন এই দলের এক সদস্য পঞ্চ বাগদী চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল, কোন একটি দল আছে ভেবে পুলিশ নজরদারি শুরু করেছিল।)। পুলিশ এই দলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করলে দলের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের বয়ানের নিরিখে দলের গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে পুলিশ জানতে পারে। বর্ধমান এলাকার DIG এই দলের অনুসন্ধান শুরু করেন সাব-ইন্সপেকটার হরেন্দ্র বিজয় সমাদ্দার এর তত্ত্বাবধানে। ১৯২১ সাল থেকে এই দলের অপরাধমূলক কার্যকলাপ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২৩ সালের মধ্যেই অর্থাৎ মাত্র ২ বছরে এই দল ১৩ টারও বেশি ডাকাতি করেছিল, এবং তার পরবর্তী সময়ে আরও ৫ টি ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত হন। মোটকথা, পুলিশের তদন্ত অনুসারে জানা যায় যে এই দলটি সর্বমোট ৬২ টি জামিন অযোগ্য অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে ২২ টি ডাকাতি, ২৩ টি burglary, ১৩ টি চুরি, ২ টি robbery। এই দলের বিরুদ্ধে পুলিশ IPC ৩৯৫, ৪০০, ৪১০, ৪১১ জারি করা হয়েছিল এবং সব অভিজুক্তদের বিরুদ্ধে CPC ১১০ জারি করা হয়েছিল।[২৪]

কানাই ডোম এর দলঃ এটি ছিল মূলত বর্ধমান জেলারই 'চণ্ডী রায় খয়রা দল' এর একটি শাখা (এই দলটি ১৯০৬ সালে IPC ৪০০ অভিযোগে যুক্ত হয়)। কানাই ডোম ও তাঁর পিতা প্রহ্লাদ ডোম, গোরা ডোম, সূর্য ডোম পুরনো দলের সাথেই যুক্ত ছিল পূর্বে। কিন্তু 'চণ্ডী রায় খয়রা দল' ভেঙ্গে গেলে তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ আনুমানিক ১৯১০ সাল নাগাদ কানাই ডোম ও তার শালক অঘোর ডোম পুরনো দলের কিছু সদস্যকে নিয়ে এবং স্থানীয় কিছু মানুষকে নিয়ে, এছাড়াও কানাই ডোমের চার ভাই; যথা- রতন ডোম, জতন ডোম, রাশু ডোম ও নিতেন ডোম এবং অঘোর ডোমের ছেলে শম্ভু ডোম প্রমুখকে নিয়ে এই নতুন দলটি গড়ে তুলেছিল। এছাড়াও এই দলের পাওয়া কয়েকজন সদস্যের নাম হল কৃষ্ট, লাল শেখ, শশি ডোম ইত্যাদি। মোট ৫৫ জন সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠা এই দলের মধ্যে ৩৩ জনই ছিলেন ডোম সম্প্রদায়ের এবং বাকীদের মধ্যে ১৪ জন মুসলমান, ২ জন বাগদী, ২ জন সৎগোপ, ১ জন করে

যথাক্রমে মাঝি, হাড়ি, তামুলি, ও ব্রাহ্মণ। এরা সকলেই ৭ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতো। যেমন- সিহিগ্রাম, রানাদি, সিমনোর, সুকদাল, ভিমসোর, ঝারুল, শুন্দিপুর আউসগ্রাম প্রভৃতি গ্রামসমূহ। মূলত বর্ধমান জেলার গলসি, আউসগ্রাম, ফরিদপুর ও বর্ধমান থানার অধিনিস্থ গ্রাম ও শহরে ও সন্নিহিত জেলা বাঁকুড়ার সোনামুখি ও বীরভূমের ইলামবাজার এলাকাসমূহে তাঁরা তাদের অপরাধমূলক কাজসমূহ করে থাকতো। ১৯০৪-০৫ সালে চণ্ডী রায়ের নেতৃত্বে মোট ৩ টি ডাকাতি করা হয়েছিল, এবং ১৯১০-১১ সালে কানাই ডোমের নেতৃত্বে মোট ৬ টি ডাকাতি ও ২ টি robbery করা হয়েছিল। তাদের এই কার্যকলাপ ১৯১৩ সাল পর্যন্ত অবিরাম ভাবে চলতেই ছিল যতক্ষন না এই দলের তিনজন সদস্য ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। যদিও ১৯১৫ সাল থেকে পুনরায় তাদের অপরাধমূলক চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। শুরু হয় ডাকাতি ও burglary। ১৯১৬ সালে এককভাবে কানাই ডোমের নেতৃত্বে ৮ টি ডাকাতি ও ২ বড়ো আকারের burglary হয়ে থাকে।

সরকারি তদন্ত অনুযায়ী জানা যায় যে, এই দল মোট ৪২ টি জামিন অযোগ্য অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে ২২ টি ডাকাতি, ৩ টি robbery, ৬ টি burglary ও ৫ টি চুরির মতো অপরাধ। ১৮ জনকে IPC ৪০০ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। এই দলের ২৬ জনের বিরুদ্ধে ১৭ টি কেস জারি করা হয়েছিল। বাকিরা bad-livelihood কেসে যুক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই একইসঙ্গে ১ থেকে ১০ টি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। তদন্ত থেকে জানা যায় যে, এই দলের ৩২ জন একসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অপরাধ ঘটিয়ে থাকতো। এই দলের বেশিরভাগ ভাগ সদস্য বৈবাহিক বা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় ছিল।

সাব-ইন্সপেকটার পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জির তত্ত্বধানে এই দল ধরা পরে এবং DIG ১৯১৮ সালে এই দলের বাকি সক্রিয় সদস্যদের Criminal Tribes Act এর আওতায় আনেন।[২৫]

হিরু ঘোষ এর দল- হিরু ঘোষ বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, ও বীরভূম সীমান্তবর্তী স্থানসমূহে ডাকাতি ও burglary এই দলটি তৈরী করে। ১৮৯৫ সাল থেকেই এই দলের কার্যকীর্তি ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসতে থাকে। ১৮৯৮-৯৯ সালে এই দল কয়েকটি burglary এর মতো ঘটনা ঘটালে এই দলের কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয় এবং এই দলের একজন কে জেরা করা হল সে এই দলের বর্ণনা করে। মোট ৩১ জনকে নিয়ে গঠিত এই দলের সদস্যসমূহ কেউ ছিল জাতিতে গোয়ালা (২ জন), রাজবংশী (২ জন), মুসলমান (১০ জন) ইত্যাদি। এরা সকলেই ছিলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহ এবং পার্শবর্তী জেলা মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ও ভরতপুর থানার গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। তবে এই সমস্ত গ্রামগুলো ৬ মাইলের মধ্যেই বিরাজ করতো। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এই দলের ২১

জনের গ্রাম ছিল সেই সময়ের কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত। এছাড়াও কিছুজন ছিলেন বীরভূমের নানুড়ের বাসিন্দা, কেউ ছিলেন নদিয়ার কালীগঞ্জ এর বাসিন্দা।

এই দল যদিও ১৮৯৫ সাল থেকেই সরকারের নজরে আসতে থাকে, কিন্তু এই সময় পুরোপুরিভাবে সরকার এই দলের বিষয়ে সেইরকম কিছুই জানতো না। কিন্তু 1900 সালে পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বরের ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তম বাগদি ও গোস্ত ঘোরাই কে গ্রেপ্তার করা হলে তাদের বয়ানে এই দলের গতিবিধির কথা কিয়োকাংশ জানা যায়। তবে ১৯14 সালে কাঁন্দরার ডাকাতিকে ঘিরে তদন্ত শুরু হলে এই দলের উপস্থিতি সম্পর্কে সরকার পুরোপুরিভাবে জানতে পারে। এই দলের এক সদস্য খুদু শেখ বিচারপতির সামনে বয়ান জারি করলে এই দলের ১৩ জনের গতিবিধি সম্পর্কে জানা যায়, ফলত তাদেরকে মধ্যে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে কেস শুরু হয় এবং তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯১৬ সাল নাগাদ এই দলের কয়েকজন সদস্য বেশ কিছু ডাকাতি ও burglary এর মতো অপরাধযুক্ত কাজ করেন এবং দলের সদস্য গোবিন্দ বুনো ও হাতু মন্ডল বিচারকের সামনে জবানবন্দি দিলে এই দলের সদস্যদের অপরাধপ্রবন মানুষ বলে সরকারি গণ্য করেন। এই দলের সদস্যরা মোট ৫৫ টি জামিন অযোগ্য সম্পত্তিগত (যেমন- ১৬ টি ডাকাতি, ৩২ টি burglary, এবং ৭টি চুরি) অপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণিত প্রত্যেক সদস্য একের অধিকবার বিভিন্ন অপরাধের জন্য বহু বার (৪ জন ২ বার, ৩ জন ৩ বার, ১ জন ৪ বার, ৩ জন ৫ বার, ২ জন ৬ বার, ১ জন ৭ বার, ১ জন ৯ বার, ১ জন ১২ বার, ২ জন ১৩ বার, ১ জন ১৮ বার) অভিযুক্ত হয়েছিল। এই দলের ১৮ জন সদস্য সম্পর্কে আত্মীয় ছিল এবং অধিক সংখ্যক সদস্য একই ধর্মীয় ছিলেন।[২৬]

হরি দল - পূর্বে নিকুঞ্জ হরি ও রায়চরণ হরির ভিন্ন ভিন্ন দুইটি দল ছিল। পরবর্তী সময়ে ওই দুই দলের অধিকর্তা দুই একসাথে হাত মেলান এবং ভিন্ন দুই দল একত্রিত হয়ে নিকুঞ্জ হরির নেতৃত্বধীনে এই দল গঠিত হয়। প্রায় সব সদস্যই জাতিতে হরি সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এই দলের প্রধান কেন্দ্র স্থান ফরিদপুরে হওয়াই এই দল 'ফরিদপুরের হরি দল' নামেও সমধিক পরিচিতি লাভ করেছিল।

মোট ৪৩ জন সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠা এই দলের মধ্যে ৩০ জনই ছিল হরি জাতির মানুষ, এবং বাকিদের মধ্যে ৭ জন বাউরি, ১ জন মুচি, ১ জন বাগদি, ১ জন লোহার, ১ জন কৈবর্ত ও ১ জন ডোম প্রমুখ। তাঁরা প্রায় সকলেই ফরিদপুর থানার কয়েকটি গ্রামসমূহে (গ্রাম গুলো ৩ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত ছিল) দলে দলে বাস করতো। বর্ধমান জেলার ফরিদপুর থানা ছাড়াও রানীগঞ্জ, অন্ডাল ও ককশা থানার অন্তর্বর্তী এলাকা এবং বীরভূমের ইলামবাজার থানা ও বাঁকুড়া জেলার সালতোড়া থানার অধীনস্থ স্থানসমূহে তাঁরা অপরাধের বেড়াজাল পেতে বসেছিল।

CID বিভাগের অধিকর্তা DIG ১৯১৫ সালে এই দলের বিরুদ্ধে CTA এর অধীনে অনুসন্ধান শুরু করেন। ইন্সপেক্টর নিরোদ মোহন রায় চৌধুরী ও সাব ইন্সপেক্টর যুগল কিশোর রায় অনুসন্ধান শুরু করেন এবং DSP জে এন চক্রবর্তী এর তত্বাবধানে সাব ইন্সপেক্টর পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জী ইন্সপেক্টর এস আর শেঠ এর সহায়তায় এই দলের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পূর্ণ করেন।

১৯১১ সালে ফরিদপুর জেলার বালাজুড়ি ডাকাতির ঘটনাকে (কেস নং ১, মার্চ ১৯১১) কেন্দ্র করে এই দলের কিছু সদস্য পুলিশের নজরে আসে, যখন এই দলের নেতা সহ ৬ জন সন্দেহভাজন বলে চিহ্নিত হয়েছিল। যদিও ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই দল তার অপরাধের কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছিলো, যতক্ষণ না ৩০ জন সদস্যকে CPC ১১০ ধারা অনুযায়ী ১ বছরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক ১ বছর পরেই অর্থাৎ ১৯১৪ সালে এই দলের কিছু সদস্য কর্তৃক আঞ্চলিক স্তরে বেশ কিছু অপরাধমূলক কার্যসিদ্ধি হয়: যেমন ২ টি ডাকাতি ও ২১ টি burglary এবং বেশ কিছু চুরির ঘটনা ঘটেছিলো। ১৯১৬ সালে ২৭ জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

এই দলের সকল সদস্য খুব ধুরন্ধর, উন্মাত্ত ও বিপদ্দজনক ছিল। এরা মোট ৬৫ টির মতো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল burglary (৪৬) এর মতো অপরাধ। এছাড়াও চুরির মতো ঘটনা ১২ টি ও ডাকাতির মতো ঘটনা ৪ টি।[২৭]

কদু মোল্লা এর দল : কদু মোল্লা, পিতা হায়দার মোল্লা, এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯১৭ সালে এই দল প্রথম পুলিশের নজরে আসে এবং ১৯১৮ সালে এই দলের কয়েকজন সন্দেহভাজন বলে গণ্য হলে ৪৫৭ নং ধারা ও ৩৮০ নং ধারা (IPC) অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয় (কেস নং ৩, ১৪ই জুন, ১৯১৮, মঙ্গলকোট থানা)।

এই দলটি আকারে খুব বেশি বড় ছিল না। মোট ১৯ জন নিয়ে গড়ে উঠা এই দলের ১৬ জন মুসলমান, বাগদি ২ জন ও ১ জন মুচি ছিল। এরা সকলেই কাটোয়া থানা ও মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত শিমুলিয়া, টাঙাপাড়া, কৈচার, সিনাত প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দা ছিল। এরা মূলত বর্ধমান জেলার কাটোয়া, সাহেবগঞ্জ, মঙ্গলকোট থানা ও বীরভূমের নানুর থানা অধীনস্থ গ্রামগুলোতে অপরাধ করে বেড়াতো।

১৯২০ সালে (কেস নং ১১, ১০ই অক্টবর ১৯২০, কাটোয়া থানা, IPC ধারা ৩৯৫) এই দলের কিছু সদস্য, যেমন কদু মোল্লা, সায়েদ শেখ, লুতাব শেখ, জুনাব শেখ, জৌলাস শেখ, প্রমুখকে বিচারলয়ে পেশ করা হয়, কিন্তু যথেষ্ট সাখ্যর অভাবে তাঁরা জামিন পেয়ে যায়। কিন্তু এই দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে অপরাধী প্রবন মানুষ বলে কেস শুরু করে তদন্ত শুরু করেন ইন্সপেক্টর আজহার উদ্দীন আহমেদ।

১৯২০ সালেই সাহেবগঞ্জ থানায় (কেস নং ২০, জুন ১৯২০, IPC ধারা ৩৯৫) ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একজন স্বীকারোক্তি করেন। ফলত এই দলের বিরুদ্ধে

সরকারি সড়জমিনে তদন্ত ও পকড়াও শুরু করেন, যার দরুন এই দল কিছু দিনের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অনেকটাই। মূলত এই তদন্তের ফলে জানা যায় যে তাঁরা এই সময়ের মধ্যেই মোট ৭ টি burglary এবং ১ টি চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল।

১৯২০ সালের শেষের দিকেই এই দল পুনর্গঠিত হয়ে সক্রিয়ভাবে পুনরায় তাদের কার্যকলাপ শুরু করে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দলের ৮ জন বেশ সমস্যায় পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ দায়ের (কেস নং ৩, ৩রা অক্টবর ১৯২০, IPC ধারা ৩৯৫) হয়। অনেকাংশে ভেঙে যাওয়া ও বিধ্বংস্থ এই দল, তাসত্ত্বেও ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো দমে অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে গিয়েছিলো এবং এই সময় এই দলের ১১ জনের বিরুদ্ধে কেস করা হয়।

এই দল কর্তৃক মোট ৩৩ টি জামিন অযোগ্য অপরাধ ঘটেছিলো। তার মধ্যে ৫ টি ডাকাতি, ২০ টি burglary, 8 টি চুরি, ১ টি robbery। এদের বিরুদ্ধে IPC 8১১ ও 8১8 ধারা জারি হয়েছিল। এই দলের ১৩ জন সদস্যই বৈবাহিক বা রক্তগত সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল।তবে এই দলের সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং এরা প্রত্যেকে একের অধিক সংখ্যক কেসে অভিযুক্ত হয়েছিল।

বাকি ১8 জন সদস্য বিশেষ কোনো দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়নি। তবে তাদেরকে অপরাধের সাথে যুক্ত বলে ধরা হয়েছিল এবং যদিও তাঁরা বেশ কিছু জামিন অযোগ্য অপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে বলা যায়, যেমন ১ জন ১৫ বার, ১ জন ১১ বার, 8 জন ৯ বার, ১ জন ৮ বার এবং ১ জন ৫ বারের মতো অপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছিল।[২৮]

পরিশেষে, ডাকাতরা অন্যায় কাজ করলেও অনেক সময় তাঁরা দরিদ্র, বৃদ্ধ, মহিলা ও বাচ্চাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল। বাংলার ইতিহাসে অনেক কুখ্যাত ডাকাতের নাম পাওয়া যায় যারা সমাজের কিছু মানুষের কাছে ছিলেন রবিন হুড। এছাড়াও ডাকাত দলের অনেকাংশে বিরোধিতা ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের মালপত্র লুঠ করতো। আর সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে ব্রিটিশ সরকার যখন এদের নিশানায় আসতে শুরু করেছিল তখন থেকেই ডাকাত দলের নিস্পত্তি করার চেষ্টায় নেমে পড়েছিল।

তথ্যসূত্র :

১। Mukhrejee, Arun, Crime and Public Disorder in Colonial Bengal: 1861-1912, K. P. Bagchi and Company, Calcutta, pp. 26-27

২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬

৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৩

৬। সুর, নিখিল, সেকালের অপরাধ জগৎ, আশাদীপ, কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা- ৩৩

৭। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৫

৮। তদেব, পৃষ্ঠা. ৬০

৯। তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৪

১০। Banerjee, Sumanta, The Wicked City: Crime and Punishment in Colonial Calcutta, Orient BlackSwan, New Delhi, 2009, p. 21

১১। ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল, বাংলার ডাকাত, শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ১৯-২০

১২। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৩

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা. ৮৭

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৫

১৫। সুর, নিখিল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ২১

১৬। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৭

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৭

১৮। মিত্র, সুধীর কুমার, হুগলীর ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, খণ্ড ১, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃষ্ঠা. ৩১৭

১৯। সেন, রণজিৎ, বাংলার সামাজিক ডাকাতিঃ একটি প্রাথমিক প্রতিরোধ ১৭৫৭-১৭৯৩, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা. ২৩

২০। সুর, নিখিল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৬

২১। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৯

২২। Mukhrejee, Arun, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৬

২৩। সুর, নিখিল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪

২৪। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Ramjan Doctor alias Sirkar's gang of Burdwan District, File No. 3-T-6(1), June 1927, p. 03949

২৫। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Kanai Dome's gang in Burdwan, File No. P.3-T-22(1), July 1918, pp. 41-43

২৬। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Hiru Ghosh's gang of Burdwan, File No. P.3-T-5(1), June 1921, pp. 21-24

২৭। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Hari gang of Burdwan, File No. P.3-T-16(1), November 1917, p. 40

২৮। Government of Bengal, Political Department, Police, Declaration of the Kadu Molla's Ghosh's gang of Burdwan, File No. P.3-T-13(1), July 1923, p. 51

বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার স্বরূপ : গান্ধিজীর দর্শন ভাবনার একটি পর্যালোচনা

মিতালী সরকার
স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অনুচিন্তন : বিদ্যায়তনিক দর্শন চর্চায় দার্শনিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। পাশ্চাত্য দর্শন চর্চায় বিভিন্ন দার্শনিক পিথাগোরাস, প্লেটো, এরিস্টটল, হবস, লক, কান্ট, দেরিদা প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনা দর্শন চর্চাকে পরিশীলিত করেছে। একইভাবে, ভারতীয় সভ্যতায় বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁদের চিন্তার মাধ্যমে প্রাচ্যের দর্শন চর্চাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। শঙ্করাচার্য, মনু, কৌটিল্য, মাধ্ববাচার্য প্রমুখ দার্শনিক ও মনীষীগণ তাঁদের চিন্তাধারার মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন। অতি-সাম্প্রতিক রামকৃষ্ণদেব, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবাফুলে, বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, আম্বেদকর, ইকবাল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তা-চেতনা ভারতীয় দর্শনচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে অতি-সাম্প্রতিক এই দর্শন চর্চার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতপাত, বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও ধর্মের সম্পৃক্ততা ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে গান্ধিজীর দর্শন ভাবনার আলোকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার স্বরূপ আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
সূচক শব্দ : দার্শনিক, দর্শন চর্চা, ভারতীয় দর্শন, বর্ণ, অস্পৃশ্যতা, ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ :

আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের আঙ্গিনায় অহিংসা, সত্যাগ্রহ, অছিতত্ত্ব ইত্যাদি তাত্ত্বিক আলোচনা গান্ধিজীর দর্শন থেকে আমরা পেয়ে থাকি। সুপ্রাচীনকাল থেকে জাতপাত, বর্ণ ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা নিয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিকগণ মূল্যবান মতামত প্রদান করে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেছে। এক্ষেত্রে গান্ধিজীও অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থা নিয়ে তাঁর নিজের মতামত স্বরূপ নিজস্ব বীক্ষা প্রদান করেছেন। ভারতের দর্শন ভাবনার অন্যতম কাণ্ডারী মহাত্মা গান্ধির কর্মকান্ড দেশের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকস্তরে উন্নীত হয়েছে তাঁর উচ্চমার্গের মননশীল দার্শনিক চিন্তা-চেতনার বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে। মূলত বিদ্যায়তনিক গবেষণায় গান্ধিবাদী গবেষকদের হাত ধরেই তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়েছে জগৎময়।

গান্ধিজীর দর্শন চর্চার মূল উৎস হল সনাতন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। এর পাশাপাশি তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের অনুশাসনের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শন ভাবনা পরিপূর্ণ ও পরিশীলিত হয়েছে। জনজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করেন। সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা, অস্পৃশ্য, অবদমিত, নিম্নবর্ণীয় শ্রেণীগুলির প্রতি সহানুভূতি বশত তাঁদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য তিনি 'হরিজন' হিসাবে তাঁদেরকে সঙ্গায়িত করেন। তাঁদের আত্মোন্নতির বিভিন্ন মার্গের বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার স্বরূপ গান্ধিজীর দর্শন ভাবনার আলোকে পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গান্ধিজির বীক্ষায় বর্ণ ও বর্ণাশ্রম

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির সার্বজনীন পরিচয় হল আধুনিক ভারতের দার্শনিকদের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব রূপে। 'সকলকে' নিয়ে মিলিতভাবে চলাই ছিল গান্ধির দর্শনের অভিনব পন্থা।[১] এই কারণে অচিরেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় আধুনিক দর্শন বীক্ষার অন্যতম প্রাণপুরুষ। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশেষত *'হরিজন*, *'ইয়ং ইন্ডিয়া'*তে সামাজিক সমস্যা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, যেগুলি থেকে বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে তাঁর অভিমত জানা যায়।[২] গান্ধি বর্ণব্যবস্থাকে ভারতীয় জাতির 'ভিত্তিপ্রস্তর' বলে মনে করতেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা বর্ণব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ভারতীয় জাতিগঠন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে তিনি বর্ণব্যবস্থার যে ব্যাপক 'সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কার' দরকার সেকথা মনে করতেন। অর্থাৎ, বর্ণব্যবস্থার কুফলগুলোকে যদি সংস্কারের মাধ্যমে দূর না করা যায়, তাহলে অনতিবিলম্বেই ভারতীয় জাতির সামাজিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে। সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে গান্ধি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলেছেন। তিনি কখনোই সনাতন বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক থাকতে পারে—একথা মানতেন না। বর্ণব্যবস্থা যদি বৃক্ষ হয়, অস্পৃশ্যতা তবে পরগাছার মতো। পরগাছাকে কাটতে গিয়ে আমরা যেন ভুল করে বৃক্ষ না কেটে বসি। বর্ণহিন্দুদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তাঁর মনে হয়েছিল, বর্ণব্যবস্থা ধ্বংস করার অর্থ হল– বর্ণ এবং অ-বর্ণের মধ্যে একটা 'রাজনৈতিক বিভাজন' সৃষ্টি করা। গান্ধি মনে করতেন, এধরণের 'রাজনৈতিক বিভাজন' ভারতীয় জাতিগঠনের পক্ষে 'আত্মঘাতী' হতে বাধ্য।[৩] গান্ধিজি জানিয়েছেন-

> "পরিবার সম্ভবত ঈশ্বর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। একটি পরিবারে যেমন থাকে সেই রকম ঐক্য বা স্বাভাবিকতা জাতিপ্রথা বা শ্রেণীপ্রথা কোনটিতেই নেই। জাতিপ্রথা যদি বেশ কিছু অকল্যাণ ঘটিয়ে থাকে তাহলে শ্রেণীপ্রথাও কম কিছু ঘটায়নি। শ্রেণীপ্রথা যদি কিছু

সামাজিক উৎকর্ষতার সংরক্ষণে সাহায্য করে থাকে তাহলে জাতিপ্রথাও একই কাজ সমানভাবে করেছে, হয়ত-বা কিঞ্চিৎ বেশিই করেছে। জাতিপ্রথার ভাল দিকটি হল এই সম্পত্তির মালিকানার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে না।

এমনকি পবিত্র পারিবারিক বন্ধনও সম্পদের দূষণ থেকে নিরাপদ নয়---একথা বলেছেন শঙ্করাচার্য। পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ হচ্ছে জাতি। উভয়ই রক্তের সম্পর্ক তথা উত্তরাধিকার দ্বারা পরিচালিত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে উত্তরাধিকার হচ্ছে একটি মায়া, আসলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই হচ্ছে সব। বহু দেশের বহু জোরাল অভিজ্ঞতাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবুও যদি তাঁদের 'পারিপার্শ্বিক অবস্থা' মতবাদ মেনেও নিই তাহলেও এটা প্রমাণ করা সহজ যে শ্রেণীপ্রথা অপেক্ষা জাতিপ্রথার মাধ্যমে 'পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে' অনেক বেশি সংরক্ষিত ও বিকশিত করা যায়।"[৪]

আবার তিনি জাতিভেদের সঙ্গে বর্ণপ্রথার কোন সম্পর্ক নেই বলে বক্তব্য রেখেছেন। সদর্পে তিনি জানিয়েছেন-

"বর্ণের ছদ্মবেশধারী জাতপাতের রাক্ষস অধঃপাতে যাক। জাতিভেদের দ্বারা বর্ণের হাস্যকর অনুকরণ হিন্দুধর্ম তথা ভারতবর্ষকে অধঃপতিত করেছে। বর্ণাশ্রম অনুসরণ করায় আমাদের ব্যর্থতাই বহুলাংশে আমাদের অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বনাশের কারণ। এটি আমাদের কর্মহীনতা এবং দারিদ্রের অন্যতম কারণ, এবং অস্পৃশ্যতা ও আমাদের বিশ্বাসহীনতার জন্যও এটি দায়ী।"[৫]

গান্ধিজি মনে করতেন বর্ণ মানুষের জন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে, বা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এই বিধি পালনের অর্থ হল পূর্বপুরুষদের বংশধারা ও ঐতিহ্যের আহ্বানকে স্বীকার করে 'বর্ণাশ্রমের' মূল ভাবটিকে বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করা। বর্ণাশ্রম প্রথায় বংশানুক্রমিক কাজকে দায়িত্ব মনে করা হয়। স্বভাবতই সেই কাজের দ্বারা তাঁর জীবিকা নির্বাহও হয়ে থাকে। এই অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৩৮ সালে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধিজীর বিশিষ্ট একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

"আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যখন জন্মায়, তখন তার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। প্রতিটি ব্যক্তিই নির্দিষ্ট কয়েকটি সীমাবদ্ধতাসহ জন্মায় যা সে অতিক্রম করতে পারে না। এই সীমাবদ্ধতাগুলি সতর্ক নিরীক্ষণের মাধ্যমে বর্ণের সূত্রে উপনীত হওয়া গেছে। এর ফলে নির্দিষ্ট প্রবণতা সম্পন্ন নির্দিষ্ট লোকের জন্য কার্যের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র

> প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো গেছে। সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিলেও বর্ণের সূত্রে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই- একদিকে এতে যেমন প্রত্যেককে তার শ্রমের সুফল সম্বন্ধে নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনিই অন্যদিকে, তার প্রতিবেশির ওপরে চড়াও হওয়া থেকেও তাকে নিবৃত করা হয়েছে। এই মহান সূত্র দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে হতমান হয়ে পরেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা-বিন্যাস তখনই গড়ে ওঠবে, যখন এই সূত্রে অর্থ পূর্ণভাবে উপলব্ধ হবে এবং এর বাস্তবায়ন ঘটবে”।[৬]

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধিজী একটি সুস্পষ্ট মত পাওয়া যায় ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত ‘হরিজন’ পত্রিকার একটি লেখাতে—

> “বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু তাকে বজায় রাখা যায় শুধু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের দ্বারা। ....বর্ণ মানুষের সত্তার পরিচয় প্রদান করে এবং সেই পরিচয়ের সুবাদে তাঁর পালনীয় দায়িত্বের উল্লেখ করে কিন্তু কেউও উঁচু বা কেউও নীচু এই ভাবনা বা অধিকার প্রকাশ করে না, বরং তার বিরোধিতা করে। সকল বর্ণের মানুষই সমান, কারণ সমাজ কারও উপর বেশী বা কারও উপর কম নির্ভর করে না। আধুনিক কালে বর্ণের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে উচু-নীচুর শ্রেণীবিভাগ। বর্ণের বিধি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা কঠোর নিয়ম-সংযমের দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম যোগ্যতা দ্বারা আমাদের এই বিধি মেনে জীবন-যাপনই করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ......যদিও ‘বর্ণবিধি’ কিছু হিন্দু দার্শনিকের বিশেষ আবিষ্কার, তাহলেও এর বিশ্বজনীন প্রয়োগ রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু সেই ধর্ম যদি কোন বিধি বা আদর্শকে প্রকাশ করে তাহলে সেটির বিশ্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা থাকা দরকার। ‘বর্ণ’ বিধিকে আমি সেই দৃষ্টিতেই দেখি। আজ হয়ত সারা জগৎ এটিকে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে এটিকে গ্রহণ করতেই হবে।বেদে চারটি ‘বর্ণ’কে শরীরের চারটি অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং এর থেকে ভাল তুলনা আর হয় না। তাঁরা যদি একই শরীরের সদস্য (অঙ্গ) হয় তাহলে কেউ কারও থেকে উঁচু বা নীচু হয় কি করে? দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যদি ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা থাকত এবং তারা প্রত্যেকেই যদি বলতে শুরু করত যে সে বাকি অঙ্গদের তুলনায় উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর তাহলে আমাদের দেহটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যদি উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতা বিচারের মত দুষ্ট ক্ষতকে জিইয়ে

> রাখা হয়। এই দুই ক্ষতই আমাদের বর্তমান সময়ের বহু অকল্যাণের মূল, বিশেষত জাতের লড়াই এবং গৃহযুদ্ধ। খুব সামান্য বুদ্ধিতেও এটা বোঝা দুষ্কর নয় যে 'বর্ণাশ্রম' ধর্ম পালন বিনা এইসব যুদ্ধ বিবাদের অবসান ঘটানো যাবে, তার কারণ বর্ণাশ্রমের নির্দেশই হচ্ছে –একজন যে উদ্দেশ্যে জন্মেছে তার সেই অস্তিত্বের শর্তকে সে পূরণ করবে সেবা ও কর্তব্যের মানসিকতা নিয়ে (অর্থাৎ সে যে 'বর্ণে' জন্মেছে সেই বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব সে পালন করবে সেবার মনোভাব নিয়ে।)"[৭]

গান্ধিজীর উপলব্ধিতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন

দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা গান্ধিজীকে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই পরিসরে তিনি তাদের সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ব্যক্তিগত কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মানসলোককে উদ্বেলিত করেছিল। তাঁর চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা, দার্শনিক প্রজ্ঞার মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ফলে তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িয়ে কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে যারবেদা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকার সময় গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে গান্ধির দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯৩২ এ *"যারবেদা মন্দির থেকে"* শিরোনামে এখানে ১৬টি বিষয় প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ' ছিল অন্যতম একটি। এখানে গান্ধিজি জানিয়েছেন-কেউ জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য হতে পারে না। কোন কোন মানুষকে জন্মাবধি অস্পৃশ্য বিবেচনা করা অন্যায়। সন্তানের মল-মূত্র পরিষ্কার করার পর মা যতক্ষণ স্নান না করছেন, ততক্ষণ 'অস্পৃশ্য' হতে পারেন। কিন্তু সেই সময়ে কোন শিশু যদি তাঁকে স্পর্শ করে ফেলে, তবে সে দূষিত হয়ে যেতে পারে না। অথচ ভাংগী, ধাংগর ও চামার প্রমুখদের জন্ম থেকেই উপেক্ষা ভরে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয়। বছর বছর ধরে তাঁরা অনেক সাবান মেখে স্নান করতে পারেন, ভাল পোষাক পরতে পারেন, বৈষ্ণবদের ফোঁটা-তিলক ছাপ লাগাতে পারেন, প্রত্যহ গীতাপাঠ করতে পারেন এবং শিক্ষিতের পেষায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তবুও তাঁদের অস্পৃশ্যতার ছাপ ঘুঁচবে না। এ হল চূড়ান্ত অধার্মিকতার লক্ষণ, যার ধ্বংসই একমাত্র কাম্য। এপ্রসঙ্গে গান্ধিজি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

> "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে আশ্রমের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করতে চাই যে অস্পৃশ্যতা কেবল হিন্দুধর্মের কোন রকম অঙ্গই নয়, বরং এ এক প্লেগ ব্যাধি, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রতিটি হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য। তাই প্রতিটি হিন্দু যাঁরা এই প্রথাকে পাপ বিবেচনা করেন তাঁরা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের সঙ্গে সহজে মিত্রতা বন্ধন গড়ে তুলে এর

প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তাঁদের সঙ্গে সেবা ও প্রেমভাবনা চালিত হয়ে মেলা–মেশা করবেন। এই ভাবে এই পাপ প্রথার বিরোধী হিন্দুরা নিজেদের শুদ্ধিকরণ হচ্ছে মনে করবেন। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের যুগ যুগের দাসত্বের কারণ সঞ্জাত অজ্ঞানপুঞ্জ ও অন্যান্য দোষত্রুটি থেকে মুক্তি দেবার জন্য এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ মেটাবার জন্য ঐ জাতীয় হিন্দুরা ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা করবেন। এইভাবে তাঁরা অন্য হিন্দুদেরও অনুরূপ আচরণের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন”।[৮]

অস্পৃশ্যতা বর্জন বিষয়েও গান্ধিজি জানিয়েছেন-

“অনেক কংগ্রেসী এই ব্যপারকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে আবশ্যক বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য এই ধারণা অনেকে রাখেন না। যদি হিন্দু কংগ্রেসীরা অস্পৃশ্যতা বর্জন উহার নিজস্ব আবশ্যকতার জন্যই মানেন, তবে তাহার তথাকথিত ‘সনাতনী’দিগকে আজকের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা এই বিষয়টা সনাতনীদের সহিত লড়াই করার বিষয় বলিয়া না লইয়া, অহিংসকের পক্ষে যা ভাব হওয়া উচিত – বন্ধুত্বের ভাব লইয়াই যেন গ্রহণ করেন। আর হরিজনদের সম্পর্কেও ইহাই আবশ্যক যে, প্রত্যেক হিন্দু তাহাদের সমস্যাকে নিজ সমস্যা বলিয়া মনে করিবেন—তাহাদের ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবেন। হরিজনদের যে একাকীত্ব, দুনিয়ায় তাহার সহিত এত বড় নিদারুণ একাকীত্ব আর দেখা যায় না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, এই কাজ করা কত কঠিন। কিন্তু স্বরাজের সৌধ নির্মাণ করিতে হইলে এই কাজ অবশ্য করণীয়। স্বরাজের পথ ত দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ। এই পথে অনেক পিচ্ছিল চড়াই ও গভীর খাদ আছে। দৃঢ়পদে এই সকল সঙ্কট পার হইতে হইবে, তবে না আমরা স্বরাজশীর্ষে পৌঁছাইতে পারিব ও সেইখানকার স্বাধীনতার নির্মল বায়ুতে শ্বাস লইতে পারিব।”[৯]

তিনি আর বলেন যে-

“আমি পুনর্জন্ম চাই না। কিন্তু যদি আমাকে পুনর্জন্ম দিতে হয় আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে জন্মাই, যাতে করে আমি তাদের দুঃখ-কষ্ট ও নিয়ত মহা-অপমান ভাগ করে নিতে পারি। যাতে করে ঐ চরম দুর্দশা থেকে নিজেকে ও তাদের মুক্ত করতে আমি সচেষ্ট হতে পারি। তাই আমি প্রার্থনা করছি যে, যদি পুনরায় জন্মাতে হয় আমি

> যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বা শূদ্র না হয়ে 'অতিশূদ্র' হয়ে জন্মাই"।[১০]

তিনি উপনিষদীয় ভাবনার দ্বারা উদবুদ্ধ হয়ে বলেন সব মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর অবস্থান করে, সকলেই অমৃতের পুত্র। তাই কোনও ব্যক্তি বিশেষকেই অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা ঠিক নয়। গান্ধিজীর মতে অহিংসা ও প্রেমের দ্বারাই এক সর্বোদয় সমাজ গড়ে উঠতে পারে যেখানে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকবে না; তেমনি থাকবে না কোনও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যর ভেদাভেদ। গান্ধিজীর ভাষায়: "Removal of untouchability means love for and service of the whole world and thus merges into ahimsa"। এই প্রসঙ্গে R. K. Pravu এবং U. R. Rao *The Mind of Gandhi* গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য (১৯৩৮ সালের 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত) My mother said, 'you must not touch this body, he is an untouchable,' "why not?" I questioned back and from that day revolt began.[১১]

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় গান্ধিজীর দর্শনে অহিংসা ও সত্যের সাধনার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা স্পষ্ট। তিনি অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে সামাজিক বিষয় হিসাবে গণ্য করলেও তিনি পুরোপুরি জাতিপ্রথার ধ্বংস চাননি— চেয়েছিলেন বর্ণ কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে কিছু সংস্কার; যাতে তাঁর 'অস্পৃশ্য/হরিজন'-দের বর্ণ হিন্দুরা ঘৃণা না করে। এককথায় গান্ধিজি নিম্নবর্ণীয়দের সামাজিক মুক্তির জন্য তাঁদেরকে 'হরিজন' অভিধায় অভিহিত করে 'হরিজন আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি তাঁদের মানবিক মুক্তির প্রয়াসও চেয়েছিলেন। তবে এবিষয়ে গান্ধিজি কোন স্থায়ী সমাধান সূত্রের সন্ধান দেননি বলা যায়। বর্তমানে অনেক গান্ধি সমালোচক হরিজন আন্দোলনে গান্ধিজির ভূমিকাকে তির্যকভাবে দেখেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> "অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে মহাত্মাজী যে আন্দোলন শুরু করেন তাও তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত, ধর্মপ্রাণ গান্ধির অহিংসার নীতি 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, 'স্বরাজ' এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা নিয়ে টালবাহানা, শত্রুর ক্ষতি না করে তার হৃদয় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, মালিক-শ্রমিকের পিতা-পুত্র প্রতিম সম্পর্ক স্থাপনের প্রচার ইত্যাদির মতোই গান্ধি নির্দেশিত বর্ণ হিন্দু 'হরিজন' দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ একান্তভাবেই মহাত্মাসুলভ বর্ণাশ্রম বজায় রেখে। যাবতীয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে, গীতার মাহাত্ম্য প্রচার করে মহাত্মাজী 'হরিজন' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। হিন্দু –মুসলমান প্রশ্নেও গান্ধি ব্যর্থ আর একইভাবে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনেও তিনি ব্যর্থ।"[১২]

সূত্রনির্দেশ

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান,* হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬, পৃ. ৩৪৪।

২. কৃষ্ণ কুমার সরকার, ‘বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে গান্ধি’, রিম্পা দাস (সম্পাদিত), *তিহাস, আন্তর্জালিক পত্রিকা, Vol. 1, No.1, July, 2020,* পৃ. পৃ. ২৪-৩০।

৩. সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.), *ভারতবর্ষ: রাষ্ট্রভাবনা,* কলকাতা: প্রকাশন একুশে, ২০০১, পৃ. ৩১৯।

৪. শ্রীমান নারায়ণ (সম্পা.), *মহাত্মাগান্ধির নির্বাচিত রচনা, পঞ্চম খন্ড[সত্যের আহ্বান],* আমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০, পৃ. ৪০৮।

৫. *ইয়ং ইণ্ডিয়া,* ২৪.১১.১৯২৭, পৃ. ৩৯০।

৬. আর. কে. প্রভু ও ইউ. আর. রাও (*সম্পা.*), *গান্ধী-মানস,* নয়া দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৪, পৃ. ৮৯।

৭. *হরিজন,* ২৮.০৯.১৯৩৪, পৃ. পৃ. ২৬০-২৬২।

৮. শ্রীমান নারায়ণ (সম্পা.), *মহাত্মাগান্ধির নির্বাচিত রচনা, তৃতীয় খন্ড [মৌলিক রচনা সমূহ],* আমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০, পৃ. ১৮২।

৯. মহাত্মা গান্ধি, *গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি-এর অর্থ ও স্থান,* পুনা, ১৯৪৫।

১০. আর. কে. প্রভু ও ইউ. আর. রাও (*সম্পা.*), *প্রাগুক্ত,* পৃ. পৃ. ৮৬-৮৭।

১১. R. K. Pravu & U. R Rao (Eds.), *The Mind of the Mahatma Gandhi*, Ahamadabad: Nabajiban Publishing House, 1967.

১২. সুকান্ত পাল (সম্পা.), *বহুমাত্রিকতার আলোকে ভীমরাও আম্বেদকর,* কলকাতা: মিত্রম, ২০১৭, পৃ. ২০৯।

বাঙালি জাগরণের এক বিস্মৃত অধ্যায় : ব্রজেন্দ্র কুমার দে'র 'বর্গী এলো দেশে'

মৃণাল কান্তি রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : অষ্টাদশ শতকে বাংলায় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত ক্রমশই জটিলতায় সমাচ্ছন্ন ছিল। সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে তখন সবাই ব্যস্ত। হিংসা, নিন্দা, পরস্পরের বিরোধীতা, এবং খুন-জখমের নেশায় তখন সবাই বাতিকগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। ১৭৪০ সালে আলিবর্দী খাঁ তৎকালীন বাংলার নবাব সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার নবাবী সিংহাসন দখল করেন। এবং সিংহাসনারোহণের পর আপন আত্মীয়দের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন নিয়ে নানা রকম বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় দুর্ধর্ষ মারাঠা সৈন্যরা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে অতর্কিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে বাংলার নবাব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। সব রকম চেষ্টা করেও নবাব তাঁর সাধের বাংলাকে সেদিন বাঁচাতে পারেনি। মারাঠারা চৌথ (কর) আদায় করতে এলেও নিজেদের স্বভাবধর্ম ভুলতে পারেনি। তাঁরা বাংলাদেশের মানুষকে চরম দুর্ভোগে ফেলে, হাত-পা কেটে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে, নারী ধর্ষণ করে, খেত-খামার পুড়িয়ে এক রূদ্ধশ্বাস পরিবেশের সৃষ্টি করে। গ্রামাঞ্চল, শস্যক্ষেত্র শুনশান শ্মশানে পরিণত হয়। যে সমস্ত মারাঠারা বাংলাদেশে এসে হাঙ্গামা চালিয়েছিল তাঁদের বাঙালিরা, 'বর্গী', নাম দিয়েছিল। এবং বর্গীদের এই আক্রমণ বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা বা বর্গীর আক্রমণ নামে পরিচিত। ১৭৪২ সালে এই আক্রমণ শুরু হয় এবং ১৭৫২ পর্যন্ত চলে। বর্গীদের এই বীভৎস অত্যাচার থেকে বাঁচতে সেদিন বহু মানুষ দলে দলে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও কলকাতায় পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এই আক্রমণের ফলে কৃষিকাজ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশিয় কুটির শিল্প প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এবং বাংলায় ১৭৫৭ সালে স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পরই ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভীত মজবুত হয়, এবং ইংরেজদের অত্যাধিক শোষণের ফলস্বরূপ ১৭৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সমকালীন বিভিন্ন লেখায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা হয়েছিল। তথাপি বর্গীদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার এই যন্ত্রণা বাঙালি কোনোদিন ভুলতে পারেনি। আজও বাঙালিরা ছত্রে ছত্রে বর্গীদের এই নিষ্ঠুরতার কথা সবসময় স্মরণ করে। আজও বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে, জলে-স্থলে সেই বিভীষিকার কথা মিথের ন্যায় মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। নেপোলিয়নের সময় ইংল্যান্ডবাসী যেমন নেপোলিয়নের নাম করে দুষ্টু শিশুদের ঘুম পাড়াত, বাংলাদেশে আজও বাঙালি মায়েরা বর্গীদের নাম করে দুষ্টু শিশুদের ঘুম পাড়ানি গান

শোনায় –‘খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে।’ যার মধ্যে দিয়ে নারীহৃদয়ের হাহাকার, ভয় এবং আশঙ্কার চিত্রটি ফুটে উঠেছে।
সূচক শব্দ : মারাঠা বর্গী, সুজলা-সুফলা, সিংহাসনারোহণ, আক্রমণ, কল্যাণময়ী, স্বদেশী।

প্রতিপাদ্য বিষয় :
অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ঘটে যাওয়া এই বিষয়কে নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হয়ে আসছে। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ে দু'খানি কাব্য রচিত হয়েছে। একখানি সংস্কৃতে রচিত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ‘চিত্রচম্পু’ (১৭৪৪), দ্বিতীয়ত, গঙ্গারামের ‘মহারাষ্ট্রপুরাণ’ (১৭৫১)। এবং কবি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ (১৭৫২) কাব্যের গ্রন্থারম্ভে এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে। শুধু মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নয় আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য থেকে নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতাতেও এই আক্রমণের কথা উঠে এসেছে। বাংলা ভাষায় যে সকল নাটকে বর্গীদের কথা উঠে এসেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – নিশিকান্ত বসুর ‘বঙ্গে বর্গী’, ব্রজেন্দ্রকুমার দে’র ‘বর্গী এলো দেশে’, নন্দলাল রায়চৌধুরী ও পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের সমনামে লেখা ‘ভাস্কর পণ্ডিত’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত নাটকের বিষয় হিসাবে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ ও বাংলাদেশের হাল চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তারই সাথে নাট্যকাররা ইতিহাসের পাতায় উৎশৃঙ্খল যুবক হিসাবে চিহ্নিত নবাব সিরাজদ্দৌলার মানবিক কাহিনি উপস্থাপন ও বর্গী সর্দার দাম্ভিক ভাস্কর পণ্ডিতকে কোমলে-কঠিনে রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে অঙ্কন করে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। ফলে বাস্তব থেকে সরে এলেও নাটকগুলি সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য এই নিবন্ধে ব্রজেন্দ্র কুমার দে’র ‘বর্গী এলো দেশে’ নাটকে মারাঠা বর্গীদের নিগ্রহের বিপরীতে বাঙালিদের জেগে ওঠার বিষয়টি বিশ্লেষিত হবে।

বাংলা যাত্রাপালার ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) একটি সুপরিচিত নাম। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অসংখ্য যাত্রাপালা (নাটক) লিখে তিনি নিজের আসনটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক গুলি হল ‘বর্গী এলো দেশে’, ‘ভৈরবের ডাক’, ‘ঝান্সীর রাণী’, ‘ভারত-তীর্থ’, ‘চাঁদের মেয়ে’, ‘বঙ্গবীর’, ‘প্রবীরার্জ্জুন’, ‘রাজলক্ষ্মী’, ‘বাঁশের বাঁশী’, ‘সারথি’, ‘রাজ-নন্দিনী’,’, ‘ভক্ত কবি জয়দেব’, ‘দানবীর’, ‘চাষার ছেলে’, ‘গন্ধর্ব্বের মেয়ে’, ‘গাঁয়ের মেয়ে’, ‘কুরুক্ষেত্রের আগে’, ‘রক্তের আলপনা’ প্রভৃতি।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে’র ‘বর্গী এলো দেশে’ (১৩৫৭) নাটকটি কলকাতার নবরঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। এই পালা সেইসময় বেশিরভাগ মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। মারাঠা বর্গী সৈন্যরা বাংলাদেশের গ্রামে ঢুকে যেভাবে অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালাত তারই খণ্ডচিত্র ধরা পড়েছে এই নাটকে। অনেক কাল্পনিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে কাহিনিকে রসোগ্রাহী করে তুলেছেন নাট্যকার। এই ঐতিহাসিক

নাটকটির প্রধান বিশেষত্ব হল ব্রজেন্দ্রকুমার দে বর্গীদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। নাটকের এক চরিত্র জনার্দ্দন জানায় - "না-ই বাঁচলুম ভাই। অমর হয়ে ত আসিনি। মরবো, কিন্তু মরার আগে জানিয়ে যাবো যে বাঙ্গালীরা ভীরু নয়, বাঙ্গালীরা মরে কিন্তু হটে না।" [১]নাটকের অনেক গান বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে নাটকের এক চরিত্র গঙ্গারাম বলেছে –

"চোখ মেলে চেয়ে দেখ ছয় কোটি বাঙ্গালি,
কত খুন ঢেলে দিয়ে কত জমি রাঙালি।
কত শিশু বলি হলো, কত যে ভেঙ্গেছে শাঁখা,
কত ঘর হলো ছাই, পথঘাট খুনে মাখা,
আজও ঘুমে যে বিভোল,
লাথি মেরে তারে তোল,
অসি হাতে দিয়ে বল্ কেন ঘুম ভাঙ্গালি।" [২]

সর্বোপরি নাট্যকার নাটকের ভূমিকাংশে লিখেছেন - "এই নাটক দেখিয়া বা পড়িয়া একজন বাঙ্গালীর মনেও যদি একটুখানি দেশাত্মবোধ জাগে, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।" [৩]

নাটকটিতে সর্বত্র বাঙ্গালীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা হয়েছে। বাঙালিরা যেমন অপমান সহ্য করতে পারে, তেমনি পারে অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। মেহেরউন্নিসা চরিত্রে বাঙালি নারীর প্রেমময়ী ও রণংদেহী দুই মূর্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালি নারীরা শত অপমানসত্ত্বেও শত আঘাতেও পাপীকে অভিশাপ দেয় না, শরীর থেকে প্রাণ গেলেও কখনও কারও অনিষ্ট কামনা করে না। এমন চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় আলোচ্য নাটকে। কবি গঙ্গারামের স্ত্রী কাকলি, তাদের একমাত্র নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণ নিয়েছে মধুরাও নামে এক নিষ্ঠুর বর্গী। পুত্র, সংসার হারিয়ে উন্মাদিনী হয়েছেন কাকলী। শত দুঃখ কষ্ট পেরিয়ে যখন পাপীকে হাতে পেয়েছে, তখন শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে কল্যাণময়ী নারী পাপিষ্ঠ মধুরাওয়ের মধ্যে নিজ সন্তানকে কল্পনা করে ছেড়ে দিয়েছে। তার করুণায় নিষ্ঠুর মারাঠার মনেও নারকীয় হত্যালীলার পরিবর্তে প্রেম ভাব জন্ম নিয়েছে। মধুরাও জানিয়েছে – "এই বাংলার নারী। জানি না এদের হৃদয় কি দিয়ে গড়া। এরা আঘাত পেয়েও অভিশাপ দেয় না। প্রাণ গেলেও কারও অনিষ্ট কামনা করে না। বাংলা যদি বাঁচে, এই সর্ব্বংসহা মায়েদের জন্যই বাঁচবে। মার কবি, আর আমার মরতে ভয় নেই। মহিমময়ি জননি, অভিশাপ যদি না দাও, আশীর্বাদ কর, যেন পরজন্মে তুমি হও মা, আমি হই তোমার সন্তান।" [৪]শুধু তাই নয়, মধুরাওয়ের মত নিষ্ঠুর বর্গীও অনুভব করতে পেরেছে – "বাংলার ধ্বংস নেই, বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে যতই চেষ্টা করুক, তাতে শুধু তাদেরই শক্তি ক্ষয় হবে। এ জাতি নিজের গরিমায় ভারতে অমর হয়ে থাকবে।"[৫]আলিবর্দী খানও আফগান সেনাপতি ও

সেনাবাহিনীর তুলনায় কম শক্তিশালী বাঙালি সৈন্যদের প্রতি আস্থা রেখেছেন বাংলাকে রক্ষার জন্যে। এখানেই নাটকটিতে বাঙালিদের জয় ঘোষিত হয়েছে।

পাশাপাশি আক্রাম খাঁ'য়ের মত ঘরশত্রু বিভীষণের চরিত্রও এঁকেছেন নাট্যকার। যে আক্রাম খাঁ প্রতিবেশি হিন্দুদের উপর নির্যাতন হতে দেখেও প্রতিকার করে না, বরং হিন্দুদের নিপীড়নে আহ্লাদিত হয়। এই আক্রাম খাঁ'ই সুযোগ বুঝে মারাঠা বর্গীদের হিন্দু নারীদের উপর লেলিয়ে দিয়েছে। আবার পরোপকারী দিবাকরকে দুশমনের কাছে সঁপে দিয়েছে। অবশেষে নিজের পাপে নিজেই ধ্বংস হয় সে। একদিকে পত্নী সিতারার মৃত্যু হয়, অন্যদিকে মেয়ে মেহেরউন্নিসাকে নবাবী দস্যুরা হরণ করে। তখন কপট আক্রাম খাঁ'য়ের দুঃখে পাঠকের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। আসলে তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে এ ধরনের ঘরশত্রু অসংখ্য ছিল। যাঁরা মারাঠীদের বাংলার গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছিল। না হলে হাজার হাজার বর্গমাইল দূরে থাকা মারাঠীরা বাংলাদেশের ধনসম্পদের খোঁজ পেল কীভাবে? নাটকের এক চরিত্র সিতারা তাই বলেছে – "বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালীর রক্ত খেতে বর্গীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখন বাংলার আর কোন ভরসা নেই।"[৬] ভাস্কর পণ্ডিতও এক সময় দাম্ভিকতার স্বরে বলেছেন – "পেশোয়া বলেছেন মহারাষ্ট্র মারাঠীদের, পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের, রাজস্থান রাজপুতের জন্য, কিন্তু বাংলা সবার জন্য। এই মধুচক্রের সবটুকু মধু আমি শোষণ করে নিয়ে যাবো পেশোয়ার জন্য। আজ নিয়ে যাবো "চৌথ", কাল চাইবো সেলামি, পরশু দাবি করবো রাজস্বের অর্ধাংশ। দেবে না আলিবর্দী খাঁ? তাহলে তাকে বাংলার মসনদ থেকে টেনে এনে ভাগীরথীর জলে ডুবিয়ে মারবো।"[৭]

নাটকে নবাব আলিবর্দীর পত্নী শরফেন্নুসার বীরত্ব অত্যন্ত প্রশংসারযোগ্য। শরফুন্নেসা বেগম সবসময় শাসনকার্য পরিচালনায় আলিবর্দীকে পেছন থেকে সাহস ও শক্তি জোগাত। কোনো কাজে মতিভ্রম হলে আলিবর্দী সঙ্গে সঙ্গে শরফুন্নেসার পরামর্শ গ্রহণ করত। নাটকে একসময় আলিবর্দী বর্গীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে বিপুল সংখ্যক মারাঠা বাহিনীর সম্মুখে বীরবিক্রমে লড়াই চালিয়ে আলিবর্দীকে উদ্ধার করেছে বেগম শরফুন্নেসা। আবার প্রজাদের কথা মাথায় রেখেই দুশমন ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করতেও নবাবকে উপদেশ দিয়েছে। যদিও ধার্মিক আলিবর্দী সে পরামর্শ শুনতে নারাজ ছিল। তথাপি শুধুমাত্র বাংলাদেশের ৬ কোটি প্রজাদের কথা মাথায় রেখেই শরফুন্নেসা ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছে। কারণ শরফুন্নেসা বেগম জানতেন ভাস্কর পণ্ডিতকে না মারলে বাংলায় বর্গীদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও নারীনির্যাতন বন্ধ হবার নয়; ফলে স্বামীকে রাজার ধর্ম প্রজাপালনে উৎসাহ দিয়েছে সে। যার মধ্য দিয়ে প্রজানুরঞ্জক ও নবাবী বেগমের আদর্শ রূপটি সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে।

নাটকে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মোস্তফা খাঁ'য়ের বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলার নবাব আলিবর্দী যখন বর্গীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে দিশেহারা, তখন মোস্তফা খাঁ বারবার নবাবকে বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করতে উৎসাহিত করেছে। অবশ্য এর পেছনে

মোস্তফা খাঁ'র দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, নবাবের সঙ্গে বর্গীদের সন্ধি হলে মোস্তফা সন্ধির এক-চতুর্থাংশ ভাগ পেত। দ্বিতীয়ত, মোস্তফা খাঁ বর্গীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নবাবের শক্তি ক্ষয় করতে চেয়েছিল, যাতে নবাবের মসনদ খুব সহজেই মোস্তফা খাঁ'য়ের হস্তগত হয়। এজন্য তিনি প্রতি মুহূর্তে আলিবর্দীর বিরুদ্ধচারণ করেন। কিন্তু মোস্তফা খাঁ'য়ের মত বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞর কাছে মোস্তফার কৌশল পঙ্গু হয়ে যায়। শেষে ভাস্করের কাছ থেকে হতাশ চিত্তে কপর্দকশূন্য হয়ে ফিরতে হয় তাঁকে। এর ফলে ভাস্কর পণ্ডিতের মনে প্রতিহিংসার আগুন দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, এবং এতদিন যে মোস্তফা নবাবের ক্ষতি চাইত, এখন সে নবাবের হিতকাঙ্খীরূপে যোগদান করে। শেষে তাঁর হাতেই ভাস্কর পণ্ডিতের যবনিকাপতন ঘটে। বলা চলে, এই মোস্তফা খাঁ'ই বর্গীদের বাংলাদেশে অবাধ লুণ্ঠনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। নবাব মোস্তফা খাঁ'নের উপর দশ হাজার সৈন্য দিয়ে বর্গী দমনে নিশ্চিন্তে ছিলেন। কিন্তু মোস্তফা খাঁ'য়ের মনে চলেছিল অন্য ফল্গুস্রোত। যার পরিণাম সুখের হয়নি। মোস্তাফা বর্গীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না করায় বর্গীরা বাংলাদেশের গ্রাম-নগর লুঠ করে, সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে, নারীদের লাঞ্ছিত করে, জগৎ শেঠের কুঠি লুট করে এবং নবাবকে দিশেহারা করে। যদিও বাস্তবে মোস্তফা খাঁ নবাবকে সন্ধি করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বর্গী দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তথাপি সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, মোস্তফা খাঁ নবাবকে নিগন সরাইয়ের যুদ্ধে সহায়তা করে কাটোয়ায় পৌঁছে দিলেও পরবর্তীকালে তাঁর প্রার্থিত শাসক পথ না পাওয়ায় আজীবন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছিল। আর এখানেই মোস্তফা খাঁ'য়ের প্রকৃত স্বরূপটি পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে। এজন্যই বোধহয় আলোচ্য নাটকে নাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে শক্তিশালী আফগান সৈন্যদের চাইতেও বাঙালিদের প্রতি বাংলা রক্ষার দায়ভার অর্পণ করতে চেয়েছেন।

সবথেকে মজার ব্যাপার হল, এই নাটকের কাহিনিতে ব্রজেন্দ্রকুমার দে কবি গঙ্গারামকে সরাসরি মঞ্চে নিয়ে এসেছেন। যা এর আগে কোনো সাহিত্যিক করেনি। ফলে নাটকটিতে গঙ্গারামের কাব্যের প্রভাব পড়েছে এবং নাটকে বৈচিত্র্য এসেছে একথা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বর্গীদের আক্রমণে বাংলার মানুষের বীভৎসতার কথা বলতে গিয়ে 'মহারাষ্ট্রপুরাণে'র কবি গঙ্গারাম লিখেছেন –

"কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ।।
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।।
এক জনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে।।
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা।

সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া।।”[৮]

কবি ভারতচন্দ্রও রাজসভায় বসে কাব্য রচনা করলেও তৎকালীন সময়ের যুগ সমস্যার কথা ভুলতে পারেননি বলেই হয়তো কাব্যারম্ভে বর্গীদের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন –

“লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গল।।
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল।।” [৯]

এই মারাঠা আক্রমণ বাঙালি জীবনের এক কালো অধ্যায়স্বরূপ। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন –“বর্গীর হাঙ্গামা একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ধনেপ্রাণে সর্বনাশ করিয়াছিল। সেই ব্যাপক ক্ষতি ও অত্যাচারের ক্ষত চিহ্ন বাঙালি কোনদিনই ভুলিতে পারে নাই, নর-নারী-শিশু সকলেরই চিত্তে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।” [১০]

প্রায় একদশক ধরে মারাঠা বর্গীরা বাংলাদেশের যে ধ্বংসকারী বিভীষিকা এনেছিল তার ফলস্বরূপ বাংলার সমাজজীবন থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্রই বিপুল পরিবর্তন সূচিত হয়। এই প্রলয়কারী আক্রমণে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ভাঙন ধরে এবং নতুন উপনিবেশ হিসাবে কলকাতা নগরীর উদ্ভব ঘটে। আত্মরক্ষার্থে মানুষ বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ ছেড়ে উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ এবং কলকাতায় শরণার্থী হয়ে চলে যায়। মহাশ্বেতা দেবী এই অদলবদলের ইতিহাসকে, বিশেষত লোকচলাচলের ইতিহাসকে ‘এক্সোডাস’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একথা সত্যি যে, আঠারো শতক শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষীয় জীবনে কালো অধ্যায়স্বরূপ। বিদেশি শত্রুদের বারবার আক্রমণে এই সময় সমাজজীবন থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্রই বিপর্যয় নেমে এসেছিল। বাংলাদেশে এই সময় একদিকে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে নানা কুসংস্কারের জড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও শাসকদের হিংসাত্মক বিষ-বাষ্প সাধারণ জনজীবনকে নরকতুল্য করে রেখেছিল। একের পর এক শাসকের আনাগোনা বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে বহিঃশত্রুর নিপীড়ন, অন্যদিকে দেশীয় শাসকদের শোষণের ফলে সাধারণ মানুষের সুখনিদ্রা চিরতরে ঘুচে গিয়েছিল। আবার মারাঠা বর্গীদের পাশবিক নির্যাতনে মানুষ ‘কাটা ঘায়ে নুন ছিটা’র মতো বেদনায় ছটফট করেছিল সেদিন। সর্বোপরি বাংলাদেশে নবাবদের সময়েই বিদেশি বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রভাব বিস্তার হয়। অবশেষে ১৭৫৭ সালের বাংলার চিরাচরিত ইতিহাসের পালাবদল ঘটে। এবং বাংলার মাটিতেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার

অবসান ঘটে; পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে নব্যাধুনিক মানসবদলের সূত্রপাত ঘটে। উক্ত নাটকটিতে সেদিনের সেই জ্বলন্ত চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। সর্বোপরি বাঙালি জাগরণের বিষয়টি নাটকে নতুন মাত্রা দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উৎস নির্দেশ

১) দে ব্রজেন্দ্রকুমার – 'বর্গী এলো দেশে', ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃ – ৬।

২) পূর্বোক্ত, পৃ – ৫৬।

৩) পূর্বোক্ত নাটকের ভূমিকাংশ।

৪) পূর্বোক্ত, পৃ – ১২৬।

৫) পূর্বোক্ত, পৃ – ১২৭।

৬) পূর্বোক্ত, পৃ – ৪২।

৭) পূর্বোক্ত, পৃ – ৪৩।

৮) গঙ্গারাম – 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' (যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সম্পাদিত), নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০১৯, পৃ – ২৬-২৭।

৯) রায় ভারতচন্দ্র – 'অন্নদামঙ্গল' (ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ, সম্পাদনা শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, মাঘ ১৩৪৯, পৃ – ১৭ ।

১০) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার – 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ৩য় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃ – ৪১ ।

সহায়ক গ্রন্থ

১) Datta Kalikinkar – 'Alivardi and his Time', University of Culcutta, ১৯৩৯।

২) রায় নিখিলনাথ – 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০ ।

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন – 'বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।

৪) মজুমদার রমেশচন্দ্র – 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার য়্যাণ্ড পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৭৩ ।

বাংলাদেশের ম্রো নৃগোষ্ঠীর জুমভাষা : একটি বাস্তুভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা

মুহাম্মদ তসলিম উদদীন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি নিয়ে সাংস্কৃতিক সম-অঞ্চল (Iso-Area) পার্বত্য চট্টগ্রাম। নৈসর্গিক এ অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী ও তাঁদের অভিপ্রয়াণ (Migration) বৈচিত্র্যময়। সাংস্কৃতিক উপাদানে এখানকার অর্থনীতি ও সমাজাদর্শ প্রায় সমধর্মী হলেও ভাষাবৈচিত্র্যে আছে বিভিন্নতা। বর্তমান প্রবন্ধে সমাজভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics) বা বাস্তুভাষাতত্ত্ব (Ecolinguistics) এ বান্দরবান পার্বত্য জেলার দুর্গম পাহাড়ে বসবাসরত প্রান্তিক ম্রো নৃগোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় জুম তথা কৃষিভাষার অনন্য দিক নিয়ে আলোকপাত হয়েছে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ওজস্বী দিক ভাষা। এর মাধ্যমে সমাজব্যক্তির অন্তরাহরিত ভাবনারাজির সারাৎসার প্রকাশ ঘটে। আমরা জানি, প্রেরক, গ্রাহক ও প্রতিবেশের ওপর ভাষার চরিত্রনির্ভর করে। প্রেরকের সামাজিক পরিচয়ের মাধ্যমে মূলত ব্যক্তির সমাজভাষা চিহ্নিত হয়। তবে এখানে ভাষা-এলাকা (Domain) একটা বড় বিষয়। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর আন্তঃসম্পর্ক বিনির্মাণে ভাষা-সংযোগের ভূমিকা অপরিসীম। ম্রো নৃগোষ্ঠীদের প্রায় নব্বইভাগ লোক জীবিকানির্বাহের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে জুমকে বেচে নেয়। তাই এদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা এবং জুমকেন্দ্রিক আচারকৃত্যের ভাষায় আছে স্বতন্ত্রতা। মূলত ম্রো নৃগোষ্ঠীগণের ভাষা-পরিস্থিতি ও বাস্তুভাষা হিসেবে জুমভাষায় তারা কতটুকু পারদর্শী তা প্রতিপাদন করত এ ভাষার অভিনবত্ব তুলে ধরাই হবে এ প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ।]
সূচকশব্দ : বাস্তুভাষা, ম্রোভাষা, ম্রো নৃগোষ্ঠী, জুমচক্র, জুমশব্দ

জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কই বাস্তুবিদ্যা (Ecology)। বাস্তুবিদ্যার মৌল কার্যকরী একক বাস্তুতন্ত্র। একটি জীবের সাথে তার পরিবেশের প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছেই। কোনো একপ্রকার জীবকে ঘিরে এবং তার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী সজীব ও নির্জীব বস্তুসমূহই জীবটির পরিবেশ। এভাবে দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে কোনো একটি অঞ্চলে বসবাসকারী সকল জীব সম্প্রদায়ই পরস্পরের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই বসবাসের উপযোগী যে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠে তা হলো বাস্তুতন্ত্র। সমাজব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার অন্যতম মাধ্যম ভাষা। সম-অঞ্চলের আলো বাতাসে বেড়ে উঠা ব্যক্তিবর্গের ভাববিনিময়ের সমাজভাষাই বাস্তুভাষা। বাস্তুভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক

অনুশীলনকে বলা হয় 'বাস্তুভাষাতত্ত্ব'। বাস্তুভাষাতত্ত্ব (Ecolinguistics), বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ফলিত শাখা সমাজভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics) এর অন্তর্গত। তাই বাস্তুভাষাতত্ত্ব পঠন-পাঠনে সমাজভাষাতত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম। অন্যদিকে সমাজভাষাতত্ত্ব নির্ভরশীল সমাজ-কাঠামোর ওপর। সামাজিক বিধিনিষেধ, সমাজব্যক্তির প্রত্যাশা-প্রাপ্তি-প্রেক্ষাপটকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় সমাজভাষাতত্ত্ব অভিধাটি। এটিকে ভূগোল-ভাষায় নয়; দেখা হয় সামাজিক স্তরবিন্যাসে অঙ্গীভূত করে।

ভাষা ব্যবহারে এলাকা (Domain) একটা বিশেষ ফ্যাক্ট। একটি নির্দিষ্ট এলাকার সমাজব্যবস্থায় সমমানসিকতা সম্পন্ন ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠী থাকতে পারে। আবার একই এলাকায় বহুভাষী সম্প্রদায়ও থাকতে পারে। পরিবেশ প্রতিবেশের সমাজ-সংস্কৃতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ভাষা-এলাকা।

বৈচিত্র্য হলো ভাষার মূলকথা। সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ ভাষা ও সমাজকে একটি সংগঠন পরিগণন করেন।

স্মরণাতীতকালে কৃষক সমাজ দৈনন্দিন কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি পরিবেশ-প্রতিবেশ, লোকবিজ্ঞান, লোকসংস্কার এবং উৎপাদন সামগ্রীকে ভাষা সংগঠনের মিডিয়ামের সাহায্যে নানা ভাষা কোডে চিহ্নিত করে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান করে আসছে। সমাজ সংগঠনে ভাষা সংগঠনের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশ্লেষণে সমাজভাষাবিজ্ঞানে ফিল্ডওয়ার্ক অবিকল্পক। কেননা ভৌগোলিক কিংবা স্থানিক পার্থক্যের কারণে সমাজ সংগঠনের ভাষা-সংযোগ এবং মাধ্যমগুলি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাই একই ভাষা সংগঠনের অন্তর্গত নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল থেকে ভাষা-কোড সংগ্রহ করে তার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ জরুরি। আর সমাজ সংগঠনের ভাষা সংযোগের বৈচিত্র্যগুলিও বিচার্য।

আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৈসর্গিক লীলাভ‚মি বাংলাদেশের বান্দরবান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) এর চিম্বুক পাহাড় পাদদেশের ম্রো নৃগোষ্ঠীর বাইট্যা পাড়ার সামাজিক সংগঠনে চালিত জুমচাষে ব্যবহৃত ভাষাগুলোর পর্যালোচনা করবো।

তথ্য-সংগ্রহ ও পদ্ধতিবিজ্ঞান

ম্রো নৃগোষ্ঠীদের সাথে থেকে তাদের জুমচাষ এবং এতদ্বিষয়ক সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধ যেহেতু জুমভাষা নিয়ে সেহেতু জুম-সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত সমাজভাষার শব্দগুলিকে নৃতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান (Anthropological Linguistics) এর মাধ্যমে বিশ্লেষণই হবে আমার বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান) মোট জনজাতি ৯,২০,২১৭ জন (বিবিএস প্রকাশিত জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন)। শুধু বান্দরবানে ১২টি নৃগোষ্ঠীর ১,৯৭,৯৭৫ (জনশুমারি ২০২২) জন লোকের বসবাস। তন্মধ্যে ম্রো নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫২,৪৫৫ জন (জনশুমারি ২০২২)। বান্দরবানের সদর জেলা থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বান্দরবান-থানছি

রোডের ৫নং টংকাবতী ইউনিয়নের চিম্বুক পাহাড় পাদদেশের ‘কওয়াং ওয়া’ বা বাইট্যা পাড়া (১২ জুলাই ২০২২) ও ব্রিকসিক পাহাড় ঘেঁষা রামরী পাড়ায় (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২২) আমার ক্ষেত্রসমীক্ষা।

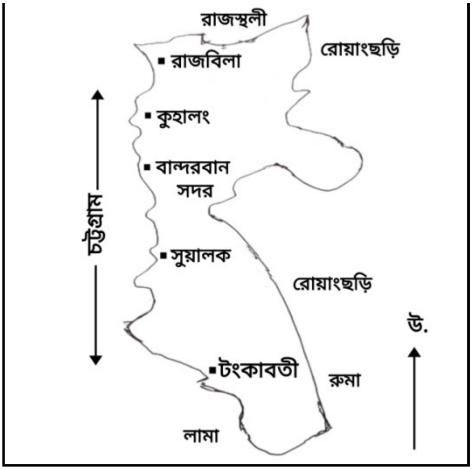

রেখাচিত্র-১ : বান্দরবানের ৫নং টংকাবতী ইউনিয়নের অবস্থান (মানচিত্র স্কেলানুযায়ী নয়)

ইয়াংঙান ম্রো এ গবেষণাকর্মে মূল তথ্যদাতা। তার ভাষ্যমতে উপর্যুক্ত দুই পাড়ায় মোট ১৩৫টি (বাইট্যা পাড়ায় ৭৭টি ও রামরী পাড়ায় ৫৮টি) ম্রো পরিবার যুগ যুগ ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে বসবাস করে আসছে। ‘তুইহির ঝিরি’ এ দুই পাড়াসহ আরো কয়েকটি পাড়ার জুমচাষ এবং নিত্যব্যবহার্য পানির একমাত্র উৎস। বর্তমান গবেষণাকর্মে তথ্য-সংগ্রহে Qualitative Method এর প্রয়োগ করা হয়েছে। এ Method এর In-depth Interview, key Informant Interview, Focus Group Discussion কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগৃহিত উপাত্ত-বিশ্লেষণে দোভাষী (ম্রো-বাংলা) ছিল সহায়ক। আর ডকুমেন্টেশনের পদ্ধতি হিসেবে খাতায় লিখন, কথারেকর্ড এবং ডিজিটাল চিত্রগ্রহণ (স্থির ও চলমান) করা হয়েছে। আর মাঠকর্মে প্রাপ্ত তথ্যের সহায়কে দ্বৈতীয়ক উৎস (Secondary Sources) হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। আমার এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্য জুমচাষসম্পৃক্ত জুমশব্দগুলি সংগ্রহ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমকৃষি-সংস্কৃতিকে সমুন্নত করা।

১.১ ম্রো এথনোগ্রাফি

নৃতাত্ত্বিক বিচারে ম্রোগণ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর তিব্বতী-বার্মান। এদের মুখমণ্ডল গোলাকার, গায়ের রং হলদে-বাদামী, চোখের মণি কালো, চুলগুলো খাড়া, দাড়ি-গোঁফ কম।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার মধ্যে ম্রো নৃগোষ্ঠীগণ বান্দরবানের সব উপজেলায় বসবাস করে। তবে আলিকদম, লামা, বান্দরবান সদর ও থানছিতে এদের সংখ্যা বেশি।

ম্রো শব্দটি *ম্রোচা* থেকে এসেছে। এর অর্থ- মানব সন্তান। ম্রোরা নিজেদেরকে ম্রোচা বা মারুসা পরিচয় দিয়ে থাকে। পার্বত্য বাঙালিদের কাছে তারা মুরং নামে সমধিক পরিচিত।

আনক, দমরং, সুংমো নামে ম্রোদের তিনটি গোত্র আছে। ম্রো পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। ম্রোদের একই গোত্রের ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে বহুবিবাহ এবং বিধবাবিবাহে এদের কোনো আপত্তি নেই। ম্রোরা ক্রামা, বৌদ্ধ, প্রকৃতি-পূজারি ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। 'ক্রামা' ম্রোদের নতুন ধর্মব্যবস্থার নাম। বর্তমানে ৬৫ শতাংশ ম্রোরা ক্রামা ধর্মানুসারি (মৌখিক সাক্ষাৎকার ইয়াংঙান)। এরপরও ম্রোদের কিছু সংখ্যক বর্তমানে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করছে। আর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ম্রো তো আছেই। তবে প্রকৃতি-পূজারি ম্রোদের সংখ্যা তেমন নেই বললেই চলে। ম্রোদের বর্ষবরণ উৎসবের নাম 'চাংক্রান'।

জুমচাষই ম্রোদের জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। পোশাক-পরিচ্ছদে ম্রোরা অত্যন্ত স্বাধীন। ম্রো নারীরা পরিধান করে ওয়ানক্লাই। আর ম্রো পুরুষেরা পরে দং (নেংটি) তবে বর্তমানে তারা লুঙ্গি পরিধান করে। মেয়েরা ওয়ান চা (বক্ষবন্ধন), করমা (ব্রাউজ), করমা পুরুষেরাও পরিধান করে। ম্রোদের লোকসংস্কৃতিতে আছে লোককথা, লোকাচার, লোকনৃত্য, সংগীত, কিংবদন্তি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন। এদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এতে মোট ৩১টি বর্ণ আছে। ম্রো আধ্যাত্মিক পুরুষ মেনলে ম্রো এ বর্ণমালার উদ্ভাবক। বর্তমানে ম্রো বর্ণমালায় গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

১.২ ম্রো নৃগোষ্ঠীর ভাষা

ভাষাতাত্ত্বিক গ্রিয়ারসন ম্রো নৃগোষ্ঠীর অসংখ্য শব্দের সাথে বর্মী শব্দের শব্দগত ও উচ্চারণগত মিল দেখেই ম্রো ভাষাকে বর্মিদলভুক্ত করেন। অবশ্য নৃগোষ্ঠীর ভাষাগবেষক সৌরভ সিকদার গ্রিয়ারসনের উপর্যুক্ত মতের বিপরীতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বম, পাংখোয়া, লুসেই, খিয়াং, খুমি ও ম্রো নৃগোষ্ঠীকে কুকি-চিন নামে আখ্যায়িত করেছেন।(ভূমিকা) আমরা এখানে সিংইয়ং ম্রোকৃত (ম্রো ১০৩) ম্রো ভাষার বংশলতিকা সরলিকৃত রেখাচিত্রে তুলে ধরবো-

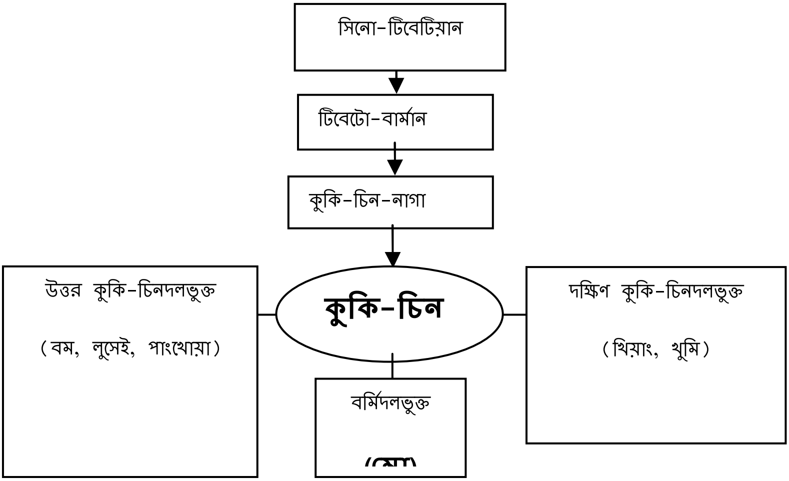

রেখাচিত্র-২ : ম্রো ভাষার বংশলতিকা

ম্রো নৃগোষ্ঠীগণ বাংলাদেশের বান্দরবানের সাতটি উপজেলাসহ মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ এবং কিছু সংখ্যক ম্রো ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করছে।

১.৩ জুমচাষ ও ম্রো জুমচক্র (Jhum Cycle)

পাহাড়ের ঢালে করা এক বিশেষ পদ্ধতির চাষের নাম 'জুমচাষ'। বছরান্তে ভূমি পরিবর্তন হয় বলে এটি স্থানান্তরী কৃষি বা ক্ষেত্রান্তরী কৃষি (Shifting Cultivation) আবার কোথাও Slash and Burn Agriculture নামেও পরিচিত। জুমচাষ, এখানকার নৃগোষ্ঠীদের বংশানুক্রমিক পেশা এবং অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে রোদে শুকিয়ে আবার তা আগুনে পুড়িয়ে কৃষিজ মণ্ড উৎপাদনের পদ্ধতিই হলো জুমচাষ। এটি একটি প্রকৃতিনির্ভর কৃষি। এ চাষ পদ্ধতির মধ্যেই স্বয়ংক্রিয় জৈবসারের উৎপাদন হয়। জুমচাষ শুধু পার্বত্যাঞ্চল নয়; ক্রান্তীয় অঞ্চলের বহুদেশে এই কৃষি পদ্ধতির প্রচলন আছে। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীগণ পাহাড়ের গায়ে বিশেষ পদ্ধতিতে যে চাষাবাদ করে তাহলো জুমচাষ। বর্তমানে এখানকার ২০ হাজার হেক্টর জমিতে জুমচাষ হয়। প্রায় ৯০ শতাংশ নৃগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুমের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া জীবনযাপনের অপরিহার্য সবই একচাষ থেকে পায় বলে জুম নৃগোষ্ঠীদের কাছে এটি 'বাজার' নামে পরিচিত।

পার্বত্য নৃগোষ্ঠীগণ জুমকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। যেমন-

নৃগোষ্ঠীর নাম	IPA	চাষশব্দ	IPA
চাকমা	/tʃakma/	জুম	/dʒum/
তঞ্চঙ্গ্যা	/t̪ɔncoŋgæ/	ঝু’ম	/dʒʱum/
মারমা	/marma/	’য়া	/ʲa/
		ইয়া	/iʲa/
		তইংখুয়ং	/t̪o͡i̯ŋkʰu͡i̯ŋ/
ত্রিপুরা	/t̪ripura/	হু	/hu/
		হুগ	/hug/
		হৌগ	/ho͡u̯go/
		কুক	/kuk/
ম্রো	/mro/	লৌ	/lo͡u̯/
		ওয়াহ্ ল্যুপ	/oʷah læ͡u̯p/
বম	/bɔm/	লৌ	/lo͡u̯/
		লাও	/la͡o̯/
		ল্যওত্তুয়া	/læ͡o̯t̪t̪uʲa/
পাংখোয়া	/paŋkʰoʷa/	লৌ	/lo͡u̯/
লুসেই	/luʃe͡i̯/	লৌ	/lo͡u̯/
খুমী	/kʰumi/	ল	/lɔ/
চাক	/tʃak/	ইকপ্রা	/ikpra/

সাধারণত জুমচাষ হয় হং /hɔŋ/ = পৌষ বা ইয়ো /iʲo/= মাঘ থেকে কেপ /kep/= কার্তিক মাস পর্যন্ত। এ সময় জুমিয়াগণ মাসভেদে যে কার্যাদি পালন করে থাকে তা নিম্নোক্তরূপে দেখানো যায়-

ক্রম.	মাসের নাম	কার্যাদি
১.	হং /hɔŋ/ পৌষ ও ইয়ো /iʲo/ মাঘ	জুমের জায়গা নির্বাচন করা। জুমের ধারে-কাছে ঝিরি, ঝরনা, পানি, পশু-পাখি, পোকা-মাকড় ও জীব-জন্তুর আনাগোনা আছে কিনা দেখা।
২.	বি /bi/ ফাল্গুন ও প্রাত /prat̪/ চৈত্র	নির্বাচিত জুমক্ষেত্রের আগাছাগুলিকে কাটা বা পরিষ্কার করা।
৩.	প্রাত /prat̪/ চৈত্র ও সরাই /sɔrai̯/ বৈশাখ	শুকনো আগাছায় আগুন দেওয়া।
৪.	সরাই /sɔrai̯/ বৈশাখ ও লকুই /lokui̯/ জৈষ্ঠ্যে	ফসলের বীজবপন করা।
৫.	লকাউম্ম্য /lɔkau̯mmo/ আষাঢ় ও রাম /ram/ শ্রাবণ	জুমঘর তৈরি করা এবং জুমের আগাছা পরিষ্কার করা। জুমে সার দেওয়া (জুমে আগে সার দেওয়া হতো না বর্তমানে অধিক ফলনের লোভে সার প্রয়োগ করতে হয়)।
৬.	রাম /ram/ শ্রাবণ ও বন /bɔno/ ভাদ্র	ফসলের চারা রক্ষণাবেক্ষণ করা। আগাছা পরিষ্কার করা। জুমঘরে বসে ফসল পাহারা দেওয়া।
৭.	বন /bɔno/ ভাদ্র ও লুদ /lud̪/ আশ্বিন	জুমঘরে অবস্থান করা। এসময় জুমের ফসল আসতে শুরু করে। শূকরের কবল থেকে ধানকে রক্ষার জন্য নানা ফাঁদ তৈরি করা।
৮.	লুদ /lud̪/ আশ্বিন ও কেপ /kep/ কার্তিক	জুমের ফসল উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। ধানকেটে জুমঘরে স্তুপাকারে সাজিয়ে রাখা হয়। এসময় নবান্ন উৎসবেরও ধুম পড়ে।
৯.	কেপ /kep/ কার্তিক ও ক্লং /klɔŋ/ অগ্রহায়ণ	মাড়াইকৃত ধানকে শুকানো ও অন্যান্য ফসল রক্ষণাবেক্ষণ করা।

১০.	ক্লং /klɔŋ/ অগ্রহায়ণ	ধান ও জুমে ফলা হলুদ, মরিচ, তুলা, আলু, গম ইত্যাদি ফসল ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

১.৪ ম্রো নৃগোষ্ঠীর জুমভাষাবিজ্ঞান

জায়গা নির্বাচন *চামকির ওয়াহ্*

ম্রোদের জুমচাষের জায়গা নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জুমে স্বপ্ন দেখা। তারা এ স্বপ্ন দেখাকে ম্রো ভাষায় *পমাং* বলে। স্বপ্ন ভালো হলে জায়গা নির্বাচনের পরপরই করতে হয় জুমের জায়গা বা জঙ্গল পরিষ্কার *ওয়াহ চিয়াখিন* এবং ঝোপঝাড় কেটে রোদে ফেলে রাখাকে বলে *চিয়া তিয়া*। ঝোপঝাড় শুকালে আগুনে পুড়ানোকে তারা বলে *ওয়াহ তৌকখিন্*। জুমে পুড়ানো না পুড়ানো ঝোপকে আলাদা করাকে বলে *ওয়াহরাত্*। পোড়ানো ছাই মাটিতে মিশানোর জন্য বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা কিংবা প্রার্থনা করতে হয় একে ম্রো ভাষায় বলে *চাসতখিন্*।

আগাছা পরিষ্কারকে ম্রো নারীরা সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজ মনে করেন। আগাছা পরিষ্কারের প্রথম ধাপকে তারা বলে (যখন চারা নরম থাকে) *বাটরামা থাকখিন্* দ্বিতীয় ধাপকে বলে *বটওয়াই থাকখিন্* (এখানে কোন কাজ থাকে না), তৃতীয় ধাপকে বলে *বটসুম* এসময় ফসল কিছুটা বড় হয়ে যায়। *রুইতাত* এ সময় ধানে ফুল এবং ছড়া এসে যায়। ধানের সাথে লতানো আগাছাকে এসময় সাবধানে টেনে তুলতে হয়। *চাঙেনখিন্* এটি জুমের ধান কাটাপর্ব এবং ধান কেটে কেটে *থে* নামের বাঁশের ঝুড়িতে রাখা হয়।

ধান মাড়ানোকে ম্রো ভাষায় বলে *চা থুয়া* বা *চায়েও* অর্থাৎ ধান শুকিয়ে খাওয়ার জন্য এবং বীজের জন্য রাখা হয়। *চালিও* জুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জুমের শস্য ফসলের বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি। বীজ সংরক্ষণের জন্য তারা *ক্লইপুক* নামক একপ্রকার ছোট আকারের ঝুড়ি ব্যবহার করে।

জুমকে ঘিরে অসংখ্য পোকার আনাগোনা দেখা যায়। ম্রোভাষায় প্রতিটি পোকার আলাদা আলাদা নাম আছে। পোকাদের মধ্যে কিছু উড়তে পারে যেগুলোকে *প্লং* বলে। এ জাতের পোকার মধ্যে আছে *দোং রুইচ্য দোং*। এরা সবুজ ঘোড়াফড়িংকে বলে *প্লংক্যাং*। আর উড়তে না পারা পোকামাকড়ের মধ্যে আছে *দুংপাত্তম*। আর কিছু প্রাণী আছে যা ফসলের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর, এর মধ্যে অন্যতম *উদম্য* (ইঁদুর)। আবার ফসলের জন্য উপকারী প্রাণীদের মধ্যে আছে *পোর* (ব্যাঙ)। জুমে পোকারা ডেকে বুঝিয়ে দেয় জুমচাষীকে কখন কী করতে হবে।

১.৪.১ ম্রোদের ভূমিরূপের জুমভাষা

মাটিকে ম্রো ভাষায় বলা হয় *ক্রং*। তবে কোথাও কোথাও *বন্*ও বলা হয়। মাটি নরম এবং সাদা হলে বননাই মাটি শক্ত ও লাল হলে বলে *বনকাম*। ম্রো নৃগোষ্ঠীদের কাছে মাটি নানা ধরনের-কালচে রঙের মাটি *ক্রংঙাঃ* (ভালো মাটি), বালুমিশ্রিত পাহাড়ী মাটি *সেংক্রং* আর পাথুরে কণামিশ্রিত পাহাড়ি মাটি *ক্রংরে*, বেশ শক্ত মাটি- *ক্রংখুং* (পাথুরে মাটি),নরম কাদামাটি *সুপ্লক*, নদীর পলিমাটি (বালুমিশ্রিত) *প্লাম না এ্যাক্*। বেশ শক্ত আঁঠালো মাটি *ক্লুং বন্* (উইঁঢিবির মাটি), ফসল না হওয়া মাটি হলো-*বন ইয়ুং দই/ বন ঙাক*, কাদামাটি *বননাই বন* বালিমিশ্রিত কালচে রঙের মাটি সে বন উর্বর মাটি যে মাটিতে সার লাগে না *বর ওয়ইমি বন*।

ম্রো ভাষায় পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের নাম-

ম্রো ভাষায় পাহাড় চূড়া হলো *চ্যুত্*, পাহাড়ের মধ্যবর্তী *দংক্লম*, আর পাহাড়ের নিচের দিকে ঢালু হয়ে আসা প্রায় সমতল জায়গা হলো *দমনাই*।

জুমচাষকে ম্রো নৃগোষ্ঠীগণ *বক* (আনক), *কেম* (দওপ্রেং), *চাম* (সুংমো) নামে সম্বোধন করে থাকে। অঞ্চলভেদে ম্রো ভাষার বিভিন্নতার জন্য এমত নাম। বর্তমানে ম্রোদের আনক গোষ্ঠীর ভাষায় বইপুস্তক রচনা হচ্ছে বলে এ ভাষা বান্দরবানের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। আমার প্রবন্ধে ব্যবহৃত জুমভাষাগুলোর বেশির ভাগই আনক গোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করা।

১.৪.২ ম্রো নৃগোষ্ঠীর জুমশব্দ

ম্রো লৌভাষা	আ.ধ্ব.ব IPA	বাংলাভাষা
চিয়া ওয়া	/tʃiʲa oʷa/	জঙ্গল কাটা
কাপ প্লাং	/kap plaŋ/	স্থান নির্বাচন বা চিহ্ন দেওয়া
রাত ওয়া	/rat̪ oʷa/	জুম পরিষ্কার
তক্ ওয়া	/t̪ɔk oʷa/	জুমে আগুন দেওয়া
চাং বক্	/tʃaŋ bok/	জুমঘর তোলা
সত চা	/sɔt̪o tʃa/	বীজবপন করা
তোম/মতুক	/t̪om//mot̪uk/	আগাছা পরিষ্কার

চং চা	/tʃɔŋ tʃa/	ফসল পাহারা দেওয়া
ঙেন চা	/ŋeno tʃa/	ধান কাটা
পল চা	/pɔl tʃa/	ফসল তোলা
থোয়া চা	/t̪ʰowʷa tʃa/	ধান মাড়াই
চাতুয়া	/tʃat̪ʰuʷa/	জুমে ধান মাড়াই
করল চা	/korl tʃa/	ধান বাড়িতে আনা
তো চালিও	/t̪o tʃali͡o̯/	বীজসংরক্ষণ পদ্ধতি
লাক্রোক্	/lakrok/	পরিত্যক্ত জুম পরিষ্কার
হাওলা	/ha͡o̯la/	তুলা সংগ্রহ
লাউ সুয়ামো	/la͡u̯ suʲamo/	হলুদ তোলা
লেক লিংক	/lek liŋk/	মরিচ সংগ্রহ
লাইকইক বক্	/la͡i̯kik bok/	ক্ষেত-খামার
লাই	/la͡i̯/	জমি-জিরেত
সুং অ ইয়ুং	/suŋ ɔ iʲuŋ/	ভালো মরসুম
নিংঙাক্	/niŋŋak/	মন্দ আবহাওয়া
নেমমি লাই	/nemmi la͡i̯/	জলা-জমি
ক্রেউমি লাই	/kre͡u̯mi la͡i̯/	উঁচু জমি
অকাত্ চাং	/ɔkat̪ tʃaŋ/	একচাষ
লাইটিম হন থন	/la͡i̯t̪im hɔn t̪ʰɔn/	লাঙল-চষা

দক লাইটিম	/d̪ɔk lai̯t̪im/	হালধরা
দং হন্ পুন্	/d̪ɔŋ hon pun/	টং উঠানো
অসিং	/ɔʃiŋ/	একগাছা
চালিউ তকরা	/tʃaliu̯ t̪ɔkra/	বীজতলা
ওয়েত্ চা	/oʲet̪ a/	ধান ছড়ানো
চারো/চাপয়	/tʃaro//t̠ʃapɔʲ/	ধানচারা
চই চারো	/tʃoi̯ tʃaro/	চারাতোলা
চক চা	/tʃɔk tʃa/	চারারোপণ
ইয়াং ইয়াং ম	/iʲaŋ iʲaŋ m/	সারি সারি
তোম	/t̪om/	নিড়ানি দেওয়া
প্রাম কই রুই	/pram koi̯ rui̯/	ঘাস বাছা
চই প্রাম	/tʃoi̯ pram/	ঘাস তোলা
দক প্রাম	/d̪ɔk pram/	ঘাস ধরা
অতুত হন চেম মর উই	/ot̪ut̪ hɔn tʃem mɔr ui̯/	আগাগোড়া ফল
থে কেত	/&t̪ʰe ket̪/	কীটনাশক ছড়ানো
অচেং	/ɔt̠ʃeŋ/	একগোছা
থে কেত/সচ্ছা	/t̪ʰe ket̪/ /sɔtʃtʃʰa/	বিষ দেওয়া
অতং	/ɔt̪ɔŋ/	এক আড়ি
চহাও কওয়াকরা	/tʃɔhao̯ koʷakra/	খড়ের গাদা

পাম	/pam/	ধানের গোলা
দিয়া চা	/d̪i̪ʲa tʃa/	ধান শুকানো
চা পম	/tʃa pɔm/	থোড় আসা
তুং মি	/t̪u̪ŋ mi/	ধানভানা
পিদ ম্য	/pid̪ mæ/	ঝোপঝাড়
প্রামচ্যা	/pramotʃka/	পতিত জমি
কাউ	/kau̯͡/	বাঁশ
মিয়া	/miʲa/	বেত

একসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীগণ সারাদিন জুমের কাজে ব্যস্ত থাকতো। জুমকে তারা মাতা-পুত্রজ্ঞান করতো। কিন্তু অধুনা তারা আগের মতো জুমচাষে মনোযোগী নয়। কারণ বর্তমানে একশ্রেণির জুমিয়া বিভিন্ন সংস্থার বদান্যে উচ্চফলনের আশায় ভূমে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করছে। এটি জুমিয়া-সংস্কৃতিতে আবহমানকাল ধরে চলে আসা রীতিকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করছে। ফলশ্রুতিতে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির জুমিয়াগণ যারা প্রাকৃতিকভাবে খাদ্য ফলনের নিমিত্তে কায়িকশ্রম দিচ্ছে তারা আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। কার্যত জুমচাষের সাথে যুক্ত নৃগোষ্ঠী সমাজের জুমশব্দ, সনাতন সংস্কার এবং আচারকৃত্যসমূহ কালের অতলগহ্বরে হারাতে শুরু করেছে। জুমসংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির এ বেহাল দশা তাদের আগতজীবনে বিস্তর প্রভাব ফেলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠীগণ সংস্কৃতি সংরক্ষণে বেশ তৎপর। কিন্তু প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীগণ আপনাকে বাঁচাতে যেখানে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে লুপ্তপ্রায় এই সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত দুরূহ। সুতরাং আপন সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সমঝোতা থাকা দরকার বোধ করি। যদি এটির ব্যত্যয় ঘটে তবে চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী সমাজ ঐতিহ্যবাহী বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে বিলীনতার কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

তথ্যসূত্র :

ম্রো, সিংইয়ং। *ম্রো জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি*। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান, ২০১৯।

সিকদার, সৌরভ। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১।

চাকমা, নিরঞ্জন। 'আদিবাসী সমাজে চাষবাস জুম শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কিছু কথা'। *অখ্যইক*। রতন মুনি চাকমা সম্পাদিত। বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি, রাঙ্গামাটি, ২০০৪।

চাকমা, সুগত। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০০৯।

Grieson, G. A. *Linguistic Survey of India.* Calcatta, 1903.

Bright, William. *Sociolinguistics : Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference.* 1964, The Hague, Mouton and copublishers, 1985, second printing.

Mro, Younguang. *Mro Grammar.* Bandarban, 2022.

Ganguly, J. B. *Economic Problems of the Jhumias of Tripura.* Agartala, 1968.

ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যদাতা

১. ইয়াংঙান ম্রো, বান্দরবান বাইট্যা পাড়া, বয়স-৩৬, পেশা-জুমচাষ, শিক্ষাগত যোগ্যতা-স্নাতকোত্তর।

৩. থংপং ম্রো, বান্দরবান বাইট্টা পাড়া, বয়স-২৮, পেশা-জুমচাষ, শিক্ষাগত যোগ্যতা-৬ষ্ঠ শ্রেণি।

৪. প্রেনপ্রে ম্রো, বান্দরবান রামরী পাড়া, বয়স-২২, কলেজ শিক্ষার্থী।

৫. লঙঙি ম্রো, বান্দরবান রামরী পাড়া, বয়স-৬১, পেশা-জুমচাষ, শিক্ষাগত যোগ্যতা-নাই।

প্রসঙ্গ সাম্প্রদায়িকতা : একটি রবীন্দ্র প্রবন্ধ ও উপমহাদেশের ইতিহাস

যীশু দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধসার : সাম্প্রদায়িকতা শুধু একটি সামাজিক সংকট হিসেবেই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনে তা একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে অনিবার্যভাবে বর্তমান রয়েছে। প্রাগাধুনিক কাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত ইতিহাসের ঐতিহ্যের দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, আধুনিক কালে রাজনীতি ও মৌলবাদী চেতনার মিশ্রণে যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, সামন্ত পুঁজি আর সামন্ততন্ত্রের কালে তার বিকাশ ও প্রসার সম্ভব ছিল না। রাজশাসন, রাজনৈতিক ফায়দা আর সেই চিরন্তনী শ্রেণী স্বার্থের অমোঘ প্রয়োজনে ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে যৌথতার বোধ যুক্ত করে উনিশ ও বিশ শতকের ভারতে রোপন করা হল সাম্প্রদায়িকতার মহীরূহ। কবি, সাহিত্যিক ও সমাজ কর্মীরা সেই শুরুর দিন থেকেই এই বিষবৃক্ষের মূল থেকে মগডাল পর্যন্ত নষ্ট করার উদ্যোগ করে আসছেন। কিন্তু ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে এসেও অসাম্প্রদায়িক সমাজের আন্দোলন কেবলমাত্র একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েই রয়ে গেছে। রাজনীতির কুশীলবদের বেশির ভাগই বিশেষ কারণে সেই সম্প্রীতির উদ্যোগে সামিল হননি।

রবীন্দ্রনাথের ‘কালান্তর’ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘হিন্দু মুসলমান’ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক মিলনের পথে বাধা এবং তার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেগুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, তা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিরশনে একটা অত্যন্ত গুরুতর দলিল হতে পারত। কিন্তু গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতে এক আপাদমস্তক কবির সমাজ ভাবনাকে কেইবা রাজনীতির চর্চায় বিবেচ্য বলে মনে করার মতো দুঃসাহসের পরিচয় দিতেন? তাই হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বসংঘাতের রাবীন্দ্রিক ভাষ্যটি কেবল বিদ্যায়তনিক চর্চার উপাদান হিসেবেই রয়ে গেল।

এর পর কেটে গেছে একশো বছর, সাতচল্লিশের দ্বিখণ্ডিত ভারত একাত্তরে তিনটুকরো হল। মুসলমানের দেশ ভেঙে পাঞ্জাবী মুসলমান আর বাঙালী মুসলমানের দুই দেশ হল। অসাম্প্রদায়িক হিন্দুস্থানেও হিন্দুদের জন্য আলাদা স্থানের প্রস্তাব জোরালো হয়ে উঠছে। এক শতাব্দী পরে তাই আবার ফিরে শুনতে হবে কবির বাণী। তাই ভারতীয় উপমহাদেসের রাজনীতির ইতিহাস আর সেই ঋষিপ্রতীম কবির চিন্তনকে মিলিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

১

এক সহস্রাব্দের বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান নামের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ধর্ম সম্প্রদায় সহাবস্থান করছে। মধ্যপ্রাচ্যের সেমেটিক একেশ্বরবাদী ইসলাম আর গঙ্গা-সিন্ধু তীরের পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিগত বৈপরিত্য নিয়েই গড়ে তুলেছে বৃহত্তর ভারতীয় জনজাতি। ধর্মের তত্ত্ব আর দর্শনের স্তর থেকে আচরণের সীমানা পর্যন্ত যে বেষ্টনীর মধ্যে একটি ধর্ম তার স্বাতন্ত্র্যকে সুরক্ষিত করে রাখতে চায়, এই দুই ধর্মেরও সেই বেষ্টনী খুবই দৃঢ়ভাবে বর্তমান। তা সত্ত্বেও এরা সহাবস্থান করেছে, একে অপরকে বুঝতে চেয়েছে, আদান প্রদানের উপায়ে একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। মধ্যযুগের মরমিয়া ভাবান্দোলন সেই বোঝাপড়াকে আরো সহজ করেছে। বিশেষ করে জনজীবনের লোকায়ত স্তরে, ধর্ম যেখানে সবদিক থেকেই শিথিল হয়ে মিশে যেতে চায় অন্যের সঙ্গে, সেইখানেই হিন্দু ও ইসলাম বারে বারে নিজের ধর্মীয় পরিচয়ের সীমানা পার করে পরস্পরকে ছুঁয়ে একাকার হতে চেষ্টা করেছে। আবার এর বিপরীতে ধর্মের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে ধর্মের রক্ষকেরা গড়ে তুলেছে ধর্মীয় অবরোধ। ধর্মের অলঙ্ঘনীয় আদেশ আর আচারের অলঙ্ঘনীয় বেড়া তুলে হিন্দু ও ইসলাম সমান্তরাল পথে যাত্রা করেছে আগামীর দিকে। একদিকে যেমন পীর আর দেবতায় মিলে বটের মূলে থান জমিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে তেমনি শরিয়তে-ভাগবতে দ্বন্দ্ব চলেছে অনিবার।

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের অস্তিত্বগত এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতটি ভারতীয় সমাজের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ইওরোপে আধুনিকতার আগমনে খ্রিস্টধর্ম যেভাবে ক্রমশ গির্জার প্রাচীরের মধ্যেই সীমায়িত হতে শুরু করেছে, এদেশে তেমনটা একেবারেই সম্ভব হয়নি। পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান নিজেদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে সময়ের বহিঃপ্রাকার রচনা করে বসেছে। বলা বাহুল্য উনিশ শতকে আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইসলাম তার নিজের সুরক্ষা বেষ্টনীটি আরো দৃঢ় করে গড়ে তুলেছে।(Subrata Dashgupta, "The Bengal Renaissance")। এর অতিরিক্ত ভাবে পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে রাজনৈতিক কারণে ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক মৌলবাদকে ব্যবহার করার প্রবণতাও প্রবল হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ভাবে তো বটেই, সামাজিক ক্ষেত্রেও একটি আধুনিক জাতি গঠনের পক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই সক্রিয় অভ্যুদয় নিঃসন্দেহে পরিতাপের বিষয়। ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতিকে সেই ভুলের মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু বিভেদের এই উদগারের পেছনে যে বিষের অস্তিত্ব, তা বিভক্ত ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অস্বস্তি আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তাই এর নিরাময় আজকের উপমহাদেশীয় ভুবনে একটি গুরুতর প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়।(গৌতম বসু, "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস") এই প্রবন্ধে স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও পরবর্তী ইতিহাসের একটি অতি

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়টির প্রশ্নটির উত্তরের সন্ধান করা হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধ সংকলনের 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধটি এই আলোচনায় আমাদের প্রধান অবলম্বন।

২

স্বাধীনতার ইতিহাসে তখন অসহযোগ আর খিলাফতের কাল। বাংলা ১৩২৯ সালের ৭ই আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ বর্ষা যাপনের ফাঁকে শুনতে পেলেন সাগর পারের এক প্রবাসীর প্রশ্ন। বর্ষার তানময়, শব্দময় দিনে এমন একটি গুরুতর প্রশ্ন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে সংসারের কাজের কথা। কালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন –ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধান কি? রীতিমত উত্তর দেবার ঢঙেই তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার স্বরূপ ও তার সমাধানের আলোচনা করে চিঠির উত্তর দিয়েছেন। চিঠিটি 'কালান্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থে 'হিন্দু মুসলমান' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও সেই চিঠিটি মৌলবাদী চেতনা আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিঘাতের সাক্ষী এই সময়ের জন্য আরও একবার পুনরধ্যয়নযোগ্য। ইতিহাসের নিরিখে তাকে আরেকবার যাচাই করা খুবই আবশ্যক হয়ে পড়ছে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাধার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ইসলামের পরমত অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি। ধর্মের দিক থেকে খাঁটি মুসলমানের কাছে কাফের আর মুনাফেকরা শত্রু এবং বিনাশ যোগ্য। ধর্মান্তর ও জিজিয়ার মাধ্যমে কাফের প্রধান হিন্দুস্থানে মুসলমান সুলতান আর বাদশারা সেই কর্তব্য থেকে অব্যাহতি নিলেও কাফেরের ধর্মাচরণকে বিনষ্ট করবার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই ছিলেন খুবই যত্নবান। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের আবেদনে ইসলাম স্বধর্মে আপোষ করলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে সে কখনই কাফেরের ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকৃতি দেয় না। খুবই গুরূত্বপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের কথা উল্লেখ করে তাদের স্বাতন্ত্র্যের কারণটি নির্দেশ করেছেন। "খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্যে অপর ধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু মুসলমান", 'কালান্তর') অন্যদিকে হিন্দুর ধর্মের ক্ষেত্রেও ইসলামের সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য আছে, ইসলামের মত সে পরমত ধ্বংসে প্রবৃত্ত না হলেও নিজের চারিদিকে শাস্ত্রীয় বিধানের হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করে অন্য ধর্মের ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলেছে। সেই গণ্ডির সীমা পার করে যাবার দুঃসাহস দেখানো হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব। এই প্রবাদটি সেই ভাবনারই ফলশ্রুতি—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। পরধর্ম ভয়াবহ"। তবে ইসলামকে একধাপ টপকে সে অন্যকে স্বধর্মে গ্রহণেও নারাজ। আচারের অশুদ্ধতার ধুয়ো তুলে হিন্দু অন্য ধর্মের মানুষকে দুরে ঠেলতে একান্তই ব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে পত্রকার রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু মুসলমান", 'কালান্তর')

শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনার সময়ই রবীন্দ্রনাথ মুসলমান জনসাধারণের সংস্পর্শে আসেন। হিন্দুর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের হীনতা তাঁকে ব্যথিত করে। সে কথাই আচারে আবদ্ধ হিন্দুর হীনতার উদাহরণ হিসেবে কালিদাস নাগকে তিনি লিখেছেন।–

"আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু মুসলমান", 'কালান্তর')

রবীন্দ্রনাথ একদা 'ভারততীর্থ' কবিতায় লিখেছিলেন—'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক, হূণ দল, পাঠান, মুঘল এক দেহে হল লীন।' কিন্তু আজ এই চিঠিতে তিনি লিখছেন ভীষণ এক অমিলের কথা, যেখানে মেলবার পথ বন্ধ। হিন্দু আর মুসলমান যখন তাদের ধর্মের পরিচয়টাকে প্রধান করে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখনই তাদের মেলবার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এদের একজনের যেদিকে মিলনের দ্বার খোলা, অন্যজনের সেদিকে দ্বার বন্ধ।–

"ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিলবে। এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু'-যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দু যুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ– এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্ট-ভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ কে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু মুসলমান", 'কালান্তর')

অর্থাৎ ধর্মের পথে মিলনের দ্বার একেবারেই রুদ্ধ। এখানে এসেই খৃষ্টানদের বিষয়ে ধর্মকে বড় করে না তোলার যে কথাটি তিনি লিখেছেন, তা মনে পড়ে। আসলে এখানেই এই সমস্যার সমাধান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন এর সমাধান "মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে।" খৃষ্টানের যে মন-পরিবর্তন, যুগ-পরিবর্তন তিনি

দেখেছিলেন, তাই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রত্যাশা করেছিলেন। এই বদলের স্বরূপের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চিঠিতে তিনি লিখছেন –

> "য়ুরোপ সত্য-সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু মুসলমান", 'কালান্তর')

৩

সেই যুগ পরিবর্তন হয়েছে কি? ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। জাতীয়তাবাদের উন্মেষের কাল থেকে স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ সালের প্রথম প্রচেষ্টাটি তারই প্রমাণ।(অলোক রায়, 'উনিশ শতক') কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্যে তার যে পরাজয় ঘটে বাঙালীর কাছে, সাতচল্লিশের বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সে তার প্রতিশোধ নেয়। স্বাধীনোত্তর ভারত, পাকিস্তান এবং কিছু পরে বাংলাদেশ নামের তিনটি খণ্ডিত রাষ্ট্র আজও সেই বিভেদের ঐতিহ্য কেউবা ঘোষিত-ভাবে, আবার কেউবা নিজের অজান্তেই লালন করে চলেছে। কিন্তু মধ্যযুগের ভারত ধর্মকে কেন্দ্র করে এমন দিনের সাক্ষী হয়নি। মধ্যযুগীয় সময়োপযোগী ধর্মীয় আবেগ তাড়িত সংঘাত সেকালের হিন্দু মুসলমানেও ছিল, কিন্তু বিশ শতকের বিদ্বেষাত্মক সম্প্রদায় ভাবনার সন্ধান সেকালে দুর্লভ। রাজপুতানা আর মারাঠাদের সঙ্গে মুঘল বাদশাহ সংগ্রামকে বঙ্কিম চন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি কাহিনিকারেরা তাদের উপন্যাসে ধর্মরক্ষার্থে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করলেও(বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রাজসিংহ'), (রমেশ চন্দ্র দত্ত, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত') তা যে আদপে ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক, ইতিহাসের গবেষকরা তার সাক্ষ্য দেবেন।(Sir Jadunath Sarkar, 'Shibaji And His Time') কিন্তু সাতচল্লিশ সালের ভারত বিভাগের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রেরণাই ছিল না। ছিল একটি পবিত্র ভূখণ্ডে অর্থাৎ পাক জমিনে বাসের স্বপ্ন, যেখানে কাফের আর মুনাফেকদের আধিপত্য, তাদের কুফরি ধর্মীয় আচার বরদাস্ত করতে হবেনা মুসল্লিদের। অর্থাৎ সেই মধ্যযুগীয় সময়োপযোগী ধর্মীয় আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের দাবিতে ভারতবর্ষীয় সমাজ এগিয়ে চলেছিল দেশভাগের দিকে। কেবলমাত্র মিলনের বাধাই নয়, রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেও ধর্মীয় আবেগের অবাধ ব্যবহার হল উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে। রবীন্দ্রনাথ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', আর 'বন্দে মাতরম'-এর দাঙ্গাবাজি দেখেননি। তাই হিন্দু আর মুসলমানের মিলনের স্বপ্ন খুবই সাদা চোখে তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে পাকিস্তানের আগমনী যখন ভারতের রাজনীতি আর সমাজের গভীরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল, তখনই

সেই মিলন-স্বপ্ন মুহূর্তে চূর্ণ করে ভারতীয় মহাজাতিটি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিধা হয়ে গেল।

আসলে কায়েদ-এ-আজম জিন্নার মতই কংগ্রেসি নেতারাও একটি বিরাট ভ্রান্তির স্বীকার ছিলেন। একদিকে কংগ্রেস ত্যাগী মহম্মদ আলি জিন্নার মুসলিম লিগ বলছে হিন্দু ও মুসলমানের দুই জাতিসত্তার কথা, আর অন্যদিকে কংগ্রেসি নেতারা দ্বিজাতিত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের সমস্যাটিকেই অস্বীকার করছেন। সম্ভবত লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং কংগ্রেসের এই অস্বীকৃতি থেকেই ভারতীয় মুসলমানের মনে পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। অসংখ্য বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েও হিন্দু আর মুসলমান যে আসলে একটি ভারতীয় জনজাতিতে পরিণত হয়েছিল, জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব তাকে অস্বীকার করে কায়েম করেছিল পাকিস্তান। অন্যদিকে এক মহাজাতির নানান বৈপরীত্যের স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সবলে অস্বীকার করে কংগ্রেসও পরোক্ষে পাকিস্তানকেই অনিবার্য করেছে।

৪

মহামানবের সাগর তীরে মানবের এই বৈচিত্র্যের ছবিটি কিন্তু অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। ধর্মের বাধাটুকু পার করবার উপায় হিসেবে তিনি মন আর যুগ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতি তা অনুধাবন করতে অনেক সময় নিয়েছে। অমিলের বিরোধটাই তার সামনে সত্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অমিলের সুযোগ টুকুই ভেঙে দিল ভারতবর্ষকে। কিন্তু এই অমিল যে সত্য নয়, তার চেয়েও বড় সত্য আছে, যাকে শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয় সে কথাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন কালিদাসকে।

"অন্য দেশে মানুষ যুগ-পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব। যদি না আসি তবে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা গুটি কেটে বেরোতে সচেষ্ট হয়েছে। মুসলমান পরিচয়ের অবরোধ কেটে তারা বাঙালী হিসেবে ডানা মেলতে চেয়েছে। সময়ই বলবে সে উড়ানের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই অসাম্প্রদায়িক মহাজাতিটি কেন বার বার টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এই প্রশ্নটাই এইখানে এসে গুরুতর হয়ে উঠল। তবে নিশ্চিতভাবেই সত্য এখনও গোপন আছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সীমানা পেরিয়ে এবারে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিভেদকেই কি বাঙালীরা জোরালো করে তুলেছে? স্বাধীন পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনের প্রথম সভাতে মহম্মদ আলি জিন্না তার দেশের মানুষকে মুসলমান-হিন্দু, বাঙালী-পাঞ্জাবী প্রভৃতি পরিচয় ত্যাগ করে একমাত্র পাকিস্তানি পরিচয় গ্রহণের আহ্বান জানান। যে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপরে গড়ে ওঠে পাকিস্তান, জন্মের কয়েক দিন পরই তাকে অস্বীকার করে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় রাষ্ট্র। কিন্তু কেন এই ঐক্যবদ্ধতার তাগিদ? আসলে সম্প্রদায় আর জাতির বোধটা সব অনুভূতির ওপরে উঠে ভেঙে দেয় এক মহা-জাতির দেশ, সুরক্ষিত হয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ। আর ধ্বংস হয়ে যায় আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, আর নিজের নিয়মে গড়ে ওঠা সমাজ। আরও একটু গভীরে গেলে দেখা যায় সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে ওঠার

এই দায়ের পেছনে আছে একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিরোধ বাধে বৈষম্যের। বৈষম্য থেকে জন্ম নেয় আকাঙ্ক্ষা। জিন্না যেসব বৈষম্যের কথা বলে পাকিস্তান কায়েম করলেন, নেহেরুরা যে বৈষম্য স্বীকার করেননি, ইয়াহিয়া যে বৈষম্যকে ইসলামিক ঐক্যের সাম্প্রদায়িক মোড়কে ঢেকে দিতে চেয়েছেন। শেখ মুজিব যে বৈষম্যের কথা বলে লাল সূর্যোদয় দেখিয়েছিলেন বাঙালীকে, সেই বৈষম্যের, অবিচারের অভিযোগটি তো নীরবে হাতবদল হয়ে গেছে।(ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "দ্বিজাতিতত্ত্বের সত্য মিথ্যা", 'বাঙালী ও বাংলাদেশ', অরুণ সেন ও আবু হাসেম সম্পাদিত) রবীন্দ্রনাথ সেই বৈষম্যের হদিস কতটুকু পেয়েছিলেন স্বাধীনতার পঁচিশ বছর আগের এই বর্ষা মুখর দিনে, কালিদাস নাগকে চিঠিতে সে কথা তিনি জানাননি। সাম্প্রদায়িকতার খোলসে ঢাকা সেই বৈষম্যই আসলে বিভেদের মূলে। সেকারণেই বাংলার লোকস্তরে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে স্পষ্ট করতে লিগকে বেগ পেতে হয়েছে। জমিদার আর প্রজার দ্বন্দ্বকে হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের আবরণে ঢেকেই অবশেষে বাঙালীকে ভাগ করা গেছে। কিন্তু খোলস ছেড়ে শোষণ আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। পশ্চিম পাকের মুসলমান শাসকেরা এবার আর সাম্প্রদায়িকতার চাদরে শোষণ আর ক্ষমতার লড়াইকে ঢেকে দিতে পারেননি। বাঙালী তাকে একবারেই চিনতে পেরেছিল। এশিয়ার এই মহাজাতির সামনে তাই শোষণই আসলে সাম্প্রদায়িকতার বাহনে চড়ে বারে বারে ফিরে আসছে। রূপকথার মতোই খোলসটিকে পোড়াতে পারলেই রাজপুত্র অভিশাপ মুক্ত হয়, মন আর যুগ পরিবর্তনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক আবেগ আর মৌলবাদী ভাবনাকে ধ্বংস করতে পারলেই ভারতীয় উপমহাদেশের এই সাংস্কৃতিক মহাজাতিটি তার শোষণের অভিশাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেতে সক্ষম হবে। তাই কবির বাণী বলে দুরে সরিয়ে না রেখে মন আর যুগের পরিবর্তনের আহ্বানে তাকে সাড়া দিতেই হবে। অন্যথা “নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।”

গ্রন্থ পঞ্জী :

১. অলোক রায়, উনিশ শতক, প্রমা, কলকাতা, ২০১২
২. অরুণ সেন ও অন্যান্য (সম্পা), বাঙালী ও বাংলাদেশ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৬
৩. গৌতম বসু, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস, বি বি কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা ২০০৯
৪. Sir Jadunath Sarkar, Shibaji And his time, Longman’s green & co, Landon, 1920
৫. Subrata Dasgupta, The Bengal Renaissance, Permanent Black, New Delhi, 2010

নোনা দ্বীপের জীবনচর্যা : ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পবিশ্ব

শিমুল চন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিশেষ হয়েও নির্বিশেষের অন্তর্জগতের মগ্ন চৈতন্যের বিভিন্ন সত্তা ও প্রতিকূলতাকে যিনি সাহিত্যের কায়া রূপে নির্মাণ করলেন তিনি হলেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন, সমুদ্র, উপকূল, নোনাভূমি, বাদাবন, ঝাউবন, বালিয়াড়ি, বনভূমি, কাকড়া, চিংড়ি মাছ, মাছ ধরা, ঘূর্ণিঝড়, আড়ৎ, নোনা জল, কাঠ সংগ্রহ, চাষাবাদ, জীবিকা, পালা-পার্বণ, অত্যাচার, তেভাগা, যৌনতা, সংস্কার প্রভৃতি অনুষঙ্গ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন এক ব্যতিক্রমী কথা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ছোট গল্পের চেনা আঙ্গিকে নিয়ে এসেছেন অচেনা সব গল্প গাথাকে। সুন্দরবনের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের স্বপ্ন, বিপন্নতা, শোষণ, বঞ্চন, লড়াই, কামনা-বাসনা, নিষ্ফলতা, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি অনুষঙ্গ ছোট গল্পের আখ্যানভূমিকে নির্মাণ করেছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমুদ্র যেন নিজেই একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। সিন্দুক, নোনা, কাঠকুটো, সমুদ্র গন্ডি, জলের আয়না, সমুদ্র তীরে, জলকন্যা, ডান দিকের সঙ্গী, মে'র জোছনা, জাহাজঘাটা, সমুদ্র রমণী ও দলিলের ঢেউ, জলঘড়ি, যমুনা টকিজ, চারমাস, আয়নার বীজ, তাতারসি প্রভৃতি ছোটগল্পে সুন্দরবনের জনজীবনের বিভিন্ন সত্তা ধরা পড়েছে।

সূচক/মূল শব্দ : সুন্দরবন, নোনাভূমি, কাঁকড়া, বিপন্নতা, মৎস্য শিকার, কাঠ সংগ্রহ, ঘূর্ণিঝড়, পালা-পার্বণ, যৌনতা, বঞ্চনা, তেভাগা, সংস্কার প্রভৃতি।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'মগ্নচর' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'প্রতিশ্রুতি' পত্রিকায়। তার প্রথম উপন্যাস 'রমাপদর অশন-ব্যসন' 'পরিচয়' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশ পায় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। "ডায়মন্ড হারবার, কুলপি, কাকদ্বীপ, মন্দির বাজার, মথুরাপুর, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা, সীতারামপুর, নামখানা, সাগর, জম্বুদ্বীপ, ঘোড়ামারা দ্বীপবাসি মানুষদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পালা-পার্বণ, যাত্রা-পাঁচালী, মন্ত্র-তন্ত্র, চাষ-আবাদ - এসব কিছুর মধ্যে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে দক্ষিণবঙ্গের যে সামাজিক ইতিহাস - ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় সেই সামাজিক ইতিহাসের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তার আখ্যান ভুবন জুড়ে।"১ বিগত চার বছর ধরে তার কথা সাহিত্যের বিশাল ব্যাপ্তি। ১৯৯২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে তিনি রচনা করেছেন প্রায় ১১ টি উপন্যাস। রমাপদর অশন-ব্যসন, বন্দর, বিনোদনের বিপণন, স্বজনভূমি, চরপূর্ণিমা, পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ, ফুলের মানুষ, সহিস, জোড় কলম, নভেলেট,

সমুদ্র দুয়ার - এই উপন্যাসগুলি কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রচনার ভৌগলিক সীমানা বলয় ও কথাকারের মনন ভূমি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। পাশাপাশি ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছটি গল্পগ্রন্থ - যাত্রীনিবাস, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, নতুন মেম, জলের সীমানা ও সেরা পঞ্চাশটি গল্প প্রকাশিত হয়। ২০১৪ সালে এপ্রিল মাসে দেজ পাবলিশিং থেকে প্রকাশ পায় 'রমনী ও পুরুষ' নামে আরেকটি গল্প সংকলন। ২০২২ সালে দেজ পাবলিশিং থেকে প্রকাশ পায় 'আড়খেয়া' নামে একটি গল্প গ্রন্থ। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের জন্য পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সোপান পুরস্কার। 'সহিস' উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে। এই 'সহিস' উপন্যাসের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের এক আলাদা পরিচয় জগত। 'ওল্ড বুক নিউ বুক' গল্পটির জন্য ২০০৩ সালে দিল্লি থেকে পেয়েছেন 'কথা পুরস্কার'। বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন ও সাহিত্যের বিভিন্ন মঞ্চ থেকে পেয়েছেন 'শিলালিপি', 'পাঞ্চজন্য', 'লোককৃতি পুরস্কার', 'রামমোহন লাইব্রেরী পুরস্কার'। ২০১১ সালে পেয়েছেন 'সমতট' পুরস্কার।

অনেক সাহিত্য সমালোচক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে আঞ্চলিক কথাকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন কিন্তু পাঠক-গবেষক হিসাবে আমরা হয়তো ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার প্রত্যক্ষ ছোঁয়া পেয়ে থাকলেও তাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে আঞ্চলিকতার সীমাবদ্ধতায় বেঁধে রাখতে রাজি নই। এ বিষয়ে একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক দেবেশ রায় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (২০০৪) -এর ভূমিকায় এই ভাবনাটিকে সামনে রেখেই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে যুগপৎ আঞ্চলিক ও নির্বিশেষে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - "ঝড়েশ্বর কিছুতেই তার গল্পকে নির্বিশেষে নিয়ে যেতে চান না। যেন ঝড়েশ্বর বুঝতেই পারেন না - কি করে নির্বিশেষে ও বিমূর্ত কোন ভাবনাকে গল্পে বলা যায়। গল্পের জন্য তার কঠিন ও কংক্রিট জায়গা জমি মানুষজন দরকার। এটা ঝড়েশ্বরের শেখা কোন তত্ত্ব নয়। ঝড়েশ্বরের এটাই স্বভাব। এই কঠিন ও কংক্রিটের ভিতর থেকে গল্প উঠলে উঠতে পারে বা এই কঠিন ও কংক্রিতে গল্প চারিয়ে যেতে পারে, এমন একটা অনুভব বা বোধ বা আন্দাজ থেকেই হয়তো ঝড়েশ্বর গল্প লিখতে এসেছেন। কোন নির্বিশেষকে বিশেষ করার জন্য নয়, কোন বিশেষকে নির্বিশেষ করার জন্য নয়, যেন ঝড়েশ্বর তার গল্পে বিশেষকে আরও বিশিষ্ট করতে চান। একেবারে ষোলো আনা বিশিষ্ট। একেবারে জিভের কথার মত বিশিষ্ট - কথা শুনে বোঝা যায় নদীর কোন বাঁকের মানুষ। ঝড়েশ্বর আঞ্চলিকতায় এতটাই বিশিষ্ট হওয়া সত্বেও তাকে আঞ্চলিক গল্পকার বলতে বাধে। বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট ও কংক্রিট অথচ আঞ্চলিক নয়। অনাঞ্চলিক অথচ নির্বিশেষ নয়। ঝড়েশ্বরের গল্প এমনই দুমুখো ও উল্টোটানা।"২

১৯৯৪ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'সিন্দুক' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চন্দনপিড়ির ৭০-৭৫ বয়সের জোতদার ছুনুবাবু (প্রকৃত নাম টুনুবাবু)। এক সময় এ তল্লাটের সবথেকে দাপুটে লোক ছিলেন ছুনুবাবু। প্রতিদিন রাতে শোওয়ার সময় বন্ধুকে টোটা লাগিয়ে বিছানার তলায় বন্দুক নিয়ে ঘুমান। আবার পরদিন ভোরবেলা বন্দুক থেকে টোটা খুলে বন্দুকটি সযত্নে কাঠের বড় সিন্দুকে গুছিয়ে রেখে দেন। এক সময় এলাকায় বিডিও, দারোগা, ইন্সপেক্টর বা গভমেন্ট অফিসের কেউ এলে ছুনুবাবুর বাড়িতে এসে উঠতেন। কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ সালের পর থেকে তারা কেউ আর ছুনুবাবুর বাড়িতে এসে ওঠেন না। এটাই এখন ছুনুবাবুর দুঃখের কারণ। তারা এখন গিয়ে ওঠেন ছুনুবাবুর বাড়ির সম্মুখের রাস্তা পার হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য, উপপ্রধান ও প্রধানের বাড়িতে। ছুনুবাবু বলেন সেই সদস্য, প্রধান, উপপ্রধান সবাই তো ছুনুবাবুর চাষি মজুর। তিনি বলেন, "প্রধান উপপ্রধানের বাপ ঠাকুরদারা ছুনুবাবুর ধান খড় বইত।" তিনি আরও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন এক সময় ফরেস্টের রেঞ্জার সাহেব ছিল ছুনুবাবুর বন্ধু। তখন বন্ধু রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে ছুনুবাবু বন্দুক নিয়ে অনেকবার হরিণ শিকারে গেছেন। হরিণ শিকার করে হ্যাজাক জেলে হরিণের মাংস রান্না করেছেন বনের মধ্যে। খাওয়া দাওয়া আর কলকাতা থেকে আনানো বিলিতি মদ ইত্যাদি ছিল সেই সময়কার তার আমোদ প্রমোদের স্মৃতি। সেই দিন কবে যেন ফুরিয়ে গেছে। বহুদিন ছনুবাবুর হরিণের মাংস খাওয়া হয়নি, কেননা হরিণ শিকার এখন আইনত অপরাধ। তাই যেন আজ সে হরিণের স্বাদ ভুলতে বসেছে। সুধীরের সাইকেলের পিছনে বসে যেতে যেতে তাই সুধীরকে বলে, "বুঝলে হরিণ মাংস বড় শুদ্ধ খাদ্য। যদি এক থাবা পাওয়া যাইতো গো সুধীর....।" আজ ছুনুবাবুর আক্ষেপের দিন। সোনালী সেই দিনগুলোর কথা ভেবে ভেবে মনটা কেমন উদাসী হয়ে যায়। এভাবেই হয়তো ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে থাকে এক হাত থেকে অন্য হাতে। আর সেই সিন্দুক, সিন্দুকে রাখা বন্দুক এখনো বহন করে নিয়ে চলে তার সেই শক্তি উন্মত্ততার চিহ্নকে।

সমুদ্র, বালিয়াড়ি, জঙ্গল, ঝোপঝাড়, জীবিকা, ভোরের শীত, নৌকা, মাছের আড়ত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গল্পের কাঠামো গড়ে উঠেছে। সমুদ্রগন্ডি গল্পটি ১৯৭৭ সালে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি 'রমণীও পুরুষ' (২০১৪) গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত। সমুদ্র উপকূলবর্তী বালিয়াড়িতে টুসকি কাঠ সংগ্রহ করে। উদ্দেশ্য আড়তে কাঠ বিক্রি করে দু'পয়সা মুনাফা অর্জন। সঙ্গে নিয়ে যায় নারকেল দড়ির লেচি আর টাঙ্গি। টাঙ্গি দিয়ে ঝাউ গাছটার শুকনো ডালে ঘা দিতেই ভোরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়ে একটা কড়া চিৎকার ভেসে আসে 'কে গাছ কাটে-এ-এ'। পিছন ফিরে দেখে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আর্দালি। আর্দালি বলে 'আজ তুমি কাঠ কটা নিয়ে যাও - কাল থেকে আর নয়'। বোঝা এক হেচকায় মাথায় তুলে নিয়ে টুসকি চলতে লাগল বাউন্ডারির বাঁধের দিকে। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তার বন্ধু সুধীরের সঙ্গে। দুজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছায় মাছের আড়তে। গদির মালিক গিরিবাবু টুসকিকে দেখে জবাব

দেয় 'না না আর কাঠ লাগবেনি। টুসকি যেন খুব উঁচু মগডাল থেকে ধরাম শব্দে নিচে আছড়ে পড়লো'। টুসকি একটা ঘোরের মধ্যে পাক খেতে থাকে। টুসকির বাবা জাল, গাছি বন্ধক রেখে সেই কবে কাঠ ভাঙতে বহরে গেছে আজ চার পাঁচ দিন হয়ে গেল, এখনো ফিরে আসেনি। সে বাধ্য হয়েই কাঠ সংগ্রহে বেরিয়েছিল। আশা ছিল দু চার টাকা উপার্জন করা কিন্তু ভাগ্য বিপরীত। "টুসকির বুকের মধ্যে সমুদ্রে পাল ছেঁড়া নৌকো ডুবি মানুষের আকুপাক। .... বালিচরের পরে আর এক পাও হাটা যাবে না, সামনে জল রেখার বিরাট গণ্ডি। ঢেউ। অসংখ্য শাসন।"৩ সমুদ্রের প্রেক্ষাপটে জীবন জীবিকার নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পের মধ্য দিয়ে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের একটি বহুখ্যাত গল্প হল 'নোনা'। নোনা গল্পটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। বিজয়-যমুনা ও চার বছরের মেয়ে নুপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পের প্লট। সুন্দরবনের নোনা দ্বীপ অঞ্চলে মানুষের পেশা বলতে আছে সামান্য চাষ আবাদ, মৎস্য শিকার ও অরণ্যে মধু সংগ্রহ। তাই অনেকে বাড়িতে হাঁস মুরগি পালন করে ডিমের আশায়। বাজারের ডিম বিক্রি করে যে দু চার টাকা উপার্জন হয় সেটাই অভাবী সংসারে অনেকটা সহযোগিতা করে। খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি যমুনা বাড়িতে মুরগি পোষে। প্রতিদিন ডিম সংগ্রহ করে ও বিজয়কে পাঠিয়ে দেয় শহরগামী লঞ্চঘাটে বিক্রি করতে। প্রতিদিন নুপুর ভোরবেলা উঠে বুড়ো মুরগিটাকে সোহাগ করে। বিজয় লক্ষ্য করে - "প্রতি বছর তো গাঙ্গ ভাঙছে আর বাঁধ হচ্ছে। তার ডেরায় দূরত্ব ছোট হয়ে আসছে নোনা গাঙ বিষদাতে চিবোচ্ছে চরের মাটি।"৪ তাদের জীবনে কোনো মিষ্টত্ব নেই, আছে শুধু লবণাক্ত নোনা ভাব। বিজয়ের হঠাৎ মনে পড়ে কাল রাতে পেতে রাখা দোনটা তো দেখে আসা হলো না। যদি দু-চারটে পাঙ্গাস, টেংরা বা চিংড়ি বরশিতে গাঁথে। যমুনা জোক আর আরশোলা গেঁথে দিয়েছিল বড়শিতে গতকাল রাতে। কিন্তু তেমন কিছুই কপালে জোটে না। ততক্ষণে ডিম নিয়ে লঞ্চে যেতে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে বিজয়ের। তাড়াতাড়ি বনবাদার ঝোপঝাড় পেরিয়ে যখন বিজয় পৌঁছেছে লঞ্চ ঘাটে ততক্ষণে অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। লঞ্চ পৌঁছে গেছে মাঝ নদীতে। তাই ৩০ পয়সা দামের ডিম কুড়ি পয়সায় নিশিকান্ত বাবুকে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে - চাল, ডাল, তেল, নুন কিনতে হবে তো! লঞ্চঘাটে আসার সময় বিজয় লক্ষ্য করেছে পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। " গোটা দ্বীপটাকে নোনা ক্ষার পচা ঘা এর মত শেষ করে দিচ্ছে সব। একটু একটু করে গোটা দীপটাই খাবে। আমার বাস্তভিটে জমি জায়গা - সব ধুয়ে যাবে। আজ না হোক কাল।" অমোঘ অপ্রতিরোধ্য ভবিতব্য বিজয় মনে মনে অনুভব করে।সুন্দরবনের নোনা দ্বীপে নোনা জল সাধারণ মানুষকে নোনা ছোবল মারতে থাকে অবিরত। এভাবেই নোনাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলে বিজয়-যমুনারা।

সন্ধ্যা, যতিন এবং মকবুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'কাঠকুটো' গল্পের কায়া। গল্পটি **১৯৭৯** সালে 'রূপসা' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ পায়। ঝড়েশ্বর

চট্টোপাধ্যায়ের 'কাঠকুটো' (জুন, ২০১৮) গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত এই গল্পটি। সরকারি আর্থিক পাঁচশ টাকা অনুদানে ৫২টা টালি ছাউনি ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল বাস্তহীনদের বসত হিসাবে। সন্ধ্যা সেখানকারই বাসিন্দা। কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্ধ্যা একজন কাঠ কুড়ুনী মেয়ে। 'ভাত পান্তায় নিহেরে বোমলা রাঙি চিংড়ির ঝাল চচ্চড়িতে পুরুষ্ঠ শরীর। বুক ঝাঁপিয়ে যৌবন'। সন্ধ্যা ভয় পায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পাজি আর্দালিটা হয়তো এসে তাকে জাপটে ধরবে। সে এসে দাঁড়ায় সমুদ্র বালির চূড়ায়। "এখান থেকে সমুদ্র একেবারে অবাধ। সমুদ্রের চরটা অনেক নিচে। পায়ের চাপে বালি একটু একটু ধ্বসে যায়, আবার টাল সামলিয়ে ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়ায়। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বুকে অনেকটা দেখা পায়। দৃষ্টি আরো বাড়িয়ে দেয়, শুধু ঢেউ, অসংখ্য ঢেউ"।৫ সন্ধ্যা ঢেউ চিরে অন্য কিছু খোঁজে। যদি হাত দশেক শাল সেগুন কাঠ পায় তবে তার ১৫-২০ টাকা বাঁধা। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় যতিনের সঙ্গে। মনে মনে সন্ধাকে চায়। সেটা সন্ধ্যাও বুঝতে পারে। হঠাৎ সমুদ্রের কিনারায় কিংবা কিছুটা গভীরে সন্ধ্যা কিছু একটা দেখতে পায়। শিকারির মত আর্ত দৃষ্টিতে ওৎ পেতে বসে থাকে। হঠাৎ মকবুলও জিনিসটার হদিস পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউয়ের ফনায়। "জোয়ার ক্রমশ বাড়ছে, বাতাসে সা সা শব্দ জল ভাঙার গর্জন। দূরে যতদূর চোখ যায় ধু ধু নুন ফেনা হাফসাচ্ছে গোটা সমুদ্দুর"।৬ ৩/২ ফুটের সেগুন কাঠের একটি টুকরো নিয়ে মকবুল কিনারায় হাজির হয়েছে - সন্ধ্যা ভীষণ খুশি। যতীন অপেক্ষা মকবুল কি তার বেশি পুরুষালী বলে মনে হয়। "যতীনের মুখ সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলে সন্ধ্যা। গায়ের কাছে মকবুল মেশিন বোটের মেছো"।৭ অমলেন্দু চক্রবর্তী বলেছেন - "মিনমিনে ভীরু স্বভাবের যতীন বাতিল হয়ে যায় সন্ধ্যার ভাবনায়। তার সমস্ত নারীত্ব সমর্পিত হতে চায় উদ্দাম পৌরুষ মকবুল এর কাছে, যে মানুষ সমুদ্র-তরঙ্গে নাচে"।৮ ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার, প্রেম সমস্ত কিছু মুছে যায়। শুধুমাত্র পরিশ্রমের সফলতায় মকবুল হয়ে উঠতে পারে সন্ধ্যার আসল পুরুষ মানুষ। আবার কাঠকুঠোর মত সন্ধ্যার মন থেকে এ ভাবনাও মুছে যায়। 'প্রেম নয়, প্রীতি নয়', জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদই সন্ধ্যার কাছে বড় হয়ে ওঠে।

১৯৮৬ সালে 'সাপ্তাহিকী বর্তমান' পত্রিকায় 'ডান দিকের সঙ্গী' গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (জানুয়ারী ২০০৪) গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত আলোচ্য 'ডান দিকের সঙ্গী' গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাখম ও পূর্ণিমা। গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। পূর্ণিমার ডান পাটি কাটা অর্থাৎ খোঁড়া ও বিধবা। পূর্ণিমার মৃত স্বামীর নাম ছিল হৃদয়রঞ্জন। মাখম মনে মনে পূর্ণিমাকে কামনা করে। হৃদয়রঞ্জনের অনুপস্থিতিতে মাখন পূর্ণিমার কাছাকাছি আসে এবং উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক দানা বাধতে শুরু করে। মাখমের প্রতি পূর্ণিমার নির্ভরশীলতা দিন দিন বেড়ে ওঠে। গঙ্গাসাগর মেলায় নিয়ে যাওয়ার আকুতি জানায় পূর্ণিমা। "সমুদ্রের জল চর ছাড়িয়ে অনেকটা নিচে। সবে জোয়ার লেগেছে। বাঁশ খুটো বেড়া আর কাঁটাতারের লম্বা লাইন দিয়ে পুণ্যার্থীদের অবগাহন দ্বারপথ। মেলায় তথ্য

বিভাগের বড় টাওয়ার থেকে গম্ভীর সংস্কৃত স্তোত্র ভেসে আসছে। সামনে পিছনে অসংখ্য মানুষ। পুণ্য মহাতিথির মুখ্য মুহূর্ত ধরার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা।"৯ দুজনে গঙ্গা মেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। উদ্দেশ্য, পুণ্য তিথিতে গঙ্গাসাগরে হৃদয়রঞ্জনের অস্থি বিসর্জন। অস্থি বিসর্জন শেষে উভয়ে আরো কাছাকাছি ধরা দেয়। স্নান শেষে ক্র্যাচ ছাড়া পূর্ণিমা মাখনকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়ায়। পূর্ণিমার মনে হয়, "লোহাপাতের জিনিসটা শুধু টাল সামলায়... মানুষের ভার সইতে মানুষ...।"১০ পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না পূর্ণিমার দায়ভার হয়তো সে অর্পণ করতে চায় মাখন এর উপর। এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হয় হয়তো।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষকদের একটি বড় সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে 'জলের আয়না' গল্পটি। কোন কোন সময় বর্ষাকালে যখন প্রচুর মাছের আমদানি হয় তখন কিছু মুনাফা লোভী অসৎ জমির মালিক নিজের জমিতেই নোনা জল ঢুকিয়ে রাতারাতি জমির উপর তৈরি করে ফেলে মাছের ঘেরী। ফলে পাশাপাশি অন্যান্য জমির মালিকেরা জমি হারায়। জমির মালিকের কাছে তখন ফসলের চেয়ে মাছের মূল্য অনেক বেশি তাই সে জমিতে মাছ ঢুকিয়ে নেয়। কিন্তু সাধারণ কৃষি শ্রমিকেরা মৎস্য চাষে উৎসাহী নয়, তারা লাঙ্গল জমি নিয়েই খুশি থাকতে চায়। ফলত জমির মালিক বা লিজ বাবুদের সঙ্গে কৃষকদের ঘটে বিরোধ । কৃষকেরা জমি ফিরে পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু বর্গাদার লিজ বাবুরা জমি দিতে অসম্মত হয়। আবার পাশাপাশি জমিতে নোনা জল ঢুকে গেলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়, এটাও কৃষকদের দুশ্চিন্তার কারণ। নিজের জমি হারিয়ে বিষ্ণুপদ উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠে। বিষ্ণুপদ ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছের ঘেরীতে। জলে ডুবে ডুবে হাতড়ে-হাতড়ে পায়ে-পায়ে নিজের জমিকে খুঁজে ফেরে ভূমিহীন বিষ্ণুপদ। অবশেষে বিষ্ণুপদ চিৎকার করে বলে ওঠে, "পেয়েছি এইতো আমার বাপের জমিন"। এই অবিস্মরণীয় দৃশ্যের মুগ্ধতায় আমরা পাঠকেরা বাকহারা হয়ে পড়ি। অসৎ, নিষ্ঠুর লিজবাবু হারান নস্কর বলে ওঠে, "এত জল কাঁদায় বিষ্ণু জমিটা চিনলো কি করে?" জলের আয়নায় বিষ্ণুপদ নিজের জমিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। ঘামে রক্তে ভেজানো তার বাপ ঠাকুরদার জমিকে সে স্পর্শ করলেই অনুভব করতে পারে। মাটির সঙ্গে মানুষের যে অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন তা স্পষ্ট রূপে এই গল্পে ধরা পড়েছে।

প্রশান্ত, স্ত্রী জয়া ও দুটি ছোট সন্তানকে নিয়ে গাঙ বাঁধের ধারে স্বপ্নের ঘর বাঁধে। প্রশান্তর পেশা হলো মাছের আড়তে মাছ লোড ও আনলোড করা। কিছুদিন পর বাঁধে ফাটল ধরে, তীব্র জলের তোড়ে ঘরবাড়ি ভেসে যায় গহীন গাঙে। এবারে আড়তবাবুর দেওয়া জমিতে তারা নতুন করে আবার ঘর বাঁধে কিন্তু সেখানেও ভাগ্য বিফল। শোনা যায়, সেখানে নাকি রেললাইন তৈরি হবে, জায়গা ফাঁকা করে দিতে হবে। পুনরায় বাসন-কোশন ঘর-দোর জিনিসপত্র বেঁধে স্ত্রী সন্তানকে সঙ্গে করে নতুন ভূমির খোঁজে বের হয় প্রশান্ত। খুঁজে ফেরে স্থায়ী ঠিকানা - যেখান থেকে আর হতে

হবে না ভূমিহীন, ঘরহীন। অবশেষে অনেক দূরে রাস্তার ধারে কাঠপুলের কাছে নতুন স্বপ্নের ঘর বাঁধে প্রশান্ত। সেখানে কিছুদিন থাকার পর শুনতে পায় সেখানেও নাকি জাহাজঘাটা তৈরি হবে, সরে যেতে হবে অন্যত্র। এক জীবনেই বারবার উদ্বাস্তু হতে থাকে প্রশান্তের মত আরো অনেক পরিবার। প্রশান্তরা তাই স্থায়ী ঠিকানা খোঁজে, পারেনা স্থায়ী হতে। তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী বসবাস করতে চায়, থিতু হতে চায়, চায় শিকড় মাটির গভীরে প্রথিত করতে। সুন্দরবনের খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের বারবার উদ্বাস্তু হওয়ার বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে 'জাহাজঘাটা' গল্পের কাঠামো।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' (জানুয়ারি, ১৯৯৩) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গল্প হল 'সমুদ্রতীরে'। গল্পটি তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রাণতোষ হাতি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রধান। পেশায় ছিলেন ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার। নিকুঞ্জ বেরা আশ্রমের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। প্রথমেই উঠে আসে সমুদ্র প্রসঙ্গ "শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভোরের হাওয়ায় রিটায়ার্ড ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার পেছনে তাকায়। ডালে পাতায় ঝাউচারা... সাদা বালির স্তূপ - তার ওপাশে অনাথ বালকদের আশ্রম।"১১ ভজরাম প্রাণতোষ হাতির ছায়া সঙ্গী ভৃত্য। প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে বন্যায় ভেসে চড়ায় ঠেক খেয়ে পড়েছিল ভজরাম। মৃতবৎ ভজরামকে আশ্রয় দিয়েছিল প্রাণতোষ হাতি। সেদিন থেকেই প্রাণতোষ ভজরামের একনিষ্ঠ প্রভু বাবু। কিন্তু প্রাণতোষ হাতির কাছে ভজরাম 'ম্যানেজার-নায়েব'। নিকুঞ্জ বেড়ার কাছে অনাথ আশ্রম থেকে চিঠি এসেছে জরুরী মিটিং এর। গল্পে উঠে আসে ১৯৪৮-৪৯ এর সময় প্রবাহ। প্রাণতোষ হাতি সেই সময় প্রবাহের জীবন্ত সাক্ষী। কিভাবে লাটদারেরা জোতদারকে দিয়ে চাষবাস আবাদ করাতো। সেই সময় এখানে এসে প্রবেশ করল কমিউনিস্টরা। তৈরি হলো বিক্ষুব্ধ বাতাবরণ। উভয়ে এসে পৌঁছান আশ্রমে, দেখা হয় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ডাক্তার বাবুর হাতেই এখন আশ্রমের ভার অর্পিত। আগামী ৮ তারিখ লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এর একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এখানে আসবেন অনাথ বালকদের থাকার জন্য একটা বড় বোডিং ঘর তৈরি করার জন্য - এটাই মিটিং এর মূল বিষয়। মিটিং শেষ করে সকলে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান রাস্তার পাশে গেমুয়া গাছের তলায়। হঠাৎ প্রাণতোষ বলে ওঠে - "এই সেই গাছ গো-। তেভাগার বিপ্লবী লিডারদের বাধা হইছিল- ডাক্তার লোকজন সকলের চমকে ওঠে"। পার্টি থেকে ওদের অস্ত্র লড়ায় থামাতে অর্ডার দিয়েছিল, তাই ওরা পালিয়ে পালিয়ে গাঙ্গে সমুদ্রে ভেসে বেড়াতো। তারপর একদিন বি.এস.এফের গুলিতে সেই বিপ্লবী মালির ছেলে শহীদ হয়। গভমেন্ট থেকে লাইসেন্স বন্দুকের অফার এসেছিল প্রাণতোষ হাতির কাছে, সে গ্রহণ করেনি। তারপর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে শান্তি রক্ষক হিসাবে তাকে একটি মূল্যবান সার্টিফিকেট প্রদান করেছিল। যে সার্টিফিকেটে গভমেন্টের সিলমোহল মারা এবং যার দৌলতে রাজভবন থেকে দিল্লি প্রেসিডেন্ট সব জায়গায় দেখা করা যায়। সকলের চোখে কেমন

একটা সম্মান, বিস্ময়, কৌতুহল দানা বাঁধে। সকলের চোখে তাকিয়ে খুশি, আস্থা ও মর্যাদায় চকিতে উজ্জ্বল মুখমন্ডল বৃদ্ধ প্রাণতোষ হাতির। ডাক্তারের মনে হয় -"মানুষ বোধ হয় চায়...মর্যাদাভূষিত জীবন যাপনের স্বীকৃতি.. !"১২

সমুদ্রের প্রতি মানুষের নিবিড় ভালবাসার অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে উঠেছে 'জলকন্যা' গল্পে। 'জলকন্যা' গল্পটি ২০০১ সালে 'এখন মুক্তাক্ষর' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পটি 'নতুন মেম' (জানুয়ারি, ২০০৫) গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি উল্লেখযোগ্য সমুদ্রপ্রীতিমূলক গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মালতী, বয়স আঠারো উনিশ। তিন ভাই-বোন বাবা-মায়ে সংসার। প্রায় এক বছর পর কলকাতার বাবুদের বাড়ি থেকে দিন দশকের ছুটিতে নিজের গ্রামে এসেছে মালতী। মালতী কলকাতায় বসু বাড়ির পরিচায়িকা। খাওয়া পড়া মাস মাইনের সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে। চার পাঁচ বছর থেকে সে কলকাতাতেই থাকে। বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় থাকার একটা গোপন ব্যথা সে মনে মনে অনুভব করে সর্বদা। "মনে হল মা-বাবা ভাই-বোনদের থেকে কত দূরে...। মা ভাই বোনদের চোখের মনি... বুকের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেও কত শত মাঠঘাট মাইল দূরে...।"১৩ দিদি গীতা ও ভাই ছকুর সঙ্গে তার সময় বেশ আনন্দ করে কেটে যায়। "কলকাতার কোন পিচ ঢালাই স্ট্রিট নয়, পাকা লেনও নয়, রড সিমেন্টে আকাশ কুঠুরির মেঝে নয়, গাছপালাময় নোনা মাটিতে দাঁড়িয়ে মালতীর বুকের ভিতর কোন আত্মজনের পরশ প্রবাহ যে...।"১৪ ক্রমে ছুটি ফুরিয়ে আরো তিন চার দিন পার হয়ে যায়। গীতা ও ছকুর সঙ্গে মালতি ঘুরে বেড়ায় সমুদ্রে, উপকূলে, বালিয়াড়িতে, ফরেস্টে প্রভৃতি স্থানে। এবার কলকাতা থেকে স্বস্ত্রীক অনিমেষবাবু এসেছেন মালতীর বাড়িতে, মালতীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বলে। অনিমেষবাবু ২৪-২৫ বছর ধরে অধ্যাপনায় ব্যস্ত। বড় মেয়ে কলেজের অধ্যাপক, ছোট মেয়ে হাইকোর্টের উকিল। মালতীর কাছ থেকে বসু পরিবার সর্বোচ্চ পরিষেবা পাবার জন্য কাজের পরিবেশটা যথাযথ রেখেছেন। মালতী সেখানে বেশ আদর যত্নেই থাকে। মালতি সমুদ্র স্নান সেরে এসে অনিমেষবাবু ও গৃহিণীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। গৃহিণী প্রশ্ন করে 'আমাদের বাড়ি যাবি না?' মালতি জবাব দেয়, যাবো, চান করে আসি। বলতে বলতে মালতি আবার ছোটে সমুদ্রমুখো। দেখতে দেখতে ৩৫-৪০ মিনিট পার হয়ে যায়। অনিমেষ দেখতে পায়, "মালতী এলোমেলো কাপড়ে সমুদ্রকে গায়ে মাখছে। সর্বাঙ্গ বিছিয়ে আলগ্ন।" গৃহিণী কিছুটা ক্ষোভের কণ্ঠে বলে ওঠে, এখনো চান হয়নি? অনিমেষ বলে ওঠে, 'চলো ফিরি'...।' গৃহিণী বলে, ওকি যাবেনা? "সে কী? তাহলে আমাদের..."। অনিমেষ গৃহিণীর মুখোমুখি হয়ে কোন অতল ধ্বনিময়তায় বলে ওঠে - "আমাদের কলকাতার বাড়িতে এত বড় সমুদ্র আছে...!," ১৫ অনিমেষ অনুভব করতে পারে আঠারো উনিশ বছরের মালতির শৈশবের ব্যথা অনুভূতির জগতকে। তাই সে মালতিকে না নিয়েই ফিরে যেতে চায় কলকাতায়। হয়তো মালতি আর কখনো কলকাতায় ফেরেনা। বুকে আঁকড়ে ধরে বিপুল সমুদ্রকে, বেঁচে থাকে সমুদ্রের মধ্যে।

সমুদ্রের প্রতি মালতির এ এক ভিন্ন ধরনের আনন্দ উপলব্ধি ভালোবাসার অচেনা ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সমুদ্র প্রীতি তথা প্রকৃতি প্রীতি মালতীর মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে।

ইয়াস বা যশ ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দুটি ছোট গল্প রচনা করেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের আগমন বার্তা, ভয়াবহতা, মানুষের করুণ পরিস্থিতি ও সমুদ্র উপকূলবর্তী জনজীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন আলোচ্য গল্প দুটিতে। গল্প দুটি হল 'মে'র জোছনা' (অক্টোবর ২০২১) ও 'সমুদ্র রমণী ও দলিলের ঢেউ' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১)। আলোচ্য গল্পদুটি ঝড়েশ্বরের 'আড়খেয়া' (বইমেলা ২০২২) গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পদুটি মিলে ইয়াশ ঝড়ের পরিপূর্ণ রূপচিত্র পাঠকের সামনে ধরা পড়ে। ২৩ শে মে রবিবার ২০২১ 'মে'র জোছনা' গল্পের সূচনা। বছর ২৬ এর হাসেম ও আকলিমার সংসারে মেয়ে সুমাইয়া। টিভি চালাতেই উচ্চারণ বাজে,"... অতি গভীর নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড় যশ'য়ে পরিণত হবে' ... স্ক্রিনের সামনে দাঁড়ায় মা ও মেয়ে, 'সন্ধ্যার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূল এলাকায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝড়ো হওয়া বইবে ও বৃষ্টিপাত হতে পারে..."। ...পুলিশ বাবুরাও মাইকে চেঁচিয়ে গেল, হাই ইস্কুল বাড়িতে ত্রাণশিবির খোলা হচ্ছে, সমুদ্রকূল ছেড়ে দুর্বল ঘর ছেড়ে কাল থেকে সম্ভব হলে আজ থেকে শিবিরে আশ্রয় নিন... ১৫০-১৫৫ কিমি বেগে আসছে..."।১৬ ঝড়ের প্রবল তাণ্ডব শুরু হয়। গ্রামবাসীরা সব দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রবল জলের তোরে সুমাইয়া ভেসে যায়। এক দোকানেই তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। সকলে ছোটে হাইস্কুলের ত্রাণ শিবিরে। এক একটি ঘরে প্রায় ২০-২৫ জন আশ্রয় নেয়। চিড়ে, গুড়, বিস্কুট, লুঙ্গি, জামা প্রকৃতি ত্রাণসামগ্রী এসে পৌঁছয়। কিছুক্ষণ পর শুরু হয় সর্বহারাদের আগুপিছু কান্না। 'সমুদ্র রমণী ও দলিলের ঢেউ' যেন দ্বিতীয় পর্ব। "কত পরিবার যে সে সময় হাল লাঙলে চাষ করতো...। সে জমি ধীরে ধীরে নোনা সমুদ্র খেয়ে নেয়। গ্রাম... মৌজাটাকে নোনা ঢেউ ছোবলে ছোবলে ধসিয়ে সমুদ্র করে নিয়েছে।"১৭ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্লাস্টিকের বস্তায় বেঁধে মাথায় নিয়ে হাতে গবাদি পশুর দড়ি ধরে সবাই এগিয়ে চলে হাই স্কুলের ত্রাণ শিবিরের আশ্রয়ে। মিলি কমলা এখানে এসে ওঠে। সাত আট জন ছেলে কর্মী মেয়েরা বস্তায় শুকনো খাবারের প্যাকেট জনে জনে বিলি করে। সেখানে শরণার্থীদের হাতে 'দুয়ারে ত্রাণ' এর একটি করে ফর্ম ধরিয়ে দেয়। ফর্ম ভরে দিলেই মিলবে সাহায্য। বড় সাহেবরা এসেছেন সরেজমিনে। সকলে সাহেবদের কাছে হাতজোড় করে। এখানেই সমাপ্ত হয় গল্পটি।

অবদমিত কামনা-বাসনা, যৌনতা, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নানা বিষয় - জলঘড়ি, তাতারসি, যমুনা টকিজ, চারমাস, আয়নার বীজ প্রভৃতি গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে। 'চারমাস' গল্পের নায়ক হিমাংশু। চারমাসের ভাঙ্গা গড়ার কাহিনী এই গল্পে উঠে আসে। কাজের খোঁজে হিমাংশু এক দ্বীপে এসে পৌঁছায় মেশিন তদারকির কাজে। সেখানে এসে দেখা হয় অঞ্জির সঙ্গে। অঞ্জি স্বামী পরিত্যক্ত একজন নারী। ফলে ধীরে ধীরে

অঞ্জির মন গিয়ে পড়ে হিমাংশুর ওপর। হিমাংশু ও অঞ্জির সম্পর্ক দানা বাঁধে, অবদমিত কামনা বাসনা পূর্ণতার রূপ খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন হিমাংশু দ্বীপ ছেড়ে চলে যায় এবং অঞ্জির সমস্ত স্বপ্ন চুর্ন-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে। সুন্দরবনের নোনা অঞ্চলে নদীর বা দ্বীপের যেমন পাড় ভাঙ্গে তেমনি অঞ্জির মন ভাঙার উপমা এখানে অঙ্কন করা হয়েছে। 'জলঘড়ি' গল্পে মঞ্জুরি ও দুঃশাসনের মানবিক যৌনতা ও কামনা বাসনার চিত্র ধরা পড়েছে। জলঘরির হিসেব ধরে ইটভাটাতে কয়লা দিতে হয়, এই কাজ করে দুঃশাসন। সেই ইটভাটাতেই কাজ করে স্বামী পরিতক্তা মঞ্জুরী। সেই ভাটাতে এনামেল তাদের সঙ্গী। দুঃশাসন মঞ্জুরীর ওপর এবং মঞ্জুরী দুঃশাসনের উপর দেহজ কামনা বাসনার তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু উভয়েই জানে এই মনের টান আসলে শরীরী খেলায় মাতোয়ারা হওয়ার নামান্তর। হঠাৎ একদিন ইটভাটার মুন্সি যখন মহাদেবের বউয়ের ঘরে ঢোকে তখন মঞ্জুরীও দুঃশাসনের হাত ধরে জোর করে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে আসে। দুজনের শরীরে ও মনে ইট ভাটার মত দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। "মুখোমুখি উষ্ণ পরিসর। নিঃশ্বাসের শব্দ। দুজনেই থৈ না পেয়ে বোবা। দুঃশাসন মঞ্জুরির চোখে দেখতে পায় ডিবরির আগুন।" তবুও যৌনতা পূর্ণতা পায় না। জলঘড়ির সময়ের কাছে পরাস্ত হয় দুঃশাসন। রডের হুক দিয়ে জলঘড়িটা ভেঙে ফেলতে চায় তীব্র আক্রোশে। 'আয়নার বীজ' গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়না। পেশায় যৌনকর্মী। নয়না স্বামীকে ছেড়ে ভ্যানচালক মাধবের সঙ্গে সংসার করতে চায়। দিনের বেলা সে ঘরণী আর রাতের বেলা বাবুদের আমোদের সামগ্রী। প্রসাধন, শাড়ি, গয়না, টিভি ইত্যাদির প্রতি তার আকর্ষণ। সে আশা করে আর একটু ভালো জীবন। এতে তার কোন পাপ বোধ কাজ করে না। সে বলে, "আমি তো সংসারের জন্যেই যাই।" মাধব প্রথমে সবকিছুকে মেনে নিলেও পরের দিকে সে প্রতিবাদ করে এবং শেষ পর্যন্ত নয়না তাকে চড় মেরে নিজের নির্দিষ্ট পথেই অনড় থাকে। বঞ্চিত, অবহেলিত, নির্যাতিত জীবনকে ত্যাগ করে সে এখন স্বাবলম্বী, অর্থ উপার্জনশীল। তাই সে কারো নাগালে পরাধীন হয়ে থাকতে চায় না। নিজের উপার্জনে কেনা নতুন আয়নায় নতুন ভাবে নিজের মুখ দেখে জীবনের বেঁচে থাকার আনন্দের বীজ মন্ত্র খুঁজে পায়।

অভিরাম, পারুল ও নিবাস কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'তাতারসি' গল্পের আখ্যান। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'তাতারসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায়। বাদাবনের মেয়ে পারুল। শরীর উপচে যৌবন। অভিরাম পেশায় কৃষক। শীতের কয়েক মাস ভোরবেলা টুপটাপ করে ঝরে পড়ে তাতারসি। "কেমন রসবতী মেয়ে মানুষের মত গাছ। ভরা তিন দিন তিন রাত ফোঁটা ফোঁটা ধারায় ভাড় ভর্তি করে দিয়েছে।"১৮ পঞ্চায়েতের পিয়ন নিবাসের কাছে পারুলও যেন রসে ভর্তি তাতারসি। নিবাস পারুলের যৌবনের তাতারসিকে আস্বাদন করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারুল খুঁজে ফেরে ভালবাসার উষ্ণতা ও নিরাপত্তা। অভিরামের মধ্যেই পারুল খুঁজে পায় সেই মানবিক সত্তাকে, যাকে

আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা যায়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় নিপুন দক্ষতায় পারুলের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া কামনা-বাসনার চিত্র অঙ্কন করেছেন আলোচ্য গল্পে।

তথ্যসূত্র :-

১) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প : জীবনের গাঢ় সমাচার, বরেন্দু মন্ডল, সমকালের জিয়নকাঠি, সম্পাদক, নাজিবুল ইসলাম মন্ডল, সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা (২য় খন্ড), জানুয়ারি-জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা-৯৮

২) 'তার নিজের আধুনিকতা', দেবেশ রায়, (মূলগ্রন্থ-ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা-৯

৩) রমণী ও পুরুষ, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা.১০-১১

৪) নোনা, শ্রেষ্ঠ গল্প, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮

৫) কাঠকুটো, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮৬

৬) কাঠকুটো, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯০

৭) কাঠকুটো, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯১

৮) ঝড়েশ্বর যা লিখেছেন, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শারদীয় কোরক, সম্পা. তাপস ভৌমিক, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৯১

৯) শ্রেষ্ঠ গল্প, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৪

১০) শ্রেষ্ঠ গল্প, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৬

১১) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮১

১২) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৯

১৩) নতুন মেম, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮৪

১৪) নতুন মেম, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮৬

১৫) নতুন মেম, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯১

১৬) আড়খেয়া, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২০

১৭) আড়খেয়া, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৫

১৮) তাতারসি, শ্রেষ্ঠ গল্প, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২২

গ্রন্থপঞ্জি :-

১) ছোট গল্পকারের দায় ও দায়িত্ব, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯৫

২) সেই স্বপ্নসম্ভবের জন্য অপেক্ষা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রবিবার প্রতিদিন, ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৬
৩) সাহিত্যের কাছে দাবিসনদ, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রবিবারের প্রতিদিন, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
৪) বিয়াল্লিশের ছোকরা ভাবছেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গণশক্তি, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৮
৫) আমার ছুনুবাবু, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ইছামতি বিদ্যাধরী, সম্পাদক অসীম কুমার রায়, জানুয়ারি, ২০১৩
৬) অন্য কাহিনীমালা, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, একালের রক্তকরবী, সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, সেপ্টেম্বর, ২০০৫
৭) চৌপাশকে আমার অবস্থান থেকে ধরতে চাই, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, দিবারাত্রির কাব্য, আফিফ ফুয়াদ, উপন্যাস সংখ্যা, ২০০৩
৮) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাষণ, বাংলা বই, সম্পাদক দেবেশ রায়, পবিত্র সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট ২০০৭
৯) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : পরিবর্তনশীল গ্রাম জীবনের ভাষ্য, শ্রাবণী পাল, কথা সোপান, সম্পাদক অমর মিত্র, বৈশাখ সংখ্যা, ১৪২৩
১০) চার দিক চার গল্পকার, উর্মি রায়চৌধুরী, বইয়ের দেশ, সম্পাদক হর্ষ দত্ত, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১২
১১) এই সময়ের ছোটগল্প : একটি কোলাজ, অরুণকুমার বসু, গল্পগুচ্ছ পত্রিকা, সম্পাদক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, শারদ ১৪১১
১২) গল্পকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শিশির কুমার বাগ, পথ পত্রিকা, সম্পাদক সৌরভ কুমার ভূঁইয়া, ২০১২
১৩) ছোটগল্পে আশির লেখকরাই এখন প্রধান, দেবেশ রায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫
১৪) শ্রেষ্ঠ গল্প, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, বারোমাস পত্রিকা, সম্পাদক অশোক সেন, শারদীয় ২০০৪
১৫) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি, শিশির কুমার বাগ, অন্য আকাশ, সম্পাদক শিশির কুমার বাগ, এপ্রিল ২০১৩
১৬) সাক্ষাৎকার, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রুপম প্রামানিক, শুধু সুন্দরবন চর্চা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৪
১৭) সাক্ষাৎকার, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গল্প সরনি, সম্পাদক অমর দে, ২০০৭
১৮) ছক ভাঙ্গার গল্প : প্রসঙ্গ ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অশোক পাল, সৃজন পত্রিকা, সম্পাদক লক্ষণ কর্মকার, এপ্রিল-জুন, ২০১৩

নগর মুর্শিদাবাদ থেকে জেলা মুর্শিদাবাদ-এর উত্তরণ, ১৭০৪ – ১৭৮৬

প্রদ্যুৎ মন্ডল
গবেষক,
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ: বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তন একটি অভূতপূর্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুর্শিদাবাদ নগরীর উত্থান হলেও জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটতে আরও আট দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল। অবশ্য জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের উত্তরণের প্রক্রিয়া মুর্শিদাবাদ নগরীর উত্থানের অনেক আগের থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনকালে দেশীয় কর্তৃত্বকারীগণ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রশাসনিক এককগুলির বিভিন্ন সময়ে নানান পরিবর্তন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ প্রভুগণ শুধুমাত্র কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বারংবার এক্তিয়ারের পরিবর্তন সাধন করে মুর্শিদাবাদ জেলা অঞ্চলের মানুষজনকে নাজেহাল ও দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। যদিও অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, চরাই-উতরাই-এর পথ অতিক্রম করে আঠারো শতকের শেষের দিকে মুর্শিদাবাদ জেলা গঠিত হয়েছিল; তথাপি বিলেতি শাসকগণের মুনাফার বিষয়টিও ভাববার মতোই ছিল। যাই হোক, এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে একদিকে মুর্শিদাবাদ নগরীর উন্মেষ ও নামকরণের পটভূমির ইতিহাস জানার চেষ্টা হয়েছে অপরদিকে মুর্শিদাবাদ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, বিভিন্ন পর্যায় ও প্রেক্ষাপটের ইতিহাস অন্বেষণের জোর প্রয়াস করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: নগর, সরকার, জেলা, মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদকুলি খাঁ, চুনাখালি, কালেক্টর, মহাবিভাগ

প্রাচীনকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলার ভূখণ্ডগুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় ইতিহাসে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড় অঞ্চলের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বাংলার অন্যতম পাল রাজা মহিপালের রাজধানী শহরও সম্ভবত এই জেলায় ছিল (বর্তমানে মহীপাল)।[১] নবাবি আমলে একটি দীর্ঘ সময়কাল মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী। নবাবদের আমলে মুর্শিদাবাদের শ্রীবৃদ্ধি ও জাঁকজমক বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষত ঐ সময়ে জেলার অর্থনীতি বেশ শক্তিশালীই ছিল।[২] অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুর্শিদাবাদে বিলেতিদের শাসন-শোষন শুরু হয়। ফলস্বরূপ ঔই সময় থেকেই জেলার গরিমা নষ্ট হতে শুরু করেছিল।

অনেক উত্থান-পতন, চরাই-উতরাই-এর পথ অতিক্রম করে বর্তমানে মুর্শিদাবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অন্যতম শাসনতান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক জেলা। এটি পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মাঝখানে অবস্থিত। এটি ভারতের ৬৪১টি জেলার মধ্যে নবমতম জনবহুল জেলা। জেলাটি দেখতে অনেকটা সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের মতো। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম একটি পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবেও পরিগণিত। ১৮৭৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান রূপটি প্রায় সুনিশ্চিত হয়।

মুর্শিদাবাদ নগরীর নামকরণ ও পত্তন

বাংলা তথা ভারতীয় উপামহাদেশের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তন একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নবাব মুর্শিদকুলি খান মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তন করেন। তবে নগরীর নাম মুর্শিদাবাদ হওয়ার আগে ঐ অঞ্চলটির কিছু পূর্বনাম ছিল। প্রথমে সেই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা যাক। অঞ্চলটির দুটি নাম বহুল প্রচলিত ছিল; একটি মুখসুদাবাদ আর অন্যটি হল মুখসুসাবাদ। অনেকে মনে করেন যে, মকসুদাবাদ ও মখসুসাবাদ নাম দুটির কোনও একটি থেকে 'মুর্শিদাবাদ' নামের উৎপত্তি হয়েছে। প্রচলিত ধারণার বাইরেও ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ নগরীর অনেক নাম পাওয়া যায়। দুই চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বাংলায় হুসেন শাহের আমলে মকসূদন দাস নামে জনৈক সন্ন্যাসী এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয় 'মুখসুদাবাদ'।[৩] শুরুতে বাংলার সুবাদার সৈয়দ খানের ভাই মকসুস খাঁ ঔই অঞ্চলে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। সরাইখানাটিকে কেন্দ্র করে শহরের পত্তন হয় এবং শহরটির নামকরণ করা হয় 'মুখসুসাবাদ'।[৪] পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রচিত ভবিষ্য পুরাণের 'ব্রহ্মান্ড খন্ড'-এ শহরটির নাম মোরাসুদাবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিল জনৈক যবন।[৫] আচার্য্য যদুনাথ সরকার এই শহরের পূর্ব নাম 'মাসুমাবাজার' ছিল বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'History of Bengal' বইটিতে। 'মাসুমা' শব্দের অর্থ 'সতী নারী'।[৬] জনৈক ওমরাহ-পত্নী এই বাজারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেবস্টিয়ান মানরিখ (১৬২৯ - ১৬৪৩) এই বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়ে এই বাজার ছিল ভীষণ প্রাণচঞ্চল। এই বাজার খাদ্যশস্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সূতীবস্ত্র, তামাক ও আফিমের ব্যবসায়ীদের সমাগমে মুখরিত ছিল।[৭] আবার, ১৬৬৬ সালে ফরাসি পর্যটক ট্যাভারনিয়ার শহরটি ভ্রমণ করেন এবং তাঁর বিবরণীতে তিনি শহরটির নাম 'মাদেসুবাজারকী' (Madesoubazarki) বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] ১৭৮৬ সালে রেমন্ড 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিন' বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্থানটির প্রাচীন নাম মুরসুদাবাদ, পরবর্তী নাম মকসুসাবাদ এবং সর্বশেষ নাম মুরসিদাবাদ। এছাড়াও, ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট স্ট্রেনশ্যাম মাস্টার ও উইলিয়াম হেজেসের লেখায় উল্লেখ আছে যে, মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে 'মখসুদাবাদ' স্থানটি ছিল কাশিমবাজারের মতো কাঁচা রেশম ও রেশমিবস্ত্রের উৎপাদন কেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থানটি খ্যাতি অর্জন

করেছিল এবং টাঁকশালও তৈরি হয়েছিল। ১৬৭৯ সালের একটি মুদ্রা লাহোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। যেটি মুখসুদাবাদের টাঁকশাল থেকে ছাপানো হয়েছিল। তারা আরও লিখেছেন যে, মুখসুদাবাদ বলচাঁদ বা বুলচাঁদ রায় নামে এক স্থানীয় শাসকের শাসনকেন্দ্র ছিল। ১৬৮৩ সালে মুখসুদাবাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে 'মুখসুদাবাদে' শাসনবিভাগের একটি কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছিল এবং একটি টাঁকশালও বিদ্যমান ছিল। ফলত, নবাবি আমলে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজধানী হিসাবে মুর্শিদাবাদের শাসনতান্ত্রিক প্রাথমিক কাঠামো সতের শতকেই তৈরি হয়েছিল।

দেওয়ানি স্থানান্তরিত করার পর স্বভাবতই তিনি রাজস্ব বিভাগের সংস্কার ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেন। রাজস্ব বিভাগের কাজকর্মের হিসেবপত্র নিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও তাঁর মন্ত্রীদের প্রচুর পরিমান নগদ টাকা ও নানান দুর্লভ সামগ্রী উপহার দেন। অপরদিকে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবও করতলব খাঁকে বহুমূল্য পোশাক, পতাকা, নাগরা ও তরবারি উপহার দেন।[৯] সর্বপরি, ১৭০২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সম্রাট তাঁকে মুর্শিদকুলি খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁর উপাধি অনুসারে মখসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ করার অনুমতি দেন।[১০] ১৭০৪ সালে করতলব খাঁ বাংলায় ফিরে এসে মুর্শিদকুলি খান নামে পরিচিত হলেন ও 'মুখসুদাবাদ' নামের পরিবর্তন করে তিনি অঞ্চলটির নতুন নাম দিলেন মুর্শিদাবাদ। এই ঘটনার তিন বছরের পর অর্থাৎ ১৭০৭ সালে মুর্শিদকুলি খান সুবাদার হলে মুর্শিদাবাদ সুবা বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়।[১১] সুতরাং, ১৭০৪ সালে মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তন হল। এই সময় থেকেই অঞ্চলটি মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে, করেছে।

মুর্শিদাবাদ নামধারী জেলার উৎপত্তি ও গঠন

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তন হলেও জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটতে আরও বিরাশি বছর সময় অতিবাহিত হয়েছিল। অবশ্য জেলা গঠন প্রক্রিয়া মুর্শিদাবাদ নগরীর উত্থানের অনেক আগের থেকেই শুরু হয়েছিল। ষোড়শ শতকের আটের দশকের পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য খুবই কম তথ্য পাওয়া যায় বা কার্যত কোন উপাদানই পাওয়া যায় না। ১৫৮২ সালে মোঘল সম্রাট আকবরের নির্দেশে তাঁর রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল বাংলার রাজস্ব বিভাগের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন।[১২] সেই তালিকায় তিনি বাংলা সুবাকে উনিশটি সরকারে বিভক্ত করেন।[১৩] সরকারগুলি জেন্নাতাবাদ, পূর্ণিয়া, তেজপুর, পিঁজরা, ঘোড়াঘাট, বার্বাকাবাদ, বাজুয়া, শীলহাট, সোনারগাঁ, ফতেয়াবাদ, চাটগাঁ, ওড়ম্বর, সরীফাবাদ, সেলিমানাবাদ, মাদারুণ, সাতগাঁও, মাহমুদাবাদ, খালিফিতাবাদ এবং বাকলা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। আবার এই সরকারগুলির অধীনে ৬৮২টি পরগণা বা মহল ছিল। বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি উক্ত উনিশটি সরকারের

মধ্যে পাঁচটি সরকারের অধীনে ছিল। এখন ঐ পাঁচটি সরকারের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. ওড়ম্বর: বাংলার দ্বারস্বরূপ তিলিয়াগাড্ডী ও শকরীগলি থেকে বর্তমান রাজমহল প্রদেশ হয়ে ভাগীরথী অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের চুনাখালী পরগণা পর্যন্ত ভূখণ্ড সরকার ওড়ম্বর নামে পরিচিত ছিল।[১৫] এর মধ্যে গৌড়ের রাজধানী টাঁড়া ও রাজমহল অবস্থিত হওয়ায় একে সরকার টাঁড়া ও রাজমহল বলা হত। এই সরকারের অধীনে ৫২টি পরগণা ছিল।[১৬] বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরদিকের রাঢ়, ও বাগড়ীর বেশিরভাগ অঞ্চল এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খ. মাহমুদাবাদ: সরকার সাতগাঁও-এর কাছে ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী এক বিরাট 'ব'-দ্বীপের উত্তর কোণে সরকার মাহমুদাবাদ বা ভূষণা অবস্থিত ছিল। এই সরকারের পরগণার সংখ্যা ছিল ৮৮টি। আর, এই সরকারের অধীনে ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত বাগড়ীর কতিপয় অঞ্চল।[১৭]

গ. সরীফাবাদ: ওড়ম্বরের দক্ষিণ সীমানা থেকে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত (অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান পরগণা) সরকার সরীফাবাদ বিস্তৃত ছিল। ২৬টি পরগণা এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮] আর, এই সরকারের অধীনে ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত রাঢ় অঞ্চলের একটি বিরাট এলাকা যেমন, ফতেসিং পরগণা (বর্তমানে কান্দী নামে পরিচিত), মহলন্দী, নবগ্রাম, খড়গ্রাম ইত্যাদি।

ঘ. বার্বাকাবাদ: সরকার জেন্নাতাবাদ (বর্তমান মালদহের কাছে গঙ্গা নদীর পূর্বোত্তর তীরের ভূভাগ সরকার জেন্নাতাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল) -এর দক্ষিণদিক থেকে গঙ্গা বা পদ্মা নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত লস্করপুর বা পুঁটিয়া জমিদারি পর্যন্ত সরকার বার্বাকাবাদের সীমা বিস্তৃত ছিল।[১৯] ৩৮টি পরগণা উক্ত সরকারের অধীনে ছিল। আবার, এই সরকারের অধীনে ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর কিছু অঞ্চল। অঞ্চলগুলি বর্তমানে বেলডাঙ্গা, নওদা, হরিহরপাড়া, ডোমকল, রাণীনগর ইত্যাদি নামে পরিচিত।

ঙ. সাতগাঁও: পলাশি পরগণা থেকে মঙ্গলঘাট পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর উভয় তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সরকারের এলাকা, বিশেষত পূর্ব তীরের বেশিরভাগ ভূখণ্ড নিয়ে সাতগাঁও সরকারের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২০] ৪৩টি পরগণায় বিভক্ত ছিল সাতগাঁও সরকার। আর, এই সরকারের অধীনে ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ।[২১] জেলার কান্দী মহুকুমার দক্ষিণাঞ্চলের কিছু স্থান এই সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল না।

তবে টোডমলের পরিকল্পনা অর্থাৎ বাংলার রাজস্ব আদায়ের এলাকার তালিকা গঠন খুব বেশি বছর পুরোপুরি স্থায়ী হয়নি। J. T. H. Walls তাঁর 'A History of Murshidabad District and Biographies of Its Some Noted Families' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, টোডরমলের এই রেন্ট রোল সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধের

প্রথম দশকের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[২২] ৫৭ বছর পর বাংলার রাজস্বসহ প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়। ১৬৫৮ সালে মোঘল সম্রাট শাহাজাহানের শাসনকালে যুবরাজ সুজা বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২৩] তিনি বাংলার রাজস্ব আদায়ের এলাকার তালিকার পরিমার্জন ও সংশোধণ করেছিলেন। তাঁর সময়কালে বাংলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কিছু অঞ্চল মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ওড়িশা প্রদেশের কিছু ভূখণ্ডকে খারিজ করা হয়।[২৪] স্বভাবতই এই সময় নতুন এলাকাগুলির বন্দোবস্ত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ফলস্বরূপ সরকার ও মহলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি বাংলার বর্ধিত অংশগুলিকে অতিরিক্ত ১৫টি সরকার ও ৩০৭টি পরগণায় বিভক্ত করেন। সর্বপরি তাঁর আমলে সমগ্র বাংলা ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। যাই হোক, আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র ভূভাগ উক্ত সরকার ও পরগণাগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, সপ্তদশ শতকেও মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান চেহারা একেবারেই তৈরি হয়নি।

আবার শাহ সুজার বন্দোবস্তও ৬৪ বছরের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়ে। ১৭২২ সালে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খান দক্ষতা ও ব্যয় সংকোচনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রশাসনিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটান।[২৫] তিনি সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৫০টি পরগণা বা মহলে বিভক্ত করেন। চাকলাগুলি বন্দর বালাশোর বা বালেশ্বর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী বা সপ্তগ্রাম, ভূষণা, যশোহর, আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট বা রংপুর, কুরিবাড়ি (কুচবিহার ও অসামের কিছু অংশ), জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। চাকলাগুলির প্রশংসা করে জেমস গ্রান্ট মন্তব্য করেছেন যে, মুর্শিদকুলির পরিকল্পিত চাকলাগুলি ছিল আয়তনের দিক দিয়ে পূর্বের সরকারের তুলনায় ঢের বিস্তৃত, সীমানা চিহ্নিত এবং রাজস্ব সুনির্দিষ্ট।[২৬] মুর্শিদকুলি খান প্রত্যেকটি চাকলায় একজন করে ফৌজদার ও আমিনদার নিযুক্ত করেছিলেন। পদ দুটি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছিল স্বাধীন। বড় জমিদাররা যাতে বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে না ওঠে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি প্রাচীন মোঘল ব্যবস্থা অনুসরণ করে জমিদারদের একাধিক চাকলার অধীনে স্থাপন করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরুপ বলা যায় যে, রাজশাহী জমিদারি ৮টি চাকলার মধ্যে নীহিত ছিল। সমস্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত মুর্শিদাবাদে হতো ঠিকই, তবে প্রতি চাকলা ও পরগণার রাজস্ব আলাদাভাবে চিহ্নিত থাকত যাতে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়।[২৭]

যাই হোক উক্ত ১৩টি চাকলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ছিল অন্যতম একটি বৃহত্তর চাকলা। এই চাকলার অধীনে ১১৮টি পরগণা বা মহল ছিল। মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা।[২৮] এছাড়াও নদীয়া, বীরভূম ও মালদহ জেলার বৃহদাংশও এই চাকলার বাইরে ছিল না। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, মুর্শিদাবাদ চাকলা গঠিত হয়েছিল সরকার ওড়ম্বর, জেন্নেতাবাদ,

বার্বাকাবাদ, সরীফাবাদ ও মাহমুদাবাদ প্রভৃতির অধিকাংশ ভূভাগ, সাতগাঁও-এর কিছু পরগণা ও চুনাখালির সমগ্র অঞ্চল নিয়ে।[২৯] এই চাকলারই অধীনে ছিল রাজশাহী জমিদারির কিছু অংশ, কাশিমবাজার দ্বীপের উর্বর ভূখণ্ড, বীরভূম ও উখড়া বা নদীয়া জমিদারির কতিপয় অংশ। ফতেসিংহ, আসাদনগর, সাত সইকা প্রভৃতি পরগণা এবং রুকুনপুর, লস্করপুর, চাঁদলই প্রভৃতি জমিদারির অধিকাংশ অঞ্চলও মুর্শিদাবাদ চাকলার বাইরে ছিল না।[৩০] যাই হোক, ১৭২৭ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ চাকলার কোন পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেনি।

১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সুজাউদ্দিন।[৩১] তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সারা বাংলা সুবাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন। এই চারটি বিভাগ ছিল এরকম, -

প্রথম বিভাগ: পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের কিছুটা অংশ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় বিভাগ।

দ্বিতীয় বিভাগ: পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও চট্টগ্রামকে নিয়ে গঠিত ঢাকা বিভাগ।

তৃতীয় বিভাগ: উড়িষ্যা বিভাগ ও

চতুর্থ বিভাগ: বিহার বিভাগ।

প্রথম বিভাগটি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বিভাগ ছিল নবাব সুজাউদ্দিনের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে। এই সময় রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের একাংশের শাসনকার্য পরিচালিত হত।[৩২] অন্যান্য বিভাগগুলির শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের প্রতিনিধি নায়েব নাজিম বা সহকারী শাসনকর্তাদের হাতে। তবে নবাব সুজাউদ্দিনের সমগ্র শাসনকালে (১৭২৭ - ১৭৩৯) আর কোনও প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়নি। আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র ভূখণ্ড ঔই কেন্দ্রীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেও জেলা গঠন অধরাই রয়ে গিয়েছিল।

পলাশির যুদ্ধের বছর সাতেক পর, ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় কর্তৃত্বকারীদের কাছ থেকে দেওয়ানির দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়।[৩৩] এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের অধিকার চলে যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে। এতদিন পর্যন্ত বাংলার রাজস্বসহ প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত বাংলার নবাবগণ। কিন্তু ঐ নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর তাঁদের হাতে থাকলো না। ফলত বাংলার বিভিন্ন জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তনসহ সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থার রুপান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে কোম্পানি দেওয়ানির ক্ষমতা হরণ করে নিলেও রাজস্ব আদায়ের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য দেশীয় আধিকারিকদেরই বহাল রেখেছিল। আসলে কোম্পানির এদেশের মাটিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকত। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য দেশীয় আধিকারিক নায়েব

দেওয়ান মুহম্মদ রেজা খানকে তদারক করত। রাজস্ব আদায়ের অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য কোম্পানি পূর্বের রাজস্ব বিভাগগুলিকেই অনুসরণ করে রাজস্ব আদায় করত। রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার কিছু কাল পর কোম্পানি সমগ্র বাংলাকে উনিশটি জেলায় ভাগ করে। জেলাগুলি তৈরি করার সময়ও কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই জেলাগুলি গঠন করেছিল। সেই জন্য জেলা গঠন করার সময় তারা পূর্বের রাজস্ব বিভাগগুলিকেও ধর্তব্যের মধ্যে রেখেছিল। এই উনিশটি জেলার নাম ছিল এরূপ, - তমলুক, মহিষাদল ও হিজিলির লবন ট্র্যাক্ট সহ হুগলি, নৈহাটি সহ মাহমুদশাহি, দিনাজপুরসহ সিলবারিস, কোচবিহার ও ইদ্রাকপুরসহ রংপুর, পাচেত ও বিষ্ণুপুরসহ বীরভূম, যশোর, সিলেটসহ ঢাকা, রাজশাহী, মাসিদাসহ লাখেরপুর, লক্ষীপুরসহ কোলিন্দা (নোয়াখালি), জাহাঙ্গীরপুর, চুনাখালি (মুর্শিদাবাদ), সন্দীপ দ্বীপসহ চিটাগঞ্জ, বর্ধমান, জলেশ্বরসহ মেদনীপুর ও ক্যালকাটা।[৩৪] এই ধরনের বিভাগের ফলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। যার জন্য পরবর্তীকালে বারংবার জেলাগুলির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। যাই হোক, এই জেলাগুলির মধ্যে চুনাখালি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে চুনাখালি নামক স্থানটি মুর্শিদাবাদ জেলার সদরদপ্তর বহরমপুর শহরের কাশিমবাজারের কাছাকাছি অবস্থিত। যাইহোক তৎকালীন মুর্শিদাবাদ নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল চুনাখালি জেলা। বর্তমান বিহারের কহলগাঁও পর্যন্ত অঞ্চলও ঐ চুনাখালি জেলার এক্তিয়ারের বাইরে ছিল না। ১৭২২ সাল থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ঐ উনিশটি জেলার অস্তিত্ব ছিল। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে, জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ নামের কোনও জেলার অস্তিত্ব ছিল না।

১৭৬৯ সাল থেকে ১৭৭৪ সালের অন্তবর্তীকালীন বিভিন্ন সময়ে বহু কমিটি, পরিষদ ও নতুন কার্যালয় গঠন করা হয়েছিল। ১৬৬৯ সালে গঠিত হয় 'সিলেক্ট কমিটি' (Select Committee)। হ্যারি ভেরেলেস্ট (Harry Verelst) ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। সিলেক্ট কমিটি ১৭৬৯ সালের ১৬ই আগষ্ট তাঁদের সভার কার্যবিবরণীতে একটি সাধারণ অনুবৃত্তি জারি করেছিল বা জ্ঞাপিত করেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল যে, 'In every province or district a gentleman in the service should be appointed under the name of supravisor'.[৩৫] অর্থাৎ কমিটি নির্দেশ দিয়েছিল যে, প্রত্যেকটি প্রদেশ বা জেলায় একজন ভদ্রলোককে 'তত্ত্বাবধায়ক' নামক পদে নিয়োগ দিতে হবে।

এই সময় কোম্পানি মুর্শিদাবাদে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। সংস্থাটির নাম ছিল 'মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল অব রেভিনিউ' (Murshidabad Council of Revenue)। ১৬৬৯ সালে সিলেক্ট কমেটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি জেলাতে কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 'সুপারভাইজার' নিযুক্ত করা হল।[৩৬] ঔই নির্দেশনার প্রধান স্থপতি ছিলেন সিলেক্ট

কমেটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভেরেলেস্ট। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, 'Their duties were to make minute local investigations and to gather as much informations regarding the revenue as possible'.[৩৭] অর্থাৎ সুপারভাইজারগণের দায়িত্ব হবে স্থানীয় বিষয়াদির তদন্ত করে তা সংক্ষেপে নথিভুক্ত করা ও রাজস্ব বিষয়ক তথ্য যতটা সম্ভব সংগ্রহ করা। এই 'তত্ত্বাবধায়ক' নামক পদাধিকারী আধিকারিকগণ কাজ করতেন মুর্শিদাবাদের দরবারের রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে। সিলেক্ট কমিটি প্রতিষ্ঠার এক বছর পর, ১৭৭০ সালের অক্টোবর মাস থেকে, তাঁদের কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 'মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল অব রেভিনিউ' নামক সংস্থাটির তত্ত্বাবধানে।[৩৮]

অষ্টাদশ শতকের সাতের দশকের গোড়ায় রাজস্ব সংগ্রহের কর্তৃত্ব পরিচালন সমিতির অধীনে নিয়ে আসা হল। ওই বছরই ১৭৭১ সালে 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অব রেভিনিউ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এরপর মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব দেওয়ানের পদ থেকে অপসারিত করা হল।[৩৯] জেলাগুলিতে যে সমস্ত সুপারভাইজারগণ কাজ করছিলেন তাঁদের 'কালেক্টর' নামক পদ দেওয়া হল। রাজস্ব সংগ্রহের কাজে কালেক্টরদের সাহায্য করার জন্য দেওয়ান নামে এক শ্রেণীর দেশীয় কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছিল।[৪০]

১৭৭২ সালের ১৩ই অক্টোবর থেকে ১৭৭৩ সালের ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহ রেভিনিউ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই এগারো মাসের সময়কালে জেলাগুলির কালেক্টরের সঙ্গে রেভিনিউ বোর্ডের চিঠি চলাচলের কিছু নমুনা পাওয়া যায়।[৪১] চুনাখালি জেলার কালেক্টরের সঙ্গে কমেটি অব রেভিনিউ-এর পত্রালাপের নমুনাও পাওয়া গেছে। সেগুলিতে চুনাখালি জেলার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। আবার ১৭৭২ সাল থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে দরবারের রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষভাবে কতিপয় জেলার রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন মুর্শিদাবাদ নগরী থেকে।[৪২] এই সময়ে দরবারের রেসিডেন্ট ছিলেন সামুয়েল মিডিলটন (Samuel Middleton)। চুনাখালি, লস্করপুর, রুকুনপুর, রাজমহল, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, জাহাঙ্গিরপুর প্রভৃতি জেলার কালেক্টরগণ রেসিডেন্টের মাধ্যমে রেভিনিউ বোর্ডের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। ১৭৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর প্রশাসনিক এলাকার আরও একটি পরিবির্তন হয়। ঐ একই তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সুলতানাবাদ ও আমির পরগণা দুটিকে মুর্শিদাবাদ মহাবিভাগ থেকে নিয়ে ভাগলপুরের সাথে যুক্ত করা হয়।

আঠারো শতকের আটের দশকের প্রথমদিকে জেলাগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল। ১৭৮১ সালে প্রভিন্সিয়াল কোর্ট অব ডিরেক্টর্স একটি নির্দেশনামা জারি করে। এতে বলা হয় যে, রেভিনিউ বোর্ড জেলাগুলি থেকে ইউরোপীয় কালেক্টরদের ফিরিয়ে নেবে এবং তার পরিবর্তে আমিল বা দেওয়ান নামক পদাধিকারী দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করবে।[৪৩] ফলত রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও

পরিচালনার অধিকার দেশীয় আধিকারিকদের হাতে বর্তালো। এই ঘটনার কিছু কাল পর সমগ্র বাংলা প্রদেশকে পাঁচটি মহাবিভাগে (Grand Division) ভাগ করা হয়। পাঁচটি মহাবিভাগের সদরদপ্তর ছিল, - ক্যালকাটা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর এবং ঢাকা।[৪৪] তবে চিটাগঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলা দুটিকে পাঁচটি মহাবিভাগের কোনও একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রতিটি মহাবিভাগের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তত্ত্বাবধানের জন্য তৈরি হয় পাঁচটি 'প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অব রেভিনিউ' (Provincial Council of Revenue)। আমিল বা দেওয়ান নামক পদাধিকারী আধিকারিকগণ কাজ করত এই পাঁচটি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ঔই পাঁচটি মহাবিভাগের মধ্যে অন্যতম ছিল মুর্শিদাবাদ মহাবিভাগ। এই মহাবিভাগে সাতটি জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেলাগুলির নাম ছিল এরূপ, - চুনাখালি, পূর্ব রাজশাহী, পশ্চিম রাজশাহী, লস্করপুর, রুকুনপুর, জাহাঙ্গিরপুর ও খাসতালুক (ভাগলপুর, রাজমহল) প্রভৃতি।[৪৫] এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত মুর্শিদাবাদ মহাবিভাগের অন্তর্গত জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ নামক কোন জেলার অস্তিত্ব ছিল না। বরং চুনাখালি নামক জেলার নাম পাওয়া গেল, যা বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। সুতরাং এই পর্বেও মুর্শিদাবাদ নামক জেলা গঠিত হয়নি।

আঠারো শতকের আটের দশকের গোড়ায় 'প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অব রেভিনিউ' নামক সংস্থাটিকে অপসারিত করা হয়েছিল। ঐ সংস্থাটির পরিবর্তে ১৭৮১ সালে 'কমেটি অব রেভিনিউ' (Committee of Revenue) গঠন করা হয়েছিল।[৪৬] এই সময় থেকে বিভিন্ন কালেক্টরশিপকে (Collectorship) লুপ্ত করা হয়েছিল। ১৭৮৬ সালের ১৮ই এপ্রিল কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ বিভাগ ভেঙে এগারোটি জেলা (Collectorship) তৈরি করা হয়। এগারোটি জেলার নাম ছিল এরূপ, - মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, নদিয়া, ফতেসিং, মাহমুদশাহী, সিলবারিস, লস্করপুর, যশোর, হুগলী, চব্বিশ পরগণা এবং নগর ক্যালকাটা। জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি জেলা ছিল মুর্শিদাবাদ। অতএব ঐ তারিখ থেকে অর্থাৎ ১৭৮৬ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।[৪৭] ১৭৮৬ সালের ২৫শে এপ্রিল গভর্নর জেনারেল জেলাগুলির অনুমোদন দিয়েছিলেন।[৪৮] এই দিন থেকেই মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা স্থান পায়। একইসঙ্গে জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ইতিহাসে।

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, একটি শহর থেকে একটি জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের উত্তরণের পথ সহজ ছিল না। প্রতিটি পর্যায়ে জেলাটি বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এসেছে। ১৭০৪ সালে মুর্শিদাবাদ নগরীর পত্তনের পর, মুর্শিদকুলি খান, সুজাউদ্দিন প্রমুখ নবাব বাংলা সুবার বিভিন্ন চাকলা ও বিভাগ গঠন করে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূখন্ডগুলিকে তার অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করে

নিয়ে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থার নতুন বিন্যাস করে। ঐ বিন্যাসের মধ্যেও মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। শেষপর্যন্ত, ব্রিটিশ প্রভুগণের হাত ধরে জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

তথ্যসূত্র :

১. রমাপ্রসাদ ভাস্কর, *'প্রাচীন মুর্শিদাবাদের কথা'*, অরূপচন্দ্র সম্পাদিত মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্তঃ প্রথমখণ্ড, বাসভূমি প্রকাশন, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), ২০০৪, পৃ. ২৪.

২. সুশীল চৌধুরী, *নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১২.

৩. প্রতিভারঞ্জন মৈত্র, *মুর্শিদাবাদেরই তিহাস*, দেবুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩.

৪. Golam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin; a history of Bengal*: Translated from the original Persian by Maulavi Abdus Salam, Published by Asiatic Society, Baptist Mission Press, Kolkata, 1902, p. 28.

৫. J. Burgess, *'Geography of India'*, Indian Antiquary, Vol. 20, Dec 1891, p. 419.

৬. দেবশ্রীদাস, *মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক মুক্তধারাঃ ঐতিহাসিক সমীক্ষা*, প্রভা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ১১.

৭. তদেব।

৮. শ্যামল দাস, *'অবিভক্ত বাংলার সুবাহর মুর্শিদাবাদ'*, কল্যাণ কুমার দাস সম্পাদিত অতিতের মুর্শিদাবাদ, শিল্পনগরী, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), ২০২০, পৃ. ২৮.

৯. Golam Hussain Salim, op.cit., p. 28.

১০. Jadunath Sarkar, History of Bengal: Vol. 02 (Muslim Period), B. R. Publishing Corporation, Delhi, 1943, p. 399.

১১. রাজর্ষি চক্রবর্তী, *'অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের ইতিবৃত্ত'*, অরিন্দম রায় সম্পাদিত মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান – পঞ্চম খণ্ডঃ প্রাচীন থেকে আধুনিক, মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্র প্রকাশনা, বহরমপুর, ২০২১, পৃ. ৭৯.

১২. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী*, কেপি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৮৪.

১৩. Purna Chandra das, *The Musnad of Murshidabad (1704 - 1904)*, Publishers name (not mentioned), Omraoganj, 1905, p. 6.

১৪. কমল চৌধুরী (সম্পাঃ ও সং), *মুর্শিদাবাদের ইতিহাসঃ প্রথমপর্ব*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৬৭ – ৫৬৮.

১৫. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫.

১৬. তদেব., পৃ. ৮৪.

১৭. B. P. Ambashthya, *Beames' Contributions to the Political Geography of the Subahs of Awadh, Bengal, and Orissa in the age of Akbar*, Janaki Prakashan, Patna, 1976. p. 75.

১৮. Ibid., P. 10.

১৯. Ibid., p. 72.

২০. Ibid., p. 102.

২১. Ibid., P. 9.

২২. J. T. H. Walls, *A History of Murshidabad District and Biographies of Its Some Noted Families,*Jarrold and Sons, London, 1902, p, 34.

২৩. অরুপচন্দ্র, *মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের কালপঞ্জি,* বাসভূমি প্রকাশন, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), ২০১৪, পৃ. ৩১.

২৪. নিখিলনাথরায়, *মুর্শিদাবাদের ইতিহাস: প্রথমখণ্ড,* মেটকাফ প্রেস, কলকাতা, ১৩০৯, পৃ. ৪২৪.

২৫. সুদীপ্ত সাঁধুখা ও গোপালমণ্ডল, *দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসেনদিয়া ও মুর্শিদাবাদ,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৭৫.

২৬. Jems Grant, *Fifth Report from the Select committee on the Affairs of the East India Company*, 1812, p. 31.

২৭. সুদীপ্তসাঁধুখা ও গোপালমণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬.

২৮. অরুপচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬.

২৯. নিখিল নাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২.

৩০. তদেব।

৩১. অমলেন্দু দে, *সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে,* পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৪.

৩২. সুদীপ্ত সাঁধুখা ও গোপাল মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯.

৩৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক – কৃষেন্দু রায়), *পলাশি থেকে পার্টিশানঃ আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৬.

৩৪. Rai Bijay Mukharji Bahadur, *Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Murshidabad (1924 – 1932)*, Bengal Government Press, Alipore, 1938, p. 102.

৩৫. Harry Verelst, *A view of the Rise, Progress and Present State of English Government in Bengal: Including a Reply to the Misrepresentations of Mr. Bolts and other Writers.*, J. Nourse, London, 1772 p. 76.

৩৬. Ibid., p. 122.

৩৭. Narendra Krishna Sinha (edited), *The History of Bengal (1757 - 1905)*, Calcutta University Press, Calcutta, 1967, p. 51.

৩৮. সাগর সিমলান্দী, 'মুর্শিদাবাদের জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ একটি আলোচনা', সুভাষ বিশ্বাস সম্পাদিত আধুনিকযুগের বাংলাঃ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি., দিশা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২৮৯.

৩৯. Ibid., p. 84.

৪০. Proceedings of the Select Committee, 26th May 1771, p. 305.

৪১. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, Bengal Secretariat Book Department, Calcutta, 1914, p. 59.

৪২. Ibid.

৪৩. Proceedings of the Committee of Revenue, 1st-8th July, 1784, p. 15.

৪৪. Narendra Krishna Sinha (edited), op. cit., p. 84.

৪৫. L. S. S. O'Malley, op. cit., p. 59.

৪৬. Narendra Krishna Sinha (edited), op. cit., p. 84.

৪৭. সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, *চেনা মুর্শিদাবাদঃ অচেনা ইতিবৃত্ত*, অমৃতা প্রকাশনী, বহরমপুর, ১৯৯৬, পৃ. ১৭১.

৪৮. Proceedings of the Governor General (Revenue), 25th April 1786, p. 17 – 19.

আত্মকথার অন্তরালে 'অন্তরঙ্গতা' : প্রসঙ্গ 'অঘোর প্রকাশ'

লাভলী হাজরা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুচিন্তন: অন্তরঙ্গতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রনালীর সাথে অন্তরঙ্গতা ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। সুপ্রাচীন কালেও আমরা এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তবে এই অন্তরঙ্গতা নিয়ে চর্চা ও চর্যা অতিসাম্প্রতিক প্রবণতা। এই সম্পর্কে চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখ্যাগারের তথ্যের একটা অপ্রতুলতা দেখা যায়। তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জী, ডায়ারী, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আত্মজীবনী ইত্যাদির উপর। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে আমরা এরকম কয়েকটি আখ্যানের সন্ধান পাই যেখানে গার্হস্থ্য জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে অন্তরঙ্গতার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে। তবে অন্তরঙ্গতার বিষয়টি আলাদা মাত্রা পেয়েছে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত প্রকাশ চন্দ্র রায়ের 'অঘোর প্রকাশ' নামক যৌথ আত্মজীবনীতে। এখানে স্থান পেয়েছে 'অ-ঘরে' থাকা এক কামিনীকে প্রকাশ করার কথা। সমগ্র আখ্যানজুড়ে স্থান পেয়েছে স্বামী-স্ত্রীর একসাথে কাটানো বিভিন্ন সুখকর স্মৃতির ও অন্তরঙ্গতার কথা। বর্তমান প্রবন্ধে এই আখ্যানে বর্ণিত 'অন্তরঙ্গতার' বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
সূচক শব্দ: অন্তরঙ্গতা, আত্মজীবনী, সখ্যতা, অঘোর প্রকাশ, ইত্যাদি।

মূল প্রবন্ধ

অন্তরঙ্গতা হল একধরণের সম্পর্ক বা আন্তঃসম্পর্ক।[১] এই অন্তরঙ্গতা শারীরিক বা মানসিক সখ্যতাকে বোঝায়, যা একটি সম্পর্কের মান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। অন্তরঙ্গ সম্পর্ক শারীরিক (যৌন) ও মানসিক (অযৌন) দুইই হতে পারে। যেখানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত জনও জড়িয়ে থাকেন। ইমোশনাল ইন্টিমেসি বা মানসিক ঘনিষ্ঠতা, পারস্পরিকতা এবং দুর্বলতার অনুভূতির সাথে জড়িত। একটি সুস্থ সম্পর্কের জন্য এই ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এক বা একাধিক মানুষকে ভালোলাগা বা ভালোবাসার গভীর অনুভূতি থেকে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা হতে পারে। তবে শারীরিক ঘনিষ্ঠতায়, মানসিক ঘনিষ্ঠতা থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। শারীরিক ঘনিষ্ঠতা রোমান্টিক প্রেম বা যৌন কার্যকলাপ অথবা আবেগপূর্ণ যোগ সূত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার কিছু কিছু সাধারণ আকাঙ্ক্ষা থাকে যা শুধুমাত্র অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই পূরণ হয়। অন্তরঙ্গতার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সম্পর্কের মান বৃদ্ধি করে তা নিয়ে আলোচনা সচরাচর আমরা দেখতে পাই না। যদিও

বা বন্ধুত্ব, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আমরা যতটা সাবলীল ভাবে আলোচনা করি বা করতে পারি প্রেমের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ততটা সাবলীল ভাবে আমরা আলোচনা করি না। যেমন একজন প্রেমিক প্রেমিকা ও দম্পতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কেমন ছিল, তারা কি ভাবছে অন্তরঙ্গতা নিয়ে, অন্তরঙ্গতা তাদের কাছে কি ? এসব নিয়ে তেমন কিছু জানতে পারা যায় না।

অন্তরঙ্গতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রনালীর সাথে অন্তরঙ্গতা ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। সুপ্রাচীন কালেও আমরা এর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তবে তার বহিঃপ্রকাশ ছিল ভিন্ন। এই অন্তরঙ্গতা শুধুমাত্র মানব-মানবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। জৈব ও অজৈব জীবের মধ্যেও এটা গড়ে উঠতে পারে। প্রাচীন ভারতে বর্ণিত তপোবনের মধ্যে মানব শিশু ও সিংহ শাবকের অন্তরঙ্গতার কথা আমরা জানি। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে[২] আমরা এর অজস্র দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তবে এই অন্তরঙ্গতা নিয়ে চর্চা ও চর্যা অতিসাম্প্রতিক প্রবণতা। এই সম্পর্কে চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখ্যাগারের তথ্যের একটা অপ্রতুলতা দেখা যায়। তাই আমাদের নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত জীবনপঞ্জী, ডায়েরী, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আত্মজীবনী ইত্যাদির উপর। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে আমরা এরকম কয়েকটি আখ্যানের সন্ধান পাই যেখানে গার্হস্থ্য জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে অন্তরঙ্গতার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলতে পারি - রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'[৩], ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী, আশলতা সিংহের ডায়েরি, প্রিয়তমা দেবীর ডায়েরি, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা- 'ইতি ননামী-স্ত্রীকে লেখা চিঠি'। তবে অন্তরঙ্গতার বিষয়টি আলাদা মাত্রা পেয়েছে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত প্রকাশচন্দ্র রায়ের 'অঘোর প্রকাশ' নামক যৌথ আত্মজীবনীতে।[৪] এখানে স্থান পেয়েছে 'অ-ঘরে' থাকা এক কামিনীকে প্রকাশ করার কথা। সমগ্র আখ্যানজুড়ে স্থান পেয়েছে স্বামী-স্ত্রীর একসাথে কাটানো বিভিন্ন সুখকর স্মৃতি ও অন্তরঙ্গতার বিবরণ।

প্রকাশচন্দ্র রায়ের লেখা 'অঘোর প্রকাশ' বাংলার প্রথম যৌথ আত্মজীবনী। প্রকাশচন্দ্র রায় স্ত্রীর মৃত্যুর ১১/১৩ বছর পর ১৯০৭ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। কি আশ্চর্য, স্ত্রীকে নিয়ে লেখা গোটা একটি গ্রন্থ! এমন প্রচেষ্টা এদেশে বিরল। এই আত্মজীবনীটির প্রচ্ছদ অভিনবত্বের দাবিদার। স্ত্রী স্বামীর অন্তরের অন্তস্থলে কতটা অংশ জুড়ে ছিলেন, তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে প্রচ্ছদটিতে। এখানে বন্ধনীতে লেখা 'স্বর্গীয় দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন কাহিনী'। মূলত প্রকাশচন্দ্র রায় এই লেখনীতে তিনি এবং তার স্ত্রী অঘোরকামিনী রায়ের দাম্পত্য জীবনের সব খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন। তিনি লেখনীর উদ্বোধন অংশটি বিবৃত করছেন এইভাবে-

> "তোমার দেহত্যাগের পর তিরিশ দিনের দিনে তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে, শুদ্ধাচার, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হবার

> সম্ভাবনা নাই। আরও বলিয়াছিলে, তোমার মত না হইলে উন্নত মিলনের ভূমিতে উপনীত হইতে পারব না।
>
> সেই দিন হইতে তোমার মত হইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইলাম। আবার সেই দিন হইতে, কি জানি কেন, তোমার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই জীবনীর সূত্রপাত।"[৫]

১৮৪৭ সালে বহরমপুরে প্রকাশচন্দ্রের জন্ম আর অঘোরকামিনী জন্মেছিলেন ১৮৫৬ সালের মে-জুন মাসে জেলা চব্বিশপরগনার অন্তর্গত মাইহাটী পরগণাভুক্ত শ্রীপুর গ্রামে। সময়টা সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে। শহর কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবর্তনের ছোঁয়া এইসব গ্রাম মফস্বলে তখনও পৌঁছায়নি। মাত্র ১০ বছর বয়সে অঘোরের বিয়ে হয় প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে। প্রকাশ তখন ছাত্র, উনিশ বছর বয়স। কোন অসাধারণ বুৎপত্তি তার নেই। বরং সাধারণ সাদামাটাই বলা চলে। বি.এ.পরীক্ষাও পাস করতে পারেনি। দাদার সংসারে থাকেন স্ত্রীকে নিয়ে। এই সময়েরই একটি ঘটনা তিনি পাঠককে জ্ঞাত করছেন এই ভাবে-

> "সারাদিন তোমাকে রন্ধন প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিতে হইত, কি আহার করিলে তাহাও আমি সব সময় জানতে পাইতাম না। আমার ইচ্ছা হইত তোমাকে লেখাপড়া শিখাই। দিনে তাহার সুযোগ হইত না। সকলে শয়ন করিলে, যখন তুমি শয়ন করিতে আসিতে, তখন তোমার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইত। .... ক্রমশ প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইয়া গেল।"[৬]

এই গল্প সে যুগে বিরল হলেও অমিল নয়, কিন্তু এর পরের ঘটনাক্রম স্তম্ভিত করে। কি করে অর্জন করলেন এরকম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি? ঐ যে ছোট মেয়েটিকে আপন করে নিলেন, তার প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ কি থেকে? এটা বলা মুশকিল। জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া উদার পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিলেন তার সামনে। তিনি লিখছেন-

> "বাহিরের জনসমাজের সেবা না করিলে ঘরের ধম্মও ঠিক থাকে না।....... তাই এ সময় হইতে আমাদের চেষ্টা হইল যে কিসে আমাদের জীবন, বিশেষতঃ তোমার জীবন,সংসারের সীমা ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।"[৭]

প্রকাশচন্দ্র কর্মজীবনে যেখানে যেখানে গমন করেছিলেন সেখানে তিনি অঘোরকে সঙ্গে করে নিয়েছিলন। এই সূত্রে অঘোরের বর্ধমান, মতিহারী, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমন করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজকের দিনে স্বামীর সাথে স্ত্রীর গমনাগমন খুব স্বাভাবিক ব্যপার হলেও তখনকার দিনে এটা যথেষ্ঠ প্রতিবন্ধক ছিল। আসলে প্রকাশ তার স্ত্রীকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। আসলে তিনি কখনো চাননি তার স্ত্রী তার থেকে দূরে থাকুক, তেমনটা তার স্ত্রীও। তাই তিনি বলছেন-

"তোমার মন তখন এমন একাকী হইয়া পড়িয়াছে যে পত্রে প্রবোধ মানিত না। আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া দর্শনের পিপাসা আরও বাড়িয়া যাইত। আগুনে ঘৃত ঢালিলে কি তাহা নির্ব্বাণ হয়? তখন তো তুমি কেবল শরীরই জানিতে।....... এ সেবক ও তখন শরীরের জন্য ব্যস্ত ছিল।"[৮]

পরে তিনি আরো লিখেছেন-

"শরীরের বিচ্ছেদে উভয়ই কাতর হইতেছিলাম। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন যে পরস্পরের ভালোবাসা ও সহানুভূতির গুণে দুটা নিম্নস্তরবাসী আত্মাও পরস্পরের কত সাহায্য করিতে পারে।"[৯]

প্রকাশচন্দ্র রায় যিনি একসময় নাস্তিক ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের সংস্পর্শে এসে তিনি হলেন ধার্মিক এবং দেবী অঘোরকামিনী রায় ও একই ধর্ম গ্রহণ করলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে শাসক-শাসিতের ধর্ম যদি এক হয় তাহলে শাসকের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করা সহজ হয়ে ওঠে। তেমনি পরিবারে যদি স্বামী-স্ত্রী সমমনষ্ক এবং সম-ধর্মের অনুসারী হন তাহলে সেই পরিবারে শান্তি বিরাজ করে। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের মতো পরিসর তৈরি হয় সেই পরিবারে। প্রকাশ-অঘোরের পরিবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি লিখছেন-"এইবার আমরা ব্রাহ্ম পরিবারের মতো জীবনযাপন করিতে লাগিলাম। এমন করিয়া তুমি ও আমি আর তো কখনো সংসার করি নাই।"[১০] দুজনেই হয়ে যান নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। এরপর থেকেই তাদের জীবনে ঘটে আমুল পরিবর্তন। অনেকগুলি সন্তান লাভের পর তারা ঠিক করলেন আর কোন শরীরের সম্পর্ক রাখবেন না। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

"অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্ম সাধনের ব্যাঘাত হয়, তা তুমি বুঝিয়াছিলে।.... এবার তাই আমরা দুজনে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না।..... আমরা দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই ছয় মাস শরীরে কোন সম্পর্ক থাকিবে না।"[১১]

কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ধর্মের সহিত থাকলেও দুর্বলতার কারণে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে কয়েক বার। আত্মিক মিলন যে শারীরিক মিলনের ঊর্দ্ধে এবং ধর্মের দ্বারা নিজেদের দুর্বলতাগুলিকে সংযম করার চেষ্টা করছেন তা তাদের কথায় বোঝা যায়। তিনি বলছেন-

"এক মাস দুই মাস তিন মাস বেশ ভাল গেল, আবার প্রতিজ্ঞার বল চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ কতবার হইয়াছে। তোমার ও আমার দুর্বলতা আমরা দুজনেই অবগত ছিলাম। তাই ভয়ে ভয়ে এবারও ছয় মাসের জন্য ব্রত গ্রহণ করিলাম।"[১২]

অনেকটা সময় অতিক্রমের পর আত্মিক মিলনের ব্রত ছয় মাস অতিক্রম হল এবং তারা দুজনেই সংকল্প করলেন এই ব্রতই আজীবন পালন করবেন। কিন্তু আগে যখন শারীরিক মিলনের থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন ভয়ে ভয়ে করেছেন। কারণ সন্দেহ ছিল, যে এই ব্রত তারা কি পালন করতে পারবেন? কিন্তু এখন যখন আত্মিক মিলনকে আজীবন পালন করবেন বলে ঠিক করলেন, কোনরকম ক্লেশ অনুভব করলেন না। তিনি বলছেন- "আত্মিক মিলনব্রত লইয়াছি; যেন, নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছি। .... এবারকার দৈনিক জীবন কত নূতন বোধ হইতে লাগিল।"[১৩] উভয়েই এই ব্রত পালন করার জন্য সমান সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পরস্পরের সাহায্যে ধীরে ধীরে শরীরের অধিকার অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। একপ্রকার শারীরিক অভাব ভুলে গিয়ে সেবার ধর্মে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। প্রকাশচন্দ্র বলছেন, "তুমি জানিতে আমার শরীরের অভাব হইলে কেবল স্বর্গীয় খাদ্যে তোমার সেই অভাব দূর হইতে পারিবে ।"[১৪] আত্মিক মিলনের ব্রতে উত্তীর্ণ হলেও তখনও শারীরিক মিলনের অভাব অনুভব করতেন। তিনি বলছেন, "যখন আমার শারীরিক ভাব অধিক জাগরিত হইয়া উঠিত, নিজ গুণে তুমি মহা ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে।"[১৫] এভাবেই চলত তাদের সংগ্রাম। ব্রতভঙ্গ হলে সবাই হাসবে, সেই ভয়ে এ কথা কাউকে তারা জানাননি। তাদের চোখের জলের কথা শুধুমাত্র তারা এবং ভগবান জানতেন।

ভালোবাসার যে স্পর্শ অনুভূতি থাকে তাকে ছাড়িয়ে যায় চোখে দেখার আনন্দ, আর তাকেও ছাপিয়ে যায় স্মৃতির কম্পন। এই ঘটনা তিনি ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে- "স্মৃতিই স্থায়ী অবস্থা, কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না।"[১৬] একজনের না থাকা যাতে অন্যজনকে পীড়া দিতে না পারে তাই অদর্শনকে স্মৃতির তরঙ্গে ধরে রাখতে চেয়েছেন। এ হলো সেই তরঙ্গ যা অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করে। তারা রাত্রি প্রথম ভাগে একে অপরের কাছে আসতেন না, পাছে কোন প্রকার চিত্ত বিক্ষেপ হয়। এইভাবে তাদের সাত বছর অতিক্রম হলো আত্মিক মিলন ব্রতের। এই সাত বছরে এই ব্রত উদযাপন করতে তাদের অনেক ক্লেশ হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রকাশচন্দ্র রায়ের তার নিজের কাজে শরীর ও মন নিযুক্ত রাখার উপায় থাকলেও দেবী অঘোরকামিনীর সে উপায় ছিল না। সেক্ষেত্রে অঘোরকামিনী রায়কে বেশি ক্লেশ পেতে হয়েছে।

শারীরিক মিলনের সাথে সাথে স্পর্শ বন্ধ হল, নিষিদ্ধ হল গ্রীবা পর্যন্ত আলিঙ্গন। ঠিক করলেন এবার তারা আধ্যাত্মিক বিবাহ করবেন। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর সাত দিনের জন্য শারীরিক মিলন বাতিল বলে তারা ধার্য করেন। আত্মিক মিলনের যে ব্রত, তা অনন্তকালের জন্য পালন করবেন বলে সকলের সামনে ব্যক্ত করলেন। তারা চেষ্টা করে গেছেন ক্রমাগত কিভাবে এই প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হবেন। তাতে চোখের জলে মাথার বালিশ ভিজলেও চোখের জল একে অপরকে দেখাতেন না, যাতে ব্রত ভঙ্গ না হয়। এই বিবরণে তিনি জানিয়েছেন-

"শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগের সংগ্রামও তোমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে আমার শরীরের প্রতি তোমার কিছুই টান না থাকে; তাই প্রস্তাব করিলাম যে একেবারে পরস্পরের শরীর স্পর্শ করিব না। তুমি ইহাতে অসুখী হইয়াছিলে। যখনি মনে করিতে যে আমার শরীরের জন্য তোমার যতটা টান আছে, তোমার শরীরের জন্য আমার ততটা নাই, তখন তোমার মনে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।"[১৭]

ভালোবাসা যে শরীরের ঊর্ধ্বে, সেই সংকল্প থেকেই শরীরের ওপর ভালোবাসার ভিত্তি তারা স্থাপন করেননি, কারণ তারা বিশ্বাস করতেন "পৃথিবীর ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী, শরীর না থাকলে কিছুদিন পর উড়িয়া যায়। তাই সংকল্প করিয়াছিলাম, শরীরের ওপর ভালোবাসার ভিত্তি স্থাপন করিব না।"[১৮] তাই শরীরের মৃত্যু হলেও দর্শন সুখ যাতে বজায় থাকে সেই চেষ্টাই করেছিলেন। এবার চেষ্টা করলেন পত্র লেখা বন্ধ করে "পত্রের ওপরে উঠিতে পারিয়াছি কিনা? এত পারিয়াছি ইহা কি পারিব না?"[১৯] হ্যাঁ পেরেছিলেন। তখন লক্ষ্ণৌ থাকাকালীন দীর্ঘ নয় মাস দেখা করেননি তারা। এবং শেষে তারা চিঠি লেখাও বন্ধ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। অথচ তাদের ডায়েরির লেখাগুলি মনে হয় যেন একই দিনে একজনেরই লেখা। এক যোগে 'একে-এক' হবার অভূতপূর্ব অংকটি যেন কষতে চেয়েছিলেন তারা। বিরোধ কি আসেনি? এসেছে, তাকে সামলেছেন এই ভেবে, "যে পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে হইলে আমিত্ব বিনাশ ভিন্ন আর পথ নাই।"[২০] আমিত্ব বিনাশের যে পথে তারা অগ্রসর হয়েছিলেন, সেখানে তারা সফলভাবে উত্তীর্ণ। প্রকাশ চন্দ্র রায় ত্যাগের যে পথ দেবী অঘোরকামিনীকে দেখিয়েছিলেন তা তিনি আমৃত্যু পালন করে গেছেন। যেখানে যেখানে প্রকাশচন্দ্র মিলনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন, অঘোরকামিনী বার বার মনে করিয়েছেন প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার কথা। এবং দেখা যাচ্ছে পরস্পরের সহযোগিতায় তারা তাদের শারীরিক সম্পর্ক না রাখার যে ব্রত, সেখানে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের ত্যাগ অক্লান্ত কষ্ট এবং ধৈর্যের কারণে। দূরে থেকেও পরস্পরকে অনুভব করার যে অনুশীলন তারা করেছেন, তা অঘোরকামিনীর ৪০ বছর বয়সে দেহত্যাগের পরেই বোঝা যায়। শারীরিকভাবে স্ত্রী পাশে না থেকেও আত্মাকে অনুভব করে 'পিকু' সম্বোধনে কত লেখাই লিখেছেন তার 'রী'। কথোপকথন করছেন স্ত্রীর সাথে, "তোমার দেহত্যাগের পর ৩০ দিনের দিনে তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে বলিয়া ছিলে, শুদ্ধাচার শুদ্ধ ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" প্রকাশ চন্দ্র বলছেন- "এই বৃদ্ধ বয়সে যাহাতে তোমার মত সেবা পাগল হইতে পারি, নিরন্তর সেই ভিক্ষা করিয়াছি। ঈশ্বর করুন, এইরূপে যেন আমি মিশিয়া যাইতে পারি।" যৌথ যাপনের স্বরলিপি আত্মস্থ না করলে দ্বৈত গান কিভাবে বা গাওয়া সম্ভব?

'অঘোর প্রকাশ' নামক যৌথ আত্মজীবনীটির গড়ন শৈলীর মধ্যেও একটা নতুনত্বের ছোঁয়া দেখা যায়। জীবনের আশ্রমের মতো তিনিও এই আখ্যানের গড়নের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে পাঠক সমাজের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি সমগ্র আখ্যানটি সাজিয়েছেন চারটি পর্বে। প্রথম পর্বটি 'উদ্বোধন' অংশ হিসেবে বিবেচিত। দ্বিতীয় অংশটি 'সূচনা'- এখানে বিবৃত হয়েছে ৭টি পরিচ্ছেদ। ১৮৬৬ সাল থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এই অংশে আলোচিত। তৃতীয় অংশটি 'বিকাশ' পর্যায়-এখানে ৮ম (১৮৮০) থেকে ২৯তম (১৮৯১) পরিচ্ছেদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বশেষ অংশটির নাম 'পরিণতি'-এখানে ৩০তম পরিচ্ছেদ থেকে ৪১তম পরিচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে। এই সমগ্র আখ্যানে স্থান পেয়েছে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে জীবন সায়াহ্নে উপনীত হওয়ার সমস্ত ঘটনা প্রবাহ। তবে যে বিষয়টি এর ছত্রে ছত্রে স্থান পেয়েছে সেটি হল 'অন্তরঙ্গতা' ও 'অন্তরঙ্গতার বহিঃপ্রকাশের আবেদন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এত সাবলীল ভাবে নিজেদের দাম্পত্য জীবনের অন্তরঙ্গতার কথা এই আখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি। বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত আত্মচরিতগুলির মধ্যে তাই এই যৌথ আত্মচরিতটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১ . অন্তরঙ্গতা আসলে একধরণের সখ্যতা। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। যেমন- মানসিক ও বৌদ্ধিক সংস্পর্শতা এবং আবেগপ্রবণতা, শারীরিক অন্তরঙ্গতা প্রকাশ আখ্যানটিতে আমরা মানসিক-আধ্যাত্মিকতা ও বৌদ্ধ সংস্পর্শতার উল্লেখ বেশি পেয়েছি।

২ . বাৎসায়নের *কামাসূত্র* কালিদাসের ,*অভিজ্ঞান শকুন্তলাম* , *বিষ্ণুধর্মোত্তর* প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তরঙ্গতার বিবিধ বিরবরণ পাওয়া যায়।

৩ . রাসসুন্দরী দাসী, *আমার জীবন,* কলকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ১৮৬৮।

৪ . প্রকাশ চন্দ্র রায় ,*অঘোর কামিনী,* কলকাতা: ব্রাহ্ম মিশন প্রেস।১৯০৭ ,

৫ . *তদেব, উদ্বোধন অংশ।*

৬. *তদেব*।১০ .পৃ ,শ্বশুর পরিবার—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ,বধূ -খণ্ড প্রথম ,সূচনা পর্ব ,

৭ . *তদেব, বিকাশ পর্ব , তৃতীয় খণ্ড - গৃহস্থবৈরাগিনী , অষ্টম পরিচ্ছেদ - মনের প্রসার,* পৃ. ৩।

৮ . *তদেব , সূচনা- পর্ব , প্রথম খন্ড - বধূ , পঞ্চম পরিচ্ছেদ - একাকিনী,* পৃ. ২৩।

৯ . *তদেব, পৃ. ২৪।*

১০. *তদেব,মতিহারীতে প্রথম বার– ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ,গৃহিনী -দ্বিতীয় খণ্ড ,পর্ব সূচনা ,* পৃ।২৬ .

১১ . *তদেব, তপস্যার আরম্ভ-নবম পরিচ্ছেদ, গৃহস্থ্য বৈরাগিনী,* বিকাশ পর্ব, পৃ. ১০।

১২ . *তদেব,* পৃ. ১০।

১৩. *তদেব,* পৃ. ১৩

১৪ . *তদেব* ,পৃ ।১৩ .

১৫ . *তদেব*।১৪ .পৃ ,

১৬. *তদেব*।

১৭ . *তদেব, , পরিচ্ছেদ ৩৮ তম,* সেবিকা পরিণতি পর্ব, তোমার হাতের বেদনার দান, পৃ. ৫০।

১৮. *তদেব,পত্রত্যাগ -ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ,সেবিকা -বিকাশ পর্ব* , পৃ ।৬৯ .

১৯ . *তদেব* ,পৃ ।৭০ .

২০. *তদেব।*

গিরিশ কারনাড’এর নাটকে ভারতীয় রাজনীতির পরিক্রমা

অমিতাভ কাঞ্জিলাল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ : গিরিশ কারনাড ভারতীয় নাট্যজগতের সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যার শানিত রাজনৈতিক বীক্ষণ এবং নির্মোহ সমাজ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন তার প্রতিটি রচিত নাটকে ধ্রুপদী ব্যঞ্জনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অনায়াসে তিনি কিংবদন্তী, ইতিহাস, লোকায়ত জীবনের নানান মৌখিক গল্পগাথা থেকে নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অভিনব উদ্ভাসনেতার রচনাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঅনন্য বললেই যথেষ্ট বলা হয় না - অনেক সময় তা প্রতিস্পর্ধার মাত্রা’কে স্পর্শ করেছে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে উগ্রজাতীয়তাবাদী প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বুকে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়েছেন ‘আমি শহুরে নকশাল’লিখে। এই স্পষ্ট উচ্চকিত ঘোষণার সাথেই আমরা মিলিয়ে নিতে পারি,তাঁর‘হয়ে ওঠা’র পরিক্রমায় তিনি নিষ্ঠুরতা, ক্ষুদ্রতা, ষড়যন্ত্র, সংকীর্ণতা ইত্যাদিকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন আর চমৎকারগাণিতিক সূত্রে তাকে ব্যাখ্যা করে নিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর নাট্যসাহিত্যের চরিত্রায়নের মধ্যে। স্বাধীনতাত্তোর পর্বের ভারতীয় থিয়েটারে গিরিশ কারনাড এমন একউজ্জ্বল অধ্যায়, যাঁর স্বাতন্ত্র এবং স্বকীয়তা সর্বকালীন শীর্ষমাত্রাকে একদিকে যেমন স্পর্শ করে, তেমনি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে কারনাড ভারতীয় নাটকেরআন্তর্জাতিক পরিচয় নির্মাণ করে গেছেন। বর্তমান নিবন্ধে গিরিশ কারনাডের আজীবনের নাট্যচর্চার মধ্যে নিহিত সমাজবোধ ও রাজনীতিবোধকে পর্যালোচনা করে নাট্যকার হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে।
সূচক-শব্দ : ভারতীয় নাটক; নবতরঙ্গ সাংস্কৃতিক আন্দোলন; মৌলবাদ; রাজনৈতিক-মনস্তত্ত্ব; আত্মসমীক্ষণ; মহাকাব্য।

গিরিশ চাননি তাঁর মৃত্যু নিয়ে শোক বিহ্বলতা অতিনাটকীয়তার মাত্রা অর্জন করুক, নিজের অন্তর্জলীযাত্রার দৃশ্যটি তাই নিজেই রচনা করে গিয়েছিলেন নীরব নিভৃতচারীতার অন্তরালে| পুষ্পিত অন্তিম শ্রদ্ধা নিয়ে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি নেই, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্তিম সংস্কারের আয়োজন নেই, গুণমুগ্ধদের দীর্ঘ অপেক্ষমান শেষ প্রণাম জানাবার ব্যবস্থাপনা নেই প্রায় নিঃশব্দে জীবন রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপথ্যে চলে গেলেন ভারতীয় নাট্যধারার অন্যতম কিংবদন্তি সেই প্রাণপুরুষ, যাঁর আজীবন রচিত নাটক হ'ত সতত চড়া সুরে বাঁধা, অতিনাটকীয়তাকে উপজীব্য করে গড়া| মনে পড়ে যার ভারতীয় নাটকের আরো এক কাল-পুরুষের প্রস্থান মুহূর্তটি, নীরব

অভিমানে তাঁর গুণগ্রাহীদের অন্তিম সাক্ষাতের সুযোগ দেননি শম্ভু মিত্র - কিন্তু সেই অভিমান ছিল ব্যক্তি-মানুষের অভিমান, সংগঠনের প্রতি অভিমান| গিরিশ কারনাডের নীরব প্রস্থান কিন্তু একটি প্রতিবাদের স্মারক - শেষ তাঁকে প্রকাশ্যে যেমন দেখা গেছে, নাকে অক্সিজেনের নল - বুকে ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে দৃপ্ত ঘোষণা "আমি একজন নাগরিক নকশাল"!একটি প্রতারক, অসহিষ্ণু, অবিবেচক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তীব্র প্রত্যাখ্যান ছুঁড়ে দিয়ে নিজের মৃত্যুকে নিজের কীর্তি'র চেয়েও বড় করে রেখে গেছেন গিরিশ কারনাড|

অবশ্য এমনটা খুব অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না| জনসমক্ষে তিনি ছিলেন প্রায়শঃ ভাবলেশহীন এক গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনবোধের কোরকে ছিল যুক্তিবাদিতা ও বাস্তববাদিতার অনবদ্য সঙ্গম, প্রায় আট দশক ছড়ানো জীবনকাল ভাস্বর হয়ে ছিল স্পষ্টবাদিতায়| কারো কারো জন্য এসব মুখোশের মতো ব্যবহার্য, কিন্তু মৃত্যুর নির্মম পরিহাস তাদের মুখের ওপর থেকে সেই মুখোশকে টেনে ছিঁড়ে দিলে সেই মরণকে পাখির পালকের চেয়েও হালকা বলে মনে হয়| কিন্তু আজীবন উচ্চারণ আর আচরণের সাযুজ্য অনুশীলন করে চলা গিরিশ কারনাডের এমন অনাড়ম্বর অন্তিমযাত্রা একদিকে যেমন প্রতীকী, অন্যদিকে তেমনি স্বাভাবিক|

গিরিশের স্মৃতিচারণায় এবং কীর্তি আলোচনায় যত লেখালেখি, যত বক্তৃতা, যত আলোচনা, যত মতবিনিময়, এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই জনসমক্ষে একজন নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যতাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক রূপে গিরিশের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়কে ভিত্তি করে নির্মিত| কিন্তু 'হয়ে ওঠা' গিরিশের এক অনুপম বিবরণী তিনি রেখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনী মূলক কন্নড় রচনা "অদথ্যা আয়ুষ"(A Life Spent Playfully) গ্রন্থে (2011)| সেখানে তিনি উল্লেখ করছেন নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশের পেছনে মুম্বাইয়ের অভিনয়জগত কিংবা অক্সফোর্ডের বিদ্যোৎসাহী সভার ভূমিকা ততখানি প্রসারিত নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর শৈশবের লালনভূমি মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক সীমান্তবর্তী শিরশি ও ধারওয়ার নামের মফস্বল দুটি’র ভূমিকা| গিরিশের বাবা ছিলেন শিরশি’র সরকারি হাসপাতালে একজন শব-ব্যবচ্ছেদ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার,

লাশ-কাটা-ঘরের অনতি দূরেই ছিল তাদের পারিবারিক বাসস্থান| গিরিশ খুব ছোটবেলা থেকেই সেই লাশ-কাটা-ঘর ও তাকে কেন্দ্র করে অপঘাতে মৃত, আত্মহত, নিহত অনেক মৃতদেহের সারি দেখেছেন আর শুনেছেন সেই মৃতদেহদের আত্মীয় পরিজনের বিলাপ ও দুর্ঘটনা চর্চা| এসব দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে অল্প বয়সেই গিরিশের মধ্যে ভয়-ভীতি-দুঃখ-বেদনা-ঘৃণা-বিবমিষার ঊর্ধ্বে ভাবলেশহীন সত্তার বিকাশ ঘটেছিল| অপমৃত্যুতে বিলীন হয়ে যাওয়া মানুষদের নিয়ে প্রেত বিষয়ক যে ভ্রম ও ভীতি গিরিশ-মানসে অবদমিত থেকেছে, তারই সার্থক ও সদর্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর নাট্যসৃষ্টিশীলতার পর্ব-পর্বান্তরে; যযাতির অশেষ যৌবন-আকাংখা, তুঘলকের উন্মাদনা,

নাগমন্ডলের দ্বৈধচরিত্র কিংবা হয়বদনে মস্তক অদলবদলের মতো অদ্ভুতুড়ে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাপ্রবাহ তারই সাক্ষ্য বহন করে|

গিরিশ উল্লেখ করেছেন ধারওয়ারে শুরু হলো তাঁর মেধাগত এবং বিদ্যাগত বুৎপত্তি অর্জনের পর্ব| কাব্য, সাহিত্য এবং দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকলেও তাঁর বাস্তববোধ তাঁকে গণিত নিয়ে পড়াশোনা পথে পরিচালনা করে| উচ্চতর শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি প্রান্তিক মফস্বলের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলবার একান্ত আগ্রহে গিরিশ অক্সফোর্ডে পৌঁছলেন| জীবনের নানা গলিপথ, রাজপথ ঘুরে অবশেষে তিনি হয়ে উঠলেন একজন নাট্যকার| যে গিরিশ একদিন পৃথিবীর পাঠশালার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়ে স্বদেশ ছেড়ে ছিলেন, তিনি ফিরে এলেন নিজের আশৈশব ভালোবাসার ধারওয়ারে নিজের শিকড়ের কাছে| কালান্তরে ধারওয়ার একটি আধুনিক নাগরিক জনপদে পরিণত হয়ে উঠছিল, গ্রাম্য ভিটেগুলির জায়গায় গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি সার সার দাঁড়িয়ে পড়ছিল; গিরিশ কিন্তু ধারওয়ারে তাঁর বাংলোর আশেপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে যথাসম্ভব গ্রাম্য ও লৌকিক স্বরূপেই বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন| ধারওয়ারের একটি ঘুপচি বাড়ির ছোট্ট চিলেকোঠার ঘরে একটি অখ্যাত প্রকাশনসংস্থা 'মনোহর গ্রন্থমালা' পরম যত্নে লেখক হিসেবে প্রায়-অপরিচিত গিরিশ কারনাডের রচনাগুলি ছাপানোর কাজ শুরু করে| সেই কৃতজ্ঞতাবোধে ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ভারতরত্ন পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর পরিবারের দ্বারা পরিচালিত এই প্রকাশনা সংস্থা থেকেই গিরিশ তাঁর আজীবনের লেখালেখি প্রকাশিত করে গেছেন|

ধারওয়ারে শিক্ষালাভকালে গণিত নিয়ে অধ্যয়ন করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে গিরিশ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন -- "গনিত বিষয়টা আমার তেমনভাবে কোনদিনই ভালো লাগত না| কেবলমাত্র বেশি নম্বর পাওয়ার আগ্রহেই গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করি| কিন্তু গণিতকে মনোযোগ দিয়ে যখনই শিখবার চেষ্টা করেছি, আমি তার ভেতর এক রকমের ছন্দ, এক ধরনের স্বরগ্রাম, এক প্রকার চলন ও লয় অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম| উপপাদ্যসমূহ সমাধান করবার সময় যুক্তির পরম্পরা সমুদ্রের অবিরত তরঙ্গমালার মত আমার কাছে উপনীত হতো, আমি অনুভব করতাম তাদের রহস্যময় ধাপগুলো অতিক্রম করবার শিহরণ| গণিতচর্চার এইসব অভিজ্ঞতাগুলো আমার বরাবর নাট্যরচনায় কাজে লেগেছিল| অক্সফোর্ডে বসে যখন তুঘলক লেখার কাজে হাত দিয়েছি, তখন প্রথমেই উপপাদ্যের মত ছকে নিতাম নাটকের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সম্পর্ক, পাত্র-পাত্রীদের সাথে বিভিন্ন ঘটনাবলির সম্পর্ক, ঘটনাবলী ও পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যোগাযোগের ভারসাম্যবিধান ইত্যাদি দিকগুলি| আমার নাটক লেখার ক্ষেত্রে, আমার গণিতের শিক্ষা এইভাবেই কার্যকারী ভূমিকা রেখে এসেছে চিরকাল|"

গণিত এবং দর্শনের প্রতি গিরিশের আগ্রহ বিকাশে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর একজন প্রণম্য শিক্ষক কে.জে.শাহ| শাহ ছিলেন গণিত, ভাষা এবং মননের দর্শনের পন্ডিত| লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের ছাত্র হিসেবে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছিলেন শাহ| তিনি গিরিশকে উৎসাহিত করেন রোডস স্কলারশিপের জন্য আবেদন জানাতে| গিরিশ তাঁর এই শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও অন্ধভক্তি জাহির করেননি| পরবর্তীকালে শাহ যখন মুসলিম-বিদ্বেষী রাজনীতি ও হিন্দুত্ববাদের কট্টর সমর্থক হিসেবে অবতীর্ণ হন, এমনকি জরুরি অবস্থার পক্ষে সাওয়াল করেন, গিরিশ তাঁকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন|

সাধারণ বোধবুদ্ধি থেকে এই কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই উদ্রেক হয়, যে মেধাবৃত্তি'তে এমন দুর্লভ সাফল্য অর্জন করে বিদেশে বসে ইংরেজি ভাষায় নাট্যরচনা করে তুলনামূলকভাবে অধিক প্রচার ও বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রায় নস্যাৎ করে কেন গিরিশ কারনাড স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন? ভারতীয় বংশোদ্ভূত বহু সাহিত্যিক বিদেশে বসে বিদেশি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে এমনকি নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত অর্জন করেছেন, তাহলে গিরিশ কারনাডের ক্ষেত্রে কি সেই তাগাদা যা তাকে স্বদেশে ফিরতে কার্যত বাধ্য করলো?

এ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে গিরিশ প্রায় তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ অভিমানী স্বরে উল্লেখ করছেন, "বেশ কিছুকাল ধরে আমার মত একজন ভারতীয় জাতকের গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গে ইংরেজ সমাজের বিবিধ উন্নাসিকতা থেকে আমার ভেতরে এক বিচ্ছিন্নতাবোধ গড়ে উঠেছিল| পশ্চিমী সভ্যতায় প্রতিভার বিপুল সমাদরের জনশ্রুতির প্রতি আমার মোহভঙ্গ ঘটছিল ধীরে ধীরে - বুঝতে পারছিলাম তেমন নিষ্পাপ ভরসাগুলি কত অর্থহীন! অথচ সেই সময়েই আমার লেখা প্রথম নাটকটি (যযাতি, ১৯৬১) কন্নড় ভাষার কৃতবিদ্য রসিকজন ও কলাপারদর্শীদের মধ্যে বিপুলভাবে সমাদৃত হচ্ছিল| আমি তখনই স্থির করি, আমার বিদেশে বসবাসের এবং সাহিত্যচর্চার পরিকল্পনা নিতান্ত বোকামি বলেই প্রতিভাত হবে, সে হবে আমার আত্ম-পরাজয়| তাই স্বদেশে আমাকে ফিরতেই হবে|"

গিরিশ যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন, সারাদেশে তখন এক সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের জোয়ার উঠেছে| যদিও তখন দেশের অর্থনীতি টালমাটাল এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রসরমান, তথাপি শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র-চিত্রকলা-প্রয়োগমুখী শিল্পের ধারাসমূহ এক নতুন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিল, তাত্ত্বিকেরা যাকে New Wave Cultural Movement বলেছেন| বাংলায় তখন বাদল সরকার তাঁর Third Theatre পদ্ধতি নিয়ে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছেন পথে-প্রান্তরে, মারাঠি নাটকের জগতে বিজয় টেন্ডুলকারের মতো নাট্যকারের হাত ধরে উঠে আসছে জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যার মঞ্চায়িত documentation, হিন্দি নাটকের দুনিয়ায় ভীষ্ম সাহানি, মোহন রাকেশ প্রমুখের অসামান্য নাট্যভাবনা ভারতীয় নাটকের পরিসরকে

ঔপনিবেশিকতার শতক-প্রাচীন ভাবকল্প থেকে মুক্ত করে এক নবোদিত চেতনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত করেছিল| গিরিশ এই মহতী প্রচেষ্টায় যুক্ত করলেন স্বদেশীয় কিংবদন্তি, দন্তকথা, লোককথা ও মহাকাব্য থেকে রূপ সংগ্রহ করে তাতে সমকালের রস জারিত করে তোলার অভিনব প্রয়াস| তাঁর নাটকগুলি অতি সহজেই তাই জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল| চেনা কাহিনীকে অচেনা প্রেক্ষিতে দেখতে পেয়ে দর্শকজন আমোদিত এবং বিস্মিত হচ্ছিলেন| অল্প সময়ের মধ্যেই গিরিশ হয়ে উঠলেন এই পরিবর্তিত আর্থ-সমাজ-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা স্রষ্টাব্যক্তিত্ব|

গিরিশ প্রবর্তিত নাট্যভাষায় মৌখিক ইতিহাসের সাথে রহস্যময়তা মিলেমিশে গেছে অবলীলায়; ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যশৈলীর বিন্যাসের সাথে ঘটনা ও পাত্রসমূহের জ্যামিতিক যুক্তির পরম্পরাগত আদলের মিশ্রণ ঘটেছে সবিশেষ যত্নে; চরিত্রসমূহ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক উন্মোচন দর্শককে আমুল কৌতুহলে আবিষ্ট করেছে| সনাতন ভারতীয় নাট্যরচনাকৌশল মূলত আরোহমূলক, অর্থাৎ ঘটনার সন্নিবেশ ও পাত্রসমূহের সমাগমে ধীরে ধীরে নাট্যবস্তু একটি তুঙ্গবিন্দু বা Climax-এ উপনীত হয়, এবং সেখান থেকেই উপসংহারের দিকে যাত্রা শুরু করে| তবে বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' এই কৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, বিশাখদত্ত অবলম্বন করেছিলেন অবরোহমূলক পদ্ধতি, অর্থাৎ নাটকের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে এ নাটকের পরিণতি কোনখানে নিবন্ধ, সে ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমের কী অনবদ্য বিস্তার সেই পরিণতিকে অনিবার্য করে তুলল, তাইই মূলত উপভোগ্য| গিরিশ নিজেও অবরোহমূলক রচনাশৈলী অনুসরণ করে তাঁর নাট্যনির্মাণকে গতিশীল করেছেন| সেক্ষেত্রে কাহিনীর ঠাসবুনেট, চরিত্রায়নের এর যথার্থতা, এমনকি ভিড়, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদিকেও সুনিয়ন্ত্রিত অঙ্গের মতো পরিচালনা করা হয়েছে নাটকের বিষয় বিন্যাসে|

অতীতচারিতা তাঁর নাট্যভাষার এক অনবদ্য অঙ্গ, 'অগ্নি মাট্টু মালে' (The Fire and the Rain, 1994) নাটকের পাত্র যবক্রি'র মাধ্যমে তিনি বলে ওঠেন, "অতীত কখনো অপগত হয় না, অতীত আমারই সত্তাতে বিরাজমান, আমিই অতীতের প্রমাণ!" মহাভারতআশ্রিত এই নাটকটিতে ঘটনাবলী কুন্ডলীর মত পাকে পাকে এগোতে থাকে, নাটকের মধ্যে নাটক অভিনীত হতে থাকে, ধর্মীয় মৌলবাদ বনাম নাস্তিক্যবাদের সংঘাতকে উপজীব্য করে ভ্রাতৃকুলের অন্তঃসম্পর্কের রসায়নে নাটকটির এক অসামান্য পরিণতি সূচিত হয়| সমালোচকেরা ' অগ্নিজল' নাটকটিকে, গিরিশের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে চিহ্নিত করে থাকেন| এক অনন্ত সময়-পথিকের মতো গিরিশ কাহিনীর লোকে-লোকান্তরে ঘুরেছেন রূপকল্প সন্ধানে| মন্ডল কমিশনের বিরোধিতায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া উচ্চবর্ণের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি তথা তাকে ধর্মীয় উন্মাদনার পথে পরিচালিত করে বাবরি মসজিদ বিনাশের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার পূর্বপ্রেক্ষিতে রামের জন্মভূমি অনুসন্ধানে উঠে আসা জাতীয় বিতর্ককে সামনে রেখে গিরিশ লিখলেন "তেলেডান্ডা" (১৯৯০)| দ্বাদশ শতাব্দীর লিঙ্গায়েত সাধক বাসভন্না'র জীবনকাহিনীতে গিরিশ খুঁজে

দেখিয়ে দিলেন ভারতীয় মনুক্রমিক বর্ণবাদী অসভ্যতার স্নায়ুকেন্দ্রে প্রবহমান আত্মবঞ্চনা ও অস্বীকৃতির ঔদ্ধত্য|

আলবেয়ার কামু লিখেছিলেন, 'একটি সার্থক ট্রাজেডি গড়ে ওঠে মূলত মানবিক ইচ্ছা বনাম মানবসাধ্যাতীত শক্তি, যেমন ভাগ্য, ইতিহাস ইত্যাদি মধ্যে সংঘাতের মাধ্যমে'| গিরিশের অধিকাংশ নাট্যরচনায় নায়কসত্তার সাথে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সংঘাত সমানুপাতে উপস্থিত থাকে| কখনো পরিস্থিতি বলবান বলে নায়ক'কে পরাজিত মনে হয়, কখনো নায়ক পরিস্থিতির উপর নিজের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেন, এইভাবে পরতে পরতে নাটক গড়ে উঠতে থাকে অনিবার্য পরিণতির দিকে| আসলে গিরিশ তাঁর এক জীবনকালের ব্যাপ্তিতেই দেখেছিলেন স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষে গান্ধীর ভাববাদের প্রভাব কাটিয়ে মাথা তুলছিল নেহেরুর বাস্তববাদিতা, নেহেরু পরবর্তীকালে ইন্দিরা-আমলে সেই বাস্তববাদিতা রাজনৈতিক কঠোরতায় রূপান্তরিত হয়, ইন্দিরা-পরবর্তী যুগে নব্য-পুঁজিবাদের বিস্তার উদারনীতির ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে, অনতিবিলম্বে সেই ছদ্ম-উদারনীতিবাদের উপরিকাঠামো খসে গিয়ে নব্য-পুঁজিবাদের নয়া-ফ্যাসিস্ট চেহারার উন্মোচন ঘটে গৈরিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির উত্থানে| তাই তাঁর নাট্যরচনার পর্বে-পর্বান্তরে নায়ক হিসাবে একটি মতবাদ বা দর্শন'কে প্রতিফলিত হতে দেখি যা সমসাময়িক দুর্বিপাকের ও সংকটের আবর্তে সংঘাতময় এক পরিণতির পথে কখনো নিশ্চিত, এখনো অনিশ্চিত উপসংহারের দিকে এগিয়ে চলে, সেই ইতিহাস/কাহিনী নির্ভর সমসাময়িকতা আসলে বর্তমানেরই প্রতিচ্ছবি| এই ভাবেই গিরিশ সতত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন নিজের নাট্যভাষায়, সাম্প্রতিক হয়ে ওঠেন চিন্তাপদ্ধতিতে|

বরাবর উদারমনস্ক, সংস্কারমুক্ত, বাস্তবসম্মত বিবেচনায় আস্থাশীল গিরিশ সমকালের দর্পণে অতীতকে দেখতে গিয়ে বহু mythকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, মহাপুরুষ এবং খলনায়ক উভয়কেই দেখতে চেয়েছেন গহীন মনের সাদাকালো আলোয়| আরতা করতে গিয়ে নানা বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন বারংবার| নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে গিরিশ যখন লিখলেন 'টিপু সুলতান কান্দা কানাসু' (Deams of Tipu Sultan, (১৯৯৭) তখন টিপুর চরিত্রায়ন নিয়ে দক্ষিণ ভারতের খ্যাতনামা সাহিত্যকার এস.এল ভৈরপ্পার সাথে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ হয় - গিরিশ তখনও সোচ্চারে বলেছিলেন, "টিপু ছিলেন মানবিক ভালো-মন্দ দিয়ে গড়া, তাঁর নিজের সময়ে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিকর মূল্যায়নের শিকার, এবং তাঁর পরবর্তীকালে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয় আবদ্ধ রেখে চিত্রায়িত ঐতিহাসিক চরিত্র"! (ঘটনাচক্রে পরবর্তীকালে তিনি মুখর হয়েছিলেন বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে টিপু সুলতানের নামে নামাকরনের সপক্ষে|) মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কেও তাঁর মূল্যায়ন ছিল প্রায় একই রকম, অথচ ভাবতে অবাক লাগে, গিরিশ যখন "তুঘলক" (১৯৬৪) লিখছেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছরের সামান্য বেশি| চিন্তাপদ্ধতির এই ধারাবাহিকতা শুধু ব্যতিক্রমী নয়,

অসামান্য| সমসাময়িক আর কোন নাট্যকারের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এমন দৃঢ়তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল| নাট্যরচনা শৈলীতে দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তার অভাবের জন্য এবং অতিকাব্যময়তা দ্বারা ঘটনাবিন্যাসের যৌক্তিকতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য গিরিশ উপমহাদেশের প্রথম নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন| বলেছিলেন 'যে নাটক জনমানসে বহুল সমাদৃত না হয়ে মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রশংসিত অথচ সীমাবদ্ধ থাকে তা নাট্যের মূল উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারেনা', রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন| তা নিয়ে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয়, কিন্তু গিরিশ তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেননি|

চিন্তার সংকীর্ণতাকে গিরিশ বরাবর নিন্দা করেছেন, এমনকি এজন্য কন্নড় ভাষার নবজাগরণ নিয়ে অত্যুৎসাহী তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ইউ.আর অনন্তমূর্তি'র সাথেও তাঁর মত পার্থক্য তৈরি হয় ভাষা-সংকীর্ণতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে| Tata Literary Meet' এর মঞ্চ থেকে আরেক নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ভি. এস নাইপলের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনায় সোচ্চার হয়েছিলেন এই মর্মে যে নাইপল জাতিবিদ্বেষী (বিশেষত মুসলিমবিদ্বেষী) ওমানবতা বিরোধী| এই একই যুক্তিতে ২০১৪ সালে তিনি নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন, বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ করার কঠোরতম প্রতিবাদ করেছিলেন, সাংবাদিক সমাজকর্মী গৌরী লঙ্কেশ হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে|

একবহুত্ববাদী ভারতের কথানক তিনি| মুক্তচিন্তার সুত্রধার| সকল নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামির বিপ্রতীপ বিন্দুতে এক অনির্বাণ জীবনজ্যোতি ছড়ানো আলোকসম্ভব নাটকপুরুষ তিনি| তার ভাবিত-কল্পিত-কথিত-রচিত-অনুসৃত ভারত আদি থেকে অদ্যে হেঁটে যায় প্রগতির পথে, যুক্তির আলোকবর্তিকা হাতে| তাই গৌরী লঙ্কেশের হত্যাকারীদের হিটলিস্টে প্রথম যে নামটি ঘৃণার আঁচড় দিয়ে লেখা, তিনি অবিনশ্বর হয়ে ভারতীয় রঙ্গশালায় ততদিন প্রাসঙ্গিক হয়ে রইবেন যতদিন না তাঁর স্বপ্ন পূরণ হয়|

সূত্র :

- H.S Chandalia and Abrar Ahmed; Dramatizing The Truth : The Plays of Girish Karnad; Yking Books; Delhi; 2021
- Om Prakash Budholia; Girish Karnad- History and Folklore; B. R. Publishing Corporation; Delhi; 2011
- Shailaja B Wadikar; Girish Karnad A Contemporary Playwright; Atlantic Books; 2019
- Dr. Soham Chaudhury; Girish Karnad – An Inclusive Study of His Illustrious Plays; Shashwat Publication; Delhi, 2018
- গৌতম গুহ রায়; এবং গিরিশ কারনাড; সোপান প্রকাশণী; কলকাতা; ২০২০

প্রান্তিকতার মরুভূমিতে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধকতার চর্চার তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

বুবাই বাগ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাগনান কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: উন্নয়নবাদী ভাবনা থেকে গড়ে ওঠা সাম্প্রতিক ‘প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক চর্চা’তে (Disability Studies) বিভিন্ন পরিসরে প্রতিবন্ধী মানুষদের সক্ষমতার আখ্যানকে তুলে ধরার চেতনা দেখা যায়। তবে সেখানে বিষয়গতভাবে সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আইন এবং ইতিহাস অনেকাংশে প্রাধান্য পেয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম থেকে শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক ভাবনা চিন্তা জরালো হয়ে ওঠে। সেই চেতনায় কর্মক্ষমতার অবয়ব অধিক গুরুত্ব লাভ করায় বিপরীতে 'অক্ষমতা'র ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে অন্যান্য অধিক কর্মক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের থেকে পৃথক করে তথাকথিত 'অক্ষম' মানুষদের একপ্রকার বিচ্ছিন্ন করে রাখার লক্ষ করা যায়। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে ক্রমেই প্রতিবন্ধকতাজনিত বিচ্ছিন্নতা বা বৈষম্য তীব্র হতে থাকে। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্ব থেকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে বেশ কিছু প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই তথাকথিত 'মূলস্রোতে' (Mainstream) অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করা হয়। যদিও মূলস্রোতের ইতিহাস চর্চায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের উজ্জ্বল উপস্থিতি চোখে না পড়লেও তাদের যে ইতিহাস রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাশ্চাত্য সঞ্জাত ধেউয়ে ভারতেও গত পাঁচ দশকে বিক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক ভাবনা-চিন্তার সমাবেশ লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সেই চর্চার ধারবাহিক বিবর্তন পর্যালোচনার চেষ্টা করা হবে। তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে রচিত এই প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক পরিসরে থেকে ক্রমান্বয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানিক উপাদানগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সর্বদা তা ইতিহাসের মূল সীমানা অতিক্রম করে চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও আইনের পরিসরে প্রবেশ করেছে। সত্যি বলতে ভারতের প্রতিবন্ধকতার মত সামাজিক প্রান্তিক মানুষদের মুলস্রোতের ইতিহাস চর্চায় প্রবেশে বরাবর অদৃশ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দলিত চর্চার ক্ষেত্রে যেমন দলিত-অদলিতের সমান আগ্রহ বা অংশগ্রহণ চোখে পড়ে প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সেই চেতনার অনুপস্থিতি চোখে পড়ে কেন? ১৮৯১ সাল থেকে আদমশুমারীতে উপনিবেশিক প্রশাসন প্রতিবন্ধকতার বিষয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা চেষ্টা করলেও তাত্ত্বিক মহলে প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতিকে উপেক্ষার কোন বিশেষ কারণ রয়েছে কী? নাকী গণতান্ত্রিক পরিসরে বরাবর 'ভোটমুখী রাজনীতি'র বাইরে থেকে

যাওয়ার জন্য তাদের প্রতি এই ধরণের চেতনা ক্রমশ 'স্বাভাবিক' হয়ে গিয়েছে? বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়গুলি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধকতা চর্চার বিবর্তনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতার ইতিহাসকেও বোঝার চেষ্টা করা হবে।

মূলশব্দ: প্রতিবন্ধকতা, ইতিহাস চর্চা, মূলস্রোত, অন্তর্ভুক্তিকরণ

I

বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্ব থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি 'সামাজিক ইতিহাস' অনুসন্ধান ক্রমে স্বাতন্ত্রতা লাভ করেছিল। সেই চর্চায় সামাজিক পরিসরের কিছু কিছু প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষদের উপস্থিতি চোখে পড়লেও প্রতিবন্ধী মানুষ বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের দেখা যায় না। সেই ঐতিহ্য এখনও সমানভাবে বহমান বলে কেউ কেউ অভিযোগ করলেও বিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে তত্ত্বগত চর্চায় বা টেক্সটে প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি নেহাত কম নয়। তার আগেও যে কিছুই ছিল না সে কোথাও জোর করে বলা যাবে না। তবে ঐতিহাসিক কালানুক্রমের ক্ষেত্রে অনেক সময় ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। সেই চেতনা থেকে বর্তমান প্রয়াস।

ইতিহাসের সাধারণ মতাদর্শ হিসাবে সনাতনী ঐতিহ্য থেকে মার্ক্সবাদ, সংশোধনাবাদ, অমার্ক্সীয় চেতনা, উত্তর আধুনিক সংস্কৃতির মধ্যে বিবর্তন লক্ষ করা গেলেও প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধীয় আলোচনায় সবসময় সেই চেতনার অনুসরণ দেখা যায় না। প্রতিবন্ধকতা চর্চায় সাধারণভাবে চিরাচরিত বা ঐতিহ্যবাহী চেতনা, চিকিৎসীয় ব্যাখা এবং সামাজিক ঘরানার উপস্থিতি চোখে পড়ে। সাম্প্রতিককালে মার্ক্সবাদের পাশাপাশি র‍্যাডিক্যাল বা উগ্রবাদী চেতনার সন্নিবেশ লক্ষণীয়।

ভারতে গত তিন দশকে (বিশেষত ১৯৯৫ সালের আইন রচনার পরে) প্রতিবন্ধকতা চর্চায় বস্তুনিষ্ঠতার যথেষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বেকার দয়া, করুণা, কল্যাণের সীমান থেকে বেড়িয়ে আইন, পুনর্বাসণ, কর্মসংস্থান, কর্মক্ষেত্র, ন্যায়, অধিকার, ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ, উপস্থাপনা, প্রতিনিধিত্বের মত শব্দগুলি ক্রমে প্রতিবন্ধকতা চর্চায় জরালো স্থান গ্রহণ করেছে। পূর্বেকার গ্রন্থগুলিতে তথ্য প্রদানমূলক ডাইরেক্টরি ধরণের বিষয় বা বিবিধ সুযোগ সুবিধার উল্লেখ দেখা যেত। সম্প্রতি অন্যান্য প্রান্তিকতা চর্চার (বিশেষত মানবীবিদ্যা ও দলিত চর্চা) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই চেতনার অনেকাংশে বদল ঘটেছে। সত্যি বলতে প্রতিবন্ধকতা চর্চা আজকের দিনেও সম্পূর্ণভাবে ‘পাঠক্রমিক বিষয়ে’ পরিণত না হওয়ায় সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, আইন, ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, উন্নয়নতত্ত্ব সর্বোপরি ইতিহাসের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

II

স্বাধীন ভারতে প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত প্রথম আলোচনা লক্ষ করা যায় প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে The Planning Commission in India-এর

তত্ত্বাবধানে *Social Welfare in India* (1955) নামে একটি গ্রন্থের সম্পাদনায়। যেখানে দুটি প্রবন্ধ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে রচিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন দৃষ্টিহীনযুক্ত আমলা লাল আবদানী। তাঁর প্রবন্ধে সমসাময়িক দৃষ্টিহীন এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের অবস্থাগত উন্নতির পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক কার্যাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।[১] অপর প্রবন্ধে শ্রীমতি ফতেমা ইসমাইল শারীরিক বা চলনজনিত প্রতিবন্ধীদের পারিবারিক ও সামজিক অবস্থার বর্ণনা ও প্রতিবন্ধকতা নিরাময়ের রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর উল্লেখ করেছিলেন।[২] এই দুই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কল্যাণকর রাষ্ট্র ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকেও প্রতিবন্ধকতা চর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। ১৯৬১ সালে বোম্বাইয়ের 'টাটা ইনষ্টিটিউট অব্ সোশ্যাল সায়েন্সে'র রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে তৎকালীন অধিকর্তা অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া'র তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মরণিকা গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধে প্রতিবন্ধকতা স্থান পেয়েছিল। প্রবন্ধ দুটি লিখেছিলেন সি. এ. আমেসুর[৩] এবং জে. সি. মারফাটিয়া[৪]। পেশাগত ভাবে তাঁরা দুজনেই ছিলেন ডাক্তার। স্থায়ীভাবে তাঁরা ব্রিটেনের অধিবাসী ছিলেন। দূরে বসে দেখার ফলে, তাঁদের লেখনীতে কিছুটা অতিমাত্রিকতা যুক্ত হয়ে যায়। আমেসুর তাঁর প্রবন্ধে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিভিন্ন শাখা (দৃষ্টিহীন, বধির এবং চলনজনিত) এক ছাতার তলায় আলোচনা করেছিলেন। মারফাটিয়া তাঁর প্রবন্ধে মানসিক অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোকপাত করেছিলেন। এই দুই প্রবন্ধে প্রতিবন্ধকতা ভাবনায় নীতি নির্ধারণ অপেক্ষা চিকিৎসীয় আঙ্গিকে প্রতিবন্ধকতার নিরাময়ের বিষয় অধিক প্রাধান্য পেয়েছিল। পরবর্তিতে অবশ্য এখানেই ভারতের প্রথম প্রতিবন্ধকতা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল।

১৯৬০-এর দশকেই ভারতীয় প্রতিবন্ধকতা ভাবনায় কিছুটা ভিন্ন ধারণা প্রদান করেছিলেন উষা ভাট্ (১৯৬৩)। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে ভারতের প্রতিবন্ধী মানুষদের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করেছিলেন।[৫] তাঁর গবেষণায় সমস্ত ধরণের শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষদের কথা উঠে আসে। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা সত্বেও প্রাচীন যুগ থেকে প্রতিবন্ধী মানুষেরা কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন সেই আখ্যানও স্থান পেয়েছিল। তাঁর গ্রন্থটি ভারতের প্রতিবন্ধী মানুষদের ইতিহাস রচনার অন্যতম দলিল হিসেবে অনেকের কাছে বিবেচিত হয়েছে। তিনি প্রতিবন্ধকতার সমস্যাকে 'সামাজিক সমস্যা' হিসেবে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কারিগরী প্রশিক্ষণ ও প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমেই প্রতিবন্ধকতার অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভবপর হতে পারে। উষা ভাট্-এর গবেষণার পর বেশ কিছুদিন অবশ্য সমাজবিজ্ঞানের আঙ্গিকে প্রতিবন্ধকতা চর্চায় নীরবতা দেখা যায়।

III

১৯৮০-র দশক সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জীবন আখ্যান পুনরায় স্থান লাভ করে। সমকালীন পর্বে বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধকতার অধিকার আন্দোলনের লড়াইের সূত্র ধরে ভারতের উচ্চশিক্ষিত প্রতিবন্ধী মানুষেরাও বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থে পৃথক পৃথক ক্ষতি বা বিনষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতার (দৃষ্টিহীন, বধির, চলন জনিত এবং মানসিক অসুস্থতা) সমস্যা, নিরাময়, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক সুযোগ সুবিধা প্রদানের তথ্য সমৃদ্ধ অধ্যায় বিন্যাস লক্ষ করা যায়। ফলে তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য প্রদানের চেতনা অধিক গুরুত্ব লাভ করে। সেই চেতনা থেকে অধিকাংশ গ্রন্থে বিশেষ শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসনের প্রকল্পের এক প্রকার ডাইরেক্টরি বর্ণিত হয়েছে। এই রচনার সূচনা করেন ডি. এস. মেহতা। তাঁর গ্রন্থে প্রতিবন্ধী মানুষদের স্থায়ী অসুস্থতা থেকে নিরাময় এবং বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। সামাজিক কল্যাণের ধারণা থেকে তিনি প্রতিবন্ধী মানুষদের তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গে একই ধরণের প্রান্তিকতায় মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছিলেন।[৬] অনিমা সেন (1988), তাঁর গ্রন্থে পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবন যাবপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন।[৭] তাঁর গ্রন্থে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি মানসিক প্রতিবন্ধকতার সমস্যা ও নীতি নির্ধারণের চেতনা গুরুত্ব লাভ করেছে। অরবিন্দ্ এন. দেশাই[৮] (1990) এবং কৃষ্ণা চন্দ্রে'র[৯] (1994) গ্রন্থে সংখ্যাগত প্রেক্ষিতে প্রধান তিন শাখার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সমস্যা এবং কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহ সর্বোপরি কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রদান করেছিলেন। তাঁদের গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে প্রতিবন্ধকতার শাখাসমূহ (যেমন দৃষ্টিহীনতা বা বধিরতা) প্রাধান্য পেয়েছিল।

এই সব গ্রন্থে প্রতিবন্ধকতার সমস্যার কথা পাওয়া গেলেও প্রতিবন্ধী মানুষের উপস্থিতি বা প্রতিনিধিত্ব খুব একটা পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে অপ্রতিবন্ধী তাত্ত্বিক বা বিশেষজ্ঞগণ কিছুটা দূর থেকে দেখার ফলে প্রতিবন্ধকতার আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা বা বৈষম্য বিষয়ে নীরবতাই চোখে পড়ে। তথ্য সমৃদ্ধ উক্ত গ্রন্থগুলিতে বিশ্লেষণের অভাব ভীষণভাবে স্পষ্ট।

IV

১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধী মানুষ আইন যেমন প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল একই সঙ্গে তত্ত্বগত প্রতিবন্ধকতা ভাবনাতেও নতুনত্ব এসেছিল। এই পর্বে আন্তঃবিভাগীয় (interdisciplinary) পাঠক্রমে প্রতিবন্ধকতা প্রবেশ লক্ষ করা যায়। তার কারণ হিসেবে বলা যায় পূর্বেকার অপ্রতিবন্ধী তাত্ত্বিকদের পাশাপাশি তথাকথিত প্রতিবন্ধী তাত্ত্বিকেরা সমানভাবে চর্চায় নিয়োজিত হতে থাকেন। এই পর্বে

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ,আইন ,রাষ্ট্রবিজ্ঞান ,সমাজতত্ত্ব) কতার বহুমাত্রিক চেতনা ক্রমে গবেষণায় স্থপ্রতিবন্ধ (চর্চান করে নেয়। অনেকে বলেন এই পর্বে প্রতিবন্ধকতা চর্চা অবহেলিত তত্ত্বের ভাবনা (oppression theory) সালের আইনের ১৯৯৫থেকে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পট নিয়ে গবেষণা করেনপ্রেক্ষাপট ও তার ইতিহাস নির্মাণ। এই আইনের প্রেক্ষা গজেন্দ্র নারায়ণ কর্ণ। দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকনিজেও , চলনজনিত প্রতিবন্ধকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। প্রতিবন্ধকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ভারতীয় প্রতিবন্ধকতার অবস্থাগত পরিবর্তবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেন সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিলেন। পূর্বে প্রতিবন্ধকতার সমস্যাকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়ত। কর্ণ তাঁর গবেষণায় সমাজের পাশাপাশি রাজনৈতিকঅর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক , উপাদানগুলিকে সংযোজিত করেছেন।[১০] তাঁর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত বহুবিধ ভাবনার দরজাকে যেমন উন্মোচিত করেছে একই সঙ্গে তাঁর প্রতিবন্ধকদশার মধ্যে জীবন সংগ্রাম ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতা চর্চার সীমানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ভারতের প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকারে আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করেছেন জগদীশ চন্দ্র)2013)। শৈশব থেকে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ভারতের প্রতিবন্ধী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তিভূমি হিসেবে এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির অনিবার্যতা স্বীকার করেছেন। তাঁর গবেষণায় মূলত দৃষ্টিহীনদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা উঠে এসেছে। আঞ্চলিক স্তরে একাধিক সংগঠনগুলি কীভাবে ক্রমে জাতীয় স্তরে জোরালো আন্দোলন সংগঠিত করেছিলসেই ইতিহাস তাঁর আলোচনায় পাওয়া যায়। ,[১১] সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন জগদীশ্ চন্দ্র একজন অধিকার কর্মী হওয়ার জন্য তাঁর লেখা থেকে আন্দোলনের মৌলিক তথ্য পাওয়া যায়। ইতিহাসরাষ্ট্রতত্ত্বের পাশাপা ,শি আইনগত প্রেক্ষিত থেকেও এই পর্বে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ভারতের প্রতিবন্ধী আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এইচ্পিএস আলুওয়ালিয়া)2004)।এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আইনের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপস্থাপনা পাওয়া যায়।[১২] কিছুটা সমজাতীয় আলোচনা করেছিলেন জয়না কোঠারী)2012)। তাঁর গ্রন্থে ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধী মানুষ আইন এবং তার বাস্তবায়নের ইতিবৃত্ত উঠে এসেছে। তিনি প্রতিবন্ধী মানুষ আইনের দুর্বলতাগুলির পাশাপাশি সরকারীবেসরকারী এবং বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর , ভূমিকা তুলে ধরেছেন।[১৩]

V

নারীবাদী চেতনা থেকে অনেকে প্রতিবন্ধকতার 'সামাজিক নির্মাণ'[১৪] বলে মনে করেন। ভারতীয় প্রতিবন্ধকতা ভাবনায় নারীবাদী মতাদর্শের বিষয়টি যথেষ্ট প্রবল। 'অবহেলিত',

'অবদমিত', 'বঞ্চিত', 'বৈষম্যের শিকার' প্রতিশব্দগুলি মানবীবিদ্যা চর্চার যেমন বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে তেমনই প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রাত্যহিক জীবন আখ্যানে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অনেকেই অভিযোগ করেন মূলস্রোতের মানবীবিদ্যা চর্চায় নারী প্রতিবন্ধকতার কথা সেই অর্থে দেখা যায় না। তাই নারী প্রতিবন্ধকতার পৃথক আখ্যানে চর্চা করাই অনেকাংশে শ্রেয়। এই চেতনা থেকে অন্যতম সার্থক প্রকাশনা হল আশা হন্স ও অ্যানি প্যাট্রি সম্পাদিত *Women Disability and Identity* (২০০৩)। লিঙ্গগত প্রেক্ষিত থেকে প্রতিবন্ধকতাকে বোঝার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের প্রবন্ধ সংকলিত এই গ্রন্থে ভারতীয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নারীদের কথা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে এসেছে। বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় ভারতীয় নারী প্রতিবন্ধকতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমান অধিকারের আখ্যান তুলে ধরেছেন অনিতা ঘাই। চলনজনিত প্রতিবন্ধকতার শিকার শ্রীমতি ঘাই, জীবন অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত জ্ঞান নিয়ে প্রতিবন্ধী নারীদের ইতিহাস ও মনস্তত্ব আলোচনা করেছেন। বর্তমানে আম্বেদকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শ্রীমতি ঘাই প্রতিবন্ধদশার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন বলে তাঁর পক্ষে প্রতিবন্ধকতার আপাত অসুবিধাগুলি উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। একদিকে তাত্ত্বিক এবং অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতা অধিকার কর্মী অনিতা ঘাই তাঁর লেখনিতে ভারতীয় নারী প্রতিবন্ধকতার বঞ্চনার দিকগুলির পাশাপাশি অন্তর্নিহিত বৈষম্যকরণ, বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তাঁর মধ্যে তত্ত্বগত প্রেক্ষিতেও প্রতিবন্ধী নারীরা বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। একদিকে তারা যেমন মূলস্রোতের নারীবাদী চর্চায় প্রবেশ করতে পারে না, আবার প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক চর্চার মধ্যেও তাদের উপস্থিতি সেইভাবে দেখা যায় না।[১৫]

VI

গত দুই দশকে ভারতীয় প্রতিবন্ধকতার প্রাতিষ্ঠানিক আন্তঃবিভাগীয় চর্চার সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের আধিক্য দেখা গেছে। তবে এই সমস্ত বিষয়গত উপাদান চর্চার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধকতা চর্চার ধারণা খানিকটা মানবীবিদ্যা চর্চার মত প্রসারিত হতে থাকে। ভারতে প্রতিবন্ধকতার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূচনা হয় মুম্বাইয়ে 'টাটা ইন্সিটিটিউট অব্ সোশ্যাল সায়েন্সে'-এ 'স্কুল অব্ সোশ্যাল ওয়ার্কে' (২০০৮)। 'ডিস্যাবিলিটি স্টাডিস এন্ড ফিল্ড একশ্যান' নামে আন্তঃবিভাগীয় পাঠক্রমে প্রাথমিক ভাবে মাস্টার ডিগ্রী পড়ানো শুরু হয়। সেখানে সমাজতত্ত্ব এবং সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রাধান্য দেখা গেলেও, ক্রমে অন্যান্য বিষয়গুলি (বিশেষত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি) স্থান পেয়েছে। দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ণের উদ্যোগে 'সোস্যাইটি ফর ডিস্যাবালিটি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশান স্টাডিস' গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, শিক্ষা বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বে'র মধ্যে প্রতিবন্ধকতা চর্চাকে যুক্ত করা হয়েছে তবে তা দলিত বা মানবীবিদ্যা চর্চার মত এখনও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

ভারতে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক চর্চার মত প্রতিবন্ধকতা ভাবনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্থান পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা কেন্দ্রিক গবেষণা বোম্বাইে শুরু হলেও, ১৯৮০ দশকের পরে তা অনেকাংশে দিল্লী অভিমূখী হয়। কারণ এই পর্বের প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধীয় অধিকার আন্দোলন রাজধানী দিল্লিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল। তবে আন্তঃবিভাগীয় পাঠক্রম হিসেবে প্রতিবন্ধকতা চর্চার প্রথম সূচনা বোম্বাই বা অধুনা মুম্বাইয়ে শুরু হয়।

আঞ্চলিক পরিসরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধীয় আন্তঃবিভাগীয় চর্চার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। যদিও প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা বঙ্গদেশে নতুন নয়। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে দৃষ্টিহীন ও বধিরদের জন্য দুটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। ভারতের প্রতিবন্ধী মানুষেরা নিজেদের সংগঠন এখানেই প্রথম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।[১৬] তাসত্ত্বেও ইতিহাসের মূলস্রোতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি একপ্রকার উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। তবে সমাজতত্ত্ব বা বিশেষ শিক্ষার পরিসরে গুটিকয়েক প্রতিবন্ধী মানুষ এবং তাদের নিকট আত্মীয়দের উদ্যোগে বিক্ষিপ্ত গবেষণা চোখে পড়ে। সেখানে আবার 'ব্যক্তিগত বিয়োগান্তক কাহিনী'র প্রাধান্য থাকে ফলে বস্তুনিষ্ঠ উপাদানের অভাব দেখা যায়। তাছাড়া প্রতিবন্ধকতার সমস্যাকে চিকিৎসীয় ব্যবস্থার সহজ ধারাপাতে যুক্ত করার ফলে অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে মূলস্রোতের তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না।

VII

ভারতের প্রতিবন্ধকতা ভাবনার ইতিহাস পর্যালোচনায় সমসাময়িক পশ্চিমীদেশের প্রতিবন্ধকতা চর্চার বিকাশ সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক আলোচনায় চিকিৎসাবিদ্যার আধিক্য লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীকালে আন্তঃবিভাগীয় পাঠক্রমে সরাসরি প্রতিবন্ধকতার মত বিষয়ের প্রবেশ ঘটে। এই পর্বে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধকতার প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা শুরু হয়েছিল। সেখানে 'ঐতিহ্যগত' ও 'চিকিৎসীয়' ব্যাখ্যার সীমানা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে সামাজিক প্রান্তিকতায় প্রতিবন্ধকতার অধিকার, সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ ও মূলস্রোতিকরণের মত উপাদানগুলি গুরুত্ব লাভ করে। এই সমস্ত আলোচনায় মতাদর্শের বিষয় অবলীলাক্রমে চলে আসে। মার্ক্সীয় আঙ্গিকে প্রতিবন্ধকতা ব্যাখার মূল কারিগর ছিলেন ব্রিটিশ তাত্ত্বিক ভিক্টর ব্যারেল ফিঙ্কলেষ্টাইন (১৯৩৮-২০১১), মাইকেল জেমস হোয়েলস অলিভার (১৯৪৫-২০১৯) এবং টমাস উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৯৬৬-) প্রমুখ। পূর্ববর্তী দু ঘরাণা থেকে সরে গিয়ে তাঁরা প্রতিবন্ধকতার 'সামাজিক ধরণ' ব্যাখায় সচেষ্ট হয়েছেন। শিল্পায়িত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমের বিষয় গুরুত্ব লাভ করায় সক্ষমতার চেতনা অনিবার্যভাবে চলে আসে। আবার

বিশ শতকের শেষ তিন দশকে প্রচলিত তাত্ত্বিক কাঠামোর সংশোধন চেয়ে বেশ কিছু তাত্ত্বিক সোচ্চার হয়েছিল। তাঁদের লেখনীত সূত্র ধরে উত্তর আধুনিক চর্চার প্রসার ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের মধ্যে জাক ল্যাকাঁ (১৯০১-১৯৮১), মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪), জ্যাক দেরিদা (১৯৩০-২০০৪), এডোয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩), ইয়ুরগেন হাবেরমাস (১৯২৯-) প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের লেখননী প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা ভাবনার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। হেনরি জে. স্টাইকার, ডেভিস জে. লের্ণাড, পল লঙ্গমোর, জোসেফ পি. স্যাপিরো'র মত তাত্ত্বিকেরা প্রতিবন্ধকতার ইতিহাস ব্যাখায় অনেকাংশে উত্তর আধুনিক ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রাচীন কাল থেকে প্রতিবন্ধকতার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন হেনরি জ্যাক্স ষ্টাইকার (২০০২)। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ধর্মতত্ত্বের আঙ্গিকে প্রতিবন্ধকতার অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টে'র উদ্ধৃতি ব্যবহার করে তিনি লিখছেন কিছু কিছু শারীরিক অসুস্থতা (যেমন প্লেগ বা কুষ্ঠ আক্রান্ত) অন্যান্য সাধারণ অসুস্থতা থেকে স্বতন্ত্র এবং সেই স্বাতন্ত্রতাই প্রতিবন্ধকতার ধারণা নির্মাণ করে। প্রতিবন্ধকতা নির্মাণে তিনি কয়েকটি স্তরের উল্লেখ করেছেন 'অপবিত্র – অসম্পূর্ণতা – অসুস্থতা – অশুদ্ধতা – কলঙ্ক – অস্বাভাবিক – অ-সাধারণ'।[১৭] তাঁর লেখনীতে খৃষ্টীয় মতবাদের পাশাপাশি জুডাইক ঐতিহ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। জুডাইক ধারা অনুসরণ করে তিনি দেখিয়েছেন অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, স্থায়ী অসুস্থতা এবং অস্বাভাবিক গঠন সাধারণভাবে অপবিত্র বা অশুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিছুটা সমরূপ ধারণা পাওয়া যায় আমস্ ইয়ং (২০০৭) গবেষণায়। তিনিও লিখছেন প্রতিবন্ধকতার ব্যাখার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে সাধারণভাবে ধর্মীয় চেতনার আধিক্য লক্ষ করা যায় আরও স্পষ্ট করে বললে হয়ত ধর্মীয় বাধ্যবধকতার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধারণায় দয়া, করুণা ও যত্নের বিষয় সংযুক্ত হয়ে থাকে।[১৮]

প্রাচীনযুগের মত মধ্যযুগ ও আদি আধুনিক যুগেও পাশ্চাত্যে প্রতিবন্ধকতা নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্মের অপরিসীম গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন ইরিনা মেল্ট্জার (২০০৫)। তাঁর মতে সমগ্র মধ্যযুগে এমনকি আধুনিক যুগেও প্রতিবন্ধকতার ধারণা সম্বন্ধীয় পর্যালোচনায় ধর্মীয় চেতনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১৯]

VIII

পশ্চিমী বিশ্বে প্রতিবন্ধকতার সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বেশ কিছু গবেষণামূলক পত্রপত্রিকা প্রতিবন্ধকতা চর্চার সীমাকে প্রসারিত করেছে। এই সমস্ত জার্নালগুলির মধ্যে কর্তৃত্বস্থানীয় কয়েকটি নাম উল্লেখ করা যেতে পারে- *Disability & Society, Disability Studies Quarterly, Disability and Rehabilitation, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, Journal of Disability Policy Studies,*

Journal of Intellectual & Developmental Disability, Journal of Intellectual Disabilities, Journal of Learning Disabilities, Journal of Literary and Cultural Disability Studies, Learning Disability Practice, Learning Disability Quarterly, Review of Disability Studies। প্রতিবন্ধকতার স্থানিক চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে পত্রিকাগুলি অনেকাংশে বিশ্বায়িত চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে।

এই জার্ণালগুলির বিবর্তিত রূপ ফুটে ওঠে বেশ কিছু সংকলিত গ্রন্থের সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। প্রতিবন্ধকতা বহুস্তরীয় আখ্যান তুলে ধরতে ডেভিস জে. লের্ণাড *The Disability Studies Reader* (1997) নামে গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন। এখানে প্রতিবন্ধী মানুষদের ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সামাজিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত আখ্যান উঠে এসেছে। প্রথম দিকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে গবেষণামূলক প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে একাধিক অনুপ্রেরণামূলক কবিতার সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। বর্তমান শতকের সূচনায় গ্যারি এল. আলব্রেখট, ক্যাথারিনা ডি. সীল্মান এবং মিশেল বিউড়ী'র *Handbook Of Disability Studies* (2001) নামে অপর এক গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন। যেখানে অপ্রতিবন্ধী তাত্ত্বিকদের সঙ্গে তথাকথিত প্রতিবন্ধকতাযুক্ত তাত্ত্বিকদের কণ্ঠস্বর সমানভাবে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিবন্ধকতার চর্চার দ্বার উন্মোচনে গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে অনেকে মনে করেন। ডান গুডলে'র সম্পাদিত *Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction* (2010) গ্রন্থটি প্রতিবন্ধকতার আন্তঃবিভাগীয় চর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। এই গ্রন্থটি সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষকদের কাছে মূল্যবান বা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার নিক্ ওয়াটসন, ক্যারল থমাস এবং আলান রাউলস্টনের সম্পাদনায় *Routledge Handbook of Disability Studies* (2012) গ্রন্থে প্রতিবন্ধকতা ভাবনায় উত্তরাধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

IX

তাহলে বলা যায় শারীরিক অসুস্থতা বা আপাত অসুবিধার কারণে সভ্যতার ঊষালগ্নে যে পৃথকীকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ শুরু হয়েছিল সেই ঐতিহ্য এখন হয়ত অনেকাংশে বহমান। তবে অঞ্চল বিশেষে তারতম্য লক্ষণীয়। গত কয়েক দশকে পাশ্চাত্যে প্রতিবন্ধকতার প্রগতি স্পষ্ট হলেও ভারতে সেই ছবি কিছুটা ভিন্নতর। ঐতিহ্যগত ভাবে ভারতের প্রতিবন্ধী মানুষেরা ক্রমাগত বৈষম্যের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। যার প্রতিফলন তত্ত্বগত চর্চা বা বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মধ্যে পাওয়া যায়। বর্তমানে সেই চেতনার কিছুটা বদল ঘটছে। বর্তমানে সমাজতত্ত্ব, বিশেষ শিক্ষা ও মানবাধিকার চর্চায় সামাজিক প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে বিক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না। ফলে দেরীতে হলেও প্রতিবন্ধকতা চর্চার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তা অদূর

ভবিষ্যতে হয়ত ফুলে ফলে সুসজ্জিত হতে পারে। অনেকটা দলিত চর্চা বা মানবীবিদ্যা চর্চার মত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করতে পারে।।

তথ্যসূত্র :

১. Lal Adbani, (1955), 'The Deaf and Blind in India', in *Social Welfare in India,* New Delhi: The Planning Commission in India, pp. 267-280.

২. Fatemah Ismail (1955), 'Rehabilitation of Crippled Children', in *Social Welfare in India,* New Delhi, The Planning Commission in India, pp. 283-301.

৩. C. A. Amesur (1961), 'Welfare of the Physically Handicapped', in A. R. Wadia (ed.), *History and Philosophy of Social Work in India,* Bombay: Allied Publishers Private Ltd, pp. 327-360.

৪. J. C. Marfatiya (1961), 'Welfare of the Mentally Handicapped', in A. R. Wadia (ed.), *History and Philosophy of Social Work in India,* Bombay: Allied Publishers Private Ltd, pp. 361-381.

৫.) Usha Bhatt1963 ,(*The Physically Handicapped in India: A Growing National Problem,* Bombay: Popular Book Depo.

৬. D. S. Mehta, (1983), *A Handbook of Disability in India,* New Delhi: Allied Publisher.

৭. Anima Sen, (1988), *Psycho-Social Integration of the Handicapped: A Challenge to the Society,* New Delhi: Mittal Publication.

৮. Arvind N. Desai, (1990), *Helping the Handicapped: Problems and Prospects,* New Delhi: Ashish Publishing House.

৯. Krishna Chandra, (1994), *Handbook of the Psychology for the Disabled and Handicapped,* New Delhi: Anmol Publication Private Limited.

১০. G. N. Karna (1999), *United Nations and the Right of Disabled Persons: A Study in Indian Perspective*, New Delhi: A. P. H. Publishing Corporation.

১১. Jagadish Chandra, (20013), Disability Rights and the Emergence of Disability Studies, in Rennu Addlakha (ed.), *Disability*

Studies in India: Global Discourses, Local Realities, Delhi, Routledge, pp. 61- 77.

১২. HPS Alluwaliah (2004), *Summit of the Mind: All India Cross Disability Convention*, New Delhi.

১৩. Joyna Kothary (2012), *The Future of Disability Law in India: A* Critical Analysis of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995, New Delhi: Oxford University Press.

১৪. বিশ শতকের সাতের আন্দোলনে নারীত্বকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে 'সামাজিক নির্মাণে'র তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তলার চেষ্টা করেন। সেই চেতনার আলোকে একশ্রেণীর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত তাত্ত্বিকগণ (মাইক অলিভার, টম শেক্সপীয়ার প্রমূখ) প্রতিবন্ধকতাকে সামাজিক নির্মাণ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। যার মধ্য দিয়ে তারা ব্যক্তির শারীরিক দূর্বলতা বা অসুবিধা অপেক্ষা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অসুবিধাগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। C. Barnes & M. Oliver, (1993), *Disability: A Sociological Phenomenon Ignored by Sociologists*, Leeds: University of Leeds, pp. 1-23.

১৫. A. Ghai, (2003), *Dis(embodied) Women Form : Issues of Disabled Women,* New Delhi: Har-Anand Publication Pvt. Limited ,pp. 56-90.

১৬. কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়েশ্রী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে ,র প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে'র নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে ভারতে দৃষ্টিহীন মানুষদের প্রথম সংগঠন ব্লাইন্ড পারসনস্' ,সুকান্তি হাজরা ,স্থাপিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। সাক্ষাৎকার 'অ্যাসোসিয়েশান) ,কলকাতা ,অ্যাসোসিয়েশান ব্লাইন্ড পারসনস্ ,প্রবীণ সদস্য২ মার্চ । (২০১২ ,

১৭ . Henry. J. Striker, (2002), *History of Disability*, (translated by), William Sayers, Ann Arbor: The University of Michigan Press, p. 30.

১৮. Amos. Yong, (2007), *Theology and Down syndrome: Reimagining Disability in Late Modernity*, Waco TX: Baylor University Press, p. 43.

১৯ . Irina. Metzler, (2005), *Disability in Medieval Europe: Thinking about Physical Impairment in the High Middle Ages, c.1100 c.1400,* New York: Routledge.

আকবর-পর্তুগিজ সম্পর্ক : একটি রাষ্ট্রনীতিক-বাণিজ্যিক পর্যালোচনা

সুমন মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ১৫৫৬ সালে আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজরা তাদের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিল। তারা পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে দুর্গ এবং কুঠি নির্মাণ করেন। এছাড়া পূর্ব উপকূলেও তারা কিছু বসতি স্থাপন করেছিল। পর্তুগিজরা 'কার্তাজ' প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ১৫৭২ সালে আকবর যখন গুজরাট জয় করেন তখন তিনি প্রথম সমুদ্রে প্রবেশ করার সাফল্য অর্জন করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে পর্তুগিজদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে ভারতীয় বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে। আকবর ও পর্তুগিজদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে—বাণিজ্য এবং জাহাজ চলাচল এবং ধর্মীয় সংযোগ। আকবর মনে করেছিলেন যে, পর্তুগিজরা মক্কাগামী তীর্থযাত্রীদের কাছে ভয়ের কারণ ছিল এবং তারা সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাই ভারত মহাসাগর থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করা প্রয়োজন ছিল। এটা খুবই লজ্জার ছিল যে, আকবরের মতো এক মহান রাজাকে 'কার্তাজের' জন্য পর্তুগিজদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। এতে বাদশাহ আকবরের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল। গুজরাট জয়ের ফলে পর্তুগিজদের সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন যেমন ব্যর্থ হল, অন্যদিকে তেমনি, আকবরের ব্যক্তিজীবনে পর্তুগিজ সংস্পর্শ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মুঘল বাদশাহ আকবরের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক ছিল কিছুটা টানাপোড়েনের। আকবর কখনো তাদের ছিলেন ঘনিষ্ঠ, আবার কখনোও শত্রুভাবাপন্ন।

সূচক শব্দ: আকবর; মুঘল; পর্তুগিজ; 'কার্তাজ'; গুজরাট; মক্কা

মূল আলোচনা:

দিল্লি সুলতানির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের সুযোগে জহীরুদ্দীন বাবর ১৫২৬ সালের প্রথম পানিপথের যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। মুঘলরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬-৩০) নিজের জীবিতকালে কোনোদিন সমুদ্র দেখেননি। তাই পর্তুগিজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপনের কোনো প্রশ্ন ছিল না। বাবরের

পুত্র হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬) ও তাঁর রাজত্বকালে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহে এত লিপ্ত ছিলেন যে, সামুদ্রিক ব্যাপারে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। হুমায়ুনের পুত্র মহান আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) যখন ত্রিশ বছর বয়সে ক্যাম্বে উপসাগরে সমুদ্র দর্শন করেন তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। মূলত তাঁর সময় থেকে মুঘল ও পর্তুগিজদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[1] মুঘল সাম্রাজ্য ছিল স্থলভূমি নির্ভর। মুঘল সাম্রাজ্যের সমগ্র রাজস্বটাই আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। জলপথের থেকে শুল্ক ছিল খুবই কম। মাত্র ৫ শতাংশ আসত আমদানি-রপ্তানির ওপর আরোপিত শুল্ক থেকে। তাই সমগ্র ষোড়শ শতকে মুঘল বাদশাহগণ সামুদ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি। এর ফলে ভারত সাগরে পর্তুগিজদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয় এবং মুঘলদের নৌশক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায় যা পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক ছিল কিছুটা টানাপোড়েনের। মুঘলরা কখনো ছিলেন তাঁদের ঘনিষ্ঠ, কখনো তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট। মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে পর্তুগিজরা কখনোই বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং নিয়মিত সম্পর্ক গড়ে তোলেনি।[2]

আকবর-পর্তুগিজ সম্পর্ক সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা :

মুঘল বাদশাহদের সাথে পর্তুগিজদের সম্পর্ক বিষয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন। সেই সকল গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলিতে আকবরের সাথে পর্তুগিজদের সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। Jorge Flores তাঁর *Unwanted Neighbours: The Mughals, the Portuguese,andTheir Frontier Zones* (2018)[3] গ্রন্থে, Luis de Assis Correia তাঁর *Portuguese India and Mughal Relations, 1510-1735* (2017)[4] গ্রন্থে, Pius Malekandathil তাঁর *The Mughals, the Portuguese and the Indian Ocean: Changing Imageries of Maritime India* (2016)[5] গ্রন্থে, Jorge Flores তাঁর *The Mughal Padshah: A Jesuit Treatise on Emperor Jahangir's Court and Household* (2015)[6] গ্রন্থে, Nuno Vassallo e Silva এবং Jorge Flores তাঁদের *Goa and the Great Mughal* (2011)[7] গ্রন্থে, Afzal Ahmad তাঁর *Indo-Portuguese Diplomacy During the 16th and the 17th Centuries, 1500-1663* (2008)[8] গ্রন্থে মুঘল-পর্তুগিজ সম্পর্ক বিষয়ের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। M. N. Pearsonতাঁর 'Portuguese India and the Mughals' (1998)[9] প্রবন্ধে, K. S. Mathew তাঁর 'Akbar and Portuguese Maritime Dominance' (1997)[10] প্রবন্ধে, Jagadish Narayan Sarkar তাঁর 'New Light on Mughal-Portuguese Relations, 1665-67' (1969)[11] প্রবন্ধে বাদশাহ আকবরের সাথে পর্তুগিজদের সম্পর্ক বিষয়ে বিশদে আলোকপাত করেছেন। মুঘল-পর্তুগিজ সম্পর্ক বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা বাংলা ভাষাতেও হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। শরিফুল বারী তাঁর *'ভারতে পর্তুগিজ বণিকদের ইতিহাস* (২০২১)[12] গ্রন্থে, শানজিদ অর্ণব অনুদিত জোয়াকিম জোসেফ এ. ক্যাম্পস

প্রণীত *‘হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল’* (২০১৮)[13] গ্রন্থে, ইমতিয়াজ আহমেদ তাঁর *‘দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য* (২০০৮)[14] গ্রন্থে, অশীন দাশগুপ্ত তাঁর *‘ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য ও রাজনীতি: ১৫০০-১৮০০’* (১৯৯৯)[15] গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাদশাহ আকবরের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক :

১৫৫৬ সালে আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজরা তাদের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিল। তারা পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে দুর্গ এবং কুঠি নির্মাণ করেন। এছাড়া পূর্ব উপকূলেও তারা কিছু বসতি স্থাপন করেছিল। পর্তুগিজরা ‘কার্তাজ’ প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের বণিক, অভিজাত এবং শাসক সম্প্রদায় পর্তুগিজদের কাছ থেকে ‘কার্তাজ’ বা জাহাজ চলাচলের অনুমতিপত্র ক্রয় করতে না পারে তার জন্য কার্তাজের সমস্ত শর্ত মেনে চলতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন।[16] আকবরের রাজত্বকালের বিভিন্ন বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৫৩৭ সালে পর্তুগিজরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে বাহাদুর শাহকে হত্যা করেছিল। যাতে ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গুজরাট সুলতানির শাসকদের মধ্যে অন্যতম মালিক আয়াজ পর্তুগিজ বণিকদের কোণঠাসা করার জন্য সমুদ্রে দুর্গের কোণে কোণে অবস্থিত গম্বুজ বিশেষ নির্মাণ করেন যা ‘সাঙ্কাল কোথ’ নামে পরিচিত ছিল এবং দিউকে সমুদ্র উপকূলের সঙ্গে লোহার চেন দ্বারা সংযুক্ত করেন, যাতে পর্তুগিজদের জাহাজগুলি সমুদ্রে প্রবেশ করতে না পারে। আয়াজের রাজত্বকালে উপকূলীয় গুজরাটে কোনো পর্তুগিজ জাহাজ প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কোনো ভারতীয় জাহাজই গুজরাট উপকূল থেকে পর্তুগিজ কার্তাজ অনুমতিপত্র ব্যতীত যাত্রা করতে পারত না।[17]

১৫৭২ সালে আকবর যখন গুজরাট জয় করেন তখন তিনি প্রথম সমুদ্রে প্রবেশ করার সাফল্য অর্জন করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে পর্তুগিজদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে ভারতীয় বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে। আকবরের গুজরাট অভিযানের একাধিক কারণ ছিল।[18] ভারতীয় মুসলিম তীর্থযাত্রীদের মক্কা যেতে হলে গুজরাট হয়ে যেতে হত। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে গুজরাটে কর্তৃত্ব বিস্তার আকবরের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল। পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচারে মক্কা যাত্রীদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। গুজরাটের ধন সম্পদের ওপর পর্তুগিজদের শ্যেন দৃষ্টি ছিল। অথচ তৃতীয় মুজাফফর শাহ পর্তুগিজদের দমনে কোনো উদ্যোগই নেননি। পশ্চিম উপকূলে পর্তুগিজ তৎপরতা বিনষ্ট করা সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তাই পর্তুগিজ উৎপাত নিবারণের জন্য আকবর গুজরাটের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

আকবর ও পর্তুগিজদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বাণিজ্য এবং জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে।

বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচল :

গুজরাটকে নিজের অধীনে নিয়ে আসার জন্য আকবর সুরাট অবরোধ করেন। সুরাটেই তিনি প্রথম পর্তুগিজদের মুখোমুখি হন।[19] আবুল ফজল তাঁর *'আকবর নামা'* গ্রন্থে বলেছেন, মীর্জাদের আমন্ত্রণে সুরাটে পর্তুগিজরা এসেছিল আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু পর্তুগিজরা যখন অনুভব করল যে, আকবরের শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে, তখন তারা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল। তাই পর্তুগিজ গভর্নর আকবরের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন শান্তি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য। আবার, সমকালীন পার্সিয়ান ঘটনাপঞ্জিতে বলা হয়েছিল, আকবর নিজেই গোয়াতে তাঁর দূত পাঠান যাতে পর্তুগিজ গভর্নর সুরাটে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। আকবরের তরফ থেকে গোয়াতে দূত পাঠানোর প্রচেষ্টার মূল কারণ ছিল মুঘল হারেমের বিভিন্ন সদস্যরা, তাঁর মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন প্রতি বছর মক্কায় তীর্থ করতে যেতেন। এখানে আকবরের মা হতে পারেন হাজি বেগম, হতে পারেন মারিয়ম মাকানি, হতে পারেন গুলবদন বেগম। পর্তুগিজদের সঙ্গে আকবরের সুসম্পর্ক স্থাপনের মূল কারণ ছিল মক্কাতে তীর্থযাত্রীরা যাতে নিরাপদে জাহাজ মারফত পৌঁছতে পারেন। পর্তুগিজ নাবিক জলদস্যুরা যাতে রাজকীয় জাহাজগুলির কোনো ক্ষতিসাধন না করে। সুরাটে পর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পর আকবর উত্তর দিকে ব্রোচ ও ক্যাম্বে হয়ে আহমেদাবাদে পৌঁছান ১৫৭৩ সালের ৮ মার্চ। সমকালীন এক পর্তুগিজ লেখকের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, আকবরের সঙ্গে পর্তুগিজদে সম্পর্ক এত বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, আকবর ক্যাম্বের পর্তুগিজ বণিকদের কাছ থেকে পরিধান করার জন্য পর্তুগিজ পোশাক চেয়েছিলেন। আকবর যখন বন্দর শহর সুরাট, ব্রোচ ও ক্যাম্বে দখল করে নিয়েছিলেন তখন ক্যাম্বের ৫০-৬০ জন পর্তুগিজ নাবিক ও বণিক আকবরের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, ক্যাম্বেতে তাদের দ্বারা আমদানিকৃত পণ্যের ওপর যেন কোনো শুল্ক প্রদান করতে না হয়। আকবর পর্তুগিজ বণিকদের ওই অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিলেন। ক্যাম্বে বন্দরের ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতি বছর প্রায় ৩০০,০০০ ক্রুজাডোজ পরিমাণ অর্থ পর্তুগিজদের শুল্ক হিসেবে প্রদান করতে হত। পর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর আকবর ১৫৭৩ সালের ১৮ মার্চ এক ফরমান জারি করে সুরাট, ব্রোচ, নৌসারি, ভদোদরার সমস্ত ক্যাপ্টেন, গভর্নর, প্রশাসক এবং অন্যান্য আধিকারিকদের আদেশ দেন যে, পর্তুগিজদের যেন কোনোভাবে বিরক্ত না করা হয়। পর্তুগিজ ভাইসরয় ডম অ্যান্টেনিও ডি নোরোনহা তাঁর দূত অ্যান্টেনিও ক্যাব্রালকে আকবরের কাছে পাঠিয়েছিলেন বন্ধুত্ব স্থাপন করার জন্য। পর্তুগিজরাও কথা দিয়েছিল আকবরকে যে, তারা কোনোভাবেই মালাবার জলদস্যুদের সুবিধা করে দেবে না।

বিনিময়ে পর্তুগিজরা চেয়েছিল যে, গুজরাট প্রদেশের যে কোনো প্রান্তে পর্তুগিজদের দাসেরা উদ্বাস্তু হিসেবে থাকতে পারবে এবং দাসদের বিচার হবে পর্তুগিজ আইন অনুসারে এবং পর্তুগিজ প্রভুদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।[20]

পর্তুগিজদের তরফ থেকেও সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল। আকবরের রাজপরিবারের সদস্যরা যাতে মক্কাতে তীর্থযাত্রা করতে যেতে পারেন তার জন্য 'কার্তাজ' বা অনুমতিপত্র প্রদান করা হত।[21] আকবর পর্তুগিজদের কাছ থেকে 'কার্তাজ' সংগ্রহ করতেন যাতে তাঁর রাজকীয় জাহাজগুলি গুজরাট থেকে প্রতি বছর লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। অ্যান্টিনিও ক্যাব্রাল আকবরের রাজকীয় জাহাজগুলিকে 'কার্তাজ' প্রদান করেছিলেন। আকবরের তরফ থেকে ক্যাব্রালকে আরও অনুরোধ করা হয়েছিল যে, 'কার্তাজে' যেন নির্দিষ্ট জাহাজটির নাম এবং মোখা ও লোহিত সাগরের বন্দরসমূহে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভ্রমণ করবেন তাদের নাম উল্লেখ থাকে। পর্তুগিজরা সম্মত হয়েছিল যে, প্রতি বছর সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী সুরাট থেকে মোখা যাওয়ার জাহাজের ওপর মূল্যহীন কার্তাজ প্রদান করা হবে এবং ওই কার্তাজ যুক্ত জাহাজটি যখন গুজরাট উপকূলে ফিরে আসবে তখনও তাকে কোনো শুল্ক প্রদান করতে হবে না। যখন একটি 'কার্তাজ' প্রদান করা হত তখন তাতে উল্লেখ থাকত কী পরিস্থিতিতে তা প্রদান করা হচ্ছে। জাহাজের নাম এবং কত পরিমাণ পণ্য তাতে আছে, নাবিকের নাম ও বয়স, জাহাজটির কোন বন্দর থেকে আগমন ও কোন বন্দরে গমন, বন্দর থেকে জাহাজটি রওনা হওয়ার নির্ধারিত দিন ওই কার্তাজে উল্লেখ থাকত। জাহাজের নিরাপত্তার জন্য কত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং জাহাজটিতে কী কী পণ্য পরিবহণ করা যাবে না তাও 'কার্তাজে' উল্লেখ থাকত। সব শেষে যিনি 'কার্তাজ' প্রদান করছেন তাঁর স্বাক্ষর এবং তারিখ দেওয়া থাকত।[22]

পর্তুগিজদের দ্বারা আকবরকে প্রদেয় বাৎসরিক 'কার্তাজ'-এর কোনো আর্থিক মূল্য গ্রহণ করা হত না। গুজরাটের সুলতান এবং পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকেই সম্মত হয়েছিলেন যে, গুজরাট উপকূল থেকে প্রত্যেকটি জাহাজ ছেড়ে যাওয়া ও ফিরে আসার সময় দিউ-এর শুল্ক ভবনে শুল্ক প্রদান করার জন্য রিপোর্ট করতে হবে। দিউ-এর শুল্ক ভবনে জাহাজগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করা হত। তাই বন্দরের রাজস্ব আদায়কারীগণ সম্রাট আকবরের মূল্যহীন কার্তাজ প্রদানের বিষয়ে সজাগ থাকতেন। প্রতি বছর পর্তুগিজ শুল্ক আদায়কারীরা 18,000 প্যারাডোজ অর্থ দাবি করত। দিউ-এর শুল্ক ভবনের নথিপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের ওই দাবি ন্যায্য ছিল। মুঘল সম্রাট আকবরকে মূল্যহীন কার্তাজ প্রদান করা হয়েছিল বলে পর্তুগিজদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। হিসেব করা হয়েছিল যে, প্রতি বছর পর্তুগিজদের আয় থেকে ৫০০০ ক্রুজাডোজ ক্ষতি হয়। ক্যাম্বের আবাসিকরা যারা তাদের নিজস্ব জাহাজ নিয়ে মোখার দিকে যাত্রা করত তারা বাধ্য ছিল দিউ-এ এসে প্রতি বছর শুল্ক প্রদান করত। কিন্তু আকবরের যে সমস্ত জাহাজ মোখা থেকে গুজরাটে প্রত্যাবর্তন করত তাদের

কোনো শুল্ক প্রদান করতে হত না। এই সুযোগে ক্যাম্বের বণিকরা ওই সব রাজকীয় জাহাজগুলিতে সোনা, রূপা, প্রবাল, রেশমি কাপড় ও অন্যান্য পণ্য মোখাতে পাঠাতে শুরু করে। এটা ছিল পর্তুগিজদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ ভারতীয় বণিকদের জাহাজগুলি থেকে দিউ-এর শুল্ক ভবন প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করত। কিন্তু এর ফলে শুল্কভবন প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পর্তুগিজরা ১৫৭৩ সালে আকবরের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।[23]

লোহিত সাগর থেকে গুজরাটে যে সমস্ত রাজকীয় জাহাজ মূল্যহীন 'কার্তাজের' সুবিধা নিয়ে আসত তা পর্তুগিজদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৫৭৭ সালে লোহিত সাগরের জিড্ডা থেকে ৫টা পণ্যবাহী জাহাজ গোগাতে পৌঁছেছিল। পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ দিউ-এর রাজস্ব আদায়কারীদের নির্দেশ দিয়েছিল যে, ওই সব জাহাজগুলির প্রতি কঠোর মনোভাব দেখানো হোক এবং তাদের দখল করে বাজেয়াপ্ত করা হোক। ওই জাহাজ যদি 'কার্তাজ' নিয়ে আসেও তবুও যেন তাকে ছাড়া না হয়— এই নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ রাজস্ব আদায়কারীরা আর্থিক দিক দিয়ে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল। এরই সূত্রে, আকবরের একটি জাহাজকে গোগাতে পর্তুগিজরা দখল করে নিয়েছিল। ফারনা ও মিরাণ্ডাকে পর্তুগিজ ভাইসরয় নির্দেশ দিয়েছিলেন গোগাতে গিয়ে যেন ওই সমস্যার সমাধান করা হয়। আকবরের জাহাজঘাট 'কার্তাজ' বহন করলেও দিউ-এর শুল্ক আদায়কারীরা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। শুল্ক আদায়কারীরা জাহাজঘাটকে দিউ-এর শুল্ক ভবনে পাঠাতে বাধ্য করেছিল এবং জাহাজটিকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছিল। এই অবস্থায় ব্রাজ ডি অ্যাজেভেডো পর্তুগিজ ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এই সময়ে গুজরাটের মুঘল গভর্নর পর্তুগিজ ভাইসরয়ের কাছে তাঁর দূত পাঠিয়েছিলেন ঐ ব্যাপারে সুবিচার পাওয়ার আশায়। তিনি ভাইসরয়কে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, পর্তুগিজরা যে জাহাজটাকে বাজেয়াপ্ত করেছে তা সম্রাট আকবরের। ঐ একই সময়ে তিনি রাজকীয় জাহাজটিকে পর্তুগিজদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য সুরাট থেকে কিছু জাহাজ পাঠানোর পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। ফ্রান্সিসকো পায়েজকে পর্তুগিজ গভর্নর পাঠিয়েছিলেন রাজকীয় জাহাজ ও তার মালপত্র গোয়াতে নিয়ে আসার জন্য। অবশেষে পণ্যবাহী জাহাজটি আকবরের এজেন্টের কাছে ফিরে আসে বিভিন্ন সমঝোতার পর। ওই রাজকীয় জাহাজটিতে 600,000 ক্রুজাডোজ মূল্যের সোনা-রূপা ছিল। এছাড়া, মণি, মুক্তো, প্রবাল, বুটিতোলা রেশমি কাপড় এবং অন্যান্য পণ্য ছিল।[24]

পর্তুগিজ কর্তৃক মোখা থেকে আসা জাহাজগুলির দখলের সংবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। মালাবার উপকূলের পোন্নানির শেখ জৈনুদ্দীন ষোড়শ শতকের শেষের দিকে লিখেছিলেন, ১৫৭৭ সালে পর্তুগিজরা বিভিন্ন গুজরাটি জাহাজ দখল করেছিল। ওইসব জাহাজের মধ্যে কতিপয় ছিল সম্রাট আকবরের। এই ঘটনার জন্য আকবরের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক সাময়িককালের জন্য অবনতি হয়েছিল।

যদিও উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং বাজেয়াপ্ত জাহাজগুলি বাদশাহ ফিরে পেয়েছিলেন। প্রত্যেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সমুদ্রে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আকবরের উচিত ছিল ভারতের বন্দরগুলি থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করা।[25]

ঐ সব ঘটনা সত্ত্বেও আকবরের সঙ্গে পর্তুগিজদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু গুজব রটে যায় যে, পর্তুগিজরা সুরাট থেকে পশ্চিম এশিয়াগামী জাহাজগুলিকে গায়েব করে দিত এবং বাজেয়াপ্ত করত। যখন আকবর উদয়পুর হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল সুরাট থেকে যাত্রা করা জাহাজের যাত্রীরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল সম্ভাব্য পর্তুগিজ আক্রমণের জন্য। গুজরাটের শক্তিশালী প্রশাসকদের অন্যতম কুলিজ খানকে নিশ্চয়তা দিতে বলা হয়েছিল যাতে করে সুরাট থেকে জাহাজের যাত্রীরা নিরাপদে গমন করতে পারে। 'সালিসি' এবং 'ইলাহি' নামক দুটি জাহাজে যাত্রীদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কুলিজ খান যখন বন্দরে পৌঁছান তখন দেখেন যে বিষয়টি গুজব ছড়া আর কিছুই নয়।[26]

১৫৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আকবর কুতুবউদ্দীন খানকে নিয়োগ করেছিলেন পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। এ ব্যাপারে তিনি গুজরাট ও মালবের আধিকারীকদেরও সহায়তা চেয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শাসকরাও ভারত থেকে পর্তুগিজ উৎখাতের জন্য ওই দলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন যে, এটাই বাদশাহ আকবরকে আনুগত্য প্রদর্শনের সর্বোত্তম সুযোগ এবং তাদের প্রজারাও রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে যাবে।[27]

আকবর মনে করেছিলেন যে, পর্তুগিজরা মক্কাগামী তীর্থযাত্রীদের কাছে ভয়ের কারণ ছিল এবং তারা সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি করেছিল। তাই ভারত মহাসাগর থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করা প্রয়োজন ছিল। এটা খুবই লজ্জার ছিল যে, আকবরের মতো এক মহান রাজাকে 'কার্তাজের' জন্য পর্তুগিজদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। এতে বাদশাহ আকবরের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল।[28] পর্তুগিজদের প্রতি অসন্তোষ এত বাড়ছিল যে আকবর সাময়িকভাবে তীর্থযাত্রীদের মক্কা যাওয়া নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন। যাইহোক, আকবর ক্রমশ পর্তুগিজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে শুরু করেন। S. R. Bakshi এবং S. K. Sharma তাঁদের *'The Great Moghuls': Akbar'* (Vol. 3) গ্রন্থে বলেছেন,

> Their (Portuguese) violent intolerance made them extremely unpopular, particularly with broad-minded rulers like Akbar.[29]

যদিও আকবর মালব এবং গুজরাটে তাঁর আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসকদের সহায়তায় তারা যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় পর্তুগিজদের

উৎখাতের জন্য। কিন্তু পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ বা যুদ্ধের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[30]

K. S. Mathew তাঁর 'Akbar and Portuguese Maritime Dominance' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, আকবর তাঁর রাজত্বকালে পর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি কোনো বিবাদ ও যুদ্ধে তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হননি এবং তিনি পর্তুগিজদের নৌ-আধিপত্যের বিরুদ্ধেও কোনো চ্যালেঞ্জ জানাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তবে একথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, নৌশক্তিতে আকবরের দুর্বলতায় পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে তাঁকে ওইরকম নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। আকবরের মতো মহান শাসক যদি নৌশক্তি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুভব করতেন তাহলে তিনি খুব সহজেই পর্তুগিজদের দমন করতে পারতেন।[31]

যাইহোক, আকবরের গুজরাট অভিযানের ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। গুজরাট অভিযানের মধ্য দিয়ে আকবর সর্বপ্রথম পর্তুগিজদের সংস্পর্শে এলেন। আকবর হজ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পর্তুগিজদের কাছ থেকে 'কার্তাজ' সংগ্রহ করলেও একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না যে, তিনি সক্রিয়ভাবে সামুদ্রিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। M. N. Pearson তাঁর *'The Portuguese in India'* গ্রন্থে বলেছেন,

> Akbar was prepared to take passes from the Portuguese in order to be allowed to send off his pilgrim ships. The object of the exercise was to send people to the Holy Cities; the means were subordinated to this end, and the traffic did not involve state political concern with the sea.[32]

তবে গুজরাট জয়ের ফলে পর্তুগিজদের সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন যেমন ব্যর্থ হল, অন্যদিকে তেমনি, আকবরের ব্যক্তিজীবনে পর্তুগিজ সংস্পর্শ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আকবরের ধর্ম চিন্তার বিবরণে এই যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যায় যে, মুঘল বাদশাহ আকবরের সঙ্গে পর্তুগিজদের সম্পর্ক ছিল কিছুটা টানাপোড়েনের। আকবর কখনো তাদের ছিলেন ঘনিষ্ঠ, আবার কখনোও শত্রুভাবাপন্ন। ঘনিষ্ঠ ছিলেন কারণ, পর্তুগিজ বণিকদের উপস্থিতির ফলেই নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছিল। নতুন বাজার গড়ে উঠছিল এবং মুঘল সরকারি কোষাগারে বাড়তি রাজস্ব জমা পড়ছিল। এর ফলে মুগল অর্থনীতি চাঙ্গা রূপ ধারণ করতে শুরু করে। তবে পর্তুগিজদের প্রতি মুঘল সম্রাটদের অসন্তোষ বাড়ার ফলে তারা ইংরেজ শক্তির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এর ফলে বিদেশি বণিকদের দ্বারা ভারতে বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ বাড়তে থাকে ফলে মুঘল অর্থনীতি বলীয়ান হয়েছিল। কিন্তু আকবর

একটা শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। এর ফলে সাম্রাজ্যের পতনের সময় নৌশক্তির অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় যে, আকবরের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক ছিল মিশ্র প্রকৃতির।

তথ্যসূত্র:

1 K. S. Mathew, 'Akbar and Portuguese Maritime Dominance', in Irfan Habib (ed.), *Akbar and his India*, New Delhi: Oxford University Press, 1997. pp. 256-266.

2 M. N. Pearson, *The Portuguese in India*, New York: Cambridge University Press, 1987, pp. 42-44.

3 Jorge Flores, *Unwanted Neighbours: The Mughals, the Portuguese, and Their Frontier Zones*, New Delhi: Oxford India Press, 2018.

4 Luis de Assis Correia, *Portuguese India and Mughal Relations, 1510-1735,* New Delhi: Broadway Publishing House, 2017.

5 Pius Malekandathil, *The Mughals, the Portuguese and the Indian Ocean: Changing Imageries of Maritime India*, New Delhi: Primus Books, 2016.

6 Jorge Flores, *The Mughal Padshah: A Jesuit Treatise on Emperor Jahangir's Court and Household*, London: Brill, 2015.

7 Nuno Vassallo e Silva & Jorge Flores, *Goa and the Great Mughal,* New York: Scala, 2011.

8 Afzal Ahmad, *Indo-Portuguese Diplomacy During the 16th and the 17th Centuries, 1500-1663*, New Delhi: Originals, 2008.

9 M. N. Pearson, 'Portuguese India and the Mughals', in *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 59, 1998, pp. 407-426.

10 K. S. Mathew, 'Akbar and Portuguese Maritime Dominance', in Irfan Habib (ed.), *Akbar and his India*, New Delhi: Oxford University Press, 1997.

11 Jagadish Narayan Sarkar, 'New Light on Mughal-Portuguese Relations-, 1665-67' (Based on Portuguese Sources), in *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 31, 1969, pp. 184-194.

12 শরিফুল বারী, ভারতে পর্তুগিজ বণিকদের ইতিহাস, ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী, ২০২১

13 শানজিদ অর্ণব, জোয়াকিম জোসেফ এ. ক্যাম্পস প্রণীত 'হিস্টরি অব দ্য পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল', ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৮

14 ইমতিয়াজ আহমেদ, 'দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগিজ বাণিজ্য', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮

15 অশীন দাশগুপ্ত, 'ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য ও রাজনীতি: ১৫০০-১৮০০', কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯

16 Charles Ralph Boxer, *The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825*, New York: Hutchinson, 1969, p. 48.

17 Rubi Maloni, 'Control of the Seas: The Historical Exegesis of the Portuguese "Cartaz"', in *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 72, 2011, pp. 476-484.

18 K. S.Mathew, op.cit. pp. 260-261.

19 M. K. Zaman, 'Akbar's Gujarat Campaign: A Military Analysis', in *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 55, 1994, pp. 313-318.

20 Manya Rathore, 'Between Court and Coast: Tracing the layers of Mughal-Portuguese relations (1570-1627)', Un-published PhD Dissertation, University of Wien, Vienna, 2018, pp. 64-66.

21 Mahmood Kooria, "Killed the Pilgrims and Persecuted Them": Portuguese *Estado da India's* Encounters with the Hajj in the Sixteenth Century, in Umar Ryad (eds.), *The Hajj and Europe in the Age of Empire,* New York: Brill, 2017, p.24.

22 Neelima Joshi, 'Sea Piracy during the Mughal Period (1556-1707): Major Players, Disposition and Motives', An article published by National Maritime Foundation, 29th March, 2016, retrieved from https://maritimeindia.org/wp-content/uploads/2021/02/29-3-2016-Sea-piracy-during-the-mughal-period1556-1707-Major-players-disposition-and-motives.pdf, on 28/11/2021 at 11:15 pm.

23 Jorge Flores, 'The Sea and the World of the Mutasaddi: A profile of port officials from Mughal Gujarat (c. 1600—1650)', in *Journal of the Royal Asiatic Society*, Third Series, Vol. 21, No. 1, January, 2011, pp. 55-71.

24 Ibid. pp.58-62.

25 Ravinder Kumar, 'Mughal's relation with Portuguese', in *International Journal of Applied Research*, 2(11), 2016, pp. 520-523.

26 Sanjay Subrahmanyam, 'A Note on the Rise of Surat in the Sixteenth Century', in *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 43, No. 1, 2000, pp. 23-33.

27 Colin Mitchell, 'The Deccan Frontier and Mughal Expansion, Ca. 1600: Contemporary Perspectives', in *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 47/3, 2004, pp. 357-389.

28 Naim R. Farooqi, 'Moguls, Ottomans, and Pilgrims: Protecting the Routes to Mecca in the Sixteenth and Seventeenth Centuries', in *The International History Review*, Vol. 10, No. 2, May, 1988, pp. 198-220.

29 S. R. Bakshi, and S. K. Sharma, *The Great Moghuls: Akbar* (Vol. 3), New Delhi: Deep and Deep Publications, 1999, p. 224.

30 Colin Mitchell, op.cit. pp. 380-381.

31 K. S. Mathew, op.cit. pp. 262-264.

32 M. N. Pearson, *The Portuguese in India*, p. 63.

মালদা জেলার নাট্যচর্চায় নেপথ্য শিল্পী

ইন্তাজুল হক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কোন একটি শো সফল শুধু নায়ক বা নায়িকার জন্যই পায় না। সফল শো করতে হলে আবহাওয়া, আলো, পোশাক, রূপসজ্জা, মঞ্চ সজ্জার জন্য অনেক গুণী ব্যক্তি থাকেন।যাঁরা পর্দার আড়াল থেকেই সমস্ত কিছুই করেন। যাঁদের নাম খুব কম লোকমানসে এসে থাকে। আমরা লক্ষ্য করেছি মালদা জেলার নাট্যচর্চার জগতে ঠিক তেমনি এক দৃশ্য। তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা আলো, আবহাওয়া ,রূপসজ্জা, মঞ্চ সজ্জায় অনেক বেশি হলেও মানুষ তাদের নাম জানেন না।তাঁদের কৃতিত্ব ও নাম
মালদা জেলার নাট্য জগতকে দৃষ্টিনন্দন করে।
সূচক/মূল শব্দ : আলো, আবহাওয়া, রূপসজ্জা ,মঞ্চ সজ্জা, পোশাক ।

মূল আলোচনা :

কোনো একটি শো সুন্দর করার পেছনে পর্দার আড়ালে শিল্পীদের অবদান অতুলনীয়। যে কোনও শো তো শুধুমাত্র একজন নায়ক বা নায়িকার বা পার্শ্ব চরিত্রের জন্যই শুধু সাফল্য পায় না। এমনকী কোনও অ্যালবামের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য না। সাউন্ড,মিউজিক, লাইট ডিজাইনার, এমনকী ইমপ্রেসারিও এঁদের সবার প্রচুর অবদান থাকে একটা সফল শো-এর পিছনে।কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এঁদের কাজ সম্পর্কে শ্রোতারা জানলেও, এঁদের নাম সব সময় উইংসের আড়ালেই থেকে যায়।তাই আমার চেষ্টা ' মালদা জেলার নাট্যচর্চায় নেপথ্য শিল্পী'দের অক্লান্ত পরিশ্রম যাতে তাঁদের নামের তালিকায় ইতিহাসের পাতায় থাকে তাই আমার এই চেষ্টা।

নাটকে আলো :

চল্লিশ এর দশকের প্রথম দিকে এ জেলায় মঞ্চে আলোর বিশেষ ব্যবহারের কথা ভাবায় যেত না। মূলত ডে নাইট বা হ্যাচাক বা কোথাও ইলেকট্রিকের বাতি জ্বালিয়ে নাটক মঞ্চস্থ হতো। সেই সময়ে মঞ্চে আধুনিক আলোর ব্যবহার নিয়ে আসেন কলিয়াচকের পুরুষোত্তম সোমানী মহাশয়। সেই সময়ে ' মালদা ড্রামাটি ক্লাবের ' প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই তিনি আলো ও মিউজিকের ব্যবহারের দায়িত্ব নিতেন। এরপর ১৯৪৮ সালের 'উপকরণ নাট্যবীধি' প্রযোজিত ' বেয়ারিং পোস্ট ' নাটকে যে আলো ব্যবহার হয়েছিল বার্লো স্কুলের মাঠে আক্ষরিক অর্থে সেটাই ছিল মালদহ জেলার নাটকের প্রথম আলোর ব্যবহার। নাটকটি ছিল রবি সেনের লেখা শ্রী নীরেন চৌধুরী

নির্দেশিত। ১৯৫২ সালের শ্রী পুরুষোত্তম সোমানী নাটকে আলো ও সঙ্গীতের নির্দেশকের ভূমিকায় আসেন। 'আলোতীর্থে 'নাটকটি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা, ' লাল সড়ক' নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শ্রী অহির ভূষণ রায়।

শহর কলকাতার মতো মালদা জেলাতেও তখন নাট্যচর্চার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ মালদাতে তখন জীবিকার কারণে কলকাতা সহ অন্যান্য জেলা থেকেও বহু শিক্ষিত মানুষেরা আসতে শুরু করেছেন ।সেই থেকেই বিনোদন এবং সৃষ্টিশীলতা মালদা জেলায় দেখা দিয়েছে। মূলত বি.দে হল আর টাউন হল এই মঞ্চেই তখন নাটক মঞ্চস্থ হতো।' দুঃখীর ইমান','তেরোই চৈত্র ', ' বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', এইসব নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর শহরে নাট্যপ্রেমী মানুষের মধ্যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। এই নাট্য আলোড়নের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিল ' মালদা ড্রামাটি ক্লাব', ' আলোক তীর্থ', ' শিল্পী পরিষদ'। এই অনুকূল বাতাবরণে শ্রী পুরুষোত্তম সোমানী নাটকের আঙ্গিকে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ব্যস্ত থাকতেন নিত্য নতুন আলোর প্রয়োগে। পারিবারিক দিক দিয়ে তাঁর এই পাগলামিকে কেউ মেনে নিতে পারেনি। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন তার ছেলে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি হোক। কিন্তু নাটক পাগল লোকের কাছে এইসব বাধা অন্তরায় হতে পারেনি। মালদা বি.দে হলের সাথে আজীবন যুক্ত থাকলেও জেলায় বা অন্য জেলার নাটকের তার অবদান কেউ ভুলতে পারেনি। নাটকের পাশাপাশি তিনি সিনেমাহলও চালু করেছিলেন বুলবুল চন্ডি এবং গাজোলে । কিন্তু বলা বাহুল্য এই পরীক্ষামূলক কাজে তিনি বিশেষ সফল হননি। সেই সময়ে তিনি গাজোল একটি নতুন নাট্যদলও গড়ে তুলেছিলেন। মালদা নাট্য জগতের পরিচালক অহিভূষণ রায় চাকরি সূত্রে গাজোলে ট্রান্সফার হয়ে নাট্যদল তৈরির কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।গাজোলে তিনি তখন বেশ কয়েকটি নাটকও মঞ্চস্থ করলেন। আলো আর আবহ সংগীতে ছিলেন পুরুষোত্তম বাবু। তখন মালদহে স্পট বা ডিমারের ব্যবহার আসেনি। সাবেকি সরঞ্জাম দিয়ে মঞ্চে আলোর প্রয়োগ করা হতো। পূর্ণমাত্রায় আলোর ব্যবহার ও আবহের প্রয়োগ হয়েছিল বি.দে হলে 'কালিন্দী' নাটক।'আলোক তীর্থের' প্রযোজনায় এই নাটকে প্রথম পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেন পুরুষোত্তম বাবু। এই নাটকটির পরিচালক ছিলেন শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সেই সময় থেকেই পুরুষোত্তম বাবু একটি আলোক সম্পাদনা কাজ চালাতে। এই নাটকে স্পট লাইটের ব্যবহার হয় চৌকোনা বক্সের মধ্যে হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে।

১৯৬৫ সালে 'ফেরারী ফৌজ ' নাটকে বোমার আঘাতে ব্রিজের ওপর জিপগাড়ি উঠিয়ে দেওয়ার দৃশ্যে আলোর মুন্সিয়ানা দেখিয়ে পুরুষোত্তম সো মামানী রাজ্য পর্যায়ে স্বীকৃতি পান। পরবর্তীকালে কালের নিয়মেই আলোক নিয়ন্ত্রণে অনেক আধুনিকতা এসেছে। আলো নিয়ে অনেক ভাল ভাল কাজেও হয়েছে। তবে সমস্ত কিছুই মুষ্টিমেয় কয়েকটি দলের। বেশিরভাগ সংস্থাতেই আলোর ব্যাপারে ইলেকট্রিক হাউসের শরণাপন্ন

হতে হতো বা ভাড়া করা আলোর সাহায্য নিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে যে কজন কৃতী নাট্যকর্মী 'আলোক সম্পাত ' বিভাগকে নিজস্ব ভাবনা চিন্তা দিয়ে পুষ্ট করেছেন তারা হলেন - মনীন্দ্রনাথ দে, ননী কর্মকার, গোপাল চক্রবর্তী, দীপক মৈত্র, চন্দন মৈত্র, দীপক চক্রবর্তী (চাঁচল দিশার), সুনির্মল দাস (শিল্পী চক্র),হিরোন পদ্দার (চাঁচল গণনাট্য সংঘ), তন্ময় কুন্ডু (হরিশ্চন্দ্রপুর পিপলা কৃষ্টি সংসদ), সুনীল দাস (গাজোল, বিষাণনাট্য সংস্থা), ভৈরব সাহা (মালদা মালঞ্চ) প্রমূখ। এখন অবশ্য জেলার বাইরের বিভিন্ন আলোক শিল্পীরাও এ জেলার নাটকে আলোক পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং বর্তমানে নাটক আলোর ব্যবহারে যথেষ্ট ভূমিকা নিচ্ছেন ।

নাটকে আবহ :

চল্লিশের দশকের প্রথম দিক থেকেই এ জেলায় নাট্যচর্চা শুরু হয় আর নাটককে মঞ্চ সরগরম করাতে আবহাও বিশেষ প্রয়োজন। এই জেলায় যাঁরা নাটকে আবহও পরিবেশন করেন তাঁরা হলেন - আশিষ উপোধ্যায়(ইংরেজ বাজার), দেব সিং রায় (ইংরেজ বাজার), সোনামুনি রায় (ইংরেজ বাজার), কাজল সরকার (ফারাক্কা),ভাস্কর দাস(ওল্ড মালদা),পূজা চৌধুরী (সামসি), দেবদুলাল চক্রবর্তী (কলিগ্রাম), দীপা চক্রবর্তী (চাঁচল), দীপক চক্রবর্তী (চাঁচল)কৃষ্ণা বসু ও আশিষ উপোধ্যায়া (গাজোল), রতন সরকার (হরিশ্চন্দ্রপুর) ।

নাট্যমঞ্চ ব্যবস্থাপক :

মালদা জেলা অভিনয়ের জেলা। চারের দশকের প্রথম দিক থেকে এ জেলায় নাট্যচর্চা চলে আসছে। কোন নাটককে মঞ্চস্থ করতে হলে মঞ্চের অনেকগুলি কাজ করতে হয়। তাঁর মধ্যে মঞ্চ ব্যবস্থা অন্যতম। আর এই ব্যবস্থা করে থাকেন নাট্য দলের মঞ্চ ব্যবস্থাপক। যাদের নাম পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। যাঁরা না হলে নাট্যমঞ্চস্থ করা দুরূহ ব্যাপার। যাঁদের নাম কোন বড় পর্দার কোনেও থাকে না। তবে এ জেলার বিভিন্ন নাট্যদলের মঞ্চ ব্যবস্থাপকরা হলেন - ডেভিড হালদার (ইংরেজ বাজার),নয়ন দাস,দীপংকর দাস,অজয় দাশগুপ্ত (সামসি),অজিত পান্ডে, সুকুমার রায়, ডিলু সরকার,গোপাল সরকার,তপন ভট্টাচার্য (কলিগ্রাম),বৈদ্যনাথ বসাক,কৃষ্ণ সরকার, চিনু গুপ্ত, হরি রাম ঠাকুর(চরি - অনন্তপুর,কলিয়াচক),তন্ময় সরকার,মিলু রায়,অজয় দাশগুপ্ত (ফারাক্কা), জয়ন্ত দাস,পল্লবী রায়,রথীন চৌধুরী, বিশ্বজিৎ দাস (বামন গোলা) মিহির দাস, বনলতা সেন, কমল চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন সাহা (হরিশ্চন্দ্রপুর), গদাধর রায়, ভীম সরকার,মাধব সাহা,রাজবহাদুর নুনিয়া (গাজোল) ।

রূপসজ্জা শিল্পী :

নাটকের কলাকুশলীদের রূপসজ্জা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মালদা জেলায় বহু নাট্য দলে বহু গুণি রূপ সজ্জাশিল্পী আছেন। তাঁরা হলেন -সুদীপ্তা তরফদার, সহেলি ঘোষ(বিষাণ নাট্য সংস্থা), মাখন চন্দ্র পান্ডে, মিতা দাস (চুরি অনন্তপুর নওজোয়ান সংঘ), চন্দনা চট্টোপাধ্যায়, আঁখি রায়(চাঁচল অপাংক্তেয়), অতিশ লাহিড়,রীনা সরকার

(কলিগ্রাম বিবর্তন নাট্যগোষ্ঠী), পৌলমী সরকার (কলিগ্রাম শিল্পী চক্র), প্রকাশ রায়, সতেশ রায় ও জুলি রায় (চাঁচল কম্পাস), দীপিকা সরকার, বৈশালী বিশ্বাস (সামসি কলেজ নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র), বিধাত্রী দেব সরকার, কণা রায় (মালদা আগামী), দেবলীনা দাস ,কৃষ্ণা ত্রিবেদী, সতীশ চন্দ্র রায় (মালদা মালঞ্চ), অরুণ কুমার রায়, রিতা চক্রবর্তী (সমবেত নাট্য সংস্থা)। এছাড়াও মালদা জেলায় বহু নাটক দল আছে। যাঁদের নির্দিষ্ট রূপসজ্জার শিল্পী নেই। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের রূপসজ্জা করে থাকেন।

নাটকে ব্যবহৃত গানের সুরকার :

মালদা জেলাতে যে সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তাতে সঙ্গীতের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে অনেকগুলি নাটকেই ।তবুও অত্যন্ত সচেতনভাবে নাটকে গানের ব্যবহার করে গণনাট্য সংঘের শিল্পীবৃন্দ ।বলা যায় ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য সংঘ নবরূপে নবচেতনায় গড়ে উঠল।জনগণের সমস্ত বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনায় ও সংগ্রামে সাথী হয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ উত্তরবঙ্গেরও সমস্ত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ল।ছয়টি জেলা বিশিষ্ট উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা মালদাতেও গণনাট্য শাখার পরিচালনায় ১৮৪৫-৪৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গণ সঙ্গীতের পরিশীলিত অনুশীলন ও চর্চা লক্ষ্য করা যায়।এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন নরহত্যা নর অঞ্চলের সতীশ মন্ডল,ইংরেজবাজারের নজরুল ইসলাম, নরহাট্টার রমণী পাল,মকদম পুর তেলীপাড়ার জিতেন শর্মা,রামকৃষ্ণ পল্লীর পুষ্পজিত রায়,সাহাপুর নিবাসী চন্দন নন্দী,ইংরেজবাজারের দোকড়ি চৌধুরী,পিরোজপুর অঞ্চলের অঞ্জন সেনগুপ্ত,ইংরেজবাজারের স্বপন দে,শ্রী শশীষ সাহা, সমীর মুখার্জী,প্রশান্ত মিশ্র,বিনয় রায়,তুফান সরকার,পার্থ বন্দোপাধ্যায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয় ড্রামা ক্লাবের সায়ন পরিয়াল ও স্বেতাংশু পান্ডে ,মালদা মালঞ্চের দেবলীনা দাস ,রতুয়ার কিশোর রায়, সামসি কলেজ নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূজা চৌধুরী, বিষাণ নাট্য দলের আশিষ উপোধ্যায়,ফারাক্কা মহাদেব পুরের কাজল সরকার,মালদা সমবেত সংস্থার শরদিন্দু চক্রবর্তী,মালদা আগামীর জয়ন্ত বিশ্বাস ও বিকাশ সাহা, চাঁচলের সুভাষ মন্ডল ও তপন ভট্টাচার্য প্রমূখ। এ জেলায় বহু নাট্যদল আছে যাদের আলাদা করে সঙ্গীত শিল্পী নেই। বহু দলের কর্ণধাররা জানান যে তারা দলে সমবেত সঙ্গীত বা গান পরিবেশন করে থাকেন।

তথ্যসূত্র :

১. সাক্ষাৎকার : নাম - ঘোষ, রঞ্জিত, বয়স - ৪৫ বছর, পেশা - হিসাব রক্ষক (সামসি কলেজ) বিশেষ পরিচয় -বিশিষ্ট সমালোচক ও প্রাবন্ধিক,আর্থিক স্তর - মধ্যবিত্ত, ঠিকানা- গঙ্গাদেবী, সামসি ,মালদা ,তারিখ - ২৫.০১. ২০২০২৩ , গ্রহীতা - ইন্তাজুল হক, স্থান - পূর্ব পাড়া, চাঁচল ,মালদা।

২. সাক্ষাৎকার : নাম - আলি, সজিরুদ্দিন , বয়স - ৫৭ বছর, পেশা - প্রধান শিক্ষক (মালদা ওসমানিয়া মডেল হাই মাদ্রাসা) বিশেষ পরিচয় -বিশিষ্ট

সমালোচক ও প্রাবন্ধিক, আর্থিক স্তর - উন্নত, ঠিকানা- পুরাতন মালদা, মালদা, তারিখ - ২৫.০১. ২০২৩ , গ্রহীতা - ইন্তাজুল হক, স্থান - পুরাতন মালদা,মালদা।

৩. সাক্ষাৎকার : নাম - হোসেন , আকমাল , বয়স - ৪৫ বছর, পেশা - শিক্ষক বিশেষ পরিচয় - বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক,আর্থিক স্তর -মধ্যবিত্ত, ঠিকানা- জালাল পুর, কালিয়াচক, মালদা ,তারিখ - ২৫.০৭. ২০২২ , গ্রহীতা - ইন্তাজুল হক, স্থান - জালাল পুর,কালিয়াচক ,মালদা।

৪. সাক্ষাৎকার : নাম - বর্মন, অভিষেক, বয়স - ৪১ বছর, পেশা - revenue inspector of English bajar)বিশেষ পরিচয় -বিশিষ্ট সমালোচক ও নাট্য অভিনেতা, আর্থিক স্তর -মধ্যবিত্ত, ঠিকানা- মোথাবাড়ি,মালদা ,তারিখ - ২৩.০৭. ২০২২, গ্রহীতা - ইন্তাজুল হক, স্থান - নিজস্ব বাসভবন, মোথাবাড়ি ,মালদা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য ,মলয়শঙ্কর,- " মালদহ চর্চা" ২য় খন্ড (সম্পা), বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা, কলকাতা ৭০০০০৯ । প্রথম প্রকাশ : ২০১২ । ISBN :৯৭৮ - ৮১- ৯০৬৪৮৪- ৯- ৩১।

২. সরকার, রঞ্জিত,দত্ত ,কঙ্কন - "বাঙলা ও বাঙালি",(সম্পা), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,কলকাতা ৭০০০০৯ ।প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২১ । ISBN : ৯৭৮-৯৩-৯০৯৯৩- ৫৬- ৭ ।

৩. চক্রবর্তী, মনোবিনোদ,- "উত্তরবঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন মালদা ড্রামাটিক ক্লাব ও শতাব্দী বি.দে হলের ইতিহাস"। অসীম সেন প্রকাশক, ইমেজ প্রিন্টিং প্রেস চাঁচল, মালদা ।প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২

গঙ্গা নদীর জলবন্টন সমস্যা ও ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত

মেঘমিত্রা বিশ্বাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ,
চাকদহ কলেজ

সারসংক্ষেপ : বর্তমান প্রবন্ধটিতে গঙ্গা নদীর জলবন্টন সম্পর্কিত ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা বিষয়ে আলোচোনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গঙ্গা নদীর উচ্চ উপত্যকায় ভারত ও নিম্ন উপত্যকায় বাংলাদেশ অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক থেকে ভারত বিশেষ সুবিধা পেত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবেশগত তথা অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়টিকে ভারত সর্বদাই অগ্রাহ্য করেছে। বাংলাদেশও সর্বদাই তার অস্তিত্ব সংকট অনুভব করত। ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় তার মধ্যে কাজ করত। এই কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অযথা ইসলামিক দেশ তথা জাতিপুঞ্জের মঞ্চে তুলে সমস্যা জটিল করে তুলেছিল। ইসলামিক দেশগুলির বার্ষিক অধিবেশনে গঙ্গা জলবন্টন সমস্যার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সহমর্মিতা লাভ করে ভারতকে চাপে রাখতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মৌলবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উস্কানি ছিল প্রবল। বর্তমান প্রবন্ধটিতে গঙ্গা নদীর জলবন্টনকে কেন্দ্র করে দুই দেশের অভাব-অভিযোগ, দুই দেশের ভূমিকা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বাস্তুতন্ত্রের সমস্যা, মানবিক সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পালাবদল এই দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে কী প্রভাব ফেলেছে, তা-ও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল প্রবন্ধ:

ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ তথা গোটা সভ্যতা সেই বৈদিক যুগ থেকে আজও গঙ্গা নদীর সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই নদী একদিকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মিথের জন্ম দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন যুগে গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে মহাজনপদের উত্থান ও দ্বিতীয় নগরায়ণের সূচনা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে মগধকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। সেই সঙ্গে গঙ্গা নদীর রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে থাকে। বর্তমানে গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ধারা অন্যমাত্রা পেয়েছে। বর্তমানে গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া প্রধান বিষয়টি হল— ভৌগোলিকভাবে যেসব দেশের মধ্যে দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেসব দেশ ঠিক কতটা পরিমাণ গঙ্গার জল নিজেদের দেশের

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে তা নির্ধারণ করা। অর্থাৎ জলবন্টনকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, তার উৎসটা ঠিক কোথায়, জলবন্টন নিয়ে উভয় দেশের চাহিদা কী, সর্বোপরি এই সমস্যার প্রকৃতি কীরূপ তা বর্তমান প্রবন্ধে খোঁজার চেষ্টা করা হবে। যে-কোনো দেশের আর্থিক সম্পদ বিকাশে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে নদী হল তার সম্পদ। কারণ, নদীর জল কৃষি তথা অকৃষিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গঙ্গা নদীর উচ্চ উপত্যকায় ভারত ও নিম্ন উপত্যকায় বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অবস্থান করায় গঙ্গার জল কোনো দেশ কত পরিমাণে নিজেদের দেশের জন্য ব্যবহার করতে পারবে সেই নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনও নদীর জলের ব্যবহার্যতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

ভারত সরকার ফারাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের মাধ্যমে গঙ্গা নদী থেকে ৪০,০০০ কিউসেক জল শুষ্ক সময়ে রিভার ক্যানেলের মাধ্যমে গঙ্গার শাখা নদী ভাগীরথী-হুগলী নদীতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাগীরথী-হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করে কলকাতা বন্দরের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। অপরদিকে বাংলাদেশ গঙ্গার নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় ফারাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের ফলে স্বভাবতই তার পক্ষে পর্যাপ্ত জল পাওয়া সম্ভবপর নয়। এই জলের অসমবন্টনকে কেন্দ্র করেই ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার জলবন্টনগত সমস্যার সূত্রপাত।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনোত্তর পর্বে, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে গঙ্গানদীর উপর ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত ছিল উচ্চ উপত্যকায় ও পূর্ববঙ্গ ছিল নিম্ন উপত্যকায় অবস্থিত। ১৯৫০-এর প্রথমদিকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে হুগলী নদীর ওপর গড়ে ওঠা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ও গঙ্গানদী ব্যারেজের প্রভাব বিষয়ক একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। মান সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত এই বিশেষজ্ঞ কমিটি সমীক্ষা চালিয়ে পরিষ্কার রিপোর্ট দেয় যে, গঙ্গানদী প্রকল্প উত্তরোত্তর অবক্ষয় হয়ে চলেছে। এই হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার পশ্চিম জার্মানির বিখ্যাত হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ার ড. ওয়াল্টার হেনসনকে নিয়োগ করেছিল। তিনি হুগলী নদী স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে, এ বিষয়ে গবেষণা করে জানান যে, গঙ্গা প্রকল্পকে রক্ষা করার একমাত্র উৎকৃষ্ট সমাধান হল গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ, যার মাধ্যমে গঙ্গার জল ভাগীরথী-হুগলী নদীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এর ফলে শিল্পাঞ্চল কলকাতায় জলের চাহিদাও যেমন মিটবে, তেমনি হুগলী নদী পার্শ্ববর্তী কৃষি অঞ্চলে উর্বরতা বাড়বে। এছাড়া হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেলে বর্ষার সময় বন্যার সম্ভাবনাও অনেক কম থাকবে। এই উদ্দেশ্যেই ভারত সরকার ১৯৬১

সালে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, যার ফলে গঙ্গার নিম্ন অববাহিকায় অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে জলপ্রবাহ অনেক কমে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প রূপায়িত হোক তা পাকিস্তান সরকার কোনোভাবেই চায়নি। ভারত সরকার ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে যুক্তি খাড়া করেছিল, তার সত্যতা যাচাই করার জন্য পাকিস্তান সরকার আমেরিকার দুইজন বিশেষজ্ঞকে এ বিষয়ে নিয়োগ করেছিল। আমেরিকান দুই বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে সমীক্ষা করে, গত পনেরো বছরে হুগলী নদীর জলপ্রবাহ কমে যাওয়ার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি। হুগলী নদীতে লবণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসাবে দেখিয়েছিলেন, বন্যার ফলে পলি জমে যাওয়া এবং দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীতে জলপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ। ফলে ফারাক্কা ব্যারেজ গঠনের আগে থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তানের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল যে, হুগলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ফারাক্কা ব্যারেজের নির্মাণ সম্পূর্ণভাবেই অযৌক্তিক। বরং এই ব্যারেজ নির্মাণ হলে পূর্ববঙ্গে জল সংকটের সৃষ্টি হবে এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের গোটা অর্থনীতি গঙ্গার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই পূর্ববঙ্গ কোনোভাবেই ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পকে মেনে নিতে পারেনি। পূর্ববঙ্গের মতামত গ্রহণ না করে ভারতের একতরফা চাহিদায় ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণকে বাংলাদেশ তাদের সম্মান ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করত। এর ফলে ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর থেকেই ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে গঙ্গার জলবন্টনকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যেমন উত্তপ্ত হয়েছিল, তেমনই অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও জলবন্টনকে কেন্দ্র করে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর উভয় দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ফারাক্কা ব্যারেজ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রতিনিধি মিঃ বি. এম. আব্বাস, জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী ভারত সফরে এসে ভারতের জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী ডঃ কে. এল. রাও এবং বিদেশমন্ত্রী শরণ সিং-এর সাথে ফারাক্কা প্রকল্প নিয়ে এক বৈঠক করেন। বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল যৌথভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। এর পরবর্তীতে ১৯৭২-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান ভারত সফরে এসে উভয় দেশের বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রক্ষা করে উভয় দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে বৈঠক করেছিলেন। উভয় দেশ একযোগে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে, সেচপ্রকল্প উন্নয়নে ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে রাজি হয়েছিল। এই বৈঠকের ভিত্তিতেই ১৯৭২-এর ১৭ই মার্চ উভয় দেশের মধ্যে ২৫ বছরের জন্য বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

উভয় দেশ যাতে সহজে একযোগে কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯৭২-এর ২৪শে নভেম্বর যৌথভাবে ‘জয়েন্ট রিভার’ কমিশন গঠিত হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে

উল্লেখ্য যে, জয়েন্ট রিভার কমিশনের বৈঠকে গঙ্গা জলবন্টনের পরিমাণের কোনো উল্লেখ ছিল না। তবে ভারতের তরফ থেকে বাংলাদেশকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, বর্ষার সময় গঙ্গার শাখা নদী ও জঙ্গিপুর ব্যারেজ একসঙ্গে কাজ করবে যাতে প্রয়োজনে আগের তুলনায় অনেক বেশী জল ভাগীরথী নদী বহন করতে পারে। এছাড়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ফারাক্কা ব্যারেজ কোনোভাবেই বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করবে না।

১৯৭৪ এর ১৯শে মে পুনরায় উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীগণ এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। উভয় দেশ স্থির করেছিল যে, ফারাক্কা ব্যারেজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই যৌথ সমাধান সূত্রে পৌঁছাতে হবে। ফারাক্কা ব্যারেজ উদ্বোধন হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভারত সর্বদা সমঝোতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। ১৯৭৪-এর ১৬ই মে উভয় দেশের পক্ষ থেকে জয়েন্ট রিভার কমিশন এক ইস্তাহার প্রকাশ করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে, গঙ্গার জল যখন শুষ্ক সময়ে কম থাকে তখন কলকাতা পোর্ট তথা বাংলাদেশে তীব্র জলসংকট সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় জয়েন্ট রিভার কমিশনের প্রধান কাজ হবে জলসম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করা, যাতে উভয় দেশই সন্তোষজনকভাবে গঙ্গার জল ব্যবহার করতে পারে। এই মৈত্রীসূচক চুক্তিকে বাংলাদেশের ইংরাজি দৈনিক পত্রিকাগুলিতে *'Fraternal Understanding'* বলে উল্লেখ করেছিল। ভারত এই চুক্তির মাধ্যমে এক বড় কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল, যাতে ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে ভারতকে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে না হয়। এই কারণে ভারত সর্বদা যৌথ সিদ্ধান্তের আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৪-এর ৬-৮ই জুন পুনরায় জয়েন্ট রিভার কমিশনের যে বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে জলপ্রবাহ বৃদ্ধির বিষয়ে কোনো দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে বৈঠকগুলির আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা না করেই গঙ্গার জলের ব্যবহারযোগ্যতার উপর নজর দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৫-এর এপ্রিলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জলবন্টন নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল। উভয় দেশের চরম মত পার্থক্যের কারণে বৈঠকের প্রথম দুদিন কোনো চুক্তি সম্পাদন করা যায়নি। তৃতীয় দিন ১৮ই এপ্রিল *'Ad hoc'* চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মি. জগজীবন রাম, বাংলাদেশের মন্ত্রী মি. আব্দুর রাবনাসারনাবাতের সাথে ৪১ দিনের জন্য এই চুক্তি সম্পাদন করেন। *'Ad hoc'* চুক্তি দ্বারা স্থির করা হয় যে, রিভার ক্যানেলের মাধ্যমে ভারত এপ্রিল-মে মাসে অর্থাৎ শুষ্ক সময়ে ১১,০০০ থেকে ১৬,০০০ কিউসেক জল প্রত্যাহার করবে, অপরদিকে বাংলাদেশ শুষ্ক সময়ে ৪০,০০০ কিউসেক জল নিতে পারবে এবং বলা হয়েছিল যে, যে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছে, তাদের প্রধান কাজ হবে এই হারে জল প্রত্যাহার করে উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কতটা মিটছে এবং কোন্ দেশ ঠিক কতটা জল

প্রত্যাহার করছে, তা ফারাক্কাতে অবস্থান করে পরিমাপ করে উভয় প্রশাসনকে জানানো।

'Ad hoc' চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হন কে. মুস্তাফ আহমেদ। মুজিবর রহমানের মৃত্যু ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সমীকরণকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। বলা যেতে পারে যে, গঙ্গা জলবন্টনকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, যার সময়সীমা ১৯৭৫-এর আগষ্ট থেকে ১৯৭৭ এর মার্চ পর্যন্ত। মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৭৫-এর ১৮ই ডিসেম্বর প্রথম দুই দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। যেখানে *Ad hoc* চুক্তি লঙ্ঘন করে ভারতের পুনরায় ৪০,০০০ কিউসেক জল প্রত্যাহারের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র ১৯৭৬-এর ১৫ই জানুয়ারি ভারতে পাঠানো হয়েছিল। ভারত তার বিরুদ্ধে আসা একতরফা জল প্রত্যাহারের দাবি নাকচ করে জানায় যে, *'Ad hoc'* চুক্তিটি ঐ বছরের শুধুমাত্র শুষ্ক সময়ের জন্য করা হয়েছিল। শুষ্ক সময়ের পরবর্তী ক্ষেত্রে ঐ চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

১৯৭৬-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি শুষ্ক সময়ে গঙ্গার জল ন্যায়সংগতভাবে বন্টন করার বিষয়ে আলোচনার জন্য ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশ একটি চিঠি প্রেরণ করেছিল। ভারত জানিয়েছিল যে, শুষ্ক সময়কালটি হল মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। তবে বাংলাদেশ শুষ্ক সময়ের এই ধারণা কোনো মতেই মেনে নেয়নি। বাংলাদেশের অভিযোগ ছিল যে, মার্চ থেকে মে মাস অতি সংকটজনক সময়। তবে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যেই পড়ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, ফারাক্কা ইস্যু বিষয়ক বৈঠককে দৈনিক সংবাদপত্রগুলি *'Meaningless'* বলেছিল। ১৯৭৬-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত ভারত বা বাংলাদেশ, কোনো দেশই জলবন্টন বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়নি। ১৯৭৬-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকার জলবন্টন বিষয়ে এক শ্বেতপত্র পেশ করেছিল। বাংলাদেশ সেখানে সরাসরি অভিযোগ করেছিল যে, ভারত একতরফাভাবে গঙ্গা থেকে জল প্রত্যাহার করছে বলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকটাপন্ন। এর বিরুদ্ধে ভারত বলেছিল যে, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে এবং ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ফারাক্কা ব্যারেজ কোনোভাবেই বাংলাদেশের ক্ষতি করছে না। আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কৃষি ও নৌ-চলাচল বিপর্যস্ত হচ্ছে, তার সমাধান বাংলাদেশ সরকার ভারতের জল প্রত্যাহারের বিরোধিতা ছাড়াই করতে পারবে। অর্থাৎ ভারত দেখাতে চেয়েছিল যে, ফারাক্কা ব্যারেজ কোনোভাবেই বাংলাদেশে সংকটের সৃষ্টি করছে না। বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার চালাচ্ছে। লবণতার মাত্রা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের ইকো সিস্টেম নষ্ট হচ্ছে— বাংলাদেশ এই অভিযোগের বিরুদ্ধে

ভারত জানিয়েছিল যে, ভারতের মধ্যে অবস্থিত সুন্দরবন অঞ্চলে ইকো সিস্টেম নষ্টের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল 'লং মার্চ', যা ছিল অসংখ্য বাংলাদেশীর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল। মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। এই 'লং মার্চ' হওয়ার পূর্বেই ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে সুষম জলবন্টনের জন্য ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী এর প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন যে, ফারাক্কার ব্যারেজ নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্যই হল কলকাতা বন্দরকে রক্ষা, যা পূর্ব ভারতের জন্য জীবনদায়ী। তিনি আরও জানান যে, দুই মাস শুষ্ক সময়ের জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতাই যথেষ্ট। ভাসানী প্রত্যুত্তরে শ্রীমতি গান্ধীকে স্বচক্ষে বাংলাদেশের জল সঙ্কটের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে যেতে বলেছিলেন। ভারতের তরফ থেকে কোনো সদর্থক প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় ভাসানী 'লং মার্চ' করেছিলেন। এই লং মার্চ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন— *'Just demand of Bangladesh on the sharing of the Ganges water.'*

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক তথা অরাজনৈতিক মহল— সকলেরই বক্তব্য ছিল যে, ভারতের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে যখন কোনো স্থায়ী সমাধানই হয়নি, তখন আর্ন্তজাতিক ইস্যু হিসাবে এই সমস্যাকে তুলে ধরে বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোক। এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েই বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬-এর ১৩ই মে সপ্তম ইসলামিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আর্ন্তজাতিক ইস্তাম্বুল সম্মেলনে ফারাক্কা ব্যারেজ ইস্যুটিকে তুলে ধরেছিল। বাংলাদেশ অনান্য দেশের প্রতিনিধিদের সামনে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে, ফারাক্কা ব্যারেজের জন্য বাংলাদেশ সুষ্ঠু জলবন্টন প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তুর্কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৭৬-এর আগস্টে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির কলম্বো সম্মেলনে বাংলাদেশ ফারাক্কা সমস্যাটিকে তুলে ধরেছিল। তবে বাংলাদেশ সেভাবে কোনো সহানুভূতি পায়নি।

১৯৭৬-এর ২৩ শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরাসরি জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ফারাক্কা ব্যারেজ সংক্রান্ত সমস্যাকে উপস্থাপন করেছিল। বাংলাদেশের এই মনোভাবের প্রতি ভারত তীব্র বিরোধীতা করে। ভারতের বক্তব্যই ছিল গঙ্গা জলবন্টন সমস্যাটি দ্বিপাক্ষিক সমস্যা, এই সমস্যাকে রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে এনে অহেতুক জটিল করার কোনো মানেই হয় না। বাংলাদেশ ভারতকে উপেক্ষা করে গঙ্গা জলবন্টন সমস্যা বিষয়ে জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে বিশেষ রাজনৈতিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব রেখেছিল। বাংলাদেশের প্রস্তাবানুসারে জাতিপুঞ্জ বিশেষ রাজনৈতিক কমিটির বৈঠক ১৫, ১৬ ও ২৪শে নভেম্বর আহ্বান করেছিল। এই বৈঠকে ভারতের তরফে প্রতিনিধি ছিলেন জগজীবন রাম ও বাংলাদেশের তরফে প্রতিনিধি ছিলেন এম. এইচ. খান। এম. এইচ.

খান ফারাক্কা ইস্যুর জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোর, একগুয়ে মনোভাব দেখিয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকের অসহনীয় মনোভাবকে ভারত সমস্যার জটিলতার জন্য দায়ী করেছিল। এছাড়া, এম. এইচ. খান প্রথম থেকেই ভারতের অপছন্দের ব্যক্তি ছিল। কারণ ১৯৭৬-এর ৯ই সেপ্টেম্বরে যখন তিনি ভারত সফরে এসেছিলেন, তখন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সাথে তাঁর প্রকাশ্য বিবাদ হয়েছিল এবং তিনি সভা পরিত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে শ্রীমতি গান্ধী যথেষ্ট অপমানিত হয়েছিলেন।

১৯৭৭-এর এপ্রিল থেকে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নয়া মোড় এনে দিয়েছিল। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি রাখার জন্য শ্রীমতি গান্ধী সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ভোটে পরাজিত হন। অপরদিকে জনতা সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করেছিল। জনতা সরকার প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে নতুনভাবে আলাপ-আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৭-এর ১৫ই এপ্রিল তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম ঢাকা সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে আলোচনা নয়, বাংলাদেশের সাথে ভারতের যত দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়েছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে সমাধান সূত্র খোঁজা। জনতা সরকারের আমলে দীর্ঘ পাঁচ মাস চুক্তি বিষয়ে দর কষাকষির পর ১৯৭৭-এর ৫ই নভেম্বর দ্বিপাক্ষিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিতেই ভারত প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গাকে আন্তর্জাতিক নদীর মর্যাদা দিয়েছিল। নীচের সারণীর মাধ্যমে জলবন্টনের পরিমাণ দেখানো হল—

১৯৭৭-এর জলবন্টন

সময়সীমা	৭৫% প্রাপ্যতা, রেকর্ড ১৯৪৮-৭৩	গঙ্গা নদী থেকে ভারতের জল প্রত্যাহার (কিউসেকের হিসেবে)	গঙ্গা নদী থেকে বাংলাদেশের জলপ্রত্যাহার (কিউসেকের হিসেবে)
জানুয়ারি			
১-১০	৯৬,৫০০	৪০,০০০	৫৮,৫০০
১১-২০	৮৯,৭৫০	৩৮,৫০০	৫১,২৫০
২১-৩১	৮২,৫০০	৩৫,০০০	৪৭,৫০০
ফেব্রুয়ারি			

সময়সীমা	৭৫% প্রাপ্যতা, রেকর্ড ১৯৪৮-৭৩	গঙ্গা নদী থেকে ভারতের জল প্রত্যাহার (কিউসেকের হিসেবে)	গঙ্গা নদী থেকে বাংলাদেশের জলপ্রত্যাহার (কিউসেকের হিসেবে)
১-১০	৭৯,২৫০	৩৩,০০০	৪৬,২৫০
১১-২০	৭৪,০০০	৩১,৫০০	৪২,৫০০
২১-২৮/২৯	৭০,০০০	৩০,৭৫০	৩৯,২৫০
মার্চ			
১-১০	৬৫,২৫০	২৬,৭৫০	৩৮,৫০০
১১-২০	৬৩,৫০০	২৫,৫০০	৩৮,০০০
২১-৩১	৬১,০০০	২৫,০০০	৩৬,০০০
এপ্রিল			
১-১০	৫৯,০০০	২৪,০০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৫,৫০০	২০,৭৫০	৩৪,৭৫০
২১-৩০	৫৫,০০০	২০,৫০০	৩৪,৫০০
মে			
১-১০	৫৬,৫০০	২১,৫০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৯,২৫০	২৪,০০০	৩৫,২৫০
২১-৩১	৬৫,৫০০	২৬,৭৫০	৩৮,৭৫০

বলা যেতে পারে, ১৯৭৭-এর চুক্তিটি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি *'Break Through'* ছিল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভারতীয় গবেষক জয়ন্ত কুমার রায় ১৯৭৭-এর চুক্তি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, *'For India's Poor performance*

in Farakka diplomacy, it was India's Central leadership which is to blame.' এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ঠিক একমাস পরই ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রিজাউর রহমান ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। ভারত সফরে আসার সুবাদে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ১৯শে ডিসেম্বর একটি বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে উভয় দেশের পক্ষ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, জয়েন্ট রিভার কমিশনকে আপগ্রেড করতে হবে, যাতে যথা সময়ে কমিটি তথ্য সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে পারে। সেদিন রাতেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মি. এস. রেড্ডি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭৭-এর চুক্তিকে *'most notable achievments'* বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯৮০-তে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭৯-এ জনতা সরকারের মধ্যে দলীয় দ্বন্দ্বের ফলে নতুন নির্বাচন করতে সরকার বাধ্য হয়েছিল। সেই সময় ১৯৮০-র জানুয়ারিতে ভোটে জয়লাভ করে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীত্বে ফিরে আসেন। ১৯৮০-র প্রথম থেকেই গঙ্গার জলপ্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে কমতে থাকে। ১৯৮০-র মার্চে ৩৩.৪% ও এপ্রিলে ২৭.৪% প্রবাহ কমে গিয়েছিল। কংগ্রেস সরকার পূর্ববর্তী জনতা সরকারে ১৯৭৭-এর চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিল। ভারতের জলসেচ মন্ত্রীর তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, কলকাতা বন্দরের জন্য ৪০,০০০ কিউসেক জল অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে সরকার পক্ষ তথা বিরোধী পক্ষ— উভয়ই প্রধানমন্ত্রী, জলসেচমন্ত্রী ও পরিবহন মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। তাঁদের বক্তব্যই ছিল যে, বাংলাদেশের তরফ থেকে জল প্রত্যাহার বেশী করার ফলে নবদ্বীপ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভাগিরথী নদীর এই প্রবাহ ক্রমে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে, নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৭-এর চুক্তির তিন বছর পর ১৯৮০-র নভেম্বর ও ১৯৮১-র এপ্রিলে চুক্তিটি উভয় দেশেরই প্রশাসনিক মহলে পর্যালোচিত হয়েছিল। তবে দুটি বৈঠকেই উভয় দেশ গঙ্গার জল বন্টনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাধানের বিষয়ে কোনো ঐক্যসূত্রে পৌঁছাতে পারেনি। ১৯৮১-র এপ্রিলের বৈঠকে যৌথ ইস্তাহারেই জয়েন্ট রিভার কমিশনের ব্যর্থতাকে সমাধান সূত্রে না পৌঁছানোর জন্য দায়ী করা হয়েছিল। ১৯৮২-র ৬ থেকে ৮ই অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের সামরিক বিভাগের প্রধান দিল্লিতে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে তারা উভয়েই ১৯৭৭-এর চুক্তি বহাল রাখার বিষয়টি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং ঠিক করা হয়েছিল যে, ১৮ মাসের মধ্যে স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই উপলক্ষে ৭ই অক্টোবর একটি সেট স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে ১৯৮২-র বন্দোবস্তে নির্দিষ্টভাবে কখনই বলা

হয়নি যে, ভারত ফারাক্কার মাধ্যমে বাংলাদেশকে কমপক্ষে কত পরিমাণ জল দিতে ইচ্ছুক। আসলে ১৯৮২-র চুক্তিটি ছিল দ্বিপাক্ষিক বার্তালাপ মাত্র।

১৯৮৪-র ডিসেম্বরে নিউ দিল্লিতে উভয় দেশের প্রতিনিধিদের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক বসলেও তাও ব্যর্থ হয়। পরবর্তী প্রতিনিধিস্থানীয় বৈঠক হয় ১৯৮৫-র জুনে। তাতেও উভয় দেশের মতপার্থক্যের কারণে বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর আগস্টে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে জলবন্টন বিষয়ে এক প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেখানে শুষ্ক সময়ে জলবন্টন বিষয়ে আঞ্চলিক স্বার্থের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ভারত এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভারত ও বাংলাদেশে— এই আঞ্চলিক প্রয়োজন বিচার করতে চেয়েছিল, অন্য কোনো তৃতীয় দেশের নয়। ১৯৮৫-র অক্টোবরে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনে মিলিত হয়ে গঙ্গা জলবন্টন বিষয়ে সমাধান সূত্রে আসার জন্য আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে উভয় দেশের শীর্ষ ব্যক্তিদের লক্ষ্য ছিল নবগঠিত সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার পূর্বেই এই দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধান করে নেওয়া। এই লক্ষ্যমাত্রা রেখেই ১৯৮৫-র ২২শে নভেম্বর আগামী তিন বছরের জন্য জলবন্টন বিষয়ে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সময়সীমা ছিল ১৯৮৮-র ৩১শে মে পর্যন্ত। এই মৌ অনেকটা ১৯৭৭-এর চুক্তির অনুরূপ ছিল। ১৯৮৫-র মৌ স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় দেশের প্রতিনিধি ও ইঞ্জিনিয়ার সহযোগে একটি জয়েন্ট এক্সপার্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল, যাদের প্রধান কাজই ছিল ফারাক্কা ও হার্ডিঞ্জ ব্রীজে গঙ্গার জল প্রবাহের পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্ত করে বার্ষিক একটি হিসাব উভয় দেশের সরকারকে পেশ করা। তবে শুষ্ক সময়ের কথা শুধু মাত্র মৌ তে উল্লিখিত ছিল, বর্ষার সময়কার কোনো নথি পাওয়া যায়নি।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা জলবন্টন নিয়ে সৃষ্টি হওয়া সমস্যার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারত অনেক ক্ষেত্রেই গঙ্গাকে নিজের দেশের একমাত্র সম্পত্তি মনে করেছিল। ফলে জল বন্টনের মূল চাবিকাঠি নিজের ইচ্ছাধীন করতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে অনেকটাই *Big Country-Small Country*-র একটা মানসিকতা কাজ করেছিল। অপরদিকে, বাংলাদেশও গঙ্গা জলবন্টন ইস্যুটিকে দ্বিপাক্ষিক সমস্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে অনেক ক্ষেত্রেই অহেতুক বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে টেনে এনে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। উভয় দেশের অসহনশীল মনোভাব সমাধান সূত্রে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল। এছাড়া ছিল উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন যা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। ১৯৯৬ সালে গঙ্গা জলবন্টন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সমস্যার সমাধান ঘটলেও বর্তমানে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যেকার কূটনৈতিক সম্পর্ক সরগরম হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Singh Kuldeep, *India and Bangladesh*, Anmol Publications, Delhi, 1987, Page-94
2. The Hindu, 19th July, 1973
3. Times of India, 17th May, 1974
4. Ibid, 9th June, 1974
5. Ibid, 20th April, 1975
6. Begum Kurshida, *Tension over the Farraka Barrage*; atechno-political tangle in South-Asia, K.P Bagchi & Co., Calcutta, 1988, Page-161
7. Bindra S.S, *India and Her Neighbours; A Study of Political, Economic and Cultural Relation And Interaction*, Deep & Deep Publications, New Delhi,1984
8. Times of India, 17th May, 1976
9. Begum Kurshida, Ibid, Page-169
10. Ibid, Page-172
11. Begum Kurshida, Ibid, Page-182
12. Roy Jayanta Kumar, 'International Studies', Vol-XVII, No-2, April-June, 1978, P-235
13. The Hindu, 20th December, 1977
14. Ibid
15. The Hindu, 28th February, 1980
16. The Statesman, 25th April, 1980
17. Ibid, 5th April, 1981

হামিরউদ্দিন মিদ্যার ছোটোগল্প : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

সৈকত মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: হামিরউদ্দিন মিদ্যা বর্তমান সময়ের তরুণ কথাকারদের অন্যতম এক প্রতিনিধি। তাঁর ইতিমধ্যে প্রকাশিত দুটি গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত ত্রিশটি গল্প ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে আরও কয়েকটি গল্প। বাঁকুড়ার প্রান্তিক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা হামিরউদ্দিন পড়াশোনার পাশাপাশি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কলমে বাঁকুড়া-সন্নিহিত গ্রামীণ বাংলার কৃষক জীবনের একাধিক অনুপুঙ্খ উঠে এসেছে। প্রান্তিক কৃষক, পরিযায়ী শ্রমিক, মেলায় দোকান দেওয়া পাতুনি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ফসলের বিনিময়ে ধানের মাঠ পাহারা দেওয়া শ্রমজীবী মানুষ কিংবা পরিযায়ী কৃষি শ্রমিক—এঁদের জগতের কথা হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের বিষয় আশয়। সেইসঙ্গে গ্রামীণ জীবনের মৃত্তিকাসংলগ্ন অভিজ্ঞতার রসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর নির্মাণের জগতটি।
সূচক শব্দ: হামিরউদ্দিন মিদ্যা, ছোটোগল্প, গ্রাম, কৃষক, পাতুনি ব্যবসাদার, পরিযায়ী শ্রমিক।

বর্তমান সময়ের বাংলা ছোটোগল্পের জগতটিকে যে তরুণ কথাকাররা সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হামিরউদ্দিন মিদ্যা (জন্ম-১৯৯৭)। এ পর্যন্ত তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল 'আজরাইলের ডাক' (সৃষ্টিসুখ, জানুয়ারি ২০১৯) এবং 'মাঠরাখা' (সোপান, ২০২২)। প্রথম গ্রন্থটিতে গল্পের সংখ্যা বারোটি, দ্বিতীয়টির গল্পসংখ্যা আঠারো। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে এসেছে গ্রামীণ সমাজ এবং তার মানুষজন। আরও গভীরে বলতে গেলে গ্রামীণ ইসলামি জনসমাজ। লেখক এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন তাঁর বেড়ে ওঠার নিজস্ব জগৎ কিংবা একেবারে পরিচিত ভূগোলকে। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে 'মাঠরাখা' (সোপান, ২০২২) নামক গল্পগ্রন্থের ব্লার্ব (লেখক পরিচিতি) থেকে জানা যায়—

> হামিরউদ্দিন মিদ্যা'র জন্ম ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৯৭, শালি নদী ও দামোদর নদ মধ্যবর্তী বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর একটি প্রত্যন্ত গ্রাম রূপপালে। প্রান্তিক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই মাঠ-ঘাট চাষবাসের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই জীবন ও জীবিকার তাগিদে পড়াশোনার ইতি টানতে হয়। কখনও পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে চলে গেছেন কেরালায়, কখনও হাটে হাটে, মেলায় মেলায় মনোহারী সামগ্রীর ছোট্ট দোকান দিয়েছেন।

> বর্তমানে তিনি কৃষিকাজের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, পাশাপাশি পড়াশোনার কাজটিও চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামবাংলার সহজ-সরল প্রান্তিক মানুষজনদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে থাকতে কখন যেন অনুভব করলেন তাদের অন্তরের কথা। সেই কথা জানানোর জন্যেই কলম ধরলেন ২০১৬ সালে। গল্প ও গদ্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকায়। ২০১৮ সালে লেখালেখির জন্য পেয়েছেন 'প্রতিশ্রুতিমান গল্পকার সম্মান'। এ-ছাড়াও প্রথম গল্প সংকলন 'আজরাইলের ডাক'-এর জন্য ২০২১ সালে পেয়েছেন 'দৃষ্টি সাহিত্য সম্মান'। তাঁর গল্প ইংরেজি ও হিন্দিতেও অনুবাদ হয়েছে।[১]

লেখকের বেড়ে ওঠা কিংবা যাপিত জীবন অভিজ্ঞতা যে তাঁর সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলে, তা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একাধিক গল্পের পাঠ অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যেতে পারে লেখক হামিরউদ্দিন সফলভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর পরিচিত জগতটিকে তার অনুপুঙ্খসহ। তাঁর লেখা গল্পের শিরোনামগুলি থেকে কিছুটা আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়টি। যেমন 'বককল', 'শালীনদীর হড়পা বান', 'মকছেদ চাচার ঢেঁকিশাল', 'হেঁড়ল', 'ডালিম গাছের ছায়া', 'পীর সাহেবের আস্তানা', 'মেহেরুন্নেসার ভারতবর্ষ', 'মাঠরাখা' ইত্যাদি।

হামিরউদ্দিন তাঁর ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন সমসময়কে। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে বদলে যাওয়া জীবনযাপন এবং মানুষের মূল্যবোধের একাধিক অনুপুঙ্খ। 'বককল' (জুন, ২০১৭) এই ধরনের একটি ছোটোগল্প। রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক নীতির কারণে বদলে যাচ্ছে মানুষের ঘরবাড়ি, কিন্তু পুরানো প্রজন্ম কি ছাড়তে পারছে তাদের মাটির পুরানো চিরাচরিত ঘর কিংবা যাপনের রীতিগুলিকে? বোধহয় না। সেইকারণেই এগল্পের 'দাদো' সরকারি ঘর পেয়েও ছাড়তে চান না তাঁর নিজস্ব 'বড়োবাড়ি', যে বাড়ি শুধুমাত্র বাড়ি নয়, তাঁর এই অতিক্রান্ত দীর্ঘ জীবনের বহু স্মৃতির প্রত্নস্থলও বটে। সে বাড়ির মধ্যে জড়ো করা বহু আপাত অদরকারি জিনিসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাঁর মায়ার পরশ। তারই মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া যায় একটি বক শিকার করবার কল। এইরকম একটি বাড়ি ছেড়ে যেতে মন চায় না বৃদ্ধ 'দাদো'-র—

> সবই নিয়ে যাওয়া হবে, খালি থেকে যাবে এই ভিটেমাটি, উঠোন, আঁজিরগাছ। বর্ষায় প্রথমে খড়ের চালাটা ফুটো হবে, ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি পড়ে উপরতলার মেঝের মাটিটা গলে গলে পড়বে নিচে। তারপর ধীরে ধীরে চারটা দেওয়াল, মাটির ঘর মাটিতেই মিশে যাবে একদিন। হয়তো ঘুঘু চরবে। দাদো বিড়ি খেতে খেতে সেই কথাই ভাবছে মনে হয়।
>
> সবকিছু রহিমকাকার জন্যই হল। কাকা পার্টি করে। নেতা হিসাবে একটু খ্যাতি আছে বইকি! না হলে সব এমনি এমনি? তবে এই বয়সে আর ইটের বাড়ির কোনও প্রয়োজন ছিল না, মাটির ঘরটাতেই অনায়াসে কেটে যেত জীবনটা। ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না আমার বাপ-চাচারা।

যেহেতু শুধু দাদোদেরই মাটির বাড়ি, তা ছাড়া সবার ইটের। তাই কোথায় যেন ঘা লাগছিল![২]

দাদো শেষপর্যন্ত ছেলেদের অনুরোধে একরকম বাধ্য হয় পুরানো মাটির ঘর ছেড়ে সরকারের দেওয়া নতুন ইটের ঘরে চলে যেতে। কিন্তু এরপর সে নিজের কোনো ছেলে কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বোঝাই যায় নতুন এই ব্যবস্থা তার মনঃপূত হয়নি। ধীরে ধীরে দাদো বুঝতে পারে যে, ইটের ঘর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাতে দরকার ইলেকট্রিকের আলো কিংবা পাখার মতো সামগ্রী। তাঁর ইতিপূর্বের চাহিদাহীন সন্তুষ্টির জীবনটি কোথাও যেন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। লেখক অনুভব করেন বককলের ফাঁসের মতো দাদোর উপরে এঁটে বসছে নতুন যুগের চাহিদাময় জীবনের অতৃপ্তির বন্ধন, যা কেবলই আরও শক্ত হয়ে চেপে বসে মানুষের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনের গলা চেপে ধরতে থাকে। তাই গল্পের শিরোনামের 'বককল' প্রকৃতপ্রস্তাবে আর বকের উপরে ক্রিয়াশীল নয়, ব্যঞ্জনায় তা মানুষের উপরেই প্রযুক্ত হয়।

হামিরউদ্দিন কৃষিজীবী পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। ফসলের মাঠকে চেনেন আশৈশব। কৃষকের অনিশ্চিত জীবনের অনুপুঙ্খ তাঁর জানা। সেই অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেছেন তাঁর 'যুগ যুগ ধরে' (কথা সোপান, শারদীয় ১৪২৫) গল্পটিতে। এ গল্পে ফসলকে ঘিরে কৃষকের আশা, মমতা, আশঙ্কা কিংবা আশাভঙ্গের কাহিনি উঠে এসেছে। ধরা পড়েছে কৃষির অনিশ্চয়তার ফলে কৃষিজমি ছেড়ে মানুষ চলে যাচ্ছে রাজমিস্ত্রীর লেবার হয়ে। যাঁরা শেষপর্যন্ত চাষ করছেন, তাঁরাও অনাবৃষ্টিতে, জলাভাবে তীব্র অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ছেন। পড়ে থাকছে শুধুই হতাশা। সেই দিকগুলিকে এ গল্পে তুলে ধরার পাশাপাশি কৃষি-সংলগ্ন অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতার অচেনা জগতটিকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন লেখক। এ গল্পের ভাষাও তাই নাগরিক জীবন-সঞ্জাত নয়, একেবারে কৃষকের ফসলের ক্ষেত থেকে যেন উঠে আসা—

এ বছর অনাবৃষ্টির ফলে দামোদর শুকনো খটখটে। মাইথনের ড্যামে পানি কম। ডি.ভি.সি. আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে ক্যানেলে পানি দিবে না। মাঠগুলো খাঁ খাঁ করছে। পানি ছাড়লে মাঠকে মাঠ সোনা ফলে যায়। গাঁয়ের বড়ো চাষিরা বোরোচাষে অনেক জমিই টাকা নিয়ে চাষ করতে দিয়ে দেয়। আড়াই তিন-হাজার টাকা বিঘেয় জমি পাওয়া যায়। সেই সুযোগটাকে আব্বার মতো ভূমিহীন চাষিরা লুফে নিয়ে নেমে পড়ে মাঠে। কিন্তু এ বছর দ্যাখো, কুনু শালার শ্যালোয় চাষ করার মুরোদ নাই, সব লেজ গুটিয়ে পগারপার! রাজমিস্ত্রির লিবার খাটতে চলে যাচ্ছে, নয়তো দুর্গাপুরের কারখানায়। হিম্মত তাইলে আব্বারই আছে বলতে হয়, চাষির ব্যাটা চাষি! — আব্বার জন্য গর্ববোধ হল।[৩]

কিন্তু পুত্রের এই গর্ববোধ শেষপর্যন্ত টিকে থাকে না। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বেশ কিছু মানুষকে একদিকে যেমন তাদের জীবিকা থেকে চ্যুত করে, তেমনি অন্যদিকে জীবিকা আঁকড়ে পড়ে থাকা কৃষকের জীবনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। লেখকের কলমের মুনশিয়ানায় পাঠক কখন যেন এ গল্পের কৃষক পরিবারটির সঙ্গে ফসল বাঁচিয়ে রাখার উৎকণ্ঠার শরিক হয়ে পড়েন। অনেক আশা নিরাশার শেষে যখন বৃষ্টি আর ঝড় আসে, ততদিনে এমনকি ভূগর্ভের শ্যালো মেশিনবাহিত জলটুকুও আর না পেয়ে ধান হলুদ হয়ে গেছে। ঝড়ের বিধ্বংসী তাণ্ডবে ধান তো দূরে থাক, খড় পাওয়ার আশাটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে যায় কৃষিজীবী পরিবারটির শেষ আশা কেড়ে নিয়ে। এ গল্প শুধু আর বাংলার দামোদর উপত্যকার কৃষকের আশা-নিরাশার গল্প হয়ে থাকেনি, প্রকৃতপ্রস্তাবে এ গল্প সারা ভারতের কৃষকসমাজের মর্মের বেদনাকে তুলে ধরেছে একইসঙ্গে—

> জিওলনালার মাঠের কাছে আসতেই আমার চোখ ছানাবড়া! দেখলাম আট বিঘে জমির ধানগাছগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত সৈনিকের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নিচে। জিওলনালার ঢিবির উপর যে আদ্যিকালের শিরীষগাছ, আব্বা ওই গাছটার মতো আলের মাথার উপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত ঝড়ঝাপটাতেও যার কোনও নড়নচড়ন নেই![৪]

‘ডাকপুরুষ’ (সংবাদ প্রতিদিন, শারদীয় ১৪২৮) গল্পটিতে লেখক তুলে ধরেছেন নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি হয় সমাজের অন্তর্গত ধর্মজীবীদের দ্বারা—সে কখনো পুরোহিত, কখনো ইমাম। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকতে থাকতে পরস্পরের ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা আচার গ্রহণ করে একে অপরে। তা নিয়ে আপাতভাবে কোনো বিরোধ ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ অতিবাহিত করেছে সুদীর্ঘকাল। আর সেইভাবেই তারা চেয়েছে বেঁচে থাকতে। এ গল্পে কুসুমডাঙা গ্রামের কৃষিজীবী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আশ্বিন মাসের শেষে ‘ডাক সংক্রান্তি’-র সময়ে জমিতে নল পুঁতে ফসলকে আহ্বান করে। তারা বিশ্বাস করে এর মাধ্যমে ভাল ফলন হবে। আর এইভাবে তারা শস্যদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়—

> আশ্বিন মাসের শেষদিকে ধানগাছ পোয়াতি হয়। গাছ গর্ভে ধারণ করে কচি শিষ। ধানের এই গর্ভাবস্থাকে বলে ‘থোড়’। মাসের শেষদিন ডাক সংক্রান্তি। ছেলে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার আশায় পোয়াতি মেয়েকে যেমন সাধ ভক্ষণ করানো হয়, রাঢ়ের চাষিরাও এইদিন ভাল ফলনের আশায় শস্যদেবীর উদ্দেশ্যে পোয়াতি ধানগাছকে সাধ দেয়।[৫]

চাষিদের এই কাজ গ্রামের ইমামের পছন্দ হয় না। তাঁর মতে এটি ‘শেরেকি গোনাহ’। এই কাজ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের ধর্মীয় আচার বলে তিনি মনে করেন। তাই মসজিদে নামাজের শেষে একদিন তিনি সবাইকে এই কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইমামের নিষেধে এতদিনের বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলতে চায় না হায়দার আলির মতো কৃষকেরা।

সবার অলক্ষ্যে তারা আশ্বিনের শেষদিনে নল পুঁততে যায় নিজের নিজের ফসলের ক্ষেতে। ধর্ম যে মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ বুনে দেয়, সেই উপলব্ধি জেগে ওঠে সাধারণ মানুষের মনে—

> সুময়টা এখন খুবই খারাপ রে ছয়দুল! দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হায়দার আলি। তারপর বলল, তুই আমি একলা কিছুই পালটাতে পারবনি। গাঁ থেকে একে একে কত পরব উঠে গেল বলত! কত আমোদ-ফুর্তি করে পেরিয়ে গেছে দিনগুলো। আর এখন?
>
> ঠিকই বলেচ তুমি। এখন আর আমাদের কুনু আনন্দ করার দিন নাই। দিলদিলি করি না, লাউভাসান করি না...শুধু ধর্ম আর ধর্ম করেই মলেক সব।
>
> ধর্ম করুক ছয়দুল, তাতে আপত্তি নাই। তবে সব ভাগ করে দিলে হবেক! নল পোঁতা হিন্দুদের পরব, এটা কুনুদিন ভেবেছিলিস?
>
> সারা গাঁয়ে আজ হিন্দু-মুসলমান সবার ঘরে ঘরে পিঠে, ক্ষীর, পায়েস হত। আমি তুমার বাড়ি খেয়ে আসতাম, তুমি আমার বাড়ি। সব চলি গেল একে একে!
>
> শেষ টানটা দিয়ে বিড়িটা পায়ের তলায় পিষে দিল হায়দার আলি। বলল, নল পোঁতা কুনু হিন্দুর পরব লয়, কুনু মুসলমানের পরব লয়। নলপোঁতা হল চাষিদের পরব। চাষিদের কুনু জাত হয় না রে ছয়দুল। চাষিরা হল অন্নদাতা। সবার কথা ভাবে। খোদা উপর থেকে সব দেখছে। তুই দেখবি কুনু পাপ হবেকনি আমাদের।[৬]

এইভাবে এ গল্পে ধর্মীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে নিতে চেয়েছে প্রান্তিক কৃষিজীবী মানুষ। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টিকে তাঁর গল্পে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'মেহেরুন্নেসার ভারতবর্ষ' (দ্য ওয়াল, ফেব্রুয়ারি ২০২০) ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি গল্প। ২০১৯ সালের শেষদিকে ভারত সরকারের সি.এ.এ. (CAA) আইন এবং এন.আর.সি. (NRC) তালিকা তৈরির বিপক্ষে দেশ জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন তৈরি হয়। বহু মানুষ এর ফলে নিজের ভিটে ছাড়া হওয়ার আতঙ্কে ভুগতে থাকেন। প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলেও তৈরি হয় আশঙ্কার পরিবেশ। মানুষ জীবন জীবিকা ভুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ জোগাড় করতে। আলোচ্য গল্পটি এরই প্রেক্ষাপটে লেখা। মেহেরুন্নেসার নাতি কেরালায় শ্রমিকের কাজ করা মতিবুল পড়িমরি করে বাড়ি ফিরে আসে। ঘরের সিন্দুক তোলপাড় করে খুঁজতে থাকে নাগরিকত্বের প্রমাণ, পুরানো দলিল, কিন্তু পায় না। মেহেরুন্নেসার কাছে জানতে পারে খালের মাছ পাহারাদার হিসাবে কাজ দিয়ে তার দাদোকে বসবাসের জমি দিয়েছিল গ্রামের মল্লিকবাবুরা। সেই জমিতেই তাদের বাস। তার দলিল

কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু দেশের সরকার তো এ কথা মানবে না। তাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গ্রামের সমস্ত লোকের মতো তারাও সন্ধান করে চলে কাগজের—

> মতিবুল দাদির কথা শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি দিল। বলল, মুখে যতই চাবুলি মার কেনে দাদি, কাগজ ছাড়া কুনু কাজ হবেকনি। আজকাল কাগজই সব।
>
> মেহেরুন্নেসা এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, কানের গোড়ায় কাগজ কাগজ করিস না তো! রাখ তুর কাগজ! কাগজের নিকুচি করেছে! নিজের কাজে-পাটে মুন দে। হই দেখ, খালপাড়ের দখিনে খেজুরগাছটার তলায় শুইয়ে আছে তুর দাদো। মাটি খুঁড়ে হাড়-পাঁজরাগুলো দেখিই দুবো।[৭]

দেশের মাটিতে যাদের হাড় পাঁজরা কিংবা হাড় পাঁজরায় দেশের মাটিকে ধারণ করে যারা চিরঘুমে আচ্ছন্ন, এ দেশের মাটিতে তাদের বসবাসের আর কোনও কাগুজে প্রমাণ দরকার আছে কিনা, রাষ্ট্রশক্তি তা ভেবে দেখে না। তাই দেশের প্রান্তে প্রান্তে জ্বলে ওঠে বিরুদ্ধতার আগুন। এ গল্পের শেষে লেখক তাই সার্থকভাবেই বলেন—

> টিভিতে, রেডিয়োয়, কাগজে সবখানেই আগুন জ্বলার খবর। সারাদেশ উত্তাল! রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মেহেরুন্নেসা একবার ঘরে ঢুকে, তো পরক্ষণেই ঘরের পিঁদাড়ে এসে খালপাড়ের দখিনপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু শুধু কি আর দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ি! কারও জন্যে অধীর প্রতীক্ষা করে থাকে। যেন খেজুরগাছের নীচে ঝোপঝাড়ের তলায় চাপাপড়া কবরের মাটি ফুঁড়ে, কয়েকশো বছরের পুরনো দলিল হাতে উঠে আসবে বুড়ো করম আলী।[৮]

'মাঠরাখা' গ্রন্থের শেষ গল্পটির নাম 'উড়োকাক' (সংবাদ প্রতিদিন, রোববার, বিশেষ গল্পসংখ্যা ২০২০)। এ গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন মেলার প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের কথা। এ গল্পের শিবদাস প্রকৃতপক্ষে বাংলা থেকে কেরালায় কাজ করতে যাওয়া একজন পরিযায়ী শ্রমিক। জীবিকার দায়ে সে অল্প কিছুদিন পর পর কেরালায় চলে যায় কাজের তাগিদে। কিন্তু তার নববিবাহিতা বধূর একান্ত অনিচ্ছায় সে আর ভিন রাজ্যে যেতে পারে না। শেষপর্যন্ত মেলায় মেলায় দোকান দেওয়া পাতুনি ব্যবসাদারের পেশা গ্রহণ করে সে। এ গল্পে সেই প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের জীবনের অনিশ্চয়তা এবং তাদের প্রতি ধেয়ে আসা সামাজিক তাচ্ছিল্যের একাধিক দিককে জীবন্ত করে তুলেছেন লেখক। বস্তুতপক্ষে এই নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের কথা বাংলা সাহিত্যে খুব কম ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে উঠে এসেছে। এদের জীবনে বেঁচে থাকার তীব্র প্রতিযোগিতা কিংবা বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পেরে উঠতে না পারার গল্পগুলি নতুন করে আলোকিত হয়ে উঠেছে এই গল্পে। লেখক উড়োকাক বলতে মেলায় মেলায় দোকান দিয়ে বেড়ানো এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা কিংবা নিরাশার দোলা—মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে—

> মেলাটাকে পেছনে ফেলে পাতুনি ব্যবসাদারদের সাইকেলগুলো লাইন ধরে চলেছে পিচের রাস্তা দিয়ে। অন্ধকার রাত। দশহাত দূরের কোনও কিছুই

> দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেকের হাতে টর্চ আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা আলোর মালা হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছে।
>
> দাড়িওয়ালা লোকটার নাম নুরুমুদ্দিন। বাড়ি জামালপুর। সঙ্গের বইবিক্রেতা ও ফুলদানিওয়ালা ওদের গ্রামেরই। শুধু ওরাই নয়, এপারের বেশ কয়েকটি গ্রামের পাতুনি ব্যবসাদারই মেলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। প্রত্যেকের মনে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ন্যায্য উপার্জন না করতে পারার হা-হুতাশ। ওরা যাচ্ছে নিজেদের সুখ-দুঃখ আর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের গল্প করতে করতে। কারও ছেলে-বউ বাপকে দেখে না, বুড়ো বাপকে ব্যবসায় নামতে হয়েছে। কেউ মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। কারও জমি বন্ধক পড়েছে, তা ফেরানোর জন্য মরিয়া। ওদের কথাবার্তা বাতাসে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনও গ্রামের গৃহস্থের বাড়ির কুকুর ডেকে উঠছে রাতের নিঃস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিয়ে। সেই পৌষ সংক্রান্তি থেকে মেলা শুরু হয়েছে। শেষ হবে চৈত্র মাসের গাজনে। এই কয়েক মাস পাতুনি ব্যবসাদারদের ঘরের মেয়েদের চোখেও ঘুম থাকে না। রাত জেগে না-খেয়ে বসে থাকে ঘরের মানুষটি ফেরার অপেক্ষায়। সাইকেলের ঝনঝন শব্দ শুনলেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। গভীর রাতে চলে খাওয়া-দাওয়া। ততক্ষণে পাড়াপড়শি ঘুমে কাদা। পাশের ঘর থেকে হয়তো বুড়ো বাপ, বা বুড়ি মা জেগে উঠে হাঁক পাড়ে, খোকা এলি?[৯]

এইভাবে একেবারে শিল্পীর দক্ষতায় লেখক তুলে ধরেছেন প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের কথা। এ গল্পে শুধু তাদের দীর্ঘশ্বাসই জেগে নেই, বরং তাদের সঙ্গে সেই পরিবারগুলির সদস্যদের আশা, আশঙ্কা কিংবা বেদনার দিকগুলিও যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে অনিবার্যভাবেই। আর এইভাবে তাঁর গল্পের মধ্যে দিয়ে হামিরউদ্দিন পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন সমাজের সেই স্তরের মানুষের কাছে, যাদের দুঃখ-বেদনা এত কাছ থেকে খুব কমই উঠে এসেছে।

১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারির সকালবেলায় শান্তিনিকেতনের উদয়ন গৃহে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতাটি। সেই কবিতার প্রথমে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন—‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি’—এই কথা বলে। আর কবিতার শেষের দিকে গিয়ে তিনি সেইরকম একজন কবির কথা বলেছিলেন—

> কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,
> সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।[১০]

হামিরউদ্দিনের গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, তিনি সার্থকভাবেই 'কৃষাণের জীবনের শরিক', তিনি সার্থকভাবেই সেই লেখক, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'। তাই তাঁর গল্পে নিশীথ রাতের মাঠের কাব্য মূর্ত হয়ে ওঠে, দল বেঁধে আলপথের উপর সারি দেয় মাছের দল আর জ্যোৎস্না রাতে মাঠরাখা যুবক নিজের স্ত্রীর মধ্যে আবিষ্কার করে পরিকে। এইভাবেই তাঁর কলম আগামীর পথে আরও অনেক মায়া ছড়িয়ে যাবে বলে আশা রাখা যায়।

উল্লেখপঞ্জি

১. লেখক পরিচিতি (ব্লার্ব), 'মাঠরাখা', কলকাতা, সোপান, ২০২২

২. হামিরউদ্দিন মিদ্যা, 'বককল', 'আজরাইলের ডাক', কলকাতা: সৃষ্টিসুখ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা ৯-১০

৩. পূর্বোক্ত, 'যুগ যুগ ধরে', পৃষ্ঠা ৯২

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০১

৫. হামিরউদ্দিন মিদ্যা, 'ডাকপুরুষ', 'মাঠরাখা', কলকাতা: সোপান, ২০২২, পৃষ্ঠা ১৪

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১-২২

৭. পূর্বোক্ত, 'মেহেরুন্নেসার ভারতবর্ষ', পৃষ্ঠা ১১৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১৬

৯. পূর্বোক্ত, 'উড়োকাক', পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০ সংখ্যক কবিতা, 'জন্মদিনে', কলকাতা: বিশ্বভারতী, চৈত্র ১৪১০

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘বদনাম’

রিমি বাছাড়
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : ‘বদনাম’ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশার একেবারে শেষ পর্বে প্রকাশিত হয় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন মাস আগে রচিত (১৫-২২ মে, ১৯৪১)। গল্পটি রচনার বিবরণ প্রসঙ্গে প্রতিমা ঠাকুর লিখেছেন, রোগশয্যায় পড়েও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের গতিরোধ হয়নি। সেই সময় যখনই গল্পের কোনো প্লট মাথায় আসত, সেগুলো তিনি মুখে বলে যেতেন। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় ‘বদনাম’ গল্পটি।

সূচক শব্দ : সৌদামিনী, বিজয়, অনিল, স্বাধীনচেতা নারী, ‘স্ত্রীর পত্র’, বিপ্লবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল আলোচনা :

‘বদনাম’ গল্পটিকে সুকুমার সেন বলেছেন, “ক্রাইম কাহিনির এক অপরূপ রূপকল্প”।[১] বিপ্লবী দেশনায়ক অনিল মিত্তিরকে গ্রেপ্তার করতে মরীয়া পুলিশের দারোগা বিজয়। আর সেই দারোগাবাবুরই স্ত্রী সৌদামিনী ওরফে সদু স্বামীকে লুকিয়ে ভাই বলে অনিলকে কাছে টেনে নেয়। নিজের সাধ্যমত অনিলকে দেশের কাজে সাহায্য করে। সারা গল্প জুড়ে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে একটা লুকোচুরির ভাব সহজ সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। বিজয় যেন ধরেও ধরতে পারে না, তার স্ত্রী-ই হচ্ছে গিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া সেই ‘কুখ্যাত’ মেয়েটি। এতে গল্পে একটা হেঁয়ালি মাখা রহস্যের আমেজ আসে। গল্পটি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রতিটা পরিচ্ছেদ আলাদা আলাদা দৃশ্য দিয়ে শুরু হয়েছে, অনেকটা নাটকের মত। আর গল্পের শেষে রয়েছে ক্লাইম্যাক্স। সেখানে সমস্ত সত্যের উদ্‌ঘাটন। রহস্যের পরিসমাপ্তি।

‘সবুজপত্রে’ প্রকাশিত গল্পগুলোর সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র, স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় মানসিকতার নারী চরিত্র সৃষ্টিতে আগ্রহী হন। Women empowerment ‘নিয়ে এরকম সোজা-সাপ্টা কথা বলা সে-সময়ের সমাজ ভালোভাবে নেয়নি। স্ত্রীর পত্র’ গল্পটিকে প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। ‘বদনাম’ গল্পটিতেও সৌদামিনীর চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে মেয়েদের পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন, “...যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধে পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।”[২] সদু ঘরে ও বাইরে সব ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী। কলুর বলদের মত সংসারের ঘানি টেনেই সারা জীবন কাটাতে সে ইচ্ছুক নয়। তার দৃষ্টি প্রশস্ত। সেখানে পরাধীন দেশবাসী অনাহারে মরছে। দেশহিতৈষী মানুষদের হাতে হাতকড়া পড়ছে। তাই সে আর শুধু ঘরকন্নার কাজ করে ‘সতীলক্ষ্মী’ হতে চায় না। নারীর স্বাধীন ও স্বদেশী হয়ে ওঠার আদর্শ উদাহরণ সদু। সংসারের গণ্ডির বাইরে মেয়েদের বিশাল জগৎ আছে, সেখানে স্থান পায় দেশপ্রেম। সন্তানহীনা মায়ের কষ্ট

বুকে লুকিয়ে হাসি মুখেই সংসারের সকল কাজ সে করে যায় ক্লান্তিহীনভাবে। সেইসঙ্গে দেশপ্রেমকেও আলাদা করতে পারেনি সে। খাপছাড়া এই সমাজে জন্মেও দেশের প্রতি দায়িত্বকে সে অবজ্ঞা করতে পারেনি।

তাইতো সে ঠিকই চিনেছিল অনিল নামের এক দেশপ্রেমিককে। অনিলকে সে দেশের একজন সুসন্তান হিসাবেই জানে। এজন্যই স্বামীর অগোচরে তাকে সহযোগিতা করে। কিন্তু সমাজের অন্ধ কুসংস্কার এই সহযোগিতাকে বাঁকা চোখে দেখতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু সদু দমবার পাত্রী নয়। কথার স্পষ্টবাদীতায় সৌদামিনী তার নামের বাচ্যার্থকে সার্থক প্রমাণ করেছে। সে বলে,
“মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রী বুদ্ধি ষোলো আনা কাজে লাগতে পারে।”

এই সদুর প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “আমাদের দেশের মেয়েরা বেশিরভাগ … ভালোবাসা দিয়ে তরুলতার মত জড়িয়ে থাকে, পুরুষকে বাড়তে দিতে পারে না। তা হবে কেন?”[৩] তাই তিনি ‘বদনামে’র সদু চরিত্রটিকে একেবারে অন্যভাবে গড়ে তুললেন। গল্পের শেষে তাই সে স্বামীকে বলে, “প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমার বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে।”

আসলে বদনাম গল্পটি হল ‘দুরাশা’ গল্পের তৃতীয় ভাগ। গল্পটি পড়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, স্ত্রী যে গোপনে অনিলকে সাহায্য করে সেকথা বিজয়বাবুর অগোচর নয়। কিন্তু নিজের কাছে তার স্বীকার করতে দ্বিধা ছিল পাছে অনুমানটি নির্ভুল সত্য বলে প্রমাণিত হয়। চাকরির শর্ত মেনে বিপ্লবীকে ধরার জন্য সে তৎপর হলেও বিজয় নিষ্ঠুর হৃদয়হীন দারোগামাত্র নয়। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক যথার্থ মানুষ। তাই অনিলকে গ্রেপ্তার বা সদুকে শাস্তির কিছুই সে করতে পারেনি। কারণ সদুর মুখে এতদিন যেসব সংলাপ সে শুনে এসেছে, তাতে তার দেশব্রতী সত্তার আসল রূপ বিজয়ের অজানা নয়। তার মনের কোথাও যেন লুকায়ে আছে বিপ্লবী দেশনায়কের জন্য মমতা।

অসহযোগের নরম পথে না গিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের চরম পথের পথিক ‘বদনাম’ গল্পের বিপ্লবী নায়ক অনিল মিত্র হল, এক রহস্যময় চরিত্র। নিজের বুদ্ধি-কৌশল এবং সাধারণ মানুষের সহায়তায় সে বারে বারেই পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে। সদুর মধ্যে সে নারীর প্রেরণাদাত্রী শক্তির জোর খুঁজে পায়। দারোগা বিজয় তার স্ত্রীকে বলেছে, “ওর গায়ে হাত দেবে হিন্দুর ঘরে আজ এমন লোক নেই। তারা আপন ঘরের দাওয়ায় ওর জন্য খাবার রেখে দেয় – রীতিমত নৈবেদ্য।”

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের প্রতি জনগণের বীরপূজা ও অন্ধবিশ্বাসকে এইভাবে গল্পে রূপ দিয়েছেন। অনিলকে ধরতে মরীয়া পুলিশ মুসলমান পাহারাওয়ালার সাহায্য নিতেও অপারগ। কারণ দেশে তখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘ষড়ভঙ্গ’ (১৯০৭) প্রবন্ধে বলেছেন,

“একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিলনা, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে। … শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারেনা।”

দেশের কাজে মানুষের যেমন উৎসাহ ছিল, তেমনি সমাজে তখন হিন্দুয়ানিও বড়ো বেশি করে ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান ও বাণীর যে যোগ ছিল, আলোচ্য গল্পে সেকথা প্রমাণিত হয় যখন বিপ্লবী অনিল উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'রবিঠাকুরের গান'।

"আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে!"

পুলিশের কাছে নিজেই ধরা দিয়ে অনিল বলে যে, পুলিশ তাকে বাঁধতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটিতেই রয়েছে বিপ্লবীদের সেই মুক্তি। দারোগা বিজয় সমস্ত শক্তি নিয়েও শক্তিহীন থেকে তাকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখানেই দেশের কাছে, স্বাধীনতার কাছে আইনরক্ষকেরা বারে বারে হার মেনেছে। লেডী গ্রেগরীর একাঙ্ক নাটক 'The Rising of the Moon'-এ এভাবেই পুলিশ সার্জেন্ট এক আইরিশ বিপ্লবীকে হাতে পেয়েও চলে যেতে দিয়েছিল।[৪]

'বদনাম' গল্পে বদনামের লক্ষ্যবস্তু বেশিরভাগ সময়ই সদু চরিত্রটি। কারণ স্ত্রীলোক হয়েও শুধু স্বামীসেবা না করে সে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল যেমন বাড়ির মেজ বউয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে মুক্তি খুঁজেছিল, 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী আরেক রকমভাবে মুক্তি খোঁজে দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। লোকে ভালো বলবে এই ভেবে সতীসাধ্বী হওয়ার 'সুনাম' কুড়োনোয় তার আগ্রহ নেই। সমাজের বেঁধে দেওয়া ভালো-খারাপের তুলাদণ্ডে সদু হয়ত কলঙ্কের ভাগী। কিন্তু সেই বিধি-নিষেধকে তোয়াক্কা না করা সদু মনে করে,

"আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের রক্ষা।"

সদুর স্বামী দারোগা বিজয়ও কিছুটা এই বদনামের ভাগী। কারণ সে তো জেনে-শুনেই বিপ্লবী অনিলকে গ্রেপ্তার না করে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে। তার চাকরি জীবনে এ এক গুরুতর অপরাধ। আবার বিপ্লবী অনিলের গায়ে পুলিশ বাহিনী ও ব্রিটিশ সরকার বদনামের কলঙ্ক লেপে দিয়েছে। আসলে গল্পে এই বদনাম দাঁড়িয়ে আছে বিরোধাভাসের ওপরে। সদু, বিজয় বা অনিল এরা কেউই বদনামের কলঙ্কভাগী নয়। প্রচলিত বদনামকে ব্যঙ্গ করে তারা তিনজনেই তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে সুনামকে চিহ্নিত করেছে। সমাজের দেগে দেওয়া অচ্ছুতরাই যে প্রকৃত অর্থে মানুষ, 'বদনাম' গল্পটি সেই কথাই বলে।

তথ্যসূত্র –

১. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – ১৩৫৩ বঃ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ – জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃঃ – ২৯৩।

২. শ্রীরানী চন্দ, 'আলাপচারি রবীন্দ্রাথ', 'রবীন্দ্রনাথের উক্তি', ১৭ মে, ১৯৪১।

৩. শ্রীরানী চন্দ, 'গুরুদেব', পৃঃ – ১২৫।

৪. ড. মীনাক্ষী সিংহ, 'গল্পগুচ্ছ : জীবনের মেঘ ও রৌদ্র', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ – ২২ শে শ্রাবণ, ১৪১১বঃ।

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা নির্বাচিত ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা

চৈতালী ঘটক (রায়)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সংক্ষিপ্তসার : বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। ভালো মন্দ ঔচিত্য-অনৌচিত্যর জায়গায় স্থান পেয়েছে মানুষের প্রাথমিক চাহিদা। মূলতঃ বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক সংকট ও জীবিকা সংকট থেকেই এই অবক্ষয় দানা বেধেছে। সাহিত্যে যেহেতু সমাজ প্রতিফলিত তো হয়। সেই কারনে এই পচা গলা সমাজের ছবি যে যুগের সাহিত্যে অর্থাৎ গল্প উপন্যাসের ও কবিতা গুলির মধ্যে জীবন্তভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এই সময় **'কল্লোল' 'কালিকলম'** প্রভৃতি পত্রিকাগুলির মধ্যে সব কথা সাহিত্যিকগন লিখতেন তাদের ছোট গল্পগুলির মধ্যে এই হতাশা, নিপীড়ন ও সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। এমনই দুই একটি ছোট গল্প **'বাঁশবাজী' 'বোবাকান্না'** ও **'পুরাতন ভৃত্য'**। **'বাঁশবাজী'** গল্পের অপত্য স্নেহ শিথিল হয়েছে বিত্ত ভাবনার কাছে। নিষ্ঠুর হলেও কঠিন বাস্তবের ক্ষুধা ভাবনার কাছে আবেগ ম্লান হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলার মন্বন্তরের পটভূমিকায় পল্লী গ্রামের করুন চিত্র তাদের চরম দারিদ্র্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। **'বোবাকান্না'** গল্পের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ ও মহামারির চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে একই রকম ভাবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের নৈতিক অবক্ষয়কে দেখানো হয়েছে। পুরাতন ভৃত্য গল্পের মধ্যে বিশ্বাস হীনতা স্বার্থপরতা ও আশ্রয়দাতার প্রতি অত্যাচার অর্থাৎ মানসিক কৃতজ্ঞতার অভাব ফুটে উঠেছে। গল্প গুলির মধ্যে সমাজের কঠিন বাস্তব চমৎকার ফুটে উঠেছে।

সূচক শব্দ : মূল্যবোধ, সমাজ ভাবনা, বিশ্বযুদ্ধ, ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, প্রতিবাদ, ভারতবর্ষ, প্রতিফলন, হতাশা, খাদ্যাভাব।

মূল আলোচনা

পরপর ঘটে যাওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধে বাঙালীর মূল্য বোধের পরিবর্তন ঘটেছে। ভালোমন্দ বা ঔচিত্য অনৌচিত্তের জায়গায় স্থান পেয়েছে মানুষের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন উঠে এসেছে সমাজের আর্থিক সঙ্কট থেকে। এক সামাজিক ভাঙন ও পচাগলা অবক্ষয়িত সময়ের দলিল রচিত হয়েছে কল্লোল যুগের কথাসাহিত্যিকদের রচনায় । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নিজের কথায় ফুটে উঠেছে, "যেমন শোক থেকে শ্লোকের তেমন তারুণ্য থেকে কল্লোলের আবির্ভাব।" কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় ফুটে উঠেছে প্রত্যাশা ভঙ্গের আর্তি, আশাহীন কর্মতৎপরতা, উদ্দেশ্যহীন জীবন সংগ্রাম, বুভূক্ষ মানুষের চরম অন্নকষ্ট এবং সর্বোপরি মূল্যবোধের অবক্ষয়। মূল্যবোধ এ সমাজে ক্ষয়িষ্ণু অভাববোধ ও

প্রয়োজন এখানে প্রধান, যে অভাববোধ অপত্য স্নেহকে বিদ্রুপ করে, দৈহিক শুচিতাকে উপেক্ষা করে । কল্লোল যুগের লেখক গোষ্ঠী তাদের রচনায় দেখিয়েছেন অনাহারের জ্বালা কিভাবে অসহনীয় হয়ে পিতামাতা ভাই বোনের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলিকে শিথিল করে তোলে। এযুগের অন্যতম শক্তিশালী লেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তার **"বাঁশবাজী" (১৩৫১ বঙ্গাব্দ)** নামক ছোট গল্পে দেখিয়েছেন পেটের জ্বালা কিভাবে অপত্য স্নেহকেও শিথিল করে তোলে। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষে। একজন শহরের মানুষের চোখে দেখা ঘোড়গাছির গাজনের মেলার দৃশ্যে। গল্পটিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঠিক পরবর্ত্তী সময়কে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মেলার বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে লেখক একটি মাত্র দৃশ্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যুগের চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুললেন। দরিদ্র মন্তাজ ও তার দুই ছেলে ইন্তাজ ও আক্কাছ। এই সন্তানের জীবনকে বাজী রেখেই মন্তাজ অন্ন সংস্থানের পথ বেছে নেয়। উচু বাঁশের ডগায় ছেলেকে চড়িয়ে সেই বাঁশ নিজের পেটে রেখে এক অদ্ভুদ ও বিভৎস খেলায় সে মেলার মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষন করে অর্থ উপাজনের চেষ্টা করে। যদিও শেষ রক্ষা হয় না। ক্ষতবিক্ষত ইন্তাজকে তার বাবা লুফে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় তার চেষ্টা। কিন্তু তার পরে চরম সত্য ফুটে ওঠে লেখকের কলমে—বাঁশ, বাহু ছেলে, ঘা— সবকিছুই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত। ক্ষমাহীন।

ছোট ছেলে আক্কাছের কাতর ক্রন্দন এবার আমি মরে যাব— এবার আমার পালা মন্তাজের মুখে পাথুরে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা পাঠক মনকে অবশ্যই ভারাক্রান্ত করে তোলে। লেখকের অপর একটি গল্প **'নযযৌ ন তস্থৌ'**। এই গল্পেও অপত্য স্নেহ শিথিল হয়েছে বিত্ত ভাবনার কাছে। সন্তান চাকরী পেয়ে মায়ের কাছ থেকে দূরে গেলেও মায়ের মনের প্রশান্তি ধরা পড়েছে অর্থের প্রাচুর্যের জন্য। আবার দৈব দুর্বিপাকে ছেলের কর্মক্ষেত্রে যাওয়ায় বাধা তৈরী হওয়ার মায়ের মনে উৎকণ্ঠা যদি চাকরীটা হাত ছাড়া হয়ে যায়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ছেলের পথে বেড়ানোকেই মা শ্রেয় বলে মনে করেছেন । এখানে সন্তানের বিপদ ভাবনা মাকে কাতর করেনি বরং চাকরী খেয়ানোটাই মায়ের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এখানে সন্তানের জীবনের মূল্যের চেয়ে মায়ের কাছে রবে সন্তানের চাকরীটাই মূল্যই প্রধানরূপে প্রতীয় মান হয়েছে বিষয়টি – নিষ্ঠুর হলেও তা যুগ ভাবনার জ্বলন্ত নজীর। অর্থনৈতিক সংকট কিভাবে আত্মিক সংকটকে তরান্বিত করে তারই এক মর্মস্পর্শী আবেদন গল্পে দেখিয়েছে লেখক, অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য প্রবোধ কুমার সান্যালের **'অঙ্গার'** ছোট গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিলুপ্তি ও বিত্তহীন নিরন্ন শ্রেনীর ক্রমঃপ্রকাশ লক্ষ্য করে লেখক গল্পটি লেখেন। একটি বিত্তহীন পরিবারের মেয়েরা তাদের দৈহিক শুচিতার চেয়ে অনেক বেশী প্রাধান্য দিয়েছে ক্ষিদের জ্বালা। অভাব ও দারিদ্রকে আর নিজের দেহের শুচিতা নষ্ট করে যে অর্থ তারা সংগ্রহ করেছে তাতেই ইন্ধন দিয়েছে তাদের মা, এককালে যিনি ছিলেন হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা। নিজের কন্যা শোভনা ও

মিনুকে পন্যা করে সেই অর্থ নিঃসঙ্কোচে তুলে নেন মা। সে কথা বোঝা যায় গল্পে বর্ণিত শোভনার উক্তিতে –

"আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক হয়ে গেলুম। কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড় ?"

গল্পে লেখক বলতে চাইলেন যারা দরিদ্র মানুষের ভাত কেড়ে নেয়, মান সম্ভ্রম নষ্ট করে পৃথিবীর ভদ্র সমাজে তাদের মান ক্রমশঃই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। এই গল্পেও সন্তান স্নেহ তথা সন্তানের সম্ভ্রম-এর চেয়ে বড় হয়ে ওঠে পেটের ক্ষুধা, আর এই ভাবেই অপত্য স্নেহ ম্লান হয়ে পড়ে।

'বাঁশবাজী' রচনায় প্রায় সমসাময়িক কালে আরও একটি ছোটগল্পের উল্লেখ করা যায় সেটি হল **'বোবাকান্না'**। বাংলার মন্বন্তরের পটভূমিকায় পল্লীগ্রামের করুণ চিত্র পুটে উঠেছে গল্পটির মধ্যে এখানে মূলতঃ রাঢ়ের পল্লীজীবনের কাহিনী সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়েছে। অসাধারণ দক্ষতায় লেখক পরিবেশন করেছেন কঠিন বাস্তবকে। ফুল্লরাপুর গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে "চারিদিকে মড়ার মাথা আর হাড়"। দামোদর, অজয়, কোপাই, ময়ূরাক্ষী, গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদীতে ভয়ংকর বন্যা হয়ে গেল। শ্রাবণ ভাদ্র হল জলপ্লাবন তারপরে জল নামতে শুরু করলে দেখা দিল অসুখ বিসুখ মাহামারী কলেরা। টাইফয়েড ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজার হল। শ্মশানের শশী ডোম পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল এই মৃত্যু মিছিল দেখতে দেখতে । তবে দাগী চোর শশী সবচেয়ে বেশী বিচলিত হল আনু ঠাকুরের মৃত্যুতে। কারণ তার মৃত্যু যতটা না করুণ তার থেকে ঢের করুণ আনুর সদ্য বিধবা সুন্দরী ননীর পুতুলের মতো স্ত্রীর শোকাতুর অবস্থা দেখে। শুধু সেই নয় গ্রামের মুকুজ্জে বা ভট্টাচার্য্যের মতো লোকেরাও আনুর স্ত্রীকে দেখে বিচলিত। এই চিত্র প্রদর্শনে তারাশঙ্কর গ্রামের উচ্চ জাতি থেকে নিম্নশ্রেনীর সকল মানুষের নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নারী লোলুপতার নিম্নর্জতা এখানে ফুটে উঠেছে অতি সুক্ষ রেখায়। একই সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন মৃত্যু মানুষকে শোকাহত করলেও মানুষের পেটের জ্বালাকে বিস্মৃত করতে পারে না বা ভোলাতে পারে না। তাই সদ্য মারা যাওয়া আনুর জন্য শোক প্রকাশ করার থেকেও আনুর মায়ের কাছে পেটের চিন্তাই বড় হয়ে দেখা দিল। তাকে পরদিনই যেতে দেখা যায় বাজার পাড়ার ধ্বজু সিং-এর দোকানে যেখানে 'সরকারী ভিক্ষে' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই দোকানে সরকারী চাল শেষ হয়ে যাওয়ায় **'বাজরা'** নামক এক প্রকার খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছিল যা খেলে সহজেই মানুষ মৃত্যু পথযাত্রী হওয়ার ও সম্ভাবনা রয়েছে। আনুর মা প্রথমে ভেবে ছিল এই খাদ্য খানিকটা বেশী করে তার বউ ও নাতিটাকে খাইয়ে দেবে তবেই সে মুক্ত কিন্তু পরক্ষণেই সে তার ভাবনায় রেখা টানে কারণ এই দুর্দিনে বউটিই তার একমাত্র ভরসা এখানে বউ-এর রূপ-এর বিনিময় সে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে এটি হয়তো ছিল তার মূল অভিপ্রায়। লেখক দেখিয়েছেন অভাব, দারিদ্রতথা পেটের জ্বালা মানুষকে কতখানি আত্মকেন্দ্রিক ও নিষ্ঠুর

করে তুলতে পারে। সুযোগ সন্ধানী আনুর মা পুত্রশোকে মাঝখানেও পরখ করে দেখে নিয়েছে তার সুন্দরী তরুণী পুত্রবধূটির প্রতি ডাক্তার পুরোহিত ও ডোম প্রত্যেকটি মানুষের কি অপরিসীম সহানুভূতি। আর এই সহানুভূতিটুকু কাজে লাগালেই তার অন্নকষ্ট মোচন করা সম্ভব হবে, নিদারুণ দারিদ্রের কাছে এ হেন মানসিক পরাজয় সমাজের কঠিন বাস্তবকেই চমৎকারভাবে স্পর্শ করে। তবে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকেনা তার বোবা কালা পুত্রবধূটির কথা, যে স্বামীর মৃত্যু অবধি ছিল স্তব্ধ যে দুবছরের শিশু সন্তানকে হারিয়ে যখন কেঁদে ওঠে, তখনও নিষ্ঠুর দারিদ্র আনুর মাকে নতুন করে বাঁচার পথ খুজতে শেখায়— "আনুর মা হনহন করে চলেছে নাতির দেহটা নিয়ে। তার অনন্ত দুঃখ। তবু তার অনন্ত ভাবনা। বাঁচবে কি করে। খাবে কি ? কি বেচবে ? বোবা বউটাকে বেচবে ? লেখক এই ভাবে কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরেছেন তার আলোচ্য গল্পে। এখানেও অপত্য স্নেহ ম্লান হয়ে গেছে কঠিন দারিদ্রের কাছে। কল্লোল যুগের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে দুজন উল্লেখ্য হলেন **তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়**। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় যেমন রয়েছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব তেমনি তারাশঙ্করের রচনায় দেখা যায় হৃদয়ের গভীর আবেগ ও ঐতিহ্য লালিত পুরাতন মূল্যবোধ। কিন্তু অবক্ষয়িত সমাজে এই মূল্যবোধ কিভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। দারিদ্রের কাছে মানুষ কত অসহায় ভাবে নিজের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছে তারই এক মর্মস্পর্শী পরিচয় মেলে **'অগ্রদানী'** গল্পটির মধ্যে এখানে যিনি প্রেত শ্রাদ্ধে অগ্রে দান গ্রহন করেন হিন্দু শাস্ত্র মতে এই **'অগ্রদানী'** সম্প্রদায় শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত থেকে প্রেতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পিণ্ড গলাধকরণ করেন। বর্তমান যুগে যদিও এই অমানবিক প্রথা অনেকখানি লুপ্ত প্রায়। তারাশঙ্করের **'অগ্রদানী'** গল্পে নিয়তির লীলার সঙ্গে তিনি লোভরিপুকে মিলিয়ে দিয়েছেন। গল্পে পূর্ণ চক্রবর্ত্তী বহু সন্তানের জনক এক দরিদ্র অগ্রদানী বামুন। খাওয়ার বিষয়ে তার অপরিসীম লোভ তার অপরিমিত দারিদ্রকেই স্মরণ করা। সে ভোজন রসিক নয়। রুচি বা পরিমিতি বোধ ও তার নেই। কেবল দৃষ্টি ক্ষুধা সাপের মতো তাকে ফণাবিস্তার করে যেন তার লোভ রিপুর জানান দেয়। সে ক্ষুদায় তাড়নায় অপরের উদিষ্ট ভোজন করতেও পিছপা হয় না। প্রবৃত্তিকে বশে রাখার যোগ্যতাহীন এই চরিত্রটি বুভুক্ষু সমাজ দৈন্যতার ফলশ্রুতি। তাই তার লালসা খাদ্যবস্তুকে ছাপিয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি ধাববান হয়েছে। গ্রামের ধনী শ্যামদাস বাবুর স্ত্রী শিবরানী মৃতবৎসা। তাই সুতিকাগৃহের দুয়ারে সংস্কার হেতু বা মাঙ্গলিক প্রয়োজনে পূর্ণ চক্রবর্ত্তীকে উপস্থিত রাখা হয়। তা সত্বেও শ্যামাদাস পত্নী মৃত সন্তান প্রসব করলে সে নিজ স্ত্রী হৈমবতীর সদ্যজাত সন্তানের সঙ্গে তাকে পাল্টে দেয় কেবলমাত্র বিষয় লালসার কারণে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সন্তানের মৃত্যুতে তাকেই পেত পিন্ডটি ভক্ষণ করতে হয়। প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত পূর্ণ চক্রবর্ত্তী নিয়তির দ্বারা এইভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। হযতো দারিদ্র তাকে অমানবিক করে তুলেছে। দারিদ্রই তার সকল সৎ গুণগুলিকে অপসৃত করেছে। সে সময় দরিদ্র পিতামাতার সংখ্যা

গ্রামবাংলার বুকে কম ছিল না তবুও পূর্ণ চক্রবর্ত্তী যেন এক ব্যতিক্রম চরিত্র । অপরিসীম লোভরিপুর তাড়নায় সে সংযমহীন অমানুষ হয়ে উঠেছে। মানবতা বোধের এ হেন অবক্ষয় মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। এই গল্পে লেখক যুগ চেতনা ও স্থুল চাহিদাকে যেন সুপ্ত বীজাকারে পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত বিনোদিনী গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত **'পুরাতন ভৃত্য'** এই গল্পটি আজও সমাজের বাস্তবতাকে স্মরণ করায়। **'পুরাতন ভৃত্য'** জগদীশ গুপ্তের লেখা ছোটগল্প। বিশ্বেশ্বর যাজক ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী। তাদের ভৃত্য এই (বিন্ধপ্রসাদ) "তুই যে আমার ছেলে রে" ক্ষেমঙ্করী এই অপত্য স্নেহে তাকে লালন করেছে। নমশূদ্র বাড়ীর পুরোহিত বিশ্বেশ্বর ও তার স্ত্রী অত্যন্ত আদরের সঙ্গে ভৃত্য নবকে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত তাদের সংসারের সঙ্গী করেছে। কিন্তু এই সচেতন বিনয়ী নব-র আসল চরিত্র ধরা পরে ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যুর পর। তার পারলৌকিক কাজের জন্য বৃদ্ধ যাজক বিশ্বেশ্বর নমশূদ্রদের ঘর থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং সাতাশ টাকা তার হাতে আছে এই অর্থ নিয়ে সে ঘরে এলে তার পুরাতন ভৃত্য নব তাকে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে সেটি হস্তগত করে। নব বলিল টাকা দাও...... বিশ্বেশ্বর সকাতর অনুনয় করে "টাকা নে কিন্তু প্রাণে মারিস নে বাবা"। নব তীব্র ভাষায় উত্তর দেয় "সে হয় না"।

'পুরাতন ভৃত্য' নামটি রবীন্দ্রনাথের জন্যই পাঠকের কাছে চির পরিচিত। সেখানে কেষ্ট নিজের প্রাণের বিনিময়ে মনিবের প্রাণ রক্ষা করেছে কিন্তু জগদীশ গুপ্তের **'পুরাতন ভৃত্য'** গল্পে নব ভৃত্য প্রভুর জীবন ও অর্থ সবই আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়েছে। লেখক যেন মূল্যবোধহীন সমাজকে এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যে সমাজে আশ্রিত আশ্রয়দাতার অর্থ লুটে নেয় যে সমাজে অন্নদাতাকে ভৃত্যের হাতে প্রাণভিক্ষা চাইতে হয় । সেই সমাজে মূল্যবোধ নেই। এই ভাবে লেখক এই গল্পটিক মধ্যে দিয়ে সমাজের বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। ভৃত্য নব-র এই মানসিক অবনতি বোধ হয় অভাব বোধ থেকেই উঠে এসেছে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্ত্তী ভারতের আর্থিক দুরাবস্থা ও শোষিত মানুষের হৃদয়হীনতা আলোচ্য গল্পে ফুটে উঠেছে। আজও আমাদের সমাজে লুকিয়ে আছে নব-র মতো পুরাতন ভৃত্যের দল যারা একা ফ্ল্যাটে থাকা নিঃসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অক্লেশে খুন করে সর্বস্ব লুঠ করে নেয়।

আধুনিক যুগের মানুষ ন্যায়-নীতি সত্যাচরণকে মূল্য হীন বলে মনে করে। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে বাড়িঘর বিক্রয় করে অর্থ মূল্য বুঝে নিতে চায়। দয়া মায়া ভালবাসা আবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতি গুলিও আজ লুপ্তপ্রায় । রবীন্দ্রনাথ তাঁর **"পুরাতন ভৃত্য"** কবিতার মধ্যে দিয়ে যে সময়কার পরাধীন ভারতবর্ষে দুঃখ তাড়িত মানুষগুলির মহৎ আদর্শ ও মূল্যবোধ গুলিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অভাব দারিদ্র ও অশিক্ষা মানুষকে আদর্শ বিমুখ করতে পারেনা । তাই তার সৃষ্ট ভৃত্য নিজের প্রাণের বিনিময়ে মনিবের জীবন দান করে গেছে। আর ঠিক তার

পরবর্তী সময়ে জগদীশ গুপ্ত যে পুরাতন ভৃত্য কে তুলে ধরলেন তার লেখার মধ্যে দিয়ে সে নিজের ভালো থাকার জন্য মনিব তথা আশ্রয়দাতার প্রাণ কেরে নিতেও দ্বিধা করেনি। এই ভিন্ন ধর্মী সমাজ ভাবনা কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের সমাজ ভাবনাকে স্মরণ করায়।

সহায়ক গ্রন্থ :

চিত্রা সরকার-সামাজিক সংকট আত্মিক সংকট, প্রেক্ষিত বাংলা কথা সাহিত্য।
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার-গল্পচর্চা।
জগদীশ ভট্টাচার্য্য-আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী।
সম্পাদনা-রাষ্ট্র সমস্যাঃ বাংলা সাহিত্য ।

বুদ্ধদেব গুহ'র নির্বাচিত 'প্রিয় গল্প' : রূঢ় বাস্তবের মানবিক আখ্যান

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

।।১।।

উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে বারে বারেই বাঁক পরিবর্তন করে খরস্রোতা নদীর মতই বহমান ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সাহিত্য। বাংলা কথাসাহিত্যের সজীব প্রাণ প্রবাহে একজন উজ্জ্বলতম সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬ - ২০২১)। তিনি একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, কবি ও শিশু সাহিত্যিক। বহু বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতায় ভরপুর তাঁর জীবন। 'প্রথম প্রবাস' থেকেই বুদ্ধদেব গুহ'র ভ্রাম্যমান জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয় সাহিত্যিক সংরূপে প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে। সমাজ সচেতন সাহিত্যিক 'আয়নার সামনে' দাঁড়িয়ে অবলোকন করেন মুখ ও মুখোশকে। বিকিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্ব, মূল্যবাধের অবনমন, মানসিকতার পালাবদলে পঙ্কিল সময়ের আবর্ত ও মানুষের জীবনকে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। এবং সেই উপলব্ধি, অনুভবের চিত্রণ প্রতিফলিত হয় বুদ্ধদেব গুহ'র সাহিত্যে। Higher Society এর Panel ও Chanel ভুক্ত উচ্চবিত্ত মানুষদের অন্তঃসারশূন্য যাপন প্রক্রিয়া ও মধ্যবিত্তদের সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী যাপন অভিলাষের বাস্তব সম্মত রূপায়নে বুদ্ধদেব গুহ তুলনারহিত। পাশাপাশি ভ্রমন পিপাসা ও প্রকৃতি প্রীতি তাঁর একটি অন্যতম প্রধান রচনা বৈশিষ্ট্য। বহুবিস্তৃত পটভূমিতে স্থান পেয়েছে নিম্নবিত্তের কঠিন জীবন সংগ্রাম। রচনা করেছেন রূঢ় বাস্তবের মানবিক আখ্যান।

বুদ্ধদেব গুহ'র কিছু জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম 'হলুদ বসন্ত' (১৯৬৭), 'কোয়েলের কাছে' (১৯৭৫), 'কোজাগর' (১৯৮৪), 'বাবলি' (১৯৯৫), 'মাধুকরী' (১৯৮৬), 'একটু উষ্ণতার জন্য' (১৯৮৬), 'ঋভু' (১৯৯২)। কিছু জনপ্রিয় গল্প সংকলনের নাম 'প্রথমাদের জন্যে' (১৯৭৬)। 'পহেলি পেয়ার' (১৯৭৬), 'জঙ্গল মহল' (১৯৮০), 'আয়নার সামনে' (১৯৮১), 'বনবাসর' (১৯৮১), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৮৫), 'প্রিয় গল্প' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

।।২।।

বুদ্ধদেব গুহ'র ছোটগল্পের সংকলন গ্রন্থ 'প্রিয় গল্প' সাহিত্যম্ থেকে প্রথম প্রকাশ হয় বইমেলা ১৪০৩, জানুয়ারী ১৯৯৭ সালে। ৪৬ টি গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে। বিগত ৪০

বছর ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাধারণ ও শারদীয় সংখ্যাতে যেসব গল্প বেরিয়েছে তার থেকে নির্বাচন করে এই 'প্রিয় গল্প' সংকলন গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে। গল্প গ্রন্থের ভূমিকা অংশে গল্পকার বুদ্ধদেব গুহ জানিয়েছেন--- 'ষাটের দশকের গোড়া থেকে আশির দশকের গোড়া পর্যন্ত প্রেমই আমার অধিকাংশ উপজীব্য বিষয় ছিল। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়ই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়বদ্ধতার দিকে ঝুঁকছে। প্রত্যেক লেখকের দেখার চোখ, বলার কথা, তাঁর অভিজ্ঞতাএবং মানসিকতা, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে বাধ্য'। অস্থির সময়ের দোলাচলতায় নগ্ন বাস্তবকে যেমন গল্পকার চিত্রিত করেছেন তেমনি, মানবিকতার আখ্যানটিকে নির্মাণ করেছেন অতীব যত্নের সঙ্গে। নির্বাচিত গল্পের প্রেক্ষিতে রূঢ় বাস্তবের মানবিক আখ্যান বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা-ই আমার এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

'বাবা হওয়া' গল্পটিতে আছে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সূত্রের সমীকরণ। শুধু মাত্র জন্ম দিলেই বাবা হওয়া যায় না, দীর্ঘ যাপন সূত্রে ধীরে ধীরে বাবা হয়ে উঠতে হয়। পালন করতে হয় বিভিন্ন দায়িত্ব। সন্তানের সুস্থ, সুন্দর জীবনের দিকে সবসময় সজাগ থাকতে হয়। গল্পে ম্যাক চ্যাটার্জী ওরফে মকরা উপলব্ধি করে আদর্শ বাবা হয়ে ওঠা খুব সহজ নয়, অনেক দায়িত্ব-কর্তব্যের মানবিক আখ্যানে নির্মিত হয় আদর্শ পিতার ভিত। হাওড়ার ঢালাই কারখানার মালিক ম্যাক চ্যাটার্জীর ছেলে, মেয়ে, সুন্দরী স্ত্রী আর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে আপাত সুখের সংসার। সামান্য ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা মকরা জীবনের অনেক প্রতিকূলতা পার করতে করতে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ম্যাক চ্যাটার্জী। তবে এখনো তাকে অনেক সময় Humble ভাব দেখিযে Sir, Sir করতে হয়। ব্যবসার সুবিধের জন্য কোম্পানীর Overdraft Account করা ব্যাঙ্কের Manager কে আজকাল প্রায়ই মকরা Sir, Sir করে যাতে সে Limit টা একটু বাড়িয়ে দেয়। সেই Manager একদিন যাত্রাপথে ম্যাকের বাংলোতে আসে খানিকটা Rest নিতে আর প্রয়োজনীয় কর্ম সারতে। রায় সাহেবের সঙ্গে ম্যাক তার পরিবারের সকলকে পরিচয় করিয়ে টিফিনের ব্যবস্থা করতে বলেন। এমন সময় Manager রায় সাহেব Imported সিগারেট বের করে মকরাকে দিয়ে নিজে সুখটান দিয়ে সামান্য কথোপকথনে রত হলেন। বাংলোর সামনে কর্মরত কুলি-কামিনদের নির্দেশ করে রায় সাহেব বললেন--- 'দীজ পিপল আর ভেরী অনেস্ট অ্যান্ড নাইস ইনডীড। বাট দে আর রিয়্যালি নেভ'। মকরা কিছু না বুঝে ইয়েস স্যার বলে রায় সাহেবের কথাকে সমর্থন করে বলল--- 'রাইট উ্য আর। দে আর রিয়্যালি নেভ'। কিন্তু মকরার ব্রিলিয়ান্ট ছেলে রাকেশ রায় সাহেবের বাক্যটির ভুল ধরে এই বিষয়টির প্রতিবাদ জানায়। কেননা বাক্যটিতে কুলি-কামিনদের একদিকে সৎ বলা হচ্ছে আবার একই সঙ্গে চিটিংবাজ বা অসৎ বলা হচ্ছে। এতে মকরের মালিক প্রতিম Manager রায় সাহেব অত্যন্ত মনোঃক্ষুণ্ণ হন। আর মকরাকে বলেন, আপনার ছেলেটি বড় অসভ্য। এই কথা শোনার পর মকরার মাথা গরম হয়ে যায় এবং ছেলে রাকেশকে দুই গালে সজোরে দুই চড় কষিয়ে দেয়। এই

ঘটনার পর ধীরে ধীরে ম্যাক চ্যাটার্জীর মন খারাপ হতে শুরু করে কেননা রাকেশকে কোনদিন মারেনি। যখন রাকেশ ছোট তখন তাদের অবস্থা খুব বেশী ভালো ছিল না। মায়ের সঙ্গে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে বই পড়ত, Electric চলে গেলে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়ত। আর মকরা কাজ থেকে ফিরলেই বাবা বলে কোলে উঠত।

তারপর দীর্ঘদিন কাজের চাপে ছেলেটার দিকে কোন নজর দিতে পারেননি। কারখানার জেনেরেটর কিনলেও বাড়িতে কোন ভালো ব্যবস্থা করেনি। এই বিষয় গুলি ভেবে মকরা মনে মনে খুব অনুতপ্ত হয়। একদিন College Street এ কাজে ঘুরতে ঘুরতে বইয়ের দোকানে Dictionary দেখে Knave এর অর্থ বুঝতে পারে এবং সে তার কৃতকর্মের জন্য আরো অনুতপ্ত হয়। দীর্ঘদিন ছেলের জন্য কিছু কেনেনি। দুটি ভালো Dictionary আর একটি কেক নিয়ে এসে ছেলে রাকেশের কাছে ভুল স্বীকার করে। তারপর অনেক Capital ক্ষতি হবে জেনেও ঐ Bank Manager এর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে এবং বলে আসবে-আপনি ইংরেজিটা আমার ছেলের থেকে কম-ই জানেন। গল্পে শেষে মকরের উপলব্ধি---

‘যেদিন নার্সিং হোমে রাকেশ জন্মেছিল,
সেদিন আমি শুধু ওর জন্মদাতাই
ছিলাম। এতদিন, এত বছর পরে, আজ
এক দুর্লভ ধ্রুব সত্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠে
আমি ওর বাবা হয়ে উঠলাম।’[১]

‘কুচিলা-খাঁই’ গল্পটি পাঠকদের কাছে রোমান্টিক অনুভূতি নিয়ে আসে। একই সঙ্গে জীবনে রূঢ় বাস্তব এবং অপ্রিয় নির্মম অতীতকে দ্যোতিত করে। গল্পের মূল চরিত্র গৌতম এবং বিদেশী সিন্থিয়া। Adventure প্রিয় গৌতমের যাযাবর জীবনে নীড় বাঁধার স্বপ্ন আসে। কটক শহরের টুল্বকা ফরেস্ট হাউসে বিদেশী সিন্থিয়ার সঙ্গে আলাপ সূত্রে গৌতমের চিত্তে প্রেমানুভূতির মর্ম স্পর্শ করে। বন-জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ, লতা, পাতা, ফুল, ফল নিয়ে গবেষণারত বিদেশী সিন্থিয়ার স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্যের আবেশে মুগ্ধ গৌতম। জনরহিত জঙ্গলের মধ্যে স্টেহাউসে সিন্থিয়ার সুন্দর, সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে গৌতম তাকে পাবার বাসনা মনে মনে লালন করে। তারপর শিকারে মাছ ধরায়, স্নানে সর্বক্ষেত্রে সঙ্গী গৌতম। কিন্তু তাদের এই ক্ষণিক দেখা যে মিলনে রূপান্তরিত হবে না, তার ইঙ্গিত গল্পকার ‘কুচিলা-খাঁই’ নামক একটি পাখির কর্কশ ডাকের মাধ্যমে রূপায়িত করেন। প্রকৃতিসহ মানুষের সৌন্দর্যকে চিরে ফালা ফালা করে দেয় এই পাখির ডাক। তাই গল্পে, এমনকি মানুষের জীবনে এই পাখির ডাক অশুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে। এ বিশেষ এই পাখিটির পরিচয়ে জানতে পারি--- কুচিলা-খাঁই, বাংলার ধনেশ পাখি ইংরেজি নাম The Great Indian Hornbill. এই পাখি সম্পর্কে সিন্থিয়ার মত---They are a nuisance to this serenity. ‘কুচিলা-খাঁই’ এর মত মানুষ খেকো কিছু বর্বর মানুষ আছে যারা সিন্থিয়ার মত অবলম্বহীন সুন্দরী মেয়েদের

অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের সৌন্দর্যকে পণ্যে বিকোবার জন্য বাধ্য করে এবং দালালি করে। শান্ত, সমাহিত নারী সৌন্দর্য তখন হয়ে দাঁড়ায় মানুষ শিকারের Trap গল্পের শেষে মরিয়া হয়ে গৌতম সিন্থিয়াকে ধরে রাখতে চায়, তার অতীত ভুলিয়ে নতুন ভবিষ্যতের দিকে এগোতে চায়। কিন্তু বাধা কুচিলা-খাঁই পাখির সর্বময় উপস্থিতি ও তার কর্কশ ডাক অশুভ পরিনাম। হঠাৎ করে কুচিলা-খাঁই পাখির ভূমিকা পালনকারী দামী স্যুট, মাথায় স্ট্র হ্যাট পরা ধনী ব্যবসায়ী Pay করা সিন্থিয়াকে অধিকার করে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে জোর করল ও বাধ্য করল। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টায় ব্যর্থ সিন্থিয়া। গল্পের শেষে গৌতমের উপলব্ধি---

‘ওর জীবনময়ই কুচিলা-খাঁই। ক’টা
কুচিলা-খাঁই আর ও মারতে পারবে ?’[২]

‘মাপ’ গল্পে গল্পকার রিভলভিং চেয়ারে আটকে যাওয়া বড় অফিসের একজন বড়বাবুর বিপর্যস্ত অবস্থা বর্ননা করেছেন। বড় অফিসের বড় কোম্পানীর বিভিন্ন ব্যবসা। অফিসে কর্মরত অনেক মানুষের ভাগ্য বিধাতা বড়বাবু নিজের মাপমত চিনে মিস্ত্রীদের দিয়ে একটি পছন্দ সই চেয়ার বানালেন। উদ্দেশ্য উচু থেকে নিচে থাকা মানুষদের আত্মতুষ্টির স্বাদ পেতে চান বড়বাবু। আসলে ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষেরা আত্ম অহংকারের শীর্ষে মদমত্ত অবস্থায় নিজেদের ঈশ্বরতুল্য ভাগ্যবিধাতা বলে ভাবতে থাকে। মনুষ্যত্ব জ্ঞান ভুলে ন্যায়-নীতির পরোয়া না করে যা ইচ্ছে তাই করতে চায়। চিনে মিস্ত্রীর তৈরি রিভলভিং চেয়ারে প্রথম দিন বসেই আটকে যায় বড়বাবু। মনে হচ্ছে অহংকারের আঠায় আটকে পড়েছে বড়বাবু। কোন ভাবেই উঠতে পারছে না। বিপর্যস্ত, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অসহায় হয়ে সামান্য কর্মচারী হরিপদকে প্রাণপণে ডাকতে থাকে। অবশেষে হরিপদ’র সাহায্যে বড়বাবুর জীবন বেঁচে যায়। বড়বাবু নিজেই নিজের মাপ দিয়ে এই চেয়ার বানালেন আবার নিজেই আটকে গেলেন। আসলে, বড়বাবু চেয়ার থেকে নিজের মাপটা সব সময় বড় বলে ভাবেন। গল্পের শেষে গল্পকার সেই ইঙ্গিত-ই পাঠকদের দিয়েছেন---

‘অনেক মাইনে বড়বাবুর। পারকুইজিটস।
দালালি, কমিশন, খাতির, উপরি, ডানে
এবং বাঁয়ে। বড়ই আঠা।’[৩]

‘ব্রন্টি’ গল্পে বরুণ চ্যাটার্জী ওরফে ব্রন্টির জীবন আখ্যানের মধ্য দিয়ে গল্পকার জীবনের রূঢ় বাস্তবের চিত্র প্রকটিত করেছেন। জীবনে বাঁচা মানে শুধু ইঁদুর দৌড় নয় অন্তত পক্ষে ব্রন্টির কাছে। জীবনের সব মুহুর্তকে সে উপভোগ করতে চায়--- সফলতা,ব্যর্থতা,সুখ, দুঃখ-কষ্ট যতই যা-ই আসুক না কেন। জীবনের তলানি শুধু রস পান করার মধ্যে সে বাঁচার মমার্থ উপলব্ধি করে। মধ্যবিত্ত ঘরানায় জীবন মানে একটি অভ্যেস। প্রতিদিনকার একটি রুটিনে বদ্ধ রেখে যাপন প্রক্রিয়ার নাম-ই জীবন। জীবনে কিছু করা মানে যেকোন ক্ষেত্রে চাই Success, প্রতিযোগিতার ভিড় ঠেলে ব্যক্তি মানুষ

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠিত সাফল্য তারপর প্রাপ্তি আর প্রাপ্তি--- এই যাপন প্রক্রিয়া কাম্য নয় ব্রন্টির কাছে। তাই সাধারণ, স্বাভাবিক জীবন বলতে যা বোঝায় ব্রন্টির জীবন সেই অর্থে সেই রকম নয় অর্থাৎ জীবনে সে কিছুই করেনা শুধু মাত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষণকে সে দেখতে চায়, উপভোগ করতে চায় ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। ব্রন্টির কাছে জয়ী জীবন বা পরাজিত জীবন বলে কিছু হয় না। জীবনে যা-ই হোক না কেন সবশেষে থাকে এই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিসত্তার দেখা, তৃষ্ণা, আনন্দ, দুঃখ, উপলব্ধি-ই বড় কথা। শুধুমাত্র সিকিওরিটি, নাম, যশ, টাকার পিছনে দৌড়ানো জীবন ব্রন্টির কাছে ব্যর্থ বলে মনে হয়। সে চায় বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গের জীবন। তার কাছে Life is for living এই জীবনের মধ্যে থাকে সত্তার আত্ম-উন্মোচন, আত্ম-আবিস্কার। আর একটি জিনিস ব্রন্টি লক্ষ্য করেছে, তথাকথিত গতে বাঁধা Success হওয়ার Race এ পৃথিবী থেকে লাবণ্য'র অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে। সংকীর্ণতায় ও স্বার্থপরতায় কান্তিময় আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে। সুস্থিতি ও সুচেতনার আদল বারে বারে ভেঙে যাচ্ছে ক্ষমতাবানদের আরো ক্ষমতা বৃদ্ধির মানস ইচ্ছেয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় Total Success এর জীবন বৃত্তের বাইরেও আর একটি লাবন্যময় জীবন আছে। সেই জীবন-ই ব্রন্টির কাছে কাম্য। সেই জীবনের সঙ্গে অন্বিত থেকে আত্ম-কে খুঁজে চলেছে ব্রন্টি অন্তহীন ভাবে।

'প্রান্তিক' গল্পটি কোন একটি ভাবনার একেবারে প্রান্তদেশে পৌঁছানোর কাহিনি। প্রত্যেক মানুষ-ই তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটি বিন্দুতে পেন্ডুলামের মত দুলতে থাকে। রূঢ় পৃথিবীর পঙ্কিল সময়াবর্তে ক্ষণিকের ভুলে মানুষ পড়ে যেতে পারে অন্ধকারের খাঁদে। সাধ্যের বাইরে Ultra-Modern যুগের মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা ইন্ধন দেয় জীবনের ঝুঁকি নিতে। তখন মানুষের ন্যায়-নীতির বোধ ঝাপসা হয়ে আসে। গল্পে অশোক ব্রিলিয়ান্ট Advocate সুকল্যান সেনের Assistant হিসাবে কাজ করে। মি. হোড়ের বসের ২০লক্ষ টাকার ক্যাশক্রেডিটের একটি কেস তারা সুন্দরভাবে Solve করে এবং জয়ী হয়। বিনিময়ে মি. হোড় সুকল্যান সেনকে ৮ হাজার টাকা দেয় যদিও ডিল হয় ১০ হাজার টাকা। টাকা দেয় অশোকের কাছে। মধ্যবিত্ত অশোককে তার স্ত্রী জুলি হায়ার-পারচেজে একটি রেফ্রিজারেটর কেনার বায়না ধরে। অশোকের পকেটে এখন ৮ হাজার টাকা। শুরু হয় স্বীয় বিবেকী সত্তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব। স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে আলাদা পকেটে ২ হাজার টাকা রেখে দেয় অশোক। মনে মনে অভিনয়ের খসড়া আঁকতে থাকে। ধর্মতলায় সুকল্যান সেনের চেম্বারে যাওয়ার পর তার প্রশ্নের উত্তরে অশোকের যাবতীয় পরিকল্পনা ভেঙে যায়। সিনিয়ার Advocate কে ৮ হাজার টাকা দিয়ে অশোক বাইরে এসে একটা স্বস্তি পায়। কেননা অল্প একটুর জন্য অশোক বেঁচে গেল অন্যায় করার হাত থেকে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্রান্তিক অশোকের উপলব্ধি---

'জুলি এবং ওদের চারপাশের ওরা যাদের চেনে

জানে, সকলেই বোধ হয় অনুক্ষণ এই চৌকাঠে
পা দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন অসতর্ক
মুহূর্তে ওদের মধ্যে যে-কেউ অসততার ঘরে
পা ফেলতে পারে।’[৪]

‘পহেলি পেয়ার’ রোমান্টিক প্রেমানুভূতির আবেশে পূর্ণ গল্পটি। এই প্রেমানুভূতি স্বর্গীয় ভাব পরিমণ্ডলে বিরাজ করে। শারীরিক জৈবিক প্রেমকে এড়িয়ে গল্পকার সদ্য যৌবনে উত্তীর্ন দুই যুবক-যুবতীর মানসিক নৈকট্যের আত্মিক প্রেমকে প্রস্ফুটিত করেছেন। মূল চরিত্র গল্প কথক ও জহর বাঈজী উভয়ের-ই বয়স বিশ বছর। বিশ বছর বয়সটাই বিষে ভরপুর। এক শরীরের বিষের জ্বালা আর এক শরীরের বিষ দিয়ে নিবৃত করার জৈবিক প্রেম বিষয়ে গল্পকারের কোন আকর্ষণ নেই এবং বলা বাহুল্য তা কথকের কাছে কাম্য নয়। কথক কৌতূহল বশত ১০টাকা নিয়ে মীর্জাপুরে বাঈজী পাড়ায় গান শুনতে গিয়েছিলেন। সেখানে সে জহর বাঈজীর শান্ত, সমাহিত, শুভ্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। জহর বাঈজীও মুগ্ধ হয় আগত অতিথির প্রতি। কেননা বাঈজীও উপলব্ধি করেছে অতিথির, দৃষ্টিতে, আচার-ব্যবহারে কোন জৈবিক কামনার লেলিহান শিখা নেই। পরিবর্তে আছে শুভ্র মুগ্ধতা ও কৌতূহল। সে মুগ্ধতায় প্রিয় স্থান পায় প্রিয়ের হৃদমাঝারে। কেননা কথক কোন মুরগীর মাংস খেতে আসেনি এসেছে বাঈজীদের সুরের আবেশে মগ্ন হতে। জহর বাঈজী সেই বিষয়টি অনুধাবন করে নিজের অসহায়তার কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং আগত অতিথিকে জানায়---

‘ভাই সাব আপকি তহজিব, আপকি একলাক,
ঔর আপকি তমদ্দুন কী ইজ্জত কিয়া যায়
এ্যায়সি কুছভি হামারা পাস হ্যায় নেহি।
ম্যায় মাফি মাঙতী হুঁ।’[৫]

আসলে জহর বাঈজীদের জীবন ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করলে উঠে আসবে তাদের বঞ্চনার ইতিহাস, অসহায়ত্বের দিক আর বাধ্য-বাধকতার নির্মম পরিবেশ। কেউ-ই সাধ করে তাদের শুভ্র সৌন্দর্য পণ্যে বিকোতে বাঈজী হয়নি। তবে বাঈজী হলেও কি জহরের মন নেই, ভালোবাসা নেই ? গল্পের শেষে জহর বাঈজী তার প্রমাণ রেখে যায়। তার অতিথি শালায় আগত ছোট্ট গল্পকথকের প্রতি অর্পণ করে তার জীবনের পহেলি পেয়ার।

‘নবীন মুহুরী’ গল্পটিতে যন্ত্রের সাথে মানবের লড়াইয়ের ইঙ্গিত প্রতীকায়িত হয়েছে। যন্ত্র সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদদের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যন্ত্রদানবের কাছে বিপর্যস্ত হচ্ছে মানবজীবন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে না পরে অনেক পুরানো কর্মী কর্মক্ষেত্রে তাদের কাজ হারাচ্ছে। গল্পে নবীন মুহুরী এমন-ই একজন পুরনো আমলের হিসাব রক্ষক। নগেন সাহা’র গুদামে চল্লিশ বছর কাজ করার পর বেতন ১৯৭ টাকা হয়েছে। সেই কারখানায় নতুন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হরিপদ দাস আসায় নবীন মুহুরীর

কদর কমে গেছে। সে এখন বুড়ো হাবড়া। কর্মক্ষেত্রে নবীন মুহুরীদের মত কর্মীদের দাম এখন ৭৫০ টাকা। কেননা জার্মানিতে আবিস্কৃত কারখানায়, ব্যবসায়-এ ব্যবহৃত Adding মেসিন এর দাম এখন ৭৫০ টাকা। এতে কোটি কোটি টাকার হিসেব নিমেষে করে ফেলা যায় এবং Save করে রাখা যায়। তাই আলাদা করে হিসাব রাখার অধিক কর্মী, বুড়ো কর্মী রাখার প্রয়োজন পড়ে না।

'টাটা' গল্পে গল্পকার বুদ্ধদেব গুহ আধুনিক মেকি সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়েছেন। উগ্র পশ্চিমি জীবন Style ধীরে ধীরে স্মৃতির বাইরে ঠেলে দেয় সনাতনীয় বাঙালি ঐতিহ্যকে। মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত অনুকরণীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যের জৌলুসে মধ্যবিত্ত জীবন হয় বিপন্ন। অলোচ্য গল্পে এমন-ই নির্মম বাস্তবতায় বিপন্ন জীবনের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন গল্পকার। জীবনের সুবর্ণ পর্ব পার করে হরেনবাবু ও তার স্ত্রীনীহারবালা বৃদ্ধ বয়সে উত্তীর্ণ। সামান্য চাকরীর সর্বস্ব Invest করেছেন ছেলে জয়ন্ত এর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে। শেষ বয়সের সম্বল পেনশন মাত্র ২৮ টাকা। বৃদ্ধ বয়সে কলকাতায় হরেনবাবু ও তার স্ত্রীর এই অল্প টাকায় চলা প্রায় অসম্ভব। তাই ছেলে জয়ন্ত ও ছেলে বউ দময়ন্তীর আচার-আচরণে, কথাবার্তায় ব্যথিত হলেও সব মুখ বুজে সহ্য করেন এই দুই বুড়ো-বুড়ি। জয়ন্ত কর্পোরেট দুনিয়ায় কোন একটি অফিসে কর্মরত। তার Promotion জন্য অফিসের Boss সহ কেউটে গোছের অনেককে Invite করে বাড়িতে Party এর ব্যবস্থা করে স্ত্রী দময়ন্তী। মেনুতে রেড মিট সহ বিভিন্ন নামী-দামী কোম্পানির মদ্যপানীয় আছে। সঙ্গে ইংরেজী গানের সঙ্গে কোমর দোলানো। এই পরিবেশে Modern অতিথিদের কাছে মা-বাবা'কে পরিচয় করানো লজ্জাকর ভেবে অন্য আর একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে বন্দী অবস্থায় রাখে তাদেরকে। তখন গভীর দুঃখে অপমানিত হরেনবাবুর নাতির একটি কথা মনে পড়ে গেল--- ছোট নাতি রুরু কোথাও যাবার সময় দাদু হরেনবাবুকে বলে যায়'টাটা দাদু'। এই পরিবেশে হরেনবাবুর কথাটি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হল। তিনি গোটা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করলেন---

> 'টা-টা কথাটার মানে কি ? মানে কি বিদায় ?
> এ কি, কাউকে, কিছুকে ছেড়ে যাওয়ার সময়কার
> সম্ভাষণ? কোনো গভীর ভালো লাগাকে, কোন
> বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধকে বিদায় জানানো ?
> বিদায় জানানো, শৈশব থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে
> থাকা জীবনের কোন অবিচ্ছেদ্য অংশকে ?
> রক্তপাতহীন নিঃশব্দ অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রনার শব্দের
> নামই কি এই টা-টা!'[৬]

এই সব ভাবতে ভাবতেই পুত্রের দ্বারা বন্দী অন্ধকারে হরেনবাবুর বুকে ব্যথা আরম্ভ হয়। নীহারবালা যেতে চাইলে নিষেধ করেন হরেনবাবু। যাতে ছেলের Promotion এর

জন্য দেওয়া Party তে তাদের বিঘ্ন না ঘটে। ধীরে ধীরে হরেনবাবু পাশ্চাত্য সভ্যতার বেহেল্লেপনাকে ‘টাটা’ জানিয়ে পাড়ি দেয় আলোর দেশে।

তথ্যসূত্র :

১। বুদ্ধদেব গুহ, ‘প্রিয় গল্প,’ দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্যম্, কলকাতা - ৭৩, জনুয়ারী ১৯৯৯, পৃ - ২০
২। তদেব, পৃ - ৭৮
৩। তদেব, পৃ - ৮২
৪। তদেব, পৃ - ২৮৩
৫। তদেব, পৃ - ২৮৯
৬। তদেব, পৃ – ৩৮০

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর নির্বাচিত উপন্যাসে একাকী পুরুষ

বিউটি রক্ষিত
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: একুশ শতকের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৭৬-)। সাম্প্রতিক কালের শহুরে জীবনচর্যার ছবি তাঁর রচনার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। শহরের পাকা সড়ক আর কংক্রিটের মোহমায়া তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ভুবনকে এক জমজমাট সাজ দিয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীর শহর স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখনীতে যেমন সুস্পষ্ট তেমনি এই শহরের পাত্র-পাত্রী গুলিও বহু বৈচিত্র্যে ভাস্বর। নারী-পুরুষের চরিত্রায়ণ তাদের উপস্থাপন সবকিছু মিলিয়েই স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাসের ভুবন। বর্তমান নিবন্ধে আমরা স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রায়ণের দিকটি আলোচনা করবো।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাসে নারী যেমন জীবনের বৃহত্তরে ক্ষেত্রে পদার্পণ করছে, বাধাধরা জরাজীর্ণ শৃঙ্খলতাকে ভেঙে নতুনত্বের আহ্বান করছে তেমনি অন্যদিকে পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে কাজ করেছে একাকীত্ব, ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ। 'মর্দ কো দর্দ নহি হোতা'- এই ধারণার বাইরে গিয়ে রক্তমাংসের গঠিত পুরুষের হৃদয়কেও বিগলিত করেছে স্মরণজিৎ। ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি আমাদের আলোচনার বিষয়।

সূচক শব্দ: উপন্যাস, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, বর্তমান সময়, পুরুষ চরিত্র, একাকীত্ব, মানসিক অবসাদ।

মূল বিষয়:

একুশ শতকের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তী (জন্ম-১৯৭৬-)। সাম্প্রতিক কালের শহুরে জীবনচর্যার ছবি তাঁর রচনার অন্যতম একটি দিক। সড়ক আর কংক্রিটের মোহমায়া তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ভুবনকে জমজমাট সাজ দিয়েছে। তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য ও সহজ-সরল ভাষা পাঠককে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর শব্দে জীবন্ত হয়ে ওঠে বর্তমান প্রজন্মের যন্ত্রণা, একাকীত্ব, প্রেম-ভালোবাসা। সমকালীন নাগরিক সমাজ ও প্রবল বাস্তবতার সন্ধান দেয় তাঁর সাহিত্য। এই একবিংশ শতাব্দীর শহর স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর লেখনীতে যেমন সুস্পষ্ট তেমনি এই শহরের পাত্র-পাত্রীগুলিও বহু বৈচিত্র্যে ভাস্বর। নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রায়ণ ও তাদের উপস্থাপন সবকিছু মিলিয়েই স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাসের ভুবন।

সমাজে নারীর অবস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের পদার্পণ, জগতের উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের ধীর অথচ দৃঢ় পদার্পণকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে উঠে আসতে আমরা দেখেছি। নারী প্রগতির ভাবধারায় বাংলা সাহিত্য উনিশ শতক থেকেই প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমান একুশ শতকে দাঁড়িয়ে নারী প্রগতি, নারী মুক্তি নতুন নতুন বীক্ষণের

জন্ম দিচ্ছে। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান শতক পর্যন্ত একাধিক কথাসাহিত্যের লেখনীতেই নারী প্রগতির কথা উঠে আসছে। স্মরণজিৎ চক্রবর্তীও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো পর্যালোচনা করলে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পাঠকের গোচরে আসে।

ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়লে মনে হয় পুরুষ চরিত্রের তুলনায় ঔপন্যাসিক কোথাও না কোথাও যেন নারী চরিত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তাঁর রচনায় সৃষ্ট নারীকে প্রতিবাদী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে আমরা দেখতে পাই। বিশেষত, শহুরে জীবনের উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারী যে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদচারণা করছে, সে যে বাধাধরা জরাজীর্ণ শৃঙ্খলতাকে ভেঙে নতুনত্বকে আহ্বান করেছে তার প্রমাণ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। বাস্তব সমাজের প্রতিটি নারীই যেন উপন্যাসে অঙ্কিত নারী চরিত্রের মাঝে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

নারী চরিত্রের ভিন্ন দিকগুলি যেমন স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাসে উঠে এসেছে তেমনি এর সমান্তরালে পুরুষের জগতটিও উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসে পুরুষচরিত্রগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ পুরুষের মধ্যেই কাজ করেছে ক্লান্তি, একাকীত্বের যন্ত্রণা, মানসিক অবসাদ। 'মর্দ কো দর্দ নহি হোতা'- এই ধারণার বাইরে গিয়ে রক্তমাংসের গঠিত পুরুষের হৃদয়কেও বিগলিত করেছেন ঔপন্যাসিক। একদিকে নারী চরিত্রের দৃঢ়তার দিকটি যেমন তাঁর লেখায় উঠে এসেছে তেমনি অন্যদিকে পুরুষের যন্ত্রণার দিকটিও সমানভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

পৃথিবীতে পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেই সমান সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। শারীরিক পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য তাদের থাকে না। কিন্তু পরিবার ও সমাজ নারী ও পুরুষের ভিন্ন অবস্থানকে সূচিত করে দেয়। নারীর আবদ্ধতার পাশাপাশি পুরুষের বলিষ্ঠতাকেও সমাজ বিধিবদ্ধ নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে দেয়। এই নিয়মাবলীর ঘেরাটোপে পুরুষের যন্ত্রণাও কিছু কম নয়। পুরুষ চরিত্রের এরূপ দৃষ্টান্তপূর্ণ স্মরণজিৎ চক্রবর্তী রচিত বিখ্যাত দুটি উপন্যাস হল 'পাখিদের শহরে যেমন' (২০১১) ও 'মোম-কাগজ' (২০১৬)।

ঔপন্যাসিক রচিত 'পাখিদের শহরে যেমন' উপন্যাসটির প্রধান তিন পুরুষ চরিত্র হল জয়, রথী ও বিষাণ। এই তিনজনের গল্পকে গেঁথে রাখে বর্ষাকাল, কপিল নামক এক বৃদ্ধের নিরন্তর প্রশ্ন আর বাড়ির কার্নিশ বা ব্রিজে বসে থাকা ভেজা পাখিদের দল। জয়ের পরিচয়সূত্রে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন জয় একজন বিজনেসম্যানের ডানহাত। পুরো উপন্যাস জুড়েই দেখা যায় স্ত্রী কেয়ার প্রতি সন্দেহ, কাজের টেনশন, অবৈধ ডলারের ডেলিভারি এবং বস সুতনুর ব্যক্তিগত জীবনের বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে জয় ক্রমশ বেরোবার পথ খুঁজছে। ছোটবেলা থেকেই এক অসহয়তার মধ্যে তার জীবন চলেছিল—

"বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতেই থাকত জয়। কিন্তু মায়ের মনটা ছিল ফড়িংয়ের মতো। আর তাতে আরও ঘি ঢেলেছিল মায়ের রূপ। মামার

বাড়িতে গিয়ে ওঠার এক বছরের মধ্যে নিজের চেয়ে চার বছরের ছোট একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায় মা।”[১]

এই একই দৃশ্য ঔপন্যাসিকের ‘ক্রিসক্রস’ (২০০৮) উপন্যাসে সাইমনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তার মাও সাইমন ও তার বোনকে রেখে পালিয়ে যায়। একদিকে পিতার মৃত্যু ও অন্যদিকে মায়ের পালিয়ে যাওয়া এই দুইয়ের মাঝে জয়ের জীবন তলিয়ে যেতে থাকে। আঠারো বছর বয়স পর্যন্তই সে মামা বাড়িতে আশ্রয় পায়। এরপর দিদিমা মারা গেলে মামারা তাকে বের করে দেয়। নিজেকে বাঁচাতে সেসময় জয় ছুতোরের হেল্পার, খালাসি, রঙের মিস্ত্রি, পোর্টের কুলি ও আরও নানারকম কাজ করে। এরপর সকল আর্থিক কষ্ট থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে সে সুতনুর ডানহাত হয়ে ওঠে।

কেয়াকে ভালোবেসে সে বিয়ে করে সুখী হতে চায়। কিন্তু সেখানেও সে খুব বেশি সময় ভালো থাকতে পারে না। যে কেয়া একসময় বলত-

“তোমায় আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। তোমার জন্য আমার বুকের ভিতর একটা চন্দনকাঠের বাক্স আছে”।[২]

কিন্তু সেই স্ত্রীর সঙ্গেই জয়ের মানসিক দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাদের মধ্যেকার এই দূরত্বের একমাত্র কারণ হল সন্তানের মৃত্যু। আর এই মৃত্যুর জন্য কেয়া বরাবর দায়ী করে এসেছে জয়কে। অন্যদিকে বাঁশির সঙ্গে কেয়ার মেলামেশা মেনে নিতে পারে না জয়। স্ত্রীর প্রতি তার সন্দেহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ভুল সন্দেহের কারণে সে একসময় বাঁশির বিরুদ্ধে খুনের পরিকল্পনা করতেও পিছুপা হয় না। তার মনে হয়—

“খুন একটা পদ্ধতি। একটা বিজ্ঞান। নির্দিষ্ট কিছু ধাপ পরপর ঠিক মতো না সাজালে খুন প্রক্রিয়াটিকে পূর্ণ রূপ দেওয়া যায় না। বিশেষ করে এমন একটা খুন।”[৩]

একদিকে তার সাংসারিক জীবন অন্যদিকে সুতনুর বিজনেসের কাজে জয় ক্রমশ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। আর উপন্যাস শেষে দেখা যায় যে বর্ষার রাতে সে বাঁশিকে খুন করতে চেয়েছিল সেই রাতে তার নিজেরও অ্যাকসিডেন্ট হয়। পুরো উপন্যাস জুড়ে জয়ের মধ্যে দেখা যায় মানসিক টানাপোড়েন।

অন্যদিকে রথীর পরিচয় প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলছেন—

“গতকাল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে রথী। ছ’মাস পরে বাইরের পৃথিবীতে এসে কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছিল ওর।”[৪]

বি.এ পাশ করলেও পড়াশুনোতে খুব বেশি দূর রথী এগোতে পারেনি। না বুঝে সে কলেজ পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এসব করতে গিয়ে সেও ক্রমশ জয়ের মতোই দুর্নীতির কাজে জড়িয়ে পড়ে। বাবা-মা মারা যাবার পর একমাত্র দিদির কাছেই তার আশ্রয় হয়। কিন্তু সে জানে দিদিকে টাকা না দিতে পারলে তার দিদির কাছে থাকা নিষেধ—

“বলতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে, রথীর দিদি, মানে রণিতা, পয়সার ব্যাপারটা ভালো বোঝে। ছোট থেকেই নিজেরটা গুছোতে জানত ভাল।”[৫]

রথী তার এই একাকীত্বের মাঝে ব্লসমকে বিয়ে করতে চায়। অন্ধকার জগৎ ছেড়ে সে ব্লসমের কাছে চলে যেতে চায়। কিন্তু জেল ফেরত রথীর সঙ্গে ব্লসম কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। ব্লসমের কাছে নিজেকে তার অসহায় মনে হয়। বারবার তার মনে হয় সে এই মেয়েটিকে ছাড়া বাঁচবে না—

"এই অদ্ভুত মোমের পুতুলের মতো মুখটা দেখলে রথীর বুকের ভিতর কত যে উথালপাথাল হয়, সেটা কাকে বোঝাবে ও? ওর নিজেকে যে ব্লসমের সামনে কত অসহায় লাগে সেটা ও-ই জানে।"[৬]

রথীর আরও মনে হয়েছে- "ব্লসম যখন আর ভালোবাসে না, তখন বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। সত্যিই তো, কার জন্য বেঁচে থাকবে রথী? টাকার জন্য?... একটা দুঃখী জলের ফোঁটা আলতো পায়ে চোখের পাতা থেকে গালে নামল রথীর।"[৭]

ব্লসমকে পাবার জন্য রথী অন্ধকার জগৎ ছেড়ে দিতে চায়। কিন্তু শেষবারের মতো কাজ করতে গিয়ে রথীও জয়ের মতোই ক্রমশ এগিয়ে যায় বর্ষার রাতটির দিকেই। সেও অ্যাকসিডেন্টের কবলে পরে। উপন্যাসের আরও এক অন্যতম চরিত্র বিষাণও মুখচোরা বলে ওয়াটার-পিউরিফায়ারের সেলসম্যান হিসেবে ব্যর্থ। তাকে দিয়ে একদিকে বন্ধু বিনা পারিশ্রমিকে পত্রিকার কাজ করিয়ে নেয়, নিজের দাদা পদে পদে অপদস্ত করে, তার বস তার ব্যর্থতার জন্য চাকরি বরখাস্তের নোটিশ ধরায়, আর কুমুদের সঙ্গে অদ্ভুত এক দূরত্বে সে ভেসে থাকে। পড়াশুনোতে তেমন ভালো রেজাল্ট সে করতে পারেনি। তাই সেলসম্যান হিসেবে কাজে যোগ দেয়। কিন্তু—

"সারাদিন এ দরজায়-ও দরজায় ঘুরে ঘুরে বাড়ির বউদি, মাসিমা, কাকিমা, দিদিমাদের মুখঝামটা খায়। মাসের শেষে কমিশনকে মুখঝামটা দিয়ে ভাগ করে দেখে হাতে পড়ে রয়েছে মনখারাপ।"[৮]

বিষাণের বাবা দশ বছর আগে মারা গিয়েছে। মা আর দাদা-বউদি ছাড়া তার আর কোন পথ নেই। কিন্তু নিজের দুর্বল মানসিকতা ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে দাদা চন্দ্র বিষাণকে বারংবার হেনস্থা করে। শুধু তাই নয় দু-একবার তো চড় থাপ্পড়ও মেরেছে। তার নিজের অপদার্থতার কারণে মাকেও বাচ্চাদের স্কুলে পড়াতে হয়। এমনকি কেউ অন্যায় কিছু বললেও বিষাণ প্রতিবাদ করতে পারে না—

"কিছুই বলতে পারে না বিষাণ। কে যেন ওর জিভে পাথর চাপিয়ে দেয়। কঠিন কথা বলে অন্যের মুখ ম্লান করে দেওয়ার শিল্পটা শেখা হয়নি ওর।"[৯]

আলোচ্য উপন্যাসে অন্য দুই পুরুষ চরিত্রের আলোকে যখন বিষাণ চরিত্রটিকে দেখা যায় তখন দেখা যায় বিষাণ একদিকে যেমন মানসিকভাবে দুর্বল অন্যদিকে পরিবারের মধ্যে থেকেও নিজের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সে বারবার একাকীত্বে ভুগছে। আবার অন্যদিকে জয় ও রথী কিন্তু আর্থিকক্ষেত্রে যথেষ্টই সচ্ছল। ঔপন্যাসিক এই দুই ধরনের চরিত্রকে দুভাবে অঙ্কন করলেও একটি সাধারণ বিষয়ই লক্ষণীয় যে প্রত্যেক পুরুষ চরিত্রের মধ্যেই কাজ করেছে মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি ও অসহয়তা। উপন্যাসের একটি অংশে ঔপন্যাসিক বলেছেন—

"বিষাণ বোঝে, সেলস সবার জন্য নয়। ওর মতো মুখচোরা, সেন্টিমেন্টাল মানুষের পক্ষে 'পুশি' হয়ে জিনিস বিক্রি করা সম্ভব নয়। সেলসম্যানের আমিত্বকে ঢেকে রাখে ওর লাজুক স্বভাব, যা সন্তোষদার ভাষায় 'ঢং'।[১০]

এই পুরুষ চরিত্রগুলির বিপরীতে আমরা যখন কেয়া, ব্লসম বা কুমুদকে দেখি তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় তাদের মধ্যেও একটা একাকীত্ব কাজ করছে। কিন্তু পার্থক্য এখানেই যে তাদের দুর্বলতার দিকগুলি উপন্যাসে খুব বেশি প্রকাশ পায়নি। প্রত্যেকেই তারা সাবলম্বি বা নিজে কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। কেয়ার একটি লেডিস টেলারিং শপ আছে। আবার সে একটি বিউটি পার্লারও খুলতে চায়। ব্লসম কেয়ার কাছে বিউটি পার্লারের কাজ শিখতে চায়। কুমুদ পত্রিকার কাজের সঙ্গে যুক্ত। একদিকে চারিত্রিক গঠনের ক্ষেত্রে তারা যেমন পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি শক্ত সামর্থ্য তেমনি অন্যদিকে তাদের মধ্যে কোন অসহয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলোচ্য 'পাখিদের শহরে যেমন' (২০১১) উপন্যাসের পরবর্তীতে ঔপন্যাসিকের আরও একটি উপন্যাস 'মোম-কাগজ' (২০১৬)- যেখানে ঔপন্যাসিক এক ভিন্নধর্মী পুরুষ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। অত্যন্ত শিক্ষিত ও আর্থিক ভাবে সবল হওয়া সত্ত্বেও সর্বক্ষণ মানসিক টানাপড়েন ও একাকীত্বের যন্ত্রণা গ্রাস করেছে, এমনই এক চরিত্র রুকু। আলোচ্য উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় দীর্ঘ দশ বছর পর শিকাগো থেকে কলকাতায় এসেছে রুকু। তার পুরনো বাড়ি, পরিবার, ও অন্য এক হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষকে সে দশ বছর পর খুঁজতে শুরু করে। আর এই অন্বেষণের মধ্যে দিয়েই বারবার তার চোখের সামনে চলে আসে দশ বছর আগের সমস্ত গল্প। যে জীবনে তার মা ছিল, বাবা ছিল আর ছিল তার ভালোবাসার মানুষ তোশনা। কিন্তু সবকিছুকে হারিয়ে সে শিকাগোতে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় পর সে আবার সব ভুল বোঝাবুঝিকে মিটিয়ে ফেলতে চায়।

রুকুর মা-বাবা ভালোবেসে দুজনকে বিয়ে করে। কিন্তু সেই ভালোবাসার সম্পর্কের সমীকরণ ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। সম্পর্কের মাঝে চলে আসে তিক্ততা। রুকু বলছে—

"আমার জীবনের প্রথম আট-ন' বছর বাবা আর মায়ের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারপর কী হয়েছিল কে জানে, বাবা আর মায়ের মধ্যে একটা সমুদ্র ঢুকে যায়।"[১১]

আর এই তিক্ততার কারণেই রুকুর মা ক্রমশ মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। একদিকে বাবার সঙ্গে একই পরিবারে থেকেও লক্ষ যোজন দূরত্ব অন্যদিকে মায়ের নেশার আসক্তি এই দুইয়ের মাঝে তার জীবন তলিয়ে যেতে থাকে। পরিবারের কাকু-কাকিমা ও ঠাকুমার সঙ্গেও সে মেলামেশা করতে পারে না। উপন্যাসে তার মানসিক যন্ত্রণার চরম পরিণতি তখন দেখা যায় যখন সে জানতে পারে তার বাবার বিবাহ বহির্ভূত এক সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই সম্পর্কে একটি ছোট মেয়েও রয়েছে।–

"সারা ঘরটা বনবন করে ঘুরছিল যেন। গা গুলোচ্ছিল আমার। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম ছোট্ট মেয়েটাকে! এর নাম ঋতি! এ আমার বোন! আমার একটা বোন

আছে, সেটা চব্বিশ বছর বয়সে এসে জানলাম! এটা কোন জীবনে আছি আমি? কোন অভিশাপে এমন একটা জীবন পেলাম!"[১২]

বাবার এই আচরণে মা সুইসাইডের পথ বেছে নেয়। আর অন্যদিকে রুকু এসবের মাঝে তোশনার ভালোবাসা পেতে চাইলে সেক্ষেত্রেও সে ব্যর্থ হয়। মায়ের মৃত্যুর দিনে একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাদের সম্পর্কের মাঝেও তৈরি হয় দূরত্ব। আর এই সমস্ত কিছু থেকে পালাতেই রুকু পাড়ি দেয় বিদেশে। সবকিছু থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। মোম-কাগজে জড়ানো আবছা সম্পর্কগুলো তাকে ক্রমশ অবসাদের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু দশ বছর পর কলকাতায় এসে সে একদিকে যেমন তোশনার সঙ্গে ভুলবোঝাবুঝি মেটাতে চায় তেমনি বাবার ভুলকে ক্ষমা করে বোন ঋতির জন্য কিছু করতে চায়। পুরো উপন্যাস জুড়ে দেখা যায় রুকু বেশিরভাগ সময়তেই নিজেকে একা রেখেছে। পরিবারের সঙ্গেও তার যেমন আত্মার বন্ধন সৃষ্টি হয়নি তেমনি বন্ধু ও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গেও তার একটা অদৃশ্য দূরত্বই থেকে গেছে। আর এই একাকীত্বই তাকে ক্রমশ ক্লান্তির পথে নিয়ে গেছে। বিদেশে দীর্ঘ দশ বছর একা থাকবার পর কলকাতায় গিয়েও তার মনে হয়েছে—

"ওই দেশে গিয়ে এমন একটা মানসিকতায় চলে গিয়েছিলাম যে, কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আর ছিল না। সেই অনিচ্ছেটাই এত বছরে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।"[১৩]

আলোচ্য উপন্যাসেও একইভাবে দেখা যায় ঔপন্যাসিক পুরুষ চরিত্রকে মানসিকভাবে যতখানি দুর্বলভাবে প্রতিপন্ন করেছেন, নারী চিত্র অঙ্কনে কিন্তু ততখানি করেননি। পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়েও রুকু যেমন কিছু বলতে পারেনি তেমনি বাবার অন্যায়কেও সে মুখ বুজে মেনে নিয়েছিল। এমনকি মায়ের মৃত্যুর পর সে নিজেকে ভালো রাখতে শিকাগোতে পালিয়ে যায়। তোশনার সঙ্গেও সে আর দেখা করেনি। রুকু চলে গেলে তোশনা আবার বিয়ে করলেও তার ডিভোর্স হয়ে যায়। কিন্তু এই যন্ত্রণা এড়াতে কিন্তু সে রুকুর মতো পালিয়ে যাবার কথা ভাবেনি। বরং সেখানে দাঁড়িয়েই সে নিজে কিছু করার কথা ভেবেছে। আর এখানেই রুকুর সঙ্গে তার মানসিকতার তফাৎ। অন্যদিকে উপন্যাসে জিনিতার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় রুকু তার ভালোবাসার প্রস্তাব মেনে না নিলেও সে অন্যজনকে বিয়ে করেছে। প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এগিয়ে গেলেও রুকু কিন্তু পারেনি। অবসাদ, ক্লান্তি, টানাপোড়েনের মাঝেই সে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে।

ঔপন্যাসিক স্মরণজিৎ চক্রবর্তী তাঁর প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রের যন্ত্রণাকেই বেশি তুলে ধরেছেন। তাঁর সৃষ্ট নারীদের মধ্যেও কিন্তু যন্ত্রণা, অবসাদ, একাকীত্ব দেখা যায় কিন্তু যে বিস্তৃত পরিমাণে পুরুষের ক্ষেত্রে তা বর্ণিত সেই ব্যাপক হারে নারীদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি। বরং দেখা যায় পুরুষ ক্রমশ অবসাদে তলিয়ে গেলেও নারী কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছে, যা পুরুষ করেনি। এতকাল নারীদের যন্ত্রণাকেই সাহিত্যের পাতায় আমরা বেশি পরিমাণে উঠে আসতে দেখেছি। পুরুষ অর্থেই সে শক্ত, সবল হবে এ ধারণা যে ভুল, পুরুষেরও যে কষ্ট হয়, তা কিন্তু

ঔপন্যাসিক বারবার পুরুষ চরিত্রের আলোকে দেখিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য দুই উপন্যাস তারই প্রমাণ।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, ২০১১ 'পাখিদের শহরে যেমন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ.৩৭
২. প্রাগুক্ত। পৃ. ১২
৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩৫
৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ২১
৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬
৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৮
৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭২
৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯
৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫
১০. প্রাগুক্ত। পৃ. ৬১
১১. চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ, ২০১৬ 'মোম-কাগজ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ. ৫৪
১২. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬৪
১৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৮

সহায়ক গ্রন্থ:

চক্রবর্তী. স্মরণজিৎ, 'পাখিদের শহরে যেমন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
চক্রবর্তী. স্মরণজিৎ, ২০১৬, 'মোম-কাগজ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

নীলদর্পণ নাটক প্রতিবাদী ভাবনার উৎসমুখ

মহঃ অয়াশিক উল্লা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিবাদী চেতনার অগ্নিসাক্ষী তাঁর 'নীলদর্পণ'। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সেই প্রতিবাদের ফসল তো আজ ইতিহাস। ১৮৬০ সালে তাঁর লেখা 'নীলদর্পণ' নাট্য গঠনের দিক থেকে খুব সবল নয়। কিন্তু এই নাটক সাহস এবং শৌর্যে সুন্দর। বাংলা সমাজ-সাহিত্যে এই নাটকটি অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই। এই নাটকের অন্যতম পুরুষসিংহ নবীনমাধব তার পৌরষত্বের পরিচয় রেখেছেন। বড় সাহেবের অকথ্য গালি ও জুতোর ঠোক্কর নির্বিবাদে হজম না করে, সাহেবের বুকে পদাঘাত করে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। তোরাপ গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উপর রোগ সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। প্রথম বাঙালি বা ভারতীয়, যে ইংরেজদের গায়ে হাত তুলেছে। তোরাপের সঙ্গে ছিল পরোপকারী নবীনমাধব। রোগের হাত থেকে ক্ষেত্রমণি উদ্ধারের পর পাপীষ্ঠকে নীতি উপদেশ দিয়েছেন- "রে নরাধম, নীচবৃত্তি, নীলকর! এই কি তোমার খ্রীষ্টান ধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বর্ত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!" এ যেন মধ্যবিত্ত ভদ্র যুবকের কথা। মুসলমান কৃষকের ছেলে তোরাপ এদের প্রকৃত ওষুধ জানে বলে গলদেশ ধরে চপেটাঘাত, গলা টিপে ধরা, হাঁটুর গুতো, কানমলন এর কম কিছু ভাবতে পারেনি। তোরাপ কেড়ে নিল আমাদের ভালোবাসা আর ক্ষেত্রমণির দুঃখ আমাদের রক্ত গরম করে দিল। নাট্যকার দীনবন্ধু এই নাটকে তোরাপ চরিত্রটিকে তীব্র প্রতিবাদী করে তুলেছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ ভারতীয় নাট্যসাহিত্য বা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করেছে।

সূচক শব্দ : নীলকর, প্রতিবাদ, পৌরষত্ব, পদাঘাত, গর্ভবতী, অত্যাচার, পাপিষ্ঠ এবং কানমলন।

মূল আলোচনা :

নাটকের নাম 'নীলদর্পণ', গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ। এই নাটকের নাট্যকার নামবিহীন, পরিবর্তে আছে-"নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিকেনাভিপ্রণীতম।[১] কিন্তু আমরা জানি, গ্রন্থে ব্যবহৃত গ্রন্থপ্রণেতা আসলে দীনবন্ধু মিত্র, যিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে ডাকবিভাগের উঁচুপদে আসীন, অত্যন্ত কর্মদক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে ঢাকা, বিহার, উড়িষ্যা, দার্জিলিং, কাছাড় দাপিয়ে

বেড়াচ্ছেন। ক্লান্তিহীন ভাবে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু পুরস্কারের ভাঁড়ারে শূন্য। বিধাতা পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু মানুষ পাঠান, যাঁরা শুধু দিয়েই যান – কিছু নেন না, দীনবন্ধুও বিধাতা প্রেরিত সেই ধরনের মানুষ তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

'দর্পণ' শব্দের সোজা বাংলা অর্থ 'আয়না'। এই আয়না দিয়েই তো আমরা নিজের নিজের মুখ দেখি, ক্রিম লাগাই, চাকচিক্য করি। 'নীলদর্পণ' নামকরণের মধ্যেও সেই নিজের মুখ দেখার প্রয়াস আছে। দীনবন্ধু সেই নীলকর ইংরেজদের কলঙ্ক-ছাপ মুখ, নিষ্ঠুর-কাজকর্ম, বিকৃত মুখগুলোকেই দেখানোর জন্য নাটকের নামের সঙ্গে 'দর্পণ' কথাটিকে যুক্ত করেছেন। যিনি সাহিত্যিক তিনি তো প্রতিবাদ করার নাম করে সরাসরি তারোয়ল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না। তিনি বর্তমানকে, ভাবী প্রজন্মকে ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিতে পারেন। দীনবন্ধু তা-ই করেছেন। নাটকের ভূমিকাতে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন–"নীলকর নিকর করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারন করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।"[২] – এই মুখ রক্ষার প্রয়োজনেই 'দর্পণ'। একটি প্রচলিত প্রবাদ দীনবন্ধুর পক্ষে কার্যকর – 'সাপও মরল না, লাঠিও ভাঙ্গল না'। কিন্তু সাপটা পালিয়ে গেল প্রকৌশলে।

কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা তাঁদের কলম ধরেন, অহেতুক কল্পনা বিলাসিতার জন্য নয়। দেশ, দশের অন্যায়, অবিচারে ব্যক্তি শিল্পী মনে প্রতি মুহূর্তে হতে থাকে রক্তক্ষরণ। সামাজিক, নৈতিক, মানবিক দায়বদ্ধতায় কোনো এক অস্বস্তির কাঁটা দিন-রাত বিঁধতে থাকে, আর তারই ফলশ্রুতিতে সাহিত্যে উঠে আসে প্রতিবাদ। দীনবন্ধু মিত্র নাটকের অবয়বে আমাদের বাংলাদেশে উদ্ভূত নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে রূপদান করেছেন। তাঁর লেখার যে জোর ও জের এতটাই ফলপ্রসু হয়েছিল তা বোধকরি বাংলাদেশে অন্য কোনো নাটক বা সাহিত্যিকের মাধ্যমে এতটা হয়নি। সম্ভবত ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নাটকের লেখা শুরু হয়েছিল, আর প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৬০-এ, ফললাভ একেবারে hot cake'র মতোই। 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে নাম ছিল – 'A Native'। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি এই Native আর কেউ নন, তিনি হলেন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যানুযায়ী –" 'নীলদর্পণ' অনুবাদিত হইয়া ইংলন্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দন্ডনীয় হইয়া কারারুদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।... ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"[৩] সুপ্রীম কোর্টে জেমস লঙের বিরুদ্ধে রায় হয় একমাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেখানে উপস্থিত থেকে

জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। এই নাটকে বাস্তবতা এতটাই যে তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকা নীলকরদের বিরুদ্ধে এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধের জন্য মুক্তকণ্ঠে ও মুক্তহস্তে কলম ধরেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে বলেন– "নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, প্রজাপীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। দেখ, প্রজারা আপন অধিকারস্থ না হইলে, তাহাদের ওপর সম্পূর্ণ বল প্রকাশ ও স্বেচ্ছানুরূপ অত্যাচার করা সম্ভাবিত হয় না, অতএব তাঁহারা স্বীয়-স্বীয় কুঠীর সন্নিহিত গ্রামের সকল ইজারা লইয়া থাকেন এবং তদ্বারা তাহাদিগকে স্বীয় লোভ খর্পরে পতিত করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। করিলে তাহারা এই কৌশল দ্বারা ভূস্বামীদিগের সদৃশ প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত পরাক্রম প্রাপ্ত হয়েন এবং বাস্তবিক আপনাদিগকে স্বাধিকারের সম্রাট স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রজাপীড়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদানুযায়ী ব্যবহার করেন।"[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশে নীলচাষের শুরু হয়। শোনা যায় মঁসিয়ে লুই বোনার নামে এক ফরাসি ব্যক্তি ভারতে প্রথম নীলচাষ প্রবর্তন করেন। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। বোনার প্রথমে হুগলি জেলার তালডাঙ্গায় একটি নীলকুঠি তৈরী করেন, পরে চন্দন নগরে নিয়ে যান। প্রথম দিকে ৫০-৭৫ বিঘা জমি দেওয়া হত, পরে তারা বেশি লাভের মোহে পড়ে যত খুশি জমিতে নীলচাষ করতে শুরু করেন। বাংলাদেশের উর্বর মাটিতে এই নবাগত নীলগাছ বেশ ডগমগিয়ে ওঠে। ইংরেজরাও তাদের প্রয়োজনে এই নীলচাষের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে। তারা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে নীলকুঠি নির্মাণ করে ও গ্রামীণ কৃষকদের অগ্রিম টাকা দিয়ে নীলচাষ করতে বাধ্য করে। বেশি মাত্রায় নীল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের ওপর জোর-জুলুমই শুধু নয়, কোনো ভাবে দাদন অর্থাৎ টাকা ধরিয়ে দিয়ে অনিচ্ছুক চাষীকেও নীলচাষ করানোর জন্য বাধ্য করে। অ-রাজী কৃষকদের বন্দী, আটক, মারধোর, গোরু লাঙ্গল কেড়ে নেওয়া এমনকি বৌ, কন্যাকে অপহরণ ও সতীত্ব নষ্টের মতো পাশবিক অত্যাচারে নীলকর সাহেবরা পিছপা হত না। তাদের অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে নীলচাষে অসম্মত গ্রামকে লুঠ করা, এমনকি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবার মতো কাজও তারা করেছে। আর থানা, পুলিশ, মামলা, মোকদ্দমা করলে কি হবে? শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে যায়। দেশীয় যন্ত্রণা-কাতর নীলচাষীদের কিছুই করার ছিল না। যারা পেরেছে গ্রাম, ভিটেমাটি, জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়েছে,আর যারা পারেনি – মান, সম্মান, ইজ্জত হারিয়েছে আর বিধাতা পুরুষের কাছে অহোরাত্রি মৃত্যুকামনা করেছে। তৎকালীন পত্র-পত্রিকা অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধনী' থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এমনকি প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রতিবাদ বিবৃত হয়েছে। 'আলালের ঘরের

দুলাল' গ্রন্থে আছে– "নীলকর ব্যাটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল! প্রজারা ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।"[৫]

গ্রামীণ নীলচাষীরা নীল বুনবে না, বুনবে না বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিলেও কোনো কাজ হয়নি। কারণ আইন আদালত তো তাদেরই। তবে নীলচাষের জন্য যে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি, তা নয়। গড়ে উঠেছে, কিন্তু নীলকর সাহেবরা সেগুলো সুকৌশলে চাপা দিয়ে দিয়েছে। বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস যশোহরে নীলচাষের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ বা সাক্ষ্য আছে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন, সেটি এরকম- "নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে কিন্তু নীলদর্পণ এর মতো শক্তি আর কিছুতে নাই।"[৬] তাহলে বোঝাই যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটককে 'শক্তিশালী' নাটক বলে এই নাটকের ভালে দর্পিত জয়টীকা পরালেন। কোনো অখ্যাত নাট্যকারের লেখা প্রথম নাটক সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাটের এরকম মন্তব্য চাট্টিখানি কথা নয়। এই নাটক প্রকাশের আগের মুহূর্তের বাংলাদেশ শান্তির বাংলাদেশ নয়। শাসক আর শাসিতের মধ্যে অহিনকূল সম্পর্ক অনেক আগে থেকে তৈরী হয়ে গেছে। এই নাটক প্রকাশের আগে বাংলাদেশে মহাবিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছে। শুধু তাই নয়, দিকে দিকে নীলবিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। বিদেশি শাসক এই রকম পরিস্থিতিতে তাদের শোষণ ও শাসনের মাত্রা যে বাড়বে সেটাই স্বাভাবিক। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধে জেতার পর বাংলার শাসনদন্ড তারা নিয়ে নেয়। এরপর শাসনের অনেক কানামাছি খেলা চলেছে। যেন-তেন প্রকারেণ শাসনের সুবিধার্থে নতুন নতুন আইন পাশ করিয়ে শাসন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করেছে। ইংরেজরা নতুন নতুন আইন পাশ করিয়ে সেই আইনে বলে, যে চাষী একবার নীলচাষের জন্য দাদন অর্থাৎ টাকা নিয়েছে সেই চাষীর জমির ওপর নীলকরদের বিশেষ স্বত্ত্ব বা অধিকার থাকবে এবং দাদন গ্রহণ করা চাষীরা নীলচাষে অসম্মত হলে তারা দন্ডযোগ্য অপরাধ করেছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আর এই দন্ড অবশ্যই কারাদন্ড। এই আইনের প্যাঁচে পড়েই নীলচাষীদের প্রাণ কিনারায় ঠেকেছিল। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝিতে শুরু হয় নীলবিদ্রোহ। এরপর ১৮৬০ সালে বসে নীল কমিশন। বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ হয় নীলচাষ। কিন্তু এই কমিশনের পর যে আইন পাশ হয়, সেখানে নীলচাষ বন্ধের কথা ছিল না। পরে সেই আইন প্রত্যাহৃত হলে সেই বছরেই 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত।

উৎপল দত্ত তাঁর 'Political Theatre' গ্রন্থে একটি মন্তব্য করেছিলেন – "We have tried to put revolution in a historical prospective."[৭] –এই কথার সূত্র ধরেই বলা যায় নাটকে যেমন সমকালীন কোন সমস্যাকে প্রতিভাত করা হয়, আর এই কাজটি করতে গিয়েই স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে Revolution বা

প্রতিবাদের কথা। নাট্যকার নির্যাতিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা না বলে পারে না বলেই উঠে আসে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রশ্ন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের মধ্য দিয়ে থিয়েটারের দ্বার উদঘাটিত হয়। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- "দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম দেশের শাসক শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ, সভ্যনামিক মানুষের বর্বর অন্তর উদঘাটিত হইল। নীলদর্পণে সমগ্র দেশের মর্মবেদনার প্রকাশ হওয়ায় দেশে যেমন সাড়া পড়িয়াছিল তেমনটি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বিলাতেও এই আন্দোলনের ধ্বাক্কা পৌঁছিয়াছিল।"[৮]

'নীলদর্পণ' নাটকটি দ্বিতীয়বার অভিনয়ের সময় একাধিক ইংরেজ রাজকর্মচারী এসে তা পর্যবেক্ষণ করতেন। আপত্তিকর কোনো অংশ অভিনীত হলে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইংরেজ সরকার এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করার জন্য 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' আইন সম্মতভাবে লাগু করেছিল। সাহিত্যে বাক্-স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করার মতো ক্ষুদ্র মানসিকতা সেদিন ইংরেজ সরকার নির্লজ্জভাবে দেখিয়েছিল। তবুও এদেশের সৃজনশীল মানুষের কণ্ঠ ও কলম রুদ্ধ হয়ে যায় নি। মৃত্যুভয়, জীবিকাভয়কে তুচ্ছ করে তাঁদের কলম আরো শাণিত হয়েছে। দীনবন্ধু নির্ভীকতা ও দুঃসাহসিকতার চরম নিদর্শন দিয়েছেন সমকালীন সময় ও প্রেক্ষিতে। দীনবন্ধুর এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে স্বাধীনতাপ্রিয় একজন জাতীয়তাবাদীর। সেই দিক দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র যে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 'দেশ' পত্রিকায় 'দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশ চিন্তা' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন– "দীনবন্ধুই প্রথম বাঙালীকে দেশের কথা ভাবিতে শিখাইলেন। তিনি প্রথম বিদেশী বণিকের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরেজচালিত সংবাদপত্রের হীনমন্যতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। আবার ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকের অন্যায় উৎপীড়নের কথা বলিতে যাইয়া তিনিই প্রথম তাহাদের বাঙালী সহায়কদের লোভ ও কাপুরুষতার এক গ্লানিকর চিত্র বাঙ্গালীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন। এই নাটকেই প্রথম বাঙালী দেশসেবক সাহেবের বুকে পদাঘাত করিল।"[৯]

আজ থেকে 'নীলদর্পণ' নাটকের দেড়শো বছরেরও বেশি পূর্ণ হয়েছে, তবুও আমরা আজও একইভাবে স্মরণ করছি। যদিও ১৮৬০ থেকে আজকের সময়ের মাঝে অনেক বিপ্লব, আন্দোলন, রাজনৈতিক পালাবদল, স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ, শাসকের জামার রঙ বদল অনেকবার ঘটে গেছে, কিন্তু নীলদর্পণের মূল আবেদনে জনগণের প্রাথমিক উপাদনটি এখনো একই রকম আছে। নাটক রচনার উপাদানগত, গুনগত গঠন বদলেছে, কিন্তু অবাক লাগে নীলদর্পণের অভিনয় দেখা দূরের কথা, নাটকটি পড়তে গেলেই আমাদের শরীরের রোমকূপ গুলো এখনো বিড়বিড় করে। আজকের

দিনে গণচেতনা বলতে যা বোঝায়, এই 'নীলদর্পণে' তা যথার্থভাবেই বিরাজিত। আজকে যাকে আমরা 'মার্কসবাদ' বলছি দীনবন্ধু দেড়শো বছর আগে তাই প্রকাশ করে গেছেন। সমাজ সচেতন মানুষেরা যুগে যুগে একই রকম চিন্তা করেন তারই এটি একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'মার্কসবাদ' প্রদর্শিত গণচেতনা আর দীনবন্ধুর গণচেতনা তো একই সারণির। নীলকরদের নির্যাতনে অসহায়ে নারী, পুরুষ ও পরিবারের সর্বস্বান্ততার ভার লাঘব করার জন্য নিজে শত দুঃখের, অভাবের মাকড়সা জালে থেকে জনগণের, সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘোচাবার জন্য হাতে কলম তুলে নিয়েছেন। 'নীলদর্পণ' এর পাতায় পাতায় ঠিকরে ঠিকরে এসে পড়েছে অসহায় সাধারণ মানুষের চোখের জলের ঝিলিক, কখনো প্রতিহিংসার মরিয়া প্রচেষ্টা। এই দিক দিয়ে আমরা উঁচু স্বরেই বলতে পারি – 'নীলদর্পণ' গণচেতনার নাটক।

দীনবন্ধু মিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি জানিয়েছেন যে দীনবন্ধু তাঁর কর্মসূত্রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করতেন এবং বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জায়গাতেই তিনি ঘুরেছেন। আর যেখানে তিনি গেছেন, সেখানেই তিনি 'বন্ধুত্ব' গড়েছেন। বাংলাদেশে তাঁর মতো রসিক ও মিশুকে মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন বলেই তাদের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, অসহায়তার অবস্থা তাদের মতো করেই অনুভব করেছেন। অন্যের মুখে নয়, নিজের মুখেই লঙ্কার 'ঝাল-স্বাদ' নিয়েছেন। আর তাই তাঁর নাটকের এত জৌলুস।

দীনবন্ধু কর্মোপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাকেই উপজীব্য করে 'নীলদর্পণ' কে করেছেন সমৃদ্ধ। ইতিহাসের সত্যের অপলাপ করেননি। নাটকটিতে সর্বোমোট পাঁচটি অঙ্ক, আর প্রতিটি অঙ্কে অনেকগুলি গর্ভাঙ্কের সম্মেলনে সজ্জিত। নীলকর সাহেবদের অমানবিক অত্যাচারে জর্জরিত অসংখ্য নীলচাষী পরিবারের মধ্যে নাট্যকার মাত্র দুটো পরিবারকে বেছে নিয়েছেন। সেই দুটি পরিবার হলো গোলকচন্দ্র বসু ও সাধুচরণ ঘোষের পরিবার। নাটক শুরুর প্রথম দুই গর্ভাঙ্ক থেকেই জানা যায়, এই দুটি চাষী পরিবারের ওপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের খড়গ নেমে এসেছে। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত চাষী পরিবার হলেই বা কি হবে, এরাও নীলসাহেবের অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ করতে পিছপা হয়নি। যতই তারা নির্যাতিত হোক, নীল গুদামে বন্দী থাকুক, মেয়েদের ইজ্জত, আব্রু ভুলুণ্ঠিত হোক তবুও তারা মৃত্যুর মরণ কামড় দিয়েছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কেই দেখা যাচ্ছে সংঘর্ষের আভাস। স্বরপুর বাংলাদেশের একটি পল্লীগ্রাম যা নীলকরদের বিষধর দন্তের দংশনে জর্জরিত। গোলকচন্দ্র বসু এই গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। সাধুচরণ সম্পন্ন না হলেও নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক। তাদের যা ছিল তাতেই সারা বছরের অন্ন বস্ত্রের অভাব হতো না। কিন্তু গত তিন বছর নীলচাষ করার ফলে – "তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁ খান ছারখার

করে তুলেছে।"[১০] গ্রাম থেকে একে একে সবাই চলে যেতে শুরু করেছে, এমনকি দক্ষিণ পাড়ার সম্ভ্রান্ত মোড়লরাও। সর্বনাশা নীলের চাষ করতে গিয়ে তাদের শুধু ভাতেই মারছে না, হাতেও মারছে। গোলক বসুর সুখের পরিবারে আগুন লাগে। বড় ছেলে নবীনমাধব যখন নীলকর সাহেবদের অন্যায়ভাবে চাষীদের দিয়ে জোর করে নীলচাষ করিয়ে নেওয়া এবং অত্যাচার করার প্রতিবাদ করতে গেলে। সাধারণ রায়ত সাধুচরণের অবস্থা আরও শোচনীয় কারণ সে মহাজনের কাছ থেকে সুদ নিয়ে চাষ করত, কিন্তু তার ভালো ধানের জমি নীলকররা আমিনে দাগ গিয়ে যাওয়ায় তাঁর পক্ষে সারা বছর না খেয়ে কাটানোর অবস্থা হয়েছে- "আহা জমি তো না য্যান সোনার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে?"[১১]

নীলকর উড্ সাহেবের দেওয়ানের নাম গোপীনাথ দাস। যে সবসময় নীলকরদের মন যুগিয়ে চলতে চায়। সেই গ্রামের সমস্ত কিছু ভালো-মন্দের সংবাদগুলো সাহেবদের কাছে পৌঁছে দেয় নিজের পদোন্নতির জন্য। সেই মোল্লাদের ধানচাষ বাদ দিয়ে নীলচাষ করতে বাধ্য করিয়েছে। নবীনমাধবের লাখেরাজ বাগানটাতে কষ্ট করে হলেও শেষ পর্যন্ত নীল বোনাতে পেরেছে। তার সহায়তাতেই এক সময় সাধুচরণকে ধরে নীলকুঠিতে আনতে পারে। সাধুচরণকে বাঁচাবার জন্য নবীনমাধবের সঙ্গে নীলকরদের আরও বেশি তিক্ততার সম্পর্ক তৈরী হয়। এর পাশাপাশি এই প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দেখি যে গোলোকনাথ বসুর বাড়ির মহিলারা তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারগুলো নিয়ে আমোদ আহ্লাদের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। কিন্তু সেখানেও নীলকরদের শোষণের প্রভাব আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে। অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সমস্যা সূত্রপাত হতে শুরু করেছে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখতে পাই, "সংঘর্ষের সূচনা গোলকবসুকে কারাবদ্ধ করবার জন্য নীলকরদের গোপন ষড়যন্ত্র".[১২] নবীনমাধবকে যখন কোনো ভাবেই শায়েস্তা করতে পারছে না তখন একাদশ আইনের বলে নবীনমাধবের পিতা ধর্মভীরু, শান্তশিষ্ট স্বভাবের গোলকনাথ বসুকে মিথ্যে ফৌজদারি মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। এই মিথ্যে মামলাকে প্রমাণ করার জন্য গ্রাম থেকে খেটে খাওয়া তোরাপের মতো সাধারণ প্রজাদের নিয়ে এসেছে। কিন্তু এদের দ্বারা মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করলেও, নানা রকম অত্যচার নিপীড়নের পরেও তোরাপ মিথ্যে কথা বলেনি। অপর কৃষকরা মারের চোটে ভয়ে চুপ করে গেলেও। গুদাম ঘরে আটক কৃষকদের কথার মধ্যে দিয়ে নীলকর ও তার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোর অমানুষিক অত্যাচারী রূপগুলি বেরিয়ে আসছিল। নীলকররা যে রাতের অন্ধকারে চাষীদের চোখ বেঁধে গুদামে নিয়ে আসছে সে কথাও জানতে পারা যায়। কুটির ছোট সাহেব রোগ চাষীদের শেষবারের মতো মেরে বুঝিয়ে দিতে এসেছিল তারা কি মিথ্যা বলবে। তোরাপ প্রথম দিকে বলে "ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না-ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয়

বসতি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না–জান্ কবুল।”[১৩] কিন্তু তোরাপের উপর অত্যাচারের মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন বাঁচার জন্য সাময়িক ভাবে সত্যি কথা বলবে বলে স্বীকার করে।

বসু পরিবারের ছোট বউ সরলার আশা ছিল কলেজে পাঠরত তার স্বামী বিন্দুমাধব ছুটিতে বাড়ি আসবে। কিন্তু তার পিতার বিরুদ্ধে নীলকররা মিথ্যা মামলা রুজু করছে বলে মামলার তদ্বির করার জন্য ইন্দ্রাবাদেই থেকে গেলেন। বিন্দুমাধবের চিঠি মারফত বিষয়টা নবীনমাধব জানার পর যে সমস্ত চাষীদের নাম লিখেছে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানতে পারে চাষীদের নীলকুঠির সাহেবরা ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রেখেছে। সে কারণে নবীনমাধব পাল্টা সাক্ষী খোঁজার চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হয় কারণ কুঠিয়াল সাহেবদের ভয়ে গাঁয়ের সব মানুষ তটস্থ। গ্রামের সাধারণ ছেলে মেয়ে গুলোকে শিক্ষিত করে তুলবে বলে নবীনমাধবেরা দুই ভাই মিলে ভেবেছিল এবং চেষ্টা চালাচ্ছিল একটা স্কুল তৈরী করবে। কিন্তু আজ সে সমস্ত চিন্তা থেকে সরে গিয়ে, এমনকি তার সামনে দিয়ে ‘রাইত’ কে ধরে নিয়ে যেতে দেখেও সে চুপ করে যায়, তার পিতাকে মুক্ত করার চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকায়। অতএব দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যাচ্ছে ঘটনা জটিলতার দিকে এগোচ্ছে।

তৃতীয় অঙ্কে সংঘর্ষের চূড়ান্ত অবস্থা – “প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবীনমাধব নীলকরদের সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত গোলক বসুর কারাবাস, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার।”[১৪] দেওয়ান, গোপীনাথের বুদ্ধিমতই গোলক বসুকে ফাঁসিয়েছে। তার মাথাতেই প্রথম এই বিষয়টা আসে। সে এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নিজের পদোন্নতি করতে চায়। তার প্রতিদ্বন্দী আমিনকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বেশী আয় কারার ধান্ধায়। আগে যেখানে উড সাহেব কথায় কথায় গালি দিত, কিন্তু এই ঘটনার পর অনেকটাই তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে।

নবীনমাধবের পিতাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসানোর জন্য নবীনমাধব মহা বিপদের মধ্যে পড়েছেন। এর আগে পর্যন্ত তাদের সংসারে ছিল সোনার সংসার, কিন্তু আজ তার পিতার মামলার খরচ চালানোর জন্য পাঁচশ টাকা জোগাড় করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। শুধু নবীনমাধব নয়, তার মা সাবিত্রী দেবী, স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী এবং ভায়ের বৌ সরলতা সবাই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাড়ির বউদের গয়না বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে হয়েছে। অর্থাৎ তারা চরমতম দুর্দশার জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার পরেই যে ঘটনা ঘটলো তা নাটকে অন্য স্বাদের পরিস্থিতি তৈরী করল। সাধু- রেবতীর মেয়ে ক্ষেত্রমণি পাড়ার আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে দাম দিঘীতে জল আনতে গিয়েছেল। পথে নীলকুঠির চার-পাঁচজন লেঠেল জোর করে তাকে তুলে নিয়ে এসেছে। রোগ সাহেবের কু-প্রস্তাবে ক্ষেত্রমণি সাড়া দিল না। তার পরেও ক্ষেত্রমণি নীলসাহেবকে– “ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ি যোড়া মরা

মর‍্যে মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুঁই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করবো, তোর মা-বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না........."[১৫] -এই বলে গালাগালি করলে সাহেব ক্ষেত্রমণিকে পেটে ঘুসি মেরে চুল ধরে টানে। ঠিক এরকম সময়েই তোরাপকে নিয়ে নবীনমাধব সাহেবের কামরায় প্রবেশ করে। নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলে যায়, আর তোরাপ রোগ সাহেবের গলা ধরে চপেটাঘাত এবং গলা টিপে ধরে। শুধু তাই নয় সাহেবের কান দুটোও মলে দেয় আচ্ছাসে। এ কি কম কথা, কম প্রতিবাদ? যাদের ভয়ে তারা দেশছাড়া হতে চায়, যাদের সামনে তাদের আজকের এই দুর্বিনীত অবস্থা, সেই শাসকরাজকেই চড় মারা, গলা টেপা আর কানমলা। এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক হাওয়ায় বসে ভাবতেও ভালো লাগে। গল্প গল্প মনে হয়, কিন্তু দীনবন্ধু গল্প বলার জন্য এই দৃশ্য ফাঁদেননি। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক বলেই এই প্রতিবাদ নাটকে দেখাতে পেরেছেন। অর্থাৎ এই অঙ্কে ঘটনা চরমতম উৎকর্ষতা প্রপ্ত হয়েছে যা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

চতুর্থ অঙ্কে লক্ষ করি নবীনমাধবকে শায়েস্তা করার জন্য উড সাহেবের নির্দেশে গোলক বসুকে কারাবাসের নির্দেশ দেয় বিচারক। এই রায়ের ফলে ভালো লোক গোলকবসু অপমান সহ্য করতে না পেরে জেলের ভিতরে তিনদিন না খেয়ে কাটালেন, চতুর্থ দিনের দিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। আর এখানেই যেন সংঘর্ষের করুন পরিনতি এবং সর্বনাশের মুখে গোলকবসুর পরিবার।

এরপর পঞ্চম অঙ্ক থেকে ঘটনা চরম পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। এই অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জানা যায়, নবীনমাধব পিতৃ শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত নীলবোনা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছিল। তখন সাহেব উত্তর দিয়েছিল – "যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে"[১৬] -আর সাহেব তার পায়ের জুতো বড়োবাবুর হাঁটুতে ঠেকালো।

"অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল।"[১৭] এই লাথিও যে মরণোপন্ন মানুষের এক প্রতিবাদের ভাষা। এই নাটককে এই দৃশ্যেই দেখা যায় নবীনমাধব লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর তোরাপ তার মনের ঝাল নেভানোর জন্য ইংরেজ সাহেবের নাক কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। "নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকেচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দ্যাখাবো। ..."[১৮]

বাংলাদেশে নীলকর সাহেবরা অত্যাচার চালাচ্ছিল, সেই অত্যাচররের ফলশ্রুতি এমনটাই হয়েছিল যে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। জলে ডুবন্ত মানুষ যেমন জলের মধ্যে ডুবেও প্রাণ বাঁচানোর দুর্মর প্রচেষ্টায় জলের তলার শ্যাওলাকেই আঁকড়ে ধরে, তেমনি সেদিন গ্রাম-বাংলার অত্যাচারিত মানুষ ইংরেজ শাসনে থেকেই ইংরেজকে

আঁকড়ে ধরেই প্রতিবাদের অত্যন্ত প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই প্রতিবাদ অল্প হলেও প্রতিবাদ। শাসকরাজ ইংরেজের কানমলা, গলা টিপে ধরা, সারাসরি বুকে লাথি মেরে চিৎ করে ফেলে দেওয়া- অপমানবোধ সম্পন্ন যে কোনো মানুষের পক্ষেই যথেষ্ঠ। কিন্তু নীলকর সাহেবরা যে কানকাটা! দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে অত্যাচারী শাসক সাহেব ইংরেজের অপমান হজম করার যে চিত্র দেখালেন, তা বাংলা সাহিত্যে তো বটে, বোধহয় বিশ্বসাহিত্যের পক্ষেও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আর দীনবন্ধু নীলকর সাহেবদের নির্লজ্জতার এই দৃষ্টান্ত ইংল্যান্ডের সাহেবদের দেখানোর জন্যই এই নীলদর্পণ বা নীলের আয়না। আমার মনে হয়, সাহিত্যের এই প্রতিবাদ যথাস্থানে পৌঁছাতে বেশি দেরি হয়নি।

তথ্য-সূত্র:

১. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১, পৃ. ১২৪.

২. বিশ্বাস ঊষাপতি, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ১২১.

৩. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, কলকাতা, ১৮৭৬ বসাক বুক স্টোর পৃ: ৪৪৫

৪. দত্ত অক্ষয়কুমার, 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকা

৫. মিত্র প্যারীচাঁদ, আলালের ঘরের দুলাল

৬. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী

৭. দত্ত উৎপল, Political Theatre

৮. সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪২১, পৃ. ১২৫.

৯. সেনগুপ্ত রবীন্দ্রকুমার, 'দেশ' পত্রিকা, দীনবন্ধুর স্বদেশ চিন্তা, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

১০. বিশ্বাস ঊষাপতি, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ১২৩

১১. তদেব, পৃ: ১২৬

১২. ঘোষ অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ: ১০৩

১৩. বিশ্বাস ঊষাপতি, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ১৩৮
১৪. ঘোষ অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ: ১০৩
১৫. বিশ্বাস ঊষাপতি, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২০, পৃ: ১৫৮
১৬. তদেব, পৃ: ১৭৮
১৭. তদেব, পৃ: ১৭৮
১৮. তদেব, পৃ: ১৭৯

মানভূমে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ও সত্য কিঙ্কর দত্ত - একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

অলকা মাহাতো
সহকারী অধ্যাপক,
ইতিহাস বিভাগ, আড়শা কলেজ

সারসংক্ষেপঃ- ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত আন্দোলনের ফলেই জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে বহু নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছিল। তৎকালীন বিহার প্রদেশের অন্যতম বৃহত্তম জেলা মানভূমে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব নেতৃবৃন্দ শরিক হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সত্যকিঙ্কর দত্ত। মানভূম জেলায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে সত্যকিঙ্কর দত্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করে গিয়েছিলেন। তিনি মানভূম জেলার ঝালদায় পাহাড় ঘেরা পলাশ জঙ্গলে লাঠি খেলার আখড়া গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে ঝালদার যুব সমাজকে সংঘটিত করার জন্য জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতেন। এই এলাকায় তিনি মানভূম কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ব্রিটিশ পুলিশের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন এবং পরিণতি হিসেবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শহীদ হন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুর ঝালদা তথা মানভূমবাসী তীব্র প্রতিবাদ করেন। তার অনুরাগী কয়েকজনের উদ্যোগে ঝালদার উপকন্ঠে গোকুলনগর গ্রামের নিকটবর্তী এক প্রান্তরে সমবেত হলে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে ৫জন শহীদ হন। মানভূম কংগ্রেস এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে। প্রতি বছর সেই দিন সত্য মেলা উপলক্ষে সকলেই সমবেত হয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সত্য কিঙ্কর দত্তের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

সূচক শব্দঃ- মানভূম, আন্দোলন, সত্য কিঙ্কর দত্ত, ঝালদা,ব্রিটিশ, যুব সমিতি, শহীদ, মেলা,প্রভৃতি।

মূল আলোচনাঃ-

বিগত কয়েক দশক থেকে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার প্রতি গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় আঞ্চলিক স্তরের বহু অজানা ইতিহাস গবেষকের মাধ্যমে উঠে এসেছে। বলা যায় মাইক্রো হিস্টির চর্চার ফলেই আঞ্চলিক বা স্থানীয় স্তরের ছোট ছোট ঘটনার ইতিহাস তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে যদিও এখনো এরকম বহু আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার অবকাশ রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তৎকালীন বিহার প্রদেশের মানভূম জেলার ব্রিটিশ

বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মানভূম জেলা ছিল তৎকালীন বিহার প্রদেশের তথা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম জেলা। ১৮৩৩ সালে গঙ্গা নারায়ণ হাঙ্গামার ফলশ্রুতি হিসেবে এই জেলার উৎপত্তি ঘটে।[১] এখানকার স্বাধীনচেতা জনগণের উপর বারবার ব্রিটিশদের কোপ পড়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশও হয়েছে বারংবার। বিংশ শতকের সূচনায় তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় মানভূম জেলা সুবে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের জেরে ১৯১২ সালে পুনরায় বাংলা জোড়া লাগলেও মানভূম জেলা ঐ বছরই ২২শে মার্চ গঠিত বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।[২] মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে মানভূম জেলায় সংগঠিতভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের প্রচারকার্য শুরু হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ভারতে প্রদেশ কংগ্রেস গঠিত হতে থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের শাখা হিসেবে বিহার ও উড়িষ্যাতেও প্রদেশ কংগ্রেস গঠন করা হয়। তারই ছত্রছায়ায় মানভূমে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। বিংশ শতকের বিশের দশক থেকে মানভূম জেলায় ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন তথা অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুল চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। এইসময় মানভূম জেলার ঝালদার এক কিশোর সত্যকিঙ্কর দত্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ঝালদার অত্যাচারী জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলনের প্রতীভূ ছিলেন।

সত্যকিংকর দত্ত ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আঠাশে ফাল্গুন তৎকালীন মানভূম জেলার ঝালদায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩] তাঁর পিতা বনোয়ারীলাল দত্ত ছিলেন একজন লাক্ষা ব্যবসায়ী এবং মাতা ছিলেন রজনীবালা দত্ত। পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান সত্য কিঙ্কর দত্ত পাহাড় ঘেরা মনোরম পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন। পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালা থেকে তারপর মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। সেখানে কয়েক বছর পড়াশোনা করে বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৪] বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা রাজনৈতিক পরিবেশে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু মানুষ যোগদান করতে থাকেন। মানভূম জেলায় অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে এই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত শিক্ষকতার চাকরি ত্যাগ করেন। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে অতুল চন্দ্র ঘোষ ওকালতি ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সমস্ত ঘটনা ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব পড়েছিল। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র সত্যকিঙ্কর দত্ত পড়াশুনার সাথে সাথেই দেশমুক্তির কাজে

ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঁকুড়াতে তিনি ভারত রক্ষা শিবিরে যোগ দেন।[৫] এখানে লাঠি খেলা, তরোয়াল চালনা, তীর চালনা প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

বিংশ শতকের সূচনায় বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন দ্বারা সত্য কিঙ্কর দত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাঁকুড়ায় পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তিনি ঝালদায় ফিরে আসেন। ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের শোষণ ও অত্যাচার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বিংশ শতকের বিশের দশকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের আবহাওয়া ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। এই সময় সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত সত্য কিঙ্কর দত্ত অবলিলায় পুলিশের চাকরি ছেড়ে দেন।[৬] তিনি ঝালদার উপকণ্ঠে পলাশ বনে গড়ে তোলেন লাঠি খেলার আখড়া। এই আখড়া প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় জমিদার যথা গোকুলনগর এর জমিদার হরিপদ মাহাতো, ইচাগগ্রামের জমিদার বৃন্দাবন মাহাতো, নতুনডি গ্রামের জমিদার রজনী মাহাতো প্রমুখদের সহযোগিতা ছিল। এখানে সমস্ত যুব সম্প্রদায় লাঠি খেলার চর্চার সাথে সাথে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকত। ঝালদার যুবসমাজকে সংঘটিত করার জন্য তিনি প্রচার অভিযানে নেমে পড়েন। ১৯২৫ সালে তিনি যুব সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার সভাপতি ছিলেন মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত।[৭] এই সংগঠনটি ঝালদা জয়পুর সহ স্থানীয় এলাকার যুব সম্প্রদায়কে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করতো।

ঝালদা, জয়পুর ও বাঘমুন্ডির কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে আসেন সত্যকিঙ্কর দত্ত। সেই সময় ঝালদার জমিদার ছিলেন উদ্ধব সিং। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখানকার কৃষকদের উপর অযথা অত্যাচার চালাতেন, কৃষকদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে জোরপূর্বক খাজনা আদায় করতেন। সত্যকিঙ্কর দত্ত ঝালদায় ব্রিটিশ মদতপুষ্ট অত্যাচারী জমিদার উদ্ভব সিং এর বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত করেন। বাংলার অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতির আদলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর লাঠি খেলার আখড়ায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। স্বভাবতই তিনি এখানকার জমিদার তথা বৃটিশ পুলিশের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ মানভূম জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের আহ্বানে তিনি গ্রামে গ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারকার্যে নেমে পড়েন। ১৯২৮ সালে তিনি ঝালদায় গঠন করেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং, খাদির প্রচার, জনমত গঠন প্রভৃতি কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১৯২৯ সালে মানভূম কংগ্রেসের দ্বিতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন ঝালদায় অনুষ্ঠিত হয়।[৮] এই সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম সক্রিয় সদস্য সত্যকিঙ্কর দত্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুঠামদেহী তেজস্বী এই যুবক এলাকার ছাত্র সমাজকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে আন্দোলনে যোগদান করতে

আহ্বান জানান। তাঁর সাহসিকতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার জেরে এলাকার বহু নতুন কর্মী মানভূম কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের ফলে ঝালদায় জাতীয়তাবাদের প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঝালদার জমিদার উদ্ধব সিং এর অন্যায় ভাবে খাজনা আদায় স্থানীয় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সত্যকিঙ্কর দত্তের আহ্বানে স্থানীয় যুব সম্প্রদায় পিকেটিং, বয়কট আন্দোলনের সাথে সাথে জমিদারের খাজনা বন্ধ, কৃষকদের মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবি নিয়েও প্রচার অভিযান চালান। জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হতো। এইভাবে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে ঝালদায় জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে।[৯] এমতাবস্থায় জমিদার উদ্ধব সিং আশঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। একাধারে ব্রিটিশ বিরোধী নানা কার্যকলাপ অন্যদিকে জমিদার বিরোধী কৃষক আন্দোলনের জেরে সত্যকিঙ্কর দত্তের উপর শুরু হয় কড়া নজরদারি। ব্রিটিশ পুলিশ ও জমিদার একসাথে জাতীয়তাবাদের কণ্ঠ রোধ করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তাঁকে মারার জন্য ঝালদার জমিদার উদ্ধব সিং এর প্ররোচনায় হরি ঠাকুর নামে এক গুপ্ত ঘাতকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর সুযোগ বুঝে হরি ঠাকুর বিষ মাখা কুঠার দ্বারা অতর্কিতে পিছন থেকে সত্যকিঙ্করকে আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।[১০] মানভূম জেলার সদর হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে আসা হলে গুরুতর অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। তাঁর সারা শরীর বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিন দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর অবশেষে ১৩ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১১] ২২ বছরের তরতাজা যুবকের এই পরিণতিতে ঝালদা সহ সারা মানভূম জেলাবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঝালদার আকাশ বাতাসে সত্য কিঙ্করের নাম মুখরিত হতে থাকে।

মানভূম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক অতুলচন্দ্র ঘোষ সহ বহু কংগ্রেস কর্মী সত্যকিঙ্কর দত্তের শবদেহ নিয়ে পুরুলিয়া শহরে ও ঝালদায় শোক যাত্রা পালন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আখড়াতেই দাহ করে অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।[১২] সত্যকিঙ্কর দত্তের এইভাবে মৃত্যুর ঘটনায় ঝালদায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের নির্মম রূপ মানভূমবাসী সেদিন প্রত্যক্ষ করল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। ১৯২৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০ সালে ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত ঝালদায় 'সত্যকিঙ্কর স্মৃতি সপ্তাহ' পালন করা হয়।[১৩] ৩রা জানুয়ারি সত্যকিংকর দত্তের স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মৃতি সভায় হাজার হাজার মানুষ যোগদান করেছিলেন। লাঠি হাতে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁর নামে জয় ধ্বনি দিয়েছিলেন। মানভূম কংগ্রেসের সম্পাদক অতুলচন্দ্র ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং তার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত আন্দোলনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এই সভায় সত্যকিঙ্কর দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ১৫ই জানুয়ারি মেলা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সত্যকিঙ্করের স্মৃতি রক্ষা কমিটি গঠিত হয়।[১৪]

এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন যথাক্রমে জীমূতবাহন সেন এবং শিউশরণ লাল জয়সোয়াল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সালের ১৫ জানুয়ারি সেই পলাশ প্রান্তরের আখড়ায় প্রথম মেলার উদ্বোধন হয় যা তিন দিনব্যাপী চলেছিল এবং এটি সত্য মেলা নামে পরিচিত হয়।[১৫] এই মেলা এখনো একইভাবে বিরাজমান। ঝালদার বিপ্লবী সংগঠন যুব সমিতি কৃষক সমাজকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করে।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে মানভূম সহ সারা ভারতে প্রচারকার্য শুরু হয়। জাতি- ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায় দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। ১৯৩১ সালের ১৫ জানুয়ারি সত্য মেলা ক্রমে জাতীয়তাবাদ প্রচারের মিলনমেলায় পরিণত হয়। মেলায় হাজার হাজার লোকের সমাগম ব্রিটিশ পুলিশ বানচাল করার পরিকল্পনা করে। সত্য মেলা প্রাঙ্গনে আগাম ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল।[১৬] তাসত্ত্বেও ঝালদাবাসীর আবেগকে সেদিন রোধ করা যায়নি, তারা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে সত্য মেলায় সমবেত হয়েছিল। সেদিন ব্রিটিশ পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে।[১৭] সত্যকিঙ্কর দত্তের অনুরাগী শীষ্যগণ ব্রিটিশ পুলিশের বন্ধুক দেখে এক পাও পিছু হঠেননি, বরং বন্দুকের গুলির সামনে নির্ভীক ভাবে নিজেদের বুক চিতিয়ে দেন। গণেশ মাহাত, শীতল মাহাত, মোহন মাহাত, গোকুল মাহাত, সহদেব মাহাত পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। মানভূমের ইতিহাসে এরা পঞ্চ শহীদ নামে পরিচিত।[১৮] অনেকেই আহত হন। এই প্রথম বিহারের মাটিতে ব্রিটিশ পুলিশের গুলি বর্ষন হয়, এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই নির্মম ঘটনা অমৃতসরের জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ করিয়ে দেয়। মানভূমের আপামর জনসাধারণ এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় এবং দলে দলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাভাবিকভাবেই জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

সত্যকিংকর দত্ত মানভূমের ইতিহাসেই নয়, মানভূমের মানুষের হৃদয়ে স্থান পেলেন। কুড়মালি ভাষায় গীত রচিত হল-

"কাঁহাকর ঠেঙ্গা লাঠি, কাঁহাকর দতুনকাঠি
কাঁহারে সত্য, কাঁহা সত্য হেরাওলে জীওন।
বাঁকুড়াকর ঠেঙ্গালাঠি, ঝেইলদাকর দতুনকাঠি,
অরে সত্যরে মেলাই, সত্য মেলায় হেরাওলে জীওন।।"

এই লাইন গুলির অর্থ করলে দাঁড়ায়- কোথাকার লাঠি, কোথাকার জীবন সংগ্রাম? কোথায় সত্য জীবন হারালে? বাঁকুড়ার লাঠি, ঝালদায় জীবন সংগ্রাম। সত্য মেলায় জীবন হারালে। অর্থাৎ বাঁকুড়ায় লাঠি খেলার প্রশিক্ষণ নিয়ে ঝালদায় আখড়া প্রতিষ্ঠা করে সংগ্রাম করেন এবং শেষ পর্যন্ত সত্য মেলায় বিলীন হয়ে যান। প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এই গীত গাওয়া হয়ে থাকে। এই চার লাইনের গীতে তাঁর জীবন সংগ্রামের

ইতিহাস লোকমুখে উচ্চারিত হতে থাকে। এই গীত ক্রমে মানভূম জেলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকগীত করমগীতে পরিণত হয়। এখনও কুড়মী- মাহাতো সম্প্রদায় করম উৎসবে এই গীতের মাধ্যমে সত্যকিঙ্কর দত্তকে স্মরণ করে থাকে। লোককবি মজনু মাহাত লিখলেন -

"লাঠিখেলায় মানভূম জেলার ওপর
বিনা যুদ্ধে হারালো জীবন তোর
ধন্য ধন্য ভাই সত্যকিঙ্কর।... "[১৯]

উপসংহারঃ- ঝালদার ২২ বছরের তেজস্বী যুবক সত্যকিঙ্কর দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন সংগ্রাম মানভূম তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অসীম সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠা অল্প বয়সেই তাঁকে একজন যুব নেতায় পরিণত করেছিল। তিনি বজ্র কঠিন চিত্তে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করতেন, একই সঙ্গে স্থানীয় জমিদার বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের সংগঠিত করেন। তাঁর মৃত্যু মানভূমে আইন অমান্য আন্দোলনের বিস্তারে অনুঘটকের কাজ করেছিল। ফলে এই আন্দোলন ভারতের অন্যান্য স্থানের মত মানভূমেও এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল, যেখানে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তরতাজা যুবক দেশমুক্তির লড়াইয়ে নির্দ্বিধায় যেভাবে আত্মবলিদান দিয়েছেন তার নজির বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে থাকলেও প্রান্তিক এলাকার অনেক বিপ্লবীর জীবন সংগ্রামের ইতিহাস গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা পত্রের মাধ্যমে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের একেবারে পশ্চিম সীমান্তের প্রান্তিক এলাকার এক তরুণ বিপ্লবী সত্যকিঙ্কর দত্তের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই এলাকা সেইসময় বিহারের মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাহাড়ময় পরিবেশ, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে যেভাবে জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার করেছিলেন, তা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। তাই তো তিনি মানভূমবাসীর হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন। তাঁর নামাঙ্কিত সত্য মেলা টুসু মেলায় পরিণত হয়। বিভিন্ন টুসু গীতের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়। সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহ মানভূম জেলার বহু গবেষক সত্যকিঙ্কর দত্তকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই জেলার প্রথম শহীদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও এ বিষয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

সূত্র নির্দেশঃ-

১) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-১৯৪৭*, সোনালী প্রেস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৪২

২) বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ও অন্যান্য, *পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার পুরুলিয়া*, পৃ-১০৪

৩) অমীয়কুমার সেনগুপ্ত, *মানভূমের স্মরণীয় যারা(১ম খন্ড)*, মানভূম সংবাদ, পুরুলিয়া, ২০০৬,পৃ- ১৩৬
৪) তদেব, পৃ-১৩৬
৫) তদেব, পৃ- ১৩৬
৬) তদেব, পৃ-১৩৭
৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায়,পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৪
৮) বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০৪
৯) জয়ন্ত কুমার ডাব, *অভিভক্ত পুরুলিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (১৯২১-১৯৪৭) ফিরে দেখা,* গীতা প্রিন্টার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ- ৪৯
১০) দিলীপ কুমার গোস্বামী, *মানভুমের স্বাধীনতা আন্দোলন,* পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১০, পৃ-৭৭
১১) তদেব, পৃ-৭৭
১২) *মুক্তি,* (মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সাপ্তাহিক পত্রিকা, মানভূম) ১৬/১২/১৯২৯, পৃ-৬
১৩) দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৮
১৪) মুক্তি, ০৬/০১/১৯৩০, পৃ- ৯
১৫) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৫৬
১৬) অমীয়কুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৮
১৭) দিলীপ কুমার গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৯
১৮) তদেব, পৃ- ৭৯
১৯) অমীয়কুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৮

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে শঠ ও প্রবঞ্চক চরিত্র : একটি সমীক্ষা

পূর্ণিমা সাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আর্য্য মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কথাসাহিত্যের অন্যতম উপাদান হল চরিত্র। চরিত্রের ক্রিয়াকলাপই কথাসাহিত্যের ঘটনাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। চরিত্রের দোষ-গুণ ও চারিত্রিক বিবর্তনের উপরে কাহিনির সার্থকতা নির্ভর করে। আধুনিক সাহিত্যে নায়ক চরিত্রের পাশাপাশি খল চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক-মণ্ডলীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক সাহিত্য জগতের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব যিনি কথসাহিত্য ভুবনে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।তাঁর কথাসাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তাঁর ছোটগল্পে যেমন আদর্শবান ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই, ঠিক অন্যদিকে খল চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর খল চরিত্রেরা গল্প অবয়বে বিভিন্ন ধরনের ভুমিকা পালন করেছে। জীবনের চোরাগোপ্তা পথকে বেছে নেওয়ার জন্য কারোর অতীত জীবন যেমন দায়ী আবার কখনও দেখা যায়, প্রবৃত্তিসুলভ তাড়নায় ও বৃহৎ মুনাফা লাভের আশঙ্কায় লোভাতুর মানুষের মনুষ্যত্বহীন এক বিকৃত রূপ। আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে এই ধরণের চরিত্রের উপরই আলোকপাত করা হয়েছে।
সূচক শব্দ : শঠ, প্রবঞ্চক, দুর্বৃত্ত, অপরাধ।

মানব-জীবন সম্পৃক্ত সমাজ-বাস্তবতাই কথাসাহিত্যের মূল সুর। সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকে মানুষের চিন্তা-চেতনা, বোধ-বুদ্ধি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রভৃতি। সমাজ সচেতন ও সংবেদনশীল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিকের মতামতকে অগ্রাহ্য করা যায় না- “প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্র-লেখকেরই বহুরূপী অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে সংখ্যাতীত সত্তাকে পরিবহণ করে চলেছি। আমাদেরই রোমান্টিকতার তাড়ণায় আমরা কোনো সুমধুর প্রেমকাহিনীর নায়ক হয়ে উঠি, আমাদের ভিতরে যে আদিম জিঘাংসা অবদমনের গুহায় নিহিত সে-ই ঘাতক নায়ক হয়ে জন্ম নেয়।”[১] গল্প-উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে চরিত্র অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রের মধ্য দিয়েই সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হয়। মানবিক মূল্যবোধজনিত সদাচার যেভাবে এক একটি চরিত্রকে অলংকৃত করে, ঠিক সেভাবেই শঠ ও প্রবঞ্চক চরিত্রেরা তাদের অপকর্মের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। শঠ বা প্রবঞ্চক চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, “শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি

অযৌনজ নির্বল অপরাধ। প্রবঞ্চক অপরাধীদের ছলচাতুরীর অন্ত নেই। এদের মধ্যে বহু স্বভাবের ব্যক্তি দেখা যায়। বাকচাতুর্য এদের অপকর্মের প্রধান সহায় হয়। তবে এরা যে অত্যন্ত চতুর ও কর্মতৎপর তাতে সন্দেহ নেই।"[২] উক্ত মন্তব্যকে অস্বীকার না করেও একথা বলা যায় যে, অনেক সময় অপরের অনিষ্ট সাধন করতে গিয়ে প্রতারকদের বিবেক দংশন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,— খল চরিত্রও তার খলত্বের চেয়ে বড়ো অর্থাৎ তার মধ্যে দুর্বৃত্ততা ছাড়াও কিছু ভালো গুণ থাকতে বাধা নেই— এই ভালো সবসময় নীতিগত ভালো হবে এমন কোন কথা নেই, তবে দুর্বৃত্তকেও যে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, সে তার ভিতরকার ওই 'ভালো'র জন্য। যখন এই ভালো তার ভিতরকার মন্দ দ্বারা নিরঙ্কুশভাবে আচ্ছন্ন হয় তখন সে ধ্বংস করে অপরকে, কখনও হয়ে ওঠে আত্মনাশা। কারণ দুর্বৃত্তকেও কর্মফল ভোগ করতে হয়, তাতেই রক্ষিত হয় সাহিত্যের মর্যাদা। পরিণামে দুর্বৃত্ত পারে না কখনোই জয়যুক্ত হতে।'[৩] যে সমস্ত কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের স্বকীয়তার গুণে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর গল্পসম্ভার বিচিত্র স্বাদে পরিপূর্ণ। খল চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর পারদর্শিতা অনস্বীকার্য।

পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেই কমবেশি স্বার্থপর। কিন্তু 'নক্রচরিত' গল্পের নিশিকান্তের ন্যায় লোভী মানুষ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, গল্পকার আলোচ্য গল্পে তা দেখিয়েছেন। শঠ, প্রবঞ্চকদের মধ্যে নিশিকান্ত অন্যতম। পরিবেশের শিকার, মানুষের অসহায়তার সুযোগে নিশিকান্তের ন্যায় কালোবাজারের মহাজনেরা কতটা লাভবান হয়েছিল গল্পপাঠে তা সহজেই অনুমেয়। গল্পের শুরুতেই নিশিকান্তের চোরাই ধনের বিলাতি লোহার সিন্দুকের সুস্পষ্ট ছবি রয়েছে। মানুষকে ঠকাতে সিদ্ধহস্ত নিশিকান্তের সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পর্কে গল্পকার বলেছেন— 'গোলাপাড়া হাটের সে জাঁদরেল মহাজন; শুধু সোনাদানা নয়, ধান চালের আড়ৎ, কাটা কাপড়ের ব্যবসা। গোলাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডেরও সে প্রেসিডেন্ট, সদর থেকে ছাপানো সব সরকারী খাম আসে তার নামে। তাছাড়া হাবিবগঞ্জ থানার দারোগা ইব্রাহিম মিঞাকে সে যে কী মন্ত্রে বশ করেছে কে জানে, পুলিশের হাঙ্গামা থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত।"[৪]

স্বভাবসিদ্ধ প্রতারণায় সে কেবল সাধারণ মানুষকে নয় ডাকাত দলের ছিনিয়ে আনা ধন-সম্পদের মূল্য নির্ধারণেও জুয়াচুরি করে। খাঁটি সোনার গহনাকে গিল্টি বলে চালিয়ে মূল্য বাবদ যৎসামান্য টাকা ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করে। দারোগার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্য ডাকাত দল সমস্ত জেনেও অনায়াসে মেনে নেয়। যুদ্ধের বাজারে আটশো মন চাল মজুত করে রেখেছে, চল্লিশ টাকা মন বিক্রি করবে বলে। শুধু তাই নয়, বিগত যৌবন বৈষ্ণব কুলতিলক নিশিকান্ত হাড়ির মেয়ে বিশাখাকে তুলসীর মালা পরিয়ে তার বৃন্দাবন লীলার সঙ্গিনী করেরেখেছে। এতে তার চারিত্রিক লাম্পট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পের নিষ্করুণ বাস্তবকে লেখক তুলে ধরেছেন মতিপাল ও তার স্ত্রীর অনাহারে আত্মহত্যা করার করুণ বর্ণনায়। মূল্যবোধ বর্জিত পাষাণ হৃদয় মতিলালের এই মৃত্যুর সংবাদে নিশিকান্তের অমানবিক আচরণ মনুষ্য পদবাচ্যকে কলঙ্কিত করে। মনের অপরাধবোধ অশরীরি প্রেতরূপে তাকে ভয়াতুর করে তোলে। মতিলালের ঘরের মৃত্যুদৃশ্য তার অপকর্মকে বারবার স্মরণ করায় এবং সেখান থেকে ফেরার পথে প্রকৃতির রূঢ় অভিব্যক্তির শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে সে শঙ্কিত হয়ে উঠে। গল্পকারের বর্ণনায—"কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথের দু'ধারে বাঁশের ঝড় বাতাসে শব্দ করছে। সেই শব্দে নিশি চমকে গেল। মনে হল সেই বাঁশঝারের ভেতর থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে মাংস-চর্মহীন অস্থিময় কতগুলো ছায়ামূর্তি-তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরছে তাদের প্রেতদেহ।আচম্কা একটা ভয়ে নিঃশ্বাস আটকে এল তার, মনে হল, সেই মূর্তিগুলো আর্তনাদ করে উঠবে— আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার,— তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু এখন?এখন?এখন?"[৫] মানুষের দ্বারা সংঘটিত মানুষের নিষ্ফল হাহাকার অত্যন্ত মর্মান্তিক।নিশিকান্তের ন্যায় ধূর্ত মানুষের জন্যই মন্বন্তরের ন্যায় দুর্যোগ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিশিকান্তের ন্যায় যারা পুঁজিবৃদ্ধি করে তাদের বিচার লেখক তুলে দেন করুণাময়ের হাতে এবং পরিণতিতে দেখা যায় মানুষের প্রাপ্য ক্ষুধার অন্ন আত্মসাৎ করা নিশিকান্তের গোলাঘরের সঞ্চিত চাল বৃষ্টির জলে পচে নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরণের দুঃশ্চরিত্র মানুষ যে পশুর সমতুল্য গল্পের শেষে গলিত গরুর দেহ আগলে রাখা এক কুকুরের রূপকে গল্পকার ব্যক্ত করেছেন, যেখানে চারদিকে উড়তে থাকা শকুনের প্রকোপ থেকে গরুর মৃতদেহকে একা ভক্ষণ করার প্রলোভনে সতর্ক হয়ে আছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক কপট সঞ্জয়ের কথা, যে দরিদ্র চাষীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের কার্যসিদ্ধি করেছে। এই ধরণের চরিত্ররা যে পশুর সমগোত্রের আধুনিক লেখকদের সুতীক্ষ্ণ কলমের আঁচড়ে তা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

'বীতংস' গল্পটি মূলত চরিত্রকেন্দ্রিক এবং লেখকের খল চরিত্রের মধ্যে অন্যতম। ধর্মের পরিভাষা কীভাবে এই ধরণের দুষ্ট চরিত্রেরা পাল্টে দেয়, এই গল্পের সুন্দরলাল চরিত্র তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শিক্ষার অভাব ও অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আদিবাসী জীবন। জ্ঞানের অভাব ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ করে তোলে। ফলে সুন্দরলালের ন্যায় চরিত্ররা নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য যেকোনো ছদ্মবেশ ধারণ করে মানুষকে প্রতারণা করতে পারে। গল্পের প্রথমেই সংসার বিবাগী সুন্দরলালের পরিচয় পাই। নিজের ভাইয়ের প্রতি অবিশ্বাস, স্ত্রীর চারিত্রিক স্খলন, জমিদারের সঙ্গে মামলা, মোকদ্দমায় জড়িয়ে সংঘটিত বিবাদ থেকে মুক্তিকামী সুন্দরলাল প্রকৃতির বুকে সহজ-সরল সাঁওতাল পরগণায় শান্তির খোঁজে আসে। কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে

গল্পকারের বর্ণনায় ধীরে ধীরে সুন্দরলালের চরিত্রের এক-একটি নির্মোক যেন খসে পড়তে থাকে। সে অনায়াসেই গ্রামবাসীদের সহজ সরল বিশ্বাসকে জিতে নেয়। হাত দেখতে জানা, কঠিন রোগেতে আক্রান্ত রোগীদের অনায়াসেই চিকিৎসা করানো, শিকড়-বাকড় সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সে কীভাবে অর্জন করল, এর আগে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতির রূপকে এক কুচক্রীর ইঙ্গিত লেখকের অপরিসীম শিল্প দক্ষতায় বর্ণিত হয়েছে এভাবে—"আকাশ সন্ধ্যার রঙ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের অরণ্যমণ্ডিত চুড়োয় চুড়োয় নিবিড় ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগল। শালবন ঘেরা দূরের উপত্যকাটা থেকে যে ছোট পথটা ঘুরে-ঘুরে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাসের প্রসারিত নিশ্চল বাহু। যেন মৃত্যুর আগে একবার এই পাহাড়টাকে মুখের ভেতরে টেনে আনবার শেষ চেষ্টা করেছিল।"[৬] এক অজানা অচেনা বিভীষিকা যেন সাঁওতালবাসীদেরও অক্টোপাসের মতো নিজ কবলে জড়িত করে ফেলেছে তাদের অজ্ঞানতার সুযোগে। সংসার পরিত্যক্ত সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায় না, কারণ তার আপাদমস্তক ভোগের উপকরণে পরিব্যাপ্ত। মাথায় পাগড়ি কাঁচা চামড়ার তৈরি নাগরা জুতা ও সর্বোপরি ময়লা চাপকানটার লম্বা পকেটে গচ্ছিত বহুমূল্য ধাতু মুদ্রা প্রভৃতির বাহুল্যে এটাই অনুমিত হয়, সাঁওতাল এলাকায় একরকম ভোগের পসার জমিয়ে বসেছে সে। তার সিদ্ধিলাভের ইতিহাস বিমুগ্ধ হয়ে শুনে গ্রামের মোড়ল ঝড়ু সাঁওতাল। হিমালয়ের চূড়োয় পাঁচশো বছর ধরে ধ্যানস্থ নাঙ্গা বাবার কথা, যার সঙ্গে তার নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি-ই তাকে সিদ্ধিলাভ করান। কাজেই গ্রামবাসীরা মনে করে কিছুই অসাধ্য নেই সুন্দরলালের জন্যে। ঝাড়-ফুঁক করা, পিশাচ চালান করা, বান মারা, এমনকি নুড়ি পাথরগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই সে স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারে। যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে গ্রামবাসীর বিশ্বাসের অপব্যবহার করতে চলেছে তার আভাস রয়েছে লেখকের শব্দবয়নে,— "তত্ত্বচিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছে সুন্দরলালের মন। এমন করে আর চলে না। দুমাস-মাত্র দুমাস সময়, অথচ এখন একটু একটু করে এগোতে গেলে গোটা বছরই যে কাবার হয়ে যাবে। ওদিকে 'সীজন টাইম' পেরিয়ে গেলে এসবের কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না।"[৭] কেবল অর্থলিপ্সা নয়, সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যের মধ্য দিয়ে পাশবিক ক্ষুধা যেন তার চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ে। সাঁওতাল মেয়ে বুধনীর প্রতি তার শাণিত দৃষ্টি ভোগাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দিলেও, পরক্ষণেই পাঠক আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়, যখন বুধনীকে চড়া দামে সাহেবের কাছে বিক্রি করার কথা জানতে পারে। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয় না সুন্দরলাল, শালবনের মাঝে সাঁওতালদের পূজ্য দেবতা,শিংবোঙার পূজাচ্ছলে নিজের ওপর শিংবোঙার ভর করার অভিনয় করে গ্রামের মড়ক লাগার আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। নিরুপায়, অসহায় সাঁওতালরা অনিচ্ছায় গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। গল্পের শেষে মানবতাবিধ্বংসী মনুষ্যত্ববোধহীন এক নারকীয় চরিত্রের পরিচয় পাই সুন্দরলালের মধ্যে,- "আসামের চা-বাগানে কুলি

যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে-দলে লোক মরছে। আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে— আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল! বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে তার কমিশন পাওয়া হয় কত।”[৮]

ঠগ ও প্রবঞ্চকেরা সম্পূর্ণরূপে সুযোগ-সন্ধানী। এরকমই একজন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ‘তীর্থযাত্রা’ গল্পে। দালাল নরোত্তম ঠাকুর দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত গ্রামের তেরো থেকে বত্রিশ পর্যন্ত মেয়েদের কলকাতার গণিকাপল্লিতে পণ্য হিসাবে বিক্রি করার জন্য নৌকা সহযোগে কলকাতার অভিমুখে চলেছে। তার এই অপকর্মের সহায় হয় নৌকার মাঝি ফরিদ। কালীঘাট দর্শনের অজুহাতে পাঁঠার নৌকায় পাঠার পরিবর্তে নারীদের বোঝাই করে নারী পাচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাত্রা করে। নারীর মাতৃত্ব দেহব্যাবসার পথে চরম অন্তরায়, তাই নৌকায় বোঝাই করা ছোট-ছোট শিশুদের মৃত্যু কামনার মধ্য দিয়ে নরোত্তমের পৈশাচিক ভাবনার প্রমাণ মেলে, “তেরো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত নানা বয়সের এক দঙ্গল মেয়ে। তাদের সঙ্গে-সঙ্গে বাদুড়ের ছানার মতো ঝুলে রয়েছে তিন-চারটি শিশু। নরোত্তমের মতে এরা নিতান্তই অনাবশ্যক বোঝা। কিন্তু বর্জন করবার উপায় নেই। কালো কালো জীর্ণ দেহ কতগুলো মানবের সৃষ্টি। দেখলে বাৎসল্য জাগে না, পা ধরে টেনে ফেলতে ইচ্ছে করে মেঘনার অথই জলের মধ্যে। আরো যত বিড়ম্বনা ওই আগন্তুকগুলোকে নিয়েই।”[৯] অবুঝ শিশুদের প্রতি এই ধরণের অমানুষিক ভাবনাযুক্ত মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে, তা গল্পকারের বাস্তব ভাবনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। রক্ত-মাংসে গড়া নরোত্তমের, জাতে জেলে সুখীর প্রতি দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও, ব্যবসার সঙ্গে কোনো আপোষে যেতে পারে না। তীর্থ দর্শনের নামে দেহ-ব্যবসায় ঠেলে দেওয়ার ন্যায় ঘৃণ্যকর্মে এতগুলো মেয়েকে লিপ্ত করতে তার মন বিচলিত হলেও নিজের মনকে সে এই বলে প্রবোধ দেয় যে গ্রামে দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরার থেকে এ ঢের ভালো। তাই সুখী নিজ গ্রামে ফিরে যেতে চাইলে তার ব্যবসায়ী মন বলে উঠে, “দেড়শো টাকা বাপকে গুনে দিয়ে তবে মেয়েটিকে আনতে হয়েছে। সেই দেড়শো টাকা সুদে আসলে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে। যতই ধর্মে মতি থাকুক না, নরোত্তম দাতাকর্ণের পোষ্যপুত্র নয়।”[১০] মেয়েদের চোখের জলের অসহায়তায় হৃদয় বিগলিত হয় না, নরোত্তমের মতো মানুষের। সুখীকে তার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিক্রি করে দেয় গোলাম মহম্মদের কাছে। কাশবন থেকে ছুটে পালিয়ে আসার অভিনয় করে সুখীকে কুমীরে নিয়েছে বলে সকলকে জানায়, মাঝি ফরিদ নরোত্তমের কুকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নয়। সুখীর মধ্যে তার নিজের পরিবারের চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং তার প্রচণ্ড লগির আঘাতে চোখ কেটে নরোত্তম অন্ধ হয়ে যায়। মানবিকতার উজ্জ্বল আলোর বর্ণচ্ছটায় তমসাবৃত মনের কলুষতা সহজেই দূর হয়ে যায়। লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন,—“আদিমতার উদ্দাম উল্লাস পশুর পক্ষে একান্ত সত্য হলেও মানুষ

সম্পূর্ণভাবে পশু নয়। মানুষ স্বতন্ত্র হয়েছে বুদ্ধির গৌরবে আর হৃদয়বৃত্তির প্রসারে। এই হৃদয়বৃত্তিই মানুষের সবচাইতে বড় বালাই। Love comes and the beast dies"[১১] ধর্মের ধ্বজাধারী নরোত্তমের ন্যায় মানুষের কৃতকর্মের পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে গল্পের শেষ দৃশ্যে তার করুণ পরিণতিতে তা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

দুর্বৃত্ত চরিত্রগুলির অপরাধের পঙ্কিল পথে পদস্খলনের পিছনে অনেক সময় দেখা যায় তাদের শৈশব ও কৈশোরকালের এক বেদনাদীর্ণ অতীত ইতিহাস এর জন্য অনেকটাই দায়ী। 'সঞ্চার' গল্পের নায়ক জুয়াচোর মানব চক্রবর্তী লোক ঠকানোর ন্যায় অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়ার পেছনে একান্তরূপে দায়ী সতেরো বছর বয়সে বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নির্মম অত্যাচার, ক্রোধে, ঘৃণায় সেই প্রথম ঘর থেকে গয়নার বাক্স চুরি করে অপরাধ জগতে তার প্রথম হাতেখড়ি হয়। তাই মানুষ সম্পর্কে সেইদিন থেকে তার মনে এক নঞর্থক ধারণা জন্মায়,— "মানুষ সম্বন্ধে এতটুকু দুর্বলতার রেশও তার মনে কোথাও নেই। লোক-ঠকানোর ব্যবসায় দিনের পর দিন যতই সিদ্ধিলাভ করেছে ততই বেশি করে ঘৃণা জন্মেছে মানুষ নামে পোকা জাতীয় এই জীবগুলির ওপরে। কী যে লোভী কী নির্বোধ। সস্তায় বড়লোক হতে চায়, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘুষ দিয়ে চাকরি বাগাতে চায়, চোরাই সোনা কিনতে বিবেকে বাধে না, কি করে দাও মারবে তারই ফিকির খোঁজে, সব— সব এক দলের।"[১২] মনের মধ্যে এই বদ্ধমূল ধারণার জন্যই সে অন্যকে ঠকায়। এর মধ্যে সে ছ'বার জেল খেটেছে, এবং চারটা কেস ঝুলছে তার নামে। সে এতটাই পাশবিক, যে তিনজন স্ত্রীকে অনায়াসেই ছেড়ে সন্তান সম্ভবা চতুর্থ স্ত্রী শঙ্করীকেও ছেড়ে চলে যেতে চায়। দেশভাগ ও দাঙ্গার বীভৎস ক্ষতের ফলে নির্জীব, নির্বাক অথচ স্বামীসেবা ও ঘরকন্নায় ক্রুটিহীন শঙ্করীর প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণার ফলে তাকে পরিত্যাগ করার সুযোগ-সন্ধান করতে থাকে। শুধু তাই নয়, কলকাতার পথে করুণাময় নামে একজন বৃদ্ধ স্কুল শিক্ষককে আড়াইশো টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে প্রতারণা করে অবলীলায় ত্রিশ টাকা এবং দামী একটি জার্মানি কলম আত্মসাৎ করে। অতি সহজেই বৃদ্ধ মানবের মিষ্টকথার জালে আটকা পড়ে যায়। কিন্তু মানবের গোপনচারী বিবেকের তাড়নায় সে আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। চশমা ভেঙে যাওয়ার ফলে করুণাময়ের কাতর আর্তি, এবং সেইসঙ্গে একবছর শঙ্করীর করুণা-মায়া-মমতার বন্ধনে সে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে সেখান থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পায় না। নিজের অভ্যাসগত প্রবঞ্চনার পথে চলতে না পেরে জীবনের বাক্-পরিবর্তনের এক নতুন পথে চালিত হওয়ার বাধ্যতামূলক অসহায়তায় ক্রোধে ফেটে পড়ে। কিন্তু নিজের ভেতর মানবিক চেতনাবোধকে অবদমিত করতে অসমর্থ হয় এবং নিজের কাছে সঞ্চিত পনেরো টাকা নিয়ে লোক্যাল ট্রেনে টফি লজেন্স ফিরি করার সংকল্প নেয়।

বস্ত্র সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'দুঃশাসন' গল্পে কাপড়ের আড়ৎদার দেবীদাস সরকারি দর থেকে অধিক মুনাফার লোভে কাপড় গুদামে সংগ্রহ করেরাখে। অথচ গ্রামের অসহায় গ্রামবাসীর এক টুকরো কাপড়ের জন্য করুণ কাকুতি-মিনতিতে

দেবীদাসের নিষ্ঠুর হৃদয় বিগলিত হয় না। যেখানে গ্রামসুদ্ধ কেরোসিনের দারুণ অভাবে অন্ধকারে মার বুক থেকে ছেলেকে টেনে নিয়ে শিয়ালে বাড়ির পাশেই হত্যা করে, সেই গ্রামেই দারোগা শচীকান্ত ঘটা করে পৌরাণিক যাত্রাপালার আয়োজন করে। যাত্রার আসরের আলোয় সমস্ত গ্রাম ঝলমলিয়ে উঠে। 'দুঃশাসনের রক্তপান' যাত্রাপালায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকারী দুঃশাসনের ভীম কর্তৃক নিধনের চরম মুহূর্তে বিচলিত হয় দেবীদাস। যাত্রাপালা দেখে সকালবেলায় ঘরে ফেরার পথে একজন বিবস্ত্রা ষোড়শীর নগ্নদেহ দেখে গৌরদাসের মনে হয়— "যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করেছে। তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন?"[১৩] অপরদিকে, ফসলহীন রিক্তমাঠে কৃষকদের শান-বাঁধানো হেসেলগুলো দেখে দেবীদাসের মন ভয়াতুর হয়ে উঠে। মহাভারতের অবিস্মরণীয় কলঙ্কিত সেই ঘটনাকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন গল্পকার। দূঃশাসনরূপী পাষণ্ড মর্ত মানবের পাশবিক হস্ত প্রসারিত হয়েছে বঙ্গললনাদের বিবস্ত্রা করতে। কিন্তু গল্পকার ভোলেননি এর রক্তক্ষয়ী পরিণাম দর্শাতে, যা একইসঙ্গে আতঙ্কিত ও ভীতিগ্রস্থ করে তুলেছে যুগের দুঃশাসনদের।

জীবনের কদর্যময় পথের পথচারীদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্পকারই তাদের সৃষ্টি সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্য সৃষ্টির মূল নিহিত রয়েছে চরিত্রের সংকীর্ণতা, যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের সমস্যা, জটিলতা প্রভৃতি বিষয়। কিন্তু,সমস্যা সম্বলিত দেশ-কাল-সমাজের প্রতিবিম্বিত রূপই কেবল সাহিত্যে পরিস্ফুট হয় না। এক উজ্জ্বল গতিপথে পাঠককে চালিত করার গুরুদায়িত্বও সাহিত্য-স্রষ্টার উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং কখনও প্রত্যক্ষভাবে এবং কখনও অপ্রত্যক্ষভাবে সৃজনশীল লেখক আভাসে ইঙ্গিতে সেই দায়িত্বই পালন করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন,—"নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প রচনার কাল দেশ ও জাতির খুব সুখের দিনে নয়। তিনি তাঁর গল্পে জীবনের যে বাস্তব রূপটিকে গ্রহণ করেছেন সেখানে মানবজীবন নানান সমস্যা ও সঙ্কটে যন্ত্রণাজর্জর ও অসহায়। কিন্তু আমরা প্রায়শ লক্ষ করি, মানবজীবনের সমস্ত সঙ্কটের মধ্যেও একটা আশা, এক ধরণের বিশ্বাস ও শুভ সম্ভাবনার প্রত্যয়বাণীকে তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই আশাবাদ তাঁর শিল্পীমনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"[১৪]

দেশকালের আলোড়নের সঙ্গে লেখকের অভিজ্ঞতার মিশেলেই কথাসাহিত্য। সংবেদনশীল সাহিত্যিকদের বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যেভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেভাবেই তারা এক পরিশীলিত ও সংস্কৃত সমাজ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁদের চোখে দেখা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয় গল্প-উপন্যাসের এক-একটি চরিত্র। কখনও পরিস্থিতির কবলে পড়ে, কখনও স্বভাবশত, আবার কখনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সুযোগ-সন্ধানী-একদল মানুষের চারিত্রিক স্খলন সুনিপুণ দক্ষতায় সাহিত্যিক রূপ পায় লেখকদের কলমে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ৪র্থ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, পৃ-১৮৫।

২। পঞ্চানন ঘোষাল, অপরাধ-বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড, লালমাটি সংস্করণ ২০১৯, লালমাটি, পৃ.-১৮।

৩। অলোক রায়, সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১০, সাহিত্যলোক, পৃ-৮৬।

৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, একাদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১২, প্রকাশভবন, পৃ-৪১।

৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ-৪৮।

৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ-১৯।

৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ-২৬।

৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত পৃ- ২৯।

৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ-১৩৫৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, পৃ-৩৭৬।

১০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,প্রাগুক্ত পৃ-৩৮২।

১১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্প বিচিত্রা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৫, প্রকাশ-ভবন, কলকাতা-৭৩ পৃ-৬৮।

১২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, ১ম প্রকাশ ১৩৬৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, পৃ-৩০৪।

১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮।

১৪। মৃণালকান্তি মণ্ডল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বিষয় ও রূপের মূল্যায়ণ, ২য় প্রকাশ,৯ই ডিসেম্বর ২০০৯, সাহিত্য-সঙ্গী, পৃ-১২৮।

নারীর কলমে বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্য : নৃবিজ্ঞানের খোঁজে

অনামিকা মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
লালগড় গভঃ কলেজ

সারসংক্ষেপ : প্রাক-আধুনিক সাহিত্যে ভ্রমণের বিবরণ কিছু পাওয়া যায়। তবে যথার্থ ভ্রমণমূলক সাহিত্য রচনা শুরু হয় আধুনিক যুগ থেকেই। অন্যদিকে প্রাক-আধুনিক সাহিত্যে দু'চারজন নারী কবির পরিচয় মিললেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন ছাড়া নারী লেখিকার সন্ধান তেমন মেলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় প্রথাগতভাবে নারী শিক্ষা দান। বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্রেরও বিকাশ হয়। মেয়েরা কলম ধরে পত্রিকা সম্পাদনের কাজে। পত্রিকার পাতা ভরাট করতে উদ্যোগী হয় মেয়েরাই। আস্তে আস্তে লেখা হয় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।আর এই অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়েই আসে নৃবিজ্ঞানের কথা।
সূচক শব্দ : সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, দৈহিক নৃবিজ্ঞান, মৃত্যুৎসব, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব,

নৃবিজ্ঞান

নৃবিজ্ঞান হল ইংরেজি 'anthropology'রবাংলা প্রতিশব্দ। 'anthropology'রমূলে রয়েছে একটি গ্রিক শব্দ anthropos,যার অর্থ মানুষ। সংস্কৃত শব্দ 'নৃ' মানেও তাই। কাজেই 'নৃবিজ্ঞান' কথাটির অর্থ 'মানব বিষয়ক বিজ্ঞান'। মানব বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় এর বিষয়বস্তু ব্যপকতর পরিধি সম্পন্ন ও অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমকালীন প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞান হচ্ছে বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বলিত এমন একটি জ্ঞানকাণ্ড যা বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে মানুষকে অধ্যয়ন করে। মার্কিন ধারার নৃবিজ্ঞানে সচরাচর চারটি প্রধান উপবিভাগ চিহ্নিত করা হয় – সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান ও দৈহিক নৃবিজ্ঞান। ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ধারার নৃবিজ্ঞানে 'সংস্কৃতি' ধারণার চাইতে সমাজ ধারণার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে এই প্রেক্ষিতে 'সামাজিক নৃবিজ্ঞান' কথাটি অধিকতর প্রচলিত।

সামাজিক নৃবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে যথাক্রমে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হলেও উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানীরাই এই বিষয়গুলি অধ্যয়নের জন্য তথাকথিত আদিম জনগোষ্ঠীদের উপরই বেশি নজর দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আদিম বলে বিবেচিত বিভিন্ন সমাজ ও তাদের সংস্কৃতির তুলনামূলক

অধ্যয়নই একটা সময় পর্যন্ত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মূল পরিচায়ক ছিল। উভয় ধারার নৃবিজ্ঞানেই বিভিন্ন আদিম সমাজের জ্ঞাতিব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়েছে। এই কারণে মার্কিন ধারার সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও ব্রিটিশ ধারার সামাজিক নৃবিজ্ঞানকে একই বৃহত্তর ধারার অন্তর্গত হিসাবে গণ্য করা হয় যাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান হিসাবে অনেকেই অভিহিত করে থাকেন।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান

গিরিবালা দেবীর (সেনগুপ্ত) 'সিংভূমের কোলজাতি' এবং 'কোলজাতির আমোদপ্রমোদ' প্রবন্ধ দুটি পাঠ করলে ভ্রমণ-সাহিত্য মনে হয় না সে তুলনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'নীলগিরির টোডা জাতি' প্রবন্ধটি অনেকবেশি ভ্রমণ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তবে গিরিবালা দেবীর প্রবন্ধ দুটিকে দময়ন্তী দাশগুপ্ত আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এর কারণ হয়তো গিরিবালা দেবী লিখেছেন একবার তাঁরা চাঁইবাসা থেকে ৩২ মাইল দূরে একটি নিজ্জন পর্বতের কাছে কয়েকদিন বাস করেছিলেন। সেখানে কয়েক ঘর কোলজাতি বাস করত। তাদের সঙ্গে মেলামেশা সূত্রে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন লেখিকা। সেগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। 'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় আরম্ভ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তা শেষ হয়। আর গিরিবালা দেবীর প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয় ভারতী ভাদ্র ১৩০০ এবং ভারতী শ্রাবণ ১৩০১, আষাঢ় ১৩০২। গিরিবালা দেবী 'পালামৌ' পাঠ করেছিলেন কিনা তার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও না থাকলেও আমরা পাঠক হিসাবে ধরে নিতেই পারি। কারণ তাঁর লেখায় 'পালামৌ' এর ছাপ স্পষ্ট। পালামৌ অঞ্চলের পাহাড় অরণ্য প্রকৃতির বর্ণনাস্থল ধরেই লেখক প্রবেশ করেছেন সেখানকার কোল জাতির জীবনাচরণ প্রসঙ্গে।

সিংভূম ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। তার প্রধান নগর চাঁইবাসা। সেই নগরকে ঘিরে রয়েছে উঁচু উচু পাহাড় আর বড় বড় শাল গাছের অরণ্য। এই অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত বিশেষ ছিল না। এই সকল অরণ্যময় অঞ্চলে কোল জাতি নির্ভিক চিত্তে মনের আনন্দে বাস করে। এই দুর্গম জঙ্গলই এদের জন্মভূমি ও প্রিয় বাসস্থান। গিরিবালা দেবী এদের বাসস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন-

'সচরাচর নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যে প্রকার খড় আচ্ছাদিত মাটির ঘরে বাস করে, ইহাদের গৃহাদি অবিকল সেই প্রকারের না হইলেও প্রায় তদনুরূপ। ইহারা সমভূমি হইতে কিঞ্চিত উচ্চ এবং চারিদিকে ঢালু স্থানে পল্লী নির্ম্মাণ করে। চারিদিকে ভূমি ঢালু থাকায় তাহাদিগের বাটির নিকটে বৃষ্টির জল ও কর্দ্দমাদি বড় দেখা যায় না। সুতরাং বর্ষাকালে তাহাদিগের বহুশ্রমসাধ্য ক্ষুদ্র কুটীর সমূহের কোন ক্ষতি হয় না। ইহাদের পল্লীগুলির স্বাভাবিক জল নির্গমনোপায় অতি সুন্দর, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহার প্রয়োজনীয়তা

সম্যক অবগত না হইলেও ইহারা স্বভাবতঃই পয়ঃপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখে। গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে অর্থের বিশেষ আবশ্যক হয় না। নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষাদির অভাব নাই, তথা হইতে গৃহনির্ম্মাণোপযোগী সামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহারা গৃহনির্ম্মাণ করে।' (১)

বাসস্থানের নীচে তারা চাষবাস করে, যে শস্য উৎপন্ন হয় তাতে সাত থেকে আট মাস চলে। বাকি চার পাঁচ মাস তারা জঙ্গল থেকে বন্য আলু খুঁড়ে আনে, সেগুলি পুড়িয়ে অথবা সিদ্ধ করে খায়। তাছাড়া মহুল ফুল সিদ্ধ করে খায়। মহুল ফুলের বীচ থেকে তেল তৈরি করে এরা প্রদীপ জ্বালায়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কৃষিকাজে পরিশ্রম করে। পরিশ্রমের ভাগ বরং স্ত্রীলোকের উপরই বেশী। পুরুষেরা স্বভাবতঃ অলস, আলস্যবশতঃ পুরুষদের শরীর স্ত্রীলোকদের শরীরের মতো সবল নয়। স্ত্রীলোকেরা তাদের শিশুসন্তানগুলিকে ক্ষেতে নিয়ে যায় এবং খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে কাজ করে। এদের বিশ্বাস ভূমিতে শয়ন করালে বাচ্চার শরীর খারাপ হয়। ধনী নির্ধন সকলেরই একটি করে খাটিয়া আছে।

এরা স্বভাবতঃ নম্র। সামান্য বিষয় নিয়ে এরা কলহ করে না। সহজে রেগে যায় না। তবে বিদেশীদের সঙ্গে মিশতে তারা ভালোবাসে না। যদি কেউ এদের স্ত্রী জাতির উপর কোনরূপ উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয় তাহলে এরা ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেয়। এদের গঠন সুন্দর ও শরীর বলিষ্ঠ, পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকেরা বেশি পরিশ্রম করে বলে তাদের শরীর তুলনামূলকভাবে দৃঢ় ও সবল। স্ত্রীলোকেরা বড় বড় ভারি বোঝা অনায়াসে মাথায় বয়ে আনে। এদের কেউ কেউ কালো হলেও মুখে বেশ লাবণ্য আছে। 'কাহারও কাহারও কুঞ্চিত কেশ, উজ্জ্বল চক্ষু, বলিষ্ঠ দেহ। দেখিতে বেশ সুশ্রী বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতে বাঙ্গালির ন্যায় এবং সুন্দর গৌরবর্ণ।' পালামৌ এ একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু স্থির যৌবনা থাকে। ... তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলের জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয়, কোলজাতির ক্ষয় ধরিয়াছে। (২)

এদের ধর্ম্মপ্রণালী একটু আলাদা রকম। সূর্য এদের প্রধান দেবতা এবং বিশেষ পূজনীয়। সূর্য্যকে এরা 'শিং বোঙ্গা' বা 'শিম বোঙ্গা' বলে। এই দেবতা প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি 'আরণ্যক' উপন্যাসের 'টাঁড়বারো'র কথা। ' সাঁওতাল বুড়ো বললে – টাঁড়বারো হোলো বুনো মহিষের দলের দেবতা। সে একটাও বুনো মহিষের ক্ষতি করতে দেবে না।'

এরা দিনে ভাত প্রায় খায় না, ভাত পচিয়ে এক প্রকার মদ প্রস্তুত করে, তা খেয়ে দিনের বেলা খিদে মেটায়। এই মদকে এরা ডিয়েং বলে। এটা দেখতে অনেকটা আমানির মতো। গিরিবালার মতে এই মদ প্রস্তুত করা খুব সহজ। কয়েকটি গাছের শিকড় কেটে ছোট ছোট সাদা কদমার মতো প্রস্তুত করে এবং দু'এক দিন ভাত জলে

ভিজিয়ে রেখে ওর কয়েকটি তাতে মিশিয়ে এবং তার দুই তিন দিন পরে তা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। এটা অতিরিক্ত খেলে মত্ততা আসে কিন্তু এরা খিদে মেটাবার জন্য অল্প খায় তাই এদের মত্ততা আসে না। তবে উৎসব উপলক্ষে কেউ কেউ বেশি ডিয়েং খেয়ে ফেলে। তখন মত্ততা আসে। সন্তান জন্মাবার পর এরা সন্তানের মুখে ডিয়েং স্পর্শ করায়। এদের বিশ্বাস 'জন্মাবধি এই প্রকার মদ খাইতে অভ্যাস না করিলে ভবিষ্যতে খাইতে পারিবে না।' এইভাবে সন্তানের বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিয়েং এর মাত্রা বাড়ে। প্রসূতি প্রসবের পর আট দিন অশূচি থাকে। এই অশূচিকালে স্বামী, প্রসূতি এবং নবজাতক বাদে বাড়ির বাকি সদস্যরা অন্যত্র গিয়ে খাওয়া দাওয়া নাচ গাচ আমোদ প্রমোদ করে থাকে। এই দিনেই সন্তানের নামকরণ হয়। সাধারণত পিতামহের নাম পৌত্র পেয়ে থাকে। এরা গরু, মহিষ, কুক্কুট, শূকর, মাছ, কুমীর খায়। ইঁদুর এদের উপাদেয় খাদ্য। গোমাংস এরা আনন্দের সঙ্গে খায় কিন্তু গরুর দুধ এরা খায় না।

কোলেরা মৃতদেহ দাহ করে এবং অবশিষ্ট অস্থি বাড়িতে এনে একটি হাঁড়ি পূর্ণ করে যে ঘরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা সর্বদা দেখতে পাবে এমন স্থানে হাঁড়িটিকে এক মাস ঝুলিয়ে রাখে। মাসান্তে একটি গর্ত খনন করে তার মধ্যে হাঁড়িটি রেখে দেয়। মৃত ব্যক্তির দ্রব্যাদি ও কতকগুলি খাবার বস্তু তার মধ্যে রেখে পুঁতে দেয় এবং তার উপর একটা পাথর রাখে। কোলজাতি 'বন্য অসভ্য জাতি হইলেও ইহাদের সঙ্গীতানুরাগ অত্যন্ত প্রবল'। দুমাঙ্গ(মাদল), বনাম(বেহালা), রুতু(বাঁশী) এদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। মাদলের একঘেয়ে তালে তালে এদের গান এবং নাচ হয়। মাদলের বাজনাকে কোল ভাষায় চপড়া বলে। হাতের চাপড় দ্বারা এটি বাজানো হয় বলে এর নাম চপড়া। এদের বনাম বা বেহেলা এক হাত লম্বা।

স্বর্ণকুমারী দেবী যেদিন প্রথম টোডা জাতির দেখেছিলেন সেদিন তাঁর হৃদয়ে এক নতুন আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল। তাঁর স্মরণে এসেছিল 'মনুষ্য সমাজের সেই আদিম যুগের' কথা, যখন মানুষের বুদ্ধি অপরিস্ফুট, সুবিধা আরাম কৌশল স্বল্পায়ত্ত, পর্ব্বতগুহা বা সামান্য পর্ণকুটীরই তাদের নিবাসস্থল। মাটি ও লোহা দ্বারা নির্মিত তাদের গৃহদ্রব্য। এরা 'আদিম অসভ্যজাতি' বলে পরিচিত হলেও চেহারায় অসভ্যত্ব, অনার্যত্ব বিশেষ কিছু নাই বরং আর্যদের মতোই তারা দেখতে। কালো কেউ নেই, বরং শ্যামবর্ণ বা গৌরবর্ণ। স্বর্ণকুমারী লক্ষ করলেন বাংলার সাঁওতাল, পশ্চিমের ভীল জাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে প্রায় তাদের মতই হয়ে গেছে কিন্তু টোডাজাতির আদিমত্ব অল্পই পরিবর্তিত হয়েছে। লেখিকার মতে এর প্রধান কারণ অপেক্ষাকৃত অল্পদিন এরা সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। দ্বিতীয়ত এখনো এরা বিজনবাসী। পরিবারে যতজন সদস্য রাত্রিকালে একসঙ্গে তারা শয়ন করে। এটা নাকি তাদের নিয়ম 'এ নিয়ম ভাঙ্গিবার নয় ... সমস্ত ভ্রাতার এক স্ত্রী গ্রহণ করাই ইহাদের জাতিগত নিয়ম।' টোডাদের দেবস্থানে পূজনীয় কোন প্রস্তর বা কাষ্ঠমূর্ত্তি নেই, এইখানে এরা মহিষের দুধ এনে মাখন ঘি তৈরি

করে। ' ইহাই দেবপূজা। স্ত্রীলোক এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পুরুষেরই কার্য্য।'

টোডাদের নাচ খুব অদ্ভুত লেগেছিল স্বর্ণকুমারীর। পুরুষরা নাচে কিন্তু গায় না আবার নারীরা গান করে কিন্তু নাচে না। ৭/৮ জন পুরুষে মিলে হাত ধরা ধরি করে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে ও-হাউ হাউ ও-হাউ হাউ করে চিৎকার করতে করতে তালে তালে এক সঙ্গে পা ফেলে ফেলে ঘুরতে থাকে। আসল কথা এটা আনন্দ নৃত্য নয় – মৃত্যুৎসব।

কেহ মরিলে তাহারা মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে- প্রতি গ্রামে সকলে মিলিয়া উক্তরূপে শব বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরস্তব করে। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তখন মৃত ব্যক্তি স্বগ্রামে নীত হইয়া তাহার স্বকুটীরে সমস্ত তৈজস অলঙ্কার দ্রব্যাদি সহিত দগ্ধীকৃত হয়। অধুনা এ প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেহ মরিলে তাহার কুটীর ও দ্রব্যাদি তাহার সহিত ভস্মসাৎ না করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শবদাহ করা হয়, এবং টোডাগণ সকলে মিলিয়া দুই একখানি করিয়া তৈজসপত্রাদি যাহা দান করে তাহাই মৃত ব্যক্তির সহিত পোড়ানো হয়। (৩)

শবদাহ হয়ে গেলে যুবা পুরুষেরা শড়কি দিয়ে ৮/১০ টা মহিষ নিহত করে এবং টোডা নারীরা সুর করে কাঁদতে থাকে। এটাই এদের গান।

' আমরা গাহিতে বলায় মেয়েরা গালে হাত দিয়া সুর করিয়া কাঁদিতে বসিল, আর টক খাইতে বা বেশী শীত লাগিলে যেমন লোকে মুখে হি হি শব্দ করে- কান্নার সুরের মাঝে মাঝে সেইরূপ হি হি করিতে লাগিল। ইহাই টোডাদিগের নৃত্যগীত। টোডা নারীরা মহিষ দিগকে মাঠ হইতে গৃহে আহ্বান কালে এইরূপ সুর করিয়া ডাকে।'(৪)

এরা মাছ মাংস খায় না। তাই মহিষ-বধ মৃত্যুভোজের জন্য নয়। স্বর্ণকুমারীর ধারণা মৃতব্যক্তি লোকান্তরে তার সম্পত্তি ভোগ করবে এই বিশ্বাসে তার সঙ্গে তার কুটীর তৈজসপত্র, মহিষ প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। এরা ভূত এবং আত্মা বিশ্বাস করে না। মৃত্যুৎসব ছাড়া আর কোনরূপ উৎসব এদের হয় না। বিবাহে কোন আমোদ প্রমোদ হয় না। বাবা মা স্থির করে যে তার মেয়ের সঙ্গে কার ছেলের বিয়ে দেবে। সেই স্থির করা অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিকেই এরা বিয়ে বলে। মেয়েদের ৩/৪ বছর বয়সে আর ছেলেদের ৮/১০ বছর বয়সে বিবাহ হয়। মেয়ে বড় হলে বাবার বাড়ি থেকে ছেলের বাড়ি যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে বোঝায় অতীতের মানুষদের ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ যেগুলো কালের প্রবাহে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব সেই বিজ্ঞান, যা অতীতকালের মানুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ সুনিপুণ খনন কার্যের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করে

সেগুলির ভিত্তিতে তাদের সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপরেখা পুনর্নির্মান করে। বিশ্বের অনেক দেশেই প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক জায়গায় আবার নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেও এর চর্চা রয়েছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে যখন এর চর্চা হয়, তখন তাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান বা নৃবৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানকে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বও (prehistoric archaeology) বলা হয়। কারণ এর অধ্যয়নের বিষয় সচরাচর সুদূর অতীতের এমন সব মানব সমাজ যারা নিজেদের সম্পর্কে কোন লিখিত দলিল রেখে যায় নি(মানব ইতিহাসে লিপির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক; সময়ের পথে পেছনে যেতে থাকলে যেখানে ইতিহাসের কোন লিপিবদ্ধ সূত্র আর পাওয়া যায় না, সেখান থেকে শুরু প্রাক-ইতিহাস)। ভূগর্ভের বিশেষ কোন স্তর থেকে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত কোন প্রাচীন মানববসতির ধ্বংসাবশেষ থেকে সযত্নে উদ্ধারকৃত বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধার করতে পারেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে আমরা একদিকে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করি, তেমনি নির্দিষ্ট কোন দেশ বা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই।

নবনীতা দেবসেন পেরুতে গিয়েছিলেন মূলত মাচুপিচ্চু দেখার জন্য, ইনকা সভ্যতার সঙ্গে চেনা পরিচয়ের জন্য কিন্তু নবনীতার জন্য ‘মাচুপিচ্চু আউট’ কারণ ‘তার জন্য যৌবন, নিদেনপক্ষে বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য, অনেকখানি সময়, অনেকটা পূর্ব প্রস্তুতি, এবং অনেক রেস্ত লাগে।’ এসবের একটিও নবনীতার নেই। ফলে নবনীতা না দমে গাইড বই দেখে মহোৎসাহে বিকল্পের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। “পেরুর অন্য-অন্য ইনকা সভ্যতার দ্রষ্টব্য জায়গার নাম খুঁজে বের করেন লেখিকা। এরকমই একটা জায়গা ‘পাচাকামাক’। হারিয়ে যাওয়া ইনকা সভ্যতার পদরেখা-চিহ্ন অনুসন্ধানে চলেছেন সাতসাগর পেরিয়ে আসা একগণ্ডা উৎসুক বঙ্গসন্তান। শুধুই ইনকা নয়, ইনকা পূর্ব সভ্যতারও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে সেখানে।

‘পাচা’ মানে ধরিত্রী, ‘কামাক’ প্রধান স্রষ্টা। আর, ‘ইণ্টি’ হলেন সূর্যদেবতা, সব প্রাণের মূল। ‘পাচাকামাক’ ধরিত্রীর স্রষ্টা-দেবতা। পাচাকামাকে এখনও রয়েছে প্রচুর ইনকা পূর্ব মানব সভ্যতার চিহ্ন এবং বিজয়ী ইনকাদেরও কীর্তিকলাপ। নানা ধরনের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে সুদূর বিস্তৃত নির্জন ধূলিধূসর প্রান্তরে। মন্দির, বাজার, দিঘি, দেবদাসী কুমারীদের হোস্টেল পর্যন্ত। আর আছে পিরামিড। মাটির তৈরি। ধাপে-ধাপে ওঠা। কিন্তু চুড়ো ভেঙে পড়া। আর, রংবেরঙের চিত্রিত সমাধি ক্ষেত্র। ধূ-ধূ মরুভূমির মধ্যে। এখানে একদিন প্রাণদা নদীর স্রোত বইত।

"গাড়ি থামল এসে এক ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে। কোনও একদিন এখানেই ছিল পাচাকামাক দেবতার মন্দির। আমরা শুনশান পোড়ো জমি দেখা হতাশ। এইখানেই ছিল পিরামিডের-পর-পিরামিড? প্রাসাদ মন্দির সমাধিক্ষেত্র? পাচাকামাক দেবতার মন্দির না-দেখতে পেলেও পাচাকামাক দেবতার সঙ্গে কিন্তু দেখা হল, এখানে রয়েছে ছোটখাটো একটি সুসজ্জিত জাদুঘর। জাদুঘর থেকে অনেকখানি বোঝা গেল ইনকাদের গল্প।" (৫)

জাদুঘর দেখে নবনীতা ইনকাদের বসন-ভূষণ, বাসন কোসন, শিল্পকলা, দেবদেবী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারলেন। আরো দেখলেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে খাঁ খাঁ পোড়ো জমির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। জনহীন-প্রাণহীন-উদ্ভিদহীন। একদিন এখানে ছিল লুরিন নদীর জনবহুল উপত্যকা। দু'হাজার বছর আগে, সেই ২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে স্পেনীয়দের আসার আগে অবধি এই জায়গাতে ছিল অভিজাত জনবসতি। স্থানীয় মানুষের তীর্থভূমি। হাট ছিল, বাজার ছিল, সারি সারি পিরামিড ছিল, মন্দির ছিল। এখানকার পিরামিড সবই অ্যাডোবে পিরামিড, মাটির ইটের তৈরি। ধাপে-ধাপে উঠে যায়। সেই সব পিরামিডের ধংসাবশেষ অনেক বেরিয়েছে, আরও বেরুচ্ছে। এখনও খনন চলছে। অনেক সম্পদ মাটির তলায়। এই পাচাকামাক দেবতার মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল তার অলৌকিক দৈববাণীর জন্য। এই সূর্যমন্দির থেকে উদগত দেবতার কোনও দৈববচন নিষ্ফল হত না। পেরুর দূর-দূর প্রান্ত থেকে অভিজাত পরিবারের লোকজন সপরিবারে আসা যাওয়া করতেন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। চারদিকে বাজার বসত, বেচা কেনা চলত রাস্তা ঘাটে, আর পুজোআচ্চা চলত মন্দিরে-মন্দিরে।

"এই ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আমি সেই দিনগুলোর কথা কল্পনা করছিলুম। পাচাকামাক দেবতা ধরিত্রীর প্রাণের কেন্দ্র। সর্বত্র প্রাণের সঞ্চার করেন তিনি। আর সেখান থেকে যখন কোনও দৈববাণী নির্গত হয়, সে-দৈববাণী কদাচ বিফল হয় না।"(৬)

যে মেয়েদের আকাশ দেখার অনুমতি ছিল না সেই মেয়েরাই একদিন গেল দেশের বাইরে ও বিদেশে। তাদের লেখা ভ্রমণ সাহিত্যে ফুটে উঠল কত জানা অজানা তথ্যের অনুসন্ধান। মেয়েদের লেখা ভ্রমণ-সাহিত্য সাহিত্যের আলোচনায় যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস এবং সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায়। আর এই গবেষণা সূত্রেই এসে যায় নৃতাত্ত্বিক আলোচনা। যে আলোচনা সমৃদ্ধ করে শুধু সাহিত্য ভাণ্ডারকে নয়, পূর্ণ করে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের শাখাকে। গুরুত্ব পায় আদিবাসী সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি।

তথ্যসূত্র :

১. দময়ন্তী দাশগুপ্ত(সংগ্রহ বিন্যাস ও উপস্থাপনা), আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত (ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলার ভ্রমণকথা) প্রথম পর্ব, গাংচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ১৫০

২. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পালামৌ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম সংস্করণ ১৩৫১, কলকাতা, পৃ ১৭

৩. তদেব, পৃ ২৯৪

৪. ঐ

৫. নবনীতা দেব সেন, আমি যাবই যাব পেরু, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৮

৬. তদেব, পৃ ৪৯

গান্ধির দৃষ্টিতে নারী - একটি সাম্প্রতিক মূল্যায়ন

অজয় কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া

।। এক ।।

"Along with the cruel custom of child marriages, Hindu society has another custom which to a certain extent diminishes the evils of the former."[১]

বাল্যবিবাহ হিন্দু সমাজে এক সর্বনাশা প্রথা। গান্ধিজি (১৮৬৯-১৯৪৮) তাঁর আত্মজীবনীতে একথা লিখেও জানালেন, এই প্রথার অপকারিতা থেকে দূরে থাকা যায় এমন ব্যবস্থাও রয়েছে। হিন্দু সমাজে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বরবধূকে পিতা-মাতা একত্র বাসের অনুমতি দিতেন না। গান্ধিজির আপন ভাগ্যের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিল এমন বাল্যবিবাহের স্মৃতি বিজড়িত কুপ্রথা। পারিবারিক ঐতিহ্য মানা এবং না মানার ক্ষেত্রেও তাঁর মনোলোকে কাজ করেছিল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলাচলতা। নারী প্রগতি এবং পুরুষের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে স্পন্দমান পদচারণার প্রশ্নে সংস্কার ও সংস্কারহীনতার সংকট জীবনভোর তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা এবং সত্যব্রতকে তিনি আজীবন লালন করলেও ঋষিসুলভ এই মানুষটি নারী স্বাধীনতা এবং নারী স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে দূরদর্শী মুক্ত চিন্তার প্রতিনিধিসুলভ যুগপুরুষ হতে পারেন নি। গান্ধিজি তাঁর বৈবাহিক জীবন এমন কি তাঁর পরবর্তী সময়েও পিতা-মাতার কাছ থেকে পাওয়া পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংস্কারকে শেকড় শুদ্ধ সমূলে উৎপাটিত করাকে কর্তব্য বিবেচনা করেন নি। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'The story of my Experiments with truth An Autobiography'—গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, বিবাহকালে বাল্যবিবাহের ভাল-মন্দ বিবেচনা করার মত উপযুক্ত বোধ তাঁর গড়ে ওঠে নি। বয়স না হওয়া সত্ত্বেও কিশোর কালেই বিবাহের আসক্তি তাঁর ছিল। পরিণত বয়সে আত্মজীবনী লেখার সময়ে তিনি পিতার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সেই অপ্রাপ্ত বয়সে, বিবাহকালে পিতার কার্যকে তাঁর যথাযথ বলেই মনে হত। পত্নী কস্তুর বাঈয়ের প্রতি স্বামী সুলভ প্রভুত্ব খাটাতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি লিখেছেন—"Little did I dream then that one day I should severely criticize my father for having married me as child. Everything on that day seemed to me right and proper and pleasing. There was also my own eagerness to get married. .....we were the same age. But I took no time in assuming the authority of a husband."[২] মহাত্মাজি নববধূ কস্তুর বাঈকে লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে পোষণ

করেছিলেন। কিন্ত তাঁর সে বাসনা বাসনাই থেকে যায়। সামাজিক এবং পারিবারিক বাধা ছিল। সামাজিক বাধা বলতে পর্দাপ্রথা। গুরুজনের সামনে স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানো যায় না। গান্ধি সংকোচ বোধ করতেন। আর তাঁর প্রবল ভোগস্পৃহা লেখাপড়ার প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে তুলেছিল। মহাত্মাজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'Playing The Husband' – অধ্যায়ে লিখেছেন – "Kathiawad had then, and to a certain extant has even today, its own peculiar, useless and barbarous purdah."[(৩)] গান্ধিজি মনে করতেন, হিন্দু পরিবারে পড়াশুনা এবং বিবাহ দুই'ই একসঙ্গে চলতে পারে।

আর গান্ধির মাতা পুতলী বাঈ ছিলেন ধর্মপ্রাণা রমণী। পূজাপাঠ শেষ করে তবেই তিনি অন্ন স্পর্শ করতেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতেন। ব্রতের কঠিন নিয়ম কানুন পালন করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রতও পালন করতেন। এমন কি কখনো কখনো তিনি উপর্যুপরি দু-তিনটে উপবাস পালন করতেন। ধর্মপ্রাণা মাতা পুতলী বাঈয়ের কাছে গান্ধিজি লাভ করেছিলেন ব্রহ্মচর্যের ঐশ্বর্য। সত্যের পূজারি হওয়ার প্রাণ-প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল মাতার পূত জীবনধারা থেকে। গান্ধিজির অহিংস সংগ্রাম ছিল আদর্শ নির্ভর। এমন সংগ্রামকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি বহুবার অনশন পালন করেছেন। গান্ধির জীবনে সত্যাগ্রহের উৎসমুখ উন্মোচিত ছিল মাতার হৃদয়ে লালিত ব্রতের শক্তির মধ্যে। হিন্দ স্বরাজের আবির্ভাবও সত্যপথ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। সেই নিহিত সুপ্ত সত্য বীজ পরবর্তীকালে অঙ্কুরিত-লালিত-বার্ধিত হয়েছে। সমাজক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে সুবিশাল বটবৃক্ষের রূপ লাভ করে সুশীতল ছায়া দিয়েছে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসকালে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন বুয়র যুদ্ধ শুরু হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত বুয়রদের সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন স্বয়ং গান্ধিজি। জুলু বিদ্রোহের সময়েও গান্ধিজি এমন সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। সত্যাগ্রহ হল সত্যনিষ্ঠ মানুষের নৈতিক সংগ্রাম। ত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মিক প্রতিরোধ। সত্যপথ অবলম্বী, অহিংস এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলে যথার্থ সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না। ১৯১৭ সালে গান্ধিজি নীলকর সাহেবদের জুলুমের প্রতিবাদে চম্পারণ সত্যাগ্রহ পালন করেছিলেন। নীলকর সাহেবরা কৃষকদের জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করেছিল। তারই প্রতিবাদে এমন সত্যাগ্রহ পালন। ঐ একই বছর খাজনার দায়ে কৃষকদের গরু বাছুর আসবাবপত্র যখন ক্রোক হতে থাকে, তখন গান্ধিজি খেড়া সত্যাগ্রহ পালন করেছিলেন। গুজরাটের সুরাট জেলায় বারদোলী (Bardoli) নামক স্থানে খাজনা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ পালন করেছিলেন। এই সত্যাগ্রহ বারদোলী সত্যাগ্রহ (Bardoli Satyagraha, 1928) নামে খ্যাত। আর গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের ভিত্তি স্তম্ভ হোল অনশন। এই ব্রহ্মচর্য এবং অনশন তাঁকে সংগ্রামের কঠিন পথে বহু কণ্টক জর্জর রক্ত-কর্দম পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। এই সত্যাগ্রহ এবং অনশন ব্রত প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর জননী পুতলী

বাঈয়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি স্বদেশী ব্রত আন্দোলনের সূচনাও করেন। বিদেশী দ্রব্যকে স্থায়ীভাবে বয়কট করতে চেয়েছিলেন তিনি। তারই পরিকল্পনা হিসেবে দেশীয় তাঁতির তৈরি খদ্দর বস্ত্রের প্রচলন সূচিত হয়েছিল। চৌরিচোরার অহিংস আন্দোলন যখন সহিংস হয়ে ওঠে, তখন গান্ধিজি সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। আর শাস্তি হিসেবে তিনি পালন করেন প্রায়শ্চিত্ত - অনশন (১৯২২)।

গান্ধিজির সবরমতী আশ্রম ছিল পূত শুদ্ধ চরিত্র নির্মাণের কারখানা ঘর। কিন্তু সেখানে আশ্রম বালকের নৈতিক অধঃপতনে প্রতিকারের পথ অন্বেষণ করেছেন তিনি। এই ঘটনায় ১৯২৫ সালের ২৪ থেকে ৩০ শে নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী তিনি অনশন এবং প্রার্থনাকে উপায় রূপে গ্রহণ করেছেন। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯৪৩ সালে গান্ধিজি জেলের মধ্যেই তিন সপ্তাহের (১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩ মার্চ) অনশন পালন করেন। মৃত্যুপথ যাত্রী তিনি। তবু অহিংসা আন্দোলনে অনশনকে জীবনের ব্রত বলে মেনে নিয়েছিলেন। গান্ধিজি অনশনের আচরণবিধি প্রস্তুত করেছিলেন। আশ্রমে অচ্ছুত হরিজনদের যোগদানের পক্ষে তিনি অনশন পালন (১৯১৫) করেছেন। আর শ্রমিকদের সমর্থনে আমেদাবাদে (১৯১৭) তিনি অনশন পালন করেছেন। রাওলাট বিলের প্রতিবাদে তিনি যে অনশন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন (১৯১৯), সেখানে সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির প্রার্থনায় মহাত্মাজি ১৯২৪ সালে ২১ দিন অনশন ব্রত পালন করেছিলেন। আর সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ভাগ বাটোয়ারার প্রতিবাদে ১৯৩২ সালে গান্ধিজি অনশন ব্রত পালন করেন। কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনশন পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ১৩ থেকে ১৮ই জানুয়ারী তিনি তিনটি অনশন ব্রত পালন করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়টি কলকাতায় স্বাধীনতার দিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে। উপবাস, গীতার শ্লোক পাঠ এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার শুভ সূচনা করেন। তাঁর শেষ অনশনের কয়েকদিন পরেই ঘাতকের গুলিতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। গান্ধির সমস্ত অনশনের মধ্যে নিহিত আছে সেই স্নেহময়ী, ত্যাগব্রতী, সংযমী জননী পুতলী বাঈয়ের ব্রত পালনের সুশীতল প্রচ্ছায়া। যথাসময়ে মোহনদাস তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যার মহতী প্রাণ-প্রেরণা অনশন ব্রত। এই শক্তিই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে মানবজাতিকে প্রাণবন্ত - উজ্জীবিত সত্যের বাণীতীর্থে পবিত্র আলো জ্বালিয়েছিল। সেই আলোর শিখাতেই একটি মাতৃমূর্তি হোমবহ্নির উজ্জ্বল আলোতে প্রতিভাত হচ্ছিল। তিনি গান্ধি জননী পুতলী বাঈ।

।। দুই ।।

"And it is this : willingly or unwillingly, consciously or unconsciously, She has considered herself blessed in following in my footsteps, and has never stood in the way of my endeavour to lead a

life of restraint.[৪]—একথা গান্ধিজি লিখেছেন তাঁর ধর্মপত্নী কস্তুর বাঈ সম্পর্কে। তিনি বলেছেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলাকেই তিনি তাঁর জীবনের সার্থকতা বলে মনে করেন। এবং পবিত্র জীবনযাপন করার চেষ্টায় মহাত্মাজিকে তিনি কখনো বাধা দেননি। পত্নীর কাছ থেকে গান্ধিজি পেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ সেবা। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, আমরা ছিলাম পরীক্ষিত বন্ধু। কস্তুর বাঈয়ের সাহস এবং সংযমের কথা গান্ধি তাঁর রচনায় বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। সংসারের সীমানায় নিত্য দিনের কাজে-কর্মে আদর্শ পত্নীর ছবিই গান্ধিজি প্রত্যক্ষ করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অবস্থানকালে পত্নী কস্তুরের তিনবার কঠিন অসুখ হয়েছিল। এমন কি জীবন সংশয়ও। ভয়ঙ্কর পীড়ায় পীড়িত মুমূর্ষু কস্তুর বাঈকে নিয়ে গান্ধিজি যখন স্টেশনে উঠেছেন, তখনও মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সাহস রেখেছিলেন কস্তুরদেবী। বলেছিলেন, আমার কিছু হয় নি, তুমি চিন্তা করো না—"Kasturbai needed no cheering up. On the contrary, she comforted me saying : nothing will happen to me. Don't worry."[৫]

গান্ধিজি অহিংসা দ্বারাই হিংসাকে জয় করতে চেয়েছিলেন। অহিংসা দ্বারাই সমাজ বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। গৃহ সংসারের অভ্যন্তর থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন অহিংসার প্রথম পাঠ। পত্নী কস্তুর বাঈ ছিলেন সেই সত্য আদর্শের প্রতিমূর্তি। তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছিলেন আত্মিক শিক্ষার প্রথম পাঠ। লাভ করেছিলেন সহ্যশক্তির মহনীয়তা। গান্ধি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, তিনি যেমন প্রেম-পরায়ণ ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠুর স্বামী। কখনো কখনো কস্তুরকে তিনি জ্বালাতন করতেন। কিন্তু কস্তুর মুখ বন্ধ করে সবকিছু সহ্য করতেন। কখনো তাঁর চোখ জলে ভিজে যেত। নারীর অসহায়তা ব্যক্ত করতেন মাঝে মাঝে। নিজের আত্মজীবনীতে গান্ধি লিখেছেন যে, কস্তুর বলতেন, আমি মেয়েমানুষ বলে লাথি খেয়েও আমাকে থাকতে হবে। তিনি আরো লিখেছেন, পত্নী তাঁর অদ্ভুত সহ্যশক্তি দ্বারা জয়লাভ করতেন – "But I was a cruelly-kind husband. ..... I have no parents or relatives here to harbour me. Being your wife, you think I must put up with your cuffs and kicks? The wife, with her matchless powers of endurance, has always been the victor."[৬] দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ভারতীয়রা উপঢৌকন স্বরূপ যে সম্মান সূচক অলংকার কস্তুরবাকে দান করেছিলেন, মহাত্মাজি সেগুলি জনসেবার কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন। কস্তুরবা পুত্রবধূদের জন্য তা রাখতে চেয়েছিলেন। গান্ধি এসব যুক্তিকে গুরুত্ব দেননি। অবশেষে কস্তুরবা অলঙ্কারগুলি দান করেছিলেন জনসেবার কাজে।

গান্ধিজির জীবন সাধনা ব্রহ্মচর্যের সাধনা। ত্যাগ এবং কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি। গান্ধিজি নিজে সেবা কর্মে নিরত ছিলেন। এই সেবাকর্মের অন্তঃপ্রেরণা ছিল কস্তুরবা। কোন একদিন কুষ্ঠরোগ পীড়িত এক আতুর গান্ধি-কস্তুরবার

বাড়িতে চলে আসেন। তিনি তাকে ফেরালেন না। তাকে খাইয়ে বিদায় করতে তাঁর মন সায় দিল না। তিনি তাকে একটা ঘরের কক্ষে যত্ন সহকারে রাখলেন। রোগীর আক্রান্ত স্থানের ঘা পরিচ্ছন্ন করলেন। অবশেষে তাঁর সেবা করলেন। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'Spirit of Service' -গ্রন্থে লিখেছেন- "When a leper came to my door. I had not the heart to dismiss him with a meal. So I offered him shelter, dressed his wounds, and began to look after him".[৭]
এমন সেবাকর্ম গান্ধিজি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন কস্তুরবার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ও সমর্থনে। গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন, সন্তান লালন পালনে মায়ের ভূমিকাই বড়। তিনি মনে করেন, সন্তানের শিক্ষারম্ভ শুরু হয় মাতৃগর্ভে। সন্তানের বিকাশ নির্ভর করে পিতা মাতা উভয়ের উপরে। তিনি মনে করেন, জনন ক্রিয়ার উপর সন্তানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সংসার ঈশ্বরের লীলাভূমি। জননী সন্তানকে পৃথিবীতে বহন করে আনেন। শুধু ভোগ নয়, তৃষ্ণা নয় – পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যান মানব প্রবাহের অংশভাক- ভবিষ্যৎ সুফল বংশধর। কেননা মায়ের প্রকৃতি নিয়েই সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে - "Then during the period of Pregnancy it continues to be affected by the mother's moods, desires and temperament, as also by her ways of life."[৮]

১৯০৬ সালে গান্ধিজি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন। ব্রহ্মচর্য শুধু মানসিক জাগরণ নয়, মোহের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের পূর্বে মহাত্মা পত্নী কস্তুরবার সম্মতি চেয়েছিলেন। সেই সম্মতি মিলেছিল। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী অংশের 'Brahmacharya 11'- অধ্যায়ে লিখেছিলেন-
"...I took the vow in 1906. I had not shared my thoughts with my wife until then, but only consulted her at the time of taking the vow. She had no objection."[৯] কস্তুরবা গান্ধি-জীবন পরিক্রমায় ছিলেন অনেক কিছুই। গান্ধি চরিতের- ভূমিকা লেখা হয়ে গেছিল তাঁর হাতে। তাঁর কর্মভবিষ্যৎ পরিকল্পনার খাতা সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন পত্নী কস্তুর। গান্ধিজি স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করাকে পবিত্র কর্ম বলে মনে করেছেন। সত্যব্রতের অংশভাক ত্রটি। স্ত্রী ছাড়া ব্রহ্মচর্য পালন করা যায় না। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এটা প্রথম বুঝেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী অংশের- 'Brahmacharya 1' – অংশে লিখেছেন- "I had been wedded to a monogamous ideal ever since my marriage, faithfulness to my wife being part of the love of truth. But it was in South Africa that I came to realize the importance of observing brahmacharya even with respect to my wife."[১০] ব্রহ্মচর্য হল মন, বাক্য, দেহ এবং সর্ব ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালনে ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শন করেন। ব্রহ্মদর্শন হল ঈশ্বরলাভ। ব্রহ্মচর্য এক তপশ্চর্যা। শরীর, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা রক্ষিত হয় ব্রহ্মচর্য পালনে। গান্ধিজি কস্তুরবাকে উপযুক্ত লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন।

বাল্যকালের বিবাহ, সমাজিক-পারিবারিক বাধা, কর্মব্যস্ততা- এসব কারণে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা কস্তুরের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই অসম্পূর্ণতা গান্ধিকে বারবার পীড়িত করেছে। তবুও সৎ সত্যনিষ্ঠ গান্ধি জীবন পথে পত্নীকে অবলম্বন করেই হেঁটেছেন। দু'জনেই উপবাস পালন করেছেন। সরল জীবনের অনুসন্ধান করেছেন আমৃত্যু। পত্নী কস্তুর তাঁর জীবনে ছিলেন আলোক সদৃশ।

এরপর গান্ধি-কস্তুর আশ্রম জীবনে অনুপ্রবেশ করেছেন। গান্ধি পত্নী কস্তুর হয়ে উঠেছিলেন আশ্রম জননী কস্তুরবা। আর গান্ধি হয়েছেন বাপু। আশ্রমিকদের দেওয়া এমন প্রিয় নাম। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাকাপাকিভাবে **১৯১৫** সালে গান্ধিজি দেশে ফিরলেন। গুজরাটের আমেদাবাদে গড়ে তুললেন সত্যাগ্রহ আশ্রম। নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ পরিবারের অস্পৃশ্য দুদাবাইকে গান্ধিজি আশ্রমে স্থান দিলেন। কস্তুর আপত্তি জানালেন। আপত্তি জানালেন আরো অনেকে। গান্ধি অনড়। পত্নীর কথা শুনলেন না। অবশেষে কস্তুরের মানস পরিবর্তন ঘটল। দুদাবাইকে মানলেন। তাঁর কন্যা সন্তানকে আপন সন্তানের মর্যাদা দিলেন। অস্পৃশ্য নারী হয়ে উঠলেন মহনীয়। আশ্রমিকদের কাছে কস্তুর হয়ে উঠলেন কস্তুরবা। জাতির জনকের পত্নী সামান্য রমণী কস্তুরবা আপন গুণে অসমান্য হয়ে উঠলেন।

গান্ধির জীবনে নারীর স্বচ্ছন্দ পদচারণা নিয়ে নানা কথা ওঠে। কখনো কখনো অনাবিল মুগ্ধতার নির্মল রূপও প্রতিভাত হয়েছে। **১৯১৯** সালে রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। **২৯** বৎসর বয়স্কা সরলা দেবী তখন লাহোরের কংগ্রেস নেতা রামভুজ দত্ত চৌধুরীর স্ত্রী। সরলা ভারি উচ্ছল। বড় মিষ্টি তাঁর গানের গলা। লাহোরে সরলার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন গান্ধি। সরলা দেবীর সাহচর্যে যে তাঁর লাহোরে অবস্থানকালীন দিনগুলি বড় মধুময় হয়ে উঠেছিল, সেকথা লিখে গেছেন রাজমোহন গান্ধি তাঁর 'Mohandas : A True Story of a man, His people and an Empire'- গ্রন্থে। গান্ধির সঙ্গে সরলা দেবীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল। অবশেষে সরলা দেবী সবরমতী আশ্রমে এলেন। তাঁদের আলাপচারিতা সময়ের নিষেধ মানল না। আশ্রমিকরা কানাকানি, বলাবলি করতে লাগলেন। এত সত্ত্বেও কস্তুরবা সবকিছু জেনে বুঝেও সরলা দেবীকে পরম অতিথিরূপে বরণ করে আপ্যায়ন করেছেন। অবশেষে গান্ধি তাঁর সরলা ঘনিষ্ঠতায় ছেদ চিহ্ন দিয়েছেন। সরলাদেবী এর কারণ জানতে চেয়েছেন। উত্তরে গান্ধি বলেছেন- "I have been analyzing my love for you. I have reached a definition of spiritual (marriage)."[১১] গান্ধি-সরলার প্রেমের ঘনিষ্ঠ প্রবাহে ছেদ পড়লেও, সরল আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। দেখা যাচ্ছে, গান্ধি জীবনের একটা অন্ধকারতম দিক ছিল পত্নী কস্তুরের উপর আপন অনুশাসন জারি রাখা। কস্তুরবার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধকে তিনি সেভাবে মর্যাদা দেননি। অনেক পরে তিনি আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছিলেন। তাঁর মানস পরিবর্তন ঘটেছিল। পুত্র রামদাসকে এক চিঠিতে তিনি কস্তুর সম্পর্কে লিখেছেন

(১১ই আগস্ট, ১৯৩২) – "She (Kasturba) could not be angry with me, whereas I could with her. I did not give her the same freedom of action which I enjoyed...My behaviour towards Ba at Sabarmati progressively (changed)".[১২]

প্রথম জীবনে নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধিজি সংশয়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ- আফ্রিকায় অবস্থানকালে সে দেশের এক বিচারপতির এক রায় (১৯১৩) অনুযায়ী, সরকারী অফিসে রেজিস্ট্রি ছাড়া ভারতীয় রীতির কোন বিবাহ স্বীকৃতি পাবে না। এই ছিল রায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। কস্তুর দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এই নিয়মের বিরুদ্ধে আশ্রমিক মহিলাদের সংগঠিত করে প্রতিবাদী আন্দোলনে নেমেছিলেন। গান্ধি ঘরনি কস্তুরবার পথে নেমে আন্দোলনের সূচনা এখানেই। ভারতবর্ষে ফিরে সমগ্র নারী সমাজকে গান্ধি সত্যাগ্রহী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। ১৯১৩ সালে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী নারীদের এমন আন্দোলনের কারণে কস্তুরসহ ষোলজন রমণী জেলবন্দি ছিলেন। ১৯১৭ সালে গান্ধিজি ভারতবর্ষে ফিরে সত্যাগ্রহী মহিলা বাহিনী গঠন করলেন। সেই বাহিনীতে যেমন ছিলেন আনন্দীবাই, অবন্তিকাবাইদের মত উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা, ঠিক তেমনি গ্রামের কম লেখাপড়া জানা রমণীরাও। গান্ধি পত্নী কস্তুরবাও সেই বাহিনীতে ছিলেন। গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত এই রমণীরাও বুঝেছিলেন যে, সমাজ গঠনের জন্য নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা প্রয়োজন। কেননা, সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোন আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে এমন স্বয়ম্ভরতা খুব জরুরী। কস্তুর সহ সত্যাগ্রহী দলের সমস্ত সদস্যরা গ্রামীণ পাঠশালা তৈরি করেছেন, রমণীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

গান্ধির নারী প্রগতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৈষম্যহীনতা। তিনি মনে করেন, শ্রেণিভেদ বর্জিত সমস্ত স্তরের নারী তা সে – ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যিনিই হোন না কেন সকলেই যদি প্রকৃত আদর্শের অনুগামী হয়ে সমাজের কাজ করেন, তবে সমাজের অবকাঠামো বদলাতে বাধ্য। মোহনদাস দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা জানেন, নিম্নবর্গীয় ভারতীয় শ্রমিকরা যখন সত্যাগ্রহ পালন করে কারাবাস বরণ করেন, তখন উক্ত শ্রমিকদের স্ত্রী ও কন্যারাও কৃচ্ছ্রসাধনকে সহনীয় করে তোলেন। কখনো কখনো তারাও কারাবাসে যান। গান্ধি ভারতবর্ষের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীশক্তির অসামান্যতা বুঝেছিলেন। তিনি সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি শিক্ষিতা রমণীকে যোগ্য সহযোগী রূপে লাভ করেছিলেন। সে সময়ে উচ্চ শিক্ষিতা রমণীদের সংগঠন ছিল ভগিনী সমাজ। তিনি সংস্থার সদস্য ভগিনীদের কাছে সীতা, দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ তোলেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের এমন সেবাব্রতী চিরপূজ্য রমণীদের আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলেন। তিনি বুঝেছিলেন, রমণীরা যদি যথার্থ শিক্ষিতা না হয়ে ওঠেন, তবে সমাজের উন্নয়ন রুদ্ধ হয়। আসলে

তিনি মনে করেন, নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। শিক্ষা সংস্কৃতিতেও নারী পুরুষের থাকে সমান অধিকার। এরকমই বাল্য বিবাহের সমূল উৎপাটন তাঁর বক্তৃতায় ফিরে ফিরে আসে।

১৯৪২ সালে গান্ধিজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন। কিন্তু বোম্বাই থেকে আগস্ট মাসের ৯ তারিখ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। সূচি অনুযায়ী গান্ধি জনসভায় বক্তব্য রাখতে পারলেন না। স্বামীর অবর্তমানে নেতৃত্বের সব দায়িত্ব তুলে নিলেন কস্তুর নিজে। তাঁকে ও গ্রেপ্তার করা হল। গান্ধির সঙ্গে দু'বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করলেন কস্তুরও।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধিজি লাভ করেছিলেন আর এক সহকর্মীকে। তিনি সরোজিনী নাইডু(১৮৭৯-১৯৪৯)। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রী। আলাপ লণ্ডনে। সরোজিনী তাঁর লেখায় গান্ধিকে দরিদ্র ভারতবাসীর সন্ত বলে বর্ণনা করেছেন। গান্ধির ইচ্ছাতেই সরোজিনী কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি বোম্বাইতে সুতাকল শ্রমিকদের যে ধর্মঘট (১৯২৮) হয়েছিল, সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন সরোজিনী। ১৯৩০ সালে তিনি প্রায় দু'শ মাইল পথ হেঁটে ডাণ্ডি অভিযান করেছিলেন। এই অহিংস সংগ্রামী অভিযানে সরোজিনী ছিলেন গান্ধির সহযোদ্ধা। ডাণ্ডি অভিযানে গান্ধিজি গ্রেপ্তার বরণ করলে সরোজিনী উক্ত অভিযানে-র নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। গান্ধি সম্পর্কে সরোজিনীর স্মরণীয় উক্তি ছিল – 'Gandhiji's body is in jail but his soul is with you!'[১৩]

লবণ আইন ভঙ্গে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর ব্রিটিশ পুলিশ নির্মম ও পৈশাচিক অত্যাচার করেছিল। সরোজিনী নাইডুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গান্ধির অহিংস আন্দোলন এবং আশ্রমিক আদর্শে উদ্দীপিত হয়েছিল যে সমস্ত রমণীরা, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গঙ্গাবেন, মণিবেন, সুশীলা নায়ার প্রমুখ। গান্ধি মহিলাদের আশ্রমিক আদর্শবোধে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। শুধু অক্ষর নির্ভর লেখাপড়া শেখাই নয়, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমগ্র নারী সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মান উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন তিনি। রমণী সমাজও তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলেন ধর্মের সরল অর্থ- আত্মোপলব্ধি, সংযম এবং দিব্য সত্তার আলোয় নিজের সত্তাকে আলোকিত করা। সরোজিনী তাঁর 'My father, do not rest.'- শিরোনামের একটি বক্তৃতায় গান্ধিজির মূল্যায়ন করেছেন - "...has taught the world that the spirit matters, not the flesh...My father do not rest. Do not allow us to rest. Keep us to our pledge. Give us strength to fulfil our promise".[১৪]

আশ্রমে গান্ধিজি রমণীদের চরকায় সুতা কাটা শেখানো, টয়লেট পরিচ্ছন্ন করা প্রভৃতি কাজ অবশ্য কর্তব্য বলে উপদেশ দিয়েছেন। হাতে-নাতে এসব কাজ তিনি শিখিয়েছেন। ইংরেজ কন্যা মাডলিন স্লেড (Madeleine Slade, 1892-1982) – গান্ধি

যার নাম রেখেছিলেন মীরা বেন (Mira Behn)। রোম্যাঁ রোল্যাঁর লেখা গান্ধি জীবনী (Mahatma Gandhi) পড়ে তিনি গান্ধিকে খ্রীষ্টের মত দেবতা মনে করেছেন। ১৯২৫ সালের ১৬ই নভেম্বর প্রায় ৩৩ বৎসর বয়স্কা তরুণী মীরা বেন গান্ধির সবরমতী আশ্রমে এলেন। গান্ধিজি তাকে আপন কন্যা সন্তানের মত গড়ে তুললেন, হয়ে উঠলেন প্রিয় শিষ্যা। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। গ্রেফতার হয়েছেন তিনি। ১৯৪৪ সালে গান্ধির সঙ্গে মীরার দূরত্ব তৈরি হয়। কারণ ছিল, পৃথ্বী সিং নামে এক বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং ব্যক্তিগত বৈবাহিক সম্পর্ক জনিত টানাপোড়েন। অবশেষে সম্পর্কের সেই ব্যবধান ঘুচে যায়। গান্ধি আপন হৃদয়ের ঔদার্যে তাঁর প্রিয় শিষ্যা মীরাকে গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল পর্বে গান্ধি নারী সমাজকে অহিংস সংগ্রামে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের সন্ত নারী মীরাবাইকে তিনি আদর্শ রূপে বিবেচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, নারী প্রকৃতিগত ভাবেই অহিংস। ১৯১৮ সালের খেড়া আন্দোলনে বিধবা রমণী সত্যাগ্রহী আনন্দবাই অহিংস সংগ্রামের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি জমিদারকে জমির খাজনা দেবেন না। গান্ধির মহিলা সত্যাগ্রহীরা চরকা কেটেছে, বিলিতি কাপড় পরিত্যাগ করেছে, মিটিং মিছিলে হেঁটেছে। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ রমণীদের উপর অত্যাচার করেছে। রমণীরা আইন ভঙ্গ করেছেন এবং কারাগারে গেছেন। গান্ধি জীবনের শেষপর্ব নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলমানের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সুচেতা কৃপালিনী, কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখ মহিলারা শিবির স্থাপন করে ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

নারী উন্নয়ন গান্ধি চরিতের একটা পৃথক অধ্যায় হতে পারে। একথা ঠিক , ভারতীয় নারী মুক্তির স্বাদ পেয়েছে চরকা কাটার মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় সমাজে পুরুষের হাতেই ছিল সমস্ত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। অসম অর্থনৈতিক বিন্যাস নারীর দুরবস্থার এক বড় কারণ। চরকা স্বদেশী রমণীকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের সুযোগ করে দেয়। চরকায় সুতো কেটে মেয়েরা তখন সত্য সত্যই উপার্জনক্ষম হয়েছেন। সমস্ত নারী সমাজের মধ্যে এক জাতীয় পারস্পরিকতা গড়ে ওঠে। চরকায় সুতো কেটে খদ্দরের কাপড় তৈরির লোকজ কর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে রমণী খুঁজে পেয়েছে অর্থনৈতিক নির্ভরতা। গান্ধি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই নারীর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি ঘটে। রমণীদের পুথিগত বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে কর্মময় পৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধন করাতে চেয়েছিলেন তিনি। শিক্ষিতা রমণীরা প্রসূতি বিদ্যা, সন্তান পালন, স্বাস্থ্যবিধি পালন প্রভৃতি পল্লিগ্রামের রমণীদের শেখাবেন- গান্ধি এরকম বাসনাই পোষণ করেছেন। অপরদিকে গান্ধিজি লক্ষ করেছেন, গ্রামীণ রমণীরা কষ্ট সহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রম করতে এরা অভ্যস্ত। এবং এঁরা শ্রম করতে অপারগ নয়। শহুরে শিক্ষিতা রমণীরা পল্লি রমণীদের কাছ থেকে এগুলি শিখবেন। শিক্ষিতা রমণীদের নানা সামাজিক

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উপদেশ দিয়েছেন তিনি। গান্ধি হিন্দু বিবাহে পুরুষদের পণ এবং যৌতুক গ্রহণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহ ব্যবস্থাকে তিনি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলেই মনে করতেন। নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও উভয়ের সমমর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

গান্ধির নির্দেশে মহিলারা কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে স্থান লাভ করেন। স্বদেশী দ্রব্যের প্রচারে এঁরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বিলেতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করেছিলেন রমণীরাই। কুমিল্লার হেমপ্রভা মজুমদার তাঁর স্বদেশী বক্তৃতায় পল্লিবাসীকে মুগ্ধ করে রাখতেন। ভারি চমৎকার সুবক্তা ছিলেন সন্তোষ কুমারী গুপ্তা। আর একান্তই বৃদ্ধা মোহিনী দেবী খদ্দর পরিধান করে নানা সভা সমাবেশে উপস্থিত থেকে স্বদেশী আন্দোলনে অন্যতর মাত্রা দিতেন। স্মরণ করতে হয়, ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী বাসন্তী দেবীকে। এর ঠিক তিন বৎসর পরে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেন। গান্ধি মনে করতেন, পল্লিই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক। তিনি শেষ জীবনে গ্রামবাংলার রমণীদের সাহায্যে পল্লি উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পল্লিরমণীরা গ্রামে গ্রামে মদের দোকান ভেঙে ফেলেছিলেন। তিনি মনে করেন, সুশিক্ষিতা রমণীরাও আপন সন্তানের প্রতি, সংসারের প্রতি যত্নশীল হবেন। অস্পৃশ্যতাকে গান্ধিজি জাতির কলঙ্ক বলে মনে করেন। নিম্নবর্গীয় শূদ্র রমণীরা অস্পৃশ্যতার কারণে সমাজের আলোকিত প্রদেশে আসতে পারেন না। অস্পৃশ্যতাকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন তিনি। গান্ধিজি মনে করেন, নারী শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়। নারীকে গৃহকোণের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে আত্মনির্ভর হওয়ার প্রেরণা তো তিনিই দিয়েছেন। রমণীরা স্বভাবই শুদ্ধ ও পূত পবিত্র চরিত্রের হয়ে থাকেন। তাঁর মতে, নারীর যথার্থ কল্যাণ নিহিত রয়েছে পুরুষ প্রাধান্য ও পুরুষ আচ্ছন্নতা বর্জনের মধ্যে। আত্মরক্ষায় নারী অহিংসার পথই অবলম্বন করবেন- তিনি এমন সত্যেই বিশ্বাসী। নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যখন নারী অত্যাচারের শিকার হয়ে ওঠেন – তখন গান্ধিজি স্থির থাকতে পারেন নি। এমন খবর শুনে তিনি বিষপান করে আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নারী বিষয়ক নানা কল্যাণ মূলক কাজ এমন মহাজীবনকে জড়িয়ে আছে।

গান্ধির দৃষ্টিতে নারী-এই সংক্রান্ত আলোচনায় কয়েকটি তীক্ষ্ণ প্রশ্নকে সতর্কভাবে বিচার করতে হয়। গান্ধি কি পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে লালন করেছেন? তিনি কি নারীকে একান্তই সংযমী হওয়ার কথা বলে নারী প্রগতি এবং আধুনিকতাকে মান্যতা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। তিনি কি জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত স্থাপন করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন? বারবনিতা রমণীদের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি রক্ষণশীল মানসিকতার পরিপূরক ছিল? নারী কি কেবল গৃহস্থলি সংসারের সীমানায়

নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন? বয়স্ক বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা কি পশ্চাৎমুখীনতা নয়? বিবাহের ক্ষেত্রে জাতি- বৃত্তিকে মান্যতা দেওয়ায় তিনি কি সামাজিক সংগঠনের পুরানো রীতিকে সমর্থন করেছেন? নারীকে মাতৃশক্তির প্রতীক বিবেচনা করে তিনি কি আধুনিক নারীবাদী ভাবনার উৎসমুখ রুদ্ধ করে ফেলেছিলেন? নারীকে দেশাত্মবোধ এবং আদর্শ জাতীয়তাবাদের মোড়কে মুড়ে ফেলে তিনি কি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং যুক্তিবাদকে অস্বীকার করেছিলেন? তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ও শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই ছিল না?

মনে রাখতে হবে, গান্ধি দেবশিশু রূপে মর্ত্যে অবতরণ করেন নি। একান্ত মানব শিশুরূপে মর্ত্যভূমিতে তাঁর আগমন। রক্ত মাংসের মানুষ তিনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংস সত্যগ্রহ পালন করতে গিয়ে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। এই পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। রক্তকর্দম পথে হাঁটতে হাঁটতে জর্জর হয়েছেন তিনি। সুতরাং তাৎক্ষণিক বাস্তব পরিস্থিতি এবং ঋষিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে আগামী পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা এই দুই সত্তাকে তিনি সবসময় মেলাতে পারেন নি। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দোলাচলতার মধ্যে রণ-রক্ত-জর্জর বাস্তব পৃথিবীতে তিনি দেবোপম হলেও দেবতা নন। এই হিংসা দীর্ণ পৃথিবীতে অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যে পবিত্র স্নিগ্ধ আলো তিনি জ্বেলে দিয়েছেন – শত শত শতাব্দী ব্যাপী মানুষের সভ্যতাকে তার জ্যোতিপুঞ্জ আলোকিত করবে নিশ্চয়ই। মানুষ তো আসলে আজও সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠেনি। মানুষ মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করছে। কবে যে সে সাধনা সম্পূর্ণ হবে আমরা জানি না।

গান্ধি পারিবারিক জীবনে যে পত্নী কস্তুর বাঈকে সংযম – শাসনের মধ্যে রাখতেন তা তাঁর আত্মজীবনী পড়েই বোঝা যায়। কস্তুর তাঁর স্বামীর অনেক কথাকে মানতে না পারলেও মানতে বাধ্য হতেন। এমন কি , উপায়হীন অসহায় নারী জন্মের জন্যই যে তিনি সংসার ছেড়ে অন্যকোণ স্থানে পালাতে পারছেন না, একথাও গান্ধি তাঁর আত্মজীবনীতে অকপটে স্বীকার করেছেন। আসলে গান্ধি পবিত্র নারীর প্রতীকরূপে দেখেছিলেন তাঁর জননী পুতলী বাঈকে। পিতৃতান্ত্রিকতার কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয়, উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর ধমনিতে পিতার রক্ত প্রবাহিত ছিল। হয়তো বা সেই ঐতিহ্য তিনি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বহন করেছিলেন। আর গান্ধির কথা অনেকেই উল্লেখ করেন। গান্ধি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তাঁর পিতা চারবার বিবাহ করেন। গান্ধির মাতা পুতলী বাঈ পিতা কাবা গান্ধির চতুর্থ পত্নী। চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি চতুর্থ বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পিতার ভোগ আসক্তির কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। গান্ধিরও তরুণ যৌবনে এমন নারী আসক্তি ছিল। পত্নী কস্তুর যখন সন্তান সম্ভবা, মুমূর্ষু পিতার মৃত্যু যখন আসন্ন, তখনও তিনি ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থ করেছেন। যথাসময়ে পিতার সেবা করতে পারেন নি। এই ঘটনাকে তিনি তাঁর জীবনের কলঙ্কস্বরূপ মনে করেছেন। তাঁর এই লজ্জা তাঁকে আজীবন পীড়া দিয়েছে।

আজ ২০২৩, ২০শে এপ্রিল। জনসংখ্যার বিচারে রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকা অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারতবর্ষ – জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। চিনকে প্রথম স্থান থেকে হঠিয়ে ভারতই আজ বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। চিনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ। চিনের থেকে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বেশি। ১৯৫০ সাল থেকে জনগণনার তথ্য প্রকাশ করে এসেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ড. আম্বেদকর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে সমাজের প্রান্তিক স্তরে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন, তখন গান্ধি জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও মহাত্মার এমন মতকে মান্যতা দিতে পারেন নি। গান্ধি মনে করেছেন, যে সমস্ত রমণীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঔষধপত্র ব্যবহার করেন তারা বারবনিতারই সমতুল। গান্ধির ধারণায়, রমণীরা পুরুষকে প্রলোভিত করে, তাঁর নৈতিক চরিত্রের ভূমিকে নড়বড়ে করে তোলেন। কখনো তিনি রমণীকে মানবসভ্যতার মাতৃস্থানীয়া বলেই দাবি করেছেন। বারবনিতাদের গান্ধি কখনোই ভালো চোখে দেখতেন না। পেশাগত কারণে তাদের তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পথকে (১৯২০, বরিশাল) রুদ্ধ করেছেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার টলস্টয় আবাসিক আশ্রমে যা ঘটেছিল । এক আবাসিক তরুণ দুই আবাসিক তরুণীকে বিরক্ত করলে গান্ধি যুবকটিকে তিরস্কার করার পাশাপাশি তরুণীদ্বয়ের চুল নিজে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলেছিলেন। গান্ধির ধারণা তরুণীদ্বয়ের রূপ যৌবনের জন্যই তরুণটি প্রলোভিত হয়েছে। সুতরাং এই শাস্তি। গান্ধির এমন অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি কোনভাবেই আধুনিক চিন্তনের ভাবনাকে বহন করে না। একালে তো নয়ই, সমকালেও তা যুগোপযোগী ছিল না কোনভাবেই।

গান্ধি আধুনিক শহুরে সভ্যতার প্রতি একপ্রকার বীতরাগ দেখিয়েছেন। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতাকে তিনি কখনোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিতে পারেন নি। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাধনা তিনি করেন না। আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের শিক্ষার সঙ্গে নারীর যোগাযোগকেও তিনি উদার ভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করেছেন, প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী কর্ম এবং বৃত্তির মধ্যেই ভারতের পল্লি গ্রামের প্রাণ প্রাচুর্য জীবিত থাকে। এমন পরিচ্ছন্ন ধারণায় সত্যই পৃথিবীতে মানুষ সুস্থভাবে থাকতে পারে। তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল স্বনির্ভর, যা কেবল বস্তুগত নয় – আধ্যাত্মিক প্রাণ প্রাচুর্য থেকে উৎসারিত। এক শিক্ষা সম্মেলনে (গুজরাট, ১৯১৭) তিনি পুরুষ-নারীর মধ্যে প্রকৃতিগত তফাতের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, নারী পুরুষ সমাজের সমান অংশ হলেও নারীর কর্মজগৎ গৃহ সংসারে। আর পুরুষের বহির্জগতে । সন্তান প্রতিপালন নারীর বড় দায়িত্ব। ঘরে বসে যে সব কাজ করা যায় – যেমন সুতো কাটা, বস্ত্র বয়ন, কুটির শিল্পের কাজ - নারী সেগুলোতেই যত্নশীল হবেন বলে বিশ্বাস করেন। ১৯৩৭ সালে 'অখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন'- এ (ওয়ার্ধা) তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমে এগুলিকেই রেখেছিলেন। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর মতামত সুচিন্তিত ছিল

না। বালিকা বিধবাদের বিবাহকে যেমন তিনি মান্যতা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী রমণীর পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে তিনি সম্মতি দেন নি। বিবাহের ক্ষেত্রেও জাত পাতকে অস্বীকার করেন নি তিনি। অবশ্য জীবনের উপান্ত বেলায় বিশেষত ১৯৩০ সাল পরবর্তী সময়ে গান্ধি ভিন্ন জাতি - গোষ্ঠী, ভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথাকে তিনি জঘন্য সামাজিক অপরাধ বলেই মনে করেছেন। তবুও একথা ঠিক, স্বদেশ চেতনা এবং প্রকৃত জাতীয়তাকে অবলম্বন করে গান্ধি তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেছেন। তিনি ছিলেন যথার্থ আন্তর্জাতিক মানুষ। প্রকৃত জাতীয়তা এবং স্বদেশ চেতনার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনও বিরোধ নেই। শত শত মহিলাকে তিনি ভারতের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করিয়েছিলেন। নারী সত্যাগ্রহীরা আপন আপন মর্যাদা রক্ষা করেই আত্মশক্তির প্রয়োগ - পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেদিন। সংকীর্ণ জাতীয়তার শেকড় ছিন্ন করে তারা হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ আন্তর্জাতিক নারী। স্বাদেশিকতা ছিল তাদের আন্তর্জাতিক নারী হয়ে ওঠার সাধন পথ। তাঁর সাধনালব্ধ নারী বাহিনী তাঁর আদর্শেই হয়ে উঠেছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহী।

গান্ধির পিতৃতান্ত্রিক সত্তার মধ্যেই সেদিনের নারী সমাজ লালিত, পরিশীলিত এবং বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। তবুও নারীকেন্দ্রিক চিন্তনের মধ্যে কখনো কখনো তাঁর প্রগতি বিরোধিতা ধরা পড়ে। এসব সত্ত্বেও সেদিন তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতির আলোকোজ্জ্বল রাজপথ। আজ নারীকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অগ্রগমনে তাঁর চিন্তারাশির অনেক কিছুই পরিহার করা যেতে পারে। তবুও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে বর্জন করে তিনি নারীর পদচারণার নতুন যাত্রাপথ খনন করতে চান নি। কিন্তু তাঁর পথ ধরে নারীবাদী চিন্তকেরা আধুনিক নারী প্রগতি ও নারী মনস্তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। তাঁর নারীকেন্দ্রিক ভাবনার যেখানে শেষ, আধুনিক নারীবাদীদের যাত্রা সেখানে থেকেই। তাঁর বটবৃক্ষ সদৃশ সুবৃহৎ জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা না করলে তাঁর মূল্যায়ন অসম্পুর্ণ থেকে যাবে। ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত ভারতীয় সমাজভূমিতে অহিংসার যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, তাই অনুকূলে-প্রতিকূলে, জলে – প্লাবনে, ঝড়ে - ঝঞ্ঝাতে আন্দোলিত হতে হতে নারী-পুরুষের মিলিত প্রবাহে ধারণ করে আছে ভারতীয় সত্তাকে। সেখানে সাদা খদ্দর পরিহিতা ভারত জননী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পবিত্র স্নিগ্ধ স্নাত মাতৃমূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে আজ ভারতবাসীর দুয়ার প্রাঙ্গণে।

তথ্যসূত্র :

১। Mohandas Karamchand Gandhi, playing the Husband, The Story of my Experiments with Truth an Autobiography, Om Books International, New Delhi, India, 2019, P.15

২। ibid, Child Marriage, PP. 11-12
৩। ibid, Playing the Husband, P.15
৪। Mohandas Karamchand Gandhi, A Sacred Recollection and Penance, The Story of my Experiments with Truth an Autobiography, Om Books International, New Delhi, India, 2019, P.310
৫। ibid, Kasturbai's Courage, P. 364
৬। ibid, P. 309
৭। ibid, Spirit of Service, P.223
৮। ibid, P.225
৯। ibid, Brahmacharya II, P.230
১০। ibid, Brahmacharya I, P.226
১১। Rajmohan Gandhi : Mohandas : A True Story of a man, His people and an Empire Penguin viking, 2006, P. 232
১২। ibid, P. 33
১৩। Tendulkar : Mahatma (Vol. II), Great Trial, Publications Divisions, Govt.of India, 1961
১৪। Rudrangshu Mukherjee (Ed.), The Great Speeches of Modern India, Random House India, Noida U.P., 2011, PP. 193, 197

আফসার আমেদের 'খোঁজ' সিরিজ : নিখোঁজ মানুষের আখ্যান

মামনি মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : কিস্‌সা সিরিজের রচনাকার আফসারের সাহিত্য আলোচনায় আরও এক ধরণের সিরিজ উপন্যাস আমাদের চোখে পরে, তা হল খোঁজ সিরিজ। যেখানে আমরা দেখতে পাই জীবনের খোঁজে নিখোঁজ হয়েছে উপন্যাসের নায়কেরা। এই তালিকায় থাকা উপন্যাসগুলি হল – 'সেই নিখোঁজ মানুষটা', 'খোঁজ', 'বাঁচার খোঁজে'। এই তিনটি উপন্যাসেরই কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে খোঁজ প্রসঙ্গটি। 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসের নায়ক আবিদ ছোটবেলা থেকেই এক নিখোঁজ মানুষ। তার গোটা জীবনের ধারাবিবরণীর মধ্যে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে নিখোঁজ হওয়ার প্রসঙ্গ। স্নেহ প্রেম কোনো কিছুর বন্ধনেই তাকে আটকে রাখা সম্ভব হয় নি; আপন স্বভাববৈশিষ্ট্যের কারণেই মুক্তিকামী পাখির মতো বারবার খাঁচা ভেঙে নিখোঁজ হয়েছে সে। 'খোঁজ' উপন্যাসের শ্যামাকান্ত গোটা উপন্যাস জুড়ে চালিয়েছে জীবনের খোঁজ। জীবনের মাঝে এক উজ্জীবনকে ধরতে অবশেষে সেও নিখোঁজ হয়েছে তার বারশো স্কোয়ার ফুটের বাড়ি থেকে। 'বাঁচার খোঁজে' উপন্যাসের বিনায়ক নবীন সহ উড়ালপুলের নীচে চাপা পড়া আপামর মানুষ চালিয়েছে বাঁচার খোঁজ। আর এই খোঁজেই বিনায়ক নবীনরা পাড়ি দিয়েছে বাস্তব থেকে বহুদূরে পরাবাস্তবতার জগতে। নিখোঁজ মানুষের মতো জীবন কাটানো আফসার এই নিখোঁজ নায়কদের আখ্যানকে উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন অনবদ্যভাবে। তার খোঁজ সিরিজ সার্থকভাবে হয়ে উঠেছে নিখোঁজ মানুষের আখ্যান।
সূচক শব্দ : খোঁজ, নিখোঁজ, উপন্যাস, জীবন, মুক্তি, বাঁচা, আফসার, আবিদ, শ্যামাকান্ত।

মূল প্রবন্ধ :

'ঘরগেরস্থি' লিখে বাংলা উপন্যাসের ঘরগেরস্থিতে পা রাখা আফসার মুসলমান বাঙালি জীবনের রূপকথা, কিস্‌সা, গুজব কাহিনিকে কুড়িয়ে এনে বাংলা উপন্যাসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন, শুরু হল কিস্‌সা সিরিজের পথচলা। এই রকম সিরিজ উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের পূর্ব পরিচয় থাকলেও, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ সিরিজ, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলেও; বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সিরিজ উপন্যাস নিয়ে আসেন আফসার – কিস্‌সা সিরিজ। মুসলমান সমাজজীবন ও মুসলিম অন্দরমহলের নানান গলিঘুঁজি, আলো-অন্ধকার নিয়ে রচিত হয় আফসারের কিস্‌সা সিরিজের ছটি কিস্‌সা। জনপ্রিয় এই কিস্‌সা সিরিজের পাশাপাশি আরও একধরনের

সিরিজ উপন্যাস আমাদের চোখে পড়ে – তা হল খোঁজ সিরিজ। যেখানে আমরা দেখতে পাই মানুষ নিরন্তর জীবনের খোঁজ চালিয়েছে। আর এই জীবনের খোঁজ, মুক্তির খোঁজ, বাঁচার খোঁজ বার বার তাকে জ্যা-মুক্ত করেছে, বারবার নিখোঁজ হয়েছে সে। এই তালিকায় যে উপন্যাসগুলি রয়েছে সেগুলি হল – 'সেই নিখোঁজ মানুষটা', 'খোঁজ', ও 'বাঁচার খোঁজে'। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব প্রত্যেকটি উপন্যাসের নামের মধ্যেও এই 'খোঁজ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। লেখক এই উপন্যাসগুলিকে কিস্‌সা সিরিজের মতো পৃথক করে সিরিজবদ্ধ না করলেও, উপন্যাসগুলির নাম ও কাহিনি বিশ্লেষণ করে আমি এগুলোকে এক সারিতে রাখার প্রয়াস করেছি। মুক্তির খোঁজ, জীবনের খোঁজ, বাঁচার খোঁজ কীভাবে মানুষকে নিখোঁজ করেছে, বাস্তবকে ভুলে মানুষ পারি দিয়েছে পরাবাস্তবতার জগতে – তাইই উপন্যাসগুলির আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হল এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে।

প্রথমেই আসা যাক আফসারের 'সেই নিখোঁজ মানুষটা'র প্রসঙ্গে, যে উপন্যাস আফসারকে পৌঁছে দিয়েছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে, এনে দিয়েছে সাহিত্য অকাদেমি পুরষ্কারের সম্মাননা। এই উপন্যাসে লেখক এমন একজন নায়কের কথা বলেছেন যে নিখোঁজ মানুষ, যার গোটা জীবনের ধারাবিবরণীর মধ্যে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে নিখোঁজ হওয়ার প্রসঙ্গ। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই লেখক বলেছেন – "বাগনানের মালিয়া গ্রামে দ্রুত পৌঁছনোর তাড়না ছিল আবিদের। কেননা সে নিখোঁজ মানুষ, চার বছর পর ফিরে আসছে নিজের গ্রামে। গ্রামের মানুষদের না বলেই চলে গিয়েছিল।"[১] যে আবিদ চারবছর আগে কাউকে কিছু না বলে মালিয়া গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, নিখোঁজ হওয়ার পর যার আশ্রয়স্থল হয়েছিল বিলাসপুর, সেখান থেকে আবারও নিখোঁজ হয়েছে সে। স্ত্রী নাজিমা ও পাঁচ মাসের খোকা কে রেখে, কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয় – "বিলাসপুরে নিজে দুবছর আগে বিয়ে করেছে নাজিমাকে। একটা পাঁচমাসের খোকা নিয়ে তাদের সংসার। সেখান থেকে গতকাল নিখোঁজ হয়েছে সে।"[২] এমনকি খোঁজ নেওয়ার মাধ্যম মোবাইল ফোনটাকেও বন্ধ রেখেছে, কারণ সে নিখোঁজ মানুষ, নিখোঁজ হয়ে থাকতেই ভালোবাসে। বিলাসপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে আবিদ ফিরে আসে তার নিজগ্রাম মালিয়ায় – "ফসলের খেত রূপনারায়ণ নদ, গাছগাছালি, জ্যোৎস্না সমস্ত নিসর্গ তাকে দাওয়াত দিয়ে বসেছিল। চুপি চুপি তাই বেড়িয়ে এসেছে। নিখোঁজ লোক হয়ে উঠতে চেয়েছে। আগেও তো ছিল নিখোঁজ লোক।... নিখোঁজ হওয়ার জন্য বার বার নিখোঁজ হওয়া তার।"[৩]

এই নিখোঁজ নায়কের নিখোঁজ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছেন লেখক তার অতীত জীবনের মধ্যে। পাঁচ বছর বয়সে বাবা-মা মারা গেলে, বাবা-মাকে হারানো আবিদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই নিজেকে হারানোর এক মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে – "চাচার সংসারে চাচাতো ভাই বোনদের সঙ্গে বড়ো হয়েছে। নিজেকে সরিয়ে রাখার মতো অবহেলাও ছিল। মায়ের মতো ডেকে খাওয়াতো না কেউ। কোথাও গেলে খোঁজ

করত না। তাই নিখোঁজ হওয়ার সম্ভবনা ছিল প্রবল। কৈশোরে রূপনারায়ণ নদে নৌকার মাঝির সঙ্গে থেকেছে। কখনো কখনো নিখোঁজ হয়েই থাকত।"[৪] যার খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই তার নিখোঁজ হওয়ার সম্ভবনা তো প্রবল হবেই। এই নিখোঁজ হয়েই আবিদ পালিয়ে যায় মুম্বাই, শিখে আসে চশমায় কাচ লাগানোর কাজ। তারপর গ্রামে ফিরে ঘর বানিয়ে জুলেখাকে বিয়ে করে থিতু হবার কথা ভাবলেও নিখোঁজের নেশা তাকে পেয়ে বসে, তাইতো বিয়ের মাত্র চারদিন আগে ভাবী বধূ জুলেখা ফেলে আবারও নিখোঁজ হয় – "জুলেখার সঙ্গে প্রাক্‌বিবাহ অনুষ্ঠান পানচিনিও হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কদিন আগে নিখোঁজ হয় সে। কেন? সে জানে না। মনে করতে পারে, সে ভয় পেয়েছিল।"[৫] ভয় পেয়েছিল এই বন্ধনকে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় রবি ঠাকুরের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর কথা। তারাপদকে যেমন স্নেহ-প্রেমের বন্ধনে বাঁধা যায় নি তেমনই বাঁধা পরেনি আবিদও। নিঃসন্তান বিধবা রমণী সবুরনের মাতৃস্নেহ, প্রেমিকা জুলেখার প্রণয় কোন কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। এক অজানা জীবনের টান বারবার জ্যা-মুক্ত করেছে তাকে, ঘর সংসার পেতে থিতু হওয়ার কথা ভাবলেও আবারও নিখোঁজ হয়েছে সে।

চারবছর ধরে মালিয়া গ্রামে নিখোঁজ আবিদ বিলাসপুরে তার নিজের ব্যবসা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিজের সংসার পাতলেও, অবশেষে সেখান থেকেও নিখোঁজ হয়েছে সে – "নতুন করে সে আবার নিখোঁজ হয়। এবার বিলাসপুর থেকে। নিজের ব্যবসা থেকে। সংসার থেকে।"[৬] চারবছর পর ফিরে আসে নিজগ্রাম মালিয়ায়। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে প্রস্থান। গ্রামে ফিরে এসে গ্রামের সকলের সঙ্গে দেখা করলেও, একদিন যে ভালোবাসাকে ফেলে রেখে নিখোঁজ হয়েছিল সে, সেই ভালোবাসার মুখোমুখি হওয়া তার আর হয় না। সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার পাওয়া আবিদের সাহস হয় না জুলেখার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর, তাইতো জুলেখার বাড়ি যাওয়ার আগের দিন রাতে কাউকে কিছু না জানিয়ে আবারও নিখোঁজ হয় সে। তবে নিজে নিখোঁজ হলেও গ্রামের সবাইকে দিয়ে যায় সুস্থ জীবনের খোঁজ, আর নিজেও নিয়ে যায় ভালোবাসা নিয়ে সুখে থাকার খোঁজ, যে খোঁজ তাকে এনে দেয় মুকুন্দ-মালতীর সংসার। সমাজ-সংস্কার ত্যাগ করে ভালোবাসাময় এক জীবনের খোঁজ পায় সেখানে, যে জীবন হয়তো সেও পেতে পারত জুলেখাকে বিয়ে করে। এইভাবেই 'খোঁজ' কথাটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায় নিখোঁজ মানুষের কিস্‌সায়, কথাটি বারে বারে ফিরে ফিরে আসে উপন্যাসে, উপন্যাসের নামের মধ্যেও থাকে এর উল্লেখ।

এই সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'খোঁজ' এ আমরা দেখতে পাই তেষট্টি বছরের শ্যামাকান্ত তিন বছরের একঘেয়ে ক্লান্তিকর অবসরপ্রাপ্ত জীবনে নতুনভাবে বাঁচার খোঁজ চালিয়েছে, খোঁজ চালিয়েছে নতুন এক জীবনের – "শ্যামাকান্ত তার তেষট্টি বছর বয়সে এসে জীবন আর একভাবে শুরু করবার স্বপ্নে, ইচ্ছায় জেগে উঠতে চায়। অবসর পাওয়ার পর খুঁজছে সেই পথ। যে পথ আর পাঁচজনের মতো নয়। ত্রিদিববাবু,

শুভঙ্করবাবু আর অনাদিবাবুর মতো একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে যাওয়া নয়। অবসর পাওয়ার পর আরও অনেকটা মানুষকে বাঁচতে হয়।”[৭] আর এই বাঁচাটা সে আর পাঁচজনের মতো নির্জীব স্থবির হয়ে বাঁচতে চায়নি, এই বাঁচার মধ্যে আনতে চেয়েছে নতুন জীবনের সুর। তাইতো নানান অভিনব কর্মসূচির মধ্যে জীবনকে খুঁজেছে, জীবনের খোঁজে কখনো ভর দুপুরে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, আবার কখনো বা বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে ছাদে উঠে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে খুঁজতে চেয়েছে জীবনকে।

সে এমন এক জীবনের অনুসন্ধান করেছে যেখানে ভান থাকবে না, থাকবে স্বতঃস্ফূর্ততা, জীবনের প্রতি সত্যিকারের আবেগ, ভালোলাগা, ভালোবাসা, মুক্তি, আনন্দ, তৃপ্তি। যে তৃপ্তি সে দেখেছে তালাচাবির মিস্ত্রি আসলামের চোখে, যে ভালোলাগার কারণে আসলাম অন্য অনেক বেশি মজুরির রোজগারের পথ ছেড়ে বেছে নিয়েছে এই কম মজুরির তালাচাবির কাজ। এই জীবনকে সে খানিকটা খুঁজে পেয়েছেন অনুপমা দেবীর সখ্যতার মধ্যে– “অবসর নেওয়ার পর, চার দেওয়ালের এই নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে বন্ধু পেয়ে সে বড় সুখী হয়েছে। বোধহয় আরও বন্ধু তার চাই। বাঁচতে হবে যখন, অবসর নেওয়ার পর জীবন যখন শেষ হয়ে যায় না তাই তাকে সম্পর্ক দিয়ে গড়ে তুলতে হবে, সুস্থ সুন্দর করতে হবে। জীবনকে ক্লান্ত খিন্ন দেখার পক্ষপাতী সে নয়। আত্মিক উদ্ধারের আয়োজন সে সাজাতে চায়। হয়ত একে ওপরের খোঁজ-খবর নেওয়ার ভেতর আছে মুক্তি।”[৮] আর এই মুক্তির মাঝেই সে খুঁজে পেয়েছে নতুন জীবনের সুর। তাইতো স্ত্রী যামিনীকে বলতে শুনি – “প্রতিদিন নতুনভাবে বাঁচা খুঁজতে হয় যামিনী। প্রতিদিন নতুনভাবে বেঁচে উঠতে হয়। রির্টায়ার করেছি বলে মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাব এমন ধারণা আমার নেই। ... অন্য বাঁচা খুঁজতে হয়। সম্পর্ক খুঁজতে হয়”[৯] এমনই এক সম্পর্ক তার গড়ে ওঠে তালাচাবির মিস্ত্রি আসলামের সঙ্গে।

আসলামের জীবনরহস্যের অনুসন্ধান তথা নতুন জীবনের খোঁজ তাকে জ্যা-মুক্ত করেছে। বারশো স্কোয়ার ফুটের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে সে পৌঁছে গেছে আসলামদের গ্রাম নৈটিতে। কলকাতা থেকে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রামে এসে সে দেখেছে যে কীভাবে তারা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে জানে, মানুষকে বাঁচানোর জন্য এরা কেবল রক্ত নয় জীবনও দিতে পারে। এখানে এসে সে শুধু আসলামের খোঁজই পায়নি, পেয়েছে রূপকথার নায়ক মুজিবরের খোঁজ, যে তাকে এনে দিয়েছে জীবনের অন্য মানের খোঁজ। গ্রামের দুঃস্থ, দরিদ্র্য মানুষগুলোর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে নতুন জীবনের খোঁজ দেওয়া, তাদের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো মুজিবরের এই জীবনদর্শন আপ্লুত করেছে শ্যামাকান্তকে। বাড়ির চার দেওয়াল থেকে বেড়িয়ে গিয়ে যে মুক্তি, যে জীবন সে চেয়েছিল; সেই জীবনকে সে খুঁজে পেয়েছে এই নৈটিতে এসে। মুজিবর আসলাম তাকে এনে দিয়েছে সেই প্রাণময় নতুন জীবনের

খোঁজ –"এক নতুন সম্পর্কে চলে গিয়েছিল সে। যে বৃত্তে সে বাঁচে, তার বাইরে। এই বৃত্ত ভাঙার খেলায় সে বড় আনন্দ পেল। বোধহয় তাকেই বলে আর-এক উজ্জীবন।"[১০]

এর পাশাপাশি উপন্যাসে একাধিক বার ফিরে ফিরে এসেছে 'খোঁজ' এর প্রসঙ্গ। অনুপমা দেবী তার নিজের দেশের খোঁজ পেয়েছে শ্যামাকান্তের কাছে, শ্যামাকান্ত গোটা উপন্যাসজুড়ে খোঁজ চালিয়েছে জীবনের, নতুন ভাবে বাঁচার; আর এই জীবনের খোঁজেই নিখোঁজ হয়েছে সে, বেড়িয়েছে আসলামের খোঁজে, সেখানে গিয়ে খোঁজ পেয়েছেন মুজিবরের, মুজিবর গ্রামের সবাইকে এনে দিয়েছে ভালো থাকার খোঁজ, অবশেষে এই মুজিবর আসলামদের কাছে শ্যামাকান্তও পেয়েছে অন্য ভাবে বাঁচার খোঁজ – গোটা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে খোঁজ কথাটি, এমনকি নামকরণও করা হয়েছে এই শব্দটি দিয়েই – তাই এটিকে খুব সহজেই এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এরপর আসা যাক আফসারের শেষ উপন্যাস 'বাঁচার খোঁজে' উপন্যাসটির প্রসঙ্গে। সেখানেও আমরা দেখতে পাই – উপন্যাসের নায়ক বিনায়ক দীর্ঘ অসুস্থতার মাঝখানে, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্লিন্নতার মাঝখানে জীবন অনুসন্ধান করে চলেছে, খোঁজ চালিয়েছে বাঁচার। দুঁদে রাজনীতিবিদ বিনায়ক যে একটা সময়ে পরিবার পরিজনদের কথা ভেবে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে সুস্থির হয়েছিল নিজের সাংসারিক জীবনে, ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি আত্মজনদের নিয়ে আত্মপরতার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল জীবনের অনেকটা সময়, সে দীর্ঘ সাতাশ বছর পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তীব্র মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে। যে ছোটভাই তাদের কাছে পরম আদরের ছিল, সেই ছোটভাই অতীনের মদ খেয়ে নিজেকে নষ্ট করার খবর তাকে আহত করে। সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে স্ত্রী সাহানার প্রবল আপত্তির কারণেই বিয়ের পর বাড়ি ছেড়ে বাগনানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল অতীন। বেকারত্বের জ্বালা, সাংসারিক চাপ, অভাব-অনটনই হয়তো তাকে এই আত্মধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে। বাস্তব জীবনের এই হীনতা, ক্লিন্নতা বিনায়ককে অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিলে অসুস্থ বিনায়ক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বাঁচার খোঁজ করেছে। আর এই বাঁচার খোঁজেই সে পাড়ি দিয়েছে বাস্তব থেকে বহুদূরে পরাবাস্তবতার জগতে, স্বপ্নকল্পনাময় অতীত শৈশবের দিনগুলিতে – "সে দেখতে পাচ্ছে শৈশব-বাল্যের গ্রামটাকে। তার প্রকৃতিকে। মাথার ভিতর অন্য কিছু নিতে পারছে না। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা ভাবনা পরিত্যাগ করেছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নানা ঘটনার অভিঘাতের কথা নিয়েও তার কোনো ভাবনা নেই। সে আত্মস্নিগ্ধ শৈশবে চলে যাচ্ছে, চলে যেতে ভালোবাসছে।"[১১] স্মৃতিমন্থন করে উঠে আসা এই গ্রাম ও গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে বাঁচার খোঁজ করেছে বিনায়ক। এই দক্ষিণ খালনার স্মৃতি হয়ে উঠেছে তার কাছে বাঁচার অক্সিজেন।

শুধু বিনায়ক নয় নগর সভ্যতার নাগরিকতায় ক্লান্ত, সামাজিক নানা বিপর্যয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বিপন্ন নবীনও নিরন্তর এই বাঁচার খোঁজ চালিয়েছে। রনিতার শ্লীলতাহানির ঘটনায় মুষড়ে পড়া নবীন, বিনায়ককে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে বাগনান থেকে বহুদূরের এক গ্রামে, গ্রামের মুক্ত পরিবেশে মুছতে চেয়েছে বাস্তবের সমস্ত ক্লেদ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় সমর সেনের ‘মহুয়ার দেশ’ কবিতার কথা। সেখানে লেখক নগরসভ্যতার ক্লান্তি মুছতে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন বহুদূরের মহুয়ার দেশে, আর এখানে বিনায়করা পাড়ি দিয়েছে ছোটবেলার ছেড়ে আসা গ্রাম দক্ষিণ খালনায়। ছোটবেলার বহুস্মৃতিবিজড়িত বুনিয়াদি বিদ্যালয় ‘আনন্দ আশ্রম’ কে পুনর্জীবিত করার মধ্যে দিয়ে অবশেষে তারা খুঁজে পেয়েছে নতুন জীবনের উন্মাদনা তথা বাঁচার খোঁজ – “দাদা তো ভালো আছে নবীন দেখতে পাচ্ছে। আরও ভালো থাকবে, যখন আনন্দ আশ্রম বেঁচে উঠবে। কিছু করার আশ্রয় সে পাবে, দাদাও পাবে। ... কোনো কিছুর অবলম্বন দাদাও চাইছে। বাস্তবতার জীবন খুবই নিষ্ঠুরতা দিয়ে ঘেরা। অলৌকিকতার ছোঁয়ায় রূপকথার জীবন সে চায়। তাতে থাকবে স্বপ্নপূরণের আভা। তারা হবে রূপকথার মানব-মানবী। সেই কল্পনা আমাদের কাজে লাগে আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে লাগে।”[১২]

উপন্যাসের উপসংহার অংশটিও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া উড়ালপুলের ভেঙে পড়ার বিষয়টিকে আসাধারনভাবে এর সঙ্গে যুক্ত করে হাজার হাজার মানুষের বেঁচে থাকার আকুল আর্তিকে আফসার জুড়ে দিয়েছেন এর সঙ্গে – “এই দৃশ্যের মধ্যে বিনায়ক থাকছে। কীভাবে যেন টিভি ফুঁড়ে পৌঁছে গেছে সেই অকুস্থলে। যে মানুষটার শুধু পায়ের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে, তার ধর মুণ্ডু ভেতরে চাপা পড়ে আছে। পা দুটো সাহায্য চাইছে ... কেউ কেউ বাঁচার চেষ্টা করছে, আর একটু পরেই তার মৃত্যু হবে। মৃত্যুর মিছিল যেন। হাহাকার শুধু মানুষের।”[১৩] আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তারা বাঁচার খোঁজ চালিয়েছে। কোথাও না কোথাও যেন এদের বেঁচে থাকার আকুল আর্তির সঙ্গে এসে মিশে যায় বিনায়ক নবীনের বাঁচার খোঁজ। যে খোঁজ অবিরত চালিয়েছেন আফসার তাঁর ব্যক্তিজীবনে। মৃত্যু পূর্ববর্তীকালীন দীর্ঘঅসুস্থতার ছাপ এসে পড়েছে তাঁর এই উপন্যাসে। তিনিও বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাননি বাঁচার খোঁজ, মাত্র ঊনষাট বছরে বয়সে বাংলা সাহিত্যের আকাশ থেকে নিখোঁজ হয়ে চলে যান না ফেরার দেশে।

দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক এই আলোচনার শেষে এসে একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই তিনটি উপন্যাসেরই মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই খোঁজ প্রসঙ্গটি। আর এই জীবনের খোঁজেই বারবার নিখোঁজ হয়েছে উপন্যাসের নায়করা। ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের নায়ক আবিদ ছোট থেকেই এক নিখোঁজ মানুষ, কোনো বন্ধনই কখনো তাকে আটকে রাখতে পারে নি, তার এই স্বভাববৈশিষ্ঠ্যই তাকে আপামোর পাঠকের কাছে নিখোঁজ নায়ক হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। ‘খোঁজ’ উপন্যাসের

শ্যামাকান্ত গোটা উপন্যাস জুড়ে নতুন জীবনের খোঁজ চালিয়েছে, জীবনের মাঝে নতুন এক উজ্জীবনকে ধরতে সে তার বারশো স্কোয়ার ফুটের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে পাড়ি দিয়েছে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার দূরের গ্রাম নৈটিতে। আর 'বাঁচার খোঁজে' উপন্যাসে এসে আমরা দেখতে পাই বিনায়ক নবীন সহ আপামর মানুষ বাঁচার খোঁজ চালিয়েছে। এই বাঁচার খোঁজেই নিখোঁজ হয়েছে বিনায়ক বাস্তব জগত থেকে বহুদূরে পরাবাস্তবতার জগতে। মুক্তির খোঁজে, জীবনের খোঁজে, বাঁচার খোঁজে বারবার নিখোঁজ হয়েছে তারা, কেউ শারীরিক ভাবে, কেউ বা মানসিকভাবে। সারাজীবন এক নিখোঁজ মানুষের মতো, এক আউটসাইডারের মতো কাটানো আফসার এই নিখোঁজ নায়কদের কথাকে অনবদ্যভাবে নিয়ে এসেছেন তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে। আর তাঁর খোঁজ সিরিজ সার্থক ভাবেই হয়ে উঠেছে নিখোঁজ মানুষের আখ্যান।

তথ্যসূত্র :

১. আমেদ, আফসার, 'সেই নিখোঁজ মানুষটা', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ-৯

২. প্রাগুক্ত

৩. তদেব, পৃ-১০

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. বসু, নবনীতা, ও আহমেদ, তৌসিফ (সম্পাদিত) 'আফসার আমেদ জীবন ও সাহিত্য', কলকাতা : সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ-৪৩

৭. আমেদ, আফসার, 'খোঁজ', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৭, পৃ-১০

৮. তদেব, পৃ-৬৪

৯. তদেব, পৃ-৭০

১০. তদেব, পৃ-৮৭

১১. আমেদ, আফসার, 'বাঁচার খোঁজে', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ-১৭

১২. তদেব, পৃ-১০৩

১৩. তদেব, পৃ-১১১

মেদিনীপুরে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ : একটি অধ্যয়ন

পুষ্পেন্দু রাউৎ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)

সারাংশ: মেদিনীপুর বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বিদেশী শক্তি যেমন - ইংরেজ, পর্তুগিজ, ফরাসি, ডাচ, দিনেমার, ভারতের বিভিন্ন স্থানের ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব বিদেশী শক্তি বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে মেদিনীপুরেও তাদের আস্তানা গড়ে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবে এসব শক্তি মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসের সূত্রে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কুঠি, তৈরি করেছে বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ, গড়ে তুলেছিল কিছু বন্দর। খেজুরির সমাধি সৌধ আজও ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অবস্থানের সাক্ষ্য প্রমাণ করে। এইসব শক্তির সান্নিধ্যে মেদিনীপুর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কোথাও রয়েছে ওদের তৈরি বিভিন্ন সৌধ, পোস্টঅফিস, টেলিগ্রাফ কেন্দ্র ,স্বাস্থ্য কেন্দ্র ,সমাধিক্ষেত্র। আবার কোথাও এইসব ইউরোপের শক্তির অবস্থানের কিছু ছাপ ও পাওয়া যায়। ভাষাগত দিক দিয়েও বিভিন্ন বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু, পোশাক পরিচ্ছদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ফলমূল,গাছপালা প্রভৃতিতে ইউরোপের সংস্কৃতি মিলেমিশে একান্ত হয়ে গেছে।
সূচক শব্দ: পর্তুগিজ, ইংরেজ, মেদিনীপুর, ইওরোপীয় সমাধিক্ষেত্র,টেলিগ্রাফ, ডাকঘর।

উপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। সময়ের সাথে সাথে তারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি মেদিনীপুরেও বসবাস করেছিল। সেই সুবাদে মেদিনীপুরের যত্রতত্র গড়ে তুলেছিল তাদের বসতি। অনেক বৈদেশিক শক্তির মধ্যে পর্তুগিজরা ছিল অন্যতম। ৩০০ বছর ধরে পর্তুগিজরা ভারতবর্ষে ছিল বাংলাও সেই পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য ভূখন্ড। পর্তুগিজরা অনেক বছর চলে গেছে। তবুও পর্তুগিজদের কথা, শক্তির সাফল্যের কথা, জয় পরাজয়ের কথা,অবদানের কথা, ভালোবাসার কথা, আজও আলোচিত হচ্ছে ।আজও তাদের অবদানের কথা ভোলার নয়। পর্তুগিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব আজও থেকে গেছে বাংলার মাটিতে, স্মৃতি চিহ্নে; স্মারক হয়ে ,ভাষা হয়ে সংস্কৃতির উপকরণ হয়ে - যা আজও আমাদের বিস্মিত করে, ভাবায়ও।[১]

পর্তুগিজরা এদেশ থেকে লুপ্ত হলেও এদেশীয় আচার - ব্যবহার ভাষা ও সভ্যতার মধ্যে তাদের এক কালে এদেশে আধিপত্য বিস্তারের প্রচুর স্মৃতি রয়েছে। হিজলি রাজ্যে পর্তুগিজরা যে বিভিন্ন গির্জা নির্মাণ করেছিল তার উল্লেখ সেবাস্তিয়ান ম্যারিকের বিবরণে পাওয়া যায়। আর বর্তমানে খেজুরির ধ্বজীভাঙা গ্রামে একটি প্রাচীন গির্জার ধ্বংসাবশেষ এখনো লক্ষ্য করা যায়।[২] আমাদের দেশের বাগান বাগিচা পর্তুগিজদের আনা নানা প্রকার ফল, ফুল, সবজি ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রবর্তনের সম্পদশালী হয়েছে। আতা, নোনা, সপেতা, কামরাঙ্গা প্রভৃতি উপাদেয় ফল; রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী, গাঁদা প্রভৃতি ফুল; কপি, ওলন্দা, কড়াইশুঁটি প্রকৃতি মুখরোচক তরি-তরকারি; সালসা, আয়াপান , জোলাপ, গাছগাছড়া পর্তুগিজদের প্রদত্ত। পর্তুগিজেরাই হিজলিতে বিখ্যাত 'হিজলী বাদাম' নামক সুখাদ্য ফলের চাষ প্রবর্তিত করেছিল।। এদেশের ফলের মোরব্বা আচার প্রভৃতি তৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী পর্তুগিজদের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সাগু, পাউরুটি, বিস্কুট, তামাক প্রভৃতি পর্তুগিজদের প্রথম আমদানি। আলমারি,কেদারা, জানালা প্রভৃতি গৃহসজ্জা; বিন্তি, কুপন প্রভৃতি খেলা; মুর্তি, নিলাম প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা; ক্যানেস্তারা, গামলা,বালতি, তিজেল প্রভৃতি গৃহস্থলের জিনিস; সাবান ,তোয়ালিয়া, বোতল প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্য; গরাতে বর্গা প্রভৃতি বাড়ি তৈরির উপকরণ; সংগীত যন্ত্র বেহালা পর্তুগিজদের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল। 'ফিরঙ্গ' নামক এক প্রকার দূষিত উপাংশ রোগ এদেশে চরিত্রদুষ্ট পর্তুগিজ সংসর্গেই আবির্ভাব হয়েছিল। এমনকি বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতা পর্তুগিজদের অনুকরণে যীশু মাতা মেরির নাম উচ্চারণে মাইরি বলে শপথ গ্রহণ করে থাকে, পর্তুগিজেরা এই রোগ আমাদের ভাষা ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে তাদের জাতীয় চিহ্ন রেখে গেছে। [৩]

মহিষাদল রাজপরিবারের রানী জানকী বর্গী আক্রমণ ঠেকাতে গোয়া থেকে কিছু পর্তুগিজদের এইখানে নিয়ে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন - " বর্গির হাঙ্গামার সময় আনন্দ লাল উপাধ্যায় একদল পর্তুগিজ গোলন্দাজ সৈনিক নিযুক্ত করেন তাদের নিষ্কর জমিও গ্রাম দান করেন। এখনো সেই গ্রামে পর্তুগিজদের বংশধররা বাস করছেন। তিনি যে গ্রামটির কথা বলেছেন সেটি মহিষাদলের কাছে গেঁওখালিতে আছে। এই গ্রামটিকে পর্তুগিজ গ্রাম বলা হয়। সেখানেই গির্জা এবং খ্রিস্টানদের কবর খানা আছে।"[৪] মিরপুরে এলেই চোখে পড়বে গির্জা। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই রোমান চার্চটির ফাদার হলেন মাইকেল অ্যাড্রেসার। এখানে দুই ধরনের খ্রিস্টান পর্তুগিজ বসবাস করেন - রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট। [৫]

মেদিনীপুরে কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের সমাধি ক্ষেত্র আজও ঐতিহাসিক স্মৃতিগুলোকে উসকে দেয়। সেরকম একজন হলেন মেদিনীপুরের প্রথম কালেক্টর জন পিয়ার্সের সমাধি। এই জন পিয়ার্সের সমাধি রয়েছে আমাদের মেদিনীপুর শহরে এই সমাধিকে স্থানীয় মানুষজন বলেন 'মুটুক'। পাশেই বড়াম থান। জর্জকোট এলাকায়

আজ প্রচুর ঘরবাড়ি হয়েছে। অথচ তিরিশ বছর আগে এখানে অনেকটাই ফাঁকা ছিল। তখন এই সমাধিটাই ছিল অন্যতম স্থান। যাই হোক আজ ঘরবাড়ির জঙ্গলে একে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এখানে একটা বোর্ড লাগিয়েছে।[৬] তমলুকের বর্তমান সাবডিভিশনাল অফিসের একটু দূরে খাটপুকুরের পূর্ব দিকে বাংলার ভলেন্টিয়ার সৈন্যদলের লেফটেন্যান্ট ও'হারার সাহেবের একটি সমাধি স্তম্ভ আছে।[৭] ক্ষীরপাই শহরের নিকটবর্তী কাশিগঞ্জ নামক গ্রামেও কোম্পানির একটি সুগৃহৎ কুঠি ছিল। তারই অনতিদূরে বেড়াবেড়া নামক পল্লীতে সাহেবদের ছয়টি সমাধিস্তম্ভ আছে। সমাধিগুলির এখন ধ্বংসাবশেষ গুলি আছে এবং এর গায়ে খোধিত লিপিগুলো প্রায় সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। সেজন্য এগুলি কতদিনের সমাধি বা কাদের সমাধি তা জানার কোন উপায় নেই। [৮]

অষ্টাদশ শতকের মধ্যে খেজুরি বন্দর পূর্ব ভারতে একটি অন্যতম বন্দরের মর্যাদা পায়। ভাগীরথী দিয়ে বড় বড় জাহাজ কলকাতা যেতে পারত না। তাদেরকে যদি বন্দরে নোঙর করতে হতো। এছাড়া ডাক নৌকার বিদেশি কর্মচারী সব মিলিয়ে একাধিক ইংরেজ কর্মচারীদের বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সাহেবনগর সাতখন্ড, সাহেবনগর ডাকবাংলো প্রভৃতি। ইংরেজরা ছিল সুসভ্য জাতি তাই তাদের মৃতদেহ গুলি কবর দেওয়ার জন্য ঠিক করা হয় একটি নির্দিষ্ট জায়গা। জায়গাটি সাহেবদের গোরস্থান নামে পরিচিত। সমাধিস্থ ব্যক্তিরা অধিকাংশই ছিল জাহাজের ইংরেজ নাবিক বা কর্মচারী বা এদের আত্মীয়। মহেন্দ্রনাথ করুন ১৯২৭ সালে তাঁর খেজুরী বন্দর' গ্রন্থে লিখেছেন, সমাধিক্ষেত্রে মোট তেত্রিশটি সমাধি আছে। তার মধ্যে একুশটিতে লিপি ফলক খোদিত আছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লিপিটির বয়স ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। এই সমাধিটি সম্ভবত এক নাবিকের। একটি অস্পষ্ট ও ভগ্ন লিপিফলক পড়ে আছে সমধিটির কাছে।[৯] মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে A few years ago, the earliest inscription which could be found, was on a detached and broken slab, dated 1800 and to the memory of the boats man of a ship, but some of the graves without inscriptions were probably of an earlier date.[১০] মেদিনীপুরের ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র বসু এই ইউরোপীয় সমাধি ক্ষেত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - " প্রকৃতি দেবীর স্নেহময় কোলে খেজুরির নীরব সমাধি ক্ষেত্রটি হৃদয়ে শান্তির ভাবা আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। জন্য কোলাহল এখানে নীরব। আছে মৃত ব্যক্তি দিকের শান্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেজন্য জড় প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত।[১১]

লিপিযুক্ত সমাধিগুলির বিবরণ[১২]

১. নীল ম্যাকইনেস ডুনিয়া জাহাজের মিডশিপম্যান মৃত্যু: ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮। -

২. কুমারী সারল্টী অ্যানিমিডলসেক্সবাসী রেভারেও টমাস ব্র্যাকেনের কন্যা, মৃত্যু: ১২ নভেম্বর ১৮২০।

৩. হোরাশিও নেলসন ড্যালাস লেডি মেলভিল জাহাদের পঞ্চম অফিসার, মৃত্যু ২৮ জুলাই, ১৮২০ ।

৪. এমোলিয়া - দিনাজপুরের তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এওয়ার্ড ম্যাকওয়েলের পত্নী, মৃত্যু: ২৬ জুলাই, ১৮২২ বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ আছে। এমোলিয়া অসুস্থ হয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য খেজুরী বন্দরে আসে কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি মাত্র ২৮ বছর ২ মাস বয়সে তিনি মারা যায়। বেদনাহত চিত্তে তার স্বামী স্মৃতিস্তম্ভের গাত্রে লিখেছেন -[১৩]

"The sarguine hope of a husband who adored her that the dred calamity.

Would be averted by the effect of the sea air,

Proved vain immediatly on the return of the ship owing to the loss of her rudder after an escape from danger.

When sorrow weeps over Virtune's Sacred bust our tears become us and our giret is just he shed who grateful Pays this last sad tribute of his love and Praise."

৫. চার্লস রাসেল ক্রোম্লীন- ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী। মৃত: ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২২।

৬. রবার্ট আলেকজান্ডার বেন্টলী (কলিকাতাবাসী) - মৃত্যু: ২২ নভেম্বর, ১৮২৫।

৭. সারা হেনরি অস্বর্নের পত্নী, মৃত্যু: ৩ জানুয়ারী, ১৮২৫।

৮. ডবলিউ এ চামার ভাগলপুরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট, মৃত্যু: ১৬ জানুযারী, ১৮২৬।

৯. ক্যাপ্টেন জেম্স রীড- বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ডী, ১ম রেজিমেন্ট, মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর, ১৮২৬।

১০. ডবলিউ এইচ ব্রেট-কোম্পানীর বঙ্গদেশীয় নৌবিভাগের মেট। মৃত্যু: ১৩ আগস্ট, ১৮২৬।

১১. জোস্ কাটিস্ স্টেপলইন —নৌবিভাগের ব্রাঞ্চ, পাইলট। মৃত্যু : ১৪ আগস্ট, ১৮২৬

১২. জজ, ফর্বস, এসডি-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। মৃত্যু: ২৩ অক্টোবর, ১৮৩৭।

১৩. ক্যাপ্টেন ইউলিয়াম পীট 'ফর্ব্বস' স্টীমারের অধ্যক্ষ। মৃত্যু ১৭ জুন,১৮৩৭।

১৪. রবার্ট পীচার-'ভ্যান্সিটার্ট' জাহাজের ১ম অফিসার। মৃত্যু : ১১ আগস্ট, ১৮৩৭।

১৫. জে. এইচ্ বার্লো - সিভিল সার্ভিস। মৃত্যু: ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪১।

১৬. ক্যাপ্টেন জেমস্ ম্যাসন - অ্যামেরিকান জাহাজ 'বেগরিঙ্গা। মৃত্যু : ১৯ মে, ১৮৫৩।

১৭. চার্লস উইলিয়ামসন ম্যাঞ্চেস্টারে জর্জ উইলিয়ামসনের পুত্র। মৃত্যু ১ ডিসেম্বর, ১৮৫৪।

১৮. মাইকেল হোগ্যান- এ. বি. টমসন' নামক আমেরিকান জাহাজের মাস্টার।মৃত্যু ৫ জুলাই, ১৮৫৫ ।

১৯. চার্লস লিটন 'ম্যালউইন' জাহাজের পাইলট। মৃত্যু : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮।

২০. জে. বোটেলহো পত্নী মেরী ও পুত্র ইউজীন। মৃত্যু: ৫ অক্টোবর, ১৮৬৪।

২১. এমোস ওয়েস্ট—সুপারভাইজার পূর্ববিভাগ। মৃত্যু ১০ অক্টোবর, ১৮৬৫।

খেজুরি বন্দরনগরী ছিল সমুদ্র সন্নিকটে। সুস্বাস্থ্যের মনোরম আবহাওয়া এখানে বিরাজমান ছিল। তাই এই বন্দরটিকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রিক বন্দর বলা হত। ১৯২০ সালের ২০ শে নভেম্বর তারিখে কাঁথির স্থানীয় সাপ্তাহিক নীহার পত্রিকায় খেজুরিতে স্বাস্থ্য নিবাস গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। লেফটন্যান্ট কর্নেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খেজুরিতে গ্রীষ্মযাপন করেছিলেন। এই স্থানের জলবায়ু তার কাছে এতই মনোরম লেগেছিল যে তিনি বলেছিলেন- 'ভারতবর্ষের যে কোন বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির মধ্যে খেজুরি অন্যতম। ফলে দেশী-বিদেশি সমস্ত জাহাজ এই বন্দর ছুঁয়ে যেতে চাইতো। নিরবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ সবাইকে আকর্ষণ করত। তাই অল্প সময়ের মধ্যে খেজুরি বন্দর হয়ে উঠলো একটি শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়ী বন্দর। [১৪]

ইতিমধ্যে খেজুরি বন্দরটি দিন দিন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। বড় বড় জাহাজগুলি যাতে ঠিকঠাক জলস্রোত ধরে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে তাই খেজুরি বন্দরের চার মাইল দক্ষিনে কাউখালী নামক স্থানে একটি আলোক স্তম্ভ নির্মাণ করার প্রয়োজন দেখা যায়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে এই আলোকস্তম্ভ তৈরি হয়। কাউখালীর লাইট হাউস ৮০ ফুট উচ্চতা এবং পঞ্চম তল বিশিষ্ট। এই আলোক স্তম্ভ রক্ষাণাবেক্ষণ প্রথমদিকে ইউরোপিয়ান কর্মচারীরা করত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের বোমারু বিমানের ভয়ে ব্রিটিশরা বোমা মেরে কাউখালী লাইট হাউসকে ধ্বংস করে দেয়।[১৫]

১৭৭২ এ খেজুরিতেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের স্বদেশীয় বন্দর কর্মী ও নাবিকদের খবরা খবর আদান- প্রদানের জন্য খেজুরিতে একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করে। বন্দর কর্মীদের থাকবার ব্যারাকেই এই ডাকঘরের কাজ চলতে থাকে। ইতিপূর্বে ভারতে কোন ডাক ব্যবস্থা চালু হয়েছে বলে জানা যায়নি। খেজুরিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ডাকঘরী ভারতের প্রথম পোস্ট অফিস। কলকাতা জেনারেল পোস্ট অফিস অনেক পরের স্থাপিত হয়েছিল। বিদেশ থেকে আসা চিঠিপত্র গুলি খেজুরের ডাকঘরে এনে বাছাই করে দ্রুতগামী ছিপ নৌকায় কলকাতা সহ অন্যান্য গন্তব্যে পাঠানো হতো।[১৬]

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডাক্তার ডব্লিউ.বি.ও সাগনেসি (Dr. W.B.OShawghunessey) সর্বপ্রথম ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্তন করেন। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন কলকাতা থেকে খেজুরি ভায়া ডায়মন্ড হারবার, ভায়া কুকড়াহাটি পর্যন্ত ৮২ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের অনুমতি

প্রাপ্ত হয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কুকড়াহাটি থেকে খেজুরি টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়। টেলিগ্রাফ কেন্দ্রটি খেজুরি পোস্ট অফিসে ছিল। পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধশালী বন্দর হিসেবে খেজুরির গুরুত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় তা প্রমাণ করে।[১৭]

তমলুকের স্টিমারঘাট উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক স্থাপত্য। ১৮৮৬ সালে ডায়মন্ড হারবারে রেলওয়ে লাইনে সঙ্গে তমলুকের স্টিমার সার্ভিস যোগ হয়ে রেলওয়ে স্টেশন হয়েছিল। কিন্তু সরকারের আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় ১৯০০ সালের ১ লা এপ্রিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়। হোরমিলার কোম্পানির ঘাটাল লাইনে যে স্টেশন ছিল সেই পথে মেদিনীপুর যাতায়াত কলকাতা থেকে করা যেত। হোরমিলার কোম্পানির স্টিমার থাকায় তমলুকে অপর পাড়ে হাওড়া জেলার নানা স্থান থেকে তমলুকের নদীপথে শাকসবজি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রিতে সুবিধা হয়েছিল। [১৮]

একইভাবে তমলুকে চার্লস হ্যামিলটন সাহেবের স্মৃতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্মৃতিকে উসকে দেয়। তমলুকে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন সময় রবার্ট চার্লস হ্যামিল্টন এসেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সল্ট এজেন্ট হিসাবে। রাইটার্স বিল্ডিং এর পুরাতন ফাইল থেকেও জানা যায় তমলুকে লবণ ব্যবসায়ের জন্য হ্যামিলটন নামে সাহেব এখানে সল্ট এজেন্ট হয়ে আসেন। তখন চার্লস হ্যামিলটন সাহেব একটি middle vernacular school স্থাপন করেন। হ্যামিলটন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত তমলুকের হেরিটেজ স্কুল হেমিল্টন স্থানীয় বাঙ্গালিদের কাছে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলার জনসাধারণের আগ্রহে এবং হিন্দু প্রধানদের উদ্দেশ্যেই ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয় এখানে। [১৯]

ভৌগলিকভাবে পলিমাটির ভূমিতে গড়ে ওঠা মানুষের মুখের ভাষায় নিজস্ব শিকড়ের গভীর প্রভাব ও বাইরের সবকিছুকে গ্রহণ করে তুর্কি আফগান মুঘল ভাষা রীতির সমন্বয়ে নিজেদের লোকভাষা গঠন করেছে। মেদিনীপুরের সমুদ্র তীরবর্তী কাঁথি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন ভাষাঞ্চল। যেখানে দ্রাবিড়, মারাঠা, উড্রপ্রভাব এবং বাইরের থেকে আসা সমুদ্রগামী ইউরোপীয় প্রভাব। স্থানীয় অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে মিশে এক মিশ্র লোক ভাষার ও লোকসংস্কৃতির প্রচলন ঘটিয়েছে। আজ হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত হিজলি জায়গাটি মসনদ ই আলার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়ের মিলন তীর্থ হিসেবে খ্যাত। কিন্তু একদিন এটি পর্তুগিজদের কাছে বিখ্যাত বন্দর এঞ্জেলিম (angelim) নামে খ্যাত ছিল। অনেক বেদনাময় কাহিনী আবর্তিত হয় এই হিজলি ও খেজুরি বন্দরকে কেন্দ্র করে [২০]

পরিশেষে বলা যায় মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কালের সময়ে ইংরেজ পর্তুগিজ ফরাসি ওলন্দাজ প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তি আগত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে তারা চলেও গেছে। রয়ে গেছে কিছু স্মৃতি। এছাড়া তাদের তৈরি বিভিন্ন সৌধ, সমাধি,মসজিদ, কিছু মূর্তি। আজও ডাক বাংলোর পাশে রয়েছে গোরস্থান। ভূত ভৈরবী

গাছের জঙ্গলে ঢাকা সেই গোরস্থানে শান্তির শয়ানে রয়েছেন কত মানুষ।। দিন বদলের সাথে সাথে মৃত সেই ইউরোপীয়দের পরিচিত ফলক হয়তো কোন গৃহস্থের পুকুর ঘাটে কাপড় কাচার চানপাথর হয়ে গিয়েছে। আজও সেই গোরস্থান খেজুরির পোস্ট অফিস এবং টেলিগ্রাফ লাইনের স্মৃতিটুকু উসকে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১) সুরঞ্জন মিদ্দে , দোম আন্তোনিও: সংগ্রাম ও সৃষ্টি, নান্দনিক, কলকাতা,২০১৯, পৃ : ৫৬।
২) সুস্নাত জানা, মেদিনীপুরের লোকভাষা, কবিতিকা,মেদিনীপুর,২০২২, পৃ : ৪৮।
৩) শ্রী মহেন্দ্রনাথ করন, হিজলীর মসনদ ই আলা , মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ, ১৯৫৮, পৃ : ২১।
৪) পৃথ্বীরাজ সেন, পশ্চিমবঙ্গ কে চিনুন : পূর্ব মেদিনীপুর, হৃদয়ের কথা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০২৩, পৃ : ৪৫।
৫) বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ : ৪৪৬।
৬) ভাস্করব্রত পতি, লৌকিক মেদিনীপুর, প্রথম খন্ড, কবিতিকা, মেদিনীপুর, ২০১৯, পৃ: ৮৬।
৭) শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথম ভাগ, কালিকা প্রেস, কলকাতা, ১৩২৮, পৃ:১৮৫।
৮) তদেব, পৃ: ৩২১।
৯) শ্রী মহেন্দ্রনাথ করন, খেজুরি - বন্দর, হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা - দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সংস্করণ, ক্ষেমানন্দ কুটির, মেদিনীপুর, ১৩৩৪, পৃ: ১৯।
১০) L.S.S . O' Malley, Bengal District Gazetteers : Midnapore , p -200.
১১) ভাস্করব্রত পতি, পূর্বোক্ত, পৃ:১০৭।
১২) শ্রী মহেন্দ্রনাথ করন,পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯ - ২১।
১৩) বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ : ৪২৮।
১৪) তারাপদ সাঁতরা, পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর , হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কো:, কোলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ৫৩।
১৫) তরুণ কুমার দেবনাথ, লুপ্ত বন্দরের ইতিকথা, মন্দাক্রান্তা, কোলকাতা, পৃ: ১১৩।
১৬) চন্দন দাস (সম্পাদিত), অখন্ড মেদিনীপুরের পুরাকীর্তি, তিতীষু বিশেষ সংখ্যা, মেদিনীপুর, ২০২২, পৃ: ১৫৫।

১৭) L.S.S . O' Malley, Bengal District Gazetteers : Midnapore, p -200.

১৮) রাজর্ষি মহাপাত্র, তাম্রলিপ্ত - তমলুক : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রভা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৬, পৃ: ১০২ -১০৫।

১৯) তদেব , পৃ : ১৩২ -১৩৫।

২০) সুস্নাত জানা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫ - ৪৬।

প্রাচীন বাংলার খাদ্য তালিকায় কৃষিজাত দ্রব্য ও ফল ব্যবহারের প্রতিচ্ছায়া

আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ
অগ্রদীপ এস. সি. এস. নিকেতন

সারসংক্ষেপ ঃ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি কার্যের সাথে সাথে তারা ফলের উৎপাদনের দিকে ও বিশেষ জোড় দিত। প্রাচীন বাংলায় মৌর্য, গুপ্ত ও কুষাণ আমল থেকেই প্রচুর পরিমাণে ফল ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হত, বাংলার পাল ও সেন যুগে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্যের নাম ও ফলের নাম জানতে পারা যায়। প্রাচীন বাংলার উৎপাদিত ফসলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ধান, গম, যব, বরবটি, তিল, প্রভৃতি এছাড়া ও ঝিঙে, কচু, লাউ, ডুমুর, বেগুন প্রভৃতি সবজির চাষ হত। বিভিন্ন লিখিত উপাদানে ফল চাষের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, ফল গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুস্বাদু ফল গুলি হল আম, জাম, বোদা, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল প্রভৃতি। প্রাচীন বাংলার মানুষেরা সুকৌশলে গঙ্গা নদীর বন্যাকে কাজে লাগিয়ে এবং বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ করে কৃষিকার্য ও বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ করত। কোশাম্বির মতে প্রাচীন বাংলার হলকা কাঁটা দিয়ে জমি খনন করত। গাঙ্গেয় উপত্যকায় উর্বর ভূমি ও কৃষিজ উপকরণে লোহার ব্যবহার কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব এনে দেয়। বাংলার মানুষেরা যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে কৃষি অর্থনীতি কে অবলম্বন করে স্থায়ী বসতি স্থাপন শুরু করে। কৃষিকার্যে সারের ব্যবহার শুরু হয়, এবং চাষের কাজে মানুষ মহিশ ব্যবহার করত। এ যুগে লাঙ্গল এত বড় ছিল যে চব্বিশটি বলদ তা টানতো। প্রাচীন বাংলায় ধানের উল্লেখ ব্রীহি নাম হিসাবে পাওয়া যায়।

পাল যুগে বাংলার কৃষকরা চাষ করার জন্য উন্নত মানের কোদাল, কাস্তে, হাতুরি প্রভৃতি ব্যবহার করত, চাল, গম, যব ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। এছাড়াও ডাল, সরিষা, ফল ইত্যাদি উৎপাদন করা হত। অমরকোষে বারো রকমের জমির উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্ষেত্র, কপক্ষেত্র, খিল্য, অপ্রহত, অপ্রদ, বাস্তু প্রভৃতি। বাংলার ধান, গম, যব, তিল, আম, আকন্দুর বিদেশে রপ্তানি করা হত। 'পেরিপ্লাস অফ দ্য এরিথ্রিয়ান সি' গ্রন্থ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার ফলের মধ্যে আম, পীচ, নাসপাতি ও আঙ্গুর খুব উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রাচীন বাংলায় অজয়, দামোদর, গঙ্গা, শীলাবতী, জলঙ্গী, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, আত্রেয়ী, চন্দনা, মধুমতী প্রভৃতি নদীর দ্বারা প্লাবিত হওয়ার ফলে উর্বরা জমিতে উন্নত মানের কৃষিজাত দ্রব্য ও ফলের চাষ সহজ হত।

সূচক শব্দ ঃ প্রাচীন বাংলা, খাদ্যশস্য, সবজি, ফল, নদী, কৃষক, রপ্তানি।

মূল আলোচনা ঃ

কৃষিজাত উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান চাষ ও ধান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বহুল নদ-নদী প্লাবিত বাংলার মাটির প্রভূত উর্বরতা, জলবায়ু ও বৃষ্টির প্রাচুর্যই ধান ও অন্যান্য শস্য উৎপাদনের সহায়ক। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিরিখে বঙ্গদেশ ও আদিপ্রস্তরযুগ (Paleolithic), মধ্যপ্রস্তরযুগ (Mesolithic), নব্যপ্রস্তরযুগ (Neolithis) ও সূক্ষ্মপ্রস্তরযুগ (Microlithic) ও তাম্রপ্রস্তর যুগ (Chalcolithic) ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যাযে ভাগ করা যায়। ধান্য উৎপাদনে বিষয়ে নিবন্ধকারের প্রেসিডিংস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের বোধগয়ায় ১৯৮১ সালে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধের শিরোনাম 'এ্যাম ইন্‌সাইট ইন্টু অ্যাগ্রোনমিক প্রোডাক্টস্ অব এ্যাথসিয়ান্ট ইন্ডিয়া। তাছাড়া নিবন্ধকরের দি পিপল্ অ্যান্ড কালচার অব বেঙ্গল ঃ এ স্টাডি্ ইন ওরিজিনস্, ভল্যুম ওয়ান, পার্ট ওয়ান, পৃঃ ৮৮-৯১ এ বর্ণিত আছে।

যাই হোক ১৯৬২ সালে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখননের ফলে জানা গিয়েছে সেখানে কৃষিনির্ভর জনবসতি ছিল।[১] সেখানে মাটির পাত্রে ধানের তুষের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।[২] বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে যে উহা কৃষিজাত উৎপন্ন ধান্য। ঐ মৃৎপাত্রের তারিখ বি.সি. ২০১২ ± ১২১।[৩] আবার বীরভূমে মহিষদলে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত যে দগ্ধ চাল পাওয়া গিয়াছে তার তারিখ বৈজ্ঞানিক কার্বন বিশ্লেষণে নির্ধারিত হয়েছে বি.সি. ১৩৮০ ± ৮৫৫।[৪] এইভাবে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরে ধান চাষের নজির পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত রাজবাড়ীডাঙ্গায় প্রত্নতত্ত্ববিদ সুধীর রঞ্জন দাশের তত্ত্বাবধানে তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের ফলে জানা যায় যে, সেখানে সুবিশাল শস্যভাণ্ডারের পোড়া চাল ও গম মজুত ছিল। এই সুবিশাল শস্যভাণ্ডারে আগুন লেগে গিয়েছিল ও উহা সম্পূর্ণ ভস্মাভূত হয়েছিল। বৈজ্ঞানক পরীক্ষা নিরীক্ষায় জানা গিয়েছে সেখানে তিন রকমের চাল ছিল। যথা - মোটা, মাঝারি, খুব, সূক্ষ্ম, সরু ও উন্নতমানের।[৬] গমের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ঐ গম উত্তর ভারতের গমের তুল্য ছিল। মনে হয় উত্তর ভারত থেকে গম চাষ পদ্ধতি বঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল।[৭] রেডিও কার্বন পদ্ধতির পরীক্ষায় নির্ধারিত হয়েছে যে, এই শস্যভাণ্ডার অষ্টম-নবম শতাব্দীর।[৮] উল্লেখনীয় এই যে, চাল ও গম চাষের এই নির্ণীত তারিখ প্রথম প্রামাণ্য সাক্ষ্য।

লিখিত উপাদানেও ধান চাষের পুঙ্খানু পুঙ্খ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর বঙ্গ বিজয় পর্বের 'উৎখাত প্রতিরোপিত' শ্লোক ধান চাষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯] সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণকারী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে কৃষিকার্যের অর্থাৎ ধান চাষের ও ফল উৎপাদনের কথা উল্লিখিত আছে।১০ আবার সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত ধান মাড়াই এর উঠান বা খামার, বলদের সাহায্যে ধান মাড়ানো বা ধানের গোলা বা মড়াই ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ ছবি একটি শ্লোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান।[১১]

এই শ্লোকে বর্ণিত আছে – 'সস্তু খেলো যদনুগমে বিত্তপেন গবাকৃত প্রবন্ধানাম বহুলকৃতে হিতফলঃ সঞ্চারো লোক ধান্যতো দৃষ্টাঃ খলোঃ ধান্য মর্দ্দনস্থানং খামারেতি।১২

এইভাবে রামচরিতে প্রথম একটি বাংলা শব্দ 'খামারের' (অর্থাৎ যেখানে ধান মড়াই করে রাখা হয়) উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩] সদুক্তিকর্ণামৃতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের ধান উৎপাদনের একটি চমৎকার দৃশ্য পরিস্ফুট। ('ব্রীহি স্তম্বকারিঃ প্রভূত পয়সঃ') অর্থাৎ প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার গজাইয়া উঠিয়াছে।[১৪] এতদ্ব্যতীত প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে বিশেষ করে সেন যুগের লেখতে ধান ফল উৎপাদনের বহুল তথ্য উৎকীর্ণ আছে। এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বঙ্গের প্রাচীনতম মহাস্থানগড় লেখতে উল্লিখিত ধানের কথা বলা যেতে পারে। 'সংবঙ্গীয়মান্ .... ধানম্' উৎকীর্ণ লেখ থেকে ধানের গোলার কথা জানা যায়।[১৫] আরোও লক্ষণীয় এই যে প্রাচীন বঙ্গেও আজকের দিনের মতো নানা রকমের ধান উৎপন্ন হতো। অর্থশাস্ত্রে বহুবিধ ধানের নাম পাওয়া যায়। যেমন শালিধান্য, ব্রীথি, কদ্রয় ইত্যাদি।[১৬] এইসব ধান এখন উৎপন্ন হয় না বলেই অনুমিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কিছুদিন পূর্বেও সরু উৎকৃষ্ট সীতাশাল উৎপন্ন হতো। কিন্তু এখন প্রায় বিলুপ্ত। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে সরু সীতাশাল ধান পরিমাণে ফলন কম হওয়ায় ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রেখে চাষী পরিমাণে ফলন কম হওয়ায় ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রেখে চাষী পরিমাণে যে বীজে ধানের ফলনের প্রাচুর্য দেখা যায় তাহাই – চাষ করে হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে সতের রকমের ধানের বীজের কথা পাওয়া যায়।১৭ সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গে বহুকরমের অপূর্ব, সুন্দর ধানের ফলের বর্ণনা করেছেন।১৮ রামচরিত ও রঘুংশে শালি ধান্যের বিশদ বিবরণ আছে।" সদুক্তিকণামৃতের শ্লোকে একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙলার শালিধান্য সমৃদ্ধ অনবদ্য, মধুর বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। 'শালিচ্ছেদ সমৃদ্ধ হালিকাগৃহা ঃ - আঁটি আঁটি কাটা শালিধান্য আঙ্গিনায় স্তূপীকৃত হইয়াছে।[১৫] রঘুবংশেও সেই একই ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। গাছের ছায়ায় বসে কৃষক শালিধান্য রাক্ষার্থে পাহারা দিচ্ছে।২১ চর্যাপদে 'কাগনী' নামে অন্য এক প্রকার ধানের বর্ণনা পাওয়া যায়। চর্যাপদে বর্ণিত আছে শবরজনগোষ্ঠী বাঁশের বেড়া দিয়ে শৃগালের হাত থেকে কাগনী ধান বাঁচাবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করছে।

'কঙ্গুচিনা পাকেলা রে
শবর-শবরী মাতেলা।'
কঙ্গুচিনাই কাগনী ধান।[২২]

সেন রাজত্বকালে সমতলভূমিতে কৃষিজমিতে শ্রেষ্ঠ ধান উৎপাদনের বহুল বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া, তর্পণদীঘি, গোবিন্দপুর, শক্তিপুর ও কেশবসেনের ইদিলপুর ইত্যাদি লেখতে শালি ধান্যের ও শস্যক্ষেত্রের, কোথাও বা ধান ফল উৎপাদনের জন্য মঙ্গলাচরণ বা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার শ্লোক উল্লেখনীয়।[২৩] এই 'শ্লোকে' ধান্যোপজীবি বাঙালীর আন্তরিক আকুতি ধ্বনিত হয়েছে। ধান্য উৎপাদন একান্তভাবেই বারি নির্ভর। সেই

জন্য দেখা যায় এই জনপদে খাল-বিল, নদ-নদী থাকা সত্ত্বেও ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে, নানা লোকায়ত ব্রত অনুষ্ঠানে, পূজা পদ্ধতিতে। চব্বিশ প্রহরে হরি সংকীর্তনে মেঘ ও আকাশের কাছে বারিপাতের জন্য প্রার্থনার উল্লেখ সর্বত্র বিরাজমান। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। বঙ্গদেশে প্রচুর বারিপাতের উল্লেখ লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে অসংখ্য লেখতে পাওয়া যায়। 'দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং'[২৪] তারই সাক্ষ্য বহন করে। লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া ও তর্পণদীঘি তাম্রশাসনে প্রস্ফুটিত, সুপক্ক শালিধান্যের বর্ণনায় দেখা যায় 'হেমন্তর স্ফুটমেব .... শালিশ্লাধ্য'[২৫] .... এরই প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়েছে কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে।১২ এখন 'ধন-ধান্যে পুস্পে ভরা' প্রাচীন বঙ্গের লিখিত ও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানে যে সকল ফল ফুলের বর্ণনা ও নাম পাওয়া যায় তারই দু-একটির কথা বলছি। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে এসে বঙ্গদেশে প্রভূত ফল, ফুল, গুল্মলতা, ফুলের ঝোপ-ঝাড়ের কথা বলেছেন।২৭ সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে, ধোয়ার পবনদূতে পূর্বে উল্লিখিত ফুলের সুন্দর বর্ণনা আছে। রামচরিতে কেশর ফুলের বর্ণনায় জানা যায় – ববেন্দ্রীতে সারি সারি কেশর বৃক্ষ ও কেশর ফুলের সুগন্ধে মৌমাছি মধু আহরণের সন্ধানে গুণগুণ করে ঘুরে বেড়ায়। লাল আভাযুক্ত শুভ্র পদ্মের পাপড়ির মতন গোছা গোছা কেশরে মধু ভরা অপূর্ব এই কেশর ফুল।[২৮] রামচরিতে আরো বর্ণিত আছে বরেন্দ্রীর সৌন্দর্য বহুরূপে সমৃদ্ধ আধফোটা কণক ফুলরাজিতে।[২৯] কণক ফুলেক ধুস্তুর বা চম্পকও বলা হয়েছে। চতুর্দিক ফুলে ফলময়। কেশর, কণক ও কেতক বরেন্দ্রের সৌন্দর্যের ছটা। ফুলের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত চতুর্দিকে। তার মাঝে নানা ধরণের অসংখ্য লাল ও নীল পদ্ম প্রস্ফুটিত [৩০] ('endless varieties of lotuses - red and blue') বরেন্দ্রীর দিগ্ দিগন্ত মালতী, নাগকেশ্বর ও শেষ্ঠ সুন্দরতম বকুল ফুলের শোভায় ও সুগন্ধে আমোদিত ও সুগন্ধে চতুর্দিক সুশোভিত ছিল।[৩২] জয়দেবের গীতগোবিন্দে উল্লিখিত আছে বঙ্গদেশে তমাল, চুত, অশোক, বকুল, কিংশুক, বঞ্জুল বা অশোক, বাসন্তী, লবঙ্গ ফুলে চতুর্দিক মনোরম শোভা বর্ধন করছে।[৩৩] স্মরণ করিয়ে দেয় বিখ্যাত এই শ্লোক 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে।[৩৪] পাটলী কুসুমরাজী, মল্লিকা, লতিকা, মাধবীর ও বেতসলতা, পদ্ম, চন্দন বৃক্ষের উল্লেখও গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়।[৩৫] লক্ষণীয় বিষয় এই যে কবি বলছেন – 'মাধবীর আলিঙ্গনে সহকারতরু পুলকিত হইয়া মুকুলিত হইতেছে।[৩৬] এই প্রসঙ্গে রামচরিত উদ্ধৃত করে বলি প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, প্রিয়ালা ফুলে দেশ ভরপুর।[৩৭] প্রিয়ালা ফুলে দেশ ভরপুর লতার দ্বারা পুষ্করিনী বা জলাধার পরিবেষ্টিত।[৩৮] সে এক অমন্য সৌন্দর্য। দেশ করুণা অশন ও নাগরঙ্গ বৃক্ষের শোভায় অলঙ্কৃত।[৩৯] এই সকল বৃক্ষের মনোমুগ্ধকর দৃষ্য দেশের অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য বর্ধন করে।[৪০] প্রিয়ঙ্গু লতার কথা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। আরো বলা হয়েছে বরেন্দ্রীতে বিশাল, বৃহৎ সুমিষ্ট আমলকি বৃক্ষের ফলের উদ্যান বিদ্যমান ছিল।[৪১] এমনকি মহুয়া গাছের চাষের

কথাও বলা হয়েছে।[৪২] শুধু মহুয়া নয় বরেন্দ্রীতে বা উত্তর বঙ্গে প্রচুর বাঁশ ঝাড় ও বাঁশ চাষের কথাও উল্লিখিত।[৪৩] বড়ো বড়ো গাজরী, পর্কটী বা ডুমুর ও তাল গাছে তারি সঙ্গে বৃহৎ গজারি বৃক্ষের সারি সৌন্দর্য বর্ধন করতো।[৪৪]

উপসংহার ঃ সুতরাং উ পরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন বাংলার মানুষজন বিভিন্ন ধরনের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং ফল উৎপাদনে সচেতন ছিল। তখন কার মানুষদের কাছ থেকেই বর্তমানের মানুষজন জানতে পারে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শস্য উৎপাদন ও ফল উৎপাদনের কৌশল। বিভিন্ন ধরনের শস্য ও ফল উৎপাদন আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড়ভাবে সংযোগ স্থাপন করে এবং সুস্থভাবে বাঁচার পথ তৈরী করে। এছাড়া মানুষের মনকে চিন্তাশীল, সৃজনশীল, কল্পনা ও ভাবপ্রবণতায় ভরিয়ে তোলে।

সূত্র-নির্দেশ ঃ

১) পরেশ দাশগুপ্ত, দি এক্সাভেশন অ্যাট পান্ডুরাজার টিপি (কলিকাতা, ১৯৬৪), পৃ. ১৪, ১৬-২০।
২) তদেব, পৃ. ১৪।
৩) তদেব, পৃ. ১৯।
৪) এফ.আর. অলচিন, এ্যান্ড ব্রিজেট, দি বার্থ অব ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেন (পেনন্ডইন, লন্ডন, ১৯৬৮, পৃ. ১৯৮-১৯৯।
৫) সুধীর রঞ্জন দাশ, রাজবাড়ীডাঙ্গা (কলিকাতা, ১৯৬৪), পৃ. ৪২।
৬) তদেব।
৭) তদেব।
৮) তদেব।
৯) রঘুবংশ, ক্যান্টো ফোর, পৃ. ৩৬-৩৭।
১০) টি.ওয়াটার্স (অনুবাদক), ‘অন য়ুমান চোয়াংস ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া’, ভল্যুম টু (লন্ডন, ১৯০৫, দিল্লী, ১৯৬১), পৃ. ১৮৪, ১৮৯, ১৯১, এস.বিল (অনুবাদক), সি.য়ু.কি, বুদ্ধিষ্ট রেকর্ডস অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ারল্ড, ভল্যুম টু, পৃ. ১৯১-২০১।
১১) রমেশচন্দ্র মজুমদার, আর. জি. বসাক ও এম. জি. ব্যানার্জী (সম্পাদনা), রামচরিত অব সন্ধ্যাকরনন্দী (রাজশাহি, ১৯৩৯), কবিপ্রশস্তি ফাইভ, ১৩, পৃ. ১৮৯-১৯০।
১২) তদেব।
১৩) তদেব।
১৪) শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃত এডিটেড সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী (কলিকাতা, ১৯৬৪), ২/৮/৩, নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯৮০), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫
১৫) এস.কে মাইতি এ্যান্ড আর আর মুখার্জী, করপাস অব বেঙ্গল, ইন্সক্রিপসন্স্ বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এ্যান্ড সিভিলাইজেনসন অব বেঙ্গল, (কলি ১৯৬৭), পৃ. ৩৯-৪১, দীনেশ চন্দ্র সরকার, সিলেক্ট ইন্সক্রিপসন্স্ বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন (কলি, ১৯৯৫), পৃ. ৮২।

১৬) আর সামশাস্ত্রী (অনুবাদক) অর্থশাস্ত্র (মাইশোর, ১৯৬৭) বুক ফোর, পৃ ১৩১।
১৭) হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণি, ফোর, ২৩৩; জার্নাল অব দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, ভল্যুম ৬১, ১৯৪১, পৃঃ. ১৬৬-১৬৭ ।
১৮) মজুমদার, বসাক এ্যান্ড আদার্স, রামচরিত তৃতীয় ভার্স ১৭বি, পৃ. ৯১।
১৯) নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ভল্যুম ওয়ান, পৃ. ১৭৬।
২০) শ্রীধরদাস, সদুক্তিকর্ণামৃত, ২/৮৪/৩, ২/১৩৬/৫, নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
২১) নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃ. ১৭৬।
২২) চর্যাগীতি, শবরপাদ, নং ৫০, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১৭,
২৩) ননী গোপাল মজুমদার, ইন্সক্রিপসনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম থার্ড (রাজশাহি, ১৯২৯), পৃ. ৮৫, ৮৯-৯০ আনুলিয়া কপার প্লেট অব লক্ষ্মণ সেন), পৃ. ৯৪ (গোবিন্দপুর লেখ), পৃ. ১০১ (তর্পণদিঘি লেখ), পৃ. ২০০ (রামগড় কপার প্লেট অব মহীপাল)।
২৪) মাইতি এ্যান্ড মুখার্জী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০ (রামগড় কপাল প্লেট অব মহীপাল)।
২৫) ননী গোপাল মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫ (আনুলিয়া লেখ), ১০১ (তর্পণদীঘি লেখ)।
২৬) তদেব, পৃ. ১২৯ এফ.এফ.।
২৭) টি. ওয়াটার্স অনুবাদক), পূর্বোক্ত ভল্যুম টু, পৃ. ১৮৪, ১৮৯-১৯১, বিল, পূর্বোক্ত ভল্যুম টু, ১৯১, ১৯৪, ১১৯-২০১।
২৮) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বসাক ও অন্যান্য, রামচরিত, থ্রি, ২১ বি, পৃ. ৮৪।
২৯) তদেব, থ্রি, ফাইব , ২২বি, পৃ. ৯৫।
৩০) তদেব।
৩১) তদেব, দ্বিতীয়, ফাইব, ২২, পৃ. ৫৫।
৩২) তদেব।
৩৩) 'লক্ষ্মীনারায়ণ', গীতগোবিন্দ অব জয়দেব, পৃঃ ২৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৭; সুকুমার সেন, গীতগোবিন্দ অব জয়দেব, পৃ. ১০।
৩৪) সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১।
৩৫) সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯, ১০, ৩৩, ৪৯, ৪৪।
৩৬) তদেব পৃ. ১০।
৩৭) রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্যেরা রামচরিত, থ্রি, ফাইব, ১৮, পৃ. ৯২-৯৩, দুই, ভার্স ২২, পৃ. ৫৫ ।
৩৮) তদেব, থ্রি, ফাইব, ১৬, পৃঃ ৯০, ফাইব, ১৯, পৃ. ৯৩, ফাইব, পৃ. ৮৮।
৩৯) তদেব।
৪০) তদেব, থ্রি, ফাইব, ১৩, পৃ. ৮৮।
৪১) তদেব, থ্রি, ফাইব, ১৬, পৃ. ১৯০।
৪২) তদেব, থ্রি, ফাইব, ২১, পৃ. ৮৪।
৪৩) তদেব, থ্রি, ভার্স, ১৭, পৃ. ৯১
৪৪) তদেব, ১, ফাইব, ২১বি, পৃ. ১৭; ৪, ভাস - ৩৪ এ পৃ. ১৪১।

ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

অমৃতা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া

সারসংক্ষেপঃ ঊনবিংশ শতক আধুনিক ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসময় মূলতঃ অবিভক্ত বাংলাকে কেন্দ্র করে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। উক্ত শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকায় আয়ুর্বেদের চর্চা গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সাধারণতঃ আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীরা কবিরাজদের টোলে শিক্ষা লাভ করত। বাংলায় আয়ুর্বেদের চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা , নদীয়া , মুর্শিদাবাদ, যশোহর , চট্টগ্রাম প্রভৃতি। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান শুরু হয়। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে ব্রিটিশ সরকার পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষণার নীতি নেওয়ায় এই সময় থেকে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদীয় ক্লাশগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে আয়ুর্বেদের চর্চা পুনরায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতে থাকে। বিংশ শতকেও এই ধারা প্রবহমান ছিল। এর পাশাপাশি কিছু আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে । যেমন – ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান , ১৯২২খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ প্রভৃতি। এইভাবে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার আঘাত থেকে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল ।

সূচক শব্দঃ আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ, বাংলা , ঊনবিংশ-বিংশ শতক।

মূল আলোচনাঃ

ঊনবিংশ-বিংশ শতক আধুনিক ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল মূলতঃ অবিভক্ত বাংলাকে কেন্দ্র করেই। আর্থ-সামাজিক , রাজনৈতিক , ধর্মীয় , সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের মত চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকায় আয়ুর্বেদের চর্চা গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে ।স্থানীয় শাসক , অভিজাত শ্রেণী এইসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার পশ্চিমী চিকিৎসাকে পৃষ্ঠপোষকতা করলে উক্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে ঊনবিংশ-বিংশ শতকে বাংলার আয়ুর্বেদ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস করা হয়েছে ।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের কবিরাজদের টোলে শিক্ষা লাভ করতে হত। নামজাদা কবিরাজররা নিজেদের গৃহে কোনোরকম পারিশ্রমিক

ছাড়াই শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। সাধারণভাবে কবিরাজররা নিজেদের গৃহে ও নিজেদের খরচে ছাত্রদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন , বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা গুরুর গৃহস্থালীর কাজকর্মে সাহায্য করত। যেসব ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি থাকত না , তাদের প্রথমে ব্যাকরণ ,সাহিত্য ও তর্কবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাথমিক বিদ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাদের ধ্রুপদী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পাঠ করানো হত।[১]

টোলের আয়ুর্বেদ শিক্ষা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক ছিল না, সেখানে প্রায়োগিক বিদ্যা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। টোলের শিক্ষাক্রমের শেষ পর্যায় ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে ছাত্রদের গুরুর সঙ্গে রোগীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হত। এছাড়া গুরুর সাথে বনে জঙ্গলে ঘুরে বিভিন্ন প্রকার ভেষজের সঙ্গে পরিচিত হতে হত এবং এগুলি নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রিত করে ঔষধ প্রস্তুত করাও শিখতে হত। এইভাবে আয়ুর্বেদশিক্ষার সমস্ত পর্যায় সমাপ্ত হলে গুরুর অনুমতিক্রমে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা শুরু করা যেত।[২]

ঊনবিংশ শতকের বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চার কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র ছিল নদীয়া , মুর্শিদাবাদ , হুগলী , বাঁকুড়া , মেদিনীপুর , কলিকাতা , শ্রীখন্ড , যশোহর , চট্টগ্রাম , চাঁদসী, বেলঘরিয়া, চব্বিশ পরগণা ,নাটোর প্রভৃতি।[৩] এই সময়ে বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ চর্চা কেন্দ্র ও সেগুলির শিক্ষণীয় বিষয় [৪] সারণীর আকারে উপস্থাপিত হল-

ঘরানা	শিক্ষণীয় বিষয়
১।পূর্ববঙ্গঃ ক) সাভার খ) মাট্টা গ) গলিয়া ঘ) চাঁদসী ঙ) চট্টগ্রাম ঘরানা	ক)ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকরণ খ)রোগীপরীক্ষা প্রণালী , রোগনির্ণয় , অনুপান ও নির্দেশাবলী গ)কেমোথেরাপি অনুসারে ঔষধপ্রস্তুতকরণ ঘ)বিভিন্ন ধরণের নালীঘা ও অর্শ প্রভৃতির চিকিৎসা ঙ)পাগলামীর চিকিৎসা শিক্ষণীয় বিষয়
চ) খন্ডপাড়া ২।পশ্চিমবঙ্গঃ ক) মুর্শিদাবাদ খ) কুমারটুলী গ) শ্রীখন্ড	চ)পাগলামীর শিক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র ক)নাড়ীবিজ্ঞান ও রোগনির্ণয় খ)ঔষধ প্রস্তুত কেন্দ্র গ)সাধারণ কবিরাজী শিক্ষা ও আয়ুর্বেদ পুস্তক প্রকাশনা কেন্দ্র

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকেরা দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেননি। পরে ব্রিটিশরা হাসপাতালে অধীনস্ত কর্মচারী হিসাবে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে যারা দক্ষ হয়ে উঠত , তারা সৈন্যবাহিনীতে 'নেটিভ ডাক্তার' হিসাবে যোগ দিত। নেটিভ ডাক্তারদের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ মত তাদের একটি বিদ্যালয় " স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স " ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] এদেশীয় চিকিৎসকদের শিক্ষার জন্য দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্কুল ফর নেটিভ ডক্টর্স –এর দ্বিতীয় সুপারিন্টেডেন্ট ডাঃ পিটার ব্রেটন দেশীয় ভাষায় পনেরোটি বই রচনা করেন। এগুলির বিষয়বস্তু ছিল লন্ডনের ফার্মাকোপিয়ার অনুবাদ , কলেরা , সবিরাম জ্বর , চক্ষুর গঠন, নরদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস ও আকৃতি প্রভৃতি। [৬] ১৮২৬খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী এই কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাশ পরিচালনার জন্য সরকারী নির্দেশনা বিষয়ক জেনারেল কমিটির কাছে আবেদন করেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ডব্লু.প্রাইস লেখেন , কলেজের ছয় জন ছাত্র ও বৈদ্য গোত্রের বারো জন বহিরাগত ছাত্র কলেজে চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাশ প্রবর্তনের আবেদন জানিয়েছেন ,যাতে তারা পরবর্তীকালে চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন। নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের সুপার জন টিটলার ক্লাশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। মাত্র সাত জন ছাত্রকে নিয়ে ক্ষুদিরাম বিশারদের অধীনে সংস্কৃত কলেজে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল বৈদ্যক বিভাগ। এখানে সমান্তরালভাবে আয়ুর্বেদ ও পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠ্যতালিকায় ছিল সুশ্রুত ও চরক সংহিতা।[৭] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের জন্য আরো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।[৮] ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ১৮১ জন ছাত্রের মধ্যে বৈদ্যক বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩ জন। ড.টিটলার , ড.জেমিসন প্রমুখ পন্ডিতগণ চরক , সুশ্রুত , বাগভটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। জটিল রোগ চিকিৎসায় বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ক্ষুরধার বুদ্ধির তাঁরা প্রশংসা করতেন ।[৯]

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবনমন ঘটতে শুরু করে। কবিরাজদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের গৃহে গতানুগতিক আয়ুর্বেদীয় শিক্ষাদান চলতে থাকে। তবে এর পরিকাঠামো কখনোই সুসজ্জিত কলেজের মত ছিল না। তাই চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে আগ্রহীরা পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়। প্রথমদিকে রক্ষণশীল কবিরাজরা তাদের পরিবারের পুত্রদের পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতি শিখতে দিতে সম্মত হতেন না। পরবর্তীকালে পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতির অর্থকরী দিক ও সামাজিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে অনেকেই নিজেদের সন্তানদের মেডিক্যাল কলেজে পড়তে প্রেরণ করেন ।

সংস্কৃত কলেজে দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে ব্রিটিশ সরকার পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যাকে পৃষ্ঠপোষণার নীতি নেয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মেকলের সুপারিশ অনুসারে সংস্কৃত কলেজে মেডিকেল ক্লাশগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন ।[১০]

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের ঘোষণার ফলে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সম্ভবনা সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে গেলেও বাংলায় আয়ুর্বেদ চর্চা আদৌ বন্ধ হয়ে যায় নি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন কবিরাজ আয়ুর্বেদ চর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাধর রায়। তিনি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে (বহরমপুর) আয়ুর্বেদ চর্চা শুরু করেন। তিনি জল্পকল্পতরু , পথ্যাপথ্য ,ভাস্করোদ্যয়(নিদান বিষয়ক গ্রন্থ), বৈদ্যতত্ত্ববিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি অগ্নিপুরাণের চিকিৎসা সংক্রান্ত অধ্যায় ও চরকসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।[১১] তিনি টোলে বহু শিষ্যকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। এখানে তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত শিষ্য- প্রশিষ্যের নাম[১২] উল্লেখ করা হল –

প্রথম প্রজন্ম	দ্বিতীয় প্রজন্ম	তৃতীয় প্রজন্ম
১। কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন	• কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন	
	• কবিরাজ উমাচরণ সেন/ ভট্টাচার্য	কবিরাজ হরিরঞ্জন মজুমদার
	• কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন	
	• কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন	কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ দাস
	• কবিরাজ গোবর্দ্ধন শর্ম্মা	
	• কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা	
	• কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন	কবিরাজ জয়রাম দাসজী
২। কবিরাজ গয়ানাথ সেন	• কবিরাজ সীতানাথ সেন	
	• কবিরাজ রামনাথ সেন	
৩।কবিরাজ পরেশনাথ সেন	• কবিরাজ সত্যনারায়ণ সেন	
	• কবিরাজ ধর্মদাস গুপ্ত	
	• কবিরাজ ত্র্যম্বক শাস্ত্রী	সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী ও রাজেশ্বর দত্তশাস্ত্রী
	• কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি	

৪।কবিরাজ হারান চক্রবর্তী ৫। কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন ৬। কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন ৭। কবিরাজ শ্রীধরচন্দ্র সেন	• কবিরাজজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী • কবিরাজ রমেশচন্দ্র সরস্বতী • কবিরাজ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়	কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য কবিরাজ নলিনীরঞ্জন সেন কবিরাজ ধরণীধর ও জয়দেব বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ

গঙ্গাধর সেনের অন্যতম শিষ্য দ্বারকানাথ সেনের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ সেন চরক সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। হারানচন্দ্র সেন বিখ্যাত কায় ও শল্যচিকিৎসক ছিলেন। তিনি সুশ্রুত সংহিতার ভাষ্য সুশ্রুতার্থসন্দীপণ রচনা করেন।[১৩] কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি কলিকাতায় একটি টোল স্থাপন করেন এবং পরে দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন , অধুনা এটি শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে সুপরিচিত।[১৪] ১৪কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী সুশ্রুত সংহিতার ভাষ্য রচনা করেন।[১৫] গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রধান গ্রন্থাগারিক উমেশচন্দ্র দত্ত আয়ুর্বেদ অভিধান – বৈদ্যশব্দসিন্ধু সংকলন করেন।[১৬]

ঊনবিংশ শতকের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে ‘আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী’ নামক আয়ুর্বেদ বিষয়ক একটি বাংলা পত্রিকার প্রথম সম্পাদনা করেন। কলিকাতার কুমারটুলিতে তিনি আয়ুর্বেদ চর্চাকে পশ্চিমী চিকিৎসার সমপর্যায়ে উন্নীত করেন।[১৭] তাঁর কয়েকজন শিষ্য-প্রশিষ্য হলেন[১৮] -

প্রথম প্রজন্ম	দ্বিতীয় প্রজন্ম
১।কবিরাজ নিশিকান্ত সেন ২।কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন ৩।কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্ট

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের শিষ্য বিজয়রত্ন সেন বাগভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সংস্কার করেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৯] বিজয়রত্ন সেন পশ্চিমী অ্যালোপাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মধ্যে সহযোগিতার ধারণা আনয়ন করেন।[২০] তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়কে দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং এজন্য লক্ষাধিক মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কায্য সিদ্ধির আগেই বিজয়রত্ন সেন পরলোক গমন করে।[২১] কবিরাজ যামিনীভূষণ সিদ্ধান্তে আসেন যে ,অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ টোলে ব্যক্তিগত গুরুর নিকট থেকে হওয়া অসুবিধাজনক। এবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হলে আয়ুর্বেদের বিদ্যালয় , একাধিক অধ্যাপক এবং সাধন দ্রব্যাদির প্রয়োজন।[২২] তাই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটে একটি ভাড়াবাড়িতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। যামিনীভূষণের প্রাচীন ও আধুনিকের মধ্যে সমন্বয়সাধনের এই প্রয়াস অচিরেই মহাত্মা গান্ধীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই নয় বছর পরে ৬ই মে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে এই কলেজের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং গান্ধীজী। এই প্রতিষ্ঠান 'যামিনীভূষণ রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল' নামে এখনও বর্তমান।[২৩] বিজয়রত্ন সেনের অপর শিষ্য কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কুচবিহারে একটি দাতব্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বনৌষধি দপণ ও রসৌষধি নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন।[২৪] উক্ত সময়কালে বাংলার স্বনামধন্য মহিলা কবিরাজ মৃন্ময়ী দেবী অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরের দত্তপাড়ায় 'কামাখ্যা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠা করে মহিলাদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতেন। [২৫]

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আয়ুর্বেদ আন্দোলন রাজনৈতিক অবস্থান থেকে নিজের অধিকারের বিষয়গুলি তুলে ধরে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন বেগবান হয়। এই সংস্থার প্রধান দায়িত্ব ছিল আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' এর সভায় কলিকাতায় একটি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং আলোচনার শেষে কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৬] ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গঠন করা হল 'আয়ুর্বেদ সভা' , এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে বিজয়রত্ন সেন ও নগেন্দ্রনাথ সেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন'। সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার একটি শাখা ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর অর্থানুকুল্যে গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ গণনাথ সেন বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ

মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি প্রত্যক্ষ শারীরম্, সিদ্ধান্ত নিদান ও আয়ুর্বেদ পরিচয় গ্রন্থ রচনা করেন।[২৭]

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে জানা যায় যে , ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল ১৯০টি , যেগুলিতে ১৫ জন করে ছাত্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা করত। এদের গড় বয়স ছিল ১৬.২ বছর এবং শিক্ষা সমাপ্তির গড় বয়স ছিল ২৪.২ বছর ।[২৮] আয়ুর্বেদের এই উন্নতির পিছনে কবিরাজদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও সেকালের জমিদার , প্রভাবশালী ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন – পাথুরিয়াঘাটা , জোড়াসাঁকো ও চোরবাগানের জমিদার ; বড়বাজারের গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ , জৈন বেনোভলেন্ট সোসাইটি প্রভৃতি।[২৯]

উপসংহার: ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন চলে তার তিনটি রূপ দেখা যায় – ক) প্রাচীন ও পরবর্তীকালীন আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রাদিতে প্রাপ্ত জ্ঞান সংকলন ও তার প্রচার , খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং গ) আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুত ও বিপণন।বাংলায় পশ্চিমী চিকিৎসা প্রচলিত হলে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে , আয়ুর্বেদ চিকিৎসা হয়ত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে , যে সব রোগ অ্যালোপাথিক ডাক্তারের চিকিৎসায় নিরাময় হয়নি ,তা বৈদ্যরা অনায়াসে সারিয়ে তুলেছেন। ফলে বৈদ্যদের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অশিক্ষিত হাতুড়ে বৈদ্যদের পরিবর্তে সুপন্ডিত বুদ্ধিমান কবিরাজরা চিকিৎসা করতে থাকেন। তাঁদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও বৃদ্ধি পায় ।

তথ্যসূত্র :

১) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত , ইন্ডিজিনাস মেডিসিন ইন নাইনটিন্থ অ্যান্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী বেঙ্গল, চার্লস লেসলী (সম্পাদিত) , এশিয়ান মেডিক্যাল সিস্টেমসঃ এ কমপ্যারেটিভ স্টাডি, মোতিলাল বানারসী দাশ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , দিল্লী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা –৩৬৮

২) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৯

৩) মাধবেন্দ্র পাল , আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আয়ুর্বেদ , কলিকাতা , ১৯৭৪ , পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

৪) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩৬৯

৫) এইচ.শার্প , সিলেকশনস ফ্রম এডুকেশনাল রেকর্ডস ,১৭৮১-১৮৩৯,বিভাগ -১ , কলিকাতা , ১৯২০ , পৃষ্ঠা-২৪

৬) নারায়ণচন্দ্র চন্দ , চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস , লেখনী প্রকাশন , কলিকাতা , ১৯৯৪ , পৃষ্ঠা-১৮১

৭) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় , আয়ুর্বেদের ইতিহাস , তৃতীয় খন্ড , কলিকাতা , ১৩৭০ সন , পৃষ্ঠা-১৫৮
৮) পুনম বালা , স্টেট অ্যান্ড ইন্ডিজিনাস মেডিসিন ইন নাইনটিন্থ অ্যান্ড টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী বেঙ্গলঃ ১৮০০-১৯৪৭ ,এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল উপাধির জন্য উপস্থাপিত সন্দর্ভপত্র,১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৭৩
৯) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৮
১০) এইচ.শার্প , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩০-৪০
১১) এন. গঙ্গাধরন , দ্য স্টেট অফ আয়ুর্বেদ ইন দ্য এইটিন্থ অ্যান্ড নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীজ, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রী অফ সায়েন্স , খন্ড – ১৭ , নং- ১ , ১৯৮২ , পৃষ্ঠা-১৫৭
১২) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত, পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩৭৬
১৩) এন. গঙ্গাধরন , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৮
১৪) ভারত(সাপ্তাহিক পত্রিকা),প্রথম বর্ষ ,ষষ্ঠ সংখ্যা, শনিবার , ৫ই শ্রাবণ , ১৩৪১
১৫) এন. গঙ্গাধরন , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৭
১৬) মোমিন আলি , আয়ুর্বেদ ইন দ্য এইটিন্থ অ্যান্ড নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীজ ,ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হিস্ট্রী অফ মেডিসিন (বুলেটিন) , খন্ড – ২০ , পৃষ্ঠা-১৫৪
১৭) 'আয়ুর্বেদ' , ফাল্গুন ,১৩৬৯সন , পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫
১৮) ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩৭৩
১৯) এন. গঙ্গাধরন , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৫৭
২০)'আয়ুর্বেদ সমাচার' , ২০/০৯/১৯৯২ ,খ , ১৪ সংস্করণ , কলিকাতা , পৃষ্ঠা-৮
২১) প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় , পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-১৬৭
২২) তদেব , পৃষ্ঠা-১৬৯
২৩) ডব্লিউ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.গুগল.কম/উইকিপিডিয়া.ওর্গ /কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়
২৪) 'আয়ুর্বেদ' , বৈশাখ , অগ্রহায়ণ , মাঘ , ১৩২৮ সন , পৃষ্ঠা -৩০৭
২৫) মহিলা সংবাদ (সম্পাদকীয়), প্রবাসী(মাসিক পত্রিকা), প্রথম খন্ড , প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ , ১৩০৮ সন , পৃষ্ঠা -৪৪৩
২৬) মিনিটস বুক অফ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন , ১৯০৬ , ২৪ , খন্ড – ১ , কলিকাতা পৃষ্ঠা-২৭
২৭) ডব্লিউ.ডব্লিউ.ডব্লিউ.গুগল.কম/বিএন বাংলাপিডিয়া ওর্গ /আয়ুর্বেদিক মেডিসিন
২৮) দ্য ক্যালকাটা রিভিউ , খন্ড -২ , অক্টোবর – ডিসেম্বর , ১৮৪৪ , কলিকাতা , পৃষ্ঠা-৩৪৬-৩৫৩
২৯) প্রাণকৃষ্ণ দত্ত , কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭২-৭৬

GLOBALISATION, OLYMPISM, SPORT AND MULTICULTURALISM

Mamata Malik
Assistant Professor, Physical Education
Manbhum Mahavidyalaya

ABSTRACT : The term Globalization means integration of economics and societies through cross country flows of information, ideas, technologies, goods, services, capital, finance and people. Historically the growth of globalization was mainly led by the technological forces in the field of transport and communication. The rapid development of the capital market has been one of the important features of the current process of globalization. There are many effects of globalization in every field. The main fears of globalization are that globalization leads to a more iniquitous distribution of income among countries and within countries. Globalization is not only an economic phenomenon. In sports globalization started as early as in 1877 when the inaugural cricket test match was held between England and Australia. Sports can be defined as the complex, mixture of cultural, politics, and commercial interest. The factors that develop and spreads sports culture are industrialization, the concentration of people towards urban areas, provides a pool of potential participants, the mass production of goods and technologies and sport celebrity as a figure of admiration. The international sports federation are an integral part of globalisation of sports. It brings participants from all parts of the world and unite them through a competition.

Keywords- *Globalisation, sports, economic, international.*

INTRODUCTION

- Globalisation refers to the integration of economics and societies all over the world. Globalisation involves technological, economic, political, and cultural exchanges made possible largely by advances in communication, transportation, and infrastructure.
- Its Importance- It changes the ways nations, business and people interact. It changes the nature of economic activity among nations, businesses and people interact.

- Its importance on sports field: -The globalisation of sports has been characterised by the creation of national and international sports organisations, the standardization and worldwide acceptance of the rules and regulations for individual and team sports, the development of regularly scheduled international competitions, and the establishment of special competitions, such as Olympics and various world championships, that aspire to involve athletes from nations in all corners of the globe. Historically the growth of globalization was mainly led by the technological forces in the field of transport and communication. In last two decades the process of globalization has proceeded with greater vigour. More and more developing countries are turning towards an outward oriented policy of growth. The rapid development of the capital market has been one of the important features of the current process of globalization. There are many negative and positive effects of globalization in every field. Globalization significantly modifies the sovereignty of countries where countries now have to compose with forces whose impact is beyond their national limits.

Global Influences on Sports and its Impact:-

1) Sports as Complex Mixture of Cultural, Politics, and Commercial Interest: -

- Sports events celebrating the body and physical culture have long been driven by political and ideological motives, from the ancient civilisations of Greece and Rome to the societies of early modern Europe, in more modern Western societies as well as less developed and non-developed ones.

Analysing the global sports spectacle is a way of reviewing the contribution of international sport to the globalization process generally, and to processes and initiatives of global inclusion and exclusion. The most dramatic and high profile of such spectacles have been the modern Olympic Games and the men's football World Cup (henceforth World Cup). Such sporting encounters and contests have provided a source of and a focus for the staging of spectacle and, in an era of international mass communications, the media event. In any history of globalization, it would be an oversight to omit coverage of the foundation and growth of

the International Olympic Committee (IOC) and the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), founded in 1894 and 1904 respectively. The growth of these organizations, and of their major events, has provided a platform for national pride and prestige. Greece saw the symbolic potential of staging an international event such as the first modern Olympics in 1896 to both assert its incipient modernity and to deflect domestic tensions. Uruguay, having cultivated double Olympic soccer

2) International Associations

The International Sports Federation serves as, each of which serves as a non-governmental governing body for a given sport and administers its sport at a world level, most often crafting rules, promoting the sport to prospective spectators and fans, developing prospective players, and organizing world or continental championships. Some international sports federations, such as World Aquatics and the International Skating Union, may oversee multiple activities referred to in common parlance as separate sports: World Aquatics, for example governs swimming, diving, synchronised swimming, and water polo as separate "disciplines" within the single "sport" of Aquatics.

International sports federations form an integral part of the Olympic and Paralympic movements. Each Olympic sport is represented by its respective international sports federation, which in turn helps administer the events in its respective sport during the Games. For a sport to become an Olympic sport, its international sports federation must be recognized by the International Olympic Committee.

- England is the first country to establish National sports organisation back in 1870 that was the era when most of the sports organisations got started.
- The follow up of standardize rules and sponsors, defined hierarchy, qualification of players and record keeping.
- The most important step towards the standardization of sports in all across the world was the formation of International Olympics Committee in 1894.

3) Elite sport, the media and sponsors

Sport has always grabbed people's attention. For example, attendance at football games in the early 1900s regularly exceeded 40,000 and the stadium built for the 1908 London Olympic Games seated over 68,000 spectators and was a forerunner to the modern all-seater stadia. This means that sport has the potential to influence a wide range of people. In more recent times, the combination of global media coverage, huge sponsorship deals and more athletes training full-time means that some elite sports are a very lucrative business.

Media

The media benefits from the commercialisation of sport. High profile sports stories help to attract audiences, listeners and readers. In turn, the media makes sure that sport keeps a high profile.

Sponsors

Sponsors benefit from the commercialisation of sport. Their funding is essential for sport’s growth. In return, high-profile coverage of sport ensures a high profile for their companies and products.

In this way, sport – particularly elite sport, the media and sponsorship are interlinked. This is called the golden triangle.

As well as its many benefits, commercialism in sport can also be negative. For example, some people believe that the commercialisation of elite football in the UK has changed the game for the worse and is destroying the traditional community-based links between supporters and clubs.

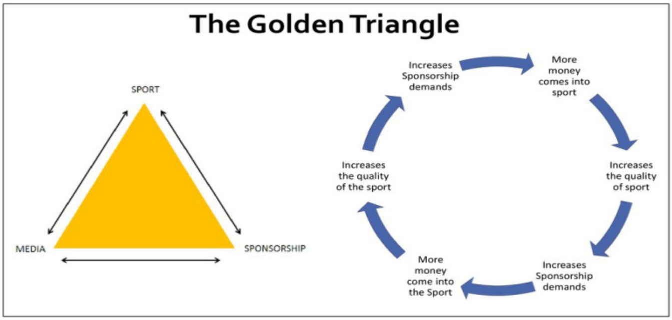

4) Impact of globalization on sports goods industries: -

Globalization is an opportunity for companies to penetrate new markets in other parts of world.

1. By establishing an agency for the sale purpose of promoting local sport products and services.
2. The industry needs to capitalize on country's reputation as successful host of world class competitions and use this opportunity to explore new markets in different areas such as exporting expertise in the venues construction such as stadiums or golf courts.
3. To capture the new markets through branding and endorsement of goods.
4. Companies should make an internationally recognizable brand image for gaining the market share.
5. Agency should add its name and logo in sports products for globalization but it is very important that the agency's branded product meets international quality standard.
6. Companies need to take advantages of Government export assistant program i.e. as (MITI) Ministry of International Trade Industry because without this assistance product facing many problems in foreign market.
7. Critical Research & development program is most needed aspect for every industry to upgrade the quality of sports product & services and to meet the changing nee
ds of market.
8. The full use of technology by the industry makes the innovative products.
9. Awards can be given to companies for innovative, creative productive and services.
10. The issues of protection of intellectual rights should addressed by government timely to improve the quality of product.

5) Revival of Traditional Sports and Regional Games: -

Major Steps Taken Towards Globalisation of Traditional Sports International Recognition

- The first stone of the process, the Declaration of Punta del Este (MINEPS III) aimed at promoting the safeguarding and development of TSG through the elaboration of a worldwide list of traditional games and sports and governmental support.

Draft International Legal Framework

- A draft Charter of Traditional Games and Sports was elaborated and followed by Resolution 21 on the desirability and scope of an international charter on traditional games and sports (General conference of UNESCO, 2005).

Knowledge Sharing and Research

- Published in 2003, the World Sports Encyclopaedia, by far exceeded the ambition of enlisting all TSG. Meanwhile, the Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage was adopted by the General Conference of UNESCO.

Project of International Network

- Convened by UNESCO (2006, Paris) a Collective Consultation opened the door to the establishment of an International Platform envisaged as a formal umbrella organization specialized in TSG. A second one held in Tehran (2009) notably focused on the establishment of a UNESCO Advisory Committee entrusted of establishing the Platform.
- Rationalize local sports; when broadcasters show these sports worldwide. Example- Kabaddi, Judo, Marshal Arts, etc.
- Sports also provide us the way to compete our political, cultural and economic activities.
- Traditional Sports and Games (TSG) also enhance intercultural dialogue and peace, reinforce youth empowerment, and promote ethical sports practices.

6) Global Migration of Sports Labour: -

- Sport migration is also a product of globalisation characterized by increased interconnectedness between territories due to advancements in the means of transportation and communication. The patterns and motives sport labour migration in three sectors: professional football, elite sport development, and sport TV broadcasting. Ex- UAE cricket broad contract with Pakistan and Indian born players to their national side.

- Historically the growth of globalization was mainly led by the technological forces in the field of transport and communication. In last two decades the process of globalization has proceeded with greater vigour. More and more developing countries are turning towards an outward oriented policy of growth. The rapid development of the capital market has been one of the important features of the current process of globalization. There are many negative and positive effects of globalization in every field. Globalization significantly modifies the sovereignty of countries where countries now have to compose with forces whose impact is beyond their national limits

7) Sports Tourism: -

- *Sports tourism is the act of travelling from one locality to another, with the intention of being in some way involved with a sporting activity or event.*
- *In fact, there are four main types of Sports tourism: -*
- *Sport Event Tourism*
- *Active Sport Tourism*
- *Nostalgia Sport Tourism*
- *Passive Sport Tourism*
- *Hard and soft sport tourism*
- The "hard" definition of sport tourism refers to the quantity of people participating at a competitive sport event. Normally these kinds of events are the motivation that attract visitors to the events. Olympic Games, FIFA World Cup, F1 Grand Prix and regional events such as NASCAR Sprint Cup Series could be described as hard sports tourism.
- The "soft" definition of sport tourism is when the tourist travels to participate in recreational sporting, or signing up for leisure interests. Hiking, skiing, running and canoeing can be described as soft sports tourism. Perhaps the most common form of soft sports tourism involves golf in regards to destinations in Europe and the United States. A large number of people are interested in playing some of the world's greatest and highest

ranked courses, and take great pride in checking those destinations off of their list of places to visit.

- *Sporting event tourism*
- *Sports event tourism* refers to the visitors who visit a city to watch events. The two events that attract the most tourists worldwide are the Olympics and the FIFA World Cup. These events held once every four years, in a different city in the world. Sport tourism in the United States is more focused on events that happen annually. The major event for the National Football League is the Super Bowl, held at the end of the year in different city every year. Even though the National Hockey League started the annual NHL Winter Classic game in 2008, the 2014 New Year's outdoor hockey game rivalled the Stanley Cup Tournament in popularity and "revitalized the NHL".[7] As of 2015, the newest trend in college basketball was to start the season off with annual tournaments such as the Maui Invitational held in Hawaii, and the Battle for Atlantis which is played in the Bahamas. This idea of pairing quality sports events with the Bahamas attractions raised the island's profile and brought in more visitors and dollars to the country. The Battle for Atlantis brought more than 5,000 fans in during Thanksgiving week for the three-day tournament. The event helped to increase hotel capacity from what is typically around 60 percent this time of year to 90 percent. Sport tourism "is a growing market and many different cities and countries want to be involved.
- *Celebrity and nostalgia sport tourism*
- *Celebrity and nostalgia sport tourism* involves visits to the sports halls of fame and venue and meeting sports personalities in a vacation basis.
- *Active sport tourism*
- *Active sport tourism* refers to those who participate in the sports or sport events. Rugby football, football, basketball, etc are considered active sports and many sport events (which we call

tournaments or festivals) are organized each year in most of the countries in the world.

8) Providing employment opportunities: -

Substantial evidence has demonstrated the role of sports in boosting a country's economic prosperity is the creation of job opportunities. A prominent example is the Indian Premier League (IPL) – the biggest cricket league globally – which has played a significant role in generating jobs for people on an enormous scale. Other major sports such as football, hockey, tennis, basketball, and kabaddi, alongside their notable leagues, have also generated various employment opportunities. In reality, the Indian sports business offers a diverse range of work opportunities in several fields, including sales, transportation, marketing, media, and finances. Players and coaches are not the only beneficiaries of the industry; instead, there is a wide range of occupational prospects. Hence, the sports industry efficiently contributes to India's economic growth by reducing unemployment.

9) Sports and Particular Identity: -

- Athletic identity is a part of self-identity and can be defined as the level, to which one identifies with the role of an athlete
- By participating in a sport, an individual is making a social statement about who they are and how they want others think of them. An athletic identity is developed through acquisition of skills, confidence, and social interaction during sport. It plays a part in a cognitive and social role.

Benefits

- Salient Self-Identity: Having a strong athletic identity often leads to a strong sense of self and sureness of who you are.
- Self-Confidence: Increased self-confidence, self-discipline, and more positive social interactions have all been observed in those with high athletic identity compared to
  those with a low athletic identity.
- Health and Fitness: Individuals who highly value the athletic component of the self are more likely to engage in exercise behaviour than those who place less value on the athletic component of self-identity (Brewer et al., 1993). Fox and Corbin

(1986) found the perceived importance of physical abilities to strongly predict involvement in physical activity.

- *Enhances Performance*: Some research has indicated that a strong athletic identity can result in a positive effect on performance, but this is still a debated topic and more research needs to be conducted before any concrete conclusions are drawn.

Potential Risks

- *Emotional Difficulties Dealing with Injury:* Injuries are an inevitable part of sport. Athletes with a robust athletic identity often find it difficult to cope with an injury, especially if it results in them being side-lined for a prolonged period of time. They tend to lose confidence and may experience feelings of helplessness.
- *Difficulty Adjusting After End of Athletic Career:* Retirement is also something that cannot be escaped by any athlete, and it can be difficult to adjust to a life without their sport because they lack other sources of self-worth. This is especially true in sports like gymnastics where girls peak at such a young age (16-20). Kerr & Dacyshyn (2000) found that female gymnasts transitioning out of the sport experience feelings of disorientation, void, and frustration.
- *Alternate Career or Educational Options Not Considered:* This can be a problem for young athletes who do not make it to a professional status or for those who experience career-ending injuries.
- Nations and individuals present themselves, the character of their nations identity with the courtesy of their achievements.

10) Economic Benefits: -

- The relationship between sports and the economy dates back to the first antique Olympics when athletes were compensated in either goods or species.
- Commoditized market place for players and teams for TV coverage. Ex- players drafting in PSL, BPL. Countries spend billions of dollars to revive their sports activities and compete the world at global level. In sports, many countries of the European

continents have taken high opportunities to utilize such chances. Numerous clubs from these European states do acquire players from countries within and even outsides their surroundings. There are thousands of players from the African and Asian continent who play professionally in those clubs of Europe. This has made many European cities and countries develop as centres of sports. With such development, many people from all over do visit such places for recreation and refreshment which contributes to the economic development of the country. Thus for Europeans the globalization of sports has benefits on the growth of the economy through the gains of foreign exchanges.

The European Commission released its second study on the Economic impact of sport through sport satellite accounts. The study aims at assessing the sport sector's macroeconomic importance in the EU, in particular its growth and employment potential. It demonstrates the fast-growing importance of sport sector in national economies. The analysis uses 2012 data and updates the original study published in 2012 which was based on 2005 data. The study can serve as a basis for sport organisations to showcase the benefits of investing money in the sport sector, including towards public authorities.

According to the conclusions of the study, the share of sport-related Gross Domestic Product within the EU is 2.12 % and amounts to € 279.7 bn. Furthermore, the share of sport-related employment amounts to 2.72 % of total EU employment, equivalent to 5,666,195 persons. Despite the economic and financial crisis between the two studies (data from 2005 and from 2012), the sport sector has continued to grow.

The researchers explain in the study that "Sport is an employment-intensive economic activity, therefore generating a greater sport share in employment than in GDP. In fact, an increase of GDP by 1 % goes hand in hand with an additional 1.35 % of employment". Furthermore, as regard to GDP, statistics show that education services and sport services (sport facility operations, sport clubs, fitness facilities, and other sport services) are the two main sport-related GDP contributors, respectively 0.39 % (€ 51,237million) and 0.33 % (€ 43,075 million) of

the EU's GDP. Countries which economically benefit the most from sport are Austria, Germany, Poland and France.

The third part of the study analyses the economic effects and characteristics of sport in each EU Member State. Those data can be used by national sport organisations to stress the importance of sport in each country providing reliable figures on sport and sport industry's contribution for example to employment and GDP.

More general comments are also made on the technical support to Belgium in their effort to create Sport Satellite Accounts (SSA) and recommendations towards a European SSA are also included.

The EOC EU Office considers the study as very useful and hopes that sport organisations will make great use of it along their discussions with public authorities to advocate for the added value of funding the sport sector. The timing of this publication seems ideal, just before the negotiations between the EU institutions on the Multiannual Financial Framework 2021-2027, which should include sport in several funding programmes.

Globalization involved working together with people from different parts of the world. The world today is full of politics. The American has for long times remains these centred of politician's experts. Many people politically enable areas on trembling grounds. The sensitivity of people from other countries who come to the American states faces many political blocks. These Americans political being very much centred their safety, politician's haves raised many constitutional requirements which are imposed by the laws of the states. This is to maintain the states in these safes' parts of the world. Thus consideration, these levels of the benefits from sporting activities and the damages which can be brought, the Americans have invented the ways to control such invasion of players to these states. Further, the globalization of sports issues has been affected by these politicians in these area campaigns for powers as well as tour the benefits of American citizens.

Conclusion: -

- The rapid changes in technology and logistics combined with the developing globalization, certainly affects the sports. These shifts have generated, on the one hand, transformations in the sense of

assuring the necessary financing sources for the organization and development of the great competitions through the delineation of obvious actions of improvement and increased efficiency in the funds management, assured by a much more professional approach. The possibility to organize the great sports events on all the continents of the world.

References:-

1. *"What's a Running Tour? Frequently Asked Questions | 360RunningBarcelona". 360runningbarcelona.com. Retrieved 2018-02-19.*
2. ^ Jump up to:[a] [b] *Weiler, Betty; Hall, Colin Michael, eds. (1992). Adventure, Sport and Health Tourism. Special Interest Tourism. London: John Wiley & Sons Ltd. pp. 141–58. ISBN 978-0471947868. Retrieved 2015-01-08.*
3. *^ "10 best bucket-list sporting events". USA TODAY. Retrieved 2015-12-01.*
4. *^ Hightower, Kyle; 28, Associated Press-Nov; Pm, 2015 2:18 (28 November 2015). "Bahamas Finds Success Creating a Sports Tourism Event". Skift. Retrieved 2015-12-01*
5. "What are the conditions required for a sport to be recognised by the IOC?". *International Olympic Committee*. International Olympic Committee. Retrieved 11 January 2023
6. Wikipedia.org
7. https://believeperform.com/athletic-identity/
8. Jultagi, tightrope walking (Republic of Korea; inscribed on Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2011)
9. Taekkyeon, a traditional Korean martial art (Republic of Korea; inscribed on Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2011
10. Slideshare.nets
11. https://www.bbc.co.uk › bitesize › guides › revision

The Newness of the New Social Movement

Upasana Roy Barman
Assistant Professor, Department of Political Science,
Serampore Girls' College

Abstract : Social Movemnets has always been one of the vital platform for the recognition of any voice which demands an Identity to its claim. In respect to the changing social structure the nature of the Social Movemnet has also changed from economic to cultural aspect. By mid 1960s and 1970s a plethora of social movements with new claims come to pass in the world politics. This movements named as New Social Movemnet with the New middle class as its flagbearer- underlining the aspect of Social Change.

This article is an attempt to under the newness of the New Social Movemnet. First a small discussion on the identity of New Social Movemnet. Secondly, the quandary regarding the newness of the new social movement. Thirdly a brief summarization of whole understanding of New Social Movemnet.

Keyword: New Social Movemnet, Colonization, Public life and Cultural shift.

Introduction:

In 1959 a book named- "The Presentation of Self in Everyday Life" written by famous sociologist Erving Goffman breathed a new life to the famous metaphor " All the World is a Stage" . Goffman analysis is illuminated through the ambience of a theater. A theater has two regions- one front stage and another the back stage. In a play the front stage acts as the platform where the actor tries to create a reality, an impression for the audience to consider, while in the back stage a performer prepare him/ her for the role to play in their original form. As Goffman states "The self…is not an organic thing that has a specific location, whose fundamental fate is to be born, to mature and die; it is a dramatic effect arising diffusely from a scene that is presented" (Cheng & Wagner, 2011, p. 1). The Self is an image casted by the social arrangement of the time.

What is New Social Movemnet- The mid 1960s and 1970s " mirror the rapid economic expansion and the redistributive policies of the welfare state which secured a level of prosperity capable of satisfying basic human needs. But the delivery of economic security itself brought problem with it. The morass of bureaucracies and formal organizations designed to implement the welfare state and maintain economic growth began to 'expropriate the capacities of societal actor to organize their own spheres of social production autonomously'. In other word the state control reached beyond the productive sphere, into the areas of consumption, services and social relation" (Paul, Ernst & Kier , 1990,p. 446). In the backdrop of such colonization of identity- New Social Movement- arose as a voice of resistance. Jurgen Habermas described this phase as 'Colonization of the Life' . Under the ages Of Capitalism, individual loses the it own sphere and the intrusion of the state is seen forth as an actuality of life- Who I am. As Habermas stated "… New Social Movement are less about material reproduction and more about cultural reproduction, social integration and socialization" . (Buechler, 2011, p.185)

As Melucci explained " The movements are triggered by new sites of conflict that are interwoven with everyday life; the conflict itself involves symbolic codes, identity claims and personal claims. The new social movements mirror the peculiarity of the modern form of power that resides behind the rationality of administrative procedures" (Buechler, 1995,p. 446). New Social Movemnet arose against the backdrop of the post industrial society – with a shift in the identity of Social Movemnet from economic resource to cultural production.

The Quandary regarding the Newness of The New Social Movement- All characters of the New Social Movement are not something that was produced. But it was separated, expounded and was given a new facet in the New Social Movement.

1- **The Old boundary between Private and Public life**- New Social Movement crosses over to those areas which were often shunned behind the veil of private affair are now making their mark as an issue capable of mobilizing collective action. Wife battering by the husband was considered a matter of private

affair since the sexuality of a wife was the property of her husband. But new social movement has contested such patriarchal understanding. They have stated that Wife battering is not a private affair, rather it is a crime not only on the victim, but also on the 'right to life' of each woman in the society. It provided the platform of creating a new identity, new resistance, new values and independent from casing of society. The aspect of self autonomy and self determination claims more value than maximization of power over the identity of being.

2- **Subject position**- Moufee main thesis lies with the understanding that human being are not subjected to the participation in a single identity and identity is not a homogenous factor. Each individual has multiple subject position which corresponding to different social relation an individual is inserted to. It is not similar to the communitarian perspective of identity that determines everything. The subjective position of an individual can never be finally fixed; it is provisional and often precariously constituted at the intersection or nodal point of various discourses.

New Social Movement creates the platform which represents the multiplicity of subject position of a single agent. It stood against the homogenization of identity and gave a call for automatization of various subject positions of an individual. In the environmental struggle the focus not only lies with the protection of bio- diversity. But also a movement against ethnic, racial, political and economic discrimination of an idenitity – or a fight for politics of recognition. Moufee explained that the whole process of massification of social life by the media in the post industrial world aimed at creating a homogeneous way of life. The multiplication of subject position is to reaffirm the right to be differentiated in the society. New Social Movement has shattered the closed and the homogeneous idea of politics.

3- **Class identification**- The aspect of class in the New Social Movement " … from an economic outlook, the class composition of a New Middle Class reflects the changing class stratification of the Western Society in the post- industrial world where the

tertiary services and self- employment made a head way. As Andre G Frank placed in his article- that the grievances about ecology, peace, women's right, community organization and identity, seems to be felt and related to demands for justice predominantly among the middle class in the West ". (Frank & Fuentes, 1987, p. 1507).

" But the character of New Social Movement in the Third World is different. The base of the movement is predominantly the working class because of much deprivation, injustice which falls on them due to the world economic crisis. The movements fostered by them reflect their struggle for the survival of their identity, self- empowerment and their rights of equality". (Chakraborty, 2014, p. 146-147).

" But even in Third World Countries , New Social Movemnet do reflect a middle class base both in its composition, value and, demands . The student movement called Nav Nirman saw increased participation of middle class, women and the influence of a very famous person J.P Narayan. The spirit of the movement rocked Gujarat, leading to riot, police oppression and dissolution of Gujarat Assembly. The movement led to another movement in Bihar and finally leading to the macabre of Emergency rule by Mrs Indira Gandhi. So the New Social Movement of the Third World does reflect a middle class base in their leadership and composition who offer their services as leader, adviser in the social movement … only because they get organically allied with the common people in their ideological leanings and practical actions". (Martin, 2015, p. 67-70).

Despite stating that it is also necessary to say that Class cannot provide sufficient ground for understanding the rise and fall of a social movement, but it do have an effect on collective action and it is a social construction. Touraine view social conflict is inseparable from cultural orientation. But more adherence to identity can narrow down the movement and remove its essence. The " New Social Movement' theory stands in oppose to the 'New Class' theory by placing the argument that New Social Movement … as responses to new development in the organization of capitalism rather than political expressions of existing middle class interests…. " (Fred, 1997,p. 467-469).

"Every movement reflects the class background of the participant who voices out their demand even if those demands are not aligned along class lineage. The Class factor cannot define the content of the individual interest because such action will narrow down a Social Movement, thereby affecting its appeal to wider mass, its preponderance and its recognition as a platform to voice out the demand of the victimized individuals. The Class can define the form of a Social Movement but not the content of individual interest". (Fred, 1997, p. 481).

The Middle Class section of the society is itself a heterogeneous segment and New Social Movement challenges some of the tenets of middle – class society and is not always a simple extension of middle class power. The history of struggle for the Democratization of South Korea in 1960 . The movement and the rise of civil society was primarily an effort of the working class, intellectuals, students, Christian organization and women. Rather being known as a predominant work of the Middle Class section of South Korean Society.

The participation of a large number of white – collar workers and other middle class in the massive uprising in June 1987 demonstrated the role of the new middle class in the democratic movement. The role of the middle class in the democratic struggle "… varied through different phases of the political transition and among different segments of the middle class. The working class was mobilized for economic democracy …. But the segment of the middle class was deeply interested in transforming the society, not just the polity, so as to obtain social democracy in the workplace and in all arenas of social life. Thirdly, each phase of the movement varied with a particular segment of the middle class . The role of the middle class was complex and variable because of the heterogeneity that existed within the class and the altering representation of various segments of the middle class in different phase of the democratic movement in South Korea" (Luigi, 2002, n.d). " Social Movement reflects the Social Conflict rather than binding itself to reflect the Class structure of a Society…. While analyzing the Social Movements of Latin America Escobar rightly stated- the mosaic form, of collective actions is so diverse that one even doubt whether a single label can encompass them all " (Foweraker, 1995, p. 38-39).

4- **Area of Contestation** - Capitalism reflected the commodification of virtually all spheres of life. The culture of Late Capitalism creates the identity, sense, class, gender and position of the subject in the dominant discourse. The discourse of consumption takes the central ideological position in capital accumulation and social regulation. As Computer based technology replaces the mass of physical labour once required for production, the critical requirement to continuously expand commodity consumption in order to maintain demand worldwide takes on a new urgency. At the same time the type of commodity consumes also changes whereby consumer society defines who we are.

The new forces of subordination arose in Late Capitalism where we witnessed commodification of social life, homogenization of the variety of social life and expansion of capitalist relation into the very realm of social life. The state was no longer the object of attraction of the movement. Rather the focus area shifted to new areas of politics, finding out an alternative of the generalized belief, values, culture and understanding of late capitalism and expansion of social space thereby bringing cultural issues within its framework.

"Herbert Marcuse and Jurgen Habermas departed from the vision of bourgeois cultural domination of the proletariat. For them both classes and class consciousness have become fragmented and diffused in late capitalism. For Tourine the main threat to Social Movement is the egoism of Utilitarianism consumer society. New Social Movement fights a society where utilitarianism is the dominant cultural pattern and the new 'opium of the people". (Uden, 1996, p. 321-323). For Example the 1st Wave of anti-psychiatry movement of the 1960s challenged the way in which psychiatry defined certain problem as 'mental illness'. The Anti-psychiatry activist establishes their own self- help group whereby it counters the dominant understanding of the Psychiatry itself. New Social Movement provides the platform for the creation of the autonomous identity or the right to be ourselves visa-a- via the structure, authority and the power

5-**Methods and its upshot**- Out of much stated Indian Freedom Movement leader- Gandhi stood out of the lot as an independent mass leader of its own country. His idea of Satyagraha not only provided a new dimension to the Indian Freedom Movement. Satyagraha was not merely a concept of Gandhi, but it was a method and a technique , to crumble the effigy of the state structure and to navigate a movement towards the path of justice ,truth and independence.

Every Movement has its own technique for publicizing its own necessity, demands and its impetus to create a new time and platform for themselves. In case of New Social Movement, Mass Media surfaced itself as an important mechanism for enlarging the public sphere and also reflecting the malicious Power Politics which in effect is creating another arena of Counter Public Sphere within the society.

The very act of Social Movement is not an individual affair, rather the core understanding of Social Movement lies with the idea of the Collectivity. Charles Tilly stated that individual identification with the Movement is a precondition for the formation of collectivity in a Movement. Gramson stated that movements can reach the audience *via* the mass media, where it creates a common understanding and knowledge that can be used by social movements to mobilize. Media creates a discourse and provides a Frame for understanding a Movement and to configure its contours in accordance with the flow of the media. Media not only act as a medium to disseminate information to the mass in order to create the platform of collectivity. But rather it acts as a podium where Power is formulated through communicative action. Castell has stated that through horizontal and interactive form of communication a change from mass individual to mass consumption, which thereby creates a new public space for deliberation and debates within the society. The Egyptian Revolution of 2011 uncoverd the role of media in creating a democratic counter discourse which led to the rattling down of the kakistocracy of Hossain Mubarak regime in Egypt. Jenkins used the term 'civic media' which stated that face- to – face engagement through electronic medium creates a participatory culture which have a spillover effect in creating the collectivity within the movement. Media

and technology did exist in earlier movement, but its boundary was substantially limited and the form was primarily restricted within a definite frame and targeting a definite class of audience. In today's world media has espoused its wing and have gulp, almost every section of society on an international level.

What we conclude from the discussion above is the fact that the Newness of New Social Movemnet wouldn't have surfaced itself if each and every character would not have acted as a single feather in the crown. The pertinent question lies with the fact that New Social Movement has acted as a platform to voice out the issues, which were eschewed by the Society as personal and private affairs of life. **"People are not sitting down, people are taking action. And women are at the forefront of these actions."** Joan Carling, Indigenous human rights activist andenvironmentalist

References:-

1- La, Cheng., & Wagner, Anne. (Eds). (2011). *Exploring Courtroom Discourse: The Language of Power and Control*. London: Routledge

2- Paul, Anieri. D., Ernst, Claire., & Kier, Elizabeth. (1990, June 4) .New Social Movement in Historical Perspective. *Comparative Politics, 22* (4), 445—4458 (Buechler, Steven. M. (2011) *Understanding Social Movements: Theories from the Classical Era to the Present. London:* Routledge

3- Buechler, Steven. M. (1995, Summer). New Social Movement Theories, *The Sociological Quarterly, 36*(3). http://walidmusthafa.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/356/2020/10/New-Social-Movement-Theories.pdf

4- Buechler, Steven. M. (1995, Summer). New Social Movement Theories, *The Sociological Quarterly, 36*(3). http://walidmusthafa.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/356/2020/10/New-Social-Movement-Theories.pdf

5- Frank, Andre. Gunder., & Fuentes, Marta. (1987, August 29). Nine Theses on Social Movement. *Economic and Political Weekly*, 22 (35).

6- Bidyut Chakraborty, Bidyut. (2014). *Communism in India, Events, Processes and Idelogy*. Oxford: Oxford Press University Press.

7- Martin, Greg. (2015). *Understanding Social Movement,* Routledge.

8- Fred Rose. (1997, September). Toward a Class- Cultural Theory of Social Movement : Reinterpreting New Social Movements. *Sociological Forum, 12* (3).

9- Fred Rose. (1997, September). Toward a Class- Cultural Theory of Social Movement : Reinterpreting New Social Movements. *Sociological Forum, 12* (3).

10- Luigi, tomba. Ed. (2002). East Asian Capitalism, Conflicts, Growth and Crisis. *China Perspective,* 51

11- Foweraker Joe. (1995). *Theorizing Social Movements, Critical Studies on Latin America.* London: Pluto Press.

12- Lass Uden. (1996). *The Limit of Public Choice: A Sociological Critiqur of the economic theory of politics,* London: Routledge

An Analysis of Relationship Between the Mughal Dynasty and the Malla Kingdom of Bishnupur

Amrita Karmakar
Research Scholar, Department of History,
Jadavpur University

Abstract- The Malla kingdom which originally spreaded around the districts of Bankura with Bishnupur as its capital, grew into a powerful realm in the medieval period from the 16th C.E.onwards.It came in the forefront leaving behind all its surrounding bhum states because of certain reasons.But the main cause of this incident was because of its alliance with the Mughal empire.This article will explore the reasons and investigate the nature of the relationship between the two powers with the changing scenario.The study will also show the political and the cultural bonding as well as some identifiable disparities and problems between them with long term significance.
Keywords-Mallabhum, Alliance, Mughals, Bonding, Disparities.

Main Text -

Throughout the historical past,it is observed that the sustainability and growth of a kingdom not only relied on violent external warfares or aggressive military policies, but it also havelarge to do with maintaining cordial relationship with theneighbouring powers.The mutual respect policybetween the empires strongly helped the dynasties and even the local powers to save their realms by jointly fighting against the outside invaders.It also helped them to conduct their state policies efficiently and peacefully. In this aspect,it is perceived that the Bishnupur kingdom of the Rarh area of West Bengal in the 16th century became able to develop a very warm relationship with the powerful Mughal dynasty.This strong bond helped the Malla dynasty to evolve suppressing the other bhum chiefdoms in their locality.This article will attempt to demonstrate under what circumstances did one pleasurable association grew between such a mighty empire and a mere local power.This study will also show how and in what ways did this relationship helped the Malla dynasty to become a strong power of their time.It will also reveal how political situationsarose

and transformedbetween the Mallas andthe Mughal emperors and how cultural assimiliation took place in the kingdom of Malla dynasty which is still prevalent in the fields of art,culture,festival and society of Bishnupur.

To begin with,it can be said that the Mughal empire rose as a supreme power in the Indian subcontinent from the 16th century onwards with the rise of Akbar as the reigning monarch.Similarly in Bengal,the Mughals established their swaydominantly.From the very early 8th centuryonwards,it was noticed that the gangetic delta of Bengal was ruled by self-governing and autonomous territories as there was no permanent ruling power.The area of Malla dynasty or famously called Mallabhum actually covered the whole of the district of Bankura and parts of Purulia,Midnapur and Burdwan district of Bengal.It actually originated as a chiefdomfrom this time.As no proper historical data is available to know the origin of the Malladynasty,chronicles regarding the Malla rule are only left as a choice to study as data of early history of Mallatimes.The chronicles mostly claim that Raghunath Singh was the originator of the Malla dynasty.For long his kingdom passed under the name of Mallabhumi,then as the Jungle Mahals(forest country).[1] He was known as Adi Malla who derived his origin from the kings of Jainagar near Brindaban.[2]Adi Malla's descendants had remained engaged in warfare with the neighbouringchieftains and had in many cases annexed their territories.[3] His son Jay Malla succeeded the throne of Mallas and made Bishnupur their official capital.After him several Mala kings ruled their realm and in a small way began to inscrease the glory of the dynasty.However,the earliest historical reference to the Mallas found in the late 16th century text Akbarnama,indicates theMalla Raja as a powerful prince.[4] On this note,therule of the 49thruler of Mallabhum, Bir Hambir (1591-1616 A.D.) wasutmostsignificant.He was the ruler who became able to develop a friendly relationship with the Mughals.He was a contemporary of the Mughal emperor Akbar.[5]

Before some time of the accession of Bir Hambir to the throne of Bishnupur in 1582 A.D,one Afghan leader named Kutlu Khan Lohani from North Orissa established their power over Mednipur and Bishnupur.[6] But the Mughals at that time under the order of Akbar arrived

to drive out the Afghans and to establish their hegemony over there.Kutlu Khan initially seemed more powerful as he brought a lot of soldiers at Raipur fort near Bishnupur.Man Singh at the instruction of Akbar sent a lot of soldiers and his son Jagat Singh to tackle the situation.But being confused in those forest areas,Jagat Singh could not handle the attacks of the Afghans.Being overconfident,he did not care to take the Afghan soldiers seriously and got drunk at the middle of the night.[7] The Afghan soldiers thus attacked their camps and Jagat Singh got severely wounded.Bir Hambir got little confused as to whom should he support as any wrong step would have destroyed his realm.But he choose humanity over politics, and took every possible care of Jagat Singh to make him alright.BirHambir also took every initiative to sent Jagat Singh to Delhi safely.

This incident changed the whole structure of the Malla kingdom and helped it to get converted from a mere chiefdom to a powerful kingdom.TheMallas came in the goodwill of the Mughal dynasty.The Mughals gifted the Mallas with 12 zamindaris and 29 forts.[8] Among these 12 zamindaris Tamluk, Mahisadal, Bamanbhum, Raipur and Manbhum (today's Purulia and Dhanbad district), these 5 zamindaris were under the control of the zamindars which were looked after by Bir Hambir. Other 7 zamindaris were directly controlled by the king, who became the lord of the whole Mandaran and Jaleswar government.[9]Thereforeowing to the extension of their kingdom, the resources of the Malla kings began to expand.It made them poles apart from the other Bhum states like Singbhum,Manbhumetc in terms of wealth and power. To make their domain stronger, they also then initiated to implement the strategy of redistributing the concentrated surplus and thus turn out to becapable to build many temples.

Though after the arrival of the Mughals to Mallabhum,the Bishnupur kings became semi autonomous and not completely independent.Bir Hambir had to give tax to the Mughal dynasty for accepting and obeying their dominance.But due to the development of a friendly alliance,the Mallas could pay the taxes according to their own wish.[10]Thus they could avoid the levies when there was severe drought in those dry areas.

PICTURE : TheMalla Kings acknowledging the Suzerainty of the Mughal Emperors

SOURCE - Photo taken by the Author from Jor Bangla Temple

After the death of Akbar,some differences in the nature of relationship took place between the Malla kings and the Mughal rulers.For example during the time of the Mughal emperor Jahangir,Islam Khan became the Bengal *Subahdar*.At that time,the friendly relationship deteriorated because Bir Hambirsuddenly could not pay taxes.This incident was not tolerated by Islam Khan as paying no tax was considered a crime for him.[11]So he sent expeditions to capture not only the Bishnupur king Bir Hambir, but also his neighbouring zamindars called Samas Khan and Selim Khan.[12] But there also Bir Hambir very tactically accepted their demands unlike the others.He even helped the Mughals against zamindar Samas Khan.[13]He also gave Peshkash to the Bengal *subahdar*.Being satisfied with his conducts,BirHambir was also returned with his kingdom.[14]But the author Sri Rathindramohan Chowdhury has raised concern as what made the Malla king Bir Hambir surrender unconditionally to the Bengal *Subahdar* as he had even armies as well as canons.It is known from the survey of Reneleythat the area of Malla dynasty was 1256 sq.mile.[15] In 1582 C.E.,Todarmal divided Bengal into 19 sarkars ,among which one was named as Mandaran sarkar.[16] This Mandaran sarkar constituted Bishnupur.After the death of Bir Hambir,Raghunath Singha became the next successor of the Malladynasty.At his time the Mughal emperor Shah Jahan came in the forefront and Shah Shuja was the then Bengal *Subahdar*.He started the Sarkar Peshkash and included Bishnupur kingdom within it in 1658 C.E.[17]

The Malla kingdom maintained their individuality and thus it is evident,that in 1720 C.E.,under Murshid Qulikhan,theMallaswere the

only independent one among the 25 zamindaris.These zamindaris were divided into 2 divisions,among which the Malla dynasty belonged to the first division.[18] Murshid Quli Khan even reduced the number of zamindaris,but he allowed to keep the sovereignty of the Mallarulers.Among these zamindaris,most of them often not used to pay taxes and Murshid Quli Khan as a punishment,used to put them in prison.But he always took a different attitude towards the Malla rulers as they previously had a very cordial relationship with the Mughals.Repeated chances were probably also given to the Mallas, as Murshid Quli Khan knew that Mallabhum is a land covered with jungles and arid uplands.If somehow he had to send armed forces against thekingdom,it would be very difficult for him to be successful.

Later during the reign of the Malla king Gopal Singha (1720-1748 C.E) ,the whole resource of the Malla kingdom was calculated and Murshid Quli fixed the zamindari at 129803 sikka rupees.[19] In 1740 C.E., one expedition was sent to the Malla kingdom from AlivardiKhan.But at his time also, the Malla ruler successfully defeated the opponents.During the Maratha raids,Bishnupur happened to be one of the frontier principalities between Bengal and Orissa.[20]All the zamindars were requested to support the Nawabs.Gopal Singha sent his most efficient cavalry to help the Nawabs against the Marathas.Because of this help,later the Nawabs reduced their taxes from 129803 rupees to 111803 rupees.[21] But as a harsh consequence to support the Nawabs,the Marathas got much angry with the Mallas.They as a result burnt all the houses and the agricultural products and tortured the common people.In 1757 C.E,during the time of Siraj-ud-daulah,conflict arose between Damodar Singha and Chaitanya Singha of the Malladynasty.After Mir Jafar became the nawab,Damodar Singha craved for his help and thus he was helped with a lot of soldiers against Chaitanya Singha.Thus Damodar Singh became victorious and acquired the throne.But soon the British power conquered this realm.

It is a well known fact that the Malla kings erected many lavish decorated terracotta temples in Bishnupur and Bankura from the 16th century onwards.As mentioned earlier,theeconomical cost for building these magnificientstuctures were certainly backed up by the

Mughals.Thus as a reciprocal gesture,the effect of the Mughal influence can be seen in most of the temples.Forexample,in Shyam Rai temple or the Jor Bangla temple of Bishnupur,the images of the Mughal emperors are evident.Apart from this,the society as well as the culture got influenced and assimilated with the Mughals.Thus the famous Jahangiri cap and various type of Mughal dresses which were famous in Delhi also began to get famous in the Malladynasty.The people of Mallabhum saw the spread of one renowned card named the *DasavatarTas.*Though this card playing method was undoubtedly embraced from the Mughals,it became most renowed among the kings of Bishnupur.Thekalki avatar of the *Dasavatar* cards bear the image of the Mughal Barpurush.Another type of cards which was also adopted by the Mallas was called the *Naksha Tas* which contained the image of the elephant riders.Different type of other amusements of the Mughals like hunting of wild animals were also adopted by the Mallakings.These hunting habits were also developed as a result of the interaction from the Mughals.[22]

Observations

Thus this article showed how political upheavals and cultural alliances with the Mughal dynasty helped Mallabhum to rise above its neighbouringchiefdoms.The consequences of the relationship between the Mallas and the Mughals were also discussed thoroughout the study.The ways by which the Malla kings displayed their power infront of other Bhum states arerevealed.Thus by these actions,the Malla monarchs proved to the rest of the areas that they were the legitimate kings of that domain with the consent and support of the Mughals. The social, political existence of the effects of the Mughal empire can be predictable from the imageries curved on the walls of the temple which are still prevalent in Bishnupur.Even, today also the faujdar family of Bishnupur Shakari market produce and sell the *Dasavatar* cards. Apart from these,various cultural integrations with the Mughals took place which is even now present in the land of Bishnupur.

REFERENCES

1. W.W. Hunter,*A Statistical Account of Bengal*, *Vol IV* reprint ed., Delhi: D.K. Publishing House, 1973, p 230.

2. *Ibid.*
3. Hites Ranjan Sanyal, Mallabhumin Surajit Sinha (ed),*Tribal Politics and State Systems in Pre colonial Eastern and North-Eastern India,*Calcutta :K P Bagchi & Co.,1987,p.80.
4. Abu-I-Fazal,*Akbarnama* vol III,Translated by H.BeveridgeCalcutta:The Asiatic Society,1939,p.879.
5. Hitesh Ranjan Sanyal,*op.cit,*p.72.
6. Rathindramohan Chowdhury,*BankurarajerItihasSanskriti,*Calcutta: Best Books, 2000, p.64.
7. *Ibid*,p.65.
8. Sanyasi Samanta,MallarajdhaniBishnupurerNotunOdhayeebong tar suchonarutsyaanusandhan in Jaladhar Haldar (ed),*Pratna Parikrama: Mallabhum, Vol.8* , Bishnupur: MallabhumKirtisala, 2014, p. 74.
9. Maniklal Singh,*Paschim Rarhtatha Bankura Sanskriti*,Bishnupur: Minerva press,1384 B.S, p.163.
10. Paschim RarhBibidha Prasanga, Bankura JelaParishad, Bankura: A.T. Press,1999,p.91.
11. *Ibid.*
12. *Ibid.*
13. *Ibid*,p.92.
14. *Ibid*,p.92.
15. Rathindramohan Chowdhury, *op.cit,*p.67.
16. Paschim RarhBibidhaPrasanga ,*op.cit,*p.92.
17. *Ibid.*
18. *Ibid.*
19. *Ibid*,p.93.
20. *Ibid.*
21. *Ibid.*
22. Chittaranjan Das, *BishnupurerMandir Terracotta,* Bishnupur: Minarva Press, p.92.

Anxious Academics : How Democracies and Governments are Re-defining and Re-describing Foundational Concepts and Historical Events?

Mrittika Nandy
Assistant Professor, Department of Political Science
Serampore Girls' College

Abstract: Democracy, a political system wherein citizens' voice, political parties' roles, rights, violations and government formation play a critical role. It also coincides with the famous quote of Abraham Lincoln 'of the people, by the people and for the people'. In the contemporary context, democracies are marking a shift from welfare to controlling the mindscape of citizens through knowledge systems, press, advertisements and other communicative mediums. The fourth estate of democracy, press devoid of elite influences is a point of appreciation and criticism for policy decisions has now become a powerful tool maneuvering the minds of electorates and rescript India's past, present and future. This also entails that the academic arena (humanities) which was once a solid foundation of politics, society and history is being reinterpreted from a monochromatic perspective. This particular paper intends to focus on how traditional democratic models as stated by Greek theorists, J S Mill, Joseph Schumpeter and others are in intensive care unit under the 'careful' lens of race, gender, religion, riots,demonstration and violation of rights. These instruments of change create a hedonistic idea about 'self' and 'other' and are imposed through academic circles justifying the narrative that Secularism, Communalism, Citizenship must be omitted.

Keywords: Academics, Citizens, Democracy, Government, Political Parties, Re-Interpretation

1. Introduction

One of the core concepts of political science is Democracy which one rudimentarily understands either through the famous quote of former President of United States of America as 'for the people, of the people and by the people' or else best practice to meet the demands of majority

thinly aligning with Bentham and Mill's idea of 'Maximum Happiness to Maximum People'. In other words the school projects and academic research on Democracy ranges from the Greek notion of demokratia, meaning demos (the many or the people) and kratos (power or rule) to debating the comparative nature of successful (or not so successful) ventures of democracy. School textbooks often suffix the images and quotes/snippets of Aristotle, Lincoln, Martin Luther King and historical acts as to how democracy was established through a prolonged struggle against colonial powers or corrupt monarchies. These historic events are cheerleaders of democracy but are also helping in construing an idea that debunking democracy will be detrimental for domestic and international politics per se. From decoding Aristoltelian logic on why Democracy is Mobocracy to understanding the merits of Democracy through the works of Mill, Schumpeter, Jefferson, Locke and Rousseau encouraged our Indian counterparts such as Gandhi, Nehru and Ambedkar for laying foundational stones for strengthening democratic structures and extending the notion to conceptional ideas of Secularism, Equality, Liberty, Justice and others. The theories on Democracy through historical acts such as Glorious Revolution (1688) American War of Independence (1776) and the French Revolution (1789) and modern acts of military coup or overthrowing of traditional monarchies in Africa and Asia through popular unrest or outbreak of civil wars in Libya, Egypt, Nepal, Myanmar, Pakistan, Maldives are establishing a much like similar democratic structures and processes to fulfill the demands of denizens and reinstate their fundamental rights. As a result, an amicable impression is created that democracy is not just the best but is here to stay!

In order to ensure that democracy is a successful working model the David Easton analysis of Political System 'a set of interaction as abstracted from the totality of the social behavior, through which values are authoritatively allocated for society'(Easton 1953). This scientific method of study deduced the state in terms of Input and Outputs otherwise known as Demands and Decisions that continuously changing the political system based on interests. The idea is further tweaked by adding theoretical perspective of Bentham's the felicific calculus

(calculating the amount of pleasure that a specific action is likely to induce). It was further researched by John Stuart Mill who structured idea of Utilitarianism as, 'Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure'(Mill 1863). This idea will be understood case by case from Indian political history in alignment with the classical theories of Democracy. Wherein how democratic implications have often undermined crucial events in history such as Emergency of 1975 followed up by Student Movements in India.

This particular paper intends to focus on how the traditional models and understanding of Democracy have taken a backseat and deletions of critical ideas Secularism, Communalism, Citizenship and inclusion of Golwalkar, Savarkar, Patel, Netaji creates a solid space for One Party System and their politics. This not only rewrites the academic space but in turn reconstructs historical facts, unleashes a new idea of politics and stiches anew social fabric of the society. And as a result,history continues to be reinterpreted with tactical questions posed on whether certain events had happened naturally or were constructed through artificial mechanisms. This question stood relevant with regard to construction of Ram Mandir in Ayodhya then to presence of *shivling* in Gyanvapi mosque now. As much as India's history is considered as vibrant element but in between the vibrancy are the dark times of hopelessness and grey areas which are now being explored and researched through particular vantage point.

1.2 Imposition of Nationwide Emergency in 1975

The year 1975 in the Indian political history is crucial as Indira Gandhi, the former Prime Minister of India imposed a nationwide Emergency; (Article 356)dodging the process of consultation with the cabinet as prescribed by the Indian Constitution. As long as the Congress party formed coalition governments in the Centre (often referred as Congress System by Rajni Kothari), the NCERT textbooks on political science and history for class XI and XII students were published with consequent editions printing a powerful image of Mrs Gandhi and promoting the idea

that imposition of emergency was not only rational act but also curb threats of on the pretext of an external aggression and internal threats. Moreover, chapter on Emergency also focused on consequences such as Sterilizations in Kashmere Gate areas of Delhi, violations of fundamental rights, house arrest of opposition leaders leading to many of them being behind the bars and others. Even, the question paper drafted questions asking students to share their views and perspectives on the imposition and implications of emergency. Although no questions were asked especially class 11th or 12th examinations regarding one's views on the very act of imposition of Emergency in India, even if it was a draconian measure. Such questions on prima facie level are open ended and students are free to respond based on capability of understanding but unfortunately the information at dispersal stitches a very positive picture of Mrs Gandhi's tactics and antics. Until the formation of National democratic Alliance under Prime Minister Narendra Modi, students were always tested based on role and functioning of Congress Party in Indian National Movement, Congress System, Nehru's Socialism, on the debacle of Janata Party and others. As a result, it creates a platform for the particular political party to not only grow but also create a rock-solid base of perennial electorates who will cast their vote to the Congress symbol.

This also marks a shift from the John Stuart Mill's notion on Democracy wherein free and open discussion will elevate individuals' character and political intelligence. This idea was further stretched in the writings of David Held and Macpherson when they argue that democracy provides an opportunity for moral, political, and intellectual development but creates a ground for political heroes and fanaticism too.

But with changing power conquests Bharatiya Janata Party (BJP) has not only controlled curriculums in educational institutions with an intent to revolutionize the academic system from the perspective of indianess (the ethnic philosophy of India). To the extent that important chapters such as Democracy, Citizenship, Secularism that feature western models and theory are being deleted as they are no longer fit Indian scheme of things. This poses a big problem when students enrolledin higher education find it difficult to understand concepts like State, Liberty, Equality, Rights, Democracy because the substructure is not

present and historical events are evaporated from the social space. The lack of knowledge on foundational concepts paints a negative picture of academic excellence and promotes dented growth leading to brain drain issue or relinquishment of citizenship (latest data shows more than 18 lakh Indians have given up their citizenship identities).

1.3 Dowry- an act hanging between legality and tradition

Dowry is a very significant act in Indian marriages. The Dowry Prohibition Act of 1961 was breakthrough legislation that enabled many married women to fight off dowry related abuse, threats and physical violations. Incidentally, dowry continues to remain a prime reason for suicides and deaths amongst Indian women. Helplines and Counsellors have been installed that can help in easing the stress and pain associated with Dowry. Even then the National Commission of Women (NCW) reports that more than 20 women died every day in 2021 because of Dowry (Gupta 2021). With reference to James Madison's and Jeremy Bentham idea of Democracy that it prevents dominance of any one group, it acts as a protective mechanism which shields citizens from arbitrary acts. However, the classification of citizen is not restricted to males only and their dominance in private and public spaces. Although, laws for women centric violence have been drafted but Democracy if at all is a protective mechanism has failed to provide safety nets to all those married women who are victims of patriarchal violence. In the loosely created social space, there is a conflux between the legislation in place and support for the Hindu texts such as Manusmriti with supporting arguments on Dowry and women as properties. The rational line of thinking is gradually delineating for further extrapolation.

It becomes very challenging to explain as to why Dowry is illegal when students from marginalized sections of society witnessing groom's family demanding and coercing the bride's father to pay a hefty amount in order to expediate the process of the union. In addition to this, there are serials such as *Balika Vadhu* and web series often portraying the custom of dowry without any uproar or resistance from audiences. This is a subtle plug in or an acceptance to an age-old custom that is legally irrelevant but continues to find relevance on celluloid.Although the concluding section of the episode shares epilogue that 'dowry is an evil

custom and we must stop it' – is just like paying a lip service to legislation. Because visibility has a greater impact as compared to the wisdom words flashing on the screen.

2. The Confluence of History and Politics creating a Fragile Social Spaces:

These historical events were crusader of political wave then and now. And often political campaigning is designated targeting particular events. Through a close observation of election campaigning (some of which have been recently concluded in Gujarat, Uttarakhand, Delhi-Municipal Elections and others) is reflective that aCongress party has directed its funds to Bharat Jodo Yatra, while BJP pitches strong arguments for religious and caste politics and launching a vile opinion on Congress and other opposition (regional) parties become a launch pad to be identified as national parties. The type of campaigning also changes from urban to rural and remote areas. There are leaders who base their political speeches on the basis of Hindu Scriptures, Texts and Vedas that continues to be an accepted norm in their daily lives. There are voters who still follow Hindu norms and customs religiously and often cast their vote accordingly. These scriptures and norms have supported the idea of dowry through the tradition of Kanyadaan- an act practiced by bride's father during the marriage ceremonies. Therefore, their knowledge on Indian politics is skewed and not in sync with recent political changes and storms. The political leaders pay a lip service to dowry issues in urban or metropolitan campaigning trails but in remote areas, their campaigning style in rural areas focus on *Roti, Kapda and Makan* (food, clothing and house) and community marriages. Especially with regard to community marriages, the act of Kanyadan is often performed by the politician in the pretext of garnering votes in upcoming elections.

3. Diluting the Rational Minds and Dependence on Social Media:

Social media is both critical and creative space depending upon and political/social alliances. Accounts on social media often circulate images from school textbooks highlighting the one-sided knowledge (academic) system in place, responses to social evils, discrimination, inequality, and others. Once a particular post becomes viral, one can notice vitality of an organic information creating two lines of arguments (for and against) and

that leads to assaulting and negatively dignifying a character based on his/her especially of rape victim and the assaulter. Moreover, one imagines that these accounts supporting derogatory comments and replies are either illiterate, fake accounts and have zilch knowledge on precarious issues. However, the cybercrime cell reports the rising number of fake accountsare posting frivolous messages and launching a severe hatred storm against a community. The very idea of posting frivolous messages is on the basis of revenue credited to per post; tweet, picture or a comment. Many political parties, gurus and ideological heads have created cyber armies that can express solidarity orsympathize with negative arguments. Moreover, social media has also become a platform for establishing credibility on any point or fact of the matter, even if the issue is irrelevant. For example, how Russian President Putin is tactfully using Social Media and Press to create impression upon his public that the outbreak of war on Ukraine was largely for peaceful purposes. Similarly, in India, the Gyanvapi mosque issue has picked up storm because there is a need to clear out the confusion if at all the shivling did exist or was miraculously created? As a result, these statements have the power to replace scientific and historical facts with subjective opinion without any logical basis.

4. Conclusion

Ralph Poulantzas asserted that 'education is a state apparatus' and education features in the concurrent list wherein both the Indian Parliament and State Legislature can legislate. A tool that is often twisted by the political parties for their own benefit and is often exploited to convert the minds of electorates in votes. This particular platform which many theorists considered to be used for enlightening the minds of denizens is often drugged to that extend; that they unable to decipher what is logical or illogical.

Academics is a platform that must be open to discussions, interpretation, and ideas, just like how in science experiments are proved or falsified in labs similarly, for social science- society is a lab for understanding foundational concepts. The knowledge already at disposal can be reformed but not edited, new ideas can be added making the academic space more democratic and vibrant in nature.

References:

Duncan, G. (1969). John Stuart Mill and Democracy. Politics, 4(1), 67-83.
Thompson, D. F. (2015). John Stuart Mill and representative government. In John Stuart Mill and Representative Government. Princeton University Press.
Mill, J. S. (1859). M. de Tocqueville on Democracy in America (Vol. 2). John W. Parker and son.
Ryan, A. (1972). Two concepts of politics and democracy: James and John Stuart Mill. New York.
Zakaras, A., &Urbinati, N. (2007). John Stuart Mill, individuality, and participatory democracy. JS Mill's political thought, 200-220.
Cuomo, M. C., & Holzer, H. (2004). Lincoln on democracy.
Medearis, J. (2013). Joseph Schumpeter's two theories of democracy. In Joseph Schumpeter's Two Theories of Democracy. Harvard University Press.
Yong, C. (2011). Does freedom of speech include hate speech?. Res Publica, 17(4), 385-403.
Tiwari, S., & Ghosh, G. (2014). Social media and freedom of speech and expression: Challenges before the Indian law. Available at SSRN 2892537.
Lunenburg, F. C. (2011). Do Constitutional Rights to Freedom of Speech, Press, and Assembly Extend to Students in School?. Focus on Colleges, Universities & Schools, 6, 1-5.
Jacobson, D. (2000). Mill on liberty, speech, and the free society. Philosophy & public affairs, 29(3), 276-309.
Dutt, V. P. (1976). The emergency in India: background and rationale. Asian Survey, 16(12), 1124-1138.
Frank, A. G. (1977). Emergence of permanent emergency in India. Economic and Political Weekly, 463-475.
Kaviraj, S. (1986). Indira Gandhi and Indian Politics. Economic and Political Weekly, 1697-1708.
Malik, Y. K., &Vajpeyi, D. K. (1988). India: the years of Indira Gandhi.
In India (pp. 1-6). Brill.
Chicago

Palshikar, S. (2015). The BJP and Hindu nationalism: Centrist politics and majoritarian impulses. South Asia: Journal of South Asian Studies, 38(4), 719-735.
Roy, S. (2014). Being the change: The AamAadmi Party and the politics of the extraordinary in Indian democracy. Economic and Political Weekly, 45-54.
Alemán, E., & Kim, Y. (2015). The democratizing effect of education. Research & Politics, 2(4), 2053168015613360.
Team, B. W. (2020, July 8). CBSE syllabus reduced: List of chapters deleted for classes 9 to 12. Business Standard India.
https://www.business-standard.com/article/education/cbse-syllabus-reduced-list-of-chapters-deleted-in-history-political-science-know-complete-revised-cbse-syllabus-for-class-9-10-11-12-120070800661_1.html
Beyond the rainbow: Reflections of a changing mindset. (n.d.). Financial Express. Retrieved December 22, 2022, from
https://www.financialexpress.com/entertainment/beyond-the-rainbow-reflections-of-a-changing-mindset/2541037/
Farber, D. (2000). Intellectuals and Democracy: Academics in Paradise/Emerson's Vocation. American Literary History, 12(4), 794-801.
Samuels, B. (2011). Facebook, Twitter, YouTube—and Democracy. Academe, 97(4), 32-34.
Williams, J. J., Nelson, C., Woessner, M., Siegel, D. J., Nuñez, A. M., Murakami-Ramalho, E., & Levin, J. S. (2012). Academic freedom and indentured students. Academe, 98(1), 10-15
Simpson, R. M. (2020). The relation between academic freedom and free speech. Ethics, 130(3), 287-319.
Taylor, M. (2014). Hindu activism and academic censorship in India. South Asia: Journal of South Asian Studies, 37(4), 717-725.

Flow of Blood : Analyzing the Ritual of Sacrifice from the Shakti Peethas of Rarh Bengal

Arijit Banerjee
Research Scholar, Department of History,
Capital University

Abstract : Rarh Bengal is one of India's most celebrated Shakti seat and area of Tantric worship. In Tantra philosophy, blood is considered a serious and important substance of Tantric rituals. This blood mainly comes from animal sacrifices. The process of animal sacrifice is very complicated in the Shakti Peethas. This paper mainly tries to explore the history and philosophy of animal sacrifice in Rarh Bengal since ancient times. It deals with the Bengali myths about sacrifices and their interpretations in philosophical and religious history. Sacrificial practices and the evolution of Tantric conduct in Rarh Bengal are the important subjects of study for researchers. This essay has tried to highlight those issues as well.

Keywords : Rarh Bengal, Shakti, Animal Sacrifice, Tantra, Blood Offering

Rarh Bengal is the home of a number of Shakti Peethas. These peethas are the abode of Adi Shakti (Mother Goddess) and mainly worshipped by the Shakta sect. Shakti goddess is often described as the 'creative force' and the genesis of the material universe and the consort of Shiva in Shakta Tantra. From the time immemorial the Shakti sites of Rarh Bengal harboured various rituals and worship practices of Tantric Hindu tradition.[1] Animal sacrifice or offering of animal blood is one of the rubrics customary in these sites. In general, sacrificial offerings are textually prescribed and a mandatory ritual followed during the worship of Shakti goddesses. The concept of blood offering may be perceived as an effective measure to pacify the aggressive nature of the deity.[2] Another myth says that one who is born in the womb of an animal is sacrificed for salvation and rebirth.[3] These perceptions are found in the Hindu Tantric

tradition of Rarh Bengal and male goats and buffaloes are offered in these practices.

Sacrifice is the ritual of killing. Animal sacrifice is the central dogma of many of the world's religions. It is prevalent throughout the planet and is an integral element of contemporary religious life. Sacrifice is the ritual through which the differences are observed in between the community to community, social rank to social rank, modern religion to ancient religion. Sacrifice is often detail oriented, lengthy, specific, elaborate and complicated. So to feel the truth of the sacrifice, one has to understand the mystery within it. In the Rarh region of Bengal, the sacrificial offerings of animals are often described as '*bali*' and the ritual is called '*balidan*' or '*pashubalidan*'. Several tantric texts, including *Kalitantram*,[4] *Mundamalatantram*[5] vividly describe the underlying theme of the *balidan* and the spiritual benefits of the offerer associated with it. Though rare, vegetable offerings are performed sometimes, known as '*kusmandabalidan*' (gourd offering) or '*akhbalidan*' (sugarcane offering). The theme of *balidan* relates the 'self' (*jiva*) and the sacrificial animal (*pashu*) and the consumption of the self animal by the divine deity will unite the material soul to the divine soul and helps in attaining liberation (*moksha*).[6]

The devotees of the Shakti Peethas believe that their relation with the divinity will enhance the flow of blood. In the Shakti sites, every day at least a male goat is sacrificed and on festivals this number touches hundred or more. On special occasions buffaloes are offered in front of the deities. The animal is first sanctified by the holy bath and puja by the brahmin of the temple, often described as '*paladar*'. Then the sacrificial ceremony is done in '*jupkastha*' or '*harikath*' and the meat of the animal is cooked and offered to the deity as '*bhog*' and subsequently distributed to the disciples as '*prasad*'.

Another three types of *bali* are performed in the Shakti sites of the Rarh region. First one is '*Shatrubali*', where an anthropomorphic figure is immolated with a sword during the puja. Here deep Tantric rituals are performed to harm an enemy with five impurities of Tantra. Second one is '*Atmabali*' where a devotee offers his or her own blood from the chest

to please the deity. Third one is '*Shivabali*' where the goat heads are offered to jackals, who are regarded as the divine vehicles of mother goddesses at the cremation grounds after the *bali*.[7]

Chintaharan Chakravarti[8] and several other researchers have observed, "animal sacrifice is a special feature of Shakti worship." The history of animal sacrifice can be traced in the Vedic literature. In his commentary on *Atharva Veda*[9] Sayana says, "The Brahman after killing the bull offers its meat to the different deities. In this hymn, the bull is praised, detailing which parts of the bull are attached to which deity as well as the importance of sacrificing the bull and the rewards of doing the same." Also in his *Rig Vedic* interpretation about sacrifices Sayana mentions, "You (O Indra), eat the cattle offered as oblations belonging to the worshippers who cook them for you."[10] Indra states in *Rig Veda*, "The worshippers dress for me fifteen (and) twenty bulls. I eat them and (become) fat, they fill both sides of my belly; Indra is above all (the world)." The notion of animal sacrifice is also mentioned in the Upanishad. *Brihadaranyak Upanishad* says to consume the meat of a sacrificial bull to give birth to a super intelligent child.[11] With the advancement of the Gupta age the initiation of Brahmanical renaissance had occurred in Bengal. Manu in his famous treatise *Manusmriti*[12] prescribes the animals offered for sacrifice at this time. Around the twelfth century in Bengal, the trend to follow Tantric Puranas can be observed among every class of the society. *Devi Bhagavata Purana*[13] lights on the Tantric procedures of animal sacrifice and it mentions that the Tantras are also practiced by Shudras. The blood chapter or *Rudhiradhyaya* is a unique and infamous chapter of *Kalika Purana* as it contains the explicit rules and regulations of animal sacrifice. According to this chapter, blood sacrifice is the integral part of Tantric Shakti *sadhana* and this ritual should be carried out by *sadhakas* during the worship. *Kalika Purana* refers to these species *viz,* bird, tortoise, alligator, goat, boar, buffalo, lizard, sosa, the nine species of deer, yak, spotted antelope, hare, lion and fish as the offerings for *balidan*. In

absence of the above mentioned species, sometimes elephants and horses can also be sacrificed.[14]

Gaudiya culture began to spread in Bengal with the rise of Chaitanya Deva in the mediaeval ages. During this time the zamindars and kings of small areas of Bengal began to practice Vaishnavism and followed the non-violent principles of Chaitanya Deva and admitted all animals and plants as divinity. As a result, Shakta Hinduism and Tantric doctrine gradually declined in Bengal. At this time the Shakti peethas of Rarh Bengal became the deities of the religion of the primitive tribes. Among them Tantric institutions are maintained by the lower levels of society.

Krishnananda Agamvagish a vivid Tantric practitioner and guru in Bengal revived the Tantric ideas around the sixteenth century from the gaudiya vaishnavite movement. In his Tantric nibandha *Brihattantrasara,* explained the Tantric rituals in detail which are generally followed in eastern India and Nepal. Krishnananda illustrated all the principles of Tantric thoughts in his book. According to him, sacrifice empowers the *sadhakas* to harness the power of Shakti.[15]

The discussion of animal sacrifice has a very deep root in cultural and anthropological history. While Tylor[16] proposes that the sacrifice should be considered as a gift to god, Smith[17] moots that the sacrifice is a "sacramental communion" between the human and the divine. According to Smith, the sacrifice should be visualised as a ritual meal. Community bonding is enhanced by the practice of sitting together and receiving *prasad* after the sacrifice. Another popular consensus says that sacrifice is also about abnegation and expiation of guilt. In general, sacrifice is the composition of the themes of substitution, commensality, abnegation and transformation. In the Tantra Shastra the concept of Shakti applies to both divine force and human energy. Therefore the *sadhakas* awaken the spiritual perception within them through Shakti *sadhana*. Shakti idol is considered by Bengali *sadhakas* to be their mother. Marcel Mauss propagates that like any dutiful son, the community wants to satisfy his mother with a gift and offered to get a larger gift instead.[18] Feministic

approach of sacrifice deals with the superiority of mother goddess. In the feminine concept sacrifices have been offered since ancient times to demonstrate the superiority and control of the matriarchy.[19] In colloquial Bengali the word '*pasu*' is used as a disgraceful sense to describe a person who is uncivilised and without control of his earthly desires. According to a popular saying of Rarh Bengal, through the animal that is sacrificed the person sacrifices its animal nature before the deity and with the blessings of them, he becomes free from the demonic qualities.

The composition of sacrifice is very complicated and can be divided into five broad parts. The first stage is *Baliprakaran* where the sacrificial animal is purified and sanctified. Subsequent mantras are performed to destroy the bonds of its animal lineage. The blood of the animal is treated as an emotional essence to touch the divinity where the animal wants liberation from this life and makes a rebirth in human lineage. The second stage is *Khargapuja*. Here the sacrificial sword is worshipped after the purification. This ultimate weapon possesses the power of the supreme source which cuts the bond of the animal. Another view from the Hindu Shastra tells that the sacred sword fulfills its epic function- the destruction of ignorance. *Stambhapuja* is the third stage where the *jupkath* is worshipped. Here the immolation takes place. It symbolizes the permanence and firmness of tantric cosmos. The fourth stage is *Chedan* or the immolation of the animal. This is the climax stage of all the procedures of *bali*.[20] Before the sacrifice, the animal is invoked as *Purusa* (Primal Man) and also as *Brahmanda* (the egg of Brahma). It is believed that with the immolation, the egg of Brahma is separated into two parts which carry the message of the next creation.[21] The final stage is *Utsarga* where the blood and flesh of the sacrificial animal is given to the deity (and sometimes to her consort). Both the sacrificer and the sacrificed animal seek grace from the divine.

Studying the history of civilization from ancient periods, it is understood that the practice of sacrifice is inextricably linked with the various religions of the world. Although Indian and Western philosophies differ in some respects on sacrifice, the prevalence of Tantra is observed everywhere. This is even more true in the case of Rarh Bengal. Because

many historians regarded Rarh Bengal as the 'heartland of Tantrism'. In this region Tantra mainly revolves around Shakti. The power of Shakti creates, sustains, and destroys the entire universe and also flows to the social and political world. Tantric ritual is the process through which spiritual liberation and worldly benefits are attained by the practitioner. In 'Auspicious Wisdom' Douglas Brooks mentions, "The Tantrika conceives of the world as power. The world is nothing but power to be harnessed."[22] Blood is essential among all the impurities that are treated as rites of salvation in tantric practice. This blood usually comes from animal sacrifices. René Girard is one of the most celebrated authors who proposes his theory against sacrificial rituals. Girard terms the sacrificial ritual as "violence" in his classic work 'Violence and the Sacred'. He associates sacrifice and murder saying that, "Sacrifice and murder would not lend themselves to this game of reciprocal substitution if they were not in some way related.''[23] Krishnananda Agamvagisha presents an elaborate constructive view of sacrificial practices of Rarh against the subversive and antisocial view of it. He clearly pleads for the use of impurities in tantric practices. According to him, all these Tantric worship involve people from all walks of life and all people can practice Tantra regardless of caste system.[24]

To go deeper into the ritual of sacrifice one has to understand the relationship between the sacrificer and the sacrificial animal. According to the saying of Rarh Bengal, sacrifice is the means of union between *jivatma* and *paramatma*. Here the sacrificer acts only as a catalyst. Another notion suggests, an animal (*pasu*) is symbolised as lacking true consciousness and the sacrificial sword helps to liberate the animal to the conscious stage by cutting its bonds. On a larger scale, Tantric sites have become focal points of human social gatherings. More rigorous research is needed on the sacrificial practices which are recognized by human beliefs and rituals.

References:

1. Barman, K. C. (2015). Shakti Peeth Bakreswar-An Ancient Religious & Rural Tourism Destination in Birbhum District of West Bengal. Asian Resonance. Vol 2. 191-194.

2. Zeiler, X. (2019). Eradicated with Blood: Text and Context of Animal Sacrifice in Tantric and Tantra-Influenced Rituals. International Journal of Hindu Studies, 23, 165-177.
3. Samanta, S. (1994). The Self-Animal and Divine Digestion: Goat Sacrifice to the Goddess Kālī in Bengal. The Journal of Asian Studies, 53(3), 788.
4. Srititirtha, S. (Ed.). (1981) Kalitantram. Kolkata Nababharat Publishers.
5. Shastri, P. (Ed.). (1980). Mundamalatantram. Kolkata Nababharat Publishers.
6. Samanta, S. (1994). The Self-Animal and Divine Digestion: Goat Sacrifice to the Goddess Kālī in Bengal. The Journal of Asian Studies, 53(3), 787.
7. Ibid, p. 783.
8. Chakravarti, C. (1963). Tantras. Punthi Pustak.
9. Griffith, R. T. H. (Ed.). (1917). The Hymns of the Atharva-Veda (Vol. 2). EJ Lazarus.
10. Wilson, H. H. (1857). Rig-Veda-Sanhita: A Collection of Ancient Hindu Hymns. Vol.3.
11. Krishnananda, S. (1977). The Brihadaranyaka Upanishad. Discourse, 1, 24.
12. Bandyopadhyay, S. (2004). Manusamhita. Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar.
13. Vijnanananda, S. (1921). The Srimad Devi Bhagavatam.
14. Blaquiere, W. C. (1799). The Rudhiradhyaya or Sanguinary Chapter. Translated from the Kalika Purana. Asiatic Researches, 5, 371-391.
15. Chattopadhyay, C. (Ed.) (1982). Krishnananda Aagamvagisha Tantrasara. Translated into Bengali from Sanskrit by Tarkalankar, C. K. Kolkata Nababharat Publishers.
16. Tylor, E. B. (1871). Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom (Vol. 2). J. Murray.
17. Smith, W. R. (1914). Lectures on the Religion of the Semites: First Series; The Fundamental Institutions. A. and C. Black.

18. Mauss, M. (2000). The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. WW Norton & Company.
19. McClymond, K. (2008). Beyond Sacred Violence: A Comparative Study of Sacrifice. JHU Press. p. 11-13.
20. Ibid. p. 29-33.
21. Samanta, S. (1994). The Self-Animal and Divine Digestion: Goat Sacrifice to the Goddess Kālī in Bengal. The Journal of Asian Studies, 53(3), 789.
22. Brooks, D. R. (1992). Auspicious Wisdom: The Texts and Traditions of Śrividyā Śākta Tantrism in South India. State University of New York Press.
23. Girard, R. (1977). Violence and the Sacred, trans. Patrick Gregory (1972), 25.
24. Agamvagisha, K. (1996). Brhat Tantrasara. Kolkata Nababharat Publishers.

Poverty, Sexuality and Criminality : The Nautch Women and The Informal Economy

Somen Dutta
Assistant Professor, Department of History,
RamKrishna Mahavidyalaya, Kailashahar, Tripura

Abstract : This article is an effort to understand a social phenomenon by experimentation with the tools of economic history. In many occasion the term like 'commercial prostitution', 'temple economy' or 'domestic economy' are being frequently used. Here, the term 'informal economy' will be used instead. Poverty, sexuality and criminality, this three were tagged by the "Raj" almost under a single bracket. Changing pattern of lived experiences of Nautch Women before and during colonial period and their economic contribution in society is the major area of discussion in this essay, that has been remained unrecognized within the ambit of Economic History. I believe this will allow to widen the scope of Economic History further.

Tags: #Nautch; #Sexuality; #Colonialism; #Economy

Introduction

The word 'Nautch', originally a common Indian word means dance. However, its anglicized form denotes professional girl dancer or musician. The Devadasis of South India and the Nautch girls of north India over the ages preserved, disseminated and popularized the tradition of Carnatic and Hindustani music and dance. Generally, the subject related to prostitution, slavery or dancing-singing girls is considered as a social issue. However, economic factors leading to women's expulsion from domestic household in many studies considered to be the major cause behind this social 'menace'. Indrani Chatterjee in her study on the subject has brought the issue of gender, which opens a new dimension. On the other hand, the intellectuals like Lakshmi Subramanian raised a serious question on the discipline of Musicology, studying the life history of some individual Nautch performers. These new scholarships again open the discourse for further intersectionality.

SECTION I

Colonial Understanding

The paradigm shifts in Indian society which took place over the course of 19th century, was as a result of interaction with the English values. These changes permanently altered the lives and livelihoods of many groups across the socioeconomic spectrum. Among the most dramatically affected were those women who would come to be categorised as ‘prostitutes. Yet, in the century before, very few of these groups of women would have considered themselves to be of ill-repute.1 Though, colonial factors cannot be overruled. “Prostitute”, this very term is problematic, as less than a century before, it was very unlikely that it would have been applied to many of those women. This recategorisation had long-term consequences not just for the women’s lives, but for the construction of gender roles in colonial India২. As the century progressed, definitions of ‘wife’, ‘concubine’ and ‘prostitute’ ossified. What came to be identified as ‘prostitution’ in India was, in fact, an amalgamation of a number of varied practices, beliefs and professions which spanned the social and economic spectrum, as we see the frequent use of “Baiji” in popular understanding. While it would be preposterous to claim that prostitution was ‘created’ by British colonialism, however, the colonial state heavily influenced the re-definition of the category to include groups of women who formerly had very little to do with the stereotypical brothel.

One of the first groups of women to come under the critical eye of observers and the colonial state were courtesans. Until the mid-19th century, hierarchies existed among women later classed as prostitutes. The courtesans (or chaudhrayans and tawa’ifs, as they were known in parts of north India) operated at the top of this classification. Chaudhrayans and tawa’ifs were valued for their skills in dance, song and etiquette in Lucknow’s highly refined court culture. These women were maintained by wealthy (often royal) patrons and while they provided sexual services to a very select, carefully chosen clientele, this represented only one component of their role.3 Veena Oldenburg has sought to portray the agency and independence such women possessed during this period, as evidenced by what she sees as their subversion of

overall gender roles, along with their personal wealth and the respect they commanded in society. Of course, it does not mean this overall liberty trickled down to the lower section of the society, nor it symbolize any meaning at all for the women living under same condition at the same period in other parts of the continent. As the story of Begum Samru suggests the same someway around mid-18th-century.4

Nevertheless, as the political economy shifted its course during mid eighteenth-century, the role and fortunes of these ladies also became uncertain. A century later, this escalated further. The revolt of 1857 was a nightmare for the British, which would shape many imperial policies in future. Here again the 'kotha' or the house of Tawayefs acted as source of information and inspirations for the rebels. Later on, these women were become soft-target for the local officials. Moreover, these women lost there early patronage from the separated and the departed nobles. Some of them chose to follow the Nawab in way to Calcutta. Calcutta then created a new construction of 'Hindustani baiji'. In united province, this Nautch and Concubainage were associated to feudal socio-economic structure, now after arriving at Calcutta, some of them became playmates of the Bengal's absentee landlordism. In the latter half of the century, the emergence of nationalists in the picture, further complicated the scenario.

It was in a similar manner that the practice of temple dedication and its dancers (or devadasi as they came to be known) was attacked. Although her main duties involved participation in temple dances, they were also responsible for food preparation, preparation of garlands for the deity, sweeping and cleaning the temple and bearing lamps to accompany processions. Temple dancers were permitted sexual relations with the first-born sons of elite Brahmin families, however, such relations, like those of courtesans, were carefully regulated. The family could uplift their prestige, and the temple could have also support of the rich.5 Prior to their inclusion in the 'prostitute' category, the temple dancing girls were apparently seen as performing a religious duty. However, this began to change by the 19th century. As there was no equivalent of temple dancing in Christianity, it is possible that the missionaries, having nothing to compare it to, automatically assumed the practice to be obscene and immoral and described Devadasis its main proponents.

The criminalisation of women as 'prostitutes' has been identified as being intricately bound with the formalisation of Brahminical practices which sought to uphold the primacy of patriarchy and firmly establish boundaries around marriage and 'appropriate' sexuality. The personal power of the (male) head of the household over its female members was now reinforced by law.6 Female jute mill workers were another such group targeted for going beyond outside the domestic space. Much to the consternation of elite men, these working women also refused to comply with newly established sexual 'norms' for women. Perhaps more critically for women of the lower and working classes was the fact that Indian elites, like European observers, found ready links between poverty, sexuality and criminality.

SECTION II

INFORMAL ECONOMY, A STORY OF MISUNDERSTANDING

In many nineteenth century texts, women who worked outside had been coined "Barbanita" or "barangana". It ignored the fact that, they are also an integral part of economic activities which was in most of the time in informal shape or may be illegal or sometime termed as underground economy. In the urban structure of Banaras, Nautch girl, Tawayef, and prostitutes had an especial place. This city had a unique internal economic dynamics where these professionals perfectly fitted. The immediate consumers of Banarasi sari were these women. For their professional purpose ornamentation and garments is an area, which is the most important part. For development and growth of an attritional work, it is necessary to have a minimum domestic consumption, which was of course fulfilled by the Tawayefs, dancers, singers and prostitutes. Apart from this, home appliances and cosmetics also were in high demand. It was not possible for an ordinary woman to afford these kind of luxurious goods; even bazar prostitutes could hardly afford such things. Many economic historians of premodern period especially Mughal era, including K. N. Chaudhuri. Have given emphasis on the commercialization and booming rate of luxurious items. This was not remained uncontested, but one can easily assume that, without this domestic market no such thing was possible.7

In Banaras, Lakhnau or in Lahore, a group of creditors followed these women, even in Bombay and Calcutta wherever they migrated. Without this money lending class, it was impossible to maintain a 'Kotha' for any housekeeper. It is to be noted that, the musical performance or "Mehephil" were seasonal and pilgrimage as well. Holi, Id-udZoha and Navaratri were among the main prominent social festivals when there income could increase. During Shraavana Purnima and Annapurna puja, devotees use to come in large number in Banaras.8 For obvious reason, this is the high time for the Banarasi prostitutes to enhance their income as much as they can. However, for rest of the year, they had to depend on the moneylender for their daily expenditure. In a particular point of this vicious circle, this forced them in to acute indebtedness. According to a survey, during 1940s, these women including skilled dancers and singers had to spend their fifty percent of monthly income as rent, commission, debt, and even bribe to the local police. They could only manage twenty to thirty percent of their income for food and clothing, and just five percent for health and medicine only in emergency.9

Before the British, the state particularly the city administration collected taxes in regular basis. Nautch programme and individual women both were taxed in Banaras and Lakhnau. Presence of royal court and royal patronage was a general feature of lakhnau, on the other hand, Banarasi girls were self-reliant, though impoverished and often maintain a close inter professional relation with prostitution.

SECTION III

TRANSITIONAL PHASE: JOURNEY TOWARDS COMMERCIALISATION

20th century, was a new phase for the Nautch girls, Devadasi and prostitutes. As the New growing urban metropolis extended their gravitation, all the previous women professionals including dancers to prostitutes, all the way had come under it. Struggling for their existence some of them had found their way and other were perished. The story of this transition would be written in city like Bombay or Calcutta. Earlier, a number of Bengali prostitutes successfully capitalized the opportunities, which was made possible by the Bengali Theatre. Now it was the time for

north Indian female singers to use this new media, which actually would give them a new identity as artist or full-fledged 'economic' professionals. It was made possible by the coming of Gramophone Company in India. Calcutta was their first hub, and GauharJaan, the first Indian to record a song commercially (1903-04).10 Johra Bai of Banaras, and AgrewaliMalkajaan among the other contemporaries. An Austrian match company used the photographs of eminent nautch performers to increase their brand value.

After all, they had to face two frontal attacks, from one side, the pressure from European 'civilizing mission' and purification movement by the 'Nationalists' on the other. Some of these women could counteract by making themselves suitable in this situation. The Persianate title 'Bai' or 'Jaan' was seemed as the sign of impurity and a link of their 'dark past'. Later on, 'Devi' and 'Begum' would replace those. Bharatanatyam emerged from the ashes of Sadir, and Katthak is the purified form of Mujra and some other traditions.11 Rukmini Devi's 'Kala Kendra' (1926) and 'GandharvaMahavidyalaya' of V.D. Paluskar were those institutions, formulated these new styles of dancing and singing, which might be able to give a new cultural identity to a newborn Nation.12

CONCLUSION

Devadasis of south and nautch performers of north India were associated to their own 'localized' form of economy. Opening or reopening of market and having been linked with the commercialized world, those local systems were subjected, then disrupted and finally perished. Transactions around Nautch performers have been seen as only as consequences but not those transactions were considered as a whole and the potentiality of those somehow overlooked in the academia. However, more attention on the 'temple economy' and the especial urban economic dynamics of Banaras is needed, which I think somehow has not been done emphatically. Complexity of the situation was more serious than it has been described. The state-imposed tax on the Nautch heavily, sellers, artisans were benefitted, sometime they played semi-political role in precolonial India. However, from the position of passive nobility, the Nautch performers of North India were often misunderstood and gradually thrown into prostitution, and often subjected by the colonial

state and law. Missionaries played an independent role, and raised their arguments and justification of the government policy. Nationalists had many voices of opinion, which should have to be addressed. The main problem in this writing is the lack of sophisticated method and technique, and failing to put the contents into a proper order. There is surely an undercurrent of economy which has been neglected so far, that feels me a need for this study. I am deeply indebted to Professor SudeshnaBannerjee, Dr. Tilottama Mukherjee and of course, the writings of Dr. Sanjay Subrahmanyam for the earlier theoretical formulation of this essay.

References:

1. Erica Wald, 'Defining Prostitution and Redefining Women's roles: the Colonial State and Society in Early 19th Century,' Goldsmith, University of London, Journal of History Compass 7/6, (November, 2009): pp. 1470-1483.
2. *Indrani Chatterjee, Gender, Slavery and law in colonial India, Oxford University Press, (New Delhi, 1999) PP. 19-26.*
3. . PranNevile, Nautch Girl of India: Dancer, Singer, Playmates, Nevile Books, (New Delhi, 1996) pp. 63-78.
4. . Michel Larneuil, *Begum Samru of Sardhana,* Sahitya Academy, New Delhi, (New Delhi, 2011), pp. 1-8.
5. . Kunal M. Parker, 'A Corporation of Superior Prostitutes: Anglo-Indian Legal Conceptions of Temple Dancing Girls, 1800-1914', Modern Asian Studies, Vol. 32, No. 3 (July, 1998), pp. 559-633.
6. . Chatterjee*, 'Gender, Slavery and law in colonial India', PP.112-119.*
7. . K.N. Chaudhuri, *The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760,* Cambridge University Press, (Online edition, 2010.): pp. 237-276.
8. . Jaynarayan Ghoshal, *Kashi Parikrama*, Bangiya Sahitya Parishat, (Kolikata, 1303 B.), p. 191.
9. S.D. Punikar& Kamala Rao, *A Study of Prostitutes in Bombay*, Allied Publisher Pvt Ltd, (Bombay, 1962), pp. 140-143.

10. Vikram Sampath, *My Name is GauharJaan: the Life and Times of a Musician,* Rupa, (New Delhi, 2012), pp. 196-251.
11. Uttara Asha Coorlawala, 'Ruth St. Denis and India's Dance Renaissance, Dance Chronicle, Vol. 15, No. 2 (1992), pp. 123-152.
12. Urmimala Sarkar Munsi&Aishika Chakraborty, *The Moving Space: Women in Dance,* Primus Books, (Kolkata, 2017), pp. 72-80.

Role of Youth in India's National Integration

Jayanta Pandey
Assistant Professor, Department of History
Achhruram Memorial College, Jhalda

Abstract: It is apodictic to assert that there is a close connection between youth and national integration. India is a land of unity in diversity. The future of this country lies in the hands of the young generation. They are considered to be the voice of the nation. They can make a huge difference. Youths can be involved actively in bringing up several changes - development, prosperity, and respect for our nation. This article first touches on India's vulnerability as a nation at the time of independence. It tries to identify various internal challenges relevant to India's national unity. Furthermore, it discusses elaborately how can our youth contribute through different ways to the national integration of India and concludes with a note that they would eradicate all internal threats and make our country stronger than ever before.
Keywords: Youth, National Integration, Communalism, Terrorism, Demographic dividend, Nation building.

Introduction:

On 15 August 1947, a hard earned, prized independence was won by the people of India after long, glorious years of struggle against the Britishers. India's freedom represents for its people the beginning of a long march to overcome the colonial legacy of economic underdevelopment, gross poverty, near total illiteracy, the wide prevalence of diseases, stark social inequality, and lack of political unity. Since the beginning, many critics have expressed doubts about India's ability to sustain its national integration and continue to progress as a nation. There have been vocal prophets of doom and gloom who predicted that neither freedom nor democracy would survive in India for long, that the Indian political system would collapse sooner or later, that the Indian Union would not survive and the nation-state would disintegrate into linguistic and ethnic fragments. They have repeatedly argued that India's numerous religious, caste, linguistic, and tribal

diversities, besides its poverty, social misery, and inequality, growing disparities of wealth, rigid and historical social structures, massive unemployment, and socio-economic problems would be bound to undermine its national unity, its democratic institutions. India would, therefore, either break up or alternatively be held together by a civilian or military authoritarian, dictatorial regime.[1] In 1960, the American scholar-journalist Selig. Harrison predicted, "The odds are almost against the survival of freedom and… the issue is, in fact, whether any Indian state can survive at all.”[2] But India, as a nation, proves all of these predictions completely wrong, remains united and continues to grow bigger on the international level.

Internal Challenges:

We also need to assert that we can't take our national unity just for granted. India's national integration has its own variety of challenges. India is a nation having great diversities. The people who inhabit this nation belong to different races, communities, and castes. They reside in different geographical regions and speak different languages. They believe in and practice different religions and have varied lifestyles. Communalism is the biggest threat in front of our nation today. India has been suffering from communalism since the colonial period. As we know, we faced the worst kind of communal riots on the eve of independence, and even after. There have been many communal riots in various parts of the country, inflicting loss of lives and immense suffering on the people.[3] Such riots are still raging in different areas creating deep concerns for the state. Regionalism is another obstacle in the way of national integration. On many occasions, it encourages people to promote regional interests even at the cost of national priorities. All of us know that India is a multilingual country. In India, there are over 2000 languages and dialects. This plurality has been negatively used on many occasions. Language politics is a challenge to India. Apart from that the prevalence of casteism, economic disparities,[4] and deep-rooted corruption at the administration level are posing a great threat to our national integrity. The extremist and separatist activities going on in different parts of the country are yet another challenge to national integration. Armed insurgency in Kashmir, Punjab, Nagaland, Assam, and Manipur

has acquired a dangerous dimension.[5] You must have heard about the Naxalite movement or Maoist movement (eastern and central India) or separatist activities(Kashmir and some parts of northeastern India). These movements quite often use violence, create fear in public life, cause the loss of lives of government personnel, and destroy public property. Internal and cross-border terrorism(mainly sponsored by Pakistan) is also presenting a big threat to India.[6]

Role of Youth:

The majority of India's population is young and therefore, their role in national unity is important. We have a long and rich history of young Indians fighting and even sacrificing their lives for the great cause of India's freedom struggle. The young population is an asset for the country if they are harnessed and utilised in the right direction. At present, unemployment is the major challenge that our youth facing. Government must address this problem through effective administrative policies and provide adequate skill training opportunities as well as support young entrepreneurs. On the other hand, our youth with their hard work and innovative ideas can help a lot to the economic growth of the country.

There are many ways through which our youth can contribute to national integration. NSS is one of the premier youth organisations in the country. Its role in inculcating the values of character, discipline, and social work among the volunteers and in shaping them into dynamic and responsible citizens of the country had been well recognised, Students can participate in NSS actively and through Special National Integration Camps(SNIC) volunteers will understand and value the rich heritage of cultures that forge unity despite the diverse languages, traditions, and regions of our country. These camps help to bridge the cultural gap among the participants. SNIC aims to propagate national integration among volunteers and society. These camps conduct various activities to promote National Integration among volunteers such as state awareness programmes, debates, quiz competitions, demonstration, cultural presentations etc., which help the volunteers in understanding the nation and its rich diversity.

National Cadet Corps(NCC) is the leading voluntary youth organisation in India under the guidance of the Indian Armed Forces. It provides the opportunity for school and college students to join this organisation. NCC aims at qualities of character, courage, discipline, spirit of adventure, sportsmanship, and the ideals of selfless service among the youth to make them good citizens. It provides a disciplined and trained manpower to the country that could be used in emergencies. It has actively taken part in the three wars with Pakistan(1948, 1965, and 1971). The NCC was mainly used in the transportation of supplies to the army and in capturing enemy paratroopers.[7] In today's scenario the role of NCC is very important for national unity. Inspiring the youth to be the engines of national integration is a real challenge. If young people are encouraged to associate themselves with organisations like NCC, perhaps it would play a major role in nation building. Special Integration Camps organised by NCC, aware our youth about the significance of national unity. These camps not only motivate our youngsters to stand for their motherland but also encourage them to spread nationalism among the people of the country. Active participation in youth exchange programmes with other countries undertaken by NCC would develop nationalist spirits among the cadets. Furthermore, cadets of NCC with their various types of social work such as adopting villages, serving old age homes and orphanages, cleaning public places, and organising blood donation camps can easily bring the people of the country together.

Youths, who are pursuing their studies in different educational institutions, often need to participate in conferences and seminars. and it is a fact that these are strong tools to generate awareness about national integration. So it is important that they would participate as well as organise conferences and seminars frequently on national integration and invite eminent speakers from all over the country. The seminars being conducted on national integration create an atmosphere where we are highly inspired by the spokesman and get a feeling of doing something for the nation by uniting all citizens of India together. During seminars and conferences, we get a feeling of oneness towards one's own country which binds us together in whatsoever place we reside. The feeling of oneness never fades away. Such initiatives not only create a strong

nationalist feeling among our youths but also make them happy and proud to be Indians and inspire them to help people in succeeding National Integration.

Indianness can be further developed by cultural and sports events. These kinds of well-thought events have the power to arouse strong national feelings among the citizens. By organising cultural events like dramas on nationalism, and shows on patriotic songs, our youth can promote national integration. They can also observe important national holidays as a unifying force. They would encourage people to celebrate Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti- regardless of language, religion, or culture. They will also need to observe National Integration Day on 19 November every year and take a pledge. Moreover, our National Symbols like the National Flag, the National Anthem, and the National Emblem also help to remind us that we all have one identity. For this reason, they should stress on awareness programmes about the importance of showing proper respect to these symbols. All of these things act as strong unifying forces both in times of celebration and adversity. They remind us of our common nationality. Not only that our youths can patron and participate in sports events like marathon running, cricket, hockey, and football matches to bring a feeling of togetherness among the people.

Writing articles not only give immense pleasure but also through those one can express himself/herself more effectively. Youngsters can start writing with the thought that They can aware people of their current understanding of the useful and burning topics in India. Latterly, they can use their writings in a way where they can actually educate and aware people about National Integration. In India, we have seen anything which is spread on social media has a good impact on Indian people. People like it so much whether it is good or bad. Writing srticles help in that matter. It is obvious that people will appreciate the idea of uniting people in one frame. There is no Hindu or Muslim for us. We should treat everyone with the same eye irrespective of their caste, creed, colour, or language. The same kind of openness we need to create among the people then only we can make India great again.

Conclusion:

Historian Ramchandra Guha said, "The forces that divide India are many…But there are also forces that have kept India together, that have helped transcend or contain the cleavages of class and culture, that - so far, at least - have nullified those many predictions that India would not stay united and not stay democratic."[8] At the same time, we shouldn't take independence for granted. As mentioned earlier, India is enjoying a demographic dividend. India can reap the economic benefits of it as well as strengthen national unity by mobilising its huge young population. The role of the Youth is very important in nation building. They can easily influence society and can also solve problems by introducing innovative and impactful ideas that will only help in the betterment of the country. They have the ability to create an identity for themselves, which will help in creating an impact. All the youth need is the support of their family and friends, and they can make our country great. So our youth can play a vital role in promoting national integration.

References:

1. Chandra, Bipan, and others, India Since Independence, Penguin Books, New Delhi, 1999, p. 5.
2. Harrison, S. S., India-The Most Dangerous Decades, Princeton University Press, Princeton, 1960, p.338.
3. Upadhyay, S. P. and R. Robinson, Revisiting Communalism and Fundamentalism in India, EPW, Vol. 47, No. 36, Sep. 2012, pp. 40-41.
4. Deaton, Angus, and Jean Dreze, Poverty and Inequality in India: A Re-Examination, EPW, Vol. 37, No. 36, 2002, pp. 3729-48.
5. Bose, Nirmal, National Integration, The Indian Journal of Political Science, Vol. 52, No. 1,1991, p. 2.
6. Mukherjee, Rohan, and David M. Malone, Indian Foreign Policy and Contemporary Security Challenges, International Affairs, Vol. 87, No. 1, 2011, p. 99.
7. Sharma, M. D., Paramilitary Forces of India, Kalpaz Publication, New Delhi, 2008, p. 305.
8. Guha, Ramchandra, India After Gandhi, Picador India, New Delhi, 2007, p. xxix.

IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON TEACHING AND LEARNING

Sougata Goswami
Assistant Professor of English, Department of Humanities
College of Engineering & Management, Kolaghat.

ABSTRACT : Artificial Intelligence & adaptive learning technologies are prominently emphasized as major advancements in educational technology. Artificial Intelligence has the capacity to identify areas in which courses can be improved. Due to the COVID-19 pandemic, the globe has changed dramatically in recent years. Various schools, colleges, and universities were forced to close as a result of the pandemic and the style of teaching and learning switched from face-to-face to digital online classes. An effective teaching and learning sector has the ability to alter a country by increasing productivity and developing human resources. Teachers who are able to use technology as a foundation for their teaching technique will profit from the automatic data collection generated by the students' participation. AI can do activities such as grading, assist students in improving their learning, and even serve as a substitute for in-person tutoring.

Keywords : pandemic, effective, foundation, technology.

DISCUSSION:

Baker and Smith give a wide definition of AI:" Computers that execute cognitive activities such as learning and problem-solving that are often associated with human minds". They say that AI isn't a single technology. Machine learning, natural language processing, data mining and algorithms are examples of technologies and approaches included under this umbrella phrase. This paper aims at answering the following key question," Has Artificial Intelligence shown any impact in Teaching and Learning?" and from the main question comes out the following sub-questions:

1. Is there an impact of Artificial Intelligence on effective teaching?
2. Is there an impact of Artificial Intelligence on effective learning?

3. Is there an impact of Artificial Intelligence on education?

AI applications are capable of performing assessment and evaluation tasks with great accuracy and efficiency. However, because the systems must be calibrated and trained, they are better suited to courses or programme with a high number of students. Articles that used automated grading, also known as Automated Essay Scoring (AES) systems, came from a variety of disciplines (e.g., English, biology, medicine, business studies), but they were mostly focused on its use inn undergraduate courses,including those with low reading and writing ability. The advantages of utilizing algorithms to discover pattern in text responses have been found to encourage more revisions by students. Both students and teachers benefit from AI education since it makes interaction more comfortable and convenient. Some students may be hesitant to raise their hands in class and offer questions. This could be due to a fear of receiving negative feedback. As a result, people can ask inquiries without being judged by the crowd using AI communication technologies. The teacher, on the other hand, might provide specific feedback to the pupil.

Educators have always prioritized adapting learning to meet the unique requirements of individual students. As AI advances, it may be possible for a machine to recognize a students' expression that indicates they are having difficulties comprehending a topic and adapt a lesson appropriately. Customizing curriculum to fit the needs of each student is not currently possible, but it will be in the future for AI-powered robots. AI can assist in making global classrooms more accessible to all students, particularly those who speak several languages or have vision or hearing problems. Presentation Translator is a free Power Point add-in that automatically creates subtitles for what the teacher is saying. This also helps students who are unable to attend school due to illness or who need to study at a higher level or in a topic not provided at their present school more alternatives. AI can help to break down boundaries between schools and conventional grade levels.

Artificial Intelligence is advancing tutoring and studying systems, and they will soon be more accessible and capable of responding to a variety of learning methods. Many more AI applications for education are in the pipeline, including student mentors, smart content production, and

a new approach to personal improvement for teachers through virtual global conferences. Although the use of artificial intelligence and machine learning in education is slower than in other sectors, progress is being made and will continue. Machine learning-based AI technologies may be utilized in education for a range of activities, including monitoring student behaviour and developing models that reliably anticipate student outcomes. In today's world, machine-based AI is already widely used in education. Artificial intelligence-based mini-tests may be used to create a range of interesting products, including intelligent teaching, covert assessments, games, and virtual reality. To get there, the educational system will need to make greater expenditures in the research and development of new testing technologies that will equip instructors and students with the resources they require.

CONCLUSION:-

Artificial intelligence and technology can significantly improve the sorts of evaluations teachers use to assist students' progress. Machine learning-based AI is more powerful since the computers can learn and improve over time, especially when dealing with huge, complex datasets. With AI, the programme aims to assist students in using artificial intelligence to achieve technological literacy, in line with the implementation of the Industry 4.0 programme in any country that is considering advanced technology-based educational initiatives in the twenty-first century. Schools in many countries that have begun to look into AI have developed solutions to overcome the various challenges faced by the world of teaching. While machine learning-based AI is still in its infancy, it has already demonstrated excellent outcomes in areas where there are no rules, such as assessing students' written replies or analyzing big, complicated datasets. In today's world, machine-based AI is already widely used in education. Natural language processing is used by various testing corporations, such as the Education Testing Service and Pearson, to grade essays. Massive online open courses, such as Coursera and Udacity, that enable limitless participation over the web, have also included AI grading to examine essays inside their courses. Natural language processing is now used by most states to evaluate the essay element of their yearly evaluation.AI can determine a student's learning

speed and needs based on their data. As a result of the findings Schools, Colleges & Universities can tailor course content to students' strengths and limitations, enhancing learning.

REFERENCES:

1. B.Coppin,Artificial Intelligence Illuminated, Boston, MA, USA: Jones and Bartlett,2004.
2. Russel,S., & Norvig,P.(2010).Artificial intelligence- a modern approach. New Jersey: Pearson Education.
3. Huang, C.et al.(2008). Developing an intelligent diagnosis and assessment e-Learning tool for introductory programming. Education Technology & Society,11(4),139-157.
4. Perin,D.,& Lauterbach,M.(2018).Assessing text-based writing of low-skilled college students. International Journal of Artificial Intelligence in Education,28(1),56-78.
5. Adamson,D. et al.(2014).Towards an agile approach to adapting dynamic collaboration support to student needs. , International journal on Artificial Intelligence,24(1),92-124.
6. Crown,S,et al.(2011).Anne G. Neering : Interactive chatbot to engage and motivate engineering students. Computers in Education Journal, 21(2),24-34.

Importance of Storytelling in Child Development

Ratul Nandi
State Aided College Teacher, Department of Education,
Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya

If you want your children to be smart, tell them stories.
If you want them to be brilliant, tell them more stories.
- Albert Einstein

Abstract : Storytelling plays an important role in a child's development. Even without being physically present, children reach through their imaginations into the world of thoughts, where they become real characters. An analysis of the modern structure of education shows that the ultimate goal of education is the holistic development of students/children. Where mental development is paramount. Storytelling helps children develop holistically. Also focuses on psychological, linguistic, and individual development. As well as emotional development. Storytelling also opens up children's fantasies. The seeds of discovery are sown in them. This article discusses in detail how storytelling, from a psychological perspective, can increase the level of curiosity in education in children.
Keywords : Storytelling, Holistic Development, Psychological Development, Linguistic Development,Individualistic Development.

Introduction

The history of storytelling is as old as human history. Since human understanding is largely related to storytelling -especially in relation to the concept of ‘relocation’, which means being able to refer to events belonging to a different time and place than ongoing communication (Yilmaz &Cigerci, 2018, pp.2). A review of the history of storytelling reveals that the practice of storytelling originated from the Altamira cave paintings about twenty thousand years ago. Where the cave dwellers draw pictures to match the various stories of their lives to the next generation. So it can be assumed that storytelling has been in vogue since the very beginning of human civilization. Only its appearance has changed. In ancient times, stories were told mainly by showing pictures. Besides, we have grown up listening to stories from our grandparents and elders since

childhood, and the remnants of those stories remain with us. Which merges with our real life. And now storytelling is considered as an art and a process of education.

Storytelling is an important teaching resource with a strong presence in all societies since the evolution of human language and has a highly effective role in the education of young children (Philips, 2000).The process of teaching has been going on in the field of education since ancient times by telling stories. In the Vedic age, disciples used to memorize Vedas, Upanishads, etc. by listening to stories from gurus. Which later came to be known as 'Shruti'. Or even during Buddhist teachings, 'Tripitaka' was memorized by listening to it. Also, the concept of 'Rote Learning'[1] that we get nowadays but the process of remembering by listening or seeing is predominant. So the idea is clear that memorizing or learning by listening (whether in the form of a book or the form of a story) has been widely practiced and universally accepted since ancient times.

The issue of the holistic development of students is one of the most important goals in the world of education today. Modern education believes in 'all over development'. Which will make the student use society in all respects. Storytelling focuses on the overall development of the student. Through storytelling, the student can imagine. And through it the child's mental development takes place. Again, the child wants to characterize themselves with the help of that imagination, and through this, the child develops physically, emotionally, morally, and socially, which leads him/her to healthy education and life.

Review of the Related Literature

Yabe et al. (2018) conducted a study on the psychological and educational development of children under the influence of storytelling. In this study, they applied the method of Near- Infrared Spectroscopy (NIRS)[2]. The results indicated more sustained brain activation to

[1] Rote learning is a process where the emphasis is on remembering new things. Rote learning focuses on how well a student remembers a subject.

[2] Near-infrared spectroscopy (NIRS) is a brain imaging method that measures light absorbance to calculate oxy-haemoglobin (oxy-HB) and deoxy-haemoglobin (deoxy-HB), which provides an indirect measure of brain activity, particularly in the frontal cortex (Giles et al. Omega-3 Fatty Acids and Cognitive Behaviour, 2014, pp. 303-325).

storytelling in comparison with picture-book reading, suggesting possible advantages of storytelling as a psychological and educational medium in children (Yabe et al., 2018).

Satriani (2019) conducted research in which storytelling plays an important role in increasing the literacy rate. Literacy is very important in reading, writing, and counting. This qualitative descriptive research is mainly done through students with interviews and observations. Research is done through interactions, learning materials, and various media in two (2) languages. Although early in the research there were some problems with teachers' ideas about storytelling, the research findings show that the role of storytelling is very important in increasing Literacy ability in Indonesia.

Bartan (2020) conducted research on 72 Pre-School teachers in Turkey, where 40 students were applied to find out which of the various storytelling methods was the most acceptable. From the results obtained from this quantitative research, it was concluded that the effective use of audio-visual elements in storytelling methods was the most effective factor for children to understand the story and focus on it for a long time (Bartan, 2020, pp.75).

Rahim (2021) did his research on Digital Storytelling. Where he sees how storytelling is making students and teachers more engaging, innovative, and interactive with the help of ICT. This qualitative research is mainly done on 4 teachers in Jakarta, Indonesia and the results show that the students are better accepting and interacting with storytelling in their studies.

Importance of Storytelling in Child Development

In 1936, the Swiss psychologist Jean Piaget published the subject of Cognitive Development[3]. Where he mentions four mental levels of a person's life. Through which a person's mental structure is formed and he/she can understand, know and comprehend all things. Piaget speaks of four levels in his theory- 1. Sensory Motor Stage (Birth to 2 Years), 2.

---

[3] Piaget's Theory of Cognitive Development, deals with human intelligence. This theory was discovered by the Swiss psychologist Jean Piaget (1896-1980). It basically discusses how one acquires knowledge, preserves it, and how it is applied. This process is a lifelong process. Hence this theory is also called developmental stage theory.

Pre - Operational Stage (2 to 7 Years), 3. Concrete Operational Stage (7 to 11 years), 4. Formal Operational Stage (12 to adolescence). Now the question is, what is the role of storytelling in his theory?

And how? To put it simply, the baby stays with his/her mother from birth. Where he/she grew up listening to various stories from his/her mother and later on in other stages of his/her life he/she also embodied various aspects of his/her life through storytelling in various ways through imagination, visualization, etc.

Children have a process of listening to stories. They hear the story from different places and assimilate it in themselves and later arrange it as their own and make it a reality. In this case, Benjamin Samuel Bloom (1913-1999) in his book *"Taxonomy of Educational Objectives: Classification of Educational Goals (1956)*[4]*"* mentions 6 steps under the cognitive domain. Which, indirectly, is related to the process of storytelling and the cognitive, perspective, and emotional acceptance of children.

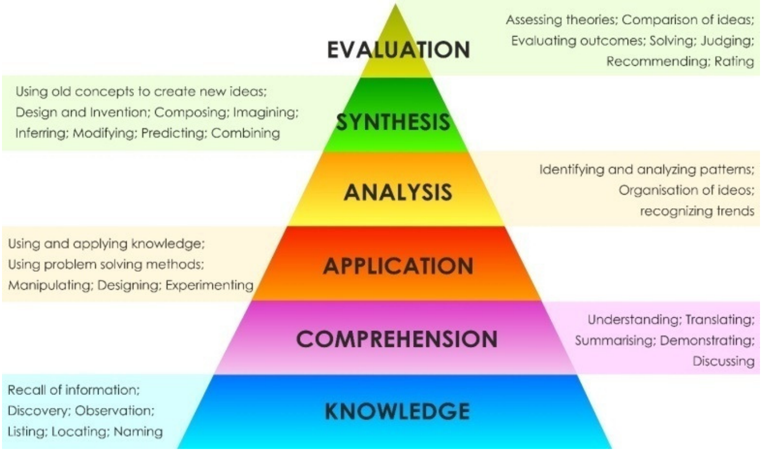

Figure 1.1 *Pyramid model of Bloom's Taxonomy 1956*

From the figure above, it is clear that the purpose of education is achieved in terms of six steps. In storytelling too, children apply these six (6) steps from listening to the story to applying it in their own lives.

---

[4] In 1956, Benjamin Samuel Bloom and his colleagues attempted to classify educational objectives in terms of task analysis or terms of student behaviour and defined the taxonomy of educational objectives.

- **Knowledge**

In this case, the students listen to the story and form ideas about all the information, specific facts, visualization, etc.

- **Comprehension**

At this level, students try to understand the previous information, facts, etc. in their own way. Reinforce "basic thinking skills" (Stalling, 2019).

- **Application**

The next level of comprehension is application. In this case, the students will try to make the heard story into reality through the power of imagination, power of visualization, intrinsic thoughts, etc. The heard story will become real.

- **Analysis**

Every story has a causal relationship. Thus, students can grasp the depth of the story by exploring or analyzing that causal relationship. And this will create rational thinking in them.

- **Synthesis**

After realizing the causal relationship of the story, at this stage, the student creates a new form of the previous story. Where a new story is born. This builds students' ability to create or discover new things.

- **Evaluation**

Bloom chose Evaluation as the final stage of his taxonomy. Where all the issues of the previous five stages are judged as to whether they are correct or not. This stage is also very important for Storytelling. At this stage, the child/student adapts the story they have heard, analyses it thoroughly, gives it a new shape, etc., and finally reveals how it is or how it is served. At this stage, the student develops the ability to see or accept something in the overall context.

In the above discussion, we see how storytelling from a psychological perspective helps in the development of children. It has been said before that storytelling improves students not only mentally but also physically, emotionally, and morally.

Benefits of Storytelling in Child Development

Rahil Shah (2021) has made some positive statements about the importance of storytelling.

I. Making Sense of the World

As far as cultural empathy goes, stories are probably one of the most effective ways to enable our children to get an understanding of our world and the diversity in it (Shah, 2021). Each story gives a different idea about this world. So children will be aware of new countries, cultures, customs, people, features, diversity, etc., and will be able to judge others by themselves. This will create curiosity to know the world.

II. Build Imagination

When children see something visually, their thoughts get stuck in that, so they can't think of anything new. But there is no limit to storytelling. Children can hear stories and imagine them. They can match the world of their imagination to themselves. Stories fire up the imagination and the seeds of creativity (Shah, 2021).

III. Focus

In today's world of technology, children's ability to concentrate is greatly reduced. They cannot concentrate on any task. But the story forces children to focus. Children get stuck in different events of the story, and different characters. They want to know what will happen next.

IV. Better Communication

The story opens up to the children. The children go into the depths of the story and tell what they don't understand. This creates the space for a successful interaction. Through interaction, they develop thinking, reasoning, comprehension, etc.

V. Introduction with the Perspective

Different people may have different views on a subject. In the same way, when a story is told to a group of children, a variety of thoughts emerge from it. Every child understands that in a particular story, everyone has different perspectivesand different opinions. Through this, they learn to listen to each other, learn to understand, and learn to respect.

Conclusion

Storytelling brings language learning alive and creates a participatory and immersive experience that allows Young Learners to enjoy hearing the language in a dynamic, sometimes stylistic, and entertaining way. Participation using key vocabulary and phrases can create an awareness of rhythm and structure (Shannon, International House World Organization, 2017, issue 43). Thus, it is clear that storytelling and proper storytelling is an invaluable tool for the development of children as well as students. While it is undeniable that this is a long and time-consuming method of conventional education, it is extremely difficult to use this type of method of teaching and learning in a country with a large population like ours. But besides that, it is also true that the education process is going on like this in many remote areas of our country. This is the method by which teachers or educated people of the village are teaching the next generation. So this method is difficult but not impossible. **"Learning through storytelling"** is gaining ground around the world. In West Bengal too, teaching through storytelling is gaining prominence in several cases and the results are positive. In fact, in the case of the overall development of students, there is a great need to tell stories about the case of overall development through mental development. At present children are reluctant to read books, as a result of which they are not aware of their culture and traditions and are not interested. But there is nothing better than listening to the story. And listening to this story is important for students to study. The doors and windows of their minds are opened through the curiosity of the story. So that they can take up the subject of their studies with interest. In addition, it improves children's imaginative power, visualization power, perception, listening to others, understanding, etc. So there is no difficulty in acknowledging that storytelling is a very necessary and important factor in the development of the child at present, which will help the child to develop more and more in the future.

Reference

Bloom's Taxonomy | Fran Stallings - Storyteller. (n.d.). Fran Stallings. https://www.franstallings.com/Workshops/BloomsTaxonomy#hide-block-bartik-main-menu

Giles, G. E., Mahoney, C. R., &Kanarek, R. B. (2014). Omega-3 Fatty Acids and Cognitive Behavior. *Omega-3 Fatty Acids in Brain and Neurological Health*, 303–325. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-410527-0.00025-9

Google Image Result for https://www.kidkenmontessori.com/wp-content/uploads/37.jpg. (n.d.). Https://Www.Kidkenmontessori.Com/Wp-Content/Uploads/37.Jpg. Retrieved May 29, 2022, from https://www.google.co.in/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kidkenmontessori.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F37.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.thestudentroom.co.uk%2Fshowthread.php%3Ft%3D6565818%26page%3D7&tbnid=XGz8PzczhdgTuM&vet=12ahUKEwjN2OmKjYT4AhVuk9gFHSUYDs8QMygAegQIARAk..i&docid=L1ub-i6wW_nA6M&w=4837&h=2862&q=bloom%27s%20taxonomy%201956&hl=en-IN&ved=2ahUKEwjN2OmKjYT4AhVuk9gFHSUYDs8QMygAegQIARAk

Harmon, S., & Chatterton, S. (2018). Exploring Bloom's Taxonomy as a Basis for Interactive Storytelling. *Interactive Storytelling*, 171–175. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04028-4_16

IH World. (2017). *Why Storytelling is Important*. https://ihworld.com/ih-journal/issues/issue-43/why-storytelling-is-important/

Importance Of Storytelling In Child Development. (n.d.). BW Education. http://bweducation.businessworld.in/article/Importance-Of-Storytelling-In-Child-Development/04-08-2021-399379/

Isik, M. A. (2016). The Impact of Storytelling on Young Ages. *European Journal of Language and Literature*, *6*(1), 115. https://doi.org/10.26417/ejls.v6i1.p115-118

MacDonald, M. R., Whitman, J. M., & Whitman, N. F. (2013). *Teaching with Story: Classroom Connections to Storytelling*. August House.

Mangal, S. K. (2004). *ADVANCED EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, SECOND EDITION* (2nd ed.). PHI.

Rahiem, M. D. H. (2021). Storytelling in early childhood education: Time to go digital. *International Journal of Child Care and Education Policy*, *15*(1). https://doi.org/10.1186/s40723-021-00081-x

Russell, R. L., & van den Broek, P. (1988). A Cognitive-Developmental Account of Storytelling in Child Psychotherapy. *Cognitive Development and Child Psychotherapy*, 19–52. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3635-6_2

Satriani, I. (2019). STORYTELLING IN TEACHING LITERACY: BENEFITS AND CHALLENGES. *English Review: Journal of English Education*, *8*(1), 113. https://doi.org/10.25134/erjee.v8i1.1924

Wadsworth, B. J. (1981). *Piaget's Theory Of Cognitive Development: An Introduction For Students Of Psychology And Education*. Longman.

Yılmaz, R., &Ciğerci, F. M. (2019). A Brief History of Storytelling. *Advances in Media, Entertainment, and the Arts*, 1–14. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5357-1.ch001

Preventive Detention and Detention Camp : A Study of Buxa Fort Since 1865 to 1951

Madhusudan Paul
Research Scholar, Department of History
University of North Bengal

Abstract : Preventive Detention Laws and the development of the Detention Camps, mainly the Buxa Detention Camp under the British Raj were a significant addition in the criminal justice system of colonial India. Detention laws in general and Detention Camps in particular were a corollary to contemporary penal reform in India. In the case of preventive detention, no offense was to be proved nor any charge to be formulated. The justification was solely suspicion or reasonable probability in contrast to criminal conviction and used it as a precautionary measure rather than a punitive measure. In colonial India, specially in Bengal, increasing rural violence in the late eighteenth century served as provocation for the major changes in the mode of punishment instead of basic criminal laws. Their own experiences at home defined their perceptions of crime in India. Similarly, the process of the criminalization in colonial India was prompted by the urgent need to generate greater social discipline in the subject society as without such order, revenue collection, trade and administrative control would be disturbed. All these led to the authorities finding no alternative other than adoption of imprisonment as the precautionary of the first resort to cope up with such crimes, criminals and violence. Instead of prisons, penal settlements, home arrest, in the 1930s the authority needed detention camps on the eve of disobedience of salt law and civil disobedience movements, along with the extensiveness and popularity of revolutionary movements. It served as an area to acquire knowledge on the nature of the colonial rulers and how they exercised or negotiated the colonial power over their colonized subjects in India.

Key Words: Preventive Detention, Precautionary, Liberty, Detention Camps, Buxa Detention Camp, Discipline and Disciplinary Law.

Introduction:

The term 'Preventive detention' was a process of imprisonment where an individual could be arrested without trial, and an act which is putatively justified for non-punitive purposes and most often to prevent further criminal acts. It was often characterized as a precautionary measure rather than a punitive measure, in a sense that the action arises out of suspicion and seeks to prevent the committal of a crime. In this regard, Sir Reginald Craddock, home member in the Viceroy's Council stated that the restrictive measures in the act were "preventive and not punitive in measures".[i] Preventive detention in India dates back to British rule in 1818 under the Bengal Regulation of III which was followed by Defence of India Act 1915, Defence of India Act 1939, Rowlatt Act of 1919, Bengal Criminal Law Amendment Ordinance (B.C.L.A.O.) of 1925 and 1930.[ii] However, the sense of preventive detention was impinged upon a person's liberty. Henceforth, the notion of liberty under the British was that the antithetical notions of Preventive Detention were the crusaders of liberty in their own land.[iii]

It is worthwhile to mention that, throughout the ages; fear of punishment can reduce or eliminate punishable action (crime) and culpable mental state. And this perception has always been popular among criminal justice thinkers. The ideas of different forms of punishments have been formalized in different ways through the ages in order to the respective ruler and his administration. But the use of Detention as a precautionary and Detention Camp as a safe custody to prevent crime is a new notion in the history of the criminal justice system in India. Detention law was an alien suppressive mechanism which was enforced by the British imperialists to preserve and perpetuate British rule over India. Where, they have enjoyed the freedom against arbitrary arrest and detention to an Englishman in England but were denied to the Indian.[iv]

However, preventive detention is a very pragmatic goal of the criminal justice system under British rule. The objective behind it is that, if the criminals or individuals who have a culpable mental state are locked up in a secured environment, they will be unable to victimize everyday citizens and not go disturbing the tranquility and threatening the

security of the state. But in colonized India, the preventive detention laws were used by the British as a suppressive tool with the growth of suspected criminals, revolutionaries and anti-British nationalist activists.[v] Basically, the Detention Camp, an aftermath of preventive detention, was first installed in the 1930s in different parts of British India and eventually in Bengal, where Hijli, Berhampore and Buxa Fort were being the centre in accordance with the Ordinance I of 1930.[vi] Similar to the institutionalization of police, army, judiciary and others the British established the institution of prison and detention camps by which they tried to control, discipline, and civilize and to encourage loyalty among the colonized subjects according to their codes and ideology. Conceptually, detention laws, prisons and detention camps became a mechanism of the British government that represented the ways and techniques through which colonial power was constructed and deployed in India.

Preventive Detention Laws:

Entrenchment of preventive detention law in India can mainly be attributed to the period wherein Indian territories were under the control of the East India Company or the British Empire. The first act authorizing the provision of detention without trial was the Bengal State Prisoner Regulation III of 1818,[vii] "the oldest statute dealing with preventive detention of India". This regulation empowered the administration of police to detain an individual or group of persons indefinitely, and without having to commit the detainee to trial. Similar regulations were gradually extended by the British to the province of Madras in 1818 and province of Bombay in 1827.[viii] Prisoners under these regulations had no right of Habeas Corpus.[ix] These laws were passed by the British as a temporary measure to meet and control a specific situation, i.e. contemporary crimes, criminals and some sort of regional upsurges held in different parts of Bengal, Madras and Bombay Presidency. But, later on this preventive detention law under different guise had acquired a more sophisticated form and permanent place in the law of the criminal justice system of British India with the Defence of India Acts of 1915 and 1939; the Rowlatt Acts of 1919 and the Bengal Criminal Law Amendment Ordinance of 1925 and of 1930.

Intention and aftermath of the Preventive Detention Laws:

These laws were designed to control crimes and to maintain law and order. But, in practice these laws were used on a widespread scale for limiting revolutionaries, through arresting perpetrators of religious violence, to curtailing the voice of moderate political leaders.[x] By March 1916 widespread arrests helped Bengal Police crush the Dacca Anushilan Samiti and Jugantat Dol[xi] and revolutionary violence in Bengal plummeted to 10 in 1917.[xii] By June 1917, 705 persons were under home-arrest under the act, along with 99 imprisonments under Regulation III.[xiii] Through the war, more than 1400 people were interned in India, and a further three hundred subjected to minor restrictions.[xiv] By the end of the war there were more than eight hundred interned in Bengal.[xv] All important nationalist leaders, except Gandhiji, were detained along with 3000 others, by the end of 1921.[xvi] In 1930 more than 150 revolutionaries were detained in Bengal.[xvii] By 1943, some 11,700 people including Mahatma Gandhi and the Congress High Command were under detention.[xviii]

The passage of the act was supported unanimously by the non-official Indian members in the Viceroy's legislative council, from moderate leaders with Indian political movement, and was seen as necessary to protect against British India from subversive nationalist violence in 1915. But with the passing of time, the wide scope and its widespread application was not to be limited to those suspected for revolutionary violence and crimes. It gradually came to be used in coercing and suppressing the voice of many nationalist leaders, even moderate views, where regional administration felt their opinion or views were seditious to British rule in India, or dangerous to the administration.[xix] Unpopularity was such that unrest spread in the country against the act and it became a flashpoint of political discontent and nationalist agitation over the colonial period in India. Actually, while trying to appease Indians, the British government was ready with repression.

Background of the installation of Detention Camps in Indian perspective and the Buxa Detention Camp:

Ladlimohan Roychowdhury's article[xx] reveals that "these revolutionaries and nationalists; and others suspected criminals were over detained by the British government under these repressive laws to isolate them from the

society. These were roughly of three types – Jail, Penal Settlement and Detention Camp." These Detention Camps were opened in Hijli, Berhampore, Buxa Duars of Bengal and some other parts of India, in the 1930s: when numbers of prisoners and detenus related with the disobedience of salt law and civil disobedience movement and revolutionary activities increased and numbers of the prisoners became unmanageable to accommodate in the existing jails.[xxi]

In this article, Buxa Detention Camp and its disciplinary rules is the subject of the present author's discussion. At the same time, the once important military, administrative and commercial centre of Buxa Fort became first a military cantonment and later a detention camp during the British period – a history of this evolution is also being attempted under this work.

The history of the Buxa Detention Camp is deeply intertwined with the memories of the political Detenus of India's national independence movement and the detenus of the communist activists of the post-independence phase. Although not as well known as the notorious Cellular jail in Andaman or the Mandalay Penal Settlement in Burma, this dual entity made Buxa Detention Camp Unique. Historic Buxa Fort is situated at the foot of the north-eastern Sinchula Range of the Himalaya, in Jalpaiguri district and near the border with Bhutan.[xxii]

Eminent Central Asian Scholar professor Ram Rahul[xxiii] reveals that the Bhutanese built the Buxa Fort in the first half of the 17th century. They used the fort as a point of contention between the Bhutan Kingdom and the Cooch Kingdom; and to protect the portion of famous "Silk Route" connecting Tibet with India, via Bhutan.[xxiv] Buxa Fort, the most important military and commercial centre was later occupied by the British. The British on invitation of the Cooch King intervened and captured the fort which was formally handed over to the British on November 11, 1865 as part of Treaty of Sinchula.[xxv] Considering the military importance of the Buxa Fort, the British renovated it from its bamboo wood structure to stone structure and made it as a permanent military cantonment from 1865 to watch over the Bhutanese troops.[xxvi] In 1914, on the eve of World War I, the cantonment was converted into a military police camp by the British government. This force of military

police was transferred to Dacca in 1924 and the Governor General through a notification declared the status of Buxa fort to be a military cantonment was cancelled.[xxvii] Buxa Fort again came into the limelight of history in the thirties of the 20th century. The political situation in Bengal became more complicated due to the revolutionary activities and looting of Chittagong arsenal. In this context the Buxa Fort cantonment was renovated and converted into Detention Camp in 1930.[xxviii]

Apparently the fact that Buxa Fort is a Detention Camp and not a Jail has necessitated the issue of separate rules governing the conduct and discipline of persons detained there.The British Government, announcing rigorous provisions against the persons detained at Buxa Duars Camp in the Jalpaiguri district:-[xxix]

1. The rules state that any police officer or constable may use a sword, bayonet, fire-arm or any other weapon against any such detenu escaping or attempting to escape or engaged in any combined outbreak or using violence to any officer of the Fort or other person.
2. The rules further lay down that the detenus must stand up when any inspecting officer or authorized visitors visits his quarters.
3. No detenu will be able to receive any letter, telegram or postal parcel nor shall he make correspondence with any one unless they are previously examined by the Commandant, Buxa Fort.
4. Various punishments under the Jail Code including cellular confinement and separate confinement have been prescribed for failure to observe any of those rules.

These rules are made under Section 13 of the Bengal Criminal Law Amendment Act of 1930, and by the order served on him under Section 2 (1) of the said Act the detenu was ordered to obey them. Under Section 6 of the said Act whoever knowingly and willfully disobeys any direction in such order shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.

<u>Aministration of the Buxa Detention Camp:</u>

Seven barracks were built for the confinement of detenus at this camp. The camp was protected by a high wall on one side and a barbed wire fence on the other three sides surrounded by a ditch. Guards with guns were stationed on high platforms at some intervals.[xxx] Lock ups were

opened at 6 A.M. in the morning in winter and at 5:30 A.M. in summer. In the morning all the detenus – some would walk and jog; and some would play football or hockey in the field below the camp. To ensure that no detenus could escape, the entire play ground was surrounded by barbed wire fence and armed guards kept watch over the detenus at all times.[xxxi] In 1938, the "(VII) edition of Bengal Jail Code"[xxxii] had provided some human facilities for prisoners mainly the detenus, like exercise and study. Rules were framed to maintain libraries in jails and detention camps of Bengal. Buxa Camp had a hall with a library. The library had various books approved by the British government. There was a lawn in front of this library – where volleyball, badminton and yoga were played. Cultural programs such as drama, music etc. were held in the hall. Everyone was then confined in a ward or separate cell according to their offence and behavior before evening. No inmate of the Buxa Detention Camp could visit his relatives. On the one hand, it was not possible to hope for the relatives of the detenus after crossing the difficult route, and on the other hand, there was no arrangement for the relatives to spend the night. The only means of communication with relatives was letters. These letters were also censored and then handed over to the detenus.[xxxiii]

Mr. P. E. S. Finney, Assistant Superintendent of Police, Barrackpore, 24-Paraganas, was posted to Buxa in the Alipur Duars subdivision of the Jalpaiguri district. After Mr. Finney, came Colonel Hogan, about the year 1933 and he was assist by Mr. Radcliffe, who was in post of Assistant Commandant.[xxxiv]

<u>Political Detenus and their activities:</u>

Pannalal Chakraborty,[xxxv] an Indian employee working at Buxa Detention Camp from 1933, states that there were about 250 detenus of Anushilan Group, Anushilan Revolted Group and Jugantar Group from different districts of Bengal. Professor Ananda Gopal Ghosh[xxxvi] also mentions about 250 detenus, but he mentions not three but four groups namely – Anushilan Samiti, Jugantar, Bengal Volunteers, and Third Party. Although Purnendu Sengupta[xxxvii] mentions the names of such groups as – Anushilan Samiti, Jugantar Dol, Bengal Volunteers, Hindustan Socialist Republican Army, Sreesangha etc. According to Sengupta, 60 percent of

those held at the Buxa Camp at this time had spent 15 to 30 years in the Andaman and other prisons. Pannalal Chakraborty points out that there were different kitchens for each group. Each group had one office manager and one kitchen manager. The names of those who were managers in 1933 are given below:

1. Anushilan Group: Office- Shri Saral Kumar Sen, Kitchen- Shri Daskhinaranjan Mitra.
2. Anushilan Revolted Group: Office- Shri Sudhanshu Mukherjee, Kitchen- Shri Suran Roy.
3. Jugantar Group: Office- Shri Manoranjan Dhar, Kitchen- Shri Satish Tagore.

Buxa's impregnable fort and strict discipline could not suppress the strong spirit of the detained revolutionaries. Seventeenth birth anniversary of the Kabiguru (master of poet) Rabindranath Tagore was celebrated at Buxa in 1931 (1338 Bangabda, twenty five Baishakh). On September 16, 1931, Santosh Maitra and Tarakeswar Sengupta lost their lives in the Hijli detention camp, firing on the unarmed revolutionaries. The revolutionaries who were detained in Buxa became vocal in their protest after a week-long hunger strike. On the eve of the Second Round Table Meeting in October 1931, the patriotic Jatindramohan Sengupta, who came to Buxa with a special massage from Gandhiji, sat in a meeting with the detained revolutionaries. In 1933, Jatin Gupta and Krishnapada Chakraborty, members of the Anushilan Samiti, escaped from the Buxa Camp, which demonstrated the indomitable spirit of the sons of Bengal.[xxxviii] The incident of this escape was a shining example of their immense bravery and patriotism – which bears witness to the inaccessibility and administrative failure of the camp.

There were separate meetings and political classes of different political parties in Buxa Camp. On January 26, an all- party meeting led by Trailokyanath Chakraborty, as proposed by Jugantar Dal leader Bhupati Majumder, the Independence Day oath and flag hoisting ceremony was held. This included strengthening the bond of unity and brotherhood among the detenus. Detenus could also know from various sources how the freedom movements were progressing all over India. In the 1940s, a number of hand bills were printed for Indian soldiers in the

British army appealing not to oppose the "Quit India Movement". Some copies of this hand bills were traced to the hand of Buxa detenus.[xxxix]

There is a rumor that Netaji Subhas Chandra Bose was detained at Buxa Camp. But no evidence of this event has been found yet. In addition, the evidence that he was not detained at that camp was obtained from the C.I.D. branch of Bengal.[xl]

Closing and re-opening of the Buxa Detention Camp:

The first phase of Buxa Detention Camp was open till 1937. This inaccessible detection camp was re-opened in the wake of the Quite India Movement of 1942. From 1941 to 1946, numerous soldiers of Indian independence movement were detained in this camp under the Defence of India Act of 1939. When the Communist Party was banded in independent India in 1949, many leaders and workers were arrested under West Bengal Security Bill of 1947 and put them into Buxa Detention Camp. This camp was abandoned in 1951.

A historical review reveals that such laws and detention camps had been primarily directed at preventing political parties, revolutionaries groups, mass organizations and individuals from carrying on their freedom struggle in both violence and non-violence ways against the British Raj in support of the colonial subjects. But, here it must be mentioned that the national freedom movements had been weakened for some times, but it never ended until liberty has come from the Raj in spite of colonial repression. Actually, colonial tyranny accelerated their indomitable zeal, self-sacrifice and desire to save the Motherland.

Notes & References:

---

[i] *Sammadara, Ranbir, The Materiality of Politics. Vol. 1, Anthem Press, London, 2007, p. 94.*

[ii] Ibid.

[iii] Freemantle, H. E. S., "Liberty and Government", *10 International Journals of Ethics,* July, 1900, pp. 439-463.

[iv] Bhagwat, Niloufer, "Institutionalising Detention without Trial", in *Economic and Political Weekly, Vol. 12,* No. 11, Mar. 16, 1987, p. 510.
[v] Rahaman, A. Faizur, "Preventive Detention an Anachronism', in *The Hindu,* Tuesday, Sep. 07, 2004.
[vi] *Home Department /Ministry, Poll Branch, Consultation/ Collection: 1930, File No. 327/I Date: 31/10/1930,* West Bengal State Archive, Kolkata.
[vii] Omar, Imtiaz, *Rights, Emergencies, and Judicial Review,* Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1996, p. 41.
[viii] Harding, Andrew and Hatchard, John, *Preventive Detention and Security Law: A Comparative Survey,* Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1993, p. 60.
[ix] Ghosh, S. K., *Terrorism, World Under Siege,* Ashish Publishing House, New Delhi, 1995, p. 398.
[x] Horniman, B. G., *British Administration & Amritsar Massacre,* Mittal Publications, Delhi, 1984, p. 45.
[xi] Popplewell, Richard J., *Intelligence and Imperial Defence: British Intelligence and the Defence of the Indian Empire1904-1924,* Routledge, London, 1995, p. 210.
[xii] Bates, Crispin, *Subalterns and Raj: South Asia since 1600,* Routledge, London, 2007, p.118.
[xiii] Popplewell, Richard J., *op. cit.,* p. 210.
[xiv] "Prisons interned" *Parliamentary Debates (Hansard), House of Commons,* 22 October 1919, Col. 52-3W.
[xv] Bates, Crispin, *op. cit.,* p.118.
[xvi] Chandra, Bipan, *History of Modern India,* Oriental BlackSwan, Hyderabad, India, 2009, p. 290.
[xvii] Ramraj, Victor V. and Thiruvengadam, Arun K., *Emergency Powers in Asia: Exploring the Limit of Legality,* Cambridge University Press, New York, 2010, pp.199-200.
[xviii] Mr. Smith, E. Conran, *Official Report of the Council of State Debates,* 2nd August 1943.
[xix] Bates, Crispin, *op. cit.,* p.119.

[xx] Roychowdhury, Ladlimohan, “Andaman, Hijli O Mandalay” (In Bengali), in *Desh Patrika,* 19th August 1989.
[xxi] Majumdar, Dilip, *Karagar Konthorodh Rabindranath (in Bengali),* Chakraborty, Calcutta, 1993, pp. 74-78.
[xxii] *The Imperial Gazetteer of India, Vol. V, Abazai to Arcot,* Secretary of State for India in Council, Oxford, London, 1908, p. 221.
[xxiii] Rahul, Ram, *The Himalaya as a Frontier,* Vikas Publishing House, Delhi, 1978, p. 78.
[xxiv] Allen, B.C., Gait, E.A., & others, *Gazetteer of Bengal and North-East India,* Mittal Publications, New Delhi, 1979, p. 237.
[xxv] Singh, Nagendra, “Appendix VII – The Treaty of Sinchula”, *in Bhutan: A Kingdom in the Himalayas: A Study of its People, and Their Government,* Thomson Press Publication Division, 1987, p. 243.
[xxvi] *The Imperial Gazetteer of India, Vol. V, op. cit.,* p. 221.
[xxvii] Professor, Ghosh, Ananda Gopal, “Jaatiya Mukti Tirtha Aitihasik Buxadurga Bandi Shibir” (in Bengali), in Kar, Arabinda, *Jalpaiguri Zilla Sankalan (1869-1994),Vol. I,* Kirata Bhumi, Jalpaiguri, 1994, p. 463.
[xxviii] *Home Department /Ministry,mop. Cit.*
[xxix] *Ibid.*
[xxx] Das, Nitish, “Buxa Bandi Shibir” (in Bengali), in Kar, Arabinda, *Jalpaiguri Zilla Sankalan (1869-1994),Vol. II,* Kirata Bhumi, Jalpaiguri, 1994, p. 559.
[xxxi] Sengupta, Purnendu, “Buxa Durger Sei Dinguli” (in Bengali, in Bhowmik, Tapas, *Paradhin Bharater Jailkhana (in Bengali),* Korak Sahitya Patrika, Prak-Sharad 2019, Kolkata, pp. 349-351.
[xxxii] *West Bengal Jail Code, Vol. II, VII Edition,* Calcutta, West Bengal Govt., 1967, p. 329.
[xxxiii] [xxxiii] Sengupta, Purnendu, *op. cit.,* pp. 349-351
[xxxiv] *Home Department /Ministry, op. cit.*
[xxxv] Chakraborty, Pannalal, “Buxa Durga O Bandi Nibas Ebang Ami” (in Bengali), *Janamat (Bengali Newspaper)*, 1987, Jalpaguri.
[xxxvi] Professor, Ghosh, Ananda Gopal, *op. cit.,* p. 465.
[xxxvii] Sengupta, Purnendu, *op. cit.,* pp. 348-349.

[xxxviii] Bandopadhyay, Sekhar, "Megher Gaye Jelkhana: BuxaDuars" (in Bengali), in Ghosh, Tarapada and Mandol, Ajit (eds.), *Paschimbanga, Jalpaiguri Zilla Sankhya* (in Bengali), Tathya O Sanskriti Vibhag, Paschimbanga Sarkar, 2001, pp. 244-249.

[xxxix] Sengupta, Purnendu, op. cit., p.349-350.

[xl] *Secret, For Police Use Only, File No. 167(X)22, The Property of Govt. of Bengal, Intelligence Branch C.I.D. Bengal,* Bengal Govt. Press 1939, West Bengal State Archive, Kolkata.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik 2582 3841

Ebong Prantik 2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 850/-